গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

আমি
কান পেতে
রই

শ্রীমতী প্রতিমা মিত্র ও

শ্রীমান মণীশ চক্রবর্তীকে

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের আগ্রহ, উৎসাহ ও আনুকূল্য সর্বাধিক

"আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
মাধুরী করেছ দান
তুমি জান নাই তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ"॥

বছরটা মনে আছে—১৯২৬ ; সময়টাও—জুন মাসের মাঝামাঝি, ১লা কি ২রা আষাঢ় হবে। গরমের ছুটি শেষ হয়ে আসছে, আর কটা দিন পরেই ইস্কুল খোলার কথা। মাত্র একশটি টাকা সম্বল ক'রে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম।

কেন পালিয়েছিলুম সেকথা এখন থাক। পালাবার মতো আপাত কোন কারণ ঘটে নি। লেখাপড়ায় যে ঠিক অতটা বীতরাগ ছিল, তাও নয়। যাবার আগে এর অন্ধকার দিকগুলো ভেবে দেখতে পারতুম। অনেককেই এমন পালিয়ে আবার ফিরে আসতেও দেখেছি 'কালামুখ নীলে ক'রে'। বহু গল্পেও পড়েছি এমনি পালানোর অবশ্যম্ভাবী ও শোচনীয় ফলাফলের কথা। নিজে তখনও পর্যন্ত একটা পাসও দিতে পারি নি, মাত্র ফার্স্ট ক্লাস চলছে তখন, সুতরাং বিদ্যেবুদ্ধিরও এমন জোর নেই যে কোথাও গিয়ে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব। তবু যে পালালুম সে নেহাৎ দুর্মতি বলতে হবে ; দুর্দৈবও —নইলে অমন মতিই বা হবে কেন?

কেন পালাব সে সম্বন্ধে ধারণাটা কিছু ঝাপ্সা থাকলেও কোথায় পালাব সেটা ঠিক ছিল প্রথম থেকেই। অবশ্যই দিল্লী। দিল্লী ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কথা চিন্তাই করি নি। রাজধানী জায়গা, যদি কিছু ক'রে খেতে হয় তো সেখানেই সুবিধা, আর দেশ-ভুঁই থেকেও বহু দূর। সেখানে কেউ চিনবে না, সামান্য কোন চাকরি—এমন কি ফেরিওয়ালার কাজ করতেও বাধবে না।...

অন্তত সেই রকমই বুঝিয়েছিলুম নিজেকে। আসল কারণটা অন্য—সেটা আজ বুঝি। ছোটবেলা থেকেই ঐতিহাসিক নাটক আর উপন্যাসে ঝোঁক। এমন কি স্কুল-কলেজ-পাঠ্য ইতিহাসের বইও বাদ দিই নি। পড়েছিও বিস্তর, এই বয়সেই নাটক-নভেলের শ্রাদ্ধ করেছি বলতে গেলে। তার ফলে দিল্লী আমার কাছে শুধুমাত্র একটা বড় শহর ছিল না, দিল্লী আমার কাছে জীবন্ত ইতিহাস, বিচিত্ররূপিণী, বিচিত্রবর্ণা। বহু ইতিকথা ও রূপকথায় গড়া তার দেহ। সে দেহে বহু কাহিনী-কিংবদন্তীর ওড়না। তার চোখে বহু ঐতিহাসিক নরনারীর বহু প্রণয়-বেদনার মোহাঞ্জন-সুর্মা, অধরে বহু রাজাবাদশার সর্বনাশ-করা হাসি। যদি যেতেই হয় কোথাও কোন শহরে তো—দিল্লী ছাড়া কোথায় যাব?

দিল্লী অবশ্য আগেও গিয়েছিলুম একবার, মা ও দাদার সঙ্গে, সে দেখে আশ মেটে নি। নিজের মতো ক'রে কল্পনা ও ইতিহাসে মিলিয়ে স্মৃতির রঙে রাঙিয়ে দেখা হয় নি। ভবিষ্যৎ বাজে কথা, সে যা হয় হবে—ভাল ক'রে দেখার টানেই গিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সে টানটা ছিল যতক্ষণ বাড়ি থেকে বেরুই নি ততক্ষণই। গাড়িতে চড়ার পরই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবটা তার স্থূল বাস্তব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। অভাব অনটনের সংসার, দাদা সবে চাকরিতে ঢুকেছেন—ষাটটি টাকা মাইনে পান, এই একশ'টি টাকাই সংগ্রহ করতে হয়েছে অনেক কাণ্ড ক'রে এক মাসিমার কাছ থেকে—এবং বলাই বাহুল্য—বেশ খানিকটা মিথ্যার সাহায্যে। অতিরিক্ত আর কিছুই আনা সম্ভব হয় নি, বরং বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে আসবার পথেই ঐ একশ' টাকা থেকে খরচ শুরু হয়ে গেছে।

সেকালে একশ' টাকার মূল্য এখনকার থেকে ঢের বেশী ছিল ; তবু একশ' টাকা যে মোটে একশটি টাকাই, কোনমতেই তার বেশী নয় এবং এক টাকাতে ষোল আনার বেশী কিছুতেই পাওয়া যায় না—এ জ্ঞান পুঁথিপত্রে যতই যা থাক এমন ক'রে এর আগে কখনও বুঝি নি। আরও একটা দিব্যজ্ঞান হ'ল এই যাত্রায়—পৃথিবীতে টাকা

না ফেললে কিছুই পাওয়া যায় না। যে সামান্য একটা কাজ করে সেও পারিশ্রমিক চায়, একমুঠো চিনেবাদাম যে দেয় সেও তার বিনিময়ে একটা পয়সা আশা করে। এমন কি এক্কাওয়ালা বা টাঙ্গাওয়ালারা যখন সরকারী নির্দিষ্ট সওয়ারী নেবার পরও কাউকে গাড়িতে তোলে তখনও তারা পয়সাই প্রত্যাশা করে, পরোপকারের কথা ভাবতে পারে না।

সুতরাং সেই অগণিত-রোম্যান্সে-ভরা ইতিহাসের মোহিনী দিল্লী শহরের মাটিতে পা দেবার বহু পূর্বেই কোন্ মানসদিগন্তে মিলিয়ে গেল—তার রঙীন ওড়নার ফুঁপিটুকুও চোখে পড়ল না। যে লালকেল্লার কথা মনে হ'লেই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হ'ত, সেই অদৃষ্ট-দেবতার বহু নাটকের অভিনয়মণ্ডিত লালকেল্লার পাষাণপ্রাঙ্গণের থেকে নবনির্মিত ঐতিহ্যহীন সেক্রেটারিয়েটের অলিন্দ বেশী আকর্ষক বলে বোধ হ'ল।

কিন্তু হায়! 'হায় রে রাজধানী কঠিন কায়া'! পাষাণমুঠিতলে শুধু মাত্র ব্যাকুলা বালিকাদেরই চাপে না সে, আমার মতো অর্বাচীন ভাগ্যান্বেষীদেরও নিষ্পেষিত ক'রে তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন গুঁড়িয়ে রেণু রেণু ক'রে দেয়। বরং সেক্ষেত্রে আরও কঠোর, আরও নির্মম সে।

না, কিছুই হ'ল না এ শহরে। কোথাও কিছু জীবিকার উপায় দেখা গেল না, প্রবাসী বাঙালীদের কাছে স্বদেশবাসী কিছুটা প্রশ্রয় পাবে এই ভরসায় যেসব বড় বড় 'অফ্‌সার'দের সঙ্গে দেখা করলুম—তাঁরা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। এমন কি সেদিনও দিতে পারি নি। প্রতি মাসেই এমন আট-দশটি ছেলে আসছে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'—যাহোক-কিছু-একটার আশায়। চাকরি এত সস্তা নয়—তার নিয়ম-কানুন আছে। এমন কি বেয়ারার চাকরি দেওয়াও আগের মতো বাবুদের ইচ্ছাধীন নেই। আর এত বেয়ারার চাকরিই বা কোথায়? বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা দেখে এবং স্মার্ট কথাবার্তা শুনে দু'একটি ছেলেকে তাঁরা কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য ক'রে ব্যবসায়ে লাগাবার চেষ্টা করেছেন,—বলাবাহুল্য, একজনও তাদের মধ্যে ধোপে টেঁকে নি। কেউ কেউ তো সে অর্থ 'প্রাপ্তিমাত্রেই' সরে পড়েছে। একথা শুধু ওঁদের মুখে নয়, স্থানীয় অন্য বাঙালীদের মুখেও শুনলুম।

কিন্তু তাদের কথা বা ওঁদের কথা ভাববার সময় নয় তখন। চাচার নিজের প্রাণ বাঁচানোর সমস্যাই প্রবল। খুবই সস্তার আমল সেটা, এখনকার ছেলেমেয়েরা ভাবতেই পারবে না সেদিনের অবিশ্বাস্য সুলভতার কথা, তবু ষোল আনা ষোল আনাই, পাঁচসিকে নয়। একশ' টাকাটা যখন মাত্র দশ টাকায় দাঁড়াল তখন চোখে অন্ধকার দেখলুম। এতদিন—যাত্রার পরিকল্পনা থেকেই চিন্তা ছিল কেমন ক'রে পরিচিত লোকেদের পরিহার ক'রে চলব, এখন ভাবতে বসলুম, কাছাকাছি কোথাও কোন পরিচিত লোক আছে কিনা। আপৎকালে বুদ্ধিও যায় ঘুলিয়ে। সে সময় আত্মীয় বা পরিচিত কারও কথাই মনে পড়ল না, অথচ ছেলেবেলা থেকে তো কতবারই কত লোকের মুখে শুনেছি, 'অমুকের অমুক দিল্লীতে থাকে', 'অমুক এখন মীরাটে'! ইত্যাদি—

অনেক চিন্তার পর, সেই গোনা দশটি টাকা থেকে আরও দু-তিনটি টাকা খরচ হয়ে গেলে মনে হ'ল—এক উপায় আছে বৃন্দাবনে গিয়ে পড়া। মা-দাদাকে চিনি, চিঠি লিখলেই যে তাঁরা ত্রস্তে-ব্যস্তে গাড়িভাড়ার টাকা পাঠাবেন তা নয়, আর পাঠালেও সে টাকা আসতে আসতে পাঁচ-ছ দিন কেটে যাবে, ততদিন দাঁড়াব কোথায়? কোন্ ঠিকানাতেই বা টাকা পাঠাতে বলব? সুতরাং এখন একমাত্র উপায় কোনমতে গাড়ি ভাড়ার টাকাটা সংগ্রহ ক'রে বাড়ি ফিরে যাওয়া এবং মাথা হেঁট ক'রে গিয়ে দাঁড়ানো।

এখন সেই টাকাটা সংগ্রহ করাই বড় সমস্যা।

মনে পড়ল বছর-দুই আগে যখন মার সঙ্গে বৃন্দাবন আসি তখন ওখানকার ব্রজবাসী বা পাণ্ডার সঙ্গে খুব মাখামাখি হয়েছিল। সেই সময়ই শুনেছিলুম আপদে-

বিপদে এইসব পাণ্ডারা যজমান-যাত্রীদের প্রচুর টাকা ধার দেন—তীর্থের ঋণ কেউ মারবে না এই ভরসায়। আমার মাকেই সে কথা বহুবার বলেছেন আমাদের কাশীরাম ব্রজবাসী, 'মাজী, আমি হাপনার ছালিয়া—হাপনার যা দরকার হবে বলিবেন। কাপড়-চোপড় লোই-উই যা দরকার কিনিয়া লেন, টাকার কথা কুছু চিন্তা করিবেন না।' মার অবশ্য দরকার হয় নি—বরং তিনিই অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সাধ্যের অতীত তাঁর—চড়া সুদে টাকা ধার ক'রে তীর্থে গিয়েছিলেন সেকথা মনে না রেখেই। যাই হোক—সেটাও কি মনে থাকবে না ব্রজবাসীর? সেক্ষেত্রে সেই মা-জীর আপন 'ছালিয়া'কে দশ-বারো টাকা ধার দিতে তাঁর আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই।

কথাটা যত ভাবলুম তত তার উজ্জ্বল দিকগুলোই চোখে পড়তে লাগল, সেটা যে আপন গরজেই দেখছি—অর্থাৎ অন্য কোথাও কূলকিনারা না পেয়েই মজ্জমান ব্যক্তির মতো তৃণখণ্ডকেই সুবৃহৎ কাষ্ঠ ভাবছি—তা একবারও মনে পড়ল না। অতএব আর কালবিলম্ব না ক'রে বৃন্দাবনেই রওনা হয়ে গেলুম এবং ট্রেন ও এক্কায় আরও কিছু অর্থব্যয় ক'রে একদা এক সন্ধ্যায় পুরানো শহরের মণিরামপাড়ায় আমাদের ব্রজবাসীর বাড়ি পেঁৗছলুম। তখন সম্বল মাত্র আড়াইটি টাকা।

গত দুদিন ধরে পাণ্ডাজীর টাকাটা দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নটাই চিন্তা করেছি, কিন্তু তিনি যে বৃন্দাবনে না থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা আদৌ মনে পড়ে নি। সেই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার নিষুতি রাত্রে অনেক ডাকাডাকির পর পাণ্ডানী উঠে দোর খুলে দিয়ে যখন খবরটি শোনালেন তখন হঠাৎ মনে হ'ল বুকে-পিঠে কে যেন খানিকটা বরফ চেপে ধরল। অথচ কথাটা মনে পড়া খুবই উচিত ছিল। এই সময় এঁরা অনেকেই বাংলা দেশে যান ঝুলনের যাত্রী সংগ্রহ করতে—সেকথা বহুবার শুনেছি। গত বছর আমাদের বাড়িও গিয়েছিলেন ব্রজবাসী ঠাকুর। শুধু আর কোন উপায় ছিল না বলেই বোধ করি কথাটা মনে করতে চাই নি।

যাই হোক—সৌভাগ্যক্রমে ব্রজবাসিনী চিনতে পারলেন, যদিচ সঙ্গে বিশেষ মালপত্র নেই দেখে ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার বার আমার হাতের ছোট্ট খবরের কাগজে মোড়া পুলিন্দাটার দিকে তাকাতে লাগলেন। তা তাকান—সেজন্য সেরাত্রের মতো অন্তত আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ঘটল না। তখনই চুলায় কাঠ ধরিয়ে ঘরের-তৈরী-ঘিয়ে ভাজা উপাদেয় বেজোরের* পরোটা এবং মুগেরীর অর্থাৎ মশলাদার মুগের ডালের বড়ির তরকারি বানিয়ে দিলেন। শেষ পাতে আচারও পড়ল একটু এবং এত রাত্রে দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে বলে আধা পোয়া রাবড়ি কি মালাই আনিয়ে দিতে পারলেন না (মূল্য দু' পয়সা) বলে বার বার আপসোস করতে লাগলেন। অতঃপর বাইরের উঠোনে একটা শয্যাও পাওয়া গেল রাতটুকুর মতো।

কিন্তু পরের দিন সকালে গৃহজাত মাঠা এক লোট্টা পান করার পর যখন আসল কাজের কথা পাড়লুম, তখন এক নিমেষে তাঁর অমন রমণীয় মুখখানি কুলিশ-কঠোর হয়ে উঠল। তিনি স্বার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ব্রজবাসী ঠাকুর আজ পনেরো-কুড়িদিন বাড়ি ছাড়া। যাবার সময় নগদ এক পয়সাও রেখে যান নি খরচার মতো—সমস্তই 'উধার' ক'রে চালাতে হচ্ছে, এক্ষেত্রে রুপেয়া-পৈসা তিনি কিছুই দিতে পারবেন না। এবং আরও জানালেন যে যেহেতু বাড়িতে আর কোন পুরুষ নেই, তাঁর লড়কা এই সবে ষেটের এক বছরের, সেহেতু আমার পক্ষে সেখানে থাকাটাও খুব শোভন নয়। এবেলাটা তিনি দয়া ক'রে থাকতে দিতে পারেন—বিকেলের মধ্যে যেন অন্য কোথাও আমি নিজের

* সম-পরিমাণ গম ও ছোলার আটা।

ব্যবস্থা ক'রে নিই।

কথাটা কিন্তু অসমীচীন নয়, ব্রজবাসিনীর বয়স সত্যিই অল্প এবং যদিচ আমার তখন মাত্র সতেরো বছর বয়স, তবু আমার যা দৈহিক গঠন তাতে দেখলে 'মিনসে' মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তখন অকস্মাৎ একটা প্রবল অভিমান বোধ করলুম ওঁর কথাতে, এটাকে রীতিমতো অকৃতজ্ঞতা বলেই মনে হ'ল। বেশ একটু চোটপাট ক'রে মনের সাধ মিটিয়ে 'নিমকহারাম' 'বেইমান' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত ক'রে সেই অদ্বিতীয় পুলিন্দাটি নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম।

অর্থাৎ আবারও একটি বিরাট আহাম্মুকি ক'রে বসলুম। যার সম্বল পকেটে কমবেশি আড়াইটি টাকা, একটি বাড়তি ধুতি, একটি বোম্বাই চাদর—সঙ্গে যার একটা বিছানা পর্যন্ত নেই বা বেচবার মতো একটা আংটি কি ফাউন্টেন পেন—তার এতটা মেজাজ দেখানো উচিত হয় নি। একবেলা একবেলাই লাভ, তাছাড়া সারাদিন সময় পেলে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে মনটা নরম করা যেত খানিক, অন্তত ওঁর ঠিকানায় টাকাটা আনাবার ব্যবস্থা করা যেত। চাই কি একটা বিছানা ধার ক'রে নিয়ে কোন ধর্মশালাতেও ওঠা যেত—তিন-চারদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ধর্মশালা একাধিক আছে, বদলে বদলেও দিন পনেরো কাটানো যায়। সেখানে থেকে ওঁর কাছে খেয়ে কটা দিন যাকে বলে 'কাদায় গুণ ফেলে' কাটানো যেতে পারত। ততদিন বাড়ির টাকা না আসুক—ব্রজবাসী এসে পড়তে পারতেন।

কিন্তু এসব কিছুই করা হ'ল না। হ'ল যেটা—সারাদিন টো-টো ক'রে ঘোরা। এ মন্দির ও মন্দির—খানিকটা বা যমুনার ধার, খানিকটা বা স্টেশনের দিক। এক পয়সার ছোলা-ভাজা ছাড়া ভরসা ক'রে কিছু কিনে খেতে পারলুম না। একবার মনে হ'ল মাধুকরী শুরু ক'রে দিই কুঞ্জে কুঞ্জে—কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা ত্যাগ করলুম, এই চেহারায় ভদ্র জামা-কাপড় পরে গিয়ে 'জয় রাধে' বলে সিকিখানা কি আধখানা রুটি ভিক্ষে চাওয়া যায় না। চাইলেও কুঞ্জবাসীরা দেবে না—তার বদলে পুলিস ডাকবে। গোবিন্দ মন্দিরে গিয়ে মনে হ'ল কামদারের সঙ্গে দেখা ক'রে কিছু প্রসাদ ভিক্ষা করি—কিন্তু কেমন যেন শেষ মুহূর্তে গলায় আটকে গেল কথাগুলো। শেষে যখন সেই দুঃসহ গ্রীষ্মের অপরাহ্ণও ম্লান হয়ে এল—তখন আর ঘুরে বেড়াবারও শক্তি রইল না, মনে হ'তে লাগল এই মুহূর্তে মরে যাবার মতো সুখ আর কিছুতে নেই—মৃত্যুই সর্বাধিক শ্রেয় বোধ হ'ল।

সবচেয়ে যেটা চিন্তা এখন—আশ্রয়ের। এ অবস্থায় কোন ধর্মশালায় ঢুকতে দেবে না, 'সামান কাঁহা' প্রশ্ন ক'রে চৌকিদাররা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে—চুরি গেছে বললেও বিশ্বাস করবে না। এখন দাঁড়াই কোথায়? এখানে সন্ধ্যার পরই ভোগ লেগে যায়, রাত নটা না বাজতে বাজতে নিষুতি হয়ে আসে শহর—তারপর? ঘুরে বেড়ালেও তো পুলিস ধরবে? অভাবে দুঃখে মানুষ হয়েছি, তবু মাথার ওপর অভিভাবকরা ছিলেন—ঠিক নিজেকে কখনও এমন অসহায় অবস্থায় পড়তে হয় নি, চোখে অন্ধকার দেখা বলতে কি বোঝায় তাও এ পর্যন্ত অনুভব করি নি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারবারই ঘা খাচ্ছি তবু এতদিন ঠিক এ অবস্থা হয় নি—আজ এই প্রথম চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

গোপীনাথের ঘেরা থেকে বেরিয়ে তখন পা দুটোকে টেনে টেনে লালাবাবুর মন্দিরের দিকে চলেছিলুম, লালাবাবুর মন্দির বলে নয়, এমনি উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঐদিকে ফিরেছিলুম মাত্র—চলতে হবে বলেই চলা, বসবার জায়গার অভাবে—অকস্মাৎ এইভাবে বিনা প্রস্তুতিতে চোখের জল উপ্‌চে বেরিয়ে পড়ায় দারুণ বিব্রত বোধ করলুম। তখনও দিনের আলো কিছুটা আছে, গ্রীষ্মের গোধূলি এসব দেশে দীর্ঘস্থায়ী—রাস্তাতে লোক-

জনের চলাচলও যথেষ্ট, যমুনাপুলিন বা গোপেশ্বর থেকে, কি কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন সেরে গোবিন্দ গোপীনাথ—যেদিকে হোক যাবার এইটেই প্রধান রাস্তা, এদিকেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি, সাক্ষীগোপালের ভাঙা মন্দির, এদিকেই ঐ সরু গলিটায় ঢুকলে বিরাট মজা পুকুর—ব্রহ্মকুণ্ড। সুতরাং লোকজন তো থাকবেই। তারা একটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জোয়ান ছেলের চোখে জল দেখলে কী ভাববে, কোন মন্দির দেখলেও বা কথা ছিল, ভক্তি-অশ্রু বলে চালানো যেত। এ না-জানি কত কী ব্যাখ্যা করবে—ডেকে জেরা করাও অস্বাভাবিক নয়।

কেউ দেখুক না দেখুক, সে মুহূর্তে আমার মনে হ'ল বিশ্বের সমস্ত লোক কৌতূহলী হয়ে আমার এই চোখের জলের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি যেন দিশাহারা হয়ে গেলুম লজ্জায় সঙ্কোচে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখে পড়ল বাঁ-হাতি একটা দোতলা বাড়ির সদর দরজা খোলা, তার দীর্ঘ অন্ধকার গলিপথ ভেদ ক'রে দেখা যাচ্ছে—দূরে টিমটিম করছে রাধাকৃষ্ণের একটি ছোট যুগল মূর্তি। অর্থাৎ এটাও কোন মন্দির বা কুঞ্জ।

আঃ, আমি যেন বেঁচে গেলুম! আর কিছু না হোক ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার ছলে চোখের জলটা তো ঢাকতে পারব, ওখানে যদি কেউ থাকেও—পূজারী প্রভৃতি—আবছা আলোতে তারা অতটা বুঝতে পারবে না। একবার প্রণামটা সারতে পারলে কোন ভাবনা নেই, সাতখুন মাপ, চোখ মুছলেও কেউ সন্দেহ করবে না, বড় জোর ভক্তির আতিশয্য ভাববে। আর দ্বিধা করলুম না, করার সময়ও ছিল না, অবাধ্য চোখের জলটা বেরিয়েই চলেছে, কোনমতে বাগ মানাতে পারছি না—তাড়াতাড়ি মাথাটা হেঁট ক'রে যেন—ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঢুকে পড়লুম মন্দিরের মধ্যে।

বাড়িটা মনে হ'ল দোমহলা, বাইরের দিকে একটা পুরো একমহল বাড়ি, তার পাশ দিয়ে এই চলন—সেই অনুপাতে দীর্ঘ, চলন পেরিয়ে গেলে সামান্য একটু উঠোন, দু'একটা ফুলের গাছও আছে বোধ হয়, সামনেটা কিন্তু বাঁধানো—একটি ছোট তুলসী ও গোবর্ধন মঞ্চ,—তার ওদিকে মন্দির ও সম্ভবত একটা স্বতন্ত্র মহল—পাকের ঘর, ভাঁড়ার ঘর নিয়ে। সেটা অনুমান, এখান থেকে মন্দিরটিই মাত্র নজরে পড়ছে—আর একরত্তি উঠোন ও তুলসীমঞ্চটুকু। দু'একটা সবুজ পাতায় গাছপালার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও যে আর কিছু আছে তা বুঝতে পারি নি, আর কিছু যে থাকতে পারে বা থাকা উচিত তাও অত ভেবে দেখি নি—তাই নির্ভয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, একমনে, বিগ্রহ লক্ষ্য ক'রেই।...বেশ খানিকটা গেছি, অন্ধকার চলনের একেবারে শেষ-প্রান্তে গিয়ে পড়েছি—সামনেই দিবসের শেষ-স্মৃতিমণ্ডিত আলো ও মুক্তি—এমন সময় পরিষ্কার বাংলায় কে বলে উঠল, 'কে র‍্যা? বলি কে আসছ গো, রোসো রোসো, ওমা আমি যে অঃসাবস্ত। শোভারাম বুঝি বিল্লীটা ঘুরিয়ে দিয়ে যায় নি। কৈ, দোর খোলার সাড়া পাই নি তো!'

থেমে যাওয়াই উচিত ছিল—কারণ নারীকণ্ঠ যে তাতে কোন ভুল নেই—অতি মধুর নারীকণ্ঠ—কিন্তু আমার আর তখন থামবার উপায় ছিল না। একটা ঝোঁকের মাথায় এত জোরে এগিয়ে এসেছি যে তখন পায়ের একটা নিজস্ব বেগ তৈরী হয়ে গেছে—সে তখন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।...তাই চেষ্টা করতে করতেও চলন ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়লুম আর সঙ্গে সঙ্গে এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ল। ওদিক থেকে দেখতে পাই নি—উঠোনের এই খাঁজে, বারবাড়ির সামনেই কুয়া, বাঁধানো বেশ বড় একটা কুয়াতলা, আর সেইখানে—বোধ করি গা-ধোবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে একটি প্রবীণা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে একখানা পুরনো রংচটা জ্যালজেলে খাটো গামছা, বুকে হ্রস্বতর এবং বিবর্ণতর আর একখানি, হাতে একটি ঘটি। গামছা দুটিতে আর যাই হোক আব্রু

রক্ষা হয় নি কিছুমাত্র, দেহটা যে আবৃত হয়েছে এমন বলা চলে না কিছুতেই। কিন্তু অপরূপ দৃশ্য বলতে আমি এ লজ্জাকর অবস্থা বোঝাতে চাই নি—অপরূপ ঐ মহিলাই। ও বয়সে তো আমি অমন কাউকে দেখি নি বটেই—পরবর্তী কালেও না। বয়স হয়েছে, মাথার চুল ধপধপ করছে সাদা, দাঁতও বেশির ভাগ নেই—মুখের চামড়াও কুঁচকে এসেছে সেই অনুপাতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বয়স বা জরাকে দেহের ঐটুকু অংশ দখল ক'রেই থেমে থাকতে হয়েছে, গলার নিচে নামতে পারে নি এখনও পর্যন্ত। বাকী যে দেহটা—সে যেন এখনও কোন অষ্টাদশী তরুণীর—গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মর্মর নারীমূর্তি—তেমনিই নিখুঁত, তেমনিই সুগোর। পরবর্তীকালে 'ভিনাস অফ মিলো'র ছবি দেখেছি, কিন্তু তারও গঠন বোধ হয় এতটা ত্রুটিহীন সুন্দর নয়।...

কিছুক্ষণ পূর্বের মানসিক আবেগ, দৈহিক শ্রান্তি, উপবাসজনিত অবসন্নতা আর এখানকার এই সীমাহীন লজ্জা ও অপরাধবোধ এবং অপরিসীম বিস্ময়—সবটা জড়িয়ে কেমন যেন বিহ্বল ক'রে ফেলল, না পারলুম এগোতে, না পারলুম পেছোতে—আর না পারলুম সময়োপযোগী কোন ক্ষমা প্রার্থনা করতে। জড়ভরতের মতো, জন্তুর মতো অবাক হয়ে ওঁর দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম।

চোখের নিমেষে আমার অবস্থাটা বুঝে নিলেন তিনি। বললেন, 'দর্শন করতে এসেছ তো? তা যাও না, এগিয়ে যাও না। ভগবানের মন্দির, দোর খোলা ছিল—ঢুকে পড়েছ, তাতে আর দোষ কি? আর এ তো দর্শনের সময়, দোর খুলে রাখাই তো উচিত এখন। আমার যে পোড়া পেটটা আবার—। অসময়ে তাই গা-ধুতে নামা। নইলে ওপরেই আমি নাওয়া-ধোওয়া সারি, এখানের মতো তো নয়, আমরা কলকেতার মানুষ—আমাদের কলঘর একটা চাই, কল থাকুক আর না থাকুক! তা সে একদফা কাপড় কাচা গা-ধোওয়া তো চুকে গেছে—এখন আর জল কোথায় পাবো? তোলা জল, সকাল বিকেল ওপরে পৌঁছে দেয় এই ঢের, আর কি বলা যায়? তাই বলি কুয়াতলাতেই যাই, কেউ তো আসে না বড় একটা। তা এখানে এসে উবি মুখপুড়ীকে ডাকছি যদি এক ডোল জল তুলে গায়ে ঢেলে দেয়—তা দ্যাখো না, পোড়ার মেয়ে যে কোথায় গিয়ে বসে আছে—! ...এতক্ষণে কাজ সেরে আমি ওপরে চলে যেতে পারতুম।'

এতক্ষণে একটু সামলে নিতে পেরেছি। বাঙালীর মুখ দেখে বাঙলা কথা শুনে নিজেও যেন কথা খুঁজে পেয়েছি। বললুম, 'মাপ করবেন, আমি অতটা বুঝতে পারি নি--একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে আসাই বোধ হয় উচিত ছিল, এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াটা অন্যায় হয়ে গেছে—'

কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলেন না ভদ্রমহিলা, বলে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে, মন্দিরে ঢুকেছ তাতে আর তোমার দোষ কি! তা ছাড়া তুমি আমার ছেলে কেন—বোধ হচ্ছে নাতিরই বয়িসী—লজ্জাই বা কিসের এত!...কিন্তু রোসো দিকি বাপু, তোমার গলাটা অমন শোনাচ্ছে কেন—?'

বলতে বলতে এবং ওপরের দেহের আবরণ হিসেবে সেই সামান্য গামছাটুকুকে সামলাবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে তিনি আরও দু'পা সামনে এগিয়ে এলেন—কুয়োতলার বাঁধানো বেড়াটুকুর ধারে একেবারে। সেই সময় অকস্মাৎ কী এক কারণে, সম্ভবত সূর্য আকাশের সর্ব পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছনোর ফলে সামনের উঁচু সাদা দেওয়ালটা আলোকিত ক'রে থাকবে কিম্বা কোন সাদা মেঘের টুকরো রঙীন হয়ে উঠে কনে-দেখানো আলোর সৃষ্টি ক'রে থাকবে—আমার মুখের ওপর উজ্জ্বল লাল একটা আলোর আভা এসে পড়েছিল : তিনি ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে প্রাণপণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'ওমা, তোমার চোখে যে জল! তাই গলাটা অমন ধরা ধরা—আমি বলি এ তো ঠাণ্ডা লাগার সময় নয়—গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন! মুখও তো শুকনো দেখছি, খাওয়া

হয় নি বুঝি সারাদিন?...ব্যাপারটা কি বলো দিকি!'

তারপরই আপাদমস্তক আমাকে আর একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'পোড়াকপাল, পা দুটোও যে কাঁপছে ঠক ঠক ক'রে। সারাদিন না খেয়ে ঘুরছ বুঝি টো টো ক'রে!... মরেছে, যা ভেবেছি তাই—বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন মন্দানি ক'রে, তারপর এখন হাতের পয়সাকড়ি ফক্কিকার হয়ে আতান্তরে পড়েছেন—"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!"...বুদ্ধি সব দ্যাখো না বাবুদের! এর নাম লেখাপড়া শিখেছেন সব। ছাই লেখাপড়া হচ্ছে, গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে। এর চেয়ে আমরা যে বলতে গেলে ক-অক্ষর গোমাংস—আমাদের ঘটে এর চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি আছে।...নাও, নাও, যাও এগিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরে বসো গে, আমি এই একটা ডোল জল ঢেলে গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে আসছি—'

চোখের জল মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলারই কথা, অন্ধকার চলন দিয়ে আসতে আসতে কোঁচার খুঁটে মুছেও ফেলেছি বারকতক—উনি যা দেখেছেন তা জল নয়, ভিজে চোখের পাতা—কিন্তু এবার আসল জলই বেরিয়ে এল আবার, সামান্য একটু প্রশ্রয় আর স্নেহের স্পর্শে। বরং দ্বিগুণ বেগে বেরোতে লাগল। কোনোমতেই সামলাতে পারলুম না। সেই লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলুম, তা নিজের কানেই খাপছাড়া শোনাল, 'দিদি —আমি বড্ড—মানে আজকের রাতটা শুধু যদি—'

উনি এক ধমকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'থামো, থামো! তোমাকে আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি। যাও—যা বলছি, গিয়ে ওখানে বসো গে। তোমার ঐ আবস্তা, নইলে তোমাকেই বলতুম দু' ডোল জল তুলে দিতে।...না, না, ও তুমি পারবে না, এ তোমাদের দেশের পাত্‌কো নয়—এ হ'ল গে ইঁদেরা—দেড়শ, দুশ' হাত নিচে জল, আর এই ভারী লোহার ডোল—এ দিয়ে জল তোলা তোমাদের কলকেতার বাবুদের কম্ম নয়। দেখি, আসবেই এখন—নইলে শোভারাম পূজুরী ছেলে আছে—সে এসে পড়বে, এই পাড়াতেই আর এক জায়গায় কাজ করে, আমার সইয়ের এক কুঞ্জ আছে সেইখানে। চোপর রাত কি আর দাঁড়িয়ে থাকব! বলি অ ঊষা, ঊষি!...নিঘ্‌ঘাৎ মরেছে হারামজাদী, কোন যমালয়ে গিয়ে বসে আছে। বলি এলি—না কি আগে চোদ্দপুরুষকে নরকে পাঠাতে হবে তবে আসবি—!'

'না গো না—এসে গেছি। চোদ্দপুরুষ এখন থাক। আমাকে যমালয়ে পাঠিয়েছ উতেই হবে।' বলে হাসতে হাসতে ঠাকুরঘরের পাশ থেকে আপাত অদৃশ্য কোন দ্বারপথে বেরিয়ে এল ছিপছিপে অল্পবয়সের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে—কপালে সূক্ষ্ম উল্‌কি, নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠী—কথায় স্পষ্ট মেদিনীপুরের টান—সম্ভবত দাসী শ্রেণীরই কেউ হবে। হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে গেল, 'ওমা—এ আবার কে! কে গা—অমন জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন? দর্শন করতে এসেছ, না মার কাছে কোন দরকার আছে?'

'তোর অত নিকেশে দরকার কি বাপু! ও আমার এক ভাই, এসেছে কলকাতা থেকে। যাও ভাই, লক্ষ্মীটি এখন ঐ ঠাকুরঘরের রকে একটু বসো গে, ঐ ওকেই আমরা নাট-মন্দির বলি—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি—! দে দিকি ঊষি, চট্ ক'রে দু' ডোল জল ঢেলে—শুদ্ধু হয়ে ওপরে উঠে যাই। সন্ধ্যের কাজ জপতপ সব বাকী, কখন কী হবে তা জানি না! ...শোভারাম এলে বলবি ওর জন্যেও খান ছ-সাত টেক্‌রা* বানাতে, রাত্তিরে ও খাবে। আর এখন পেসাদী পেঁড়া আর ক্ষীরসা† যদি থাকে তো বার ক'রে দে। নে, হাত চালা—সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস নি।'

---

* পরোটা। † ক্ষীরসা—ঘন ক্ষীর খুরিতে ঢালা।

॥ ২ ॥

অর্থাৎ আশ্রয় একটা মিলল। মাথার ওপরে আচ্ছাদন এবং ক্ষুধার অন্ন দুটো সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল এক কথায়। একেবারে অপরিচিত পথের মানুষকে কেউ এমনভাবে যেচে আশ্রয় দেয়—তা কখনও কোন গল্প-উপন্যাসেও পড়ি নি। অপর কেউ বললে বিশ্বাস করতুম না। আমারই যেন বিশ্বাস হ'তে চাইছিল না। মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি হয়ত। এক-একবার কেমন যেন ভয়-ভয়ও করছিল। আশ্রয় বলতে যা সাধারণত বোঝায়—এ তো তাও নয়। দয়ার দান নয়, মাধুকরী তো নয়ই—রীতিমতো আতিথেয়তা। নিজের গায়ে জল ঢালা হ'তেই উষাকে হুকুম করলেন, 'ওকে অমনি ঐ বালতি দুটো ভরে দে, চান ক'রে নিক। সারাদিন নাওয়া-খাওয়া হয় নি—এই গরমে সেদ্ধ হয়েছে 'পর দিন।... কাপড় আছে সঙ্গে, না দোব? দ্যাখো—ধুতি আছে এখানে, আমাদের কিরণবাবুর ফাইন ফাইন ধুতি, সিমলে ফরাসডাঙ্গা ছাড়া পরেন না বাবু—দোব, না আছে?'

কোনমতে ঘাড় নেড়ে জানালুম, বাড়তি ধুতি একটা সঙ্গেই আছে।

'তা এক কাজ করো তা হ'লে, ঐ সিঁড়ির নিচেটায় কলঘর মতো জায়গা আছে খানিকটা, ওখানে আনলাও আছে দেখবে দ্যালের গায়ে মারা, জামাটামা ছেড়ে দিব্যি ক'রে চান ক'রে নাও। পাশেই স্যেৎখানা, যেতে চাও তো চলে যাও অমনি। উষা, চান হ'লে ওকে একটু পেসাদ দে খেতে। আমি চট্‌ ক'রে ওপর থেকে আসছি।...আমার ভাই আজকে বড্ড দেরি হয়ে গেল—সন্ধ্যের পেছনে ছ্যাঁকা না লাগতে লাগতে পুজুরী আরতির তাড়া দেবে—চোখেকানে দেখতে দেবে না। ...না দিলেই বা চলে কি ক'রে, ওকেই যে আবার গিয়ে ভোগের খাবার রাঁধতে বসতে হবে। তা মরুক গে, জপ না হয় রাত বারোটা অবধি বসে বসে সারতে পারব—আহ্নিকটা তো চাই। জয় রাধে, হৃদয়েশ্বরী!'

অতঃপর স্নান জলযোগ যথানিয়মে চলল, কোন ত্রুটিই ঘটল না। উষা মেয়েটি বেশ হাসিখুশী, কথায় কথায় চোখ-টিপে কথা বলার অভ্যাস, মনিবের নিন্দে করার সময় তো বিশেষ ক'রে চোখ-টেপা চাই-ই। অবশ্য গুরুতর কোন নিন্দে করল না, যা করল তাকে নিন্দে না বলে নিন্দের ইশারা বলা যেতে পারে।

রাস্তার দিকের যে নতুন মহলটার পাশ দিয়ে এলুম, সেইটেরই ওপরতলায় দিদি থাকেন দেখলুম। গা-ধুয়ে সেইখানেই উঠে গেলেন। খানিক পরে যখন নামলেন তখন কিন্তু সে আগের মানুষটাকে আর চেনা যায় না। পরনে চমৎকার মিহি সিমলের থানধুতি, কুঁচনো চুনোট্‌ করা, ভেতরে সেমিজের মতোই একটা কি দেখলুম যেন, ভুরভুর করছে আতরের গন্ধ—একটি বেলদার সাদা ওড়না আর শৌখীন একটি জপের থলি হাতে ক'রে নেমে এলেন। তখন অবশ্য আর কথাবার্তা কিছু হ'ল না, কারণ ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শোভারাম পুজারী এর মধ্যেই বার দুই আরতির জন্যে তাড়া লাগিয়েছে। শোভা-রামেরও অল্প বয়স, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশী হবে না, ছিপছিপে অথচ সুন্দর গঠন, গৌরবর্ণ, মুখশ্রী চমৎকার—সবচেয়ে যেটা লক্ষ্য করার মতো—সেটা তার হাসি। সর্বদাই যেন একটা কৌতুক বোধ করছে—তারই হাসি চোখেমুখে লেগে আছে সর্বদা। বুদ্ধিমানও খুব নিশ্চয়, চোখের দিকে চাইলেই মনে হয় তোমার মনের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

দিদি এসেই আরতির বাজনার একটা ঘড়ি তুলে নিলেন হাতে, আমাকেও একটা নিতে বললেন। কী ক'রে তালে তালে ঘড়ি বাজাতে হয় জানতুম না, দিদিই দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'আজ রোজের ছুটি, রোজই বলে হাতে ব্যথা করছে—তা আজ জিরোক একটু। আজ আমরা ভাইবোনেই বাজাই, কী বলো দাদা!'

আরতির মধ্যে কখন আর দুটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাই নি। আরতির পরে প্রণাম—যথার্থ ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলাম সেদিন তাতে সন্দেহ নেই—সেরে উঠতেই নজরে পড়ল। একটি বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক, প্রায় এক হাত ধাক্কাসমেত কালো ফিতে-পাড় মিহি ধুতি পরনে—কুঁচনো কোঁচাটি পেটের কাছে গোঁজা (পরে জেনেছিলুম নিজেই পরিপাটী করে প্রত্যহ কোঁচান কাপড়খানা), একটা আদ্দির মেরজাই। এঁরও গলায় কণ্ঠী তবে খুব সূক্ষ্ম দানার, নাকে তিলক বা রসকলি নেই, তার বদলে কপালে ফোঁটা একটা। খুব ফরসা রং—বেশ গোলালো চেহারা, হঠাৎ দেখলে পাকা আমের কথাটা মনে আসে। মুখচোখও ভাল, সুপুরুষ বলা চলত যদি না একটু বেঁটে ধাঁচের হতেন। আরও একটা দোষ ছিল—একটা হাত আর একটা হাতেব চেয়ে একটুখানি ছোট। তবে বাঁকা কি বিকৃত কি শুকনো নয়—সহজ স্বাভাবিক হাতই—বিধাতার হিসেবের সামান্য ভুলে দুটো ঠিক মানানসই হতে পারে নি।

আর একজন যিনি এসে আরতি দেখছিলেন তিনি মহিলা। পরনে চওড়া কালোপাড় শাড়ি, হাতে একহাত চুড়ি, সাদা সিল্কের চাদর জড়ানো গায়ে—কিন্তু সিঁথিটা অস্বাভাবিক সাদা—সিঁদুর নেই তাতে। অত সাদা না হ'লে হয়ত নজরে পড়ত না। পরে, দিনের আলোয় দেখেছিলাম সামনের চুল উঠে সিঁথি চওড়া হয়ে যাওয়াতেই অত সাদা দেখাচ্ছে। যাই হোক, সাদা সিঁথির সঙ্গে হাত-ভর্তি চুড়ির যোগাযোগটা মনের মধ্যে মিলিয়ে নিতে পারি নি—ঈষৎ একটু ধাঁধায় পড়েছিলুম। এখনকার কালে আপনারা আমার বিস্মিত হবার কথায় বিস্ময়বোধ করবেন হয়ত—কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমার যা দেখা ছিল—তাতে বিধবাদের চওড়াপাড় শাড়ি পরতে দেখেছি বটে—কিন্তু তার সঙ্গে বড়জোর এক-গাছা ক'রে চুড়ি কি মাঠা বালা, কিন্তু সে খুব অল্প-বয়সী বিধবাদেরই। ইনি সে বয়স বহুদিন পার হয়ে এসেছেন, দেখে অন্তত মনে হয় চল্লিশের কম হবে না। এ-বয়সে মা-বাপ বেঁচে থাকলে মেয়েরা অনেকে নরুণপাড় ধুতি পরে—তার বেশী নয়।

অবশ্য আমি বলতে বসেছি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা, এখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, পৃথিবী বহুদূর এগিয়ে এসেছে গত ক'বছরে। বিধবা কেন গহনা পরবে না—এ প্রশ্নের জবাব চাইছে লোকে এবং ভাল মতো জবাব পাচ্ছে না। ভারতের অন্য কোন প্রান্তে নিরাভরণ বৈধব্যের বিধান নেই—সেদিনও ছিল না। তবু আমরা যে সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়েছিলুম তাতে বিস্ময়বোধ করাই স্বাভাবিক।

আরতির পর প্রণাম সেরে উঠে দিদি পরিপাটী ক'রে চাদরটি জড়িয়ে নিলেন, তা থেকে হাতটি বার ক'রে বেশ সুন্দরভাবে জপের থলিটি ধরলেন। বললেন, 'তুমি ভাই এখন একটু গড়িয়ে নাও, সারাদিনে ধকল তো কম যায় নি—আমরা একটু পরিক্রমা সেরে আসি। কিরণবাবু রইল—' বলতে বলতেই কেমন যেন থতিয়ে থেমে গেলেন দিদি, বোধ হয় মনে হ'ল কিরণবাবুর পরিচয়টা কিছু দেওয়া দরকার, গলায় অস্বাভাবিক একটু জোর দিয়ে বললেন, 'কিরণবাবু হ'ল গে আমাদের ঠাকুরের এস্টেটের কামদার—ঐ যাকে ম্যানেজার বলে আর কি! অতি সজ্জন লোক, ওঁর দৌলতেই টিঁকে আছি।...কিরণবাবু রইল আর উষা রইল, যদি কিছু দরকার হয় স্বচ্ছন্দে বলো। উষা শোন্, বাবুকে আমার ঘরের পাশে ঐ ছোট্ট ঘরটাতে বিছানা ক'রে দে আগে—এখন একটু গড়াক। আমরা ফিরলে একসঙ্গে পঙ্গত করা যাবে। চ রে রোজে—আমরা ঘুরে আসি। এখনই আবার সব পূজুরী মুখপোড়ারা ভোগ লাগিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেবে। আরতির পর একটা ঘণ্টাও সময় দেয় না ঠাকুরকে নিঃশ্বাস ফেলবার!'

তাঁরা দুজনেই বাতাসে মৃগনাভির একটা মৃদু সুবাস ছড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

উষা বেশ একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল মনিবের হুকুম শুনে। সে হেঁকে বলল, 'ওপরে বিছানা করব? তোমার ঘরের পাশে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।...কানে শুনতে পাস্ না নাকি? কান দেখিয়ে আসিস কাল পানিঘাট* হাসপাতালে গিয়ে।' যেতে যেতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন দিদি।

ঊষা ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ তাঁদের গমনপথের দিকে আর খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে—শোভারামের দিকে ফিরে একবার চোখ মট্‌কে নিয়ে বলল, 'বাবা, আপনি কোথা থেকে আসছেন গা, এত খাতির? কৈ, এত দিনের মধ্যে তো ওঘরে কাউকে থাকতে দিতে দেখি নি। ওটা হ'ল গে ওনার আঁহ্নিকের ঘর—আবার ভাবনের ঘরকে ভাবনের ঘর। লোক এলে তো থাকে এই নিচের ঘরে—কিম্বা আমাদের এই অন্দর মহলে—বড়জোর ভাঁড়ারের ওপরের ভাল ঘরখানায়।...আপনি কে হন গা মা'র?'

ওর রকমসকম দেখে ভারী হাসি পেল। আর একটু হেঁয়ালিতে ফেলবার লোভ সামলাতে পারলুম না। আমিও চোখ টিপে হেসে বললুম, 'কে কার কী হয় কে বলতে পারে বলো! পৃথিবীতে কে কার! পরও আপন হয় অনেক সময়ে—আবার আপনও পরের চেয়ে পর হয়ে যায়।'

'ভাল। দিব্যি বুঝতে পারলুম। এখনও এখানকার পেসাদ পেটে পড়ে নি, তাতেই এই বুলি! বলিহারি!'

এই বলে মুচকি হেসে সারা গমনভঙ্গীতে একটা তরঙ্গ তুলে চলে গেল ঊষা, বোধ করি আমারই বিছানা করতে।

বাইরের মহল এমন কিছু নয়—নিচে ওপরে একখানা করে ঘর, ঘরগুলো অবশ্য বড় আকারেরই—এছাড়া, নিচে যেটা চলন, সেইটেরই ওপরে খানিকটা নিয়ে ওপরে আর একটা ফালি মতো ঘর আছে, সেইখানেই আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। বড়ই সংকীর্ণ জায়গা,—চওড়ায় আড়াই হাতের বেশী হবে না কিছুতেই—তবে আমার একার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ঐ মাপের বিছানা বা তোশকও তৈরী করা আছে—দেখলুম ওর মধ্যেই পাশে বিঘৎখানেক জায়গা খালি রেখে সেটা পাতা হয়েছে, বেশ ফরসা চাদর, বালিশের ওয়াড়ও ফরসা—গত রাতের ব্রজবাসীদের বিছানার সঙ্গে তুলনা করলে এ রাজশয্যা। সারাদিনের শ্রান্তিতে পা অবশ হয়ে এসেছিল, তার ওপর এই লোভনীয় বিছানা, সুতরাং 'যান গে বাবু আপনকার বিছানা হয়ে গেছে' ঊষা খবরটা ঘোষণা করতে দ্বিরুক্তি করলুম না—টান হয়ে শুয়ে পড়লুম।

দুটো ঘরের মাঝে একটা দরজা ছিল, শুয়ে শুয়েই পাশের বড় ঘরটা দেখা গেল। ও ঘরের মেঝেতে বোধহয় আগে থাকতেই বিছানা পাতা ছিল। বোধহয় পাতাই থাকে—দুদিকে দুটি, মেঝেতে হ'লেও বেশ পুরুসুরু বিছানা, একটাতে গদি আছে বলেই মনে হ'ল। দুটো বিছানা দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষে, মাঝে অনেকখানি জায়গা, বারান্দায় যাতায়াতের জন্যে তো বটেই—সে অনুপাতেও অনেকটা বেশী ব্যবধান। বোধহয় এখানে বসেই রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হয়—কে জানে।

দুটি বিছানার একটিতে ইতিমধ্যে কিরণবাবু বিবিধ আকারের খাতাপত্র নিয়ে বসে গেছেন, বোধ হ'ল এইটেই ওঁর হিসেবপত্র করার সময়। একটা কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে, তাতেই নাকে চশমা এঁটে হেঁট হয়ে কী সব লিখছেন খাতায়। কিরণবাবু কিন্তু এতাবৎ আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেন নি, যতদূর মনে পড়ছে কারুর সঙ্গেই কথা কইতে দেখি নি ওঁকে এখনও পর্যন্ত—এখনও কিছু বললেন না, নামধাম পরিচয় কিছুই জানতে চাইলেন না। এমন কি একেবারে অপরিচিত এক ছোকরাকে ডেকে পাশের ঘরে ঠাঁই দেওয়া হ'ল, তাতেও কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না কি প্রতিবাদ করলেন না—!

* রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আগে যেখানে ছিল।

আমার কেমন যেন অবাক মনে হ'তে লাগল, এ আবার কেমনধারা মানুষ!

আমারও অবশ্য কথা বলার গরজ ছিল না। সারাদিনের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা ও অপরিসীম শ্রান্তির পর মাথায় ঠাণ্ডা জল এবং পেটে খাবার পড়েছে—দুই চোখের পাতা যেন কে টানছে ভেতর থেকে। শুয়ে পড়ার পর বেশীক্ষণ আর হুঁশ রইল না—অচৈতন্যের মতো ঘুমিয়ে পড়লুম।...

দিদিরা ফিরলেন রাত সাড়ে দশটারও পর—কলকল করতে করতে। ধড়মড়িয়ে জেগে বসে পাশের ঘরে ঘড়ি দেখলুম তাই, নইলে মনে হ'ত আট দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। কিরণ-বাবু দেখলুম তখনও জেগে বসে খাতাপত্র ঘাঁটছেন। কেন এত রাত হ'ল, কোথায় গিছলেন ওঁরা—তাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

মাঝের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দিদি বেশ পরিবর্তন ক'রে একখানি আটহাতী খাটো ধুতি পরলেন, তারপর মুখহাত ধুয়ে এসে আবার দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ডাকলেন, 'এসো ভাই এসো, এবার এ ঘরে এসো—বড্ড তকলীফ হ'ল তোমার, এত রাত হয়ে গেল এখনও খাওয়া হ'ল না, সারাদিন পেটে কিছু নেই! কী করব, ঘুরতে ঘুরতে রাধাবল্লভের বাড়ি চলে গিয়েই যত হ্যাঙ্গাম হ'ল। ঠাকুরটি কি সহজে দেখা দেন—ঠিকই বলে ব্রজবাসীরা—রাধাবল্লভ দর্শন-দুর্লভ।...ওগো কিরণবাবু, আর দেরি নয়—চটপট শোভারামকে বলো খাবারটা ধরে দিয়ে যাক—আর দেরি করলে শোভারামরাই গাল দেবে!'

তারপর পা ছড়িয়ে বসে নিজের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এ বেলার পঙ্গতটা ভাই এই ওপরেই সারি। আর একশবার ওপর-নিচে করতে পারি নে। ভারী তো খাওয়া—তার জন্যে অত মেহনতানা পোষায় না—কী বলো!'

ঊষা এসে ঘর মুছে গেলাসে গেলাসে জল গড়িয়ে দিলে, শোভারাম মুখখানা হাঁড়ি ক'রে এসে ঠক্ ক'রে খাবারের বাসনগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পরে বুঝেছিলুম তার উষ্মার হেতু। সে ঠিক রাত চারটেয় ওঠে, সাড়ে চারটেয় স্নান সারা হয়ে যায়—তার এত রাত করলে চলে না।

ওপরে খেতে আমরা চারজন। রোজেও এসে বসেছে দেখলুম, তারও বেশ পরিবর্তন হয়েছে, বোধহয় সে-ই এর নিচের ঘরখানায় থাকে, নিচে থেকেই এল—গুনচটের মতো একখানা মিলের শাড়ি পরে।

আহার্যের ঢাকা খুলতে দেখা গেল রকমারী ব্যবস্থা। বারোখানি ক'রে পুরি বা লুচি হয় প্রত্যহ, এইটেই ঠাকুরের ভোগ, বাকী সকলের জন্যে পরোটা বা টেক্‌রা! টেক্‌রা না বলে ঠিকরে বললেই ঠিক বলা হয় তাকে, পুরু পুরু—একসের আটায় ষোলখানা হিসেবে তৈরী—ঘিয়ের ছিটেফোঁটা আছে কিনা সন্দেহ। এতগুলি প্রাণীর পুরি ভাজা সম্ভব নয়, অথচ যা হবে ঠাকুরকে দেখাতে হবে একবার, সুতরাং রুটিও দেওয়া যায় না—রুটি সক্‌ড়া। রুটি বা ভাত বা দুইই—দুপুরে ভোগ নিবেদন করা হয় একবার। রাত্রে চলে না আর, তাই শুধু নিয়মরক্ষার মতো বারোখানি পুরি করা হয়, বাদ-বাকী এই বস্তু। তার সঙ্গে একটা তরকারী। ঠাকুরের জন্যে এক ক্ষুরি ক্ষীরসা, একটু রাবড়ি ও খান-দুই প্যাঁড়া। এ ছাড়া এল সেরখানেক দুধ, আলাদা একটা বাটিতে খানিকটা সর ও মিছরির গুঁড়ো। এই দুধ থেকেই সারাদিনে তোলা।

দিদিই খাবার ভাগ করলেন। পুরি কখানি নিজে নিলেন, আর রাবড়িটুকু। কিরণ-বাবুর ভাগে পড়ল খান-চারেক টেক্‌রা ও সেই ক্ষীরসা। পেঁড়া দুটোও ওঁরা খান বোধ হয় অন্যদিন—আজ আমাদের দুজনকে দিলেন। দুধও আমরা একটু একটু পেলুম—যদিচ দিদি বোধহয় আধসের নিজের দিকে রাখলেন। সবাইকে দিয়ে খানিকটা সরের সঙ্গে পুরির কুঁচি চটকে বারান্দায় পাখীকে দিয়ে এলেন। পোষা চন্দনা—ও নাকি লুচি-সর ছাড়া খায় না।

'ষাট বছর বয়স ওর, দেখছ কি! ও কি আজকের পাখী। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী ও।' বললেন দিদি।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঊষা বাসন নিয়ে চলে গেল। রোজেকেও দিদি জোর ক'রে শুতে পাঠিয়ে দিলেন নিচে। আমাকে বললেন, 'আমার এখন বিস্তর জপ বাকী, আমি বারান্দায় বসে জপ করব। তুমি ঘুমোবে এখন—না বসবে একটু আমার কাছে?'

বুঝলুম দিদি এবার আমার বিবরণ কিছু জানতে চান। আমারও জানানো প্রয়োজন। কারণ আশ্রয়টা শুধু বড় কথা নয়—আখেরের কী ব্যবস্থা হ'তে পারে সেটা না জানা অবধি সুস্থির হতে পারছি না। তাছাড়া পুরো দুটি ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছি—এখন আর সহজে ঘুম আসবেও না। আমি একটু জোর দিয়েই বললুম, 'আমি আপনার কাছেই বসব।'

দেখলুম দিদি খুশী হলেন। স্বল্প পরিসর বারান্দা, রাস্তার দিকে পাশ ফিরে সামনা-সামনি আসন পেতে বসলুম দুজনে। দিদি পা ছড়িয়ে বসলেন। 'আমার আবার পোড়া বাতের পা, মুড়ে বসতে পারি না, তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, লক্ষ্মীটি!'

মিনিট-কতক অবশ্য নিঃশব্দেই জপ করলেন বসে, তারপর একটা-দুটো প্রশ্ন করতে লাগলেন, অতি কৌশলে—আমি যাতে সেটাকে জেরা বলে ভাবতে না পারি। আমার উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে জপও চলতে লাগল। সেটা বুঝতে পারলুম তাঁর ঠোঁট নাড়ায় আর হাত নাড়ায়। কোথায় বাড়ি, কে কে আছেন, দাদা কি করেন, ক'ভাই আমরা, বাবা ক'দিন মারা গেছেন শুনে মুখে চু-চু আওয়াজ ক'রে দুঃখ প্রকাশ করলেন, বললেন, 'আহা বাছা রে, জীবনের সাধ-আহ্লাদ তো ঐখানেই ঘুচে গেছে তোর!'—তারপর আমি কি পড়ি, কেন পালালুম, মায় দিল্লীতে গিয়ে কি হাল হয়েছিল, এখানে পাণ্ডার বাড়ি থেকেই বা কেন চলে আসতে হল, ইত্যাদি।

দিদিও ধৈর্য ধারণ ক'রে বসে শুনলেন সব। মধ্যে মধ্যে উনি ঢুলছেন সন্দেহ করে বলতে বলতে থেমে গেছি—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছেন, 'উঁহু, উঁহু, ভাবছিস ঘুমোচ্ছি? তা নয়, ও আমার আপিংয়ের ঝিমুনি। ঘুম নয়। সব শুনছি আমি, বলিস তো গড়াগড়-গড় বলে যাব। আপিং খাই যে। অত দুধ খেলুম দেখলি না। আপিংয়ের সঙ্গে দুধ মিষ্টি বেশী ক'রে না খেলে শরীর কষে যায়। ঘুম অত সহজে আসে না আমার—ও শুধু ঝিমুনি।'

আমার বক্তব্য শেষ হ'তে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন বারকতক। বললেন, 'ভালো করোনি ভাই, ছিঃ! আজকাল একটা পাস অন্তত না করলে পিওনের চাকরি অবধি মেলে না। তোমার মাথার ওপর বাপ নেই, অবীরে বিধবার সন্তান—তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া উচিত কী করে মানুষ হয়ে উঠবে এই শুধু—আর কিছু না। এই তো তোমার দাদার কথা বললে, কী কষ্ট করেছেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে, ঐ তো ঠিক, ঐ তো মানুষের কাজ।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'পোড়া কপাল সব! এখানেই কি কম লোক আসে, ছেলের পাল একধার থেকে—অমনি ঘুরতে ঘুরতে! শহর বাজারে তো ঢের বেশীই আসবে। আমি বলি মরণ, এখানে এসেছ চাকরির খোঁজে—পয়সা কামাবে বলে? এখানের টিকটিকি মাকড়শা পর্যন্ত পয়সা চাইছে অবিরত—আকবর বাদশা যে জন্যে নাম রেখে-ছিলেন ফকিরাবাদ, ভিখিরীর দেশ—এখানে এসেছ পয়সা রোজগার করতে! খসে পড়ো, খসে পড়ো!'

তারপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মালা জপবার পর বললেন, 'তোর দাদার নাম-ঠিকানা দিস, কালই আমি কিরণবাবুকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে দোব। তোর লিখতে লজ্জা করবে, তেজ ক'রে চলে এসেছিলি তখন, আবার পোড়ার মুখ পুড়িয়ে শেষে গাড়িভাড়া ভিক্ষে ক'রে

ফিরে যাওয়া সে তুই পারবি না। আমরাই লিখব. টাকা এলে কিন্তু বাড়িই চলে যাস ভালছেলের মতো। দেখলি তো দুনিয়ার হালচাল. গিয়ে আবার ইস্কুলে যাস, এখনও তো বেশীদিন হয়নি—কটা মাস, গিয়ে চেপে পড়ে পাশটা দিয়ে নে!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলেন. 'কিরণবাবুকে দিয়ে লেখাবার কথা বললুম বলে ভাবিস নি যেন আমি নিজে এককলমও লিখতে জানি না। আমি ইংরিজী পজ্জন্ত লিখতে পারি অল্প অল্প, বাংলা তো গড়গড় ক'রে লিখে যাবো। তবে অনব্যেস তো, হরপ সব আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। কিরণবাবুর নিত্যি লেখা অব্যেস. জমিদারের ছেলে—হিসেব লিখে লিখে লেখা পাকা হয়ে গেছে।'

আরও খানিকটা চুপ করার পর হেসে বললেন. 'তোকে দেখে হাঁকিয়ে না দিয়ে এমন জামাই-আদরে রাখলুম কেন বল্ দিকি?...এমন তো কত আসে. দূর দূর ক'রে ভাগিয়ে দিই, বলি এটা আমার দানছত্তর নয়, এখানে কিছু সুবিধে হবে না। যাঃ—যে শাউখুড়ি ক'রে পালিয়েছিলি ঘর থেকে. সেই বাহাদুরী নিগে যা যেখানে পারিস—তোকে তা বললুম না কেন জানিস?'

নিজেই জবাব দিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ; রাস্তার তেলের আলোটা সামনেই, তার আভাটা মুখে এসে পড়েছিল. দেখলুম চোখটা ছলছল ক'রে উঠল বলতে গিয়ে ; বললেন, 'আমার একটা ছোট ভাই ছিল—ছিল কেন, বালাই ষাট, আজও আছে—তোকে অনেকটা তার মতো দেখতে। তোর মতনই বাড়নশা ঢ্যাঙা গড়ন. ষোল-সতেরো বছর বয়সে ঠিক এইরকম দেখতে ছিল। তুই যখন আচম্কা এসে দাঁড়ালি—হঠাৎ মনে হ'ল সে-ই ফিরে এল আবার. সেই বয়সে। কেমন মায়া হ'ল—মনে হ'ল কোথায় না কোথায় ঘোরে, তারও হয়ত এমনি দুর্দশা হয়। তাই আর তোকে "না" বলতে পারলুম না। তুইও আবার তেমনি—মা মাসী না বলে দিদি বলে ফেললি ফট ক'রে—!'

চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। মনে হ'ল চোখের জলটাই সামলাবার চেষ্টা করছেন। আস্তে আস্তে বললুম. 'তিনি এখন কোথায়?'

'কে জানে! হতভাগা হয়ে গিয়েছে একেবারে। লেখা-পড়া করলে না—নেশাভাঙ্ ক'রে বেড়াল চিরটাকাল। কম পয়সা উড়িয়েছে আমার! শেষ খবর পেয়েছি কোন্ এক সার্কাসের দল নিয়ে ঘুরছে। আমাদের কিরণবাবুর ভায়রাভাই. সরকারী কাজে সে-ও ঘোরে নানা দেশবিদেশে—খুব বড় চাকরি করে সরকারের—তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে-ই সিঙ্গাপুরে না কোথায় যেন। সেও তো কতকালের কথা হ'ল। হতভাগা, হতভাগা! বিয়ে দিলুম এককাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে, সুন্দরী বৌ—তা তার দিকে একবার তাকাল না পজ্জন্ত।'

এরপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা কইলেন না. নিঃশব্দে বসে জপ করতে লাগলেন। মনে হ'ল প্রবাসী হতভাগা ভাইটার কথা ভাবছেন বসে বসে। আমিও চুপ ক'রে বসে রইলুম। অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন। লজ্জা যা তা তো আছেই. পরাজয়ের লজ্জা—তবু অসহায় অবস্থাটা গেছে এইজন্যেই নিশ্চিন্ত। নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী ক'রে নেওয়ার পথটা আর যাই হোক কুসুমাস্তীর্ণ নয়—তা টের পেয়েছি খুব.—হাড়ে হাড়ে। ও যারা পারে তারা পারুক। আমার কর্ম নয়। এর চেয়ে বাড়ির ভাত খেয়ে লেখাপড়া ঢের সহজ। ...ভাগ্যিস ভগবান চেহারাটা এ'র সেই ভাইয়ের মতো দিয়েছিলেন। নইলে কি হ'ত ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। হয় অর্ধেক রাত্রে পাহারাওলা থানায় ধরে নিয়ে যেত, নয়ত এমনি ক'রে ক'দিন ঘুরে ঘুরে রেলের ওপর গলা দিতে হ'ত স্টেশনে গিয়ে।...

ভারী মিষ্টি সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে. বোধহয় লালাবাবুর মন্দির থেকেই। ঠিক জানি না—মধ্যরাত্রিরই কোন রাগিণী ধরেছে বোধহয়। এরা থামলেই রঙ্গজীর মন্দির থেকে ধরবে। দু দলে এমনি পাল্লা চলে, এর আগের বারও এসে শুনে গেছি। এ পাড়াটা তিন মন্দিরের মাঝামাঝি। তাই শোনবার কোন অসুবিধাও নেই। একটা চওড়া সড়কের

একদিকে গোবিন্দজী, বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ—আর একদিকে একটু কোণাচে ভাবে শ্রীরঙ্গজী, দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শ্রীরঙ্গজীরই প্রতিনিধি। রঙ্গজীর পয়সা বেশী, বারো মাসে তেরো পার্বন, খুব ঘটা হয়। এ'র সেবাইতরা রামানুজাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই হিসেবে 'আচারী' বৈষ্ণব বলে ব্রজবাসীরা। এ'র প্রসাদ নাকি খায় না। অন্তত তখন খেত না। কিন্তু উৎসবে যোগ দেয়। দোলে বড় বড় সোনার সওয়ার বেরোয় ক'দিন ধরে। অসম্ভব ভিড় হয়, তাছাড়া রথ আছে, এই পথেই যায়—সেই জন্যেই এ রাস্তা অত চওড়া। বরাবর রঙ্গজীর বাগানবাড়ি পর্যন্ত কয়েক শ' গজ চলে গেছে।

ঐখান থেকে বেরিয়ে এলেই এই রাস্তা। পুরনো গোবিন্দ-মন্দির থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা সাক্ষী-গোপালের মন্দির বাঁয়ে রেখে গোপীনাথের দিকে চলে গেছে—সেইটে থেকেই এই পথ সোজা চলে এসেছে লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির পর্যন্ত। অবশ্য এদিকটা মন্দিরের পিছন দিক। এপথে ঢুকলে মনে হবে ঐ মন্দিরে গিয়েই পথ শেষ হয়েছে। কিন্তু তা নয়, মন্দির ডাইনে রেখে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গোপেশ্বর মহাদেব, যমুনাপুলিন, জয়পুরের মহারাজার মন্দির—ঐ দিকে। লালাবাবু অর্থাৎ পাইকপাড়া বা কান্দির সিংহ-জমিদার বাবুদের পূর্বপুরুষ একজন. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের এক বংশধর। বিরাট ধনী, একজনের একটা তুচ্ছ কথায় চরম বৈরাগ্যে সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এইখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে ঠাকুরের রাজভোগের ব্যবস্থা ক'রে ছিলেন—কিন্তু নিজে মাধুকরী ক'রে খেতেন। শোনা যায় স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে গোবর্ধনে তাঁর ঝোপড়াতে দুধ পে'ীছে দিয়ে এসেছিলেন ক'দিন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাই এখানে সব চেয়ে বিখ্যাত। এমন ভোগের ব্যবস্থাও আর নেই। এখনকার কথা জানি না, তবে তখন ছিল না এটা ঠিক। পাছে সেই উৎকৃষ্ট প্রসাদ ভক্তরা না পায় তাই লালাবাবু দিব্যি দিয়ে গিয়েছিলেন নাকি—কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাইৎ বা পূজারীরা ঐ প্রসাদ যাতে না খান। সে নিষেধাজ্ঞা নাকি মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই করা ছিল। পরবর্তীকালে সে পাথর যমুনায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, এ'দেরই বেশী পয়সা—কৃষ্ণচন্দ্র ও রঙ্গজীর। তাই এই দু' মন্দিরেই সানাইয়ের ব্যবস্থাও উচ্চাঙ্গের। গোবিন্দ-মন্দিরেও বাজত, তবে সে এত উ'চুদরের নয়—এবং এত রাত অবধি বাজত না। এই দুই সানাইওয়ালার পাল্লাই শোনবার মতো ছিল—বহু রাত অবধি জেগে শুনতুম। আজও বসে বসে কান পেতে শুনতে লাগলুম। একটু একটু ঘুমও পাচ্ছে এবার।

বহুক্ষণ পরে আবার কথা কইলেন দিদি। একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ পাড়লেন একটা, 'তুই কেন পালিয়েছিলি তা তুই বলতে পারবি না, কিন্তু আমি বলতে পারি।'

চমকে উঠলুম। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও বোধ হ'তে লাগল। কারণ হয়ত এক নয়—অনেক। কোন্‌টা উনি টের পেয়েছেন, মনের কোন গোপন অন্দিসন্ধির কথা বলবেন কে জানে। এতক্ষণ ধরে বসে আমার কথাই ভাবছিলেন নাকি?

দিদি বেশ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, 'বাড়নশা গড়ন তোর, দেখলে সতেরো বছর মনে হয় না তো, মনে হয় মিনসে একটা। তাছাড়া পাসের পড়ার পক্ষে বয়সটাও একটু বেশী, আর ও বয়িসী অন্য ছেলে থাকলেও—আজকালকার ছেলেপিলে তো দেখি সব—কেনখুড়ি কেন্‌খুড়ি—বে'টে বে'টে পাকানো চেহারা. এধারে হয়তো দ্যাখোগে যাও বয়সের গাছপাথর নেই, বাপ-মা অমন চার বছর কমিয়ে বললেও ঢের হয়ে গেছে। এদিকে অমনি কচি খোকাটি সেজে থাকেন।...আসলে তোর লজ্জা করে অতটুকুটুকু ছেলের সঙ্গে বসে বসে ইস্কুলের পড়া পড়তে। মনে হয় এই নিয়ে সবাই হাসাহাসি করছে—মায় রাস্তার লোকেরা পজ্জন্ত। তাছাড়া মেলাই নাটক নভেল পড়েছিস এই বয়সেই—যা বললি, তাতে মনটাও পেকে গেছে বয়সের তুলনায় ঢের বেশী। মনে হয় অনেক বয়েস

হয়ে গিয়েছে, এখন আর বইখাতা নিয়ে ইস্কুল যাওয়া সাজে না। এবার একটা কিছু করা দরকার বড় রকম। তাই না?

আস্তে জবাব দিলুম, 'হয়ত তাই। কে জানে, ঠিক এমন পরিষ্কার ক'রে তো ভাবি নি। এখন মনে হচ্ছে এইটেই বড় কারণ—আপনি ঠিকই ধরেছেন। ইচ্ছে ক'রেই শেষের কথাটার ওপর জোর দিলুম।

ভারী খুশী হলেন দিদি। বললেন, 'আমি জানি যে। আমার ভাইয়ের ঠিক অমনি হয়েছিল। মা বাবার তো তেমন চাড় ছিল না, তখন অত পড়াশুনোর রেওয়াজও হয় নি, যে ইংরাজী হরপ চিনল সে খুব বড় বিদ্বান। যা বলছিলুম, গোড়াতেই এলাকাঁড়ি দেওয়ায় পড়া শুরু করেছেই অনেক বেশী বয়সে। আমি যখন জোর ক'রে গোর আড্ডির ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিলুম তখন নিচের ক্লাসে কচি কচি ছেলেদের পাশে গিয়ে বসতে হ'ল—সে ওর ভারী লজ্জা। মাস্টাররাও নাকি এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করত, পড়া না পারলে ধেড়ে-মদ্দ বলে গাল দিত—কিছুতেই তাই আর ইস্কুল যেতে চাইল না দিনকতক পরে।...হরি বলো, হরি বলো, জয় রাধে, শ্রীরাধে। রাত বোধ হয় বারোটা বেজে গেছে, যাই শুয়ে পড়ি গে' এবার।'

বারোটা অনেকক্ষণই বেজে গেছে, বাজতে শুনেছি ঘড়িতে, উনিই গল্পে মশগুল হয়ে ছিলেন, অতটা কান করেন নি। তবে সে কথা আর বললুম না। আমারও ঘুম পেয়ে গেছে বেজায়। আর দ্বিরুক্তি না ক'রে এসে শুয়ে পড়লুম। দিদি ওঘর থেকে হেঁকে বলে দিলেন, 'কলঘর কি স্যেৎখানা যাবার দরকার হ'লে কিন্তু নিচে যেও ভাই, ওপরের ওটি আমার নিজস্ব, নিজে হাতে খ্যাংরা দিয়ে ধুই। ওখানে কেউ যায় না, আমি ছাড়া।'

শুয়ে শুয়েই দেখতে পেলুম জপের মালাটি কপালে ঠেকিয়ে দেওয়ালের পেরেকে তুলে রাখলেন, তারপর বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ ক'রে সশব্দে একটা হাই তুলে বললেন, 'কিগো কিরণবাবু, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি গো! ওমা, তোমার তো বেশ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে নাক ডাকছে দেখতে পাই। তবে নাকি তোমার ঘুম হয় না?'

কিরণবাবুর বিছানা থেকে আওয়াজ এল, খুব নরম—এই প্রথম ওঁর গলা শুনলুম—'কেন, কিছু বলছ?'

'বলছি, ঘুমিয়ে তো পড়লে, মালিশটা তো করা হ'ল না, হাঁটু আর কোমর তো তেমনি তক্তা হয়েই রইল।'

'তুমি শোও, আমি মালিশ করে দিচ্ছি।'

আশা করেছিলুম দিদির কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠবে একটা, ঘুম থেকে তুলে বুড়ো মানুষকে এ কী অদ্ভুত ফরমাশ ওঁর! কিন্তু দিদি হুঁ-হাঁ কিছুই করলেন না। দেওয়ালে একটা টিনের চক্চকে চাকতি দেওয়া আলো জ্বলছিল মিটমিট ক'রে, সেটাকেই একটু বাড়িয়ে কিরণবাবু মালিশের শিশি খুঁজে নিয়ে এলেন, তারপর একান্ত অনুগত আশ্রিতের মতো দিদির পায়ে ও কোমরে মালিশ করতে বসলেন। দিদি কিছুই বললেন না, কোমরের কাপড় আল্‌গা করে দিয়ে বরং তাঁর দিকে পিছন ফিরে পাশবালিশ জড়িয়ে বেশ জুৎ করে শুলেন। বোধ করি ঘুমিয়েই পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে, কারণ একবার আস্তে আস্তে যখন বললেন, 'মাঝের কপাটটা ভেজিয়ে দিলে হ'ত, মালিশের গন্ধ নাকে খারাপ লাগবে ছোঁড়ার' তখনই দেখলুম গলা জড়িয়ে এসেছে তন্দ্রায়।

কিরণবাবু সে চেষ্টা আর করলেন না, কপাট খোলাই রইল। মালিশের গন্ধটা অবশ্য আমার খুব খারাপ লাগল না, কর্পূর-কর্পূর গন্ধ একটা—কিন্তু ভালই হোক মন্দই হোক, সে আর কতক্ষণ! আমিও বোধহয় দুতিন মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম। কিরণবাবু আরও কত রাত অবধি বসে ঢুলতে ঢুলতে মালিশ করলেন কে জানে!

॥ ৩ ॥

'তা বলে যেন ভেবো না যে কিরণবাবু আমাদের আশ্রিত কি কর্মচারী কেউ, আমাদের এস্তাজারিতে থাকে—ওর নিজের অগাধ সম্পত্তি, সত্যি সত্যি জমিদার। দত্তপুকুর না গোবরডাঙ্গা ঐদিকে কোথায় জমিদারী—খুব বড় একটা কিছু নয়, তবু বছর-সালিয়ানা আট-দশ হাজার তো হয়ই, ফেলেঝেলেও। এদান্তে সম্পত্তি বাড়িয়েছে আরও—শুনেছি। ওর ঝামেলাই বা কি, একটা ছেলে—তারও বিয়ে-থা হয়ে ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। ভাল ছেলে—বেশ গুছিয়ে জমিদারী দেখাশুনো করে, নাতি-নাতনীরাও লেখাপড়া করছে, বড় ছেলের তো খুব মাথা শুনেছি, জলপানি পায় ইস্কুলেই। জাজ্বল্যমান সংসার। ওর তো ঐ জামা-কাপড়ের ঘটা দেখছ—সব ওর নিজের, একটি পয়সা নেয় না। উল্টে আমার জন্যে দিশি কাপড় নিয়ে আসে কলকেতার দিকে গেলে।...আমার ঠাকুরকে ভালবাসে—ভক্তি করে, তাই তাঁর সেবার জন্যে পড়ে থাকে।'

স্নান ক'রে এসে ঠাকুরঘরের সামনের রকে গীতা আর আহ্নিকের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে কলাইয়ের বাটিতে চা খেতে খেতে, যেন সবাইকে শুনিয়েই বললেন দিদি। এই চাও ওপর থেকে তৈরি ক'রে এনে কিরণবাবুই দিয়ে গেছেন এইমাত্র।

'দ্যাখো, চায়ের অব্যেস থাকে তো বলে ফ্যালো। আমার এখানে টাইম-বাঁধা দুটিবার চা হয়—উষাটুষা পারে না। হয় কিরণবাবু, নয় আমি—করবার মধ্যে তো এই দুটি লোক। চোদ্দবার করবে কে? খেতে চাও তো খেতে পারো। এখন একবার আর বেলা তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে একবার—বাঁধা নিয়ম।'

চা খেতুম না তখন, সে-কথা বলে দিলুম। কিন্তু আহ্নিক-পুজো সব বাকি, গীতা পাঠের ভূমিকাতেই চা—ঠিক বুঝতে পারি নি। আমাদের দিকে দেখেছি যারা খায় বুড়ো-মানুষরা, অন্তত দশবার জপ সেরে খায়। কথাটা চাপতে না পেরে বলেই ফেললুম, বললুম অবশ্য একটু মোলায়েম ক'রেই, 'আপনি তো দেখছি পুজোর আগেই চা খেয়ে নিচ্ছেন—এক-একজনের দেখছি মনটা ছট্‌ফট করে, অথচ জপ-আহ্নিকের জন্যে খেতে পারেন না—মিছিমিছি কষ্ট পান।'

'সেয়ানা ছেলে দেখেছ! ঘুরিয়ে কেমন কথাটা শুনিয়ে দিলে আমাকে। ওগো পণ্ডিত-মশাই, এ আমার গুরুর হুকুম আছে। তাছাড়া এ-দেশে এরাও বলে, পানকে নাকি দোষ নেই, যা চিবিয়ে খাবে না পান ক'রে খাবে তা খাওয়া চলে। আমার গুরুদেব বলেছেন, মহাভারতেও নাকি লেখা আছে—দুধ জল ওষুধ ফলের রস এসব খেয়েও উপবাস রাখা চলে। আর সে বলুক না বলুক—ভগবানকে ডাকব, নিশ্চিন্তি হয়ে না ডাকলে কি চলে, মনে উৎকণ্ঠা রেখে জপ-আহ্নিক করা আর ইষ্টকে ফাঁকি দেওয়া এক!'

হেসে জবাব দিলেন দিদি। বেশ একটু অপ্রতিভ বোধ করলুম ধরা পড়ে যাওয়াতে। কিন্তু সেটা সামলাবারও সময় পেলুম না, তার আগেই, কোন প্রসঙ্গ না ধরেই কিরণবাবুর কথাটা তুললেন। পা ছড়িয়ে বসে আধসেরী বাটিতে চা খাচ্ছিলেন, পা-টা অবশ্য ঠাকুরের দিকে বা সামনে ছড়ান নি, একটু তেরছা-ভাবে ঘুরে বসেছিলেন, এক হাতে বাটি—আর এক হাত পায়ে বুলোতে বুলোতে কথাগুলো বললেন। আবারও চমকে উঠলুম। কথাটা তুলি নি বটে—কিন্তু মনের মধ্যে যে সকাল থেকেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিরণবাবু এঁর কে, আর কেনই বা এত অনুগত—গত রাত্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে প্রশ্নটা মনে জাগাই স্বাভাবিক। উত্তর অবশ্য এতেও পেলুম না, বরং সমস্যাটা বেড়েই গেল। ঠাকুর তো এখানে এই একটি নয়, অন্তত তিন-চার হাজার ঠাকুর-বাড়ি আছে বৃন্দাবনে, তবে এখানেই বা ওঁর এত ঝোঁক কেন যে, কুঞ্জওয়ালীর পায়ে তেল

মালিশ করতে হবে?

তবে উত্তর না পাই, প্রসঙ্গটা তুলে আমাকে অপ্রতিভ করিয়ে দিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কেমন একটু যেন ভয়-ভয়ও করতে লাগল। মনের কথা সবক্ষেত্রেই উনি টের পান নাকি এমনিভাবে? ভাল মানুষের মতো হাসি-হাসি মুখ দেখে বোঝবার জো নেই যে, মানুষটার পেটে এত বুদ্ধি।

যতই দেখছি ততই অবাক লাগছে। কিছুই যেন বুঝতে পারছি না।

ধাঁচ-ধরণ সবটাই যেন কেমন কেমন। এধারে বাড়িতে তো অষ্টপ্রহর আটহাতি ধুতি পরে থাকেন—স্নান করার আগে তেল মাখার জন্যে আবার একটা পাঁচহাতি ধুতি আছে, অতবড় দশাসই মানুষটার তাতে গামছার থেকে বেশি লজ্জা নিবারণ হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিলাস খুব। স্নানটাই তো একটা পর্ব দেখলুম। একটি ছোট মাদুর পেতে পাঁচহাতি ধুতি পরে বসে চপচপে ক'রে তেল মাখলেন, ঊষাই ডলে ডলে মাখিয়ে দিলে প্রায় আধঘণ্টা ধরে। তারপর স্নানের ঘরে ঢুকলেন—ঝাড়া একটি ঘণ্টা কাটিয়ে এলেন সেখানে। তাও খুব বেশি সময় বলা চলে না, কারণ তার আগে সেখানে যেসব সরঞ্জাম গেল—বেসম, সর-ময়দা, সাবান, মায় একটু গন্ধ তেল—তাতে স্নান নয়—স্নানের সমারোহই সূচিত হয়। জলও এল বড় বড় বালতির চার-পাঁচ বালতি। ঊষা নিচে থেকে বয়ে এনে ভর্তি করল। অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, 'ও কি দেখছ মামাবাবু, ঐ কুলুঙ্গীতে কত আতরের শিশি দেখেছ? ওরও একটি নিয়ে চানের ঘরে ঢুকবেন। সব শেষ হলে গা মুছে একটু আতর ঘাড়ে গলায় দিয়ে তবে শুকনো কাপড় পরবেন।...বিকেলেও চাই ওটি—তবে সে কাপড় ছেড়ে পোশাকী কাপড়ে লাগানো হবে তখন। তাই কি একটা? এবেলা যেটি মাখবেন, ওবেলা আর সেটি চলবে না।'

সত্যিই দেখলুম, শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে সার সার আতরের শিশি বসানো। কাঁচের ছোট ছোট শিশিতে কাঁচেরই ছিপি দেওয়া—আতরই হবে নিশ্চয়। আটহাতি কাপড় নয় তো জ্যালজেলে গামছা পরেই যার সারাদিন কাটে, তার আবার এ কোন্‌দিশি বিলাস!

কিরণবাবুর ব্যাপারটাও যেমন ঘোলাটে—ঐ রোজে না কি, বোধহয় রজনী নাম—ও মেয়েটার ব্যাপারও তেমনি। ওকে দেখেই যেন কেমন মনে হয়—ভাল ঘরের ভাল মেয়ে-ছেলে নয়। দিদির ধাঁচধরনও কেমন কেমন, এত ভাবন, এত বিলাস, তবু ওঁর সম্বন্ধে কিছুতেই যেন তেমন খারাপ কোন ধারণা আসে না। কোথায় যেন ওঁর মধ্যে একটা নির্মল স্রোত আছে, যাতে আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কোন ময়লা জমতে পারে না ওঁর ধারেকাছে কোথাও। রোজে তা নয়। মনটাও ওর ভাল নয় নিশ্চয়, কেমন একটু যেন গুজগুজে। নিচের ঘরে থাকে, একটা ট্রাঙ্ক ও সামান্য একটু বিছানা ভরসা। আসবাব বা মাল বলতে বিশেষ কিছু নেই। কাপড়ও যা দেখলুম ক'দিন লক্ষ্য ক'রে— ভাল দেশী শাড়ি গোনা দুখানি আছে, পাল্‌টে পাল্‌টে পরে, বাকী যা গুনচট। এককালে ভাল অবস্থা ছিল কিনা কে জানে, এখন দেখলেই মনে হয় খুব দৈন্যদশা। তার সঙ্গে হাত-ভর্তি চুড়িটা একেবারেই বেমানান। নেহাৎই দিদির আশ্রিত, গলগ্রহ। ভয়ে-ভয়েই থাকে অবশ্য, কথা বলেই না বিশেষ, নিজে থেকে তো বলেই না। যদিচ দিদিকে একটি দণ্ডের জন্যেও তাচ্ছিল্য করতে দেখি নি। দুবেলা কাছে বসিয়ে খাওয়ান, এক ছটাক হোক, আধপোই হোক, দুধও দেন দুবেলা। রাত হলে বলেন, 'তুই আগে শুতে যা রোজে, রাত করিস নি। তোর শরীর ভাল নয়, দিন দিন যা শুকিয়ে যাচ্ছিস!' তবু রোজের মুখে হাসি দেখি নি কোনদিন। কারুর সঙ্গেই ভাল ক'রে কথা বলে না। এ ওর কুণ্ঠা নয়, ঋণের জন্যে বিড়ম্বনাবোধও নয়। কৃতজ্ঞতাবোধটাই নেই। এই বয়সেই সেটা বুঝি। 'শুধু দুহাত পেতে নিয়ে যাচ্ছি, শোধ দিতে পারছি না'—এই মনোভাবে মানুষ যেমন সংকুচিত ও নীরব থাকে—এ তা নয়। বরং যেন নালিশের ভাব। এত ক'রেও যেন দিদি যথেষ্ট

করছেন না, ওর প্রতি অবিচার করছেন—এমনি ওর মনোভাব। অন্তত আমার তাই মনে হ'ত।

দিদি রোজই রাত্রে আরতির পর রোজেকে নিয়ে সেজেগুজে বেরোতেন। 'কোথায় যাচ্ছ' জিজ্ঞাসা করলে বলতেন 'পরিক্রমায়* যাচ্ছি।' কোনদিন বা বিশদও বলতেন একটু, 'রাধা-রমণের ফুলশিঙ্গার হবে আজ' কিম্বা 'বঙ্কুবিহারীর গোপবেশ হবে—তাই দেখতে যাচ্ছি।' বেশির ভাগই সংক্ষেপে 'পরিক্রমা' বলে সারতেন। আমিই জানতে চাইতুম, আর সবাই যেন ব্যাপারটা জানে মনে হ'ত। কেন না আমি যখন প্রশ্ন করতুম ঊষা তখন প্রায়ই দিদির আড়াল থেকে মুচকি হেসে, ঠোঁট উল্টে মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে চলে যেত, চোখ মটকাত আমার চোখের দিকে চেয়ে। কথাটা কিছু বুঝতাম না। তবে একটা কথা আমার জিভের ডগায় এসে যেত যে—এ যেন অভিসারে যাওয়া। নাটক-নভেল-পড়া-মনে অভিসারে যাওয়ার একটা ছবি অস্পষ্টভাবে আঁকা হয়েই থাকে, তার সঙ্গে যেন এ যাওয়ার কোথায় একটা মিল পেতুম। তবে সার্থক অভিসার নয়—কারণ যখনই ফিরতেন দেখতুম দিদি যেমন তেমন, রোজে মনমরা হয়ে থাকত। মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি আরও নত।

শেষে, এমনি চার-পাঁচ দিন দেখে একদিন দিদিকে চেপে ধরলুম, 'ওসব পরিক্রমাটমা বাজে কথা, ঠিক ক'রে বলুন দিদি—রোজ রোজ আপনারা কোথায় সয়ার করতে যান।'

অন্য কোন বয়স্ক লোককে এভাবে প্রশ্ন করতে গেলে, বিশেষ এ ভাষায়—ধমক খেতুম নিশ্চয়ই। আমিই বলতে ভরসা পেতুম না। কিন্তু এই ক'দিনে দিদিটিকে চিনে নিয়েছি। বুঝেছি যে খোলাখুলি স্পষ্ট কথাই উনি পছন্দ করেন। আরও বুঝেছি, যাকে পছন্দ করেন তার সাতখুন মাপ। এমনিও—পূজারী শোভারাম পর্যন্ত কাটাকাটা কথা বলে, মুখের উপর চোটপাট করে, উনি কিন্তু রাগ করেন না। বরং হাসেন, উপভোগ করেন বলে মনে হয়। প্রশ্রয় দিতে চান মানুষকে। আমাকেও, এর মধ্যে এমন সব কথা বলেছেন, যা কোন ষাট প'য়ষট্টি কি সত্তর বছরের মহিলা সতেরো বছরের ছেলের কাছে বলে না, সে সব প্রসঙ্গই আলোচনা করে না।

রাত্রে খাওয়ার পর বারান্দার আড্ডাটি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। সেখানে আলোচনা হয় না এমন কথাই নেই। বৃন্দাবন ভগবানের লীলাক্ষেত্র, তাঁর সাধের ব্রজধাম—সে ধামের যে এত কেচ্ছা, এত কেলেঙ্কারি তা জানতুম না। ওঁর মুখে শুনে যেন আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল। এ আড্ডাতে আমার উৎসাহ আরও বেশী ছিল এই জন্যে, এসব গল্প গিলতুম বসে বসে, পরবর্তী কালের লেখক-জীবনে এসব গল্প কাজেও লেগেছে। আমার অসুবিধে কিছু ছিল না এত রাত অবধি জেগে গল্প করায়, কারণ নিত্যই প্রথম রাত্রে টানা একটি ঘুম হয়ে যেত। কীই বা করব, ওঁদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করেছি—ওঁরা রাজী হন না, কেমন দেখেছি বিব্রত বোধ করেন। আমিই বা একা একা কত ঘুরব? পড়ার মতো তেমন বইও নেই। যেদিন ইচ্ছে হত শ্রীমদ্ভাগবতটা নিয়ে বসতুম। তাও দিনের বেলাতেই পড়ার সুবিধে। রাত্রে হ'লে কিরণবাবুর সঙ্গে সেই অদ্বিতীয় টেবিল-ল্যাম্পে বসে পড়তে হয়। সে ভাল লাগে না। কিরণবাবু তো কথা কইবেন না কেউ মরে গেলেও—আগে ভাবতুম আমি আসায় উনি বিরক্ত, পরে দেখলুম ওঁর স্বভাবই ঐ, কথা কারুর সঙ্গেই বলেন না, কেমন যেন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছেন মানুষটা, মুখের ভাব যেমন, মনটাও বোধহয় অমনি ভাবলেশহীন।

দিদির কিন্তু মনটা অন্যরকম—ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যাথলিক মন—তাই ছিল। সাবেক কালের লোক, ইস্কুল-কলেজে পড়েন নি—এ বয়সের এই রকম মেয়েছেলের মনের এতটা বিস্তৃতি আশা করা যায় না। আমার সঙ্গে কোন কথা আলোচনা করতেই বাধত

* দর্শন ক'রে বেড়ানোকেই পরিক্রমা বলে এদেশে।

না। সুতরাং এসব বিষয়ে ওঁর মনের চেহারাটা কেমন তা দেখতে পেতুম। একদিন নিজে থেকেই শোভারাম আর ঊষার কথাটা বলে ফেললেন। বললেন, 'মুখে আগুন সব। এক ধার থেকে মুখে নুড়ো জেবলে দিতে হয়। পিরবিত্তির কি আর হায়া-ঘেন্না থাকতে নেই! ঐ যে শোভারাম, পুজুরী ছেলে আমার, ওর কান্ডটাই দ্যাখো না। তুই এদেশী খোট্টা। পান্ডার ঘরের ছেলেও নয়, খাস আগ্রায় বাড়ি ওদের, মছলিখোর বাঙালীর ছায়া মাড়ায় না ওরা—তাও বিয়ে-থা করেছিস, একটা আট বছরের মেয়ে বাড়িতে, আর ও হ'ল বাঙালী মেদিনীপুরের মেয়ে, সৎ জাত অবিশ্যি—যার-তার হাতের জল আমিই বা খাবো কেন, তা বলে বামুন তো নয়—বিধবা মানুষ, পেটের দায়ে খেটে খেতে এসেছে—তুই কিনা ওর সঙ্গে জুটে গেলি!'

'জুটে যাওয়া' কথাটার অর্থ এতদিনে বুঝতে শিখেছি বৈকি! উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'তা আপনি কিছু বলেন না কেন? দূর ক'রে তাড়িয়ে দেন না কেন?'

'পাগল! আমি তাড়িয়ে দিতে যাবো কেন? অমনি না হ'লে আর ব্যাটাছেলের বুদ্ধি! ও তো এখানে ঘর ঘর, কাকে তাড়িয়ে কাকে রাখব, আর কটাকেই বা পাহারা দেব? মাঝখান থেকে আমি একটা ভাল পুজুরী আর গুণের ঝি খোয়াই কেন? শোভারামের রান্না তো খাচ্ছিস, পরিষ্কার হাত ওর। এখানে বেস্তর পুজুরী দেখেছি, কারুর রান্না ভাল নয়। ছোটবেলা আঠারো বছর বয়স থেকে আছে, নিজে হাতে রান্না শিখিয়েছি। অমন লোক পাবো কোথায়। যারা একটু ভাল রাঁধতে পারে তাদের এতটি খাঁই। তারা কেউ চার টাকা মাইনেতে থাকবে? পাঁচ টাকা ছ' টাকা পর্যন্ত চেয়ে বসবে।...না কি ঊষার মতো ঝি-ই পাবো একটা খুঁজে! যত সব দ্যাখো এখানে বাঙাল ঝি, নয়ত খোট্টা। তাদের সঙ্গে আমার একদন্ড বনবে না। তাব চেয়ে এ বেশ আছে, দুজনের টানে দুজনে বাঁধা, কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারে না। দুজনে একসঙ্গে বেশী মাইনের কাজ পাবে তবে তো ছাড়বে। আমি সব দেখে-শুনেও তাই ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকি।'

বলে ধূর্তের মতো চোখ মিটমিট ক'রে হাসতে লাগলেন।

সেই থেকেই আমি চিনে নিয়েছি মানুষটাকে। সেই জোরেই রোজের কথাটা তুললুম আরও। চেপে ধরলুম, 'বলুন ব্যাপারটা কি, বলতেই হবে।'

দিদি প্রশ্ন শুনে হাসলেন অনেকক্ষণ ধরে, নিঃশব্দে। তারপর বললেন, 'কেন বল দিকি? তোর কি মনে হয়?'

'কিছু বুঝতে পারছি না বলেই তো জিজ্ঞেসা করছি।'

'না-ই বা বুঝলি। সংসারের সব কথাই তো কিছু আর বুঝতে শিখিস নি—এটাও না হয় না বুঝলি।' আস্তে আস্তে বলেন দিদি, আবছা আলোতে আমার মুখটা দেখবার চেষ্টা করেন যেন ভাল ক'রে।

'এইভাবে এক এক ক'রেই তো সব বুঝতে শেখে মানুষ। নইলে আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বাড়ে কি ক'রে?'

আজ বুঝি যে এ ধরনের কথা অত বড় একটা বয়স্ক স্ত্রীলোককে বলা যৎপরোনাস্তি ধৃষ্টতা—কিন্তু সেদিন অতটা ভাবি নি। অল্প বয়সে প্রগল্‌ভতার মাত্রা থাকে না প্রায়ই।

দিদি রাগ করলেন না, কিন্তু মুখের মতোই জবাব দিলেন। বললেন, 'তবু—আধারের মাপটা মানানসই কিনা দেখে নিতে হয় আধেয় রাখার আগে। এক পো দুধ ধরে যে বাটিতে সে বাটিতে কি আর এক সের তেল রাখতে যাওয়া উচিত?'

এইবার লজ্জা পেলুম। অথবা ঠিক লজ্জাও নয়—মনে হ'ল গালে কথার চড় মারলেন দিদি—আহতই বোধ করলুম। মুখ গোঁজ ক'রে বললুম, 'থাক তবে, যদি মনে করেন বলা উচিত নয় তো বলবেন না।'

তখনই আর কিছু বললেন না। নিঃশব্দে বসে মালা জপ করলেন অনেকক্ষণ ধরে,

তারপর বোধহয় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা শেষ ক'রে মালাটা মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'বলা উচিত নয় ঠিকই, তবে কীই বা বিচের করছি, সব কথাই তো বলে ফেলছি তোকে। তোরা আজকালের ছেলেরা বয়সের তুলনায় পেকেও গেছিস ঢের, জানতেই বা কি বাকি আছে।... আর তাই বা কি বলব—তোর যা বয়েস আমাদের ছেলেবেলাতে দেখেছি ও বয়সে ছেলেদের বিয়ে-থা হয়ে ছেলের বাপ হয়ে যেত!'

বলেও থামলেন একটু। বুঝলুম খুবই সংকোচবোধ করছেন। বললুম, 'থাক গে দিদি। পরে শুনব কিংবা আপনিই বুঝে নেব।'

'না, তার জন্যে নয়। বলেই ফেলি। আর বলবারই বা কী আছে। যা ভেবেছিস তা-ই ঠিক—ভাল মেয়েমানুষ নয় ও। ভদ্দর ঘরের বামুনের ঘরেরই মেয়ে, একটু আত্মীয়তার খেইও আছে আমাদের সঙ্গে—সেই সুবাদেই জানা-শোনা—ষোল বছর বয়সে পাড়ার একটা ছোট জাতের লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তখন রূপ ছিল খুব, চেহারাও তো দেখছিস ছেয়ালো, অনেকেই ওকে দেখে উশখুশ করত, অমন ছোট পিরবিত্তি কেন হল জানি না। একটা কথা ছিল অবিশ্যি, বর নিত না—তবে তেমনি খাওয়া-পরার দুঃখ ছিল না, যেখানে ছিল যত্নেই ছিল—টিকে থাকলে একটা হিল্লে হ'তই. চাই কি বরও হয়ত একদিন ঘরে ফিরত. ঘর-সংসার সব হ'ত। সেও সেই থেকে ভবঘুরে বাউন্ডুলে হয়ে গেল চিরদিনের মতো।'

একটু থেমে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন, 'মরুক গে—তা ওর আর তর সইল না। তারপর ওপথে নামলে যা হয়—অনেক হাত ঘুরে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে দিনকতক একটু সুখের মুখ দেখেছিল. কাশীর এক বাঙ্গালী জমিদারের হাতে পড়েছিল। তার সঙ্গে ঘরও করেছে একটানা পনেরো বছর, স্বামী-স্ত্রীর মতোই ছিল। পোড়া কপাল ওর. সেই সময়ই গুছিয়ে নিতে পারত—মানুষটা পয়সাআলা ছিল—তা নয়, সে বলত পরিবার তো উনিও ভাবলেন পরিবার হয়ে গেছেন। একটা বাড়ি পর্যন্ত করিয়ে নেয় নি তখন, অথচ কাশীতে দেড় হাজার দু' হাজার হ'লে একটা বাড়ি হয়ে যায়। বরং পয়সা যা হাতে পেয়েছে দু' হাতে উড়িয়েছে। জমিদারনীর চালে থেকেছে। ব্যাস্, বাবু একদিন একদিনের নিউমোনিয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন. সেই অবস্থাতেই শেষ হয়ে গেল, আর জ্ঞান ফিরল না। কিছু বলে যেতে পারল না কাউকে, কিছু লিখেও রাখে নি। আজ করব. কাল করব বলত, বলত উইলে তোমার দুশো টাকা হিসেবে মাসো-হারার ব্যবস্থা থাকবে—এই সব। তাতেই ভুলে থাকতেন গিন্নি। বলে তো যে উইল একটা লেখানোও হয়েছিল উকীলকে দিয়ে, কেবল সইটা হয় নি।...অনেকের তো ভয় আছে—উইল করলেই পেরমাই কমে যায়, মরে যায় মানুষ—তাই বোধহয় সই করেনি।...তা সে তো পটল তুলল. ইনি একেবারে পথে বসলেন। সেই মাসের আটটা না ছটা টাকা বাড়ি-ভাড়া দেবেন এমন নগদ টাকা হাতে ছিল না। গয়না বেচে বেচে চলেছিল কিছু দিন, তাই ভাঙিয়েই কলকাতায় গিয়েছিলেন দিন কতক, নতুন মানুষ ধরবার জন্যে—তা এই বয়সে কে ওর তালেবর বাবু জুটবে বলো। তাছাড়া এত কাল কলকেতা ছাড়া. পুরনো চেনা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কে কোথায় উঠে গেছে কিম্বা মরে হেজে গেছে—নতুন যারা তারা চেনেই না তার সাহায্য করবে কি? রাস্তায় বসে ভিক্ষে করতেই হ'ত—কী করে যেন আমার ঠিকানা পেয়ে এখানে চলে এসেছে। বললে বিশ্বাস করবি না. ঠিক দুটি আনা পয়সা হাতে নিয়ে এসে উঠেছিল।'

এই পর্যন্ত বলে আর একবার থামলেন দিদি. বাঁ হাত দিয়ে পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন বসে বসে।

'তা এখনও তো হাতভর্তি চুড়ি রয়েছে।' আস্তে আস্তে বললুম।

'পোড়াকপাল! ও আবার চুড়ি কিসের। ও তো কেমিকেলের চুড়ি। কাঁচের চুড়ি

পরে এসে দাঁড়িয়েছিল। অত বড় মানুষটা শুধু কাঁচের চুড়ি পরে থাকলে ঝি-ঝি দেখায় না? আমি কলকাতা থেকে পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখে ডাক-খরচা ক'রে আনিয়ে দিয়েছি, নিত্যি সিঁদুর দিয়ে ঘষে চকচকে করতে হয়।...বলি ভেক চাই তো, ভেক না হ'লে ভিক্ষে মিলবে কেন?'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলুম আরও কিছু বলবেন মনে করে। উনি কিন্তু একেবারে মুখ বুজলেন যেন, নিঃশব্দে বসে মালাই জপে যেতে লাগলেন। তখন আস্তে আস্তে আবারও প্রশ্ন করলুম, 'তা ভিক্ষেটা কিসের? এই যে ঘোরা রোজ সন্ধ্যেবেলা—এ কেন?'

'মর ছোঁড়া! এত বুঝিস আর এটা বুঝিস না? সব কথা বুঝি আমার মুখ থেকে বার না করলে চলছে না?...আমি এখানে বসে ওকে আর কি সাহায্য করব? ভরসার মধ্যে তো মোহান্ত আর গোসাঁই কজন। তা এখানে বড় বড় গোসাঁই যাঁরা—তাঁদের কারও কারও এ অব্যেস আছে। অনেকের দুটি-তিনটি করে সেবাদাসী আছে বাইরে। বাঙ্গালী যারা তারা তো বটেই—ব্রজবাসী মানে এদেশী হিন্দুস্থানী যারা তাদেরও ঝোঁকটা বাঙ্গালী মেয়েদের দিকেই।—এসব দেখাশুনো কি যোগাড়-যাগাড়ে অন্য লোক লাগে না—ঐ মন্দিরে মন্দিরেই শুভদৃষ্টি হয়, দালাল আসে পিছু পিছু—বন্দোবস্ত হয়ে যায়। তাই সেই আশাতেই ওকে নিয়ে ঘোরা, যদি কারুর নজরে পড়ে যায়। এই আর কি!...তা কোন সুবিধে তো দেখছি না কোথাও। এক বুড়ো গোসাঁই একটু ঝুঁকেছে বটে, পয়সাও অগাধ কিন্তু তার আশির কাছাকাছি বয়েস। সে আর কদিন বাঁচবে। দেখছি যদি আরও একটু কম বয়সের কেউ জোটে—তবু দুটো-চারটে বছর হাতে পায়—ঠেকে শিখেছে তো—হয়ত কিছু জমিয়ে নিতে পারবে। না হয় ঐ বুড়োই ভরসা—অগতির গতি। আমি আর কদিন টানব!'

তিনি একটু হেসে মালা ধরলেন আবার। বিষণ্ণ ঠিক নয়—অপ্রতিভের হাসি, তার সঙ্গে একটু করুণা মেশানো।

এসব শুনে গা ঘিনঘিন করারই কথা কিন্তু কে জানে কেন তা করল না। দিদির ওপরে তো নয়ই—ঐ মেয়েটা সম্বন্ধেও ঘৃণা বোধ হ'ল না। বরং দুঃখই বোধ করলুম একটা। ওর আর দোষ কি, ঘর-সংসারের সাধ মেটে নি বলেই অমন করে মেটাতে গিয়েছিল বেচারী। যখন দিন পেয়েছিল তখন যদি নিজেকে বেশ্যা বলে না ভেবে ভদ্রলোকের স্ত্রী বলেই ভেবে থাকে তো—তা ওর সু-জন্ম-সংস্কারই প্রমাণ করে। বংশের সংস্কার ওটা, আকরের টান। ভাগ্যটা মন্দ বলেই বার বার এই পথে আসতে হচ্ছে—এই ভেবে সহানুভূতিই জাগল মনে মনে।

একটু পরে দিদিই কথা কইলেন আবার। যেন আমার চিন্তাসূত্রেরই খেই ধরে বললেন, 'কিরে, দিদির ওপর ঘেন্না হয়ে গেল তো?'

'ছি, কী বলছেন!' আন্তরিকতার সঙ্গেই বলি, 'আমি এমন কি একটা লোক যে এসব শুনেই ঘেন্না হবে। দিদির ওপর তো নয়ই, দিদির আশ্রিতার ওপরও হয় নি। ঘেন্না হবেই বা কেন, দোষ যদি কারও থাকে তো সে ওর বরাতের।'

গম্ভীরভাবে দিদি বললেন, 'ঠিক বলেছিস তুই। হতভাগী একেবারে। ওর জন্মলগ্নের দোষ, ওর অপরাধ কি!...কি করব, আমার যদি তেমন সঙ্গতি থাকত তো এই বয়সে কি আর—! তাছাড়া এখন থেকে শুধু পেটভাতে এক জায়গায় পরামুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে থাকা কি ভাল? আমি আর কদিন—এর পর যারা সেবায়েত হবে তারা যদি সে ভাতও না দেয়। এ তো সব দেবোত্তর, গবর্ণমেণ্টের ঘরে রেজেস্টারী করা, এ থেকে তো পৃথক ক'রে কিছু দিয়ে যেতে পারব না।'

আর কিছুই বলার ছিল না, কোন পক্ষেই না।

দিদিও আর একটুখানি জপ ক'রে শব্দ ক'রে একটা হাই তুলে উঠে পড়লেন। 'নে, ঢের হয়েছে—এবার শুয়ে পড়গে যা। রাত বোধহয় একটা বাজল।'

॥ ৪ ॥

পরিচয়ের সূত্রটা মারই প্রথম মনে পড়ল।

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে প্রথম মাথা হেঁট করে চোরের মতো এসে দাঁড়ানো ও তার আনুষঙ্গিক পর্বগুলো চুকে গেছে। অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে ব্যাপারটা। এমনি সময়ে ফিরে আসার চার-পাঁচদিন পরে—মার কাছে বসে সবিস্তারে ও সোৎসাহে গল্প করছিলুম নতুন-পাওয়া দিদির কথা। টাকা পেঁছনোর পরও কেন দু-তিন দিন দেরি হ'ল, সেই প্রসঙ্গেই উঠল কথাটা। জোর-জবরদস্তি ক'রে ধরে রেখেছিলেন দিদি। সত্যিই বোধহয় মায়া পড়ে গিয়েছিল আমার ওপর—নইলে কদিনের বা পরিচয়, আমি তো ঘাড়ে চেপে বসে কদিন বেশ ক'রে যাকে বলে 'ভুজ্যি ধ্বংস' ক'রে এলুম—দাদা হিসেব ক'রে গাড়ী ভাড়ার টাকাটাই পাঠিয়ে ছিলেন, তার ওপর দশ-বারো আনা পয়সা মাত্র বেশী, পথে খাওয়ার জন্যে—এক পয়সাও দিয়ে আসতে পারলুম না। তবু, যা নাকি কখনও করেন না উনি, ঊষা শোভারাম দুজনেই বললে—নিজে এসে স্টেশনে তুলে দিয়ে গেলেন। গাড়ি যখন ছাড়ল দেখি চোখের কোলে জল ভরে এসেছে ওঁর।

মা জেরা করে ক'রে ওঁর চেহারাটার বর্ণনা আর একবার শুনে নিলেন। ঠিকানা অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির অবস্থানটাও, তারপর মনে মনে যেন কী একটা হিসেব ক'রে নিয়ে বেশ একটু বিজয়-গর্বের সঙ্গেই বললেন, 'ও তো আমাদের চেনা লোক রে, তোদের দু'জনের একজনও চিনতে পারলি না কেউ কাউকে?'

চেনা লোক! সে আবার কি কথা!

আমি একেবারে অবাক! মার কথার অর্থ কিছুই মাথাতে ঢুকল না, হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলুম।

মা যেন আমার বিস্ময়টা বেশ উপভোগ করছিলেন। তাই আরও একটু ধাঁধায় রাখার উদ্দেশ্যে তখনই পুরোপুরি খোলসা করলেন না ব্যাপারটা। বললেন, 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলুম। ঠিকানাটা চেনা-চেনা লাগছে, অথচ এধারে কিরণ বলে কে এক ভদ্দরলোক চিঠি দিয়েছে—তাই একটু গোলমালে পড়েছিলুম। বলি ঠিকানাটা তো সেই—কিন্তু এ কিরণচন্দ্র দে সরকারটি আবার কোথা থেকে এল!...এইবার বুঝলুম যে আমার আন্দাজ-টাই ঠিক, স্পষ্ট চিনতে পারলুম এবার।'

'কিন্তু কৈ, আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না!'

'এখনও মনে পড়ল না? সেই বন্যের সময় রে—মনে নেই, একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বান দেখতে দেখতে আলাপ হ'ল? তারপর আমি দু'তিন দিন গেলুম ওর ঠাকুরবাড়িতে। আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রে মাসী সম্পর্ক পাতালে, আমি মেয়ে বললুম—এত কান্ড। তুই দিদি বলে কিছু অন্যায় করিস নি, ঠিকই করেছিস। একটা কথা বললেই মনে পড়বে তোর এখুনি—সেই মনে আছে, অন্নকূটের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে দুটো টাকা আদায় ক'রে নিয়েছিল পুজোর নাম ক'রে—একটা ঠাকুরবাড়ি থেকে এক থালা প্রসাদ পাঠিয়ে

দিয়েছিল মনে নেই? আমি রেগে মরি। আবার বলে পাঠিয়েছে, 'আমি কোথায় পাবো, এমনি চেয়ে-চিন্‌তে করা ছাড়া অন্নকূট করব কি ক'রে। ওর নাকি সব টাকা সরকারের হাতে, গোনা-গুনতি টাকা, তাই ঐভাবে আদায় করে। মনে পড়ছে এবার?'

খুব পড়েছে। আর বলতে হবে না। ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে, শুধু সেই লোকই যে এই লোক—সেই যোগাযোগটা ধরতে পারি নি। আমরা এত অবাক হয়ে গিয়েছিলুম তখন যে, ঝগড়া করা কি প্রতিবাদ করাও হয়ে ওঠে নি, সুড় সুড় ক'রে টাকা দুটো বার ক'রে দিয়েছিলেন মা। রাগারাগি করেছিলেন লোকটা চলে গেলে। এখন মনে হচ্ছে ঐ শোভারামই নিয়ে এসেছিল প্রসাদটা বয়ে। নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মা বলেছে দুটো টাকা দিয়ে দিতে।'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিসের টাকা বাবা?' 'এই প্রসাদের', উত্তর দিয়েছিল শোভারাম, 'অন্নকূটের পুজোর জমা। মা বলেছে আমি কোথায় পাবো, সরকারের হাতে টাকা, গোনাগুনতি দেয়। এক পয়সাও বাজে-খরচ করার উপায় নেই। চেয়ে-চিনতে করতে হয় তাই। তাছাড়া অন্নকূটের নিয়মই আছে—পাঁচবাড়ি থেকে ভিক্ষে ক'রে করতে হয়।'

তখন রাগ হয়েছিল, পরে মনে আছে এই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলুম খুব।

এখন সব কথাই মনে পড়েছে। খুব চেষ্টা করতে আদলটাও মনে পড়ল ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। তবে চাক্ষুস চিনতে পারার কথা নয়, সেই কথাই বললুম মাকে। আমি সেই একবারই দেখেছি। তারপর মা বরং দু'তিন দিন গেছেন ওঁর ঠাকুরবাড়িতে—প্রথম আলাপের সূত্র ধরে, আমি যাই নি। উনিও কোন দিন আসেন নি। আর সে একদিন যে দেখা—তাকে দেখা বলে না। সে সময় মেয়েরাই শুধু পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারে—পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির অবশিষ্ট কটি প্রাণী, তাদেরও আসন্ন সর্বনাশের অপেক্ষা করছে—এই ধরনের একটা কিছু যদি কল্পনা করা যায় তো আমাদের সেদিনকার অবস্থাটা বোঝা যাবে খানিকটা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলুম ঠিকই, কিন্তু সামনে যেখানে নটরাজের তাণ্ডব চলছে, রুদ্র যেখানে ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত—সেখানে পার্শ্ববর্তিনীকে কে লক্ষ্য করে!

বেশী দিনের কথা নয় অবশ্য, বছর দুই আগে পুজোর সময়। গঙ্গাযমুনায় অমন বন্যা নাকি বহুকাল আসে নি। তার পরও এতকাল হয়ে গেছে, অমন কাণ্ড আর হয় নি। সে সময় আমরা বৃন্দাবনে ছিলাম। আমার সজ্ঞানে বৃন্দাবন দেখা সেই প্রথম। তার আগেও নাকি গিয়েছিলুম, মনে নেই অত। মার শখ হয়েছিল অন্নকূট দেখার, দাদাদের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে টাকা ধার ক'রে আমাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন একা। অন্নকূটটা যদিচ কালীপুজোর পরের দিন প্রতিপদে—আমরা পুজোর দু-একদিন আগেই গিয়ে পড়েছিলুম। মাসখানেক ওখানে থেকে অন্নকূট দেখে ফিরবেন—এমনি ইচ্ছা ছিল মার।

আমরা গিয়ে পৌঁচেছি বোধহয় তৃতীয়া কি চতুর্থীর দিন। গিয়েই শুনেছি যমুনার জল বাড়ছে, লক্ষণ খুব খারাপ। বর্ষার শেষে নদীতে জল বাড়লে বন্যা হয়। তবু ঠিক ও-ধরনের বন্যা হবে কেউ ভাবে নি। প্রথম সত্যিকারের বিপদের সূচনা পেলুম—সেটা বোধহয় পঞ্চমীর দিন বিকেলে, শুনলুম রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতাল খালি ক'রে রুগী আর ওষুধপত্তর এখানে কোথায় কালা বাবুর কুঞ্জ আছে, সেইখানে সরানো হচ্ছে। ষষ্ঠীর দিন ভোর থেকে কোন সন্দেহ রইল না, বন্যা শব্দটা সকলের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল, সকলের মুখেই উদ্বেগের ছায়া। দুপুরে খবর পাওয়া গেল যমুনাপুলিন সবটাই জলসই, গোপেশ্বর মন্দির পর্যন্ত ডুবেছে। এদিকে মিশনের ছাদগুলো সুদ্ধ জেগে আছে, রাধা-বাগও নাকি যায় যায়। রাধাবাগ অর্থে কাত্যায়নীর মন্দির। দশভুজা দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিত সেখানে, ঘটা ক'রে পুজো হবে, এক সন্ন্যাসী এসে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন—

একেবারে তিনদিনের জন্যে। এধারে রেঠিয়াবাজারেও নাকি একটা পুজো হয়—তবে সে ব্রজবাসীদের পুজো, বাঙালী-মতে এই রাধাবাগই ভরসা।

এ খবরের পর আর স্থির থাকতে পারলুম না কেউই, দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। শহরে উদ্বেগটা এবার আতঙ্কে দাঁড়িয়েছে। হৈ হৈ চেঁচামেচি চলছে। লোকজনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। যমুনাতে কখনই হাঁটু ডোবে না, বর্ষা ছাড়া। সেইজন্যে নৌকোরও ব্যবস্থা নেই। নৌকো থাকলেও যে খুব একটা সুবিধে হ'ত তা নয়, তবু চেষ্টা করা যেত হয়ত। শুনলুম আশপাশের গ্রামে বহু লোক আটকে পড়েছে। যারা গাছে উঠে আশ্রয় নিয়েছে তারা আর নামতে পারছে না, খেতে পাচ্ছে না। যারা ঘরের চালে উঠে বসেছিল, তাদের দুর্গতিই বেশী। নিচের মাটির দেওয়াল গলে চালাসুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা চেঁচাচ্ছে, পাড়ের লোক হায় হায় করছে কিন্তু বাঁচাতে পারছে না কেউ।

আমরা স্বভাবতই রাধাবাগের দিকে গেলুম আগে। কিন্তু তখন আর সে পর্যন্ত যাওয়ার উপায় নেই। জল রঙ্গজীর বাগানবাড়ি পর্যন্ত এসে গেছে, বাগানের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। বাগানে রঙ্গজীর 'বাচ' খেলার জন্যে ছোট একটি পান্‌সি নৌকো ছিল, তারই সাহায্যে দু'একটি বলিষ্ঠ তরুণ কিছু কিছু লোক বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, আর রাধাবাগের নিতাই মহারাজ এক একটা অমানুষিক কান্ড করছেন। সেই খরস্রোতের মধ্যে সাঁতরে গিয়ে ভেসে-যাওয়া গরু-ঘোড়া-গাধা মায় উটগুলোকে পর্যন্ত টেনে আনছেন। তবে একা আর তিনি কত করবেন? আমাদের চোখের সামনে দিয়েই কত অসহায় জীব-জন্তু ভেসে চলে গেল। মানুষ দেখা গেল না বড় একটা, কারণ মানুষ যারা এ স্রোতে পড়েছে তারা বেশির ভাগই ডুবে গেছে, ভেসে যাওয়া সম্ভব নয় তাদের। একদল মানুষ শুধু চোখে পড়েছিল, সাত-আটটা লোক একটা চালাসুদ্ধ ভেসে চলে গেল চেঁচাতে চেঁচাতে। কী আকুলি-বিকুলি তাদের, আর কী কান্না, তারা আশা করছিল যে, আমরা—যারা তখনও নিরাপদ ডাঙ্গায় আছি—এখনই গিয়ে তাদের বাঁচাব।

অবশ্য বেশীক্ষণ দেখতে হয় নি—এই যা। বেশ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছি ঘাড় উঁচু ক'রে—অকস্মাৎ পায়ে কী একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগতে চেয়ে দেখি জল। এর মধ্যেই আমাদের গোছ-ডোবা জল এসে গেছে। আর একটু পিছিয়ে গেলাম—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানেও জল গিয়ে পেঁছিল। তখন দৌড় দৌড়, মজা দেখার সাধ মিটে গেছে, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্নই প্রকট হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই সময়ই, সেইখানে দাঁড়িয়ে আলাপ হয়েছিল এই দিদির সঙ্গে। তখনই জানলুম যে উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন, খুব কাছে না হ'লেও খুব দূরে নয়।

ঐ পর্যন্তই। তখন আর কে কার বিস্তৃত বিবরণ শোনে বা শোনায়। প্রাণের দায়ে ছুটছি প্রায়, কোনমতে নিজেদের ডেরায় গিয়ে পেঁছতে পারলে যেন বাঁচি। সেখানেও যে জল ধাওয়া করতে পারে—সেটা মাথাতে যায় নি। দিদিই বলে দিলেন মনে আছে, 'যদি এ পাড়াও ডোবে তো আমার ওখানে দৌড়ে চলে এসো, জল ভেঙেও এসো। আমার সামনের বাড়িটা আগাগোড়া পাকা গাঁথুনি, নিচেটা যদি ডুবেও যায় তো ওপরে কোনমতে প্রাণধারণ ক'রে থাকা চলবে—জড়ো হয়েও, ভেঙে পড়বে না অন্তত। তোমরা যেটায় আছ ওটা ভেতরে মাটির গাঁথুনি, বেশীক্ষণ ডুবে থাকলে দ্যালের মধ্যে যদি জল সেঁধোয় তো একসময়ে হুড়মুড় ক'রে ধসে পড়তে পারে।'

তারপরই অবশ্য অদ্ভুত একটা জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'তবে দেখে রেখো, আমার এ পাড়ায় কিছু হবে না। আমার কুঞ্জবিহারী বড় জাগ্রত, বড় দয়াল।'

হয়ও নি অবশ্য। আমরা যখন বাড়ি ফিরলুম তখন আমাদের ও বাড়িটা থেকে পনেরো-ষোল গজ দূরে পর্যন্ত জল এসে গিয়েছে। ওদিকে গোপীনাথের ঘেরা নিকুঞ্জবন সব জলমগ্ন। রেঠিয়াবাজারের প্রতিমাকে দোতলা সমান উঁচু মাচান ক'রে তার ওপর বসানো

হয়েছে, জলে চৌকি ভাসিয়ে পুজো হবে শুনলুম। অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তেই আমাদের এ রাস্তাটাও ডুববে। আমরা আবার আছি একতলার ঘরে। বিছানাপত্র অবশ্য আমরা ওপরে তুলে দিয়েছিলুম এসেই—জল না ঢুকলেও শোবার কথা তখন চিন্তাই করা যাচ্ছে না। নিজেরা সত্যি সত্যিই সেই মহিলার সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব কিনা ভাবছি, ওপরের ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর একটু দেখুন না, জল এলে সবাইকেই যেতে হবে। নিচের দেওয়ালে সব জায়গায় পলেস্তারা নেই, জল এলেই গাঁথুনির মাটি গলবে। বংশীবটের কাছে পর পর পাঁচখানা বাড়ি এর মধ্যেই পড়েছে খবর পেলুম।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য রকম ভাবে বেঁচে গেলুম। আমাদের বাড়িটার পিছনে ব্রহ্মকুণ্ড পুকুর, তার ওপারে রঙ্গজীর মন্দিরের বার-উঠানের দেওয়াল। সেখানে নাকি জল জমে পুকুরের মতো হয়ে গেছে। জলের চাপে যে কোন মুহূর্তেই পাঁচিল ভেঙে পড়তে পারে—সকলেই বলছে। তাহলে ঐ পর্বতপ্রমাণ জলের তোড়েই তো ভেসে যাবো।

আমাদের বাঁচিয়ে দিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ ব্রহ্মকুণ্ডই। প্রাচীনকালের বিরাট পুকুর—কিম্বদন্তী ব্রহ্মার চোখের জলে ওর সৃষ্টি। প্রাচীন যে তাতে সন্দেহ নেই—তবে কতটা প্রাচীন তা বলা শক্ত। ঘাট ও চারদিকের পাড় এবং গোল রানাগুলো যে ইটে বাঁধানো, তা দেড়শ'-দুশ' বছর আগে চলত। হয়ত তার আগেও বাঁধানো ছিল অন্য কোন ইঁট বা পাথরে। খুব গভীরই ছিল এককালে, এখন মজে গিয়েছে, নিচে একরত্তি সবুজ জলে বড় বড় ব্যাঙ লাফায়, কদাচিৎ কোন দক্ষিণী ভক্ত এলে স্নান করে, নইলে দূর থেকেই রাম রাম। এই পুকুরের একদিকে আমাদের একসার বাড়ি, তারপর রাস্তা। আমাদের ডানদিকে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির—বা তার পিছন দিকের পাঁচিল। আর ওদিকে ঐ রঙ্গজীর উঠোনের একতলা সমান পাঁচিল। সে পাঁচিল আর পুকুরের মধ্যে বিশ ফুট আন্দাজ একটা পাকা রাস্তা, সে রাস্তায় পড়বার জন্যে একটা বড় ভারী দরজাও ছিল। সে দরজাও বিরাট, জলুসের সময় হাতীসুদ্ধ চলে যাবে—সেই মাপে তৈরী। যখন দেখা গেল পাঁচিলটা সুদ্ধ যায়—তখন মন্দিরের কর্তৃপক্ষ দরজাটা খুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ অত বড় ফটকের সমান কিউবিক-মাপের জল বজ্রগর্জনে এসে পড়তে শুরু করল ঐ পুকুরটাতে। সে শব্দেই বুকের মধ্যে গুরগুর ক'রে ওঠে। আগেও, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের দিক থেকেও কিছু কিছু জল ঢুকতে শুরু করেছিল, তবে এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কারণ এদিকে আমাদের বাড়িগুলো থাকায় এদিকের পাড়টা স্বাভাবিক ভাবেই ওদিকের চেয়ে একটু উঁচু হয়ে গিয়েছিল।

সারারাত ধরেই ঐ জলপ্রপাতের ব্যাপার চলল। পরের দিনও সারাদিন। পুকুর ভরাট হলেই আমদের বাড়ি জল ঢুকবে, এ অবধারিত। সেইটেই হ'ল না। পুকুর ভরল না শেষ পর্যন্ত। চব্বিশ ঘণ্টা সমান বেগে জল পড়ল, তার পর কমতে কমতেও আরো বারো ঘণ্টা। জলের তোড়ে বিশ ফুট রাস্তা ক্ষয়ে পাঁচিলের গোড়া বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু তবু পুকুর অনেকখানি খালি রয়ে গেল শেষ অবধিও। ব্রহ্মার আশীর্বাদ কিনা জানি না, তবে ব্রহ্মকুণ্ডের জন্যেই আমাদের পাড়াটা বেঁচে গেল সে-যাত্রা...

রাত্রেই দিদি একবার লোক পাঠিয়েছিলেন আমাদের ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে। আমরা বলেছিলুম, বাড়ির কাছাকাছি জল এলেই চলে যাবো। জল আসে নি অবশ্য, তবে আমরা জেগে বসে প্রহর গুনেছি যাকে বলে—সারারাত। যেন ফাঁসির আসামী ভোরের প্রতীক্ষা করছি। আতঙ্ক কাকে বলে তা টের পেয়েছিলুম সেদিন। সারা শহর থেকে ভীত ত্রস্ত পীড়িত নরনারীর মিলিত আর্তনাদ উঠছে একটা—তার মধ্য থেকে কোন শব্দকে আলাদা ক'রে বেছে নেওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বিভিন্ন হাহাকারে মিশে যে ধ্বনিটা উঠছে তাতে বুকের মধ্যে কী রকম করতে থাকে—নিজেরা নিরাপদে থাকলেও। তারই মধ্যে মধ্যে আবার বিরাট শব্দ ক'রে এক-একটা বাড়ি ভেঙে পড়ছে—উঠছে নতুন একটা হাহাকার

ও আর্তনাদ। আহতদের তো বটেই, যারা বেঁচে থাকছে, মৃত ও আহতদের সেই আপন-জনেরও। সে দুঃসহ রাত্রির স্মৃতি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। এই এতকাল— চল্লিশ বছর পরেও তো ভুলতে পারি নি।

দিদি নাকি ভোরে লোক পাঠিয়েছিলেন খবর নিতে। আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভয় নেই আর—বন্যার বিষদাঁত ভেঙে গেছে, জল আর বাড়ছে না যখন, তখন একটু একটু ক'রে এবার কমেই যাবে।

ওঁর এই আন্তরিকতায় আমরা একটু অভিভূতই হয়েছিলুম। সেই জন্যেই মা আরও গিয়েছিলেন—ধন্যবাদ জানাতে। তারপর বোধহয় আরও দু-একদিন। তারপরই তো ঐ অন্নকূটের প্রসাদের ব্যাপার। মনটা খিঁচড়ে গেল। আর চলেই তো এলুম তার একদিন না দুদিন পরে। দেখা-সাক্ষাতের সময়ই বা কোথায় রইল।

কথাগুলো লিখতে যত দেরি, ভাবতে তার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগল না— তা বলাই বাহুল্য। বায়স্কোপের ছবির মতো কেন—তার থেকেও দ্রুতবেগে যেন সরে সরে গেল চোখের সামনে দিয়ে। মনে পড়ল সবই।

মা আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছিলেন। আমার যে মনে পড়ে গেছে তা বুঝতে পেরে এবার বললেন, 'তারও মনে পড়ল না—এত বুদ্ধি তার। আশ্চর্য তো! বন্যের কথা ওঠে নি একবারও?'

'তা উঠেছিল বৈকি', মনে ক'রে ক'রে দেখি, 'হ্যাঁ, বলেছিলুম যে আমরা সে সময় এখানে ছিলুম। আমি আর মা এসেছিলুম তাও বলেছি। তবে ঐ পাড়াতেই যে ছিলুম, সেটা অত খেয়াল হয় নি। আর তিনিও অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন নি। তাঁর নিজের কথাই দশ কাহন।'

মা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তার পর এখানে এসেও ওর অনেক বিত্তান্ত শুনেছিলুম। তোকে বলি নি তখন। এর নাম করতে আর বৃন্দাবনে ঠাকুরবাড়ি আছে বলতে তোর বড় পিসেমশাই চিনতে পেরেছিলেন। তিনিই ওর পরিচয় দিলেন সবিস্তারে। সে অনেক হিস্টিরি। ও এমনি অবীরে অনাথা বিধবা নয়, এককালে ডাকসাইটে মেয়ে-মানুষ ছিল ও। কলকাতার বড়লোক অধিকাংশই চিনত ওকে।'

সে আবার কি! আজ কি আর বিস্ময়ের শেষ হবে না নাকি?

'হ্যাঁ রে, সুরবালা নাম ওর। সুরোকীর্ত্তনউলী বলে বিখ্যাত ছিল। খুব নাকি ভাল কীর্ত্তন করত। বড়ো বড়ো মুজরো আসত, এদান্তে পাঁচশ টাকার কম মুজরো নিত না। পেলাও উঠত ঢের, হাজার-বারোশ' পর্যন্ত পেলা পড়ত এক এক জায়গায়, দশ-বারোখানা ক'রে গিনি।'

'তার পর?' সাগ্রহ-কৌতূহলে প্রশ্ন করি। কথাটা শুনলে হয়ত অপর কারও মনটা সংকুচিত হয়ে যেত, কিন্তু আমার কাছে নতুন এক মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠলেন দিদি। যাই হোক, এও তো এক রকমের শিল্পী। উঁচুদরের শিল্পী, যে-কোন ঘরেরই হোক বা মানুষ হিসেবে যা-ই হোক, আমাদের কাছে—যারা নতুন ক'রে পৃথিবী ও মানুষের সমাজ গড়তে চাই—তাদের কাছে শ্রদ্ধেয়।

'তার পরটাই আর কিছু বলতে পারলেন না ঠাকুরজামাই। উনি ঠিক জানেন না। বললেন যে, যেমন দপ ক'রে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দপ করেই নিভে গেল আবার। তবে নাম পড়ে নয়—সরেই গেল, কে জানে কেন। কী হল, কেন গাওয়া বন্ধ করল তা কেউ জানে না। সে নাকি একটা 'মিস্টির', ইংরিজী শব্দটা সাবধানে উচ্চারণ ক'রে মা যেন বিজয়গর্বে একবার চাইলেন আমার মুখের দিকে, 'অনেক দিন পরে ঠাকুরজামাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঐ বৃন্দাবনেই। তাতেই উনি জানতে পারেন যে, ঠাকুরবাড়ি ক'রে

ওখানে আছে, বিধবার মতো শুধুহাত করেছে, থান পরে।...তোর পিসেমশায়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল, উনি চিনতেন।'

এই বলে আর একবার থেমে আমার মুখের দিকে চাইলেন।

দেখলুম মার চোখে এক রকমের অর্থপূর্ণ দুষ্টুমিভরা হাসি। আমিও হেসে বললুম, 'যা বলবে স্বচ্ছন্দে বলতে পারো, আর যা বলবে তাও আমি জানি।'

'সে তো জানিই—ঠাকুর্দা হয়ে বসে আছ একেবারে!' মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তারপর বললেন 'কে-ই বা না জানে। ঠাকুরজামায়ের এককালে ও পাড়ায় খুবই যাতায়াত ছিল, কাকে আর উনি না চিনতেন। এখনই পয়সাকড়ি গিয়ে পৈতে-পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন!'...

কৌতূহল মিটল না, বরং বেড়েই গেল। কিন্তু সে কৌতূহল মেটাবার কোন উপায় নেই। বড় পিসেমশাই এখন কাশীবাসী, কাশীতে না গেলে তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় হবে না। যা রগচটা রাশভারী মানুষ, গেলেই যে সব কথা বলে বসবেন তাও মনে হয় না। আমারই সাহসে কুলোবে না হয়ত। যদিবা ভরসা ক'রে বলতে পারি, তিনি হয়ত এক ধমকে চুপ করিয়ে দেবেন, 'তবে রে ফাজিল ছোঁড়া। লেখাপড়া ডকে উঠল—এখন থেকে মেয়েমানুষের খোঁজ। পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তেই পেকে উঠেছ একেবারে!' সে তখন উল্‌টো বিভ্রাট হয়ে পড়বে!

সুতরাং আর কিছুই জানা হ'ল না। একবার ঝোঁক হয়েছিল খোদ দিদিকেই চিঠি লিখি, লজ্জায় পারি নি। দিদি কি মনে করবেন কে জানে। জবাবই বা দেবেন কেন? এসব কথা কি কেউ নিজে লিখে কাউকে জানায়! বিশেষত আমি কোথাকার কে, বয়সেই বা কত তফাৎ। আমার তো এ কৌতূহল প্রকাশ করাই ধৃষ্টতা।

॥ ৫ ॥

তবে কথাটা মনে ছিল। ভুলি নি কখনই।

এর বছর চার-পাঁচ পরে—১৯৩০ কি ৩১ সালে বৃন্দাবনেই দেখা হ'ল দিদির সঙ্গে। তখন সবে কলেজ ছেড়ে নিজের ভাগ্যের পথ নিজে প্রশস্ত ক'রে নেবার দুঃসাধ্য-সাধন-ব্রতে প্রয়াসী হয়েছি, অর্থাৎ বইয়ের ক্যানভাসিং ক'রে বেড়াচ্ছি বিভিন্ন প্রকাশকের হয়ে। এই কাজেই সে বছরের মে মাসে গিয়েছিলুম সংযুক্ত প্রদেশ বা বর্তমানের উত্তর প্রদেশে। ইচ্ছে ক'রেই মথুরাটা প্রোগ্রামে ধরে রেখেছিলুম এবং মথুরাটাই সবশেষে সেরে ওখান থেকে সটান—সেও এক সন্ধ্যায়—গিয়ে হাজির হলুম দিদির ওখানে।

দেখলুম সব ঠিক তেমনই আছে। সেই কিরণবাবু তেমনি নিঃশব্দে ওঁর সহস্র খেজমৎ খেটে যাচ্ছেন আর যাবতীয় হিসেব-নিকেশের ঝামেলা বইছেন। ঊষা ও শোভারামের প্রণয়েও তখনও ভাঁটা শুরু হয় নি—তার প্রমাণ যেদিন পৌঁচেছি সেদিনই পেয়েছি। মায় ওদের কারও চেহারাতেও কোন পরিবর্তন হয় নি। মনে হ'ল যেন চার বছর নয়—চার-পাঁচ দিন মাত্র পরে এসেছি। সময় এখানে যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এগোতে পারে নি একটুও।

দিদি আমাকে দেখে খুব আনন্দ করলেন। বললেন, 'যাক, মনে ক'রে যে এসেছিস,

খুব ভাল লাগল। দ্যাখ্, ওপরের ছোট ঘরেই চলবে—না নিচের এই ঘরটায় থাকবি? বলি লায়েক হয়ে উঠেছিস নাকি খুব? বার্ডসাই চুরুট ধরেছিস? তাহলে ওপরে চলবে না। এমনি আমার অত মানমযোদার বিচার নেই, তবে গন্ধটা সয় না, হাঁপের মতো আসে। আমার জন্যে যার আমাদের কিরণবাবুকে অতদিনের হুঁকো খাবার অব্যেসটা ছেড়ে দিতে হ'ল।'

বললুম, 'না, না, সত্যিই আমার ওসব অব্যেস হয় নি। তবে এখন এক আধ কাপ চা খাই মধ্যে মধ্যে, না হ'লেও যে মাথাটাথা ধরবে এমন নয়। তোমার যখন হবে তখন যদি আমাকে এক কাপ দাও তাতেই খুশী।'

তারপর গলা নিচু করে প্রশ্ন করলুম, 'তা নিচের ঘর খালি কেন? তোমার রোজে কোথায়?'

দিদির সদা-প্রফুল্ল মুখে ঈষৎ একটু বিষাদের ছায়া পড়ল যেন। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে তিনিও তেমনিভাবে চুপিচুপি বললেন, 'আর কোথায়! অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়। অন্য কিছু হ'ল না তো সেই বুড়োর হাতেই দিয়েছিলুম। বুড়ো বটে তবে তেমন কি আর, ঐ তো রাধামাধব গোসাঁই এখনও ফি রাত্তিরে শিষ্যার সেবা নিতে যাচ্ছেন—নব্বুই বছর বয়স হয়ে গেল। অন্তত দু-পাঁচ বছর বাঁচবে খুব আশা ছিল। তা দিনকতকও গেল না, বড় জোর বোধহয় ছমাস হবে—বুড়োর বাড়াবাড়ি অসুখ হ'ল, চিকিচ্ছে করাতে আগ্রা চলে গেল। কী ভাগ্যি শিষ্যা বলে পরিচয় দিয়ে ছুঁড়িটাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তা রোজে সেবাও নাকি খুব করেছে। বুড়ো বলেছিল ভাল হয়ে উঠলে তোমার নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনে দেব—আর মথুরাতে বাড়ি কিনে সেখানেই আমিও থাকব। মলে সেই বাড়ি থাকবে আর এই টাকা। রোজের কপাল, অত চিকিচ্ছে অত সেবা—ভাল হ'ল না, ঐখানেই মরে গেল। নগদ হাজার দুই টাকা হাতে ছিল, সেটা নিয়ে আসতে পারলেও হ'ত, এখানে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে দিতে পারতুম—তা বুড়ো মরার খবর পেতেই ছেলে ও নাতিরা লাঠিসোঁটা নিয়ে গিয়ে হাজির। মড়া রইল পড়ে—আগে কোথায় কী আছে দাও। সব দিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসতে হ'ল আবার। কী ভাগ্যি এর মধ্যে বুড়ো একছড়া হার আর কগাছা চুড়ি ক'রিয়ে দিয়েছিল, সেটা আর কেড়ে নেয় নি। তা মনের ঘেন্নাতেই বোধহয় এদিকে আসে নি—সোজা সেইসব গহনা বেচে হরিদ্বার চলে গিয়েছিল। শুনেছি ঋষিকেশের দিকে কোথায় কোন আখড়ায় গেরুয়া নিয়ে মাতাজী হয়ে বসেছে—চাট্টি শিষ্য-যজমানও করেছে, একরকম ক'রে দিন গুজরান হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে আর আসেও নি, চিঠিপত্তরও দেয় নি। আবার এক কাপড়ে এসে উঠবে, আবার তো ঐ অবস্থা—তাতেই বোধহয় এদিকে আর আসেনি। ভালই করেছে অবশ্য, এ যাই হোক, এ জন্মের মতো একটা হিল্লে হয়ে গেল। খাওয়া-পরার দুঃখটা তো রইল না। উপরন্তু সত্যি-সত্যিই যদি ভগবানের নাম করে তো আখেরের কাজ হয়ে থাকল!'

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন দিদি।

স্মৃতিটাকে সামলে নেবার একটুখানি অবকাশ দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, ও কি তোমার কেউ হয়? সত্যি ক'রে বলো দিকি?'

দিদি একটু তিরস্কারের সুরে বললেন—'কেন, তা জেনে কি তোর চারটে হাত বেরোবে? না ওর এ জন্মের খাওয়া-পরার ভার নিবি! সব মানুষের পেটের খবর জানবার এত শখ কেন?'

অগত্যা চুপ ক'রে গেলুম। বুঝলুম খুব একটা ব্যথার স্থানে ঘা পড়েছে ওঁর। কে জানে সেই প্রথম জীবনের কোন দুঃসহ আঘাত—যা ওঁকে ওঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে জীবনসাধনা থেকে সরিয়ে এনেছে—তার সঙ্গেই কোন সম্পর্ক আছে কিনা ঐ মেয়েটার।...

রাত্রে যথারীতি আমাদের 'আফটার-ডিনার' মজলিশ বসল। দিদি বলেছিলেন অবশ্য, 'তেতে পুড়ে এসেছিস—এই গরমে দুপুরে ঘোরা—আজ না হয় সকাল সকাল শুয়ে পড়।' আমিই আপত্তি করলুম, 'রাত আর এমন কি, এখনও তো দশটাই বাজে নি। এ তো আর তোমার পরিক্রমা সেরে রাত সাড়ে দশটায় ফিরে পঙ্গতে বসা নয়। আজ তো সকাল ক'রেই খাওয়া হয়ে গেছে।'

দিদি অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন একটু।

'তা বটে। ওটা মনে ছিল না। বোস তা হ'লে। আমার জপ আজ অনেকটা সারা আছে—তবু অধিকন্তুতে দোষ নেই।'

সে-ই বারান্দাতে মুখোমুখি বসা। দিদি পা ছড়িয়ে বসে এক হাতে পায়ে হাত বুলোচ্ছেন আর এক হাতে মালা ঘুরছে।

আমি প্রথমেই ঐ কথাটা তুললুম, বন্যার সময়ের কথাটা, 'এত তো বুদ্ধির বড়াই করো, সেবার চিনতে তো পারলে না আমায়। আগেও দেখেছ, চেনাশোনাও হয়েছে।'

দিদি হেসে বললেন, 'খুব চিনেছি। তোকে কি আর চিনতে পেরেছিলুম, তা নয়। হরিনামের মালা রয়েছে হাতে, কেন মিছে কথা বলব।—তোর বাড়ির সব খবর শুনে, মার কথা শুনে আর বন্যের সময় মাকে নিয়ে এখানে এসেছিলি শুনে বুঝতে পেরেছিলুম যে তুই আমার সেই নতুন মাসির ছেলে। তখন বলি নি, দেখছিলুম তোর মনে পড়ে কিনা। ভেবেছিলুম যাবার আগে বলব, তা আর অত খেয়াল হয় নি।'

এর পর এটা-ওটা খুচরো কথা হ'ল। মা কেমন আছেন, দাদার বিয়ে হয়েছে কিনা। দাদা এখন কত মাইনে পান। আমি কি করছি, কত রোজগার—এইসব। আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দ্যাখ, সঞ্চয় করবি যা রোজগার করিস, যদি দশটা পয়সাও রোজগার করিস—কোন বাক্সের খাঁজে কি বিছানার তলায় নিদেন একটা পয়সা সরিয়ে রেখে দিস। জমানোর অভ্যেস ছেলেবেলা থেকে না হ'লে আর হয় না।

আমার কিন্তু এসব দিকে মন ছিল না, একাগ্র হয়ে ছিল একটি মাত্র প্রশ্নে, যে প্রশ্নটা গত চার-পাঁচ বছর ধরে মনে জমা হয়ে রয়েছে অসীম কৌতূহলে। একটু ফাঁক পেতেই তাই দুম্ ক'রে—একেবারে বিনা ভূমিকায় বলে বসলুম, 'আচ্ছা, তুমি নাকি খুব ভাল কীর্তন গাইতে পারো? কৈ, একবারও বলো নি তো!'

এই প্রথম দেখলুম দিদিকে বিচলিত হ'তে, মনের নিত্য-প্রশান্তিতে বিস্ময়ের ঢেউ এসে লাগতে। রাস্তায় এখনও সেই কেরোসিনের আলো, তার একটা অস্পষ্ট আভাস মাত্র মুখে এসে পড়েছে, তবু ওঁর চমকে ওঠাটা নজরে পড়ল। মনে হ'ল মুখটাও একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল।

উনি এতটা বিচলিত হবেন ভাবি নি। তাহলে কথাটা তুলতুমই না হয়ত। কষ্ট হ'ল ওঁর অবস্থা দেখে, লজ্জিতও হলুম। কিন্তু এখন আর উপায় কি? মা বলেন, 'হাতের পাশা আর মুখের কথা বেরিয়ে গেলে ফেরানো যায় না।' শুধু মনে মনে ভাবতে লাগলুম, উনি একেবারেই চুপ ক'রে যান তো বাঁচি—যদি কোন কথাই না তোলেন আর তো আমিও তুলব না।

কিন্তু চুপ ক'রে ঠিক গেলেন না দিদি। ঐ পথের আলোটার দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে নিঃশব্দে বসে খানিকটা মালা জপ করলেন, তারপর খুব আশ্চর্য রকম সহজ কণ্ঠে বললেন, 'কেন বল্ দিকি? কে বললে তোকে?'

অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি, এখন আর ফেরা যায় না। ফিরতে চাইও না খুব। তাই সোজাসুজিই বললুম, 'আমার এক পিসেমশাই, তিনি চেনেন তোমাকে। এখানেও তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল।'

'কে বল তো? কোথায় থাকতেন? কী করেন? কী নাম তাঁর?'

নাম ঠিকানা সবই বললুম। পরিচয়ও। নেহাৎ কেওকেটা নন তিনি, এককালে কলকাতার বনেদী কায়স্থ সমাজে ওঁদের পরিবারের খুব নাম ছিল। কিন্তু দিদি ঠিক মনে করতে পারলেন না। বললেন, 'কে জানে, মনে পড়ছে না। কত লোকের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়েছিল সে সময়। এ নামের তিন-চারজনকে চিনতুম। তবে হ্যাঁ, শোভাবাজারের এক ঘোষেদের বাড়িতে গিয়েছিলুম মনে হচ্ছে, এক ভদ্দরলোকের মায়ের শ্রাদ্ধে মুজরো করতে। তারপর সে ভদ্দরলোক দিনকতক নেওটাপানা করবারও চেষ্টা করেছিলেন— কারণে অকারণে আসতেন। তারপর সুবিধে হবে না বুঝে সরে পড়েছিলেন আবার। তবে সে হ'লও তো অনেক দিনের কথা, ঠিক মনে নেই নামধাম অত। কাশীবাস করে এখন বললি? তা ওসব লোকের বুড়ো বয়সে ধম্মে মতি হয় খুব।'...

বলে হাসলেন একটু। সেই আগেকার হাসি। তার মানে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

আবারও কিছুক্ষণ বসে নিঃশব্দে জপ করলেন দিদি, তারপর হঠাৎ আমার মৌলিক প্রশ্নে ফিরে গিয়ে উত্তর দিলেন, 'যা শুনেছিস কিছু ভুল শুনিস নি। এককালে কীর্তনে নাম ছিল আমার। টাকাও মোটা কামিয়েছি। ও লাইনে থাকলে কলকেতায় চার-পাঁচখানা বাড়ি ক'রে ফেলতে পারতুম। গাড়ি-ঘোড়া চেপে বেড়াতুম আজ!'

'তা ছাড়লে কেন তাহ'লে? গলা খারাপ হয়ে গিয়েছিল?...না কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল?'

'বালাই ষাট। অসুখ-বিসুখ আমার শত্তুরের করুক। আর গলার কথা বলছিস? বলতে নেই, এতদিনের অনব্যেস তো—এখনও যদি গান ধরি সাত পাড়ার লোক জড়ো হবে। অহঙ্কার করতে নেই, অহঙ্কার করছি না, যা সত্যি তাই বলছি।...মধ্যে মধ্যে যখন কেউ কোত্থাও থাকে না তখন এক-আধ দিন গুনগুন ক'রে গান শোনাই আমার কুঞ্জের মালিককে—দেখি সুর এখনও আমার গলায় যথেষ্ট আছে। তা কি আর কুঁড়ি বছর বয়সের গলা এই সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে থাকবে? তা নয়, তবে গলার জন্যে গান ছাড়ি নি—এমনিই ছেড়েছি!'

'তবে কেন ছাড়লে?...অমন একটা সাধনার জিনিস। কত লোকে চিরজীবন মাথা কুটছে—একটু নাম করতে পারে না। এত নাম এত প্রতিষ্ঠা হবার পর কেউ ছাড়ে? কী হয়েছিল তোমার?'

আবারও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর কেমন যেন এক রকমের গাঢ়—ঈষৎ বিকৃত গলায় বললেন, 'সে অনেক কথা, সে আর তোকে কত বলব। সে-সব কথা আলোচনা করতে ভালও লাগে না। যা ভুলেছি তা ভুলে থাকাই ভাল। ওসব আর মনে করতে চাই না।'

বলতে বলতেই একেবারে উঠে দাঁড়ালেন দিদি। হরিনামের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'যা শুয়ে পড়গে যা। রাত ঢের হয়েছে। আমিও শোব এবার, শরীরটা খারাপ লাগছে।'

ঘুরে ঘরে ঢোকবার সময় একবার রাস্তার আলোটা মুখের ওপর এসে পড়ল। হঠাৎ মনে হ'ল যেন চোখ দুটো বেশী চক্ চক্ করছে তাঁর। এ কি চোখের জল? তাই কি গলাটা অন্যরকম শোনাচ্ছিল? এই চোখের জল ঢাকতেই কি এত তাড়াতাড়ি আমাদের রাতের মজলিশ ভেঙে উঠে পড়লেন?...

বিষম অনুতাপ হ'তে লাগল। কেন যে তুলতে গেলুম কথাটা, না তুললেই হ'ত। কীই বা লাভ হ'ল। মিছিমিছি বুড়ো মানুষটার মনে কষ্ট দেওয়া, ছি ছি!

ক্লান্ত হয়েছিলুম ঠিকই। প্রচণ্ড রোদে, লুয়ের মতো গরম হাওয়ায় ঘুরেছি সারাদিন, মথুরা থেকে এতটা এসেওছি টাঙ্গায়—ঐ হাওয়ার মধ্যে দিয়েই। এখানে এসে মাথায়

ঠাণ্ডা জল পড়া থেকেই যেন শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে আসছিল ঘুমে। কিন্তু এখন শুয়ে আর ঘুম আসতে চাইল না। বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ ছট্ফট করতে লাগলুম। কী এমন গোলমাল হয়ে গেল দিদির মনে? আমার ঐ সহজ স্বাভাবিক প্রশ্নটা তাঁর অন্তরাবেগের কোন্ তন্ত্রীতে এমন আঘাত করল? কোন্ বিস্মৃত বেদনার মুখের চাপাটা সরিয়ে দিল—যাতে এতটা বিচলিত হলেন তিনি! চোখের জল আসে এমন কি ঘটনা ঘটতে পারে তাঁর জীবনে? কোন প্রিয়জনের মৃত্যু—দয়িত বিরহ,—না অন্য কিছু, আরও গূঢ়, আরও মর্মন্তুদ?

কিছুই বুঝতে পারলুম না। এ দেখি কৌতূহল মেটাতে গিয়ে কৌতূহল বেড়েই গেল আরও। মাঝখান থেকে একটা সদাপ্রফুল্ল মানুষের চোখে জল বার ক'রে দিলুম শুধু। যতদূর মনে হচ্ছে দিদিও ঘুমোন নি, তাহলে নিঃশ্বাসের শব্দটা আরও জোর হ'ত। নাক ডাকে না ওঁর কিন্তু নিঃশ্বাসের শব্দটা খুব ভারী হয়ে আসে ঘুমোলে। নাক ডাকে সামান্য কিরণবাবুরই, আজ তাও শোনা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব তিনিও জেগে আছেন।

মহা অপরাধী বোধ করতে লাগলুম নিজেকে। এঁদের শান্ত নিয়মবন্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনে কী অশান্তির আলোড়ন না সৃষ্টি করলুম!

পরের দিন সকালে অবশ্য আর দিদির কথাবার্তায় আগের দিনের সেই আবেগের বিন্দু-বাষ্পও টের পাওয়া গেল না। ঠিক প্রতিদিনের মতোই প্রসন্ন ও নিরুদ্বিগ্ন তিনি। শুধু চোখের কোণে সামান্য একটু কালিমা ও দৃষ্টিতে ঈষৎ ক্লান্তির ভাব—এইটুকুতেই বোঝা যেতে লাগল যে রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হয় নি। তাও তাঁর অতি গৌরবর্ণের জন্যেই ঐ কালোটুকু ধরা পড়েছিল—নইলে সেও এমন কিছু নয়।

সেদিনটা বাদ দিয়ে পরের দিন দুপুরের দিকে আবার চেপে ধরলুম, 'একটা কথা বলব দিদি?'

'কি আবার?' কেমন একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন দিদি, দৃষ্টিও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

'তুমি তো সেদিন বললে, তোমার ঠাকুরকে এখনও মধ্যে মধ্যে এক-আধখানা গান শোনাও। আজ আরতির পর গাইবে একখানা গান?'

'মর ছোঁড়া! যা গোবিন্দকে শোনাই তা তোকে শোনাতে যাবো কী দুঃখে! বললুম না সেদিন যে কেউ যখন থাকে না তখনই শুধু গাই!'

বললেন বটে—তবে দেখলুম যে গলার আওয়াজে খুব একটা প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ পেল না। মানে আপত্তিটা খুব শক্ত বনেদের নয়। আমি আরও জোর ক'রে চেপে ধরলুম, 'দোহাই দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—একখানা পদ অন্তত শোনাও আজ!'

'দূর পাগল! এই বয়সে, গলা দিনরাত শ্লেষ্মায় ঘড় ঘড় করে—এতদিনের অনভ্যেস—এখন কি গান শুনবি! তা ছাড়া খোল নেই দোহার নেই—কীর্তন কি গাইলেই হ'ল! ঠাকুরকে যেমন তেমন ক'রে শোনানো যায়—প্রাণের আবেগে বেসুরো বেতালা যা শোনাই তাই তাঁর ভাল। তোদের শুনলে ঘেন্না হয়ে যাবে, ভাববি এই রকমই বুঝি শিক্ষা আমার, এই গানের আবার এত বড়াই।'

বুঝলুম ব্যথাটা কোথায়। শিল্পীর এ চেহারা চিনি। আমি আরও শক্ত ক'রে চেপে ধরলুম, 'ওসব বাজে কথা শুনছি না। যেমন ঠাকুরকে শোনাও তেমনি শুনিও—দোহার-টোহার বাজে কথা। না, আমি আজ ছাড়ব না, আমাকে শোনাতেই হবে আজ।'

আরও কিছুক্ষণ 'না' 'না' ক'রে রাজী হয়ে গেলেন। তবে বললেন, 'যদি বাইরের লোক কেউ এসে পড়ে আমি কিন্তু আর গাইব না। তখন যেন তাদের সামনে আমাকে

ব্যাভ্রমে ফেলিস নি!'

তাই সই। বাইরের লোক তো আসে কালেভদ্রে। আর সে আজ না হয় কাল হবে। রাজী যখন হয়েছেন একবার, তখন আর ভয় কি?

ভাগ্যক্রমে সেদিন কেউ আর ঢুকল না আরতির সময়। আরতির পর বাইরের আলোটা কমিয়ে দেওয়া হ'ল। ঠাকুরঘরে যা প্রদীপের আলো জ্বলছে মিটমিট ক'রে, তা বাইরে থেকে লোক আকর্ষণ করার মতো নয়। কিরণবাবু আরতির পরই উঠে চলে যান, আজও গেলেন। শোভারাম গেল তার অদ্বিতীয় টেক্‌রা বানাতে। শ্রোতার মধ্যে আমি আর ঊষা।

একটু গুনগুন ক'রে নিয়ে শেষ অবধি অপেক্ষাকৃত গলা ছেড়েই গান ধরলেন দিদি।

"চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি সে কত সুধা দিয়া॥..."

বড় আসরের মতো উদাত্তকণ্ঠে নয়—তবে বেশ মাঝারি মজলিশের মতো ক'রেই। কিন্তু সে হোক—প্রথম কলি ধরতেই আমি চমকে উঠলুম। এ কী, ঠিক এতটা তো আমি আশা করি নি। মেয়েদের গলায় কীর্তন আমার কোনদিনই খুব ভালো লাগে না কিন্তু, এমনি কীর্তনের খুব ভক্ত আমি। প্রখ্যাত গাইয়ে রামকমল, গণেশ দাস কোকিলকণ্ঠ—এঁদের কীর্তন আমি শুনেছি। পুরীতে জটেবাবার মঠে রেবতীবাবুর গানও শুনেছি। মোটামুটি এ গানের বিজ্ঞানাংশটা কিছু বুঝি। এ যে অপূর্ব জিনিস! গলা অবশ্য সত্যিই একটু ভাঙা ভাঙা লাগছে, শ্লেষ্মায় চেপে আছে যেন, চড়ার সময়গুলো খুব অবলীলায় চড়াতে পারছেন না, দমও সহজে ফুরিয়ে যাচ্ছে—তবু এখনও যা গলায় আছে অবশিষ্ট শক্তি—তা অপূর্ব। এমন মিষ্টি কীর্তন বা মিষ্টি গান মনে হ'ল বহুকাল শুনি নি।

গান শেষ হতে সেই কথাই বললুম, 'কী বলছেন দিদি, এখনও যা আছে আপনার পুঁজি, দরবার জিতে আসতে পারেন অনায়াসে।'

'যা যা, খোশামুদে রামপেসাদে কোথাকার! আমাকে নাচিয়ে মজা দেখতে চাও, না? তারপর আড়ালে গোঁফ ফুলিয়ে হাসবি। বলবি কেমন বাঁদরনাচ নাচালুম বুড়ীকে?'

আমার অভিভূত ভাবটা তখনও কাটে নি। আমি ঝোঁকের মাথায় এক কাণ্ড ক'রে বসলুম; একেবারে ওঁর একটা পায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'এই আপনাকে ছুঁয়ে সত্যি বলছি দিদি, এমন কীর্তন বহুদিন শুনি নি।'

'এই দ্যাখো পাগল কোথাকার। কী কাপড়ে ছুঁয়ে দিলি, সেই তো সকালের ভাত-খেগো কাপড় ছাড়িস নি। এখনও সন্ধ্যের আহ্নিক পুজো অদ্ধেক বাকী যে রে!'

মুখে বললেন বটে কথাগুলো, কিন্তু দেখলুম আনন্দে গর্বে তৃপ্তিতে তাঁর চোখে জল এসে গেছে। একটু থেমে গাঢ় স্বরে বললেন, 'বড় অসময়ে এলি ভাই, আর বিশটা বছর আগেও যদি আসতিস, তোর যে-কোনও পুরুষ কীর্তন-গাইয়ের সঙ্গে বাজী লড়ে গান শোনাতে পারতুম। আর এখন গোবিন্দ সব কেড়ে নিচ্ছেন একে একে—গলাও তো বারো আনা নিয়েই নিয়েছেন, আর এখন কি শোনাবো বল।'

বলতে বলতে—আজ প্রকাশ্যেই তাঁর চোখে জল এসে গেল। আমি কথাটা চাপা দিয়ে বললুম, 'ওসব কথা থাক দিদি, যখন শুরু করেছ তখন আর দু'একখানা গাও, আমি শুনি—'

বোধহয় এতকাল পরে এক তরুণ শ্রোতার মুখে এই ধরনের প্রশংসায় আর অনুরোধে, আন্তরিকতায় ও আগ্রহে—বহুদিনের বিস্মৃত অহঙ্কারে আত্মতৃপ্তির নেশা লাগে। তিনি চোখের জল মুছে একটুখানি সামলে নিয়ে আবার গান ধরলেন। পর পর কয়েকখানাই

গাইলেন তিনি—রীতিমতো আখর দিয়ে, বেশ যত্ন ক'রেই। আখরও সাধারণ চলতি আখর নয়—দেখলুম আখর তৈরী করবারও ক্ষমতা রাখেন। ঊষাও তখন উঠে চলে গেছে—শ্রোতার মধ্যে আমি আর সামনে তাঁর ইষ্টবিগ্রহ—তাদের কাকে লক্ষ্য ক'রে এমন মনপ্রাণ ঢেলে শোনালেন তাঁর গান কে জানে, তবে অবহেলা করেন নি বা ফাঁকি দেন নি এটা ঠিক, শিক্ষারও অমর্যাদা করেন নি।...

সেই কথাই তুললুম রাত্রে খেতে বসে, 'দিদি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে আর একবার কলকাতায় চলুন, রেডিওর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই—বাংলাদেশের লোক-গুলো শুনুক কীর্তন কাকে বলে!'

'রেডিও!' দিদি যেন জ্বলে উঠলেন, 'বলিস নি, ওই এক পেঁশের যন্তর হয়েছে। গানের দফা রফা হয়ে গেল একেবারে। গলা বলতে কারুর আর থাকবে না কিছু—দশ বিশ বছর পরে। যন্তর ছাড়া কেউ দশটা লোককেও গান শোনাতে পারবে না। আমরা অমন পাঁচ হাজার লোকের আসরে গেয়েছি—ছুঁচ পড়লে শোনা যেত, এমন স্থির হয়ে সবাই শুনেছে। গলার জোরে তাদের বশ ক'রে রেখেছি। যত ভাল গানই হোক, সেটা কানে না পেঁছলে অত স্থির হয়ে শুনতে পারে? তা ছাড়া এ হ'ল সাধনার জিনিস, এত সস্তা করতে নেই। হেলাফেলায় শুনলে হেলাফেলার জিনিসই শুনতে হবে!'

॥ ৬ ॥

সেই দিনই আমাদের নৈশ মজলিশে ভরসা ক'রে কথাটা তুললুম। বললুম, 'দিদি, তোমার জীবনের কথা আমাকে কিছু কিছু বলো না, তোমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখি তাহলে!'

'উপন্যাস লিখবি? সে আবার কি?...ও, নবেলের কথা বলছিস? তুই লিখতে পারিস নাকি? বি-এটা পাসও করলি না, কতটুকু লেখাপড়া শিখেছিস যে লিখবি? তুই আবার লিখবি!...বঙ্কিম লিখেছে—সে বি-এ পাস ছিল, ডেপুটি ম্যাজেস্টার। তোরা কি লিখতে পারিস!

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। আমিও বেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই জবাব দিলুম, 'তোমরা সেকেলে লোক এক বঙ্কিমই দেখে রেখেছ, তাও তো তারও বি-এ পাস করার কথা নয়। পাস করিয়ে দিয়েছিল তাই। আর বি-এ পাস করলেই কি লেখক হয়—কত তো হুদো-হুদো বি-এ পাস করছে আজকাল—সবাই লেখক হচ্ছে? বরং ইস্কুল-কলেজে পড়ে নি বড় লেখক হয়েছে—এই তো বেশী। এই তো রবি ঠাকুরের জগৎজোড়া নাম, শরৎবাবুর বই যা বিক্রী হচ্ছে, বঙ্কিমবাবু তা ভাবতেই পারেন নি কখনও—এ'রা কে কটা পাস করেছেন? ও ইস্কুল-কলেজের লেখাপড়ার সঙ্গে বই লেখার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাই নাকি! কে জানে বাপু। আমাদের তো মনে হয় অনেক পাস-টাস না করলে বই লিখতে পারে না।...হ্যাঁ, রবি ঠাকুরের খুব নাম। আমাদের আমলেও ওঁর গান খুব চলত। আমিও শিখেছিলুম একখানা। গানের বইও পড়েছি। কিরণবাবুর ছেলে একবার একখানা সঙ্গে এনেছিল। বেশ ভাল ভাল গান ছিল তাতে, ভগবানের গান সব। রবি

ঠাকুর বি-এ পাস নয় তাহলে? হবে!'

তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা হ্যাঁ রে, সত্যি সত্যি লিখিস তুই? আজ অবধি কিছু লিখেছিস?'

'সে কি! কত লেখা বলে ছাপা হয়ে গেল। এই তো আমার সঙ্গেই একটা মাসিকপত্র রয়েছে দ্যাখো না—কত নাম-করা মাসিকপত্র। তাতে আমার লেখা রয়েছে—'

নিজের লেখা বেরিয়েছে দেখে আসার পথে এলাহাবাদ স্টেশনে একখানা মাসিক 'হিন্দুস্থান' কিনেছিলুম। তারা এক কপি বাড়িতে পাঠাবে ঠিকই—কিন্তু অত দিন অপেক্ষা করার ধৈর্য তখন ছিল না, নগদ পয়সা খরচ ক'রে কিনে নিয়েছিলুম। সেটা সঙ্গেই ছিল, বার ক'রে দেখালুম। উৎসাহের আধিক্যে টর্চটাই জেলে ধরলুম তার ওপর। চোখে চশমা এ'টে বুড়ি দেখলেনও সাবধানে নামটা মিলিয়ে—ঠিক আমারই নাম ছাপা আছে কিনা। তারপর চশমা খুলে আবার খাপে পুরতে পুরতে বললেন, 'এই ক'রে পয়সাগুলো ওড়াচ্ছিস—এই সব ছেপে ছেপে!...এখন কি তোর এই সব ক'রে বেড়াবার সময়, কোথায় সংসারে দু পয়সা দিবি, মার দুঃখ ঘোচাবি, না এই সব শখ ক'রে যথা-সর্বস্ব উড়িয়ে দিচ্ছিস!'

'এই নাও কাণ্ড!...এ আমি পয়সা খরচ ক'রে ছাপাব কেন—এ তো মাসিকপত্র, কাগজ—কত লোকের লেখা এতে ছাপা হয়। এ তাদের ব্যবসা, একজনের সম্পত্তি। এর মধ্যে আমি টাকা খরচ ক'রে ছাপাব কি। তারা পাঁচজনের লেখা বেছে বেছে ছাপায়।'

'ও তাই নাকি? এ রকমও হয় বুঝি?' দিদি অবাক হয়ে যান যেন।

'কেন, তোমাদের বঙ্কিমেরও তো বঙ্গদর্শন কাগজ ছিল। তাতে কত লেখকের লেখা ছাপা হ'ত!'

'কে জানে বাপু, অতশত জানি না। পড়লুমই বা কবে কি, দেখলুম বা কবে!...তা এরা খরচাপাতি না নিয়ে এমনি ছাপে?'

'উল্টে টাকা দেয়। যাদের লেখা ছাপে তাদের অনেককে টাকা দিতে হয়।'

'যাঃ যাঃ। টাকা দিয়ে আবার লেখা ছাপাবে। খেয়েদেয়ে কাজ নেই তাদের।'

বেশ বেগ পেতে হ'ল বুড়িকে কথাটা বোঝাতে। তখন অবশ্য এখনকার মতো এত টাকা দেওয়ার চল হয় নি—তবু দু-একটা লেখাতে তখনই পাঁচ-সাত টাকা পেতে শুরু করেছি। এই যে লেখাটা ছাপা হয়েছে, এর জন্যেও ছটা টাকা পাব। সেই কথাই বললুম। সবাই যে টাকা দেয় তা নয়—বা সব লেখককে দেয় তাও নয়, তবে এখন অনেক কাগজই দিচ্ছে, অনেককেই দিচ্ছে; দু-একটা দৈনিক কাগজ তার মধ্যে—সব লেখার জন্যেই টাকা দিচ্ছে নাকি। এমন কি কবিতা লিখেও পাচ্ছে কেউ কেউ।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে ডাগর চোখ দিদির আরও বড় বড় হয়ে উঠল। কিন্তু তবুও সন্দেহটা ঠিক যেতে চায় না যেন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যাচাই করেন কথাগুলো।

আমি টাকার প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়লুম। বললুম, 'এই এবার আসতে আসতে পথেই একটা গল্প লিখেছি—শুনবে?'

'কৈ, কি লিখেছিস, শোনা দিকি!'

আমার তখন নবীন উৎসাহ। তখনই ঘরের দেওয়াল থেকে আলোটা পেড়ে এনে গল্প শোনালুম। বেশ মন দিয়েই শুনলেন দিদি। তারপর বললেন, 'মন্দ লিখিস নি তো। এসব মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছিস?'

'লিখেছি বৈ কি। বানিয়ে লিখি নি তো কি টুকে লিখেছি!'

'এই কাগজটাও থাক। কাল দুপুরবেলা বসে পড়ব।'

পড়লেনও পরের দিন ঠিক মনে ক'রে। আমারটাই শুধু নয়—উল্টে-পাল্টে আরও দু-একটা লেখা পড়ে কাগজখানা আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'না, তোর লেখার হাত

আছে। তুই লিখতে পারবি। বেশ লিখেছিস। তোর উন্নতি হবে। লেখা ছাড়িস নি।'

সে মওকা আর ছাড়লুম না। বললুম, 'তাহলে আমার আর্জি মঞ্জুর তো?'

'কিসের আবার আর্জি তোর?' যেন চমকে উঠলেন, কিন্তু মুখ দেখে বুঝলুম যে আর্জিটার কথা তাঁর মনে আছে। আমি বললুম, 'সেই যে তোমার জীবনের গল্প বলবে!'

'যাঃ, কারুর জীবন নিয়ে আবার উপন্যাসও লেখা হয় নাকি? সে তো জীবনী হবে!'

'না, উপন্যাসও হয়। ঠিক যা যা ঘটেছিল তাই তাই লিখলে কি আর হয়—একটু আধটু বানিয়ে, কিছু বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে লিখতে হয়। সে ধরো জীবনীতেও কি আর তা করা হয় না? জীবনীতেই কি কেউ ষোল আনা সত্যি লেখে, নিজের জীবনী নিজে লিখলেও সাধারণত সব কথা বলে না, মিথ্যে না লিখুক সত্যিটা চেপে যায়। অস্বাভাবিক বলেই টলস্টয়ের আত্মজীবনীর এত নাম দুনিয়ায়—তিনি নিজের দোষ বা লজ্জার কথা কিছু গোপন করেন নি।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন দিদি। বললেন, 'বলছিস বলতে? তা বলতে পারি, এমন কোন খারাপ কাজ করি নি—গোবিন্দ জানেন—যা বলতে লজ্জা করবে। যদি তোর সত্যিই কোন কাজে লাগে তো বলতে পারি। তবে আমার মুখ থেকে ছাড়া এসব কথা কারও শোনবার কথা নয়—কাজেই ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পেলেও লোকে বুঝবে আমি বা আমরা বলেছি। আমি কি কিরণবাবু বেঁচে থাকতে তুই এ নিয়ে বই লিখতে পাবি না। বল—কথা দে ভগবানের নাম ক'রে—তাহলে বলব।'

দিদির কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে ও দৃঢ়তায় বেশ একটু অবাক হয়ে গেলুম। দিদি যেন একটা বরই দিতে চাইছেন আমাকে, এমনি ভাব তাঁর। কোন অতি মূল্যবান বস্তু যেন। সেকালে দেবতারা যেমন তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ঈপ্সিত অস্ত্র দিতে এসেও শর্ত করিয়ে নিতেন—তেমনি কথার ভাব তাঁর। অবশ্য পরে বুঝলুম এইটেই স্বাভাবিক। আমি বলেছি হঠাৎ, খেয়ালের বশে—কিন্তু মনে ছিল না যে দিদির কাছে এটা খেয়ালের কথা নয়—এটা তাঁর জীবনের কথা, তাঁর কাছে অত্যন্ত সিরিয়াস জিনিস। জীবন সকলের কাছেই মূল্যবান ও প্রিয়, জীবন-কাহিনীও তাই।

আমি বললুম, 'কিন্তু তাহলে—কী লিখেছি কেমন লিখেছি তা তো আর পড়ে যেতে পারবে না!'

'তা হোক। সে আমার পড়বার দরকার নেই। যত বড় লিখিয়েই হোস তুই, ভগবানের চেয়ে তো আর বড় নোস। তিনি যা লিখেছেন যা লিখে যাচ্ছেন নিত্য মানুষের কপালে—তার চেয়ে ভাল আর কি লিখবি? আমার জীবনে যা ঘটেছে সে তাঁর লেখা গল্প—তাকে কি আর তুই ছাপিয়ে উঠতে পারিস?...তা নয়—তুই লিখবি সেই তোর বড় কথা, যদি ভাল লিখতে পারিস দেশের লোকের কাছে বাহবা পাবি, তাতেই তোর লেখার দাম উশুল হবে। আমাদের বুড়ো-বুড়ির নিন্দে-সুখ্যেতে কি এসে যাবে? তাছাড়া হাজার হোক আমাদের জীবনের কথা—মিথ্যে ক'রে কি বানিয়ে ঘুরিয়ে লিখলে আমাদের মন খারাপ হ'তে বাধ্য। কী দরকার? শুনে রাখ এখন—যদি মনে করিস এতে তোর কাজ চলবে তাহলে মনে ক'রে রাখিস, আমরা আর কদিন—আমরা ম'লে ভাল ক'রে গুছিয়ে সাজিয়ে লিখিস, সেই ভাল হবে। এখন টাটকা টাটকা লিখতে বসা ভালও নয়, এখন যা শুনবি, আগড়ুম-বাগড়ুম কত কি বকব—আমার কাছে আমার সব কথারই দাম বেশী তো—সদ্য সদ্য লিখলে তুইও সেই সব বিস্তর বাজে কথা লিখবি। বরং অনেক দিন পরে লিখলে জঞ্জাল সব আপনি বাদ পড়ে যাবে, চুম্বুকটুকু বেছে নিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারবি।'

দিদি লেখক নন—কিন্তু তাঁর সহজ বুদ্ধি থেকে যা বললেন, শুনে চমকে উঠলুম। সত্যিই তো, সদ্য শোনা কোন কাহিনী তখনই লিখতে বসতে নেই, তাতে ফোটোই হয়—ছবি হয়ে উঠতে পারে না। এ তো এর আগেও, আরও বহু প্রবীণ লেখক বা সমালো-

চকের লেখায় পড়েছি, শুনেওছি ইতিমধ্যে কারও কারও মুখে।

বললুম, 'তোমার যা জ্ঞান দেখছি—তুমি চেষ্টা করলে নিজেও লেখক হ'তে পারতে। কাজেই বাজে কথা বিশেষ বলবে না তা জানি। তবু তোমাকে কথাই দিলুম, তুমি বেঁচে থাকতে লিখব না, লিখলেও ছাপাব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

খুশী হলেন দিদি। বললেন, 'বেশ, কাল থেকে শুনিস তাই।...কী বা ছিরির জীবন—তার আবার গল্প। তবে তোর যদি কোন উপকারে লাগে তো লাগুক। দিন তো ফুরিয়েই এসেছে, কিরণবাবুরও তাই, আমাদের লজ্জা, আমাদের দায়দায়িত্ব আমাদের সঙ্গেই শেষ হবে। তার পরের ভাবনা আর নেই। লজ্জাহারী মধুসূদনের কাছে গিয়ে একবার পেঁছিতে পারলেই হ'ল। গোবিন্দ গোবিন্দ!'

পরের দিন থেকে বললেনও ঠিক—একটু একটু ক'রে। তিন-চার দিন সময় লাগল প্রায়। রাত্রে খাওয়ার পর যেমন বসতুম তেমনিই বসে এক-একদিন রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত চলত গল্প। যেটা তাঁর বলতে বাদ পড়ে যাচ্ছে বলে সন্দেহ হ'ত সেটা জিজ্ঞাসা ক'রে জেরা ক'রে জেনে নিতুম। তাতে রাগ করতেন না দিদি। গোপন করারও চেষ্টা করতেন না। অতি সহজেই বলে যেতেন। আমার এবং তাঁর বয়সের বিপুল ব্যবধানও যে বিশেষ মনে থাকত তাঁর তা বোধ হ'ত না—এমন সব কথাই অনায়াসে বলে যেতেন।

যেভাবে নিতান্ত সহজে বলে গেলেন—তাতে রীতিমতো বিস্মিত হবারই কথা। কোন প্রায়-নিরক্ষর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যে এমনভাবে সাধারণ নারীসুলভ সঙ্কোচ, অহঙ্কার বা আত্মপ্রচার ও নিজেকে নিয়ে নাটক করার প্রবৃত্তি দমন করতে পারে তা প্রত্যক্ষ দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত। শুধু তিনিও যে মানুষ তার প্রমাণ পেলুম একেবারে শেষে—যখন ইতিহাসটা বর্তমান কাল পর্যন্ত টেনে কাহিনী শেষ করলেন। ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে কেমন যেন ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করলেন, 'কী রকম শুনলি, হ্যাঁ রে—? এতে তোর কাজ চলবে? এ থেকে নভেল দাঁড়াবে একটা?'

কেমন যেন করুণ অনুনয়ের মতো শোনাল প্রশ্নটা। মনে হ'ল যেন ইতিমধ্যে, এই কদিনেই অনেকখানি একটা আশা মনে মনে গড়ে উঠেছে তাঁর, অনেক বড় একটা কল্পনার সৌধ গড়ে তুলেছেন—নিজের জীবনের মূল্য সম্বন্ধে। পাছে সে সৌধ ভেঙে দিতে হয়, পাছে সে আশা খান খান হয়ে পড়ে যায়—সেই উদ্বেগ তাঁর, সেই উৎকণ্ঠা। আমার উত্তরের ওপর আমার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন তাঁর সেই অতি-বড় আশার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে, সেই জন্যেই এমন মিনতির মতো বেরিয়ে এসেছে প্রশ্নটা—অর্থাৎ সত্যটা যদি অন্য রকম হয়ও সেটা যেন না বলি আমি, মিথ্যা ক'রেও আশ্বাস দিই একটা।

অবশ্য মিথ্যার আশ্রয় নেবার দরকার হ'ল না এক্ষেত্রে, সেই কথাই বললুম, 'কী বলছেন আপনি—এ তো অমূল্য রত্ন একেবারে, বরং বলা উচিত রত্নের খনি। আমার তো এখনই কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেতে ইচ্ছে করছে, এই রাত্তিরেই। হাত নিসপিস করছে—'

'যাঃ, স্তোক দিচ্ছিস আমাকে। বুড়িকে নিয়ে মস্করা করছিস। এ ছাই আবার কী গল্প হবে—'

বললেন, কিন্তু ছেলেমানুষের মতোই খুশী হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে খুশি উপচে পড়ল তাঁর গলাতেও। তবে সেই সঙ্গে সংশয়টুকুও যেন একেবারে কাটতে চায় না। আনন্দ করার কারণটা বালুভিত্তিক কিনা সেই সংশয়।

আমি বললুম, 'না দিদি, সত্যিই বলছি, স্তোক নয়। বলো তো খানিকটা লিখে শুনিয়ে যাই যাওয়ার আগে।'

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন দিদি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

না না। যা বলেছিস তা যেন ঠিক থাকে। আমরা ম'লে লিখিস। নিশ্চিন্ত হয়ে লিখিস তখন—ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে—যা খুশি।...দেখতেও আসব না—তার কথাও নেই।'

দিদি খুশী হ'লেও তাঁর সঙ্গী ও অবলম্বনটি খুশী হতে পারেন নি। কিরণবাবু এমনিতেই স্বল্পবাক, এ কদিনে যেন আরও গুটিয়ে গেছেন নিজের মধ্যে। একটি কথাও বলতে শুনি নি তাঁকে। তবে দিদির কথাগুলো যে শুনতেন শুয়ে শুয়ে—তা টের পেতুম। বাধা দিতে পারতেন না, কারণ দিদির ওপর কোন জোরই খাটত না তাঁর। কারুর কথা শোনবারই মানুষ নন দিদি। কিন্তু কিরণবাবুর ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হয় নি, সামান্য দুদিনের পরিচিত এক চ্যাংড়ার কাছে তাঁদের অন্তরতম রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত করাটা। তিনি যে কী পরিমাণ লজ্জাবোধ করছেন তা বোঝার কোন অসুবিধাও ছিল না। যখন থেকে কাহিনীর মধ্যে তাঁর কথা এল তখন থেকে আর আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাওয়াই বন্ধ ক'রে দিলেন। আর সে লজ্জা একেবারে অকারণও তো নয়। তাঁর এই স্বেচ্ছাবন্ধ অসহায় অবস্থা দেখে মায়া হ'তে লাগল তাঁর জন্যে। দিদি যে কেন কিরণ-বাবুরও জীবদ্দশায় এ গল্প লিখতে নিষেধ করেছিলেন—তাও বুঝতে পারলুম।

আরও কতকটা কিরণবাবুর জন্যেই—বেশী দিন রইলুম না আর। কেটেও গেল অনেক দিন। এত দিন থাকাও বোধহয় উচিত হয় নি। কাজকর্ম আছে, যাদের কাজে এবং পয়সায় এসেছি, তারা দিন গুনছে আমার যাওয়ার। কী রকম কি কাজকর্ম হ'ল তা তাদের জানা দরকারও। দিদি অবশ্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন আর কটা দিন থাকার জন্যে —তাঁকে ঐ কাজের দোহাইটাই দিলুম। ওটাই ভাল বোঝেন তিনি, বার বার বললেন, 'রোজগারের জায়গায় ফাঁকি দিতে নেই—হতভাগার লক্ষণ ওসব। লক্ষ্মী যেমন সতীন সন না, তেমনি সেবাতে ফাঁকিও সহ্য করেন না।'

এবারও বললেন, 'না, যার যা ভাত-ভিক্ষে তাতে তার এলাকাঁড়ি দেওয়া ঠিক নয়। সে রকম বুঝিস তো যা, কাজের ক্ষতি ক'রে আটকে রাখব না। তবে আবার আসিস ফাঁক পেলেই।'

চলে এলুম পরের দিনই। আসবার সময় পাঁচটা টাকা দিতে গেলুম ঠাকুরের প্রণামী বলে, দিদি নিলেন না। তখনকার দিনে, বিশেষত ওদেশে, পাঁচ টাকা খুব কম ছিল না, মাসে সাড়ে তিন টাকা দিলে এক মাস ভোর প্রত্যহ কৃষ্ণচন্দ্রের একটা 'পারস'* পাওয়া যেত, একটা লোকের দুবেলার রাজভোগ খাওয়া। অন্য ছোট মন্দিরের তো কথাই নেই, আড়াই টাকা তিন টাকাতেই এক মাসের প্রসাদ মিলত। দিদিও তা জানেন, তাঁর মুখেই তো শুনেছি এসব—তবুও নিলেন না। বললেন, 'তোকে দেখে কেবলই আমার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, হতভাগা ভাইটা। তোর কাছ থেকে আর খোরাকীর টাকা নেব না।'

আমি বললুম, 'একে খোরাকী বলছ কেন দিদি, এ তো প্রণামী, কুঞ্জ-স্বামীর পাওনা এটা।'

দিদি বললেন, 'ঠাকুরের পাওনা টাকায় শোধ হয় না পাগল, ও একটা ধাপ্পাবাজী কথা। ব্যবসা করি আমরা। তা তোর সঙ্গে আর না-ই করলুম।...কোনদিন যদি গুঁর সেবা আটকে যায় টাকার জন্যে—তোকে চিঠি দেবো—তখন যা পারিস পাঠাস।'

তারপর বললেন, 'ঠাকুরের পাওনা ভক্তি ভালবাসা, তা কি কেউ দিতে পারে? মিথ্যে সব বুজরুকি ফেঁদে বসে থাকা—আর নিজের মিথ্যের জালে নিজে জড়ানো। গোবিন্দ গোবিন্দ!'...

* একজনের একবেলাকার খাওয়ার মতো প্রসাদ।

সেই যে চলে এসেছিলুম তারপর আর অনেক কাল ওদিকে যাই নি। একেবারে যখন যাওয়ার সুযোগ ঘটল তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ জীবনযাত্রার সমস্ত ক্ষেত্রেই তার কামড় দিতে শুরু করেছে। যাদের বাঁধা আয় তাদের মুখ শুকিয়ে উঠেছে তখনই। দিদিকেও খুব চিন্তিত দেখলুম। দু বাড়িতেই ভাড়াটে বসিয়েছেন—তবু কুলোচ্ছে না। ঠাকুর-সেবার অনেক অঙ্গই বাদ দিতে হয়েছে। সবচেয়ে যেটায় বেশী লোভ দিদির—সে দুধও কমাতে বাধ্য হয়েছেন। এধারে আরও বুড়ো, আরও অপটু হয়ে পড়েছেন ওঁরা। তবে বেঁচে আছেন দুজনেই, এবং জরা বা বার্ধক্য ছাড়া কোন বিশেষ রোগও নেই তাঁদের।

এবারে প্রণামীর টাকা আর ফিরিয়ে দিলেন না, বেশ সহজেই হাত পেতে নিলেন। একটু হেসে বললেন, 'আরও থাকে তো দিয়ে যেতে পারিস, না বলব না। যা দিনকাল পড়েছে—তাতে শেষ পর্যন্ত প্রসাদের হোটেল খুলে না বসতে হয়।'

তারপর আর বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নি। তবে খবর পেয়েছি মধ্যে মধ্যে। ১৯৫২ সালে একদল চেনা লোক গিয়েছিল, তাদের মুখে খবর পেলুম কিরণবাবু মারা গেছেন, সুরোদি বেঁচে আছেন তখনও। তারপর আর খবর পাই নি। কিরণবাবুর সঙ্গেই খবরের যোগ-সূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেছে, চিঠি লিখলে তিনিই যা এক-আধবার উত্তর দিতেন—কালেভদ্রে। দিদির ওসব আসে না কখনই। এখন তো কথাই নেই, আর লেখা সম্ভবও নয়। আশী পেরিয়ে গেছে, হয়ত নব্বুইও পেরোল।

খবর পাই নি বলেই অপেক্ষা করেছি আরও দীর্ঘকাল। এই এতদিন পর্যন্ত। তবে আর বোধহয় করার দরকার নেই। আশা করছি এতদিনে সুরোদি নিশ্চয় মারা গেছেন। এখন লিখলে আর কথার খেলাপ হবে না। তাই এবার ভরসা ক'রে শুরু করেছি তাঁর গল্পটা।

লিখতে বসে দেখছি সুরোদির অনুমানই ঠিক। বহু কথাই ভুলে গিয়েছি, শুধু কাঠামোটা মনে আছে মাত্র। মনে মনে যে একটা ছবি তৈরী হয়ে গিয়েছিল সে ছবিটারও মোটামুটি ছাপটা আছে, পিছনের ছোট ছোট কাজগুলো ঝাপ্সা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বহুকালের কথা—তখন কিছু লিখেও রাখি নি, বরাবরই ভেবেছি সব ঠিক মনে আছে। কখনও তো মনে মনে মেলাতে বসি নি।

আসল কথা এতকাল অপেক্ষা করতে হবে তাও ভাবি নি। সুরোদি যে এত দিন বাঁচবেন তা কে জানত। এরকম আশঙ্কা থাকলে নোট ক'রে রাখতুম। এখন অনেক কথাই ভুলে গেছি, হয়ত গোলমালও হয়ে যাবে কিছু কিছু। ঘটনা আগুপিছু হওয়া আশ্চর্য নয়। সময়ের হিসেবেও হয়ত ভুল হবে। তা হোক—আমি তো আর জীবনী লিখতে বসছি না—লিখছি উপন্যাস। আসলের সঙ্গে না মেলাই তো ভাল। আর, যেসব সত্যি-কারের মানুষ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী হয়ে এ বইতে দেখা দেবে—তারা বেঁচে নেই কেউই। প্রতিবিম্ব বিকৃত দেখলে আপত্তি করবে, অনুযোগ করবে সে সম্ভাবনা নেই। আর যদিই বা বেঁচে থাকত, হুবহু নিজের ছবিটা দেখলেই কি খুশী হ'ত তারা? কে জানে।...

শুধু দিদির জন্যেই ভাবনা। তাঁর ওপর না অবিচার করি, তাঁকে না আসল মানুষটার চেয়ে ছোট ক'রে ফেলি। জানি—তাতেও, তিনি অন্তত চটতেন না, বড়জোর সস্নেহ তিরস্কার করতেন একটু। কিম্বা শুধুই হাসতেন—স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। কিন্তু আমি যে তাঁর কাছে পেয়েছি ঢের, সে ঋণের অমর্যাদা হ'লে নিজের কাছেই লজ্জার শেষ থাকবে না যে।

তাই তো এত দুশ্চিন্তা।

॥ গ্রন্থারম্ভ ॥

॥ ১ ॥

শুক্রবার এলেই নিস্তারিণী সকাল থেকে গজ গজ শুরু করত, 'আর পারি না বাবা, এই নারুদে গুষ্টির ঝঞ্ঝাট বইতে। গতর পাত হয়ে গেল আমার। আর সাহ্য হয় না। মানুষের শরীল তো—আর কত সয়?'

সাধারণত ভবতারণ চক্রবর্তী এসব ছোট কথায় কান দিতেন না—নির্বিকার চিত্তে সকালের মুড়ি চিবিয়ে যেতেন অথবা জলপান শেষ ক'রে বাইরে যাবার ভূমিকা স্বরূপ বসে ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে তামাক টানতেন। কিন্তু এক-একদিন, খুব বাড়াবাড়ি হ'লে বলতেন, চেঁচামেচি না ক'রে বেশ সহজ গলাতেই বলতেন, 'মর মাগী, তোকে এ ঝঞ্ঝাট বইতে বলে কে? না বইলেই পারিস! নিজে ঘাড় পেতে নেবে আবার নেচেকুঁদে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে!'

'ব্যায়রাম! বুঝলে, মাথার ব্যায়রাম আমার—মাথায় পোকা আছে, কামড়ায়, তাই এ কাজ করতে হয়। আর মাথার ব্যায়রাম বলেই চেঁচিয়ে পাড়াও মাথায় করি। আমি পাগল, আমি ছন্ন।...বলি হল তো?...আমার হয়েছে যে বেস্তর জ্বালা। আরি জ্বালার ওপর জ্বালা, দেয় সে চিকন কালা। তোমার হতে আমার সবচেয়ে জ্বালা। তুমি যদি তেমন হ'তে, তাহলে কি আমাকে আজ এমন চেঁচাতে হয়, না মাথা খারাপ করতে হয়।'

আর ঘাঁটান না ভবতারণ চক্রবর্তী। আর ঘাঁটাতে সাহস হয় না তাঁর। নিঃশব্দে বসে ছিলিমটা শেষ ক'রে দাওয়া থেকে নেমে পথে গিয়ে দাঁড়ান। কারণ এর পর কি হবে তা তিনি জানেন। আরও মাথা গরম হলে জ্বালার কারণটা ইশারা-ইঙ্গিতে আবদ্ধ থাকবে না, সোজাসুজি স্পষ্ট বোধগম্য ভাষাতেই ব্যাখ্যাত হবে। আর হবে বেশ সরব উচ্চকণ্ঠেই। আশপাশের বাড়ির কারুরই প্রায় শুনতে বাকি থাকবে না সে ব্যাখ্যানা। সেটা আদৌ রুচিকর নয় ভবতারণের কাছে। এমনিতেই চেঁচামেচি ভাল লাগে না তাঁর, তার ওপর নিজের অকর্মণ্যতার কথাটা জগৎসুদ্ধ মানুষ শুনুক, এ আর কে চায়!

ভবতারণের অপদার্থতাই নিস্তারিণীর মাথা খারাপের আসল কারণ। দারিদ্র্য নয় —দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পায় না নিস্তারিণী, শুধু যদি এটা জানা থাকত যে একদিন এ অভাব ঘুচতে পারে, একদিন এ দুঃখের অবসান হতে পারে। বড়বাজারে ঘুরে দালালি করে নিস্তারিণীর মামাতো ভগ্নিপতি নীরদ ভটচাযও। ওর আপন দাদাও করত। এই ক'রেই নীরদ কোটা-বালাখানা ক'রে ফেলল। দাদা বেঁচে থাকলে আজ দোল-দুর্গোৎসব করত। তার সে দিল ছিল। নীরদ ভটচায জানে শুধু পয়সা জমাতে, পুঁজি ক'রে রাখতে। সে যাক গে, পয়সাটা রোজগার তো করেছে তারা মুঠো মুঠো, একজন তো এখনও করে। আর ইনি...?

'অদেষ্ট, অদেষ্ট। পোড়ার বিধাতা সক্কলকার ললাটের লেখন লেখেন সোনার জলে, আমার বেলাতেই ভুষো কালি ছাড়া কিছু জোটে নি। মুয়ে আগুন বিধাতাপুরুষের! কেন—এঁকেই বা এমন ছিষ্টিছাড়া ভারতছাড়া ভালমানুষ করবার দরকারটা কি হয়েছিল? দুদে বজ্জাত করলে দোষটা কি হ'ত? এ যা দুনিয়া—পুরুষমানুষের দুদে না হলে চলে!'

এ আক্ষেপ প্রায়ই শুনতে হয় ভবতারণকে। আর তার জন্যে খুব দোষও তিনি দিতে পারেন না নিস্তারিণীকে। কথা খানিকটা সত্যিও বৈকি। বড়বাজারে তাঁর মতো শুধু-

হাতে দালালি ক'রে বড় বড় বাড়ি করেছে, ল্যাণ্ডো ব্রুহাম চড়ছে এমন লোক তো কম নেই। চোখের ওপরই তো দেখছেন তাদের। তাঁর 'দ্যাখতা' বড়বাজারে এসেছে আবার কাজ গুছিয়ে নিয়ে এখন ঘরে বসে তেজারতী কারবার করছে এমন লোকও তো বিরল নয়। তারা সবাই পাকা লোক, তাদের নাক কথা কয়, মুখ কথা কয়, পঞ্চমুখে মিথ্যে কথা বলতে পারে। মিথ্যে কথা তুবড়ির মতো ফুটতে থাকে তাদের মুখে। সাধারণত এই ধরনের তোখোড় লোকই দালালী করতে আসে। অত মিথ্যে ভবতারণ বলতে পারেন না। কেমন যেন লজ্জা করে তাঁর নিজের কাছেই। তাছাড়া তাঁর একটু ব্রাহ্মণত্বের গর্বও আছে। একে ব্রাহ্মণ তায় বাবা আউলচাঁদের আশ্রিত তিনি, সামান্য পেটের জন্যে এত মিথ্যে কথা বলবেন? ছিঃ! অবশ্য একেবারে উপোস ক'রে থাকতে হ'লে আলাদা কথা ছিল। প্রাণ রক্ষার্থে মান রক্ষার্থে মিথ্যে কথা বলায় দোষ নহে তা তিনি জানেন। কিন্তু কোনমতে দুবেলা দুমুঠো যখন পেটে যাচ্ছে—যখন পেটের ভাত আর কোমরের ট্যানা-টুকুও জুটছে কোনমতে, তখন আর কেন?

আসলে এ লাইনে আসাই বোধহয় উচিত হয়নি তাঁর। অথচ আর কোন্ লাইন ধরবেন তাও যে বুঝতে পারেন নি সেদিন। অন্নই জুটত না, যদি না সম্বন্ধী নকুল আচার্যি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাজারের মহাজনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। নকুল আচার্যি বলেছিলেন, 'ট্যাকার জোর থাকে বড় আড়ৎ দোকান ফেঁদে কারবার করো, কিছু বলার নেই। বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী, এ তো শাস্তরের কথা। কিন্তু ট্যাকা যেকালে নেই, ট্যাঁক গড়ের মাঠ—ঢু ঢু অষ্টরম্ভা, সেকালে হয় চাকরি করো—নয় তো এই সোজা রাস্তা পড়ে আছে দালালিতে নামো। তা চাকরি আর কে তোমাকে দেবে বলো—পেটে তো গুঁতো মারলে কোঁক শব্দ ওঠে না পাছে ক বাক্যি বেরিয়ে যায়। কিসের জোরে চাকরি করবে? বলে বামুনের কাজ তো গোনাগুনতি তিনটে—আছে বিদ্যে কানে ফুঁ, অল্প বিদ্যে শাঁকে ফুঁ, ন চ বিদ্যে উনুনে ফুঁ! লেখাপড়া জানলে হয় পড়াও, নয় গুরুগিরি করো—তোফা চলে যাবে। না হয় তো অল্পস্বল্প অং বং চং করতে পারো, পুরুতগিরি ক'রে যজমান ঠেঙিয়ে খাও—আর তাও না জানো রাঁধুনী বামুনের কাজ করো—পরের ভাতের ফেন গেলে কাটাও, আর কি! তা তোমার তো চাকরি করতে গেলে ঐ উনুনে ফুঁ-ই দিতে হয়।...তার চেয়ে আমার সঙ্গে ঘোরো, তোমার কোন ঝক্কি নেই। এর কাছ থেকে ফর্দ এনে ওকে দেবে, ওর কাছ থেকে মাল এনে একে বুঝিয়ে দেবে। পারো, বিক্কিরি হয়, দু পয়সা ঘরে আসবে, না পারো পেটে কীল মেরে ঘরে পড়ে থাকবে। এক কড়ার ঝুঁকি নেই, মহাজন তাগাদা করবে না। লাভ হলে হ'তে পারে, লোকসানের ভয় নেই কিচ্ছু!'

কথাটা বুঝেছিলেন ভবতারণ। নকুল আচার্যির স্পষ্ট কথা, না বোঝবারও কোন হেতু ছিল না। যুক্তিটা প্রাণে লেগেছিল। সেই থেকেই ঘুরতে শুরু করেছেন।

সেই ঘোরা আজও চলছে। না ঘুরে উপায়ই বা কি? এই একটি রাস্তাই জানেন, সেই রাস্তাই ধরে আছেন। নকুল বেঁচে থাকলে হয়তো আরও উন্নতি হ'ত খানিকটা। একটু বেশী বকতেন ঠিকই—কিন্তু পরোপকারীও ছিলেন মানুষটা। ঢের করেছেন তিনি। এমন ক'রে কেউ নিজের ভাত-ভিক্ষের পথ অপরকে দেখায় না। তিনি তা-ই করেছেন। থাকলে এতদিনে আরও দু-চারটে ফন্দি-ফিকির বাতলাতে পারতেন নিশ্চয়। কিন্তু তিনি বাঁচেন নি বেশী দিন, আর সেটা—ভবতারণের বিশ্বাস—নিতান্তই ভবতারণের অদৃষ্ট। অদৃষ্ট আর কিছুটা নিজের স্বভাবও। অলস বা কর্মবিমুখ তিনি নন, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্তই ঘুরে বেড়ান প্রায়। হেঁটে হেঁটে পায়ের দাঁড় ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হয় এক একদিন—কিন্তু তেমন বলিয়ে-কইয়ে নন বলে—নিজের পাওনাটা সদাসর্বদা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা আদায়ের চেষ্টা করেন না বলে—কিছু হয় না। কেড়ে-বিগড়ে ধাপ্পা দিয়েও কাজ আদায় করতে পারেন না। পাওনাই বা কী এমন হাতী-ঘোড়া, দশ টাকার

মাল বেচিয়ে দিলে এক পয়সা দস্তুরী। তা মাল অবশ্য প্রত্যহ বড় কম কেনাবেচা হয় না কিন্তু দালালও যে ঢের। আর তারা কেউই ভবতারণের মতো নিরীহ নয়—রীতিমতো কামড়াকামড়ি ক'রে কাজ করে তারা।

তা হোক। ভগবান—বাবা আউলচাঁদ ভবতারণের দিন চালিয়ে নেন একরকম ক'রে। মাস গেলে ছ-সাতটা টাকা পাইয়ে দেন। তাতে স্বামী-স্ত্রীর দিন একরকম ক'রে চলেই যায়। হ্যাঁ—খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে সচ্ছলে চলে না এটা ঠিকই—পাকা বাড়ি অট্টালিকেয় থাকতে পারেন না—খোলার ঘর, তাও ভাড়া ক'রে থাকতে হয়। ছিল ছ' আনা ভাড়া, সম্প্রতি বাড়িয়ে আট আনা করেছে। ঘুলঘুলির মতো জানলা-দেওয়া ঘর একফালি, এক চিলতে মেটে দাওয়া—ঘর বলতে তো এই। জলের ব্যবস্থা নেই—এক বাড়িওলার তিনটে মেটে বাড়ির সত্তর ঘর ভাড়াটে, তাদের একটা পাতকুয়া ভরসা। দূরে ঘোষেদের বাড়ি ভাগ্যিস একটা পুকুর আছে, তারা সরতে দেয়—তাই রক্ষে। পাইখানাও পাঁচ-সাত ঘর ভাড়াটের একটি হিসেবে, সকালে এক এক দিন আধঘণ্টা ধন্না না দিলে খালি পাওয়া যায় না। দুর্দশা খুবই, তা ভবতারণও মানেন, তবে এর চেয়েও দুঃখে কি আর কেউ নেই? সেই কথাই বলেন তিনি স্ত্রীকে, বলে বোঝাতে চান—কিন্তু তাতে ফল হয় বিপরীত। নিস্তারিণীর যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ে।

বলে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আছে বৈকি! খুব লেহ্য কথা। রাস্তায় কুটে ভিখিরীরা আছে—তাদের তো পথ ভরসা। আমার মাথার ওপর তবু একটু খোলা-খাপরার আচ্ছাদন আছে। তাছাড়াও আছে—জেলখানার কইদীরাও বোধহয় আমাদের চেয়ে দুঃখে আছে। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি—সারাদিন ধরে পাথর ভাঙছে, নয়তো ঘানি ঘোরাচ্ছে। তাদের চেয়ে আমরা সুখে আছি তা মানছি।...তা সেটুকুই বা দুঃখু থাকে কেন। তুমি ঘরে এসে বসো, আমি না হয় হাতে মালা নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুই। মনস্কামনা পুন্নু হোক।'

তবুও বোঝাতে যান ভবতারণ, 'কী করব বলো, ভগবান যে মেরেছেন। বামুনের ঘরে জন্মে আর ঐসব ইত্তিক জাতের লোকের মতো কথায় কথায় অমন সাতঝুড়ি মিথ্যে কথা বলি কি ক'রে? অথচ দিনকে রাত করতে না পারলে এ লাইনে পয়সা হয় না।'

নিস্তারিণী কিন্তু তাঁকে শুরুতেই বসিয়ে দেন, 'থামো থামো! আর বামনাই ফলিও না। মেয়েবেচা ঘরের বামুন আবার বামনাই নিয়ে নাক নাড়েন। ওসব পণ্ডিতি ফলিও অপরের কাছে। ভাগ্যিস আমার বোকাসোকা ভালমানুষ বাবা ছিল, তাই বিয়ে করতে পেরেছিলে। নইলে বৌ কিনে বে করতে হ'লে আর তোমার মুরোদে কুলোত না।...তার বেলায় বামনাই কোথায় ছিল, তখন সত্যি কথা বলতে পারো নি? তোমার বোনের বেচে কতটি টাকা বাজিয়ে ঘরে তুলেছিলেন তোমার ঠাকুর? আমার বাবাকে তার আদ্ধেক দিতে হ'লেও এহকালে আর ও কম্ম করতে হ'ত না তোমাকে। আমার শ্বশুর সত্যি কথা চেপে বে দেন নি? এই ঘর জানলে আমার বাবা দাদা কখনও বে দিত না।'

আবারও চেপে যেতে হয় ভবতারণকে। কথাটা মর্মান্তিক ভাবে সত্যি। নিস্তারিণীর বাবারা খুব উঁচুঘরের বামুন ছিলেন না বটে, তবু ভবতারণদের মতো মেয়েবেচার ঘরও নয় তাঁদের। বাবা একটু ভাঁড়িয়েই বিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে অনেক সুবিধে হয়েছিল তাঁর, ঘর থেকে টাকা বার করতে হয় নি। কিছু নিচ্ছেন না বলে উদারতা দেখাতে পেরে-ছিলেন, উলটে কিছু না কিছু না ক'রেও একশ' সওয়াশ' টাকার জিনিস ঘরে উঠেছিল। অবশ্য তা নিয়ে পরে অশান্তিও বড় কম হয় নি। কিন্তু সেটা বাবারই করা, ভবতারণের তাতে কোন হাত ছিল না। বাবার মুখের ওপর কথা বলবেন বা প্রতিবাদ করবেন—এমন শিক্ষা বামুনের ঘরে তখন ছিল না। বাবা অন্যায় করছেন—একথা ভাবাও তো মহাপাপ। কাজেই সেদিনও চুপ ক'রে থাকা ছাড়া পথ ছিল না ভবতারণের।

অবশ্য বললে কিছু জবাব দেওয়া যেত। বলা চলত যে, এই ঘর বলেই অত সহজে মেয়েকে পার করতে পেরেছিলেন নিস্তারিণীর বাবা। অন্য মেয়েদের বিয়েতে তাঁকে ঘটিবাটি পর্যন্ত বেচতে হয়েছে এক-একবার। তাছাড়া, ভবতারণ পরে শুনেছেন, ওঁরা আচার্যি বামুন বলে শুধু নয়, বামুন ছাড়া 'ভিন্ন' জাতের দান গ্রহণ ক'রে দিন চলে ওঁদের। ওঁদের যজমানদের মধ্যে নাকি জল-অচল জাতের লোকও ঢের আছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে নিস্তারিণীও তরে গেছেন তাঁর বা তাঁদের হাতে পড়ে।

তা বাদেও, বাবা সত্যাচরণ করেন নি বলে ভবতারণকেও মিথ্যাচার করতে হবে—তার কোন মানে নেই। না, বাবার দোষ ধরবেন এমন দুঃসাহস তাঁর এখনও নেই, তা তিনি বলছেন না—তবে বাবার ধর্ম বাবা জানতেন, তাঁর ধর্মের দায়িক তিনি নিজে। ভবতারণরা হলেন বাবা আউলচাঁদের আশ্রিত, স্বয়ং দুলালচাঁদ ঠাকুর তাঁদের 'মশাই'। তাঁদের আইন বড় কড়া আইন। যে ক'টি বিধিনিষেধ তাঁদের ওপর দেওয়া হয় তার প্রথমটিই হচ্ছে 'সদা সত্য বলবে'। তাঁদের মশাইরা বা তাঁদের কর্তারা এমন বেশী কিছু চান না, কড়াক্কড়ি নেই কিছুরই—কোন কঠোর তপস্যাও করতে বলেন না, শুধু—যে-কটি কথা বলেন সে-ক'টি অন্তত 'বরাতী' বা শিষ্যরা সকলে মেনে চলবে—এইটে তাঁরা আশা করেন।

'নইলে এখানে এসো না বাবা। বিশাল ভূমণ্ডলে পড়ে আছে কত গুরু কত কর্তা কত মশাই—এখানে আসতে তো কেউ মাথার দিব্যি দেয় নাই বাবা। ইটুক্ আমাদের চাই। ইটুক্ না হ'লে চলবে না।'

তা এমন কিছু তো নয়ও। এই কটি হুকুম মাত্র তাঁরা দেনঃ

'সদা সত্য বলবে।

'দিনেরাতে পাঁচবার মন্ত্র জপবে।

'শুক্রবারে শুক্রবারে ভগবজ্জনের সঙ্গে মিলবে।

'মদ খাবে না। কোন নেশা করবে না।'

'ঘোষপাড়ার মেলাতে যাবে।

'যার যা সাধ্য—কর্তার গদীতে কিছু কিছু দেবে।'

এই কটি মাত্র নির্দেশ। ব্যস। আর কিছু নয়। তা এই ক'টি কথাও না মানলে চলবে কেন? সাধনভজন করতে হ'লে, মানুষের ধর্ম পালন করতে হ'লে কেবল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে চলে কি? দাগা ষাঁড়ের মতো যা-খুশি-তাই ক'রে বেড়ালে চলবে?...আর তার ভেতর প্রথম নিষেধই তো হ'ল—মিথ্যে বলবে না, সত্য বলবে। হাঁ, সব সময় যে ভবতারণ সত্যি কথা বলতে পারেন তা নয়—তবু যথাসাধ্য মিথ্যেটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। আর তা করেন বলেই রোজগারের চেষ্টায় ভাঁটা পড়ে।

এত কথা নিস্তারিণীকে বোঝানো যায় না। বোঝাতে পারেন না ভবতারণ। ওঁর এই খানিকটা বা যথাসাধ্য সাধুতার সূক্ষ্ম মহত্ত্বটুকু সে বোঝে না। তাছাড়া নিহাৎ স্বামীর মত বলেই ওকেও এইসব করতে হয়—নইলে সে এখনও মনেপ্রাণে বাবা আউলচাঁদের সেবক হ'তে পারে নি। ওর ঠিক পুরোপুরি পছন্দ হয় না এদের রীতনীত সাধনভজন। দলের লোকগুলো—যাদের ওঁরা বলেন ভগবজ্জন (কথাগুলোই যেন ওঁদের কেমন কেমন —গুরু গুরুদেব নন, তিনি হলেন, 'মশাই', শিষ্যরা হ'ল বরাতী। নিজের বাড়িকে বাড়ি বলবার জো নেই, সেটা হল বাসা ; বাড়ি নাকি সবাইকারই একটা—ঘোষপাড়া। আর যারা এই সম্প্রদায়ের তারাই হ'ল ভগবজ্জন। নিস্তারিণী মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—বাকী সবাই কি অভাজন না দুর্জন?) তাদের বেশির ভাগই সৎজাত বা বামুন-কায়েতের ঘরের লোক নয়, মশাইরা নিজেরাই তো সদ্‌গোপ জাতে—নিস্তারিণী শুনেছে, তাদের সঙ্গে অত মাখামাখি—একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করতে এখনও তার

কেমন যেন কুণ্ঠা বোধ হয়, একটু আড়ষ্ট আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তবে যে করে, সে শুধু তার বাবার শিক্ষা এখনও মনে আছে বলে। তিনি বলতেন—বার বার, বলতে গেলে কানে বিঁধিয়ে বলে গেছেন, 'মেয়েমানুষের স্বামী ছাড়া কোন ধর্ম নেই, কোন গুরু নেই। স্বামীর মতই তার মত, স্বামীর পথই তার পথ।'

নিস্তারিণীর এই মনোভাবটা জানেন বলেই ভবতারণ আরও চুপ ক'রে যান। বোঝাবার চেষ্টা করেন না। তাছাড়া চেপে যাওয়ার বা সহ্য করার আরও একটা কারণ আছে। ভবতারণ জানেন যে, নিস্তারিণী তাঁকে সত্যিই ভালবাসে। ভালবাসে বলেই ওর এত ক্ষোভ, এত বিলাপ। নিজেরটা তত নয়, স্বামীর কষ্টটাই বেশী ক'রে বাজে ওকে। নিস্তারিণীর তরফ থেকে ভগবজ্জনের সঙ্গ করার জন্যে এত মাথাব্যথা নেই, তবু যে শুক্রবারে শুক্রবারে এত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ঘাড়ে করে, গাধার খাটুনি খাটে—সে শুধু ভবতারণের মুখ চেয়েই। খেতেদেতে ভালবাসেন তিনি চিরদিনই, অথচ ভাল খাওয়ার যা আসল রসদ, সেই পয়সাটারই একান্ত অভাব। নিস্তারিণীর মামার বাড়ি গোঁদল-পাড়ায়, তাদের ঘরের রান্না বিখ্যাত। মার কাছ থেকে সেই হাতটাই পেয়েছে নিস্তারিণী। রাঁধতে জানে সব রকমই, খাটুনিতেও ভয় পায় না। কিন্তু মালমশলা তেল ঘি না পেলে রাঁধবে কি দিয়ে? সেইজন্যেই এই শুক্রবারের ঝক্কি ঘাড়ে নিতে হয় ওকে।

সত্যিই—দায়িত্বটা নিস্তারিণীর ঘাড়ে পড়ার কথা নয়। ওর অবস্থা বোধ হয় ওদের দলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ—সুতরাং ওর কথা কেউ ভাবত না, যদি না নিস্তারিণী সেধে কথা পাড়ত। এ-তল্লাটে যত ওদের গুরুভাই বা ভগবজ্জন আছে (খুব বেশী নেই তাই রক্ষে)—তারা সবাই শুক্রবারে শুক্রবারে এইখানে এসে জড়ো হয়। এক আনা দু আনা ক'রে চাঁদা ওঠে, তা থেকে ভোগ রান্না হয় সতীমায়ের—পরোটা আর ধোঁকার ডালনা কিম্বা পরোটা ছোলার ডাল কুমড়োর ছক্কা। সন্ধ্যে থেকে বহু রাত পর্যন্ত চলে গান আর কীর্তন—তারপর সতীমায়ের ভোগ দিয়ে আনন্দ ক'রে সবাই প্রসাদ পায়। সেই কুড়ি-পঁচিশজন লোকের পুরোপেটা খাবার—পরোটা আর ধোঁকার ডালনা—একা একহাতে করতে হয় নিস্তারিণীকে। এ-ঝঞ্ঝাট সে স্বচ্ছন্দেই এড়িয়ে যেতে পারত, এখনও পারে। শরীর খারাপ বললে আর তাকে কেউ অনুরোধ করবে না, পীড়াপীড়ি করবে না। তাতে কিছু-মাত্র মন্দ মনে করবে না কেউ। এখানে না হয় অন্য কোথাও, আর কারুর বাসায় হবে। তার জন্যে ভবতারণের খাওয়াও বন্ধ হবে না, যেখানেই হোক, তার ভাগের ভাগ সে পাবেই।

তবু যে নিস্তারিণী এই আত্মপীড়ন করে—তার অনেকগুলি কারণ আছে। সে-কারণ সব খুলে বলাও যায় না কাউকে। এমন কি ভবতারণকেও না। শুনলে রাগ করবে সে, ভুল বুঝবে। প্রথম কারণ হ'ল, অপর জায়গায় এসব করাতে হ'লে সম্ভবত বামুনের ঘর জুটবে না, অত বাছবিচারের কথা মনেও হবে না কারুর। ডাল কিম্বা ডালের তরকারি, সে তো সক্‌ড়ি—সক্‌ড়ি জিনিস যার তার হাতে খাবে বামুনের ছেলে হয়ে—ভাবতেই যেন কেমন লাগে নিস্তারিণীর এখনও। দ্বিতীয় কথা—রান্না এতটা ভাল হবে না নিশ্চয়ই। ভবতারণের তৃপ্তি হবে না, সে খাওয়া খেয়ে। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গোপন কথাটি হ'ল—শুধু ঐ একদিনের খাওয়াই নয়, ঐ আয়োজন থেকে প্রাণপণে সঞ্চয় ক'রে নিস্তারিণী আরও একদিন ভবতারণের পরোটা খাবার ব্যবস্থা করে। এ অন্য কোথাও হ'লে হবে না, অন্য কেউ পারবেও না। কী ক'রে যে সে ঘি বাঁচায় বা ঘি চুরি করে তা সে-ই জানে—আর সতীমা জানেন। ঘি আর ময়দা। সেই থেকেই রবিবার কি সোমবার পাঁচ-সাতখানা পরোটা ভেজে দেয় সে ভবতারণকে।

এর জন্যেই এত কষ্ট তার—এত সওয়া।

সওয়া কি যে সে! শুধুই কি সকাল থেকে ডাল বাটা, বাটনা বাটা, রান্না করা—হাড়ভাঙা খাটুনি! সন্ধ্যে না হ'তে হ'তে একপাল লোক এসে জড়ো হবে—তাদের জন্যে দাওয়ায় মাদুর পাতো রে, কল্‌কে সাজাও রে, গাড়ুতে জল রাখো রে পা ধোওয়ার,—তারপর সেই রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত বসে বসে খচামচি গান শোনো। পরোটা তরকারি জুড়িয়ে জল।

গান মন্দ নয় অবশ্য, কিন্তু ভবতারণের বাড়িতে যারা আসে, তাদের যেমন গলা তেমনি সুরজ্ঞান। এক এক সময়ে শুধু বেমক্কা চিৎকারে কানে যেন তালা লেগে যায়। গানও দৈবে এক আধটা নতুন—না হ'লে সব একঘেয়ে, একই গান রোজ রোজ শোনা। তাছাড়া নিস্তারিণী ছোটবেলা থেকে যা শুনেছে—ঠাকুর-দেবতার গান বলতে যা বোঝায়—এ তা নয়। দেহতত্ত্বও নয়। কেত্তন কি শ্যামাসংগীত—তাও নয়। কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত গানঃ

"এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো
এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ
মুখে বলে সত্য বলো।
এর সঙ্গে বাইশ জন সদাই এক মন
জয় কর্তা বলি বাহু তুলি
কল্লে প্রেমে ঢলোঢলো॥"

এ তবু তো একরকম ভাল। এক এক গানের মাথামুণ্ডই খুঁজে পায় না নিস্তারিণী—'মানুষ আসতেছে আর যেতেছে, মানুষের সব আছে!'

এদের আবার মানুষও আলাদা। মানুষ বলতে যা বোঝায়, এতকাল যা বুঝে এসেছে নিস্তারিণী—মানে দুই পা-ওয়ালা জীব, যারা কথা বলতে পারে, চাকরিবাকরি করে, রান্না ক'রে খায়—এ তা নয়। 'মানুষ' নাকি একজনই—মশাই, কর্তা বা গুরু। এছাড়া নাকি কেউ মানুষ নয়। 'মুয়ে আগুন!' নিস্তারিণী স্বামীর আড়ালে বলে, 'কুড়ে গরুর ভেন্ন গোঠ।'

এদের এই জমায়েতের মধ্যে দৈবাৎ এক-আধ দিন কীর্তনও হয়। তেমন কোন গাইয়ে যদি এসে যায় তবেই। সেই দিনটাই নিস্তারিণীর ভাল লাগে। তেমনি সেসব দিনে রাতও ঢের হয়ে যায়। ভাব এসে গেলে তো আর রক্ষে নেই, কত লোকের মুচ্ছো হবে, কত লোক কান্নাকাটি করবে—আঁর যত এইরকম হবে গাইয়ের তত উৎসাহ, গান টেনে লম্বা করবে তত। ফলে এক একদিন গানের পালা চুকতেই রাত বারোটা একটা বেজে যায়.. এসব দিনে শুধু এরাই নয় আবার, এ বস্তি-বাড়ির অপর ঘরের ভাড়াটেরাও অনেকে এসে বসে—উঠোনে পথে মাদুর চ্যাটাই যা হোক বিছিয়ে। সে তারা নিজেরাই যোগাড় করে অবিশ্যি। কিন্তু তাদের প্রসাদ দেবার হ্যাঙ্গাম আছে। আজকাল সেয়ানা হয়েছে নিস্তারিণী, এক পয়সার বাতাসা আনিয়ে রাখে...গান শেষ হ'লে 'হরিবোল' দিয়ে ছড়িয়ে দেয় ওদের মধ্যে—যে যা পায় কুড়িয়ে নিয়ে খুশি মনে বাড়ি চলে যায়।...অনেক কষ্টের পরোটা ওর—তা থেকে আর ভাগ দেওয়া চলে না।

কিন্তু শুধু শুক্রবারই নয়। পূর্ণিমাও আছে। তবে সব পূর্ণিমা নয়। যেমন দোল-পূর্ণিমা—সেদিন সবাই ঘোষপাড়ায় যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় রথ হয় ওখানে, সে রথেও যায় কেউ কেউ। আর যায় দুর্গা-প্রতিপদে, সতীমার মোচ্ছব হয় সেদিন। কিন্তু বাকি পূর্ণিমা-গুলোতে তাল এসে পড়ে। অনেকে উপোস করে সেদিন, কিন্তু বামুনবাড়ির রান্না তায় মায়ের প্রসাদ, সে নাকি খেতে দোষ নেই। তাছাড়া 'বামনী রাঁধে ভাল, ধোঁকা তো নয় অম্রেত একেবারে' এ তারা মুখের সামনেই বলে যায়। ফলে ওর খাটুনি কমে না। বিশেষ ক'রে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বা গুরুপূর্ণিমায়। দুদিন ধরে চলে 'গিজতা গিজং'—

নিস্তারিণীর ভাষায়। চতুর্দশীতে পড়ে রামশরণ পাল মশাইয়ের দিন। রামশরণ পালই হলেন ওদের প্রথম 'মশাই'—বাবা আউলচাঁদের প্রধান সেবক। এ'রই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হলেন সরস্বতী—সতীমা। কেউ বলে সাক্ষাৎ শচীমা, চৈতন্য মহাপ্রভুর জননী (বাবা আউলচাঁদ তাঁদের মতে মহাপ্রভুর অবতার)—বেশির ভাগই বলে কর্তা-মা। বর্তমানে যাঁরা কর্তা বা দেব-মোহান্ত তাঁরা সবাই এ'র ছেলে দুলালচাঁদ মশাইয়ের বংশধর।

এসব দিনগুলোতে অনেক বাড়তি খাটুনি হয়। তবে চাঁদাও ওঠে বেশী। মোচ্ছবের নাম ক'রে ভবতারণ বাজারেও কিছু কিছু চাঁদা তোলেন। যেদিন বেশী ওঠে সেদিন লুচি হয়। মিষ্টিও আসে—বাতাসা কদমা। এসব দিনে অবশ্য নিস্তারিণী একা পারে না, আশপাশের ঘর থেকে কাউকে ডেকে নেয়। একবেলা খাবার লোভে অনেকেই আসে সাহায্য করতে। তেমন দেখলে আর ডাল কি ডালের তরকারি করে না নিস্তারিণী, কারণ ডাল হ'ল সক্‌ড়ি, যার তার হাতে খাওয়া চলে না—তা প্রসাদই হোক আর যাই হোক। অন্তত নিস্তারিণীর খেতে প্রবৃত্তি হয় না, ভবতারণকেও খেতে দেয় না সে। হাজার হোক বামুন—গলায় একগাছা দাড়ি আছে।

এইসব দিনে নিস্তারিণীর খাটুনি আর উৎসাহ দেখে ভবতারণ অবাক হয়ে যান। কষ্টও হয় ওর জন্যে। এক-একদিন বাজারে যাওয়া বন্ধ ক'রে যতটা পারেন সাহায্য করেন ওকে। খুব নাচারে না পড়লে নিস্তারিণী অবশ্য বিশেষ কিছু করতে দেয় না। বলে, 'হ্যাঁ, তা আর নয়! বারো মাস তিনশ প'য়ষট্টি দিন বাজারে ঘোরো টো-টো ক'রে—হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটো—একটা দিন যদি বা ঘরে আছ, তোমাকে আগুনতাতে জুতে দিই আর কি!...না না, তুমি শুধু দয়া ক'রে তামুকটা সেজে খাও গে, তাতেই আমার ঢের উগ্‌গার হবে!'

স্বামী ঘরে থাকলেই খুশি সে। উৎসাহে তার যেন দুখানার জায়গায় চারখানা হাত বেরোয়। তার কষ্ট ভেবে মানুষটা রোজগারের চেষ্টায় না গিয়ে ঘরে তার কাছে বসে রইল, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে?

॥ ২ ॥

এবার কথাটা নিস্তারিণীই তুলল। সাধারণত ঘোষপাড়ার মেলাতে যাবার কথাটা ভবতারণই তোলেন, আর তোলেন একটু ভয়ে ভয়েই। কারণ নিস্তারিণী ঠিক যে নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করে তা নয়, না যাওয়ার দিকে বিবিধ ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপিত করে। প্রথমত কাজ কামাই, দ্বিতীয়ত অনেক খরচা : আয় বন্ধ ব্যয় বেশী। নৌকো ক'রে অতটা পথ যাওয়া-আসা—ভাগের নৌকো হ'লেও ভাড়া কম নয়। ওদের মতো গরীব মানুষের পক্ষে ঢের। তাছাড়া, যেতে আসতে তিনদিন, খাইখোরাকী আছে, পুজো আছে, আবার কর্তার গদীতে জমা দেওয়া আছে। এত আসে কোথা থেকে? ফি বারই তো ভবতারণ একরাশ দেনা ক'রে যান—তারপর তিন-চার মাস সময় লাগে সে দেনা শোধ করতে! কী দরকার এমন নবাবী করতে যাওয়ার? ঠাকুর অন্তর্যামী, ওদের যে ভক্তির কমি নেই তা কি আর তিনি বুঝছেন না? সতীমা এখান থেকেই ওদের পুজো নেবেন।...

প্রতিবারই এমনি গোলমাল করে সে এই যাওয়া নিয়ে। এমন কি গত বছরও করেছে।

ভবতারণ আশা করেছিলেন যে দুতিন বছর তো মেলাতে যাওয়া বন্ধই ছিল, এ বছর আর কোন আপত্তি করবে না! কিন্তু নিস্তারিণী তাও করেছিল। সহজে রাজী হয় নি সে, বরং একটু চমকেই উঠেছিল। ভেবেছিল সেপাইয়ের এ মতিচ্ছন্নয় আর কারও কোন উপকার হোক না হোক, তার হয়েছে। তার কাছে শাপে বর হ'ল ব্যাপারটা। বছর বছর এই এক ঢেউ তুলে বেড়াতে যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল এই হিড়িকে—বেশ হ'ল। বারাকপুরে দাঙ্গা-লড়াই শুরু হওয়ার ফলে ঘোষপাড়া যাওয়া-আসা বিপদজনক হয়ে উঠেছিল। তার পরও—গোরা ফৌজ যখন এসে পড়ল জাহাজ জাহাজ—তখন তারা জাহাজ ক'রেই পশ্চিমের দিকে যেত, আবার ফিরতও কিছু কিছু—নৌকো ক'রে তখন গঙ্গার পথে যাওয়ার জো-ই ছিল না। 'মানোয়ারী'* গোরারা জোয়ান ছেলেছোকরা দেখলেই গুলি করত, মেয়েছেলে দেখলেই টেনে জাহাজে তুলে নিত। নিক বা না নিক, কথাটা রটেছিল খুব। একথা শোনবার পর আর কার এত বুকের পাটা যে ওদিকে যাবার সাহস করবে! ও পথে হেঁটে যাওয়ারও সাহস ছিল না কারুর। পথও তো কম নয়—কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া।

লড়াই দাঙ্গা মিটতেই দুটো বছর কেটে গেল। তার পরও একটা বছর কাটল ভয়ে ভয়ে। নিহাৎ যারা আশপাশের গ্রাম থেকে আসে—পায়ে হেঁটে বা গো-গাড়িতে—তারাই এসেছিল। এদিক থেকে কেউ যায় নি—দু-চারজন ডাকাবুকো লোক ছাড়া। গত বছরই প্রথম সবাই আবার সাহস ক'রে যাওয়ার কথা তুলেছিল। ভবতারণও—তিন চার বছর যাওয়া হয় নি, এবার আর নিশ্চয়ই নিস্তারিণী 'না' বলবে না এই ভরসায়—কথাটা পেড়েছিলেন। তার জবাবে নিস্তারিণী তিন বছর আগেকার সেই হাঙ্গামার সময়ের দেনাটা সুদে-আসলে কত দাঁড়িয়েছে—শুনিয়ে দিয়েছিল। সত্যিই—সেই এক বছর দেড় বছর যা দুর্বৎসর গিয়েছিল—এখনও মনে পড়লে ভবতারণ শিউরে ওঠেন। সম্পূর্ণই বলতে গেলে ধারের ওপর চালাতে হয়েছিল। ধার দিয়েছিল অবশ্য চেনা মহাজনরাই—কিন্তু দস্তুরমতো সুদ ধরে খাতায় লিখিয়ে নিয়ে।

সে সময় যারা ভরসা ক'রে কোম্পানীকে মাল যুগিয়েছিল তারা সবাই লাল হয়ে গেছে—কোটিপতি হয়েছে এক একজন। কিন্তু ভবতারণের এমনই অদৃষ্ট যে, তার যে সব মহাজনদের সঙ্গে কারবার, তারা—কোম্পানী এবার নিশ্চিত পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবে—ওই ভেবে হাত গুটিয়ে গদির ঝাঁপ ফেলে বসে রইল। তাদের আর কি, হাতেই যথেষ্ট আছে, ছ' মাস এক বছর এক পয়সা আয় না হ'লেও কিছু এসে যায় না ; মরতে মরল ভবতারণের মতো লোকই। সবটাই ধার ক'রে চালাতে হয়েছে ওঁকে, অন্তত আট ন'মাস। শেষের দিকে তো রীতিমতো চড়া সুদে ধার নিয়েছেন—নইলে দেবে কেন লোকে? কী আছে তাঁর সম্পত্তি! সুতরাং সে দেনা এত তাড়াতাড়ি শোধ হবার কথাও নয়।

যাই হোক—তবু শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল নিস্তারিণী—কিন্তু ঘোর অনিচ্ছায়। এবার সেই মানুষের কাছ থেকেই এ প্রস্তাব ওঠাতে ভবতারণ অবাক হয়ে গেলেন। এ যে ভূতের মুখে রামনাম। সত্যি-সত্যিই বলছে না তামাশা করছে? সেইটে বুঝতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তাঁর। বেড়া নেড়ে গেরস্তর মন বুঝছে না তো বৌ? কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে নিস্তারিণীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিলেন, 'কেন বল্ দিকি? হঠাৎ যে তোর এ ঝোঁক চাপল মাথায়? ব্যাপার কি?'

কিন্তু নিস্তারিণী ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল না, উল্‌টে রাগ ক'রে বলল, 'ও, ব্যাপারটা না শুনলে বুঝি আর নিয়ে যাওয়া যায় না—তা বেশ, আমার অত কৈফেতেরও দরকার নেই, যাবারও দরকার নেই। ভালই হ'ল—আর কোনদিন ও কথাটি মুখে উচ্চারণ

* 'ম্যান-অফ-ওয়ার জাহাজে'র, এই অর্থে মানোয়ারী।

ক'রো না—মেলায় যাবার কথাটা।'

'আ মর। আমি কি তাই বলছি। কী মুশকিল। তুই সব তাইতে বড় বেপরীত বুঝিস। যাওয়া তো হবেই—আমি কি যাব না বলেছি কোন কালে? পোড়া পেটে যে-কালে দুবেলা দুমুঠো জুটছে সে-কালে কর্তার গদিতে একটা পয়সা দিয়ে আসব না—এ কি আর হয়!...আমি শুধু বলছিলুম যে তুই-ই তো অন্য অন্যবার যাওয়ার কথা তুললেই রৈরৈক্কার কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে বসে থাকিস—এবার সতীমার কী এমন কৃপা হ'ল তোকে সুমতি দিলেন—তাই জানতে চাইছিলুম যে, বলি ব্যাপারটা কি?'

শেষের দিকে যেন একটু অনুনয়ের সুরই প্রকাশ পায় ভবতারণের কণ্ঠে। কিন্তু নিস্তারিণী ওদিক দিয়ে যায় না আর। সে ঘরদোর গুছোতে, পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে লেগে যায়। কাজ অনেক, একটা পাখী আছে—সেটা হিমিদের কাছে রেখে যেতে হবে; কিছু কিছু বাসন সরাতে হবে, সে আবার হিমিরা রাখতে চায় না—সেটা চমৎকারের কাছে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। যা দেওয়াল আর দরজার ছিরি, একটা তালার ভরসায় সব ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা প্রতিবারেই করতে হয়—যাবার আগে দুদিন, ফিরে এসে দুদিন—চারটে দিনে গাধার খাটুনি খাটতে হয় তাকে। সেজন্যে অন্যবারে গজ-গজানিরও অন্ত থাকে না। কিন্তু এবার, ভবতারণ অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, একটুও বিরক্তি প্রকাশ করছে না সে, বরং যেন একটা চাপা উৎসাহই দেখা যাচ্ছে তার কাজে-কর্মে। হাতে-পায়ে খাটুনি যেন আর লাগছে না তার। ফলে বিস্ময় বেড়েই যায় তাঁর—স্ত্রীর মতি পরিবর্তনের কোন কারণই ধরতে পারেন না।

কিন্তু নিস্তারিণীর পক্ষেও কথাটা খুলে বলা সম্ভব ছিল না। লজ্জা, দুর্নিবার লজ্জা। যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে—তা অপর কারুর পক্ষে হ'লে বা অন্য কেউ বললে নিস্তারিণী হেসে উড়িয়ে দিত। যে বলতে আসত তীক্ষ্ন ব্যঙ্গে পথে বসিয়ে দিত তাকে। নিজের বেলা তা পারে নি—তবু এর মধ্যে তার যে পরাজয়টুকু আছে, সে সম্বন্ধেই বা একেবারে অচেতন হয় কী ক'রে সে?

এই বস্তির শেষ যেখানে—সেখানে গলির মোড়ে একটা টিনের চালা দেওয়া দোতলা মাঠকোটায় কয়েকটি মেয়েছেলে থাকে। তারা দিনে বিভিন্ন বাড়ি বিভিন্ন রকমের কাজ-কর্ম ক'রে বেড়ালেও, রাত্রে তাদের বাড়তি কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল। তা না থাকলে ও বাড়িতে ও ভাড়া দিয়ে থাকা যায় না, অত সাজ-আসবাবও রাখা যায় না ঘরে। সেটা নিস্তারিণী ভাল রকমই বোঝে। এদেরই একটি মেয়েছেলের সঙ্গে জল আনতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল, সে আলাপ এক ধরণের সখ্যে পরিণত হয়েছে ক্রমশ। প্রত্যহই দেখা হয়—কখনও খাবার জল আনতে কলতলায়—কখনও বা স্নানের সময় পুকুরঘাটে। বেশ ঠাণ্ডা মানুষ, খুব হাসিখুশী। বামুনের মেয়ের সম্মান জানে, কখনও নিস্তারিণীর ছায়াতে পা দেয় না। এমন কি পায়ের জল না বামুনদিদির গায়ে লাগে—সে সম্বন্ধেও সদা সতর্ক। এদের বাড়িতেও আসে মাঝে মাঝে কিন্তু ঘরে কি দাওয়ায় ওঠে না, উঠোনে দাঁড়িয়ে বা সিঁড়ির পৈঠেয় বসে কথা কয়ে চলে যায়।

এই সৈরভীই প্রথম কথাটা বলে তাকে। বলে, 'তা হ্যাঁগা বামুনদি, তোমরা তো শুনেছি ঘোষপাড়ার মেলাতে যাও ফী বছর—ডালিমতলায় মানৎ ক'রে ঢিল বেঁধে এসো না কেন? শুনেছি হিমসাগরে চান ক'রে সতীমাকে ডেকে যে-কোন মনস্কাম ক'রে ডালিম-গাছে ঢিল বাঁধলেই তা পুন্নু হয়। আমি যেখানে কাজ করি—বাগবাজারের চাটুয্যে বাবুরা তো ওসব মানে না—কত উপহাস্যি করে, আউলে-বাউলে বলে—একটু ঘেন্নাও করে মনে মনে। কিন্তু মেজগিন্নী যেন কার মুখে কথাটা শুনে চুপিচুপি নুকিয়ে গিয়েছিল—একেবারে হাতে হাতে ফল, দশমাস না যেতে যেতে কোল-আলো-করা খোকা এল কোলে। বললে বিশ্বাস করবে না, বের তেইশ বছর পরে পোয়াতী হ'ল—প্রেথম। মেজবাবু তো

আর একটা বে করেছিল এর মধ্যে—ছেলে হ'ল না বলে—তা মাগীর বরাত ভাল, সতীনটা টপ্ ক'রে মরে গেল। আর এই ফলটা ছেল বরাতে—তাই।...তা তুমিও কেন মানৎ ক'রে ঢিল বেঁধে এলে না বাপু?'

ঢিপ ক'রে উঠেছিল বুকের মধ্যেটায়, তবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল নিস্তারিণী, 'হ্যাঁ, এই বয়সে আবার ছেলে। তুই আর হাসাস নি বাপু!'

'কেন, কী এমন তোমার বয়েসটা হয়েছে শুনি! এখনও তো দু-কুড়িও হয় নি বোধ হয়। এ বয়সে কি আর ছেলে হচ্ছে না লোকের?'

না, অতও হয় নি নিস্তারিণীর। আট-গণ্ডা হবে বড় জোর, কি আরও দু-এক বছর কম। ভবতারণের সঙ্গে বয়সের ওর অনেক ব্যবধান। ষোল বছরের ছেলে ভবতারণ—ওদের যখন বিয়ে হয়, আর নিস্তারিণী তখন মোটে পাঁচ। তবুও, এই বয়সে নতুন ক'রে সন্তানের আশায় মানৎ করা—ভাবতে গেলেও হাসি পাবার কথা।

হাসি পাবারই কথা, কিন্তু হাসি আসে নি নিস্তারিণীর, বরং চমকে উঠেছিল সে। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু করেছিল। কথাটা শোনার জন্যে চমকে ওঠে নি বা ভয় পায় নি সে। এর আগেও তো কতবার শুনেছে কথাটা। অনেকেই বলেছে। ভবতারণ পর্যন্ত ইঙ্গিত করেছেন কয়েকবার। নিস্তারিণীই এতকাল কান দেয় নি ওসব প্রস্তাবে। ওর এসব বিশ্বাস হয় না কোনকালেই। ডালিম গাছে ঢিল বাঁধলেই যদি সর্ব-কামনা সিদ্ধ হ'ত তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। সবাই গিয়ে হুড় হুড় ক'রে ঢিল বাঁধত। দেশে তাহলে আর গরীব বলে কেউ থাকত না, কোন মেয়েছেলে বাঁজা হ'ত না। ওসব কথার কথা, গালগল্প। কিন্তু আজ অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারল না কথাটা। আজকে সৈরভীর এই কথাটা তোলার একটা বিশেষ অর্থ বিশেষ ইঙ্গিত আছে—অন্তত নিস্তারিণীর কাছে। কারণ গত রাত্রের শেষের দিকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে—সে যেন সতীমার ঘরে গিয়ে প্রণাম ক'রে আকুলভাবে একটি সন্তানের কামনা করছে। গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে আর কাঁদছে—এমন সময় কে যেন ওর পিঠের কাপড়টা ধরে পিছন থেকে টানল আর আধো আধো নরম গলায় ডাকল 'মা' ব'লে। চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল ফুটফুটে পদ্মফুলের মতো একটি ছেলে।

সে এই ভোররাত্রের কথা, এখনও এক প্রহরও কাটে নি সে স্বপ্ন দেখার পর থেকে। স্বপ্ন দেখার পর থেকেই অবশ্য জেগে ছিল সে। সেই যে চমকে ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল বিছানার ওপর, আর শোয় নি। বোধ হয় ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়—এমনি একটা সংস্কার আছে বলেই। তবে সেটা ঠিক স্পষ্ট নিজের কাছেও স্বীকার করতে রাজী নয় নিস্তারিণী। গরমের অজুহাতেই উঠে বাইরে এসে বসেছিল সে। ফাল্গুনের শেষ রাত্রে —সবাই কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোয় এখনও—সেও তাই শুয়েছিল। ঠাণ্ডাও বেশ আছে, তা মানতেই হবে, তবু নিস্তারিণীর কপাল গলা ঘামে ভেসে গেছে। হাত দিয়ে দেখেছিল চোখেও সত্যিকারের জল। স্বপ্নে যখন কেঁদেছিল, তখন বুঝি সত্যি সত্যিই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।...সে যাই হোক, আর এখন ঘুম হবে না, মাথা গরম হয়ে উঠেছে, আর যদি বা হয়—উঠতে বেলা হয়ে যাবে ঢের। সেই জন্যেই বাসি মুখে জল দিয়ে কাজে লেগে গিয়েছিল সেই রাত থাকতেই—

কাজ করতে করতে মনটা অনেক শক্ত ক'রে নিয়েছিল। স্বপ্ন স্বপ্নই—স্বপ্ন আবার কবে সত্যি হয়! দিনরাত মনের মধ্যে একটা কাঙ্গালপনা আছে বলেই এই ধরনের স্বপ্ন দেখেছে সে। ওর ভেতর কান্নাটাই সত্যি। মুখে আগুন, বুড়ো বয়স পর্যন্ত শখ্ ঘুচল না। কিন্তু তখন মনকে যতই বোঝাক্—স্বপ্ন দেখে ওঠার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সৈরভী কথাটা তুলতে বিবম ঘাবড়ে গেল সে। সম্পূর্ণ অকারণে—আজই বা সাত সকালে

সৈরভী কথাটা বলতে গেল কেন? এতকাল আলাপ হয়েছে—কৈ, কোনদিন তো বলে না। কথাটা ওর মাথাতে উঠলই বা কেন?

এই দুটো ঘটনার কথা যত ভেবেছে সে তার পর, ততই এর মধ্যে একটা দৈবের যোগাযোগ দেখতে পেয়েছে। এ দুটোকে বিচ্ছিন্ন-ঘটনা-মাত্র হিসেবে দেখতে পারে নি আর। শেষে মানসিক অনিশ্চয়তা আর সহ্য করতে না পেরে, হঠাৎ এক সময় মন স্থির ক'রে ফেলেছে—যা হোক, এস্‌পার কি ওস্‌পার, একবার দেখে নেবে সে। বুঝবে সতী মায়ের দৌড়, কতদূর জাগ্রত তিনি।

কিন্তু এত কাণ্ড ক'রে যখন মেলায় পেঁছল নিস্তারিণী তখন তার ঝোঁকটা অনেকখানি কেটে এসেছে। তখন যেন নিজের কাছেই কেমন লজ্জা-লজ্জা করছে তার। তাছাড়া, যে উদ্দেশ্যে তার এখানে আসা—মেলার সময় তা হয়ে উঠবে না। সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল তার। যে ভিড়, সতীমায়ের ঘরে গিয়ে তো কাঁদবার কোন উপায়ই নেই, একটু বেশীক্ষণ ধরে প্রণাম করবে তাও তো পারবে না। মিছিমিছি এতগুলো পয়সা খরচ ক'রে আসা।...নিজের ওপরে বিরক্তিটা শেষে বিশ্বের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে বসতে লাগল, তুচ্ছ কারণে ভবতারণকে পর্যন্ত নাভূতো ন-ছুতো কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিল।—

তবু ঢিলবাঁধা পর্বটা একরকম ক'রে চুকল। বহু মেয়েছেলেই হিমসাগরে স্নান ক'রে এসে ঢিল বাঁধছে। অনেকে যে কাজ করে—ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে সে কাজ করতে অতটা লজ্জার ভাব থাকে না। বিশেষ ক'রে তাকেই যে কেউ লক্ষ্য করছে না—এটা একটা বড় সান্ত্বনা।

ঢিলটা বাঁধার পর মনটা অনেকখানি শান্ত হয়ে এল নিস্তারিণীর। হিমসাগরে স্নান ক'রে ওঠার পরই একটা আশ্চর্য প্রশান্তি লক্ষ্য করেছে সে। ঠিক বিশ্বাস হোক বা না হোক—বার বার একই কথা শুনতে শুনতে মনের অগোচরেই খানিকটা বিশ্বাসের কাজ এগিয়ে থাকে। এই হিমসাগরের বহু মাহাত্ম্য শুনেছে সে। তার গুরুভাই-বোনদের সব মুখস্থ। বিশেষ ক'রে একটা গল্প ভবতারণ প্রায়ই করেন। একবার নাকি, তখন সতীমা বেঁচে—একদল ডাকাত এসে মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, আমাদের আশীর্বাদ করো যাতে আজকের কাজ সু-ভালাভালি হাসিল হয়। তুমি বললেই হবে, তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরোবে তার আর নড়চড় হবে না! আজ খুব বড় শিকার ধরতে যাচ্ছি, পাই তো রাজা—নইলে বিপদ। আশীর্বাদ করো মা, করতেই হবে।' বেশ জোরের ভাব ওদের গলায়—অর্থাৎ এমনি না করেন মা, জোর ক'রে আদায় করবে ওরা আশীর্বাদ।

তা মাও তেমনি। কিচ্ছু বললেন না ওদের, বললেন, 'করব বৈকি বাবা, তা তোরা পেন্নাম না করলে আশীর্বাদ করি কী ক'রে? আর তোরা সব নোংরা ভোংরা ঘাঁটিস, তোদের তো এমনি ছুঁতে দিতে পারি না।...এক কাজ কর বরং—ঐ হিমসাগরে একটা ক'রে ডুব দিয়ে আয়, তারপর পেন্নাম করিস!'

এই কথা—এর আর কি! ডাকাতগুলো হৈ হৈ ক'রে গিয়ে হিমসাগর পুকুরে পড়ল সব। কিন্তু স্নান ক'রে যখন উঠে এল তখন তাদের অন্য মনোভাব। সে শক্তি, সে জোরও নেই আর—ডাকাতি ক'রে টাকা আনবার লোভও নেই। একেবারে বদলে গেছে ওরা এই কটি লহমায়। সটান সব এসে মায়ের পায়ে আছড়ে পড়ল, 'মাগো, মহাপাপী আমরা, আমাদের কৃপা করো—কিসে উদ্ধার পাবো তাই বলে দাও।'

মা হেসে অভয় দিলেন। সেই থেকে তারাও মায়ের সেবক হয়ে গেল।

তা শুধু হিমসাগরে ডুবই নয়—ডালিমতলা পরিক্রমা ক'রে, স্পর্শ ক'রেও মনে শান্তি এল অনেকটা। এই ডালিমতলাই মার সিদ্ধির স্থান, সতীমা এখানেই সিদ্ধিলাভ করে-

ছিলেন। মহা পবিত্র স্থান এদের কাছে। সতীমাই শচীমা। ভবতারণের স্থির বিশ্বাস, আরও অনেকের যে, বাবা আউলচাঁদ—এ'দের প্রথম কর্তা যিনি—তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেব —মহাপ্রভু, আর তাঁর প্রধান সেবক রামশরণ পালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সরস্বতী দেবী সাক্ষাৎ শচীমা, বা মহাপ্রভুর মা। ইনিই শচীমা, সতীমা—কর্তামাও। এ'র গর্ভের সন্তান দুলাল-চাঁদই বর্তমান দেবমোহান্তদের আদি পুরুষ।

মানৎ ক'রে উঠে—ভালয় ভালয় ও পর্বটা চুকে যাওয়ায় মেজাজটা শুধু ঠান্ডা নয়, অনেকখানি খুশীই হয়ে উঠল। একটা গাছতলা বেশ ক'রে নিকিয়ে মুছে নিয়ে কাঠ জেবলে রান্না করল সে—বেশ পরিপাটি ক'রেই রাঁধল। চাল ডাল মায় মশলাবাটা পর্যন্ত পুটুলি ক'রে নিয়ে এসেছিল, রাঁধতে কোন অসুবিধাও হ'ল না। তারপর—খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার সে-ই মেলাটা ঘুরে দেখবার প্রস্তাব করল। ভবতারণেরও তাতে আপত্তি ছিল না বিশেষ। গাছতলায় গাছতলায় এত ভিড় আর এত গোলমাল যে বিশ্রামের কোন সুবিধাই নেই কোথাও। আর যদি চোখটাই না একটু বুজতে পারেন তো শুধু এক জায়গায় 'থুম' হয়ে বসে থেকে লাভ কি? তার চেয়ে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভাল। সঙ্গে এমন পয়সা নেই যে নিস্তারিণী এটা-ওটা কিনে বাজে খরচ ক'রে ফেলবে—সুতরাং আপত্তির কোন কারণও নেই।

বেলা পড়েই এসেছিল, একটু ঘুরতেই সন্ধ্যে হয়ে এল। এবার কোথাও রাত্রের মতো আস্তানা গাড়তে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই এদিক ওদিক দেখছে—হঠাৎ নজরে পড়ল একটা গাছ-তলায় অস্বাভাবিক রকমের ভীড়। আগে মনে হ'ল কেউ ভাল গানবাজনা ধরেছে বুঝি, এমন তো চারদিকেই চলছে—কিন্তু তার পরই খেয়াল হ'ল, কৈ—গান বা কোন বাজনার তো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে? অত জটলা ওখানে কিসের?

...চিরদিনের কৌতূহলী মন নিস্তারিণীর—সে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল ভেতর দিকে। ভবতারণ মৃদু অনুযোগ করলেন, তিনি কোনদিন কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চান না, 'কী হবে ওর মধ্যে গিয়ে—কী না কী—চল্ আমরা এগুই—'

কিন্তু সে কথায় কান দেবার মানুষ নয় নিস্তারিণী, এতগুলো লোক—গান নেই বাদ্যি নেই—মিছিমিছি কিছু আর এত ভীড় করে নি। নিশ্চয় কিছু অর্থ আছে—ব্যাপারটা দেখা দরকার। কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে পা মাড়িয়ে এগিয়ে চলল সে, লোকে এই ঠেলাঠেলিতে বিরক্ত হলেও মেয়েছেলে দেখে কিছু বলল না। কিন্তু একেবারে সামনাসামনি পেঁৗছে নিস্তারিণীর মনে হ'ল—এমনভাবে না এলেই ভাল হ'ত। আর যাই হোক, ঠিক এ দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। কে একটি বৌ গাছ-তলাতেই ওলাউঠো হয়ে নোংরার মধ্যে পড়ে আছে: বোধহয় চরম অবস্থাই—এখনও বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে, দেখলে তো মনে হয় শেষ হয়ে গেছে সব। আর তার পাশে একটা কাঁথার ওপর পড়ে আছে ছোট্ট ফুটফুটে একটি শিশু—সম্ভবত মেয়ে। হয়ত দীর্ঘকাল কিছু খেতে পায় নি, মেয়েটা কাঁদছে অবিরতই—এখন আর ভাল ক'রে কাঁদতে পারছেও না, গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না বেশী, নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ছে কেমন। হয়ত গলা শুকিয়েই গেছে, টাক্‌রায় লেগে ওটাও মরবে এখনই।

একে-ওকে প্রশ্ন ক'রে কিছুই জানা গেল না বিশেষ। কাদের বৌ, কাদের সঙ্গে এসেছে, কেউ বলতে পারলে না। স্বামী সঙ্গে ছিল কিনা—তাও জানা নেই কারও। হয়ত ছিল না, তা'হলে সে অন্তত বাচ্চাটাকে ফেলে পালাত না। হয়ত পাড়াপ্রতিবেশী কারও সঙ্গে এসেছিল মেলা দেখতে কি কিছু মানৎ করতে—এখন এই সাংঘাতিক রোগ বাধিয়ে বসায় বেগতিক দেখে তারা পালিয়েছে।

অনেক লোক ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কাছে ঘেঁষছে না কেউ। রোগ নয়

সাক্ষাৎ যম—একবার ধরলে মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই। কে এগোবে কাছে? বরং যথাসাধ্য নাকেমুখে কাপড় দিয়ে দুর্গন্ধ ও দূষিত বাতাস রোধ করার চেষ্টা করছে সবাই।...তাই বলে উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই অবশ্য। কেউ বলছে 'কনেস্টেবল ডাকো' 'পাহারাওয়ালাকে খবর দাও', কেউ বলছে, 'তোমরা কেউ কর্তার গদীতে জানিয়ে এসো গে', কেউ বলছে, 'আহা কেউ একটু জল দাও না বেচারার মুখে—না জানি কত কষ্টই হচ্ছে!' সবাই বলছে অপরকে সক্রিয় হ'তে—নিজে কিন্তু এগোচ্ছে না।

নিস্তারিণীও প্রথম খানিকটা ইতস্তত করেছিল। ভয় তার নিজের জন্যে নয় একটুও, ঐ গোবেচারা ভালমানুষ বরটার জন্যেই ভয় যা কিছু। যদি নিস্তারিণীর কিছু হয় চোখে অন্ধকার দেখবে একেবারে। কিন্তু সে ভয়ে বেশীক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারল না। বাসন্তী পূর্ণিমার সন্ধ্যা...এদিকে থালার মতো চাঁদ উঠলেও গঙ্গার ওপারে পশ্চিম আকাশ তখনও রীতিমতো লাল। তারই আভা এসে পড়েছে বৌটার মুখে। কাছে গিয়ে নিস্তারিণী হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে ভাল ক'রে দেখল। প্রাণের কোন লক্ষণই নেই আর, হয় মারা গেছে নয় তো শিগ্‌গিরই মরবে, দু'চার মিনিটের মধ্যে। সে আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামাল না, অস্ফুট কণ্ঠে একবার 'যা থাকে কপালে' বলে বৌটাকে ডাইনে রেখে ঘুরে গিয়ে ওধার থেকে বাচ্চা মেয়েটাকে বুকে তুলে নিল।

এবার আর ধাক্কা দিয়ে পথ ক'রে বেরোতে হ'ল না। ঐ সাংঘাতিক রোগের ছোঁয়া নিশ্চয় মেয়েটাকেও লেগেছে, সেই মেয়ে ওর কোলে—সুতরাং ভীড় সরে আপনিই সবাই পথ ক'রে দিল। দু'একজন কেবল ওরই মধ্যে—প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বা সম্বোধনের দায় এড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করল, 'কোথায় নিয়ে চলল গো মেয়েটাকে? এ কে গা? ওদের কেউ হয় নাকি?'

নিস্তারিণী সে কথার কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না! শুধু ভীড়ের বাইরে আসতে ভবতারণও যখন ঐ প্রশ্ন করলেন, 'ও কি, ওকে কুড়িয়ে আনলি কেন? কোথায় নিয়ে যাবি ওকে?' তখন যেন সবাইকে শুনিয়েই উত্তরটা দিল, 'আনব না তো কি গলা শুকিয়ে মরবার জন্যে ঐখেনে ফেলে আসব! মেয়েটা তো গলা কাঠ হয়ে টাক্‌রায় আটকে মরে যাবে এখনি! কিম্বা যদি খুব কাঠ প্রাণ হয়ও—একটু বাদে জ্যান্ত শ্যালে টেনে নিয়ে যাবে। যে গেছে সে তো গেছেই—জলজ্যান্ত একটা মেয়ে সবাইকার চোখের ওপর মরবে?'

'ওমা—তা তুই এখন কি করবি তাই বলে? কী খাইয়ে বাঁচাবি এখন? কোথায় দুধ কোথায় কি—! কি জাতের মেয়ে তাও জানিস না—'

'কেষ্টর জীব—তার আবার জাত কি গা? আর তোমরা তো জাত বিসর্জন দিয়েই বসে আছ, কথায় কথায় আওড়াও—লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর মধ্যে একাকার! তবে আবার কথা কি?'

'তা তুইই কি ওকে বাঁচাতে পারবি?'

'দেখি না চেষ্টা ক'রে। একটুখানি দুধ কি আর কারুর কাছ থেকে মেগেপেতে পাব না? নিদেন গয়লার দোকান তো আছে! না হয় এখনই একটু মিছরির জল গরম ক'রে নিচ্ছি—'

'তার পর? ওর আত্মীয়রা যদি এর পর খুঁজতে আসে?'

'আসে—সে তো ভাল কথাই। যাদের জিনিস তারা নিয়ে যাবে। আমি তো আর এখনই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি না। আজকের রাত, কাল 'পরদিন তো এখানেই আছি। খোঁজ করতে আসে, খুঁজে বার ক'রে নিতে পারবে না? এই তো এতো লোক দেখছে, জেনে গেল সবাই—এরাই খোঁজ দেবে।...নয় তো এখানে ফেলে গেলেই কি খুঁজে পাবে? হাড় ক'খানা

খুঁজতে হবে গে শেয়ালের গর্তে।'

'আর যদি থানাপুলিশ হয় এই নিয়ে?'

'কেন হবে? থানাপুলিশ কিসের জন্যে হবে? আমি কি চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছি? এত লোকের চোখের সামনেই তো নিচ্ছি। আর কেউ নিতে চায় নিক না। কেউ নেবে না, কিছুই হবে না দেখে নিও। মা আমাকে দিয়েছেন—সতীমা! এই জন্যেই টেনে এনেছেন—বুঝলে না, এবার কেন এমন টানাছেঁড়া ক'রে চলে এলুম।'

তারপরই অসহিষ্ণুভাবে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল নিস্তারিণী, 'তোমার সঙ্গে আর আমি বকতে পারি না বাপু, এই পুঁটলিটা ধরো দিকি—কোথাও বসতে পারি কি না দেখি। আগে একটু মিছরির জল মুখে দিই—তারপর দুধের খোঁজে বেরোব...'

॥ ৩ ॥

নিস্তারিণী পরের দিন দুপুরবেলাই ফিরতে চাইছিল, ভবতারণ রাজী হলেন না কিছুতেই। আরও একটা দিন পুরো অপেক্ষা করলেন তিনি—যদি মেয়েটার কোন আত্মীয়-স্বজন খবর পেয়ে আসে, যদি কেউ খোঁজখবর করে! কিন্তু কেউই এল না, অগত্যা গদীতে সব জানিয়ে, নাম-ঠিকানা লিখে রেখে চলে আসতে হ'ল।

নিস্তারিণীর অবশ্য এসব কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না। সে জানত, তার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, কেউ নিতে আসবে না ও মেয়েকে, কেউ খোঁজ করবে না। এ সত্যি-সত্যিই সতীমায়ের দান—স্বপ্নে দেখা সেই শিশুই। মা তো স্বপ্নে ছেলে হওয়া দেখান নি, একেবারে পিছন থেকে কাপড় ধরে টানছে দেখিয়েছেন। সেই কথাই সে বললও ভবতারণকে। এতদিন পরে স্বপ্নের কথা খুলে বলল, কেন অমন দাঁড়িছেঁড়া ক'রে এসেছে সেই কথা। স্বপ্নের কথা আর সৈরভীর কথাটাও। সতীমা-ই তার ওপর কৃপা করেছেন এ সম্বন্ধে অন্তত তার মনে আর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু নিস্তারিণী যত সহজে বিশ্বাস করেছে, ভবতারণ তত সহজে পারছেন কই! তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা নেই। আহা, যাদের বাছা তারা না জানি কী করছে! অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা। মেয়ের মা-ই না হয় নেই, বাপ ঠাকুর্দা ঠাকুমা থাকতে পারে তো, তাদের কি অবস্থা হবে—যখন এরা ফিরবে না, খবরও পাবে না কিছু।

নিস্তারিণী তাঁকে বোঝায়—'এরা ফিরে গিয়ে কি নিজেদের বদনামের ঢাক নিজেরা পিটবে মনে করো? যতই চামার হোক—নিজেরা যে চামার সেটা কেউ কখনও জাহির করে না। কেউ পারে বলতে, যে অমনি ওলা-উঠোর নাম শুনেই আমরা পালিয়ে এসেছি দুধের মেয়েটাকে সুদ্ধ ফেলে রেখে—ম'ল কি বাঁচল আর ফিরে দেখি নি! তারা ঠিক গিয়ে মন-গড়া একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসে থাকবে'খন। হয় বলবে গঙ্গায় ডুবে মরেছে, নয় বলবে বাঘে টেনে নিয়ে গেছে—কি ঐ রকম কিছু। কিন্তু যা-ই বলুক, ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন, এই কথাটাই বলতে হবে তাদের, বলতে হবে—মা-বেটি কেউ আর নেই। নইলেই তো চেপে ধরবে তারা যে, মা না হয় যায়-যায় হয়েছিল, বাচ্চা মেয়েটাকে সুদ্ধ ফেলে

রেখে এলে কোন্ আক্কেলে? এই রকম রাক্ষুসে কাণ্ড ক'রে গেছে জানতে পারলে যাদের মেয়ে তারা ওদের নাকে ঝামা ঘষবে না!'

যুক্তি প্রায় অকাট্য, তবু ভবতারণ খুঁৎখুঁৎ করেন। পরের ঝাঁক্ক ঘাড়ে করা—একটা ছেলে কি মেয়ে মানুষ করা কি সোজা ব্যাপার, না চাট্টিখানি কথা! এত কাণ্ড ক'রে মানুষ করবে নিস্তার, তারপর, দু-চার মাস পোষবার পর মায়া পড়ে যাবে, তখন হয়ত তারা খুঁজে-পেতে এসে হাজির হবে একদিন, বলবে, 'আমাদের মেয়ে আমাদের ফেরত দাও।' তখন কেমন মজাটি হবে? বলে, 'পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে!'

নিস্তারিণী রাগ করে, 'তা তুমিই বা ঢং ক'রে ওখানে নাম-ঠিকানা লেখাতে গেলে কেন? না লেখা থাকলে—হাজার চেণ্টা করুক, কোন কালে খুঁজে বার করতে পারত না!'

একটু চুপ ক'রে থেকে গলায় জোর দিয়ে আবার বলে, 'কিচ্ছু হবে না, তুমি দেখে নিও! মাকে ডেকেছিলুম, মা দিয়েছেন। তোমাদের তো বেশী ভক্তি গো মায়ের ওপর—আমার ছেন্দা বিশ্বোস কিচ্ছু নেই এই শুনে আসছি চিরকাল—তা আমি বিশ্বোস করছি তুমি করতে পারছ না?'

বেশ একটু খোঁচা দিয়েই বলে শেষের কথাগুলো।

ভবতারণ অপ্রতিভ হন কিন্তু উত্তরও দেন একটা। বলেন, 'তুই তো এসব কিচ্ছু বিশ্বাস করতিস না—কত ঠাট্টা-তামাশা করতিস। মা এত লোক থাকতে তোর ওপরই দয়া করতে গেলেন?'

'ওমা, তাই তো করবেন! নিয়মই তো তাই। যে অবিশ্বাস করে তার ওপর দিয়েই তো মহিমে দেখাবেন। নইলে চাঁদ সদাগরের পুজো নেবার জন্যে মা মনসার এত কি মাথাব্যথা! আমাদের মহিম ঠাকুর কথকের মুখে শোন নি যে, ভক্তিভরে যে ডাকে সে সাত জন্ম ঘুরে তবে তাঁকে পায়, আর শত্তুর ভাবে যারা ভজে তারা পায় তিন জন্মেই। বলি কংস শিশুপাল হিরণ্যকশিপুর গল্প কি সব মিথ্যে তবে?'

এ কথার কোন উত্তর দিতে পারেন না ভবতারণ—কিন্তু তেমন নিশ্চিন্তও যে হ'তে পারেন না—তা তাঁর মুখ দেখেই বেশ বোঝা যায়।

কিন্তু দেখা গেল নিস্তারিণীর কথাটাই ঠিক, তার আন্দাজটাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল। দিন মাস ক'রে বছরও কেটে যেতে বসল, কেউ এল না মেয়ের খোঁজ করতে বা দাবী করতে। ক্রমশ ভবতারণ নিশ্চিন্ত হলেন। নিশ্চিন্তই হলেন বলতে হবে, কারণ আগে তাঁর যা মনোভাব ছিল এখন তার উল্টোটা দাঁড়িয়েছে। আগে যা ছিল আশা এখন সেটাই আশঙ্কায় পরিণত হয়েছে। মেয়েটার ওপর মায়া পড়ে গেছে তাঁরও। এখন আর আগের মতো সারাদিন বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতে পারেন না, ফাঁক পেলেই ছুটে বাড়ি চলে আসেন একবার, কোন একটা ছুতো ক'রে, মেয়েকে দেখে যান।

•

আরও কয়েক মাস যেতে দেখা গেল, সতীমার কৃপা শুধু পরের মেয়ে পাইয়ে দিয়েই থেমে যায় নি, সত্যিই নিস্তারিণীর পুজো এবং ভক্তি পাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। দৈবানুগ্রহের ধারাই বোধ করি এই—ঈশ্বর বা দেবতারা কিছুই কুণ্ঠিত হাতে দেন না, না দুঃখ আর না সুখ। এবার নিস্তারিণী নিজেও অন্তঃসত্ত্বা হ'ল। এত বছর বিয়ে হয়েছে, এই প্রথম। গোড়ায় তো বিশ্বাসই হয় নি কারও, অন্য কোন ব্যামো হয়েছে—এই কথাই মনে করেছিল সবাই। এমন কি নিস্তারিণী নিজেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জলপড়া তেলপড়া ঝাড়ফুঁকে সে ব্যামো সারল না—তখন পাড়ার কোন কোন প্রবীণা বললেন একটা দাই এনে দেখাতে। নিস্তারিণী তো ক্ষেপে আগুন। কিন্তু

ভবতারণ কি মনে ক'রে শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই একদিন গিরিবালা দাইকে ডেকে আনলেন।

গিরিবালা এ অঞ্চলের নামকরা দাই—অনেক দেখেছে সে। সুতরাং সে যখন এসে বলে গেল যে, আর দেরি নেই...বড়জোর আর দুটো মাস পরেই কানা-কানী যা হোক হবে, তখন আর কারও কোন সন্দেহ রইল না। নিস্তারিণী তখনই ভবতারণকে দিয়ে এক পয়সার বাতাসা আনিয়ে খাড়া খাড়া হরির লুঠ দেওয়াল এবং বার বার স্বামীকে শুনিয়ে সাক্ষী রেখে মানত করল যে, ছেলে হবার পর সামনেই যে পূর্ণিমা—সেই পূর্ণিমাতে গিয়ে ঘোষপাড়ায় পুজো দিয়ে আসবে, একেবারে ছেলে কোলে ক'রে।

তবু, মায়ের কৃপা সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ যার মনে থাকতে পারত—সেটুকুও আর রইল না, যখন নিস্তারিণীর কোল আলো ক'রে ছেলেই এল শেষ পর্যন্ত। সত্যিই—কোল-আলো-করা শুধু নয়, ঘর-আলো-করা ছেলে। এ ছেলে দেবতারই দান, তাতে কোন ভুল নেই। নইলে নিস্তারিণী কীই বা দেখতে—তার পেটে এই রাজপুত্তুরের মতো ছেলে আসবে কেন? অনেকে বলে বাপের মতো দেখতে হয়েছে, তা ভবতারণের চেহারাটা খারাপ নয় অবশ্য, কিন্তু রঙ বাবা-মা দুজনের চেয়েই ঢের বেশী ফরসা হয়েছে ছেলেব। সেদিক দিয়ে—শুধু সেদিক দিয়েই বা কেন, রঙ মুখ চোখ সব দিক দিয়েই—বোনের উপযুক্ত ভাই। মার পেটের বোন নয়—কিন্তু বলতে নেই—দিদি আর ভাই পাশাপাশি রাখলে কেউ সে কথা বলতে পারবে না। দু'জনেই সমান সুন্দর, দু'জনেই সমান ফর্সা। সাদা কাগজের মতো রঙ একেবারে। এমনটা কী ক'রে হ'ল অনেকেই ভেবে পান না, ভবতারণও না। শুধু নিস্তারিণীরই কোন চিন্তা নেই। সে বলে, 'হবে না? এ কি আমাদের ঘরের ছেলে? মা পাঠিয়েছেন তাঁর চেলাচামুণ্ডু থেকে বেছে বেছে নিয়ে—তাই এত রূপ, বুঝতে পারছ না?'...

ছেলে হবার পর অনেকেই ভেবেছিল, মেয়ের আদর কমবে। হাজার হোক পুষ্যি তো, ষেটের নিজের কোলে যখন এসেছে একটি, তখন কি আর পরের জিনিসে টান থাকবে? দু'একজন সে কথা বলেও ফেলে মুখ ফুটে। কিন্তু নিস্তারিণী যেন শিউরে উঠে মেয়েকে বুকে চেপে ধরে, 'বাপ্ রে, ওকথা কেউ মুখে উচ্চারণ অব্দি করো না। বলে ও-ই আমার প্রেথম, মার দান ও আমার। ওর পয়েই ছেলে হয়েছে। ওর আদর কমবে কী কথা?'

আবার বলে, 'কেন, মা সীতেও তো জনক রাজার কুড়োনো মেয়ে ছিল গো। তা ছাড়াও তো জনক রাজার আরও মেয়ে হয়েছেল। কিন্তু আদরের কোন্‌টি ছেল? সেই কুড়োনো মেয়ের জন্যেই তো যত ছিষ্টি—ধনুক-ভাঙা পণ!...তবে?'

যারা কথাটা তুলতে আসে তারাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত।

আর সত্যিই, আয়পয়ের প্রশ্ন না থাকলেও আদর কমবার কথা নয়। এ মেয়েকে পথের লোকও আদর না ক'রে পারবে না, ফিরে না চেয়ে পারবে না এর দিকে। যেমন রূপ তেমনি মিষ্টি স্বভাব মেয়ের। হেসেই আছে দিনরাত, কারণে অকারণে। কাঁদতে জানেই না মোটে। আর তেমনি—কোল বাছে না কারও, যে হাত বাড়াবে তারই কোলে যাবে। ওদের ও বস্তির কথা ছেড়ে দাও—কটা বড়লোক ভদ্রলোকের ঘরে অমন পদ্ম-ফুলের মতো মেয়ে আছে! নিস্তারিণীর ঘরের ঠিক পশ্চিমে যে দোতলা পাকা বাড়ি, তাতে এক ঘর কায়স্থ ভাড়াটে এসেছে—তাদের বৌটা তো বুক থেকে নামাতেও চায় না। তার নিজেরও দুটি আছে, বেটাছেলে তাও—কিন্তু তাদের ফেলে সে দিন-রাত মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বেড়ায়। তাতে সুবিধেও হয়েছে অনেকটা নিস্তারিণীর—বিশেষ এই খোকা হবার পর—এই বৌটি না থাকলে ওকে বোধহয় মাইনে দিয়ে ঝি রাখতে হ'ত। এখন সকাল হ'তে না হ'তে সে এসে নিয়ে যায়,—তারপর আর মেয়ের ভাবনা ভাবতে হয় না

নিস্তারিণীকে। কাঁথা বদলানো থেকে শুরু ক'রে নাওয়ানো ধোওয়ানো সবই করে সে। শুধু দুপুরবেলা ভাত খাওয়ানোর সময় একবার এখানে নিয়ে আসে। ভাড়াটে বটে, তবে ওর বর বেশ ভাল চাকরি করে—ভবতারণের মুখে অনেকবার সে কথা শুনেছে নিস্তারিণী—তাই বলে দেমাক এতটুকু নেই, স্বচ্ছন্দে ওদের খোলার ঘরে এসে উপস্থিত হয়। ভাত খাওয়াতেই আসে দুপুরবেলা—নইলে দুধ সে নিজেদের দুধ থেকেই খাওয়ায়, নিস্তারিণী হাজার বলা সত্ত্বেও দাম নেয় না কিছুতে। নেহাৎ ভাতটা দিতে ভরসা পায় না বলেই দেয় না। খুকী অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে এসে এক-একসময় ওদের ভাতের থালাতে থাবা বসিয়ে মুখে পুরতে যায়, বৌটি অনেক কষ্টে সামলে রাখে। তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়ে মুছিয়ে দেয়—মুখে দেবার আগেই।

নিস্তারিণী হেসে বলে, 'তা দিলেই পারো, ঐটুকু মেয়ে ওর আবার জাত কি।'

বৌটা শিউরে উঠে বলে, 'বাপ্ রে! তা কি পারি? হাজার হোক বামুনের মেয়ে, জাত সাপের বাচ্চা!'

নিস্তারিণী স্বভাবতই এর পর আর কথা বলে না। তবে অপরে বলে। তারা বলে, 'হ্যাঁ...কুড়ানো মেয়ে, তার আবার জাত। কী জাতের মেয়ে তাই তো জানে না কেউ।'

বৌটি কিন্তু প্রবল প্রতিবাদ করে। বলে, 'ও নিয্যশ বামুনের মেয়ে। বামুনের ঘরের মেয়ে না হ'লে কখনও অত রূপ হয়? বামুন না হয়ে যায় না!'

সেই বৌটিই—দুর্গা নাম ওর—খুকীর নাম রেখেছে। নিস্তারিণীই বলেছিল, 'তোমরা ভাল ঘরের মেয়ে, অনেক শিখেছ—একটা ভাল দেখে নাম রেখে দাও বাপু আমার মেয়ের, যাতে নাম শুনে লোকে সুখ্যেত করে।'

অনেক ভেবেচিন্তে বৌটি নাম রেখেছে সুরবালা। প্রথমটা নিস্তারিণীর অত ভাল লাগে নি। কিন্তু দুর্গা বুঝিয়ে দিয়েছে (তাকে আবার তার বর বুঝিয়ে দিয়েছে—সে কথাও স্বীকার করেছে সে), সুরবালা মানে স্বর্গের মেয়ে, দেবকন্যা। সব দিক দিয়েই এ নাম খাটে। দেবীর দান যখন তখন দেবকন্যা তো বটেই—আর স্বর্গের মেয়ে না হ'লে এত রূপ হয় কখনও? নামের মানেটা বোঝবার পর নিস্তারিণীরও ভাল লেগেছে। বেশ নাম, ঐ নাম না হ'লে কি এ মেয়েকে মানাত!...এর পর ছেলের নামের কথাও বলেছিল, কিন্তু ভবতারণ নিষেধ করেছেন। ছেলের নাম তিনি নাকি ছেলে হবার আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন—ছেলে হ'লে গণেশ নাম রাখবেন। তিনি কারবার ক'রে খান—গণেশই তাঁর ভাল।

নিস্তারিণীর তেমন পছন্দ হয় নি নামটা—কিন্তু ঠাকুর-দেবতার নাম অপছন্দ, সেটা বলতেও সাহসে কুলোয় না। তাই গণেশ নামই বহাল আছে। দুর্গা বলেছিল, তা যদি গণেশের নামই রাখতে হয় তো বরং গণপতি রাখুক, তবু ওরই মধ্যে একটু সভ্যভব্য শব্দটা। কিন্তু ভবতারণ তাতেও রাজী হন নি।

দুর্গা অবশ্য গণেশের জন্যেও করে ঢের। সেই আঁতুড় থেকেই করছে বলতে গেলে। ভবতারণ তো অপটু হাতে দুবেলা ভাতেভাত নামানো ছাড়া কিছু করতে পারতেন না। গাওয়া ঘি আর কলার পাতা, তার সঙ্গে খানকতক গজা—এর বেশী স্ত্রীর জন্যে পৃথক ব্যবস্থাও কিছু করতে পারেন নি। এমন আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই কলকাতাতে যে, সে এসে থাকবে দু-চার দিন। দুর্গাই পাঁচ রকম ভাজা ভেজে দিয়ে যেত, ঘিয়ে ভেজে এনে আল্‌তো ঢেলে দিত পাতে। বলত, 'ঘিয়ে ভাজায় তো কোন দোষ নেই দিদি, শুনেছি। আর তা না হ'লে ময়রার দোকানের খাবার খায় কি ক'রে বামুনরা?'

ভাতপাতের ভাজা ছাড়াও রাত্রের লুচি ভেজে দিয়ে যেত সে, সাবু তৈরী ক'রে দিত। ঘি-মরিচ জ্বাল দিয়ে, ঝালের নাড়ু তৈরী ক'রে দিত। দিশী ঝালের নাড়ু তৈরী করা ছাড়াও আর এক রকমের নাড়ু করতে জানত বৌটি। সে নাকি ছেলেবেলাতে পশ্চিমে

মান্‌ষ হয়েছিল. ওদেশে 'বত্তিশা' বলে নাড়্‌ করে. কাঁচা পোয়াতিকে খাওয়াবার জন্যে—বত্রিশ রকমের উপকরণ লাগে তাই 'বত্তিশা' নাম—তাও ক'রে দিত। অবশ্য ভবতারণ মোটাম্‌টি ঘি ময়দা সাব্‌ মিশ্রী সব কিনে দিয়ে আসতেন। তাছাড়াও তো এটা-ওটা লাগে। আর গতরেই বা এত ক'রে কে।

কিন্তু এ সবই—কার জন্যে করে দ্‌র্গা নিস্তারিণী তা জানত। আসলে স্‌রবালার টানেই তার ওপর টান। আঁতুড়ের কদিন তো স্‌রবালা দ্‌র্গার কাছেই থাকত। তখনও ঢের ছোট. ভাত না খাওয়ালে খ্‌ব ক্ষতি হবার কথা নয়। দ্‌ধ-সাব্‌ আর দ্‌ধ খাইয়ে রাখত ওকে। খইয়ের মণ্ড ক'রেও দ্‌ধে গ্‌লে খাওয়াত। খইয়ে নাকি দোষ নেই—সদা-শ্‌দ্ধ জিনিস। খই যে-কোন জাতের হাতেই খাওয়া যায়।

নিস্তারিণীর অবশ্য অত বাছ-বিচার ছিল না। সে হাসত দ্‌র্গার রকম-সকম দেখে। একে তো একার ঘরকন্না তার. অত ছ্‌ঁই-ছ্‌ঁই চ্‌লচেরা বিচার করলে চলে না। তাছাড়া তাদের যা মন্তর—যেখানে মাথা বিকনো—সেখানেও অত জাতের বিচার নেই। ভবতারণ তো কথায় কথায় আওড়ান. 'লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্ গ্‌র্‌র মধ্যে একাকার।'... ওদের মশাইয়ের বংশ তো সদ্ গোপের বংশ. ওদের আবার জাতের দেমাক কি? বৌটিই আসলে নিজের ধর্ম বাঁচিয়ে চলত। যতই যা হোক—নিচ্‌ বাম্‌ন আর যা-ই হোক না কেন—বাম্‌ন তো! বাম্‌নের ছেলে-মেয়েকে শ্‌দ্দ্‌রের ভাত খাওয়ানো মহাপাপ।

মেয়ে একট্‌ বড় হয়ে কথা ফোটবার মতো হ'তে আরও যেন প্রিয় হয়ে উঠল সকলকার। 'মেয়ে তো নয়—হরবোলা' বলত দ্‌র্গা. 'এত ছিষ্টির কথাও জানে। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি মিষ্টি কথাবাত্তারা বাপ্‌. তোমার ওপর দিদি সত্যিই তোমার সতীমায়ের খ্‌ব দয়া।' একট্‌ থেমে আবার বলত, 'আমার যদি এমনি একটা মেয়ে হ'ত!'

দ্‌র্গার খ্‌ব দ্‌ঃখ তার একটাও মেয়ে নেই। সম্প্রতি আবারও একটা ছেলেই হয়েছে তার। নিজের কোলের ছেলে রোদ্দ্‌রে পড়ে কাঁদে—আর পরের মেয়েকে ব্‌কে ক'রে রাখে তাই।

নিস্তারিণী হেসে বলে, 'খ্‌ব তো মেয়ের শখ! তোদের ঘরে তো এতটি টাকা না ঢাললে মেয়ে পার হয় না। মেয়ে হ'লে দেখিস তোর কত্তা মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। বেটার পর বেটা বিয়োচ্ছিস তাই খ্‌শিতে ডগোমগো। সেদিক দিয়ে আমরা বরং নিশ্চিন্ত—মেয়ের বে দিয়ে ঘরে টাকা তুলব বাজিয়ে। এখনই তো কত সম্বন্ধ আসছে. আমি বলি, না—মেয়ে বড় ক'রে বিয়ে দোব। বয়স একট্‌ বেশী হ'লে মোটা টাকা পাব।'

দ্‌র্গা বলে, 'তেমনি ছেলের বেতে গ্‌ণে গ্‌ণে বার ক'রে দিতে হবে না?'

'সে তখন ছোট মেয়ে ঘরে আনব। দ্‌'তিন বছরের মেয়ে দেখে বে দোব. তিরিশ-চল্লিশ টাকা পণে চলে যাবে।'

মেয়ের বিয়েতে মোটা টাকা পণ নেবার কথা ভবতারণকেও শোনায় নিস্তারিণী। ভবতারণ তামাক টানতে টানতে চিন্তার স্‌রে বলেন, 'স্বঘরে যে বে দিবি বলছিস, পাপ লাগবে না? যদি ও বাম্‌নের ঘরের মেয়ে না হয়? কী জাত তা তো জানি না। তারা তো আমাদের মেয়ে জেনেই নিয়ে যাবে—তাদের আর কি? আমাদেরই ধর্ম আমাদের কাছে!'

নিস্তারিণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে. 'থামো দিকি তুমি। আর শাস্তর আউড়ো না। মা দিয়েছেন আমায়—আমার মেয়ে নয় তো কি? পাপ হয় আমার হবে, আমি নরকে যাব। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না. তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তখন আমি তোমাকে ডাকব না সঙ্গে যেতে।'...

স্‌রবালা সত্যিই যেন কথার ফ্‌লঝ্‌রি ছড়িয়ে বেড়ায় দিনরাত। এত কথা সে কোথা থেকে শেখে. কে তাকে শেখায়—ভেবে পায় না কেউ। অনেক সময় মনে হয় শেখানো বা

শোনা কথা নয়, বানিয়ে বলছে। কিন্তু যেটা বারো বছরের মেয়ের পক্ষেও বানিয়ে বলা শক্ত—সেটা তিন চার বছরের মেয়ের মুখে আরও অসম্ভব অবাস্তব মনে হয়। এমন কি এক-একদিন ভবতারণও 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে ওঠেন ভয়ে, আউলচাঁদ মশাইকে স্মরণ করেন। এ মেয়েতে কোন বয়স্ক লোকের আত্মা ভর করে নি তো?

শুধু নিস্তারিণীই বিচলিত হয় না। সে জানে যে তার ফুটফুটে মেয়ে দিনরাত লোকের কোলে কোলে ঘুরছে। শুধু তো দুর্গাই নয়—ওকে একবার কোলে করবার জন্যে এ বস্তির সকলেই উন্মুখ, রীতিমতো সাধ্যসাধনা করে—কাজেই হরেক-রকম মানুষের মুখে হরেক-রকম কথা শুনছে সে, ছেলেমানুষের স্মৃতিশক্তি একটু প্রখরই হয়—সেগুলো সব মনে ক'রে রাখবে এ আর আশ্চর্য কি। আর হয়ত বুদ্ধিও হবে মেয়ের, কে জানে—তারই পূর্বসূচনা কিনা এটা। কথা শুধু মনে ক'রেই রাখে না, ঠিক কথা ঠিক জায়গাতে প্রয়োগ করতেও পারে।

আর—আর হয়ত পূর্বজন্মের সংস্কারও আছে কিছু!

সেবার শ্রাবণের শেষের দিকে দুর্গাদের পরিচিত এক সন্ন্যাসী এলেন ওদের বাড়ি। সেটা বোধ হয় ঝুলন পূর্ণিমার দিন, দুর্গার বরের ছুটি ছিল, সেই উপলক্ষেই ব্যবস্থা ক'রে আনিয়েছিল সে। ঠিক গুরু যাকে বলে সে রকম কেউ নন, সেকালে কুলগুরু ছাড়া যেখানে সেখানে দীক্ষা নেওয়ার এত রেওয়াজ ছিল না, কুলগুরু ত্যাগ করলে অনন্ত নরক—এই কথাই জানত সবাই—তা সে গুরু যেমনই হোন। 'গুরু ছেড়ে গোবিন্দে ভজে, সে পাপী নরকে মজে'—প্রায়ই শোনা যেত কথাটা।...গুরু নন, এ সন্ন্যাসী পূর্ব-শরীরে দুর্গার বর গোলোকবিহারীর সম্পর্কে ঠাকুর্দা হতেন—বাবার কাকা। সেই হিসেবেই যাতায়াত ছিল। গোলোককে উনি খুব স্নেহ করতেন—ওরও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল খুব। সন্ন্যাসী নাকি যথার্থ সিদ্ধপুরুষ, উনি বললে নাকি যে-কোন দিন সূর্য ওঠা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে, চব্বিশ ঘণ্টা রাত টেনে রাখতে পারেন উনি, হেঁটে নদী পার হয়ে যেতে পারেন অনায়াসে। সাধারণ কোন গৃহস্থবাড়ি যান না, গোলোকের অনেক সাধ্য-সাধনাতেই রাজী হয়েছেন আসতে।

এত বড় একজন সাধু আসছেন শুনে অনেকেই এসেছে। এসেছে নিস্তারিণীও। দুর্গা শেষ রাত্রে উঠে রান্না চাড়িয়েছে। সাধু আসবেন, সঙ্গে অন্তত তিন-চারটি সেবক আসবেন। ওঁরা সন্ন্যাসী, ওঁদের কোন বাধা নেই, কিন্তু দুর্গা তাই বলে ও'দের ভাত খাওয়াতে পারবে না। লুচি মালপোয়া—এই সব ঘৃতপক্ক খাবারের আয়োজন করেছে সে। নিস্তারিণী এসে ধোঁকার ডালনা, ছানার ডালনা, ক'রে দেবে কথা আছে। ডালও সক্‌ড়া—তা তারও একটা ব্যবস্থা করেছে দুর্গা—ডাল ভিজোবার আগে একটু ঘিয়ে ফেলে 'চমকে' নিয়েছে—যাতে ওটা মেঠাই-অঙ্গের পর্যায়ে পড়ে।...

সন্ন্যাসী কিন্তু এলেন বেলা একটারও পরে। দুটো ঘোড়ার বগী গাড়ি ভাড়া ক'রে নিয়ে এল গোলোক। সবসুদ্ধ সাতজন এলেন ওঁরা। গাড়ি থেকে নামতেই দুর্গা এসে আল্‌তো পা ধুইয়ে স্বামীর হাতে নতুন গামছাখানা এগিয়ে দিলে। কিনে ভিজিয়ে মাড় ছাড়িয়ে আবার শুকিয়ে রাখা হয়েছে এই কারণে। কিন্তু নিজে পা মুছিয়ে দিতে সাহস করল না দুর্গা, কে জানে সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ—মেয়েছেলে ছুঁলে যদি অসন্তুষ্ট হন। গোলোকই সকলের পা মুছিয়ে (তাও গুরুর পা মোছাবার পর সে গামছা কেচে নিতে হ'ল, সে গামছায় শিষ্যরা পা মুছবেন না) আবার নিজের হাত ধুয়ে ফুলের মালা ও চন্দন পরিয়ে ভিতরে অভ্যর্থনা জানাল।

কিন্তু দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে হঠাৎ গোলোকের ঠাকুর্দা থমকে থেমে গেলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। লোমগুলো সত্যিই খাড়া হয়ে

শিমূলে কাঁটার মতো দেখাচ্ছে। তিনি সেখানেই চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বাকী সকলে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে আছে তাঁর। এ কী হ'ল, হঠাৎ সমাধি হ'ল নাকি? এমন নাকি কারও কারও হয়, দক্ষিণেশ্বরে কে এক সাধু হয়েছেন, সাদা কাপড় পরেন, এমন জটাজুটও নেই—কিন্তু তাঁর নাকি ভাবসমাধি হয়। এও কি তাই—না অন্য কিছু? কারও কোন অপরাধ হয়ে গেল এর মধ্যে?

না, দেখা গেল সেরকম কিছু নয়। মিনিট তিন-চার পরে সাধু নিজেই 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে মৌনভঙ্গ করলেন, চোখও চাইলেন, শুধোলেন, 'ভাই গোলোক, তোমার কোন মেয়ে হয়েছে এর মধ্যে?'

এ কী প্রশ্ন সন্ন্যাসীর মুখে!

সকলেই অবাক। আগেই অবাক হয়েছিল, এখন আরও। এ ওর মুখের দিকে তাকায়, ও এর মুখের দিকে। এমন কি ওঁর সন্ন্যাসী শিষ্যরাও পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

গোলোক থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সে সবিস্ময়ে বলল, 'মেয়ে? আমার? কৈ না তো!'

'না, না। আমারই ভুল। তোমার ঘরে আসবে কেন, তোমার ঘরে আসবে না। অন্য কোন ব্রাহ্মণকন্যা, কুমারী বা সদ্যোজাতা কন্যা—আছে এখানে?—এর মধ্যে? আমি যে চন্দন তুলসীর গন্ধ পাচ্ছি বাতাসে, রাধিকার প্রিয় গন্ধ। ব্রজের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, রাধারাণীর কথা। এখানে পা দিতেই সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই তাঁর কোন সেবিকা কি প্রিয় সহচরী জন্ম নিয়েছেন। কোন কারণে শাপভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন প্রায়শ্চিত্ত করতে। নিশ্চয়ই তাই। দ্যাখো দ্যাখো, বারে বারে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার গায়ে!'

আবারও সকলে দেখল—সত্যিই রোমাঞ্চ হচ্ছে তাঁর।

দুর্গা তাকাল নিস্তারিণীর দিকে। সৈরভী, হিমি, চমৎকার—সকলেই। সকলের মনেই এই এক কথা। ব্রাহ্মণকন্যা, সতীমায়ের দান। এই সে মেয়ে নিশ্চয়। কিন্তু কে জানে কেন, কেউই মুখ ফুটে সেকথা প্রকাশ করল না। বোধ হয় নিস্তারিণীর কঠিন মুখের দিকে চেয়ে—কিম্বা অন্য কারণে। দুর্গার কারণটা অন্য, সে শুনেছিল শাপভ্রষ্ট দেবদেবী কি কোন উচ্চস্তরের সাধক জন্ম নিলে—কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায়—তিনি আর বেশীদিন বাঁচেন না।

সাধু অবশ্য আর বেশী পেড়াপীড়ি করলেন না। মৃদুকণ্ঠে 'হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে ওপরে উঠে চলে গেলেন।

নিস্তারিণী আগেই মেয়েটাকে কতক আড়াল ক'রে পায়ে পায়ে ভিড়ের পিছন দিকে সরে এসেছিল, এইবার সে টুপ ক'রে তাকে কোলে তুলে নিয়ে এক ছুটে নিজের বাড়ি এসে ঘরে ঢুকে একেবারে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। নিজের ছেলেটা যে ওপরে দুর্গার ঘরে মেঝেতে কাঁথার ওপর পড়ে রইল, গোলমালে ঘুম ভেঙে গেলে মাকে খুঁজবে, কান্নাকাটি করবে হয়ত—সেকথাও মনে পড়ল না। ওর কেমন একটা ভয় হয়েছিল, জানতে পারলেই ঐ মুখপোড়া সন্ন্যাসী কেড়ে নিয়ে যাবে নিশ্চিত।

তা সে হ'তে দেবে না কিছুতেই। বেঁচে থাকতে এ মেয়েকে ছাড়বে না সে। এক বড় হ'লে বিয়ে-থা হয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়—সে আলাদা কথা।

মাগো, এই দুধের মেয়েটাকে জটাওলা সন্ন্যাসী নিয়ে যাবে—সে আবার কি কথা!

॥ ৪ ॥

কথাটা প্রথম কারুরই বিশ্বাস হয় নি। রাঙাবাবুরা নাকি বাড়ি বিক্রী ক'রে চলে যাবেন। সে কি কথা! তাই কখনও হয়! ওঁরা বাড়ি বেচতে যাবেন কী দুঃখে! কত বড় লোক, কত বোলবোলাও, পয়সা কি ওঁদের যে-সে! গোবরডাঙ্গা না তালপুকুর, না কি কাঁচড়াপাড়া—নাকি ঐ বাঙাল দেশের দিকে কোথায় যেন মস্ত জমিদারী আছে। নাম ঠিকমতো জানা না থাকলেও জমিদারীটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেখান থেকে বোঝায় বোঝায় মাল আসছে—সে তো সকলেই দেখছে। শীতের ফসল হরেক রকমের আনাজ আর গুড়, গরমের আম-কাঁঠাল—এত আসে যে পচিয়ে ফেলে দিতে হয় ঝুড়ি ঝুড়ি, গুড়গুলো কলসীসুদ্ধ রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। আমলা-গোমস্তায়, সহিসে-কোচোয়ানে, চাকরে-ঝিয়ে সর্বদা গমগম করে বাড়ি। গাড়িই তো তিন-চারখানা। বাবুর নিজস্ব ভিক্টোরিয়া, বৌ-মেয়েদের ব্রুহাম, খোকাবাবুদের ল্যাণ্ডো আর ফীটন। কত প্রতাপ-প্রতিপত্তি। এই তো ভবতারণদের বস্তির পাশে আকাশ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এতকাল—দুপুর ছাড়া এদের বাড়ি আচার শুকোবার জো নেই—এর মধ্যে একদিনও ও-বাড়ির কেউ এদের দিকে তাকিয়ে দেখে নি পর্যন্ত—কথা বলা তো ছার। চাকর-বাকররাও কখনও কথা কয় না এদের সঙ্গে, বোধহয় তেমনিই কড়া হুকুম আছে। এত আনাজ-কোনাজ ফলমূল পচে নষ্ট হয়, ক্রিয়াকর্ম হ'লে নৌকো নৌকো মাছ মিষ্টি নর্দমায় আঁস্তাকুড়ে ঢালা হয়, তবু এদের কেউ খেতেও বলে না কিম্বা হাতে তুলে দিয়েও যায় না।...এক কথায়—এরা যে আছে, এদের একটা স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, সে সম্বন্ধেই যেন কেউ সচেতন নন। আসলে মানুষ বলেই গণ্য করেন না এদের।

শুধু একবার মাত্র—যখন জমিটা কিনে নিয়ে বস্তি উচ্ছেদ ক'রে বাড়ির পাশের এই কলঙ্কটা দূর করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন রাঙাবাবু—তখনই যা টের পাওয়া গিয়েছিল যে এদের সম্বন্ধে একটু বেশী মাত্রাতেই অবহিত ওঁরা। সেজন্যে নাকি খরচাও কম করেন নি, অসংখ্য দালাল লাগিয়ে ছিলেন, বিস্তর দাম দিতে চেয়েছিলেন—তবে এদের জমিদারও হাটখোলার বড় মহাজন, সে কতকটা ওঁদের জব্দ করবে বলেই, অত দামেও জমি হাতছাড়া করে নি—সে-ই এদের বাঁচোয়া।

তা হোক—ওঁরা মানুষ বলে স্বীকার করুন বা না করুন, বাড়িটা আর বাড়ির মালিকদের নিয়ে এদের কিন্তু রীতিমতো একটা গর্ববোধই ছিল। এতবড় একটা জলজ্যান্ত বড়লোক জমিদার হাতের কাছেই রয়েছে, চেয়ে দেখতে পাচ্ছে দুবেলা—ওঁদের নীত্কীত, ক্রিয়াকলাপ জীবনযাত্রা,—এইটেই যেন একটা সৌভাগ্য ছিল, জীবনের একটা মস্ত সুযোগ মনে করত এরা।

সেই রাঙাবাবুরা বাড়ি বেচে চলে যাবেন—চিরকালের মতো! সে আবার কি কথা!

রাঙাবাবুর আসল নাম কেউ জানে না, ঠিকমতো পদবীটাও না। কায়স্থ—এই পর্যন্ত জানে সবাই। পিতৃদত্ত নামটা কি ওঁর, তাও কেউ কোনো দিন খোঁজ করে নি। এত রকমের বাবু থাকতে রাঙাবাবু কেন—সে কৌতূহল হয়ত জেগেছে কারও কারও মনে, কিন্তু তা নিবৃত্ত করার জন্য ব্যস্ত হয় নি কেউ। সবাই বলে রাঙাবাবু—রাঙাবাবুরা এ পাড়ার মাথা—এই-ই যথেষ্ট। রঙটা সাহেবদের মতো ফর্সা বলেই রাঙাবাবু হয়ত, কিম্বা আপন-জ্ঞাতি মিলিয়ে অনেক ভাই—বড় মেজ হতে হতে ইনি রাঙার পর্যায়ে পড়েছেন। ভাই যে অনেকগুলি তাতেও ভুল নেই। সকলেই পয়সাওলা ওঁরা। ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে যখন সকলে আসেন তখন পুরুষের গায়ের শাল আর দু হাতে দশ-বারোটা ক'রে আংটি আর

মেয়েদের বিভিন্ন বিচিত্র সব গহনা দেখবার জন্যেই পাড়ার সাধারণ অধিবাসীরা দেউড়ির দু দিকে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। এ সবের দাম কী, এক-একজনের গায়ে কত টাকার জিনিস আছে, তা কারও ধারণাতেও আসে না—হিসেব করতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে। চমৎকারীকে সামান্য এক জোড়া ইহুদী মার্কাড়ি গড়াতে তিন বছর ধরে পাই পাই ক'রে টাকা জমাতে হয়েছিল।

তবে ওঁরা বাড়ি বেচে চলে যাচ্ছেন কোন্ দুঃখে?

প্রশ্নটা সকলের মনেই জেগেছিল। খোঁজও করেছে সবাই সাধ্যমতো। তার যা উত্তর শোনা গেছে—তা আরও আশ্চর্য। উনি বেচে যাচ্ছেন না, বাড়ি নাকি দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে। এ বাড়ি নাকি দু-দুবার শীলেদের গদীতে বাঁধা পড়েছিল, উধরে নেবার মতো ক্ষমতা আর এঁদের ছিল না। শীলেরাই সুদে-আসলে গ্রাস করার তালে ছিল, সস্তায় কিস্তি মারবে বলে—মানে বাড়ির সঙ্গে অন্য কোন অস্থাবর কিছু আটকানো যায় কিনা—এই ভেবে নিলামে তুলেছিল ওরা। মানে মানে চাইলে হয়ত বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন রাঙাবাবুরা, কিন্তু নিলামে তুলতে আরও পাঁচটা খদ্দের এসে গেল। তার মধ্যে মতি কীর্তনউলীর খুব পছন্দ, দক্ষিণ খোলা বাড়ি বলে, বরাবর শীলেদের থেকে হাজার টাকা ক'রে বেশী বলে বলে তার উকীল দর এমন তুলে দিলে যাতে এযাত্রা সুদ-আসল শোধ হয়েও দু-এক হাজার হাতে পেয়ে যাবেন হয়ত রাঙাবাবু। যা ন্যায্য দাম হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে ঢের বেশীই দিয়েছে নাকি মতি।

এদের বাড়ি নিলামে বিক্রী হবে—এটাও বিশ্বাস হবার মতো কথা নয়।

কিন্তু কানাঘুষোয় একই কথা শোনা যেতে লাগল সকলের মুখে মুখে। এ বাড়ির দাসী-চাকররা আগে কারও সঙ্গে কথা কইত না—কতকটা দেমাকেও বটে, কতকটা মনিবের শাসানিতে বটে—এখন তারাই বেরিয়ে পড়েছে পাড়ায় কাজের খোঁজে। তাদের মুখ থেকে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসতে লাগল ভেতরের সব কথা। বাবুরা আর কলকাতায় থাকবেন না, থাকতে পারবেন না নাকি। বাবু কোন এক সাহেবের সঙ্গে কী সব কারবার করতে গিয়ে বিস্তর পয়সা ডুবিয়েছেন, বাজারে এখনও এত দেনা আছে যে, এখানে থাকলে খুবলে খাবে সবাই। তাই অন্য ভাইরা পরামর্শ দিয়েছেন দেশে গিয়ে থাকবার। সেখানকার বাড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, ফলফসল পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে। আমলা-গোমস্তারাও পেয়ে বসেছে—যা-খুশি হিসেব দেয় আজকাল। সেখানে থাকলে আদায়-আগুাম বেশী হবে, এক রকম ক'রে ঠাট বজায় রেখেও চলে যাবে। এখানে থাকলে বাড়ি ভাড়া করতে হয়—কতবড় বাড়ি আর ভাড়া করতে পারবে? ছোট বাড়িতে গেলে সকলকার মাথা হেঁট। তার চেয়ে কাদায় গুন ফেলে দেশেই থাকুক, যদি ভগবান আবার দিন দেন, ছেলেগুলো মানুষ হয়—বাড়ি কিনে কলকাতায় ফিরতে কতক্ষণ?

অর্থাৎ বাড়ি বিক্রী সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না। আর এটা যখন সত্য হ'ল তখন ওটাও হবে নিশ্চয়। মানে মতি কীর্তনউলীর কথাটা। খবরটায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হ'ল। আশপাশের ভদ্র বাসিন্দারা তো বটেই, খোলার বস্তির লোকরা, মায় ওধারের প্রায়-অস্পৃশ্যা মাটকোটার অধিবাসিনীরাও। এত বড় একটা সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে শেষে এক কীর্তনউলী এসে বসবে! ওরা তো নাকি সব নষ্টস্বভাবের মেয়েই হয় বেশির ভাগ। ঐ ঘরের মেয়ে না হ'লে এসব শিখিয়ে রোজগারে দেবে কেন!...ছি-ছি, ভদ্রলোক কাউকে বাড়ি বেচে যেতে পারলেন না রাঙাবাবুরা?

সবাই শীলেদের দোষ দিতে লাগল। ওরা যদি অতি-লোভ না করত—তাহ'লে ওদের নামেই হস্তান্তর ক'রে দিতেন রাঙাবাবু। তাতে চুপিচুপি কাজ সারা হ'ত, তাঁরও সম্মানটা বজায় থাকত খানিক। আর তাহলে অন্তত ভদ্র এক ঘর ভাড়াটে বসত। এমন-

ভাবে গোটা পাড়াটা বেইজ্জত হ'ত না।

কিন্তু দেখা গেল এদের ক্ষোভ বা ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কিছু এসে গেল না। একদিন মালপত্র নিয়ে চলেই যেতে হ'ল রাঙাবাবুদের। ফার্ণিচার বেশির ভাগই চলে গেল সাহেবী কোন্ নিলাম কোম্পানীতে। সে জায়গায় গাড়ি বোঝাই হয়ে আসতে লাগল মতির আসবাব। বেশ সমারোহ-সহকারেই গৃহ-প্রবেশ করল সে। একজন ব্রাহ্মণ এসে পাড়ার ইতর-ভদ্র সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল, মায় বস্তির ভাড়াটেদের সুদ্ধ। ব্যবস্থা যা হয়েছিল তা কোন জমিদারবাড়ির থেকে কম নয়। যাঁরা মাছ-মাংস খাবেন তাঁদের জন্যে ঢালা বন্দোবস্ত কালিয়া পোলাও। যাঁরা খাবেন না তাঁদের জন্যে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি, সাত-আট রকমের মিষ্টি রাবড়ি ক্ষীর। তাও যাঁরা খেলেন না, তাঁদের জন্যে খইয়ের ফলার ব্যবস্থা। ক্ষীর, সাবরি কলা, আম, খই আর সন্দেশ। এ বাড়িতেই যাঁরা খাবেন না মোটে —তাঁদের অনুমতি নিয়ে ময়রার দোকান থেকে লোক দিয়ে দই-মিষ্টি পাঠানো হ'ল। সন্ধ্যায় গান-বাজনারও আয়োজন হয়েছিল, সেখানে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোক প্রায় সবাই এলেন, সে আবার আর এক ধরনের আয়োজন। দেখা গেল সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের থেকে কীর্তনউলীর নজর, বিনয়, বিবেচনা এবং ভদ্রতা ঢের বেশী। তবুও এক দল লোক খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। স্বতন্ত্র পৃথক থাকা এক ধরণের আভিজাত্য যা শুধু সেই কারণেই সম্ভ্রমের উদ্রেক করে মনে। কিছু মানুষ দূর থেকে ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে ভালো-বাসে, সহজে যা দেখা যায় তাকে দ্রষ্টব্য বলে মনে করে না।

মতি পাকাপাকি ভাবেই পাড়ার বাসিন্দে হয়ে বসল।

কীর্তনউলী বলতে ঠিক কি বোঝায় তা এরা কেউ জানত না। ওদের সঙ্গে বাইউলী, তয়ফাউলী বা ঢপউলীদের তফাৎ কী, সে সম্বন্ধেও ধারণা খুব অস্পষ্ট। অনেক-কিছু বেলেল্লাগিরি আশঙ্কা করেছিল এরা। হয়ত রাত্রে মদোমাতালের হুল্লোড় হবে, চেঁচামেচি গালিগালাজ—কিম্বা হরেক জাতের মানুষের আনাগোনা। এখন দেখা গেল সে সব কিছুই হয় না। আওয়াজের মধ্যে যা পাওয়া যায়—গান-বাজনারই শব্দ। রোজ সকালে রেওয়াজ করতে বসে ঘণ্টা দুই-তিন—সেই যা ওর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তাও ভালই লাগে। তাকে রেওয়াজ বলাও ভুল, গলা সাধা-টাধা কিছু নয়—সাধা গলা আর সাধবে কি! —খোলকর্তাল বাজিয়ে রীতিমতো গানই। মতির গলা যেমন চাঁচাছোলা, তেমনি শিক্ষা আর কর্তব। শুনতে ভালই লাগে, বিশেষ ভগবানের নাম।

এক-আধ দিন সকালে মুজরো পড়ে যায় শ্রাদ্ধবাড়িটাড়িতে,—সেই দিনগুলোতেই যেন আজকাল খারাপ লাগে বরং। পাড়া ঝিমিয়ে থাকে। তবে মুজরো বেশীর ভাগই থাকে বিকেলে বা সন্ধ্যায়। বাবুদের গাড়ি এসে দাঁড়ায় দু-তিনখানা ক'রে, কিম্বা ভাড়াটে গাড়িই—তাতে সাঙ্গোপাঙ্গো যন্ত্রপাতি বোঝাই ক'রে মতি গাইতে যায়। ফেরে অনেক রাত্রে। তারও পরে নাকি এক-আধ দিন এক-আধটা বড় গাড়ি এসে লাগে দোরে, কোনদিন কোন বাবু নামেন, কোনদিন বা মতিই উঠে বসে। তবে সে এত গভীর রাত্রির কথা, এরা কেউ বিশেষ খবরও রাখে না।

মুজরোয় যাবার সময় যা হীরে-জহরৎ গহনা পরে যায় মতি তা কোন অংশে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের থেকে কম নয় এবং হয়ত বেশীই, অবিশ্যি যদি ঝুটো না হয়। সৈরভী বলে নিস্তারিণীকে, 'বাবুদের বাড়ির ঝি-বউরাই বরং এদান্তে ইহুদী সাহেবের দোকান থেকে ঝুটো ইংরিজী জড়োয়া-গয়না এনে পরত, আসলগুলো বিক্রী হয়ে গেছে কবে। এরই বরং সব সাচ্চা।'

কে জানে। এরা সে সব বোঝে না। একটা ব্যাপারে নিস্তারিণীর খুব হাসি পায়। 'এত সব ভাল ভাল গহনার ওপর মেডেলের মালা ঝোলায় কেন গা কীর্তনউলী? ও আবার কী মালা? অমন সীতাহার গিনির মালার ওপর কতক সোনার কতক রুপোর

মেডেলগুলো—কী ছব্বাই হয়! কী হয় ওগুলো পরে, চেনা বামুনের আবার পৈতের দরকার হয় নাকি?'

সুরবালা খুব চঞ্চল স্বভাবের নয় কখনই। ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে বলেই আরও সকলের প্রিয়। গণেশটাই বরং দস্যি হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। যখন-তখন ঢিপঢিপ ক'রে পিটে দেয় দিদিকে। সুরবালা আপনমনে নিজের একরাশ মাটির খেলনা—রথ, জগন্নাথ, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে দাওয়ায় বসে খেলা করে। একটু বড় হতে ভবতারণ একখানা সেলেট কিনে দিয়েছেন, প্রথম ভাগও। মধ্যে মধ্যে নিজেই নিয়ে বসেন। নিস্তারিণী আগে আগে একটু আপত্তি করেছিল, মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বেশী দিন বাঁচে না। ভবতারণ ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন কথাটা। বলেছেন, 'দুশো বছর আগের মানুষ, বুঝলে? এ সময় জন্মানোটাই ভুল হয়েছে তোমার। ওসব আইন ছিল যখন—তখন কি এমন পথেঘাটে গ্যাস জ্বলত, না কল টিপলে জল বেরোত? দেশের রাজা যেমন চলবে প্রেজাদেরও তেমনি চলতে হবে। রাজা এখন ইংরেজ, তারা মেয়েদের তো ইস্কুলই খুলে দিয়েছে। দ্যাখো গে যাও হুদো হুদো মেয়ে পড়ছে সেখানে। সবাই মরে গেল একেবারে! তুমিও যেমন সেকেলে ভূত—নিজের নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করো না!'

সত্যিই করে না নিস্তারিণী। স্বামীর নামের তারণ কথাটার সঙ্গে তারিণী শব্দের অনেকখানি মিল আছে বলে—সহজে বলে না। বলে, 'ঐ যে, ওনার নামের শেষটার আগে একটা নি বসিয়ে নাও না, দ্যাখো না কী দাঁড়ায়।' বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলে, 'নিস্ফারিণী'।

বিয়ের কথা কোন পক্ষই তোলে না। তবে সে দুজন দু কারণে। নিস্তারিণীর আশা বয়স বেশী ক'রে বিয়ে দিলে পণ বেশী পাবে। ভবতারণ এখনও স্বঘরে বিয়ে দেওয়া উচিত হবে কি না মনস্থির করতে পারেন নি। কোনমতে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন আর মনে মনে তোলাপাড়া করছেন কি করা উচিত। নিস্তারিণী ক্ষেপে উঠলে দিতেই হবে, যতদিন না ক্ষেপে ওঠে ততদিনই মঙ্গল। তাই উচ্চবাচ্য করেন না কথাটা।

মতি পাড়ায় আসবার পর থেকে কিন্তু সুরবালার সেই সামান্য খেলাটুকুও চলে গেছে—বিশেষ ক'রে সকালবেলাটায়। মতি যখনই রেওয়াজ শুরু করে—মেয়ে সব খেলনা-টেলনা ফেলে সেইদিকে কান পেতে কাঠ হয়ে বসে থাকে। আর কোন দিকেই মন থাকে না তখন। সে সময় কেউ এলে, মার কোন ভাবীসাবী বা পাড়ার কেউ এসে গল্প শুরু করলে বিরক্ত হয়। এমন কি ওর অত ভালবাসার দুর্গামা এলেও। দুর্গামা আজকাল এ পাড়া ছেড়ে চলে গেছে—সেই দর্জিপাড়ার দিকে কোথায় একটা ছোট বাড়ি কিনেছে ওর বর—নিহাৎ সুরবালার মায়াতেই এক একদিন পাল্‌কি ভাড়া ক'রে ছুটে ছুটে আসে গঙ্গা নাইবার ছুতো ক'রে।

অন্যদিন দুর্গাকে দেখলে সেই ছেলেবেলাকার মতো ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'ও দুগ্‌গা মা, আমার জন্যে কী এনেছ বের করো শিগগির', কিন্তু এই গানের সময় এলে যেন চিনতেই পারে না। চেয়ে দেখে কিন্তু চোখে পরিচয়ের জ্যোতি ফোটে না। প্রথম দিন দুর্গা খুব আহত হয়েছিল, তারপর সে-ই আবিষ্কার করল—কান ওর খাড়া হয়ে রয়েছে পাশের বাড়ির দোতলা থেকে ভেসে আসা সুরের দিকে। দৃষ্টিও বাইরে থেকে সংহৃত হয়ে মনের গভীরে ডুব দিয়েছে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করছে সঙ্গীতরস। ঐটুকু মেয়ের এ মনোযোগ অস্বাভাবিক! ওর ওপর কিছু একটা ভর হয়েছে বলেই মনে করা চলত যদি না নিজের অজ্ঞাতসারেই হাত ও পায়ের আঙুল তাল দিয়ে যেত গানের সঙ্গে সঙ্গে।

দেখেশুনে দুর্গা বলেছিল, 'দিদি, তোমার এ মেয়েও এককালে বড় গাইয়ে হবে—

দেখে নিও। এই বয়সে এমন গানের নেশা তো শুনি নি কখনও!'

'পোড়াকপাল! ওকে গান শিখতে দিচ্ছে কে। ভদ্দরলোক, বামুনের ঘরের মেয়ে, শেষে কি বাইউলী হবে নাকি! ঝ্যাঁটা মেরে গান শেখা ঘুচিয়ে দোব না!'

কিন্তু তাতে যে সুরবালা বিশেষ ভয় পেয়েছিল তা মনে হয় না। মধ্যে একদিন ঝি-দারোয়ানদের নজর এড়িয়ে ওপরে দোতলার বড় হলঘরটাতে—যেটা রাঙাবাবুর আমলে বৈঠকখানা ঘর ছিল, 'দিশী বিলিতী আসবাবে আর হরেক রকমের ঘড়িতে সাজানো'—চলে গিয়েছিল। সেইখানেই মতির রেওয়াজের আসর বসে আজকাল। সেদিনও বসেছিল। সুরবালা দরজার বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনছিল। শেষে মতিই দেখতে পেয়ে ডেকে বিস্তর আদর ক'রে একরাশ সন্দেশ আর কমলালেবু সঙ্গে দিয়ে ফেরৎ পাঠায়। সুরবালা নিতে চায় নি, থাকেও নি বেশীক্ষণ, কোনমতে এঁকেবেঁকে ওদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়েছিল, ঝি পিছু পিছু এসে দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল লেবু সন্দেশগুলো।

সেদিন খুব মেরেছিল ওকে নিস্তারিণী। বলেছিল, 'ফের যদি ঐ বেবুশ্যে মাগীর বাড়ি যাবি তো চিরদিনের মতো ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। আমাদের পুণ্যের ঘরে ওসব পাপের হাওয়া ঢোকানো চলবে না, ওসব আমাদের সহ্য হবে না।'

একটা মিষ্টিও ছেলেমেয়েকে খেতে দেয় নি নিস্তারিণী, সৈরভীকে ডেকে সব ধরে দিয়েছিল। তার জন্যে এমন কি ভবতারণ সুদ্ধ খুঁৎখুঁৎ করেছিলেন, 'করলি কি বৌ, আসল সিলেটের নেবু—ওগুলো অন্তত রাখতে পারতিস। ফলে দোষ কি?'

'না, ও একটা থেকেই আর একটা এসে পড়বে। আমার সতীমায়ের দোরধরা ছেলে-মেয়ে—ওদের ওসব পাপের খাওয়া সইবে না।'...

সেদিন থেকে আর কোনদিন ওপরে ওঠে নি সুরবালা, কিন্তু ভালভাবে গান শোনার একটা সুবিধে ক'রে নিয়েছিল। দাওয়া থেকে নেমে যে খোলা জমিটা—উঠোন-মতো—তারই একান্তে, মতির জানলার ঠিক নিচে একটা পিঁড়ি পেতে বসত—আর একমনে যেন ধ্যানস্থ হয়ে শুনত সে গান। মনে হ'ত সত্যিই ধ্যানে বসে আছে সে—যেন কোন বাহ্যজ্ঞান থাকত না। শুধু তালে তালে পা-নড়া আর ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা যেত যে অজ্ঞানটজ্ঞান নয়—মনটা সম্পূর্ণ ঐ গানে পড়ে আছে এই পর্যন্ত।

গান পেয়ে বসলে বেশীদিন নীরব থাকে না, শুধু শোনা নয়, গলা ছেড়ে গাইবার ইচ্ছাও সুরবালার প্রবল হয়ে ওঠে ক্রমশ। আপন মনে গুনগুন ক'রে গায় আজকাল প্রায়ই। ছেলে হবার পর ওদের ঘর থেকে শুক্রবারের আসর উঠে গেছে, উঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে নিস্তার, কিন্তু মেয়ের গানে উৎসাহ দেখে ভবতারণ দু-এক শুক্রবার বা পূর্ণিমেতে, নতুন যেখানে আসর বসে সেখানে নিয়ে গেছেন সঙ্গে ক'রে; মেয়ে গেয়েওছে তাঁদের সঙ্গে, গান তুলেও এনেছে—বাবাকে শোনাবার জন্যে গায়ও মধ্যে মধ্যে—কিন্তু 'এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো' এসব গান যে ওর ভাল লাগে না—তা বোঝা যায় বেশ।

ভাল লাগে ওর কীর্তনই। তা-ই গায় সে। প্রথমে গুনগুন ক'রে গেয়েছিল দু'চার দিন, তারপর ভরসা ক'রে ওরই মধ্যে গলাটা ছেড়েছিল একটু। অনভ্যস্ত গলা, দু' একদিন ঠিক সুরে বলে নি হয়ত—কিন্তু তারপরই পরিষ্কার হয়ে গেল। নিস্তারিণী গোড়ায় গোড়ায় শাসন করার চেষ্টা করত—আদর্শটা খারাপ বলে—কিন্তু পাড়ার পাঁচ-জনের বাহবার শেষে তাকেও হাল ছাড়তে হ'ল। গর্বও তো বোধ হয়, সেটা দমন করা শক্ত বৈকি!

'যাই বলো বাপু শিক্ষে নেই, দীক্ষে নেই—এটুকু মেয়ে দূর থেকে শুনে শুধু অমন তুলে-নেওয়া—কে আর কেউ পেরেছে বলে তো শুনি নি কখনও—দেখা তো চুলোয় যাক!'

ঐটুকু মেয়ে আরও একটা ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার ছিল। মতি যখন বাড়িতে থাকত—তখন হাজার অনুনয়-বিনয়েও তাকে কেউ দুটি ঠোঁট ফাঁক করাতে পারত না। এটুকু বুঝত—অত বড় গাইয়ে কাঁচা গান শুনে হয়ত হাসবে, নকল করার চেষ্টা দেখে হয়ত ঠাট্টা করবে। সে সব সময়ে, এমন কি আপন মনে গুনগুন ক'রেও গাইত না। মতি মুজরোতে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত জানলে তবে গান ধরত। এ বিষয়ে তার জেদ ছিল অসাধারণ।

কিন্তু একদিন নিস্তারিণীই সব গোলমাল ক'রে দিল। তারও সন্তানগর্ব—মনে হ'ল তার এই দুধের মেয়ে অতবড় নামকরা কীর্তনউলীর থেকে কিছু খারাপ গায় না। একবার মতিও শুনুক তার ঐ একফোঁটা মেয়ের কী শক্তি। সে জেনেশুনেই একদিন মিথ্যে কথা বললে। বিন্দের মা একখানা গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করায় সুরবালা আড়ে বড়বাড়িটার দিকে চেয়ে যখন অস্বীকার করল—তখন হঠাৎ বলে বসল সে, 'ও—তুই কেত্তনউলীর কথা ভাবছিস? ওমা—সে তো সেই বেলা দেড়টা দুটোর সময় বেরিয়ে গেছে। তুই তখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিস, তুই জানবি কি ক'রে!'

সুরবালা বিশ্বাস করল কথাটা। নিস্তারিণী বড় একটা মিছে কথা বলে না, তাছাড়া হঠাৎ এ ব্যাপারে সে গায়ে-পড়ে মিথ্যে বলতে যাবে—এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তাকে গাওয়াবার এমন ধরনের উৎসাহ যে তার মায়ের আছে তাও এ পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি। সে নিশ্চিন্ত হয়ে গান ধরল। আর ধরলও মতির প্রিয় গান—গোষ্ঠ পালার

"নবীন মেঘের ছটা জিনিয়া বিজুরি ঘটা
ভালে কোটি চন্দনের চান্দ।
শিরে শিখী শ্রীখণ্ড ঝলমল করে গণ্ড
মুখমণ্ডল মোহন ফান্দ॥"

গান গাইতে শুরু করলে তার আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। আজকাল নিজের ওপর ভরসা বেড়েওছে অনেকখানি, গাইবার সময় বেশ গলা ছেড়েই গায়। গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে যায় যখন, তখন আশেপাশে কে আছে আর কে এসে বসল তাও হুঁশ থাকে না। আজও সে খেয়াল রইল না তার একটু পরে—তাই কখন যে বড়বাড়ির বিখ্যাত কীর্তনওয়ালী জানলা দিয়ে তার গানের আওয়াজ পেয়ে একেবারে নেমে এসে তাদের উঠোনে দাঁড়িয়েছে তা জানতেও পারল না।

নিস্তারিণী মুখে যত যা-ই বলুক, অত বড় মানুষটা (বড়লোক তো বটেই—গান-গাওয়া পয়সায় যে রাঙাবাবুর মতো ধনী জমিদারকে উচ্ছেদ ক'রে বাড়ি কিনতে পারে, সে মানুষটাও বড় কেওকেটা নয়) ওদের এই মাটির ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াবে কোন-দিন—এ তার কাছে স্বপ্নেরও অগোচর। গান শুনে—তাও যদি কানে যায়, ঘুমোয় তো সবই মাটি—চমকে যাবে, মনে মনে বাহবা দেবে, এইটুকুই মাত্র ভেবেছিল, তাতেই তার অহঙ্কার যথেষ্ট চরিতার্থ হ'ত। একেবারে সোজাসুজি সশরীরে নেমে আসবে তা একবারও মনে করে নি।...সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছিল—মতিই বন্ধ ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে নিরস্ত হবার ইঙ্গিত করল। দাঁড়িয়েই রইল সে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে গান শুনতে লাগল, বিন্দের মা যে তাড়াতাড়ি নিজে মাটিতে বসে আসন-খানা ওর দিকে টেনে এগিয়ে দিল তাও লক্ষ্য করল না।

মতি সত্যিই অবাক হয়ে গেছে। সামান্য আট দশ বছরের মেয়ে বলে নয়, বা গরীবের ঘরের মেয়ে বলেও নয়—ঈশ্বরদত্ত গলা অনেকেরই থাকে, ঈশ্বর এসব অনুগ্রহ বিতরণের সময় কুলশীল ঘর কিছুই বাছেন না, তা মতি ভাল ক'রেই জানে—একেবারে কোথাও কারও কাছে না শিখে যে এমন গাইতে পারে কেউ, শুধুমাত্র দূরে থেকে অপরের গান শুনে, এইটেই জানত না এতকাল। তাতেই এত তাজ্জব বনে গেছে সে। কোথাও কোন

ভুল নেই—না সুরে না তালে—শুধু শুনে শেখা বলেই যা একটু মাপাজোপা, যেটুকু শুনেছে তার চেয়ে বেশী আর এগোতে পারে নি। যেখানে তালটা আরও বাড়ানো যেত বা যেখানে আখরটা একটু বদলে বদলে গাইলে ভাল হ'ত, কিম্বা দু'চারবার ফিরে ফিরে গাইলে আরও মিষ্টি লাগত, সেই জায়গাগুলোতেই সুশিক্ষার অভাব বোঝা যাচ্ছে। এই-খানেই কাঁচা গাইয়ে আর পাকা গাইয়েতে তফাৎ। পাকা গাইয়েরা ভরসা ক'রে নতুন সৃষ্টির পথে যেতে পারে, কাঁচা গাইয়েদের হাত-পা বাঁধা—খাঁচার পাখীর মতো শেখা বুলিতেই সীমাবন্ধ সে।

তা হোক—এ কাঁচাও সাধারণ কাঁচা নয়। বহুদিনের অভ্যাস না হ'লে ঐ রকম পাকার স্তরে পেঁছনো যায় না। অভ্যাস আর অভিজ্ঞতা দুটোই চাই। এ বয়সে ওস্তাদের কাছে শিখলেও অতটা ভরসা পায় না মানুষ। এই বয়সে এ মেয়ে যা গাইছে তা সাধারণ গুরু-দত্ত শিক্ষাকে ছাড়িয়ে গেছে। একলব্যের কথা শোনা আছে, গল্পকথাই ভেবে এসেছে এত কাল, তেমন যে হয় তা কখনও বিশ্বাস হয় নি। এবার বুঝল যে সেরকম সাগরেদ সত্যিই থাকে, কেউ কেউ পায়। চোখে না দেখলে মতি বিশ্বাসই করত না যে এ-মেয়ে কোথাও শেখে নি গান—শুধু দূর থেকে শুনে তুলেছে গলায়।

অবাক হয়েছে যত, তত মুগ্ধও হয়েছে মতি। সে-মোহ ক্রমশ তার সতর্কতাকেও শিথিল ক'রে দিয়েছে একটু একটু ক'রে। সুরবালা গাইছিল—

'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে—
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।'

ফিরে গাওয়ার সময়ে 'বদন ছাড়িয়ে নাহি পারে'-র পর যখন পুরাতন আখরই গাইতে যাচ্ছে আবার, তখন মতি আর সামলাতে পারে না নিজেকে, নিজের অজান্তেই দোয়ারকি ধরে, 'শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম, শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম, আহা কি মধুর, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, আহা কি মধুর—'

সুরবালাও অত বুঝতে পারে নি প্রথমটায়—সুরের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, সেও সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারেই মতির গলায় গলা মিলিয়েছিল, ভালই লাগছিল তার। সে সময়টুকুর অভিজ্ঞতা নিস্তারিণী জীবনেও ভুলবে না—অথচ বোঝাতেও পারবে না কাউকে। এমন সে শোনে নি কখনও। গান যে এমন মিষ্টি হ'তে পারে, মন শুধু নয়—দেহটাকে সুদ্ধ অবশ-বিবশ ক'রে দিতে পারে—তা এই প্রথম জানল। তার চোখে জল এসে গেল আপনা-আপনিই।

কিন্তু সে ঐ দু-এক মিনিট মাত্র। তারপরেই হঠাৎ খেয়াল হ'ল সুরবালার, চমকে ফিরে চেয়ে সাক্ষাৎ মতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আর তার সঙ্গে গাইতে দেখে আরও চমকে উঠল। অসমাপ্ত গান গলায় আটকে গেল তার। এতখানি জিভ কেটে উঠে পড়ল সে, তারপর দুড়দাড় ক'রে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দড়াম ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

'ওমা—কী হবে মা, কী অসভ্য মেয়ে রে বাবা...অ সুরো, সুরো—ও কী রে' বিষম অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে নিস্তারিণী, 'বসুন দিদি, কী ভাগ্যি আজ আমাদের...আর বসবেনই বা কোথায় ছাই, এখেনে কি আর আপনাদের বসবার মতো কোন ব্যবস্থা আছে! এ শুধু আমাদেরই চলে—'

'না না, তা কেন। বসছি এই। আপনারা বামুনের মেয়ে যেখানে বসেন, সেখানে বসতে পাওয়াই তো ভাগ্যের কথা...দাওয়াতেই বসছি বাপু, অপরাধ নেবেন না যেন।' বলে মতি সত্যি সত্যিই দাওয়ায় উঠে মাটির ওপরে বসে পড়ে। বিন্দের মা আস্তে আস্তে আসনটা এগিয়ে দিচ্ছিল, জোর ক'রে তার হাত থেকে সেটা টেনে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে

তুলে সরিয়ে রাখল মতি, 'ছি ছি, তাই কখনও পারি। দাওয়ায় বসছি এই কত, তাই বলে কি বামুনের ব্যবহার করা আসনে বসতে পারি!...আপনারা ব্যস্ত হবেন না, এই আমি বেশ বসেছি। চিরদিনই তো আর বড়লোক ছিলুম না।...তবে তাও বলি, আমি যা-ই হই, মা আমার ভাল বড় কায়েতের ঘরের মেয়ে ছিল, বড় জমিদারের বৌ। নেহাৎ কপাল মন্দ, তাই—। সে যাকগে মরুকগে, আপনি কিন্তু দিদি রত্নগর্ভা তা মানতেই হবে।' নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে বলে মতি।

ওর এখানে আসাতেই নিস্তারিণীর মনের সব বিরূপতা কেটে গিয়েছিল। এখন এই বিনত আচরণে গলে জল হয়ে গেল সে। একেবারে মতির হাতদুটো ধরে বললে, 'ওমা, তাই বলে একেবারে মাটিতে বসলেন।...আসনে দোষ কি দিদি, ওসব তো অতিথ্ সজ্জনের জন্যেই—তাছাড়া আপনারা দিনরাত ভগবানের নাম করছেন, আপনি অনেক বামুনের মেয়ের চেয়ে বড়।...আমাদের যেখানে টিকি বাঁধা—আমাদের সেই মশাইরা তো এসব কিছুই বাছেন না। বলেন, যে নাম করবে, সে-ই আমাদের পেন্নাম করার যুগ্যি।...না দিদি, আপনি ভাল হয়ে বসুন। অমন কাপড়খানা মাটিতে ঘষটানি লেগে নষ্ট হয়ে যাবে।'

তারপরই আবার মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়, 'এ কি মেয়ে বাপু, দ্যাখো দিকি। একেবারে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে গা। ওলো এই,—খোল্ খোল্ কপাটটা খোল্, এত তোর ভক্তিছেন্দা এত দেখবার শখ ওঁকে—সেই উনি সশরীরে তোদের কুঁড়েঘরে এলেন আর তুই গিয়ে দোরে হুড়কো দিলি!...ছি ছি, কি মনে করছেন উনি বল্ তো। এত কিসের লজ্জা বাপু!'

'থাক থাক দিদি, হাজার হোক ছেলেমানুষ তো, লজ্জা পেয়ে গেছে।...তা দিদি এমন গলা আপনার মেয়ের—মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন না কেন ভাল ক'রে?'

'কী যে বলেন ভাই, তাই কখনও হয়! আত্তকুটুমরা সব একঘরে করবে তাহলে!'

'কেউ কিছু করবে না। পয়সা হলে দেখবেন সব আত্তকুটুম মাথায় ক'রে রাখবে! ...মেয়ের যা ভগবানদত্ত ক্ষমতা, একটু শিক্ষা পেলে দেখবেন মোটা টাকা আনবে।'

'মোটা টাকা অমনিই আনবে!...বের বয়স পার হ'তে চলল, বে দিলেই ঢের টাকা পাব। আমাদের মেয়ের বে দিতে পয়সা খরচ হয় না—উলটে ঘরে আসে।'

গলায় বেশ একটু জোর দিয়েই কথাগুলো বলে নিস্তারিণী। তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠছে আবারও—একটু একটু ক'রে। তার কেমন যেন মনে হয় ছেলেধরাদের মতো মতি তার মেয়েকে চুরি ক'রে নিতে এসেছে।

'ঢের আর কত পাবে দিদি, পাঁচশ' হাজার—এর বেশি তো নয়। তাও সব ঘরে তুলতে পারবে না, কিছু না করলেও বিশ-পঞ্চাশ খরচ করতে হবে, তত্ত্বতাবাসেও কিছু বেরোবে। তা না হ'লেও, না হয় পুরোই হাতে পেলে—কতদিন চলবে তাতে? চিরদিন তো আর কাটবে না। তাছাড়া তোমার ধরো গে বেটের দুটি সন্তান—মেয়ের বেতে যেমন নেবে, তেমনি ছেলের বেতে 'আবার বার করতেও তো হবে!...আমাদের এ-লাইনে একটু নাম হ'লে একদিনে পাঁচশ' টাকা কামিয়ে আনতে পারবে।'

এবার নিস্তারিণী দস্তুরমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আসলে তার মনেও দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। লোভ বড় প্রবল। এত টাকার কথা শুনলেও মাথা ঝিমঝিম করে। আট-দশ টাকায় যাকে সংসার চালাতে হয়—পাঁচশ' টাকা তার কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য। একটু একটু ক'রে দুর্বল হয়ে পড়ছে বুঝতে পেরে আরও মাথা গরম হয়ে ওঠে তার। নিজের ওপরের সে তাপটা মতির ওপরই এসে পড়ে কতকটা। বলে, 'তাই বলে কি মেয়েকে দিয়ে বেবুশ্যেগিরি করাব! তাই কখনও করায় কোন ভদ্দরঘরের বাপ-মা। খেতে না পেলেও এ-কাজ করতে দেয় না, এ তো তবু দুমুঠো জুটছে দুবেলা!'

'আহা, তা কেন—', মতি অপ্রতিভ হয়ে পড়লেও হাল ছাড়ে না, 'গান গাইবে টাকা নেবে—খারাপ পথে যে যেতেই হবে তার মানে কি। সবাই কি নষ্ট হয়? নষ্ট যে হবার সে ঘরে থেকেও হতে পারে।...তেমন তেমন হয় একটা ভাল-ছেলে সৎপাত্তর দেখে বে দিয়ে ঘরজামাই রেখো, নিশ্চিন্তি।'

যুক্তিগুলো যে খুব খারাপ লাগছে তা নয়, তবু নিস্তারিণী গলায় জোর দিয়ে বলে, 'না দিদি, ওসব হবে না। কর্তা এসব কথা শুনলে পাঁশ পেড়ে কাটবে আমাকে। এই তাই এসব কথা বলাবলি করছি শুনলেই ন-ভূতো ন-ছুতো করবে।'

মতি হতাশ হয়ে উঠে পড়ে। অপমানিতও বোধ করে খানিকটা। কিন্তু তবু মুখে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করে না। বড়লোক সম্ভ্রান্ত লোকদের সংগে বেশির ভাগ মেলামেশা করার ফলে মনের ভাব চাপবার শিক্ষাটা তার হয়েছে। তাছাড়া, মেয়েটার গলা সত্যিই বড় লোভনীয়, একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই ঈষৎ নিস্পৃহ স্বরে হ'লেও কথা বলার সময় যথাসম্ভব সহজ ভাবটা বজায় থাকে, শুধু সম্বোধনের সময় কিছু পূর্বের অন্তরঙ্গ 'তুমি'টা ঘুচে যায়। বলে 'দেখুন, সে আপনার যা অভিরুচি। তবে কর্তাকে একবার বলে দেখতে পারেন, আমার তো মনে হয় না—তিনি হাতে মাথা কাটবেন আপনার। খারাপ কথা আমি কিছু বলিও নি, হীরে যখন খনি থেকে ওঠে, শুনেছি তখন নাকি কাচের মতোই থাকে। যে জহুরী সে-ই কাটিয়ে-কুটিয়ে দাঁড় করায়, জিনিসটার তবে জেল্লা ফোটে, তবে দাম ওঠে। জহুরীর হাতে না পড়লে হীরে কাচই থেকে যায়, তার কোন মূল্য নেই। কোন কাজেই আসে না—কাচের কাজেও লাগে না।...কথাগুলো যা বললুম, ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন। মেয়ের রূপ আছে সত্যি কথা, বড়মানুষের নজরে পড়া আশ্চর্য নয়। তবে আপনাদের ঘরে তেমন বড়লোক কে আছে তা তো জানি না। বড়লোক চোখে ধরলে রাঁড় রাখতে পারে—মেয়েবেচা ঘরে কে বে করতে আসবে?'

শেষ এই মোক্ষম খোঁচা দিয়ে চলে যায় মতি। শুধু কথাগুলো বহুক্ষণ ধরে কানের মধ্যে জ্বলতে থাকে নিস্তারিণীর, যেমন ওর হাতের বাউটি আর গলায় গিনি হারের আলোয় জ্বলতে থাকে চোখ দুটোও।

॥ ৫ ॥

ভবতারণ সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে শুনলেন সব কথা। নিস্তারিণীর অত বলবার ঠিক ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মেয়েই ফাঁশ করে দিলে। মেয়ে মুখ গোঁজ ক'রে আছে দেখে ভবতারণই ব্যস্ত হয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করলেন ইতিহাসটা। সুরবালার লজ্জা ততক্ষণে রাগে পরিণত হয়েছে। মার ওপরে রাগ। মিছে কথা বলে তাকে অপ্রস্তুত করল কেন মা? যাকে নকল করছে সে-ই শুনে গেল—এর চেয়ে থাক্‌তাই আর কীভাবে হয় মানুষ! তাই মেয়ের মুখ ভার দেখে যখন ভবতারণ জোর ক'রে কোলে বসিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'সোনার মেয়ের মুখ আজ কালি কেন আমার? দেখনহাসি মেয়ের মুখে আজ হাসি নেই কেন? কে কী বলেছে মাকে আমার, কার এত বড়

আস্পদ্দা!...টের পেলে এখনই তার নাক-কান কেটে মাথা মুড়িয়ে নেড়া মাথায় ঘোল ঢেলে উল্টো গাধায় চড়িয়ে পগার পার ক'রে দিয়ে আসব না!' তখন হেসে ফেললেও নালিশ করতে ছাড়ে নি মায়ের নামে।

ঘটনার প্রথম অংশটা যখন জানা হয়েই গেল তখন পরের অংশটা নিস্তারিণীই বিবৃত করল। আদ্যোপান্ত সব, মায় নিজের ঝালটা সুদ্ধ। মনের সঙ্গে লড়াইটা তখনও থামে নি তার, জ্বালাও কমে নি তাই কিছুমাত্র। ভবতারণ যেন শুধুই উপলক্ষ, অনুপস্থিত মতিই লক্ষ্য আসলে, সেইভাবেই গলায় জোর দিয়ে বলে, 'মুখে আগুন মাগীর। বামুনের মেয়ে আমি, আমার কাছে বলতে আসছে ঐ কথা। কী সাহস দ্যাখো দিকি! মরণদশা মাগীর। দুটো পয়সা হয়েছে বলে হম্বিদম্বিঘ্যি জ্ঞান নেই একেবারে! যেমন বামুনই হই, বামুন তো—মান্যি কুড়োবার ভয়ও রাখে না! আশ্চর্যি!'

কিন্তু ভবতারণ শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। না রাম না গঙ্গা—কোন মন্তব্যই করলেন না। আপন মনে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে তামাক টানবার পর কী একটা অছিলা ক'রে সুরবালাকে বাইরে পাঠিয়ে (গণেশ ঘরে থাকেই না বড় একটা—খাওয়া ও শোওয়ার সময় ছাড়া, টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় দিনরাত) বললেন, 'দ্যাখ্ বৌ, রাগ করিস্ নি, আমার তো মনে হচ্ছে এ ভগবানেরই কারসাজি। সতীমায়ের ইচ্ছে তাই এমন যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। বে বে করছিস বটে কিন্তু কার মেয়ে কী জাতকুল কিছুই জানি না—নিজেদের স্বঘরে বে দিয়ে শুধু শুধু নিমিত্তের ভাগী হই কেন! এ লোকের জাতকুলের কথা। জানাজানি একদিন হবেই—তখন তারা গালমন্দ দেবে না, শাপশাপান্ত করবে না? লোকের মান্যিকে বড় ভয় করি আমি।...আরও ভেবে দ্যাখ, জানাজানি হয়ে গেলে শেষে যদি মেয়েকে ত্যাগ করে তারা? বৌ যদি না নেয়! মিছিমিছি একুল ওকুল দু কুলই যাবে। তার চেয়ে চাইছে দিয়ে দে, গান শেখে সে তো ভাল কথাই। আর কিছু না হোক, ভগবানের নাম করবে, তার একটা পুণ্যি আছে তো!'

এমনি হয়ত মনে মনে নরম হয়েই আসছিল নিস্তারিণী, শেষ অবধি হয়ত রাজী হয়েও যেত—কিন্তু ভবতারণের এই শেষের কথাটায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল আবার। এই জাতকুলের কথাটাই কিছুতে বরদাস্ত হয় না তার। সুরো যে তারই মেয়ে—সতীমায়ের আশীর্বাদী—সেটা ভবতারণ যে বিশ্বাস করতে পারেন নি এখনও—সেইটেই নিস্তারিণীর সব চেয়ে বড় ব্যথার জায়গা। এত তো ভক্তি ওঁদের, এত ছেন্দা, তবু—এই সামান্য কথাটা বিশ্বাস হয় না? এত সন্দেহ, এত অবিশ্বাস!...সে বলে, 'কখ্খনও না, এ মেয়ে আমার মার দোর-ধরা, এ আমার মার চরণের নির্মাল্য। একে আমি বেবুশ্যেগিরি করতে দোব না। ভগবানের নাম না আরও কিছু। এ তো নামবেচা, এর আবার পুণ্যি কি? যে কিনছে বরং তার পুণ্যি। আর যতই যা বলুক, ও পথে গেলে স্বভাব-চরিত্তির ভাল থাকতে পারে না, কেউ ভাল আছে—একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না সে কথা।'

'দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন ভবতারণ, 'তবে কথাটা একটু ভেবে দেখলে ভাল করতিস!'

অকস্মাৎ নিস্তারিণী স্বামীর পায়ের কাছে ঢিপঢিপ ক'রে মাথা খুঁড়তে শুরু করে, 'ফের ও কথা বললে আমি রক্তগঙ্গা করব তোমার সামনে—এই বলে রাখছি। ও আমার মেয়ে—আমি কারও কথা শুনতে চাই না। ওর আমি বে দোবই, তেমন ভাল পাত্তর পেলে পণ না নিয়েই দোব।'

ঝরঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার।

এ আকস্মিক উত্তেজনা ও কান্নাকাটির কোন হেতু খুঁজে না পেলেও ভবতারণ অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। হুঁকোটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে

তোলেন স্ত্রীকে, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন, 'এই দ্যাখো কাণ্ড! হ্রাত্তদুপুরে কী পাগলামি জুড়ল দ্যাখো, ছি ছি, ছেলেমেয়ে এসে পড়লে দেখে কী ভাববে!...বলি, তুই কি কচি খুকী আছিস এখনও? তোর মেয়ে, তুই যা-খুশি করগে যা না, আমি কি না বলেছি!'

এ চোখের জল ও মাথা খোঁড়ার কারণ ঘটেছিল অনেক আগেই। ভবতারণের জানার কথা নয়। নিস্তারিণী বিকেলের ঘটনা সব খুলে বললেও একটা কথা বলে নি। বলে নি, স্বামীর মনোভাব আরও সমর্থন পাবে—এই ভয়ে। কথাটা সে-ই ভুলতে পারছে না। বিকেল থেকে অবিরাম মনে মনে তোলাপাড়া করছে নিজেই।

সুরোর গান শুনতে মতি যখন নেমে আসে তখন পিছনে পিছনে ওর ঝি সদুও নেমে এসেছিল। কোন কারণে বা কাজ না থাকলেও সঙ্গে থাকতে হয় তাদের, এই-ই দস্তুর। এটা তাদের বড় শিক্ষা একটা। নইলে এ ধরনের বড়মানুষদের কাছে চাকরি করা যায় না। কখন কি দরকার পড়বে বা কী খেয়াল জাগবে—তখনই লোক চাই সেটা ক'রে দেবার।

সঙ্গে এসেছিল—তবে সামনে আসে নি একেবারে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। কানে তার সবই গেছে। কিন্তু মনিবের সামনে তাঁর কথার মধ্যে কথা বলার নিয়ম নেই, তাই চুপ ক'রেই ছিল। মতি চলে যেতে কাছে এগিয়ে এসেছিল, দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বলেছিল, 'না গো মাঠাকরুন, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। বেশ্যে যাকে বলে—এরা তা নয়। গান গাওয়াই হ'ল আসল পেশা—তবে কখনও কখনও দৈবেসৈবে এক-আধজন বাবু যে আত না কাটায় তা নয়, সে হল গে শখের ব্যাপার। আর সেও তেমনি সব তাবড় তাবড় লোক, তারা আসেও অনেক আতে, আবার, সুয্যি মুখ দেখাতে না দেখাতে উঠে চলে যায়। নিজেও বাইরে যায়—মিছে কথা কেন কইব—সেও তেমন তেমন লোকের কাছে। সেও ধরগে নমাসে ছমাসে একদিন। বলি এই তো এতদিন হয়ে গেল, তোমরাও তো দেখছ শুনছ, কোনদিন কোন বেলেল্লাগিরি দেখেছ কি, না তেমন কোন আওয়াজ পেয়েছ? সে মানুষ নয়।'

তারপর—অকারণেই গলা আরও এক পর্দা নামিয়ে—বলেছিল, 'চাইছে যেকালে—দিয়ে দাও মা, দিয়ে দাও। ধরো পেটের কেউ নেই, তেমন যদি মনে ধরে, ব্যবসা ঠিকমতো চালাতে পারবে বোঝে—ওকেই পুষ্যি ক'রে নেবে হয়ত। আসলে ব্যবসাই হ'ল গে ওর পেরান। নইলে পয়সার অভাব নেই—আণ্ডিল আণ্ডিল টাকা। টাকায় ছ্যাৎলা ধরে যাচ্ছে। একটা কথাতেই বুঝবে মাঠাকরুন, মানুষ তো একটা, কখনও সখনও দৈবাৎ ভবিষ্যতে কেউ হয়ত এসে থাকে, বোন বা ভাবিসাবি কেউ—সংসার তো দাসী চাকর নিয়েই সব—বাজার আসে রোজকের চার পাঁচ টাকার! তোমাদের হয়ত এক মাসের বাজার খরচা!...অথচ গিন্নি নিজে মাংস খায় না, ডিম খায় না। যেদিন থেকে মন্তর নিয়েছে কণ্ঠী গলায় দিয়েছে সেদিন থেকে সব বাদ।...তা নয়, চারদিকে জিনিসপত্তর থৈ-থৈ করা চাই, নইলে মন ওঠে না। খাবার-দাবারের এউঢেউ চারিদিকে, বলে কেবা কত খায় কত নন্দমা দে যায়!—এ হয়েছে তাই। অপ্‌চই হয় কত। এমন লোকের নজরে পড়ে গেলে আখেরে ভালই হবে। বে আর তুমি কত বড় ঘরে দিতে পারবে মা, চিরদিন বাসন মেজে ক্ষার ঠেঙিয়ে দিন যাবে। ঐ সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাবে। রূপটাই কি যে-সে তোমার মেয়ের! তবে কি জানো, এসব রূপ ছেলাবতে রাখতে হয়, তোমার আমার মতো দুঃখের পেছনে দাঁড় দিলে কি আর রূপ থাকে!...চননু গো মা, কথাটা ভেবে দেখো একটু।'

সদু ঝি আর দাঁড়ায় নি, ওপর থেকে 'সদি, সদি হারামজাদী কোথা গেলি' কানে গিয়েছিল কথা কইতে কইতেই—উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছিল তাই কথা কটা শেষ ক'রে। দাঁড়ালে কী হ'ত বলা যায় না—নিস্তারিণীর দুটো চারটে বুলি হয়ত শুনতে হ'ত তাকে, আর সে বুলি খুব মিঠেও হ'ত না। দু-দুবার ওদের অবস্থার ইঙ্গিত করেছে সে, 'সারা

মাসের বাজার খরচা' আর 'তোমার আমার মতো দুঃখের পেছনে দড়ি দেওয়া'—কোনটাই কান এড়ায় নি নিস্তারিণীর। হোক না বড়লোকের ঝি, তবু দাসী ছাড়া আর তো কিছু নয়, তাদের সঙ্গে সমান হ'তে আসে কোন্ সাহসে!...

তবু, সদু সম্বন্ধে যে মনোভাবই হোক, তার কথাগুলো ভোলা যায় নি কিছুতেই। পাকা শিকারী সে, অব্যর্থ লক্ষ্যে বাণ বিঁধিয়ে গিয়েছিল। কথাগুলো কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই থেকে—হাজার শাসনেও মনকে সরিয়ে আনতে পারছে না চিন্তাটা থেকে। সেই পরাজয়ের পরিণাম এই চোখের জল। অন্তরের জ্বালাই বাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে আসলে।

অনেক টাকা। কত টাকা তা ঠিক না বুঝলেও অনেক টাকা এটা বোঝা গেছে। টাকার অঙ্কগুলো তাদের ধারণা শুধু নয়—কল্পনারও অতীত। এইসব ঐশ্বর্য অত বড় বাড়ি—সবই তার মেয়ের হতে পারে একদিন। এগুলো না হলেও এমনি অন্য বাড়ি, অন্য টাকা।

তার মেয়েও এত টাকা রোজগার করতে পারে একদিন। মতি সে কথা স্পষ্টই জানিয়ে গেছে। জহুরীর জহর চিনতে ভুল হয় নি, ঘষামাজা করলে কী দাঁড়াবে তা বুঝেই সে কথা তুলেছে!

কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ে না, হার মানে না।

লোভকে জয়ই করে শেষ পর্যন্ত। এখন কতকটা জেদে দাঁড়িয়ে গেছে বলেই হয়ত মনে জোর পায়। সবাই শত্রু, সবাই তার পেছনে লেগেছে, নিজের মনটা সুদ্ধ—সবাইকেই দেখিয়ে দেবে সে নিস্তার বামনী কী চীজ।

সে উঠেপড়ে লাগে মেয়ের সম্বন্ধের জন্যে। ভবতারণ যে কিছু করবেন না—তা সে জানে। এমনিতেই মানুষটা খুব সক্রিয় নয়, তার ওপর এখানে একটা দ্বিধার প্রশ্ন আছে। চুপ ক'রে আছেন বটে কিন্তু সে নিছাৎই স্ত্রীর কান্নাকাটি চেঁচামেচির ভয়ে, নইলে তাঁর যে কোন সমর্থন নেই সেটা বুঝতে দেরি হয় না কিছুমাত্র।

তা হোক, নিস্তারিণী একাই একশ'। সে নিজেই পায়ে হেঁটে বাগবাজার থেকে বৌবাজার চষে ফেলতে লাগল। ধরল না এমন চেনা লোক নেই। যেসব আত্মীয়দের সঙ্গে কোনকালে দেখাশুনো যাওয়া-আসা ছিল না, তাদেরও খুঁজে বার করল। শেষ পর্যন্ত পাত্র পাওয়াও গেল একটা। পাল্‌টি ঘর ওদের, গণপণ সব মিলেও গেল ঠিকঠাক। ছেলে একেবারে গোমুখ্খু নয়, কোন্ ইংরিজি ইস্কুলেও নাকি তিন-চার বছর পড়েছে, সাহেবদেরই কী এক দোকানে চাকরি করে! এখনই একুশ টাকা মাইনে পায়—পরে নাকি আরও বাড়বে। কেরানীবাগানে নিজেদের দোতলা মাটকোঠা, বাপ-মা আর বরেরা তিন ভাই, বেশী ঝঞ্চাট নেই। মেজ ভাই পাটের বাজারে ঘোরাঘুরি করে—সেও নাকি মাসে আট-দশ টাকা দিচ্ছে সংসারে, এক কথায় সচ্ছল অবস্থা। দোষের মধ্যে বরের বয়সটা একটু বেশী, তা তাদের ঘরের নিয়মই তো এই। পণের টাকা জমাতে জমাতে বরেরা বুড়িয়ে যায়। অত সব দেখতে গেলে চলে না। এই তো তারই—ভবতারণের সঙ্গে কত বয়সের তফাৎ, তাতে কি ক্ষতি হয়েছে কিছু? না বরকে নিয়ে সুখী হয় নি সে? বিয়ের ভালমন্দ হ'ল কপালের কথা—ভবিতব্য। বরাতে না থাকলে সুখ হয় না, তা যেমন ঘরেই পড়ুক। অদৃষ্টে থাকলে এর চেয়ে বুড়ো বরে পড়েও কত মেয়ে রাজরাণী হচ্ছে, মাথায় সিঁদুর নিয়ে চলে যাচ্ছে ড্যাং ড্যাং ক'রে।...

ছেলেমেয়ে দেখা-দেখি দেনা-পাওনা সব মিটে গিয়ে আশীর্বাদের দিন অবধি ঠিক হয়ে গেল। পাঁচশ এক টাকা পণ দেবে ওরা, আর দুখানা গহনা। নিস্তারিণী আর একটু টানাটানি করতে গিয়েছিল, সুবিধা হয় নি। দিনকাল পাল্টে গেছে, এখন আর

বরপক্ষ পণ দিয়ে মেয়ে নিতে চায় না। বলে, 'আমরা না হয় এক পুরুষ ও কম্ম না-ই করব, আইবুড়োই মরব না হয়, দেখি মেয়েদের কে কতদিন বসিয়ে রাখে থুবড়ি ক'রে। এসে পায়ে পড়তে হয় কিনা দেখি। দুনিয়াসুদ্ধ দেখগে যাও বরকে পণ দিয়ে মেয়ের বাপ পথে বসছে—আমরা এমন কি চোরের দায়ে ধরা পড়লুম!'...এরা অতও দিত না, নেহাৎ মেয়ে চোখে লেগে গিয়েছে তাই। বেশী চাপ দিলে সইবে না—তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে ওরা। নিস্তারিণী বলতে গিয়েছিল যে, 'আজকাল মেয়ের বয়স হিসেবে এক এক বছরে একশ টাকা হিসেবে পণ নিচ্ছে, সে ধরলে তো আমার আরও ঢের পাওনা হয়!' তাতে বরের মামা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, 'তাহলে এত তাড়াতাড়িই বা করছেন কেন, আরও বছর কুড়ি বসিয়ে রাখুন না—পণের টাকায় বড় রাস্তার ওপর বাড়ি কিনতে পারবেন একখানা!'

নিস্তারিণী আর এর ওপর কথা কইতে সাহস করে নি। এ পাত্র ছাড়তে রাজী নয় সে। তাদের ঘরে এই পণের জন্যেই তিন বছর দু বছরের মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়—এত বড় মেয়ে সে হিসেবে পণ দিয়ে কেউ নিতে পারবে না। এমনিই, এত বড় মেয়ে ক'রে বিয়ে দেওয়া তো একটা দুর্নাম, বরপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখে। মেয়ের সুখই হ'ল আসল, কটা টাকার জন্য এমন ভাল পাত্র হাতছাড়া করলে আর জুটবে কিনা সন্দেহ।...

বরকে আগে আশীর্বাদ ক'রে এলেন এঁরা। পরের দিন পাত্রপক্ষ আসবে এঁদের বাড়ি। নিস্তারিণী তার সাধ্য মতো আয়োজন করল, এক বেলা ধরে রান্না করল বসে বসে। আজকাল লুচি খাওয়ানোর রেওয়াজ হয়েছে, নিস্তারিণীও সেই ব্যবস্থা করল। দুর্গাকে আসতে বলেছিল, পাড়ার দু-একজনও কিছু কিছু সাহায্য করল। কিন্তু কেউ ব্রাহ্মণ নয় বলে খাটুনিটা নিস্তারিণীর ওপরই এসে পড়ল বেশির ভাগ। তা ভূতের মতোই খাটল সে। একটা মেয়ে তার, অনেক সাধের মেয়ে—সেই মতোই আয়োজন করবে। খরচ কিছু বেশীই হ'ল, অবস্থাপন্ন ঘরের পাকাদেখা দু-একটা দেখেছে সে, সেইভাবেই আয়োজন করল, ঠিক নিজেদের অবস্থানুযায়ী করল না। মেয়ে বেচতে সে বসে নি, বিয়ে দিতেই বসেছে। লাভ-লোকসানের কথা সে ভাববে না। গয়না তাদের ঘরে বরেদেরই দেবার কথা, তারা নাকি চুড়ি হার দেবেও—তবু নিস্তারিণী রুপোর গোট পাঁইজোর, কানের জন্যে সোনার কেরাপাত গড়তে দিয়েছে।

রান্নাবান্না সব শেষ ক'রে আসর পেতে সাজিয়ে বসল যখন, তখন সকলের হুঁশ হ'ল যে, বরপক্ষের এতক্ষণ এসে পড়া উচিত ছিল। অন্তত তাদের সংগে সেই রকমই কথা হয়ে আছে। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছনোর কথা, সে জায়গায় সন্ধ্যে পার হয়ে গেল, কখন আসবে আর! এরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, নিস্তারিণী ঘরময় ছট্‌ফট করতে লাগল, পাড়ায় যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁরা নানা রকম আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগলেন। শুভ কাজে বিঘ্নের তো শেষ নেই, দেখগে যাও, কোথা থেকে হয়ত ভাংচি পেড়ে বসে আছে!

শেষে আর থাকতে না পেরে ভবতারণ চাদরটা কাঁধে ফেলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দুর্গার ইঙ্গিতে গোলোকও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি বসুন চক্কত্তীমশাই, আমিই যাচ্ছি।'

সে জোরেই হাঁটে, তৎসত্ত্বেও নিস্তারিণী জোর ক'রে আট আনা পয়সা তার হাতে গুঁজে দিলে, বললে, 'তুমি একটা গাড়ি ক'রেই যাও ভাই গোলোক জামাই, রাত আটটা পজ্জন্ত মাহিন্দরক্ষ্যাণ মোটে, ভটচার্যি মশাই পাঁজি দেখে বলে দিয়েছে—যদি তার মধ্যে নিয়ে আসতে পারো কাউকে!'

বলল বটে কিন্তু তার মধ্যে যে ফেরা সম্ভব নয় তা সবাই বুঝল। এখান থেকে ছাতু-বাবুর বাজারে গিয়ে গাড়ি ধরে কেরানীবাগান যাওয়া-আসাতেই এক ঘণ্টার ওপর লাগবে।

সাতটা তো বেজেই গেছে।

গোলোক ফিরল আটটা নয়, নটারও ঢের পরে।

ততক্ষণে এরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভবতারণ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন এক পাশে, নিস্তারিণী তো যাকে বলে ডাক ছেড়েই কাঁদছে আর বরপক্ষকে শাপশাপান্ত করছে। শুধু দুর্গাই যা কিছুটা প্রকৃতিস্থ, সে এখনও সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে, 'অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদও তো ঘটতে পারে দিদি, তুমি কু-টাই বা ভাবছ কেন!'

অভ্যাগত যাঁরা—তাঁরা অনেকেই পায়ে-পায়ে সরে পড়েছেন বেগতিক দেখে। এ এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, বিয়ের রাতেই বর আসে না অনেক সময়—এ তো পাকা-দেখা। যেতে পারে নি দু-একজন—অন্তরঙ্গ যারা, চমৎকারীর মতো—আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তাদের অবস্থা খুবই করুণ, পাকাদেখা যদি না হয় এখানে খাওয়ার দফা শেষ, কোন্ মুখে তারা সাজানো পাতে খেতে বসবে? অথচ রাত যা হয়ে গেল—এর পর বাড়ি গিয়ে রান্না চাপানোরও সময় রইল না। নেমন্তন্ন খেতে এসে পাকা ফলার মাথায় উঠল—হরিমটরেই কাটাতে হবে সারা রাত—এইটেই তাদের প্রধান ভাবনা।

গোলোক ফিরল মুখ কালি ক'রে। জানা কথাই—তার মুখ দেখেও বোঝা গেল যে আশঙ্কাটাই ষোল আনা সত্য হয়েছে—তবু সবাই উৎকণ্ঠিতভাবে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে—নীরব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

একটু সময় নিল গোলোক, তারপর মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বলল, 'ওরা এখানে বিয়ে দেবে না। মেয়ের দোষ আছে শুনেছে ওরা। মেয়ে যে আপনাদের নয় তা শুনতে পেয়েছে। কী জাতের মেয়ে—হয়ত কোন অজাত কুজাতেরই হবে—ঠিক নেই জেনেও বামুনের ঘরের বৌ ক'রে নিয়ে যেতে রাজী নয় তারা।'

'বেশ তো, তা একটু আগে খবর দিলেও তো পারত। এত সব রান্নাবান্না ক'রে বসে আছি আমরা, ছিষ্টির আয়োজন'—অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকার পর দুর্গাই কথা বলে প্রথম।

'ওরা বলে যে আমাদের জাত মারতে এসেছিল যারা—তাদের সঙ্গে আবার ভদ্দরতা কি! এর চেয়ে বেশী ক্ষতি করাই নাকি উচিত ছিল, পারলে করতও। বলে কিনা—আমাদের সময় নেই তাই, নইলে থানা-পুলিশ করতুম।'

নিস্তারিণী এই রকমই একটা কিছু অনুমান করেছিল, তবু ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় লাগল তার। খানিকটা বিহ্বল হয়ে গোলোকের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল, তার পরই ভবতারণের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়ল, 'এই তুমি! তুমি নিশ্চয় তাদের বলে এসেছ। তোমাকে আমি চিনি, ঘরজ্বালানে পরভালানে লোক তুমি! গোড়া থেকেই তোমার মনোগত অভিপ্পেরায় নয় যে মেয়েটার একটা ভাল গতি হোক। ...নিজে সাধু সাজবার জন্যে তুমি এই সব্বনাশটা করলে মেয়ের—নিজে গিয়ে ভাংচি দিয়ে এলে!'

ভবতারণ কিন্তু সে আক্রমণে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং যখন উত্তর দিলেন তখন, অনেক দিন পরে, তাঁর কণ্ঠে কর্তৃত্বের দৃঢ়তাই ফুটে উঠল। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওরে মাগী—আমি ভাংচি দিলে এত খরচা এত লোক বলাবলির আগেই দিয়ে আসতুম।...অত বোকা আমি নই।...দিয়ে যে আসি নি—তারই সাজা এটা, তা বুঝছিস না? নিজে থেকেই বলে আসা উচিত ছিল আমার। সব বলে-কয়ে সম্বন্ধ করলে এই ধাষ্টামোটা হ'ত না—এই লোকহাসাহাসি, এই অপমান। ধম্মের ঘরে পাপ সয় না—আমাদের হ'ল ধম্মের ঘর, কখনও জেনেশুনে অধম্ম করি নি—আজ করতে গেলে সইবে কেন। তোর কল্লায় পড়ে অধম্ম করতে গিয়েই এই অনিষ্টটি হ'ল। মার খুব দয়া তাই—এ কেলেঙ্কারটা বিয়ের রাতে হ'লে কী করতিস বল দিকি, তখন যে গলায় দাঁড় দিতে

হ'ত। কী বিপদে পড়তে যাচ্ছিলুম—মা একটা চড় মেরে তাই বুঝিয়ে দিলেন।...খুব শিক্ষে হয়ে গেল আমার। আর না, যদি বে দিতে হয় শতআগে ওর জন্মের কথা বলে তবে কথা পাড়ব। যদি জেনেশুনে কেউ নেয় তো নেবে—নইলে দরকার নেই।'

নিস্তারিণী স্বামীর এ চেহারা অনেককাল দেখে নি, সে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, জবাব দেবার মতো একটা কথাও খুঁজে পেল না। তাকে বেশী সময়ও আর দিলেন না ভবতারণ. ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'নাও খুব হয়েছে, এখন খাবারগুলো নষ্ট করে আর কাজ নেই, যারা আছে তাদের সব বসিয়ে দাও। গোলোক ভাই, না খেয়ে যেয়ো না যেন।...মন খারাপ ক'রে আর কি করবি ভাই. মা যা করেছেন ভাল জেনেই করেছেন!'...

॥ ৬ ॥

মুখে বলাটা যত সহজ, কাজটা তত নয়। কুড়োনো মেয়ে জানবার পর কেউই আর বৌ ক'রে নিতে চায় না। পণ দিয়ে নেওয়া তো দূরে থাক, বিনা পণেও কেউ নিতে রাজী হ'ল না। বিস্তর ঘোরাঘুরি ধরাধরি সার হ'ল, সময়ও নষ্ট হ'ল কম নয়। দেখতে দেখতে ছ মাস কেটে গেল প্রায়, মেয়ে পার করার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। দু-একজন যা এগোল—এদের পছন্দ হ'ল না সে সব সম্বন্ধ। তাদেরও—কারুর বা কুলের দোষ আছে, কেউ বা মাতাল-গেঁজেল।

ক্রমশ ভবতারণও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর অখণ্ড প্রশান্তি নষ্ট হয় আরও মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে। সদাপ্রফুল্ল মেয়ে তাঁর মনমরা হয়ে থাকে—গুমরে গুমরে বেড়ায়। আগে কেউ গান গাইতে বললে তখনই গাইত, এখন—মতি বাড়ি নেই নিশ্চিত জানলেও—গাইতে চায় না। এটা যে বাপ-মায়ের ওপর একটা নিগূঢ় অভিমান, ভবতারণ তা বোঝেন। তা নইলে, মেয়ের গানের দিকে আসক্তি কমে নি কিছুমাত্র ; প্রতিদিনই দেখেন ওবাড়িতে রেওয়াজ শুরু হ'লে এবাড়ির মেয়ের হাতে কাজ থেমে যায়, উৎকর্ণ হয়ে শোনে। কাজ যদি-বা বন্ধ না হয়...হাতই শুধু চলে, মন পড়ে থাকে ওবাড়িতে, তা তার আবিষ্ট চাউনির দিকে চাইলেই বোঝা যায়। ঘরে কেউ না থাকলে এক-একদিন সঙ্গে-সঙ্গে গুন-গুন ক'রে গায়ও—তবে সে শুধু একা থাকলেই। ঘরে কেউ এলেই দু ঠোঁট চেপে বন্ধ করে।

ওদিকে মতিও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। পালে-পার্বণে সিধা পাঠায় ঘন ঘন, একাদশীর দিন নিস্তারিণীকে শাড়ি সিঁদুর মিষ্টি পাঠায় বামুনের হাত দিয়ে। পাঠাতে শুরু করার আগে নিজে এসে একদিন অনুমতি নিয়ে গিয়েছিল মতি। নিস্তারিণী কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিল, 'আমাদের নিতে কোন দোষ নেই, তেমন নিষ্টে-কাষ্টার ঘর নয় আমাদের, তবে আমাদের কেউ তো দেয়ও না। মিছিমিছি কেন দেবেন ভাই ওসব, মেয়ে-বেচা ঘরের বামুন আমরা—তার ওপর ঘোষপাড়ায় আমাদের মন্তর। আমাদের তো ধরুন জাতই নেই বলতে গেলে।'

'তা হোক. তুমি ভাই দয়া ক'রে নিলেই হ'ল।' জবাব দিয়েছিল মতি।

নিস্তারিণীরা উপলক্ষ, আসলে লক্ষ্য যে সুরবালা তা বুঝতে কারুরই বাকী থাকে না। অষ্টমীর দিন তো সোজাসুজি তাকেই কুমারী পুজোর নাম ক'রে ফরাসডাঙ্গার দামী শাড়ি পাঠিয়েছে, সঙ্গে একথালা মিষ্টি। কিছু না হোক ঝি পাঠিয়ে খবর নেয় দুবেলা, কেমন আছে।

নিস্তারিণীর মনটা নরম হয়ে আসে একটু একটু ক'রে। পতি পরম গুরু—স্বামীর কথাটা অবহেলা করা বোধহয় ঠিক হয় নি। বিয়ের চেষ্টা করাটাই বুঝি ভুল হয়েছে। মায়ের ইচ্ছা নয়—নইলে এতদূর এগিয়ে ভেঙ্গে যাবে কেন সম্বন্ধটা।...ইদানীং ভাবে, দিয়ে দিলেই হ'ত মতির জিম্মে ক'রে—গান শিখে যদি সত্যিই ক'রে খেতে পারে তো শিখুক না হয়। আরও কথাটা মনে হয় ওর স্বামীর দিকে চেয়ে। ভবতারণের শরীরটা যেন হঠাৎ বড় ভেঙে পড়েছে এদান্তে, আর একদম ঘোরাঘুরি করতে পারে না। আয়ও কমে গেছে সেই জন্যে। প্রথম প্রথম তবু ছেলেটার ওপর কিছু ভরসা ছিল, এখন আর সেটুকুও নেই। ছেলেটা না শিখল একবর্ণ লেখাপড়া, না শিখল পৈতৃক দালালীর কাজ। একেবারেই রাঙামুলো হয়ে রইল। দেখতে খুবই ভাল হয়েছে, দিন-কে-দিনই চেহারা খুলছে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রূপের সঙ্গে যদি এক ফোঁটাও গুণ থাকত। এক দণ্ড বাড়ি থাকে না, দিন-রাত কোথায় যে এত টো-টো ক'রে ঘোরে কে জানে। শুধু খেতে আর শুতে আসার সময় বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক। ঢের মারধোর করেছেন ভবতারণ, শাসন করেছেন বিস্তর, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।...না, ওর ওপর ভরসা নেই এক কানাকড়িও, তার চেয়ে যদি মেয়েটা দু পয়সা আনতে পারে সেই ভালো।

সমাজে পতিত করবে, একঘরে করবে? তার আর কাকে নিয়েই বা সমাজ, তাছাড়া তাদের গুরুগোষ্ঠীতে এসব কোন বাধানিষেধ নেই, আর কোনও সমাজ না থাক গুরু-ভাইদের সমাজ আছে। অত ভয় সে করে না। তাছাড়া মতি ঠিকই বলেছে—পয়সা যার আছে তার চার দোর খোলা।...

কথাটা মনে মনেই তোলাপাড়া করে, এত কাণ্ডর পর আবার সেধে গিয়ে মতির দোরে দাঁড়াতে লজ্জায় বাধে। যদি তখন টিটকিরি দেয় মতি, দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়?

কী করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ছটফট করে শুধু...

শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল মতিই।

হঠাৎ আবার একদিন এসে হাজির হ'ল এদের বস্তির ঘরের উঠোনে। একটু বেশী ক'রেই সেজে এসেছিল যেন—দামী শাড়ি আর আরও দামী গহনায় চোখ ধাঁধিয়ে। গিনি হার নয়, গলায় হীরের হার পরে এসেছে, হাতে সাহেববাড়ি থেকে কেনা হীরে-বসানো বালা। বালা ওকে বলে না, কী যেন একটা ইংরেজী নাম আছে ওর—এ গয়নাটার খুব চলও হয়েছে এদানীং—বালার জায়গাতেই হাতে পরে বলে নিস্তারিণী বালাই বলে ওগুলোকে। হীরে কাকে বলে তা সে ঠিক জানে না, তবে বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদেই যে আলোর ছটা ঠিক্‌রে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, তাতে পাথরগুলো যে ঐ ধরণেরই কোন দামী পাথর সে সম্বন্ধে সংশয় থাকে না একটুও।

মতি বলে, 'বলতে এলুম দিদি একটা কথা। মেয়েটা এত কেত্তন ভালবাসে, তা শিখতে তো দিলেই না, শুনতে দোষ আছে কি? আজ, আমি যাঁর কাছে পেরথম কেত্তন শিখি—আমার সেই গুরু পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের বাড়ি। সন্ধ্যেবেলা তাঁর গানও হবে, এমনি ছুটকো-ছাট্‌কা নয়, পুরো একটা পালা গাইবেন, অনেকে আসবে শুনতে। রাস গাওয়া হবে, বেশ ভাল পালা, দুঃখের গান কি ছেরাদ্দর গান নয়। পাঠাবে মেয়েকে? বসে শুনবে শুধু, আর কিছু তো নয়। এমন সুযোগ আর হবে না। এখন ওঁর চেয়ে বেশী জানে এ মুলুকে কেউ নেই। যেখানের যা চাল আছে কেত্তনের—রানাঘাটীই বলো আর গরানহাটীই বলো—সব ওঁর নখদর্পনে!'

যেন সেই সুযোগটিরই অপেক্ষা করছিল নিস্তারিণী, দাওয়া থেকে নেমে একেবারে ওর দুটো হাত ধরে বললে, 'তুমি ভাই ওর সব ভারই নাও, আমি আজ থেকে ওকে ছেড়ে দিলুম একেবারে—তোমার হাতে। তোমার যখন এত আকিঞ্চন তখন আর আটকে রাখব না মিছিমিছি!'

সেই দিনই গানে হাতেখড়ি হয়ে গেল সুরবালার। নিজের গুরুর কাছেই নাড়া বাঁধিয়ে দিল মতি, প্রথম পাঠ নিইয়ে দিল। তবে তার আগে আর একটা কাজ সেরে নিল সে। আসরে নিয়ে যাবার আগে চান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে সোজা তেতলার ঠাকুরঘরে নিয়ে গেল সে। সোনার সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের পট, সেই দিকে দেখিয়ে বলল, 'উনিই—ওঁরাই আমাদের কেত্তনের দেবতা, ওঁদের নাম করেই গাওয়া—ও'দের বড় আমাদের কাছে আর কেউ নেই। ঐদিকে চেয়ে, ও'দের দিকে মুখ ক'রে আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গাল্, যদি শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী ক'রে দিতে পারি, যদি রোজগারের পথ হয়—তখন আমাকে ত্যাগ করবি না। রোজগার থেকে একটা ভাগ দিবি আমাকে—বুড়োবয়সে দেখবি, বল্—'

সুরবালা তখন নবীন আগ্রহে আবেগে থরথর করে কাঁপছে। তার সামনে তার স্বর্গ-রাজ্যের দরজা খুলে যাচ্ছে যেন, নতুন এক জগতে প্রবেশের অধিকার মিলছে। বহু-দিনের ঈপ্সিত জগৎ তার, স্বপ্নে দেখা স্বর্গ। এখানে প্রবেশ করতে পাবার জন্যে সে সব-কিছু করতে পারে, যে-কোন স্বার্থত্যাগেই প্রস্তুত। এ প্রতিজ্ঞা তো তুচ্ছ জিনিস, এ তো মতির হকের পাওনা। সে যদি সুরবালার রোজগারের উপায় ক'রে দিতে পারে—সেই রোজগার থেকে কিছু ভাগ নেবে। এর চেয়ে ন্যায্য দাবী আর কি হতে পারে। ওর বাবা যা করেন বাজারে ঘুরে-ঘুরে, সেও তো এই জিনিসই, বলেন দালালী। এক-জনের মাল বেচিয়ে দিলে তা থেকে যা লাভ হয় সেই লাভের কিছু অংশ দেয়—এই তো? সেই দালালীতেই তো ওরা জীবন ধারণ ক'রে আছে,—চার-চারটি প্রাণী। সেটা নেওয়া যদি অন্যায় না হয়—এটা নেওয়াই বা হবে কেন?

সে স্থিরভাবে স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করে, 'ঠাকুরের নামে এই তোমাকে ছুঁয়ে দিব্যি গালছি, যদি তুমি ভাল ক'রে কেত্তন শেখাও আমাকে, যদি তা থেকে আমার মোটা রোজগার হয়—তোমাকে নিশ্চয় কিছু কিছু দেব। বুড়ো বয়সে তোমাকে দেখবও।'

নিশ্চিন্ত হয় মতি। হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে, চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুমো খাবার ভঙ্গী করে।

তারপর নিজের গুরুর কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করায়, বলে, 'ওকে আপনিই আজ হাতেখড়ি দিয়ে যান বাবাজীমশাই, প্রথম গানটা আপনিই ধরিয়ে দিয়ে যান।'

প্রবীণ কীর্তনীয়া এই একফোঁটা মেয়েকে দেখে মনে-মনে বোধ করি শঙ্কিত এবং বিরক্তই হয়ে উঠলেন, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চাইলেন মতির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

মতি হেসে বললে, 'যা ভাবছেন তা নয়। ভদ্দরলোক বামুনের ঘরের মেয়ে—অনেক সাধ্য-সাধনা করে এনেছি, এক বছর ধরে ঘুরছি ওর পেছনে। কেন এত ঝোঁক—তা একটু নাড়াচাড়া করলেই বুঝবেন।'

বুঝলেনও। একটু বাজাতেই বুঝলেন যে মতি বড় মিছে বলে নি।

'এ তো প্রায় তৈরী গলা রে মতি। একে শেখাব কি, এ তো শিখে বসে আছে রে!'

'তবে আর বলছি কি ঠাকুর, নইলে এত আকিঞ্চে কেন!'

মতির ওস্তাদ খুব যত্ন ক'রেই শেখালেন খানিকটা। প্রাথমিক পাঠ হিসেবে উপদেশও দিলেন অনেক। মূল্যবান উপদেশ সব। কোথায় কোথায় কী কী ভুল-ভ্রান্তি হয় সাধারণত, সে সম্বন্ধেও সতর্ক ক'রে দিলেন। সবচেয়ে সতর্ক ক'রে দিলেন অহঙ্কার সম্বন্ধে।

বললেন, 'সঙ্গীতে শিক্ষার শেষ নেই মা, সব কিছু আমার শেখা হয়ে গেছে কি আমি খুব বড় গাইয়ে—এ ধারণা যেন কখনও না হয়।' আরও বললেন, 'পয়সার জন্যেই গাও আর কোনদিন শখ ক'রেই গাও—ভগবানের নাম করছ এটা যেন মনে থাকে। তাঁকেই শোনাচ্ছ তাঁর গান—এই রকম ভাববার চেষ্টা করবে!'

তারপর, নিজে গাইবার সময়ও জোর ক'রে দোয়ারদের সঙ্গে গাওয়ালেন। মতির ভয় ছিল যতই হোক শিক্ষা তো নেই, গটানোও নেই বাজনদারদের সঙ্গে—বেসুরো কি বেতালা ক'রে ফেলে এদের গানটা হয়ত মাটি ক'রে দেবে—কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। দু-একটা ছোটখাটো ভুল হ'ল—কিন্তু তাতে মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় নি।

প্রথম দীক্ষার দিনই সুরবালার একটা পুরো পালা-গানে পাঠ নেওয়া হয়ে গেল।

এর পর প্রধানত মতির কাছেই শিখতে লাগল সে।

শেখাতে গিয়ে মতিরই অবাক লাগে। এমন অভিনিবেশ, এমন আগ্রহ সে এর আগে আর দেখেনি। মেয়েটা যেন শেখার জন্যে পাগল। পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলেই মনে করে না—দিনে-রাতে আঠারো ঘণ্টা খাটতে বললেও সে রাজী আছে। এ কাজে যেন তার ক্লান্তিই বোধ হয় না।

মতির দোহাররা বাজনদাররা বলে, 'এ এক জন্মে হয় না—আগের জন্মের সংস্কার এ। নিশ্চয় আগের জন্মে ও এই কাজ করত, সেই শিক্ষে রয়ে গেছে।...এ তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে একদিন, দেখে নিও। গুরুমারা চেলা হবে।'

সে ভয় যে মতিরও হয় না তা নয়। তবে, ভেবে দেখে সে, তার তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কবেই—আর কতদিনই বা গাইতে পারবে? এ না হোক অন্য কেউ আবার নাম করবে, মতির কথা ভুলে যাবে সবাই। তার চেয়ে এ যদি হাতে থাকে—যদি অধর্ম না করে—এ ঘরটা তো বজায় থাকবে। এখানেই আসবে লোকে বায়না করতে। সে তাই শেখায় সাধ্যমতোই—কার্পণ্য করে না, কিম্বা ফাঁকিও দেয় না। তা ছাড়াও, ছাত্র ভাল হলে শিক্ষক না শিখিয়েও পারে না, শেখাতেও ভাল লাগে তার। সুরবালাও যেন মতিকে নিংড়ে বার করে নেয়—যতটুকু তার জ্ঞান বা শিক্ষা।

মাস কতক পরে মতি একদিন বালিতে এক মুজরোয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল ওকে। দোয়ার হিসেবেই গাইল সে—তবু সকলেরই চোখ পড়ল ওর দিকে। যাঁদের বাড়ি, তাঁরা ডেকে পরিচয় নিলেন, আলাদা বকশিশ দিলেন পাঁচটা টাকা। বাড়ি ফিরে পেলার টাকা থেকেও আর চারটে টাকা দিলে মতি। প্রথম রোজগারের টাকা নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরল সুরবালা। কম নয়—তার বাবার এক মাসের রোজগার প্রায়। টাকাটা সে ভবতারণ-কেই দিতে যাচ্ছিল, তিনি ইঙ্গিতে নিস্তারিণীর দিকে দেখিয়ে দিলেন। এ টাকা হাত পেতে নেওয়া সুখের নয়। তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল তবে সে নিস্তারিণীর মতো আনন্দে নয়, লজ্জায় ও অপমানে। মেয়ের রোজগারের টাকা—খেতে হয়ত হবেই, তবু হাতে ক'রে নিতে মাথা কাটা যায় বৈকি!...নিস্তারিণীর এত সূক্ষ্ম সম্মানজ্ঞান নেই, তখনই এক পয়সার বাতাসা আনিয়ে খাড়া খাড়া হরির লুট দেওয়াল, আর সওয়া পাঁচ আনা পয়সা তুলে রাখল ঘোষপাড়ার উদ্দেশে, যখন যাবে পুজো দেবে।

মতি আরও দিয়েছে অবশ্য, এ টাকা ছাড়াও। বাইরে নিয়ে যেতে গেলে বাইরের উপযুক্ত সাজসজ্জা চাই। বড়লোকের বাড়ি ছাড়া তাদের কেউ ডাকে না, সেখানে ভিখিরির মতো যাওয়া চলে না। এই মুজরোয় যাবার আগে দু গাছা বালা, এক ছড়া হার গড়িয়ে দিয়েছে, এছাড়াও দিয়েছে কিছু গিলটির গহনা। শাড়ি অবশ্য কিনে দেয় নি। নিজেরই পুরনো বেনারসী একখানা বার ক'রে দিয়েছে—তবে পুরনো হলেও ছেঁড়া কি বিবর্ণ নয়—অনেক কাপড়ের একখানা বলেই পড়ে ছিল, ব্যবহার হয় নি। মুজরো থেকে ফিরে কাপড় গহনা

খুলে রেখে বাড়ি যাচ্ছিল সুরবালা, মতি বললে, 'গিল্টির গয়নাগুলো শুধু খুলে রেখে যা, তেল-জল লাগলে পেতল হয়ে যাবে দু দিনে। আসল গয়না দুটো খোলবার দরকার নেই, ও তুই বারোমাস পরবি।'...

এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে লাগল মতি। টাকাও দিতে লাগল কিছু কিছু—কোনদিন চার কোনদিন বা পাঁচ—যেমন যেখানে পাওনা সেই হিসাবে। এইভাবে দু-চার দিন যেতে সুরবালাই হয়ে উঠল মূল দোহার। অর্থাৎ মতি গাইতে গাইতে হয়ত হঠাৎ একজায়গায় ছেড়ে দিলে—সুরবালা সে গান সেইখান থেকে ধরল একাই। সেটুকু সময়ে সে-ই মূল গায়েনের কাজ করে। শুধু তাই নয়, মতি নিজে পৌঁছিয়ে এসে সামনের শ্রোতাদের দিকে এগিয়ে দেয় ওকে, এটা হ'ল পেলা কুড়নোর কৌশল। এ নাকি সব কীর্তনউলীই ক'রে থাকে—মতির মতে এইটেই ওদের বড় শিক্ষা। যেখানে বড় বড় সম্ভ্রান্ত শ্রোতারা বসে থাকেন, গাইতে গাইতে সেদিকে এগিয়ে আসার অর্থই নাকি পেলার কথাটা 'স্মরণ করিয়ে দেওয়া'। প্রথম প্রথম খুবই লজ্জা করত সুরবালার। এ তো ভিক্ষা চাওয়া। কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল। দেখল যে, যে কীর্তনউলী দুশো টাকায় মুজরো করতে আসে সে-ই যখন এগিয়ে গিয়ে হাত পেতে নেয়—তখন ওর আর অত লজ্জা কি?

মতি ওকে এগিয়ে দিত, তার আসল কারণটা সুরবালা বহুদিন পর্যন্ত অনুমান করতে পারে নি। মতি দু দিনেই বুঝে নিয়েছিল যে, সুরবালা গেলে বেশী পেলা ওঠে তার চেয়ে। অল্প বয়স, আশ্চর্য রূপ আর আশ্চর্য গলা—আপনিই লোকের হাত খুলে যায় ওকে দেখলে। সবচেয়ে রূপ। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সবাই ওর দিকে, মায় বুড়ো বুড়ো লোকেরাও। মতিকে শুনিয়েই কেউ কেউ বলাবলি করে, 'নিযাশ কোথা থেকে বড়ঘরের মেয়ে চুরি ক'রে এনেছে কেত্তনউলী।' কেউ-বা বলে, 'মেমের বাচ্ছা নাকি রে! বাঙালীর ঘরে এমন রঙ তো দেখি নি কখনও!'

সঙ্গে নিয়ে যেমন যায়—ফি দিনই মতি কিছু-না-কিছু দেয় ওকে। কোন দিন পাঁচ টাকা, কোন দিন চার টাকা। বেশী আদায় হ'লে এক-এক-দিন আট টাকাও দিয়ে দেয়। সুরবালাদের কাছে এ-ই অচিন্তিত ঐশ্বর্য। বাজারে নাকি ভবতারণের বিস্তর দেনা হয়ে গিয়েছিল, সেজন্যে তিনি মুখ শুকিয়ে বেড়াতেন—সে দেনা শোধ হচ্ছে, তাঁর মুখে হাসি ফুটছে—এতেই সে খুশী। আরও বেশী পাওয়া উচিত কিনা—সে প্রশ্ন তার মনে নেই। নিস্তারিণী বরং এক-আধ দিন জিজ্ঞেস করেছে, কী রকম কি আদায় হয়, মতির হাতে কত পড়ে, কত কি খরচ, থোক লাভ কত দাঁড়ায়—সুরবালা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে তাকে, 'এত নিকেশে দরকার কি তোমার, তুমি যা পাচ্ছ তারই হিসেব করো বসে বসে।'

খোল বাজায় লোচন, সেও একদিন চুপি চুপি বলতে গিয়েছিল, 'আদায় তো তোর জন্যেই বেশী হয় গো, তা কেত্তনউলী সে বুঝে ভার্গ দেয়—না বোকা বুঝিয়ে দেয়?... যেমন কাজও শিখছিস, পাওনা-গণ্ডাও একটু একটু ক'রে বুঝে নিতে শেখ!'

তাকেও বকে দিয়েছে সুরো, 'খবরদার লোচনদা, ওসব নোংরা কথা আমাকে শোনাতে এসো না। সে-ই টেনে নিয়ে এল হাত ধরে, সে-ই শেখাল বিদ্যেটা, যা পাচ্ছি তার দৌলতেই, বলতে গেলে তার দয়ায়। তার সঙ্গে কি হিসেব-নিকেশের সম্পর্ক আমার!'

'আ মর ছুঁড়ি, বয়সগুণে ভাল কথাও মন্দ শোনায়!' ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছিল লোচন, 'এ ভালমানুষী কতদিন থাকে দেখব। আমি এখনই মরছি না, অনেক দেখলুম, এখনও অনেক দেখতে বাকী। এই টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে যেদিন খেচাখেচি ছেড়ে কিলোকিলি চুলোচুলি হবে তখন আমার কথাটা ইয়াদ করিস, লোচন বৈরিগী বলেছিল

বটে কথাটা—'

অবশ্য নগদ টাকা ছাড়াও মতি দেয় কিছু কিছু। এর মধ্যে আট গাছা চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছে, এক জোড়া তাগা! তাগাটা কার বন্ধকী ছিল, সে এলে-দিয়ে গেছে। সেইটেই পালিশ করিয়ে দিয়েছে ওকে। তা হোক, বেশ ভারী তাগা, অনেক টাকা পেত গালালে। শুধু সুরোরই নয়, নিস্তারিণীর অঙ্গেও বুড়ো বয়সে সোনা উঠেছে মেয়ের দৌলতে। একদিন এক গাছা বিছে হার পাওয়া গিয়েছিল এক জায়গা থেকে—সেটা সুরবালা চেয়ে নিয়েছে মায়ের নাম ক'রে। বলেছে, 'এ তো ফঙ্গবেনে দেনো হার—এ তো তুমি সাত জন্মেও পরবে না মাসী, কি করবে এটা নিয়ে?'

'কেন বল্ তো?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিল মতি, 'চাস তুই? কিন্তু এ হার তো মানাবে না তোকে।'

'না, আমার জন্যে নয়।' মাথা হেঁট ক'রে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বলেছিল সুরো, 'মার কথা ভাবছিলুম। কখনও তো গলায় এক কুঁচি সোনা উঠল না।...তাই বলছিলুম, আমায় তো দাও কিছু কিছু পেরায় রোজই—তা এর যা দাম হয় এক টাকা আধ টাকা ক'রে কেটে নিয়ে যদি হারটা আমাকে দাও—।'

'এই কথা! তা এর আর দাম কাটব কী লো। এও তো পাওনা জিনিস, কেনা তো নয়। এর কি আবার দাম যাচাই করতে ছুটব সেকরাবাড়ি?...যা, নিয়ে যা। মাকে দিবি সে তো ভাল কথাই। তার জন্যে অত কিন্তু হচ্ছিস কেন?'

এমনি উদারতার ঝোঁকে একদিন মস্ত ভুল ক'রে ফেলল মতি।

শরীরটাও খারাপ যাচ্ছিল অবশ্য, মধ্যে মধ্যেই বাতের ব্যথায় ভোগে ; মতলবও ছিল বোধহয় একটু বেশী উৎসাহ দেবার। বৌবাজারের এক বেনেবাড়ি থেকে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বায়না আসতে বলে বসল, 'আমি যেতে পারব না, আমার শরীর ভাল নেই। সুরোকে নিয়ে যান আপনারা।'

বাবুদের তরফ থেকে যে কথা কইতে এসেছিল সে মনিব শ্রেণীর কেউ নয়—নিতান্তই সরকার, দালালের কাছ থেকে আবার কিছু দালালীর লোভে নিজে ঘাড় পেতে নিয়েছে এই ঝক্কি, সে বিপন্ন মুখে রঘুবাবুর দিকে চাইল। রঘুবাবুও অবাক হয়ে গিয়েছিল. মতি যে তাকে না জানিয়েই দুম্ ক'রে এমন একটা প্রস্তাব দিয়ে বসতে পারে তা সে একবারও ভাবে নি। সে আমতা আমতা ক'রে বলল, 'হ্যাঁ, তা সুরো অবিশ্যি কিছু খারাপ গাইবে না, গায় তো ও ভালই—আর হবে না কেন, মেয়ের মতো যত্ন ক'রে শিখিয়েছ, গাইবার তো কথাই—তবে কি জানো, তোমার নামটা তো আর ওর হয় নি এখনও। তোমার নামটাই চায় তারা, লোককে বলতে কইতে, মতি কেত্তনউলীর গান দিয়েছি আমরা, বুঝলে না? সে বাহবাটা তো আর ওকে দিয়ে পাওয়া যাবে না!'

'তা না যায় তো আর কি করব। আমি নাচার।' নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলে মতি। তারপর ওদের সরকারের দিকে চেয়ে বললে, 'আপনি আমার নাম ক'রে বাবুদের বলুনগে যে, মতি বলেছে ওর গান যদি খারাপ হয় তাঁদের পছন্দ না হয়, তাহলে আমি আর একদিন গিয়ে বিনি পয়সায় গেয়ে দিয়ে আসব।...এর ওপর আর কথা আছে?'

'যে আজ্ঞে, বলব তাঁদের। তবে—,' সরকার রঘুবাবুর মুখের দিকে চায়।

'তবে'টাতেই রঘুবাবুরও দুশ্চিন্তা। রেটটা নিশ্চয়ই পুরো দেবেন না বাবুরা, মজুরোর মজুরীর ওপরই দালালী তার—টাকা কম হ'লে দালালীও কমে যাবে। সে-ই কথাটা শেষ ক'রে দিলে সরকারের, 'টাকাটা তো তাহলে ওঁরা কম দেবেন, ঐটুকু এক ফোঁটা মেয়েকে অত কি দেবেন?'

'আমিই কি অত দিতে বলছি!' মতি জবাব দেয়, 'যার যেমন বয়েস সে তেমন পাবে

বৈকি।'

তারপর মুখ টিপে হেসে হাটে হাঁড়ি ভাঙে মতি, বলে, 'ঢের তো কামালে রঘুবাবু, আমার ওপর দিয়ে বাড়ি ঘর সব ক'রে নিলে—আর কেন? এখনও কত দুইতে চাও আমাকে? আহিংকেটা একটু কমাও না। না হয় কচি মেয়েটার মুখ চেয়ে দু' টাকা কমই নিলে, তাতে কি মরে যাবে তুমি?'

একটু থেমে সরকারের দিকে চেয়ে চোখ টিপে আবারও বলে, 'আমার তো দিন ফুরিয়ে এল, চিত্রগুপ্ত সমন ঝাড়ছে, এবার কোন দিন পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। তখন খাবে কি? আর একটিকে খাড়া করো এবার আস্তে আস্তে—নইলে কারবার টিকবে কেন?'

রঘুবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মনে-মনে স্ত্রীজাতির মুণ্ডপাত করে। এদের অন্ত পাওয়া ভগবানেরও অসাধ্য, রঘুবাবু তো সামান্য প্রাণী।...

সরকার ফিরে এসে জানায়, বাবুরা রাজী আছেন, তবে পঁচাত্তর টাকার বেশী দেবেন না। বাজনদারদের আলাদাও দেবেন না। বকশিশ দেন সে স্বতন্ত্র কথা, কোন বাঁধাবাঁধি থাকবে না।

'তাই সই।' রাজী হয়ে যায় মতি। বলে, 'তাহলে পরশু ঠিক চারটেয় গাড়ি পাঠিও, পাঁচটায় শুরু হওয়া চাই।'

তারপর সরকার বিদায় হ'তে হেসে বলে, 'তোর তো কপাল ভাল লো, আমি প্রথম গাইতে গিয়েছি পঞ্চাশ টাকায়। তা থেকে একুশ টাকার মতো খরচাই বেরিয়ে গেছে দোয়ার-বাজনদার-দালালে।'

সুরবালার মাথায় তখন ওসব কথা ঢুকছে না। সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'এ কী করলে মাসী, শেষে কি লোক-হাসবে একটা। আমি একা গিয়ে অত বড় আসরে গাইব কি? সে আমি পারব না, তুমি চলো!'

'পারব না! নেকু! গাইব কি ক'রে! গাইবি না তো গান শিখেছিস কি জন্যে! চিরদিন কি আমার দোয়ারগিরি ক'রে কাটবে নাকি? একদিন না একদিন তো গাইতেই হবে, সেই আশাতেই এত মেহনৎ করা।...তাছাড়া দোয়ার বাজনদার সব জানাশুনো, ওদের সঙ্গে এতকাল গাইছিস,—তবু এত ভয় কিসের। তেমন হ'লে গুলিয়ে ফেললে—দেখবি ওরাই সামলে নেবে!'

তাতেও যে খুব সান্ত্বনা পেল সুরবালা তা মনে হ'ল না। সে গেল কতকটা বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে। আসরটাও বেশ বড়, সেদিকে চেয়ে আরও ঘাবড়ে গেল, দেখতে দেখতে ঘেমে নেয়ে উঠল একেবারে। কিন্তু গাইতে শুরু ক'রে গৌরচন্দ্রিকা ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাবটা কেটে গল। দ্বিধা-সঙ্কোচ কিছুই রইল না, বেশ মন দিয়েই গাইল। এত ভাল গাইল যে দোয়াররাই অবাক হয়ে গেল—যারা এতকাল ওর গান শুনছে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল তারা।

আসলে মতির ওস্তাদ সেই বাবাজী মশাই-এর উপদেশটাই কাজে লাগল আজ। চোখ বুজে যুগল-মূর্তির পটটা মনে মনে ভেবে নিল। নমস্কার করল উদ্দেশে। আসরেও একটা চৌকির ওপর গৌরনিতাইয়ের ছবি রাখা ছিল, তাঁদেরও প্রণাম করল। সেইদিকে চেয়েই গান ধরল প্রথম। সামনে বড় বড় হোমরাচোমরা বাবু বসে ছিলেন, চোগা চাপকান আচকান মাজা কফের শার্ট-এর ওপর কোঁচানো চাদর বাঁধা—চিকের ভেতরেও এ'দেরই পুরললনারা চিকের মধ্য দিয়েই অলঙ্কারের ঝিলিকে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এদের কারুর দিকেই তাকাল না সে, মনে মনে কীর্তনের দেবতা রাধাশ্যামকে ভাববারই চেষ্টা করতে লাগল।

আরও একটা নতুন ব্যাপার করল। গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল না—পেলা নেবার

জন্যে—আসরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগল। দোয়াররা অবাক, লোচন গুরুচরণ ওরা ফিসফিস ক'রে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল, 'যা না এগিয়ে যা না—ঘুরে ঘুরে গাইবি তো! সঙের মতো খাড়া রইলি কেন!' কিন্তু সুরো তা গ্রাহ্যও করল না। ঘুরে ঘুরে গাইল বটে, আসরের মাঝখানে থেকেই ঘুরল সে—যাতে চারিদিকের শ্রোতারা সকলে তার মুখ দেখতে পায়। তবে বেশির ভাগই তার দৃষ্টি রইল গৌর-নিতাইয়ের পটের দিকে। যাঁদের গান তাঁদেরই শোনাবে সে। তাছাড়া এ আসর তার, এ তার মুজরো—নিজের মতো ক'রেই গাইবে সে, ওদের কথায় চলবে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার—এমন কাণ্ড লোচন তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতে কখনও দেখে নি, পেলা তাতে বিশেষ কম পড়ল না। উঠে এসে দিয়ে গেল অনেকে, অনেকে রুমালে বেঁধে ছুঁড়ে দিল আসরে। বাড়িতে এসে গুনে দেখা গেল একশ' তিন টাকা আট আনা পেলাই আদায় হয়েছে শুধু। তা ছাড়া দুখানা গিনি। একখানা ছেলের মা বকশিশ দিয়েছে, আর একখানা পেলা হিসেবেই এসে পড়েছে পুরুষদের মধ্যে থেকে—রুমালে বাঁধা।...

মতি সব টাকাটাই ধরে দিলে সুরবালাকে। বললে, 'এটা তোর প্রথম রোজগার—এ থেকে আর কাটব না কিছু। পুরোটাই নিয়ে যা। শুধু খরচা যেটা, দোয়ার বাজনদার আর আমাদের রঘুবাবু সব মিলিয়ে ছাব্বিশটা টাকা রেখে যা, ওতেই হবে।' সুরবালা অন্তত একখানা গিনি রাখার জন্যে পেড়াপীড়ি করল, বলল, 'কিছু রাখো—নামমাত্তর অন্তত—?' কিন্তু মতি রাজী হ'ল না। বললে, 'আজ নয়, এর পর বরং অন্যদিন পুষিয়ে দিস। এ তোর বউনির গাওনা, এর সব টাকাটাই ঘরে নিয়ে যা। বামনী বুঝুক, মিছে বলেছিলুম কি সত্যি বলেছিলুম!'

অতিশয় চতুর ও হিসাববুদ্ধিসম্পন্ন লোকও মধ্যে মধ্যে উদারতার আবেগে অথবা বাহবার মোহে বেহিসাবী কাজ ক'রে বসে। মতিরও বোধহয় সেইরকম একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

জীবনে এত টাকা কখনও চোখে দেখে নি নিস্তারিণী, এত টাকা গোনারও অভ্যাস নেই। যতবার গুনতে যায়—হিসেব গুলিয়ে ফেলে। গিনিও—দূর থেকে যা দেখেছে, মতিকেই দেখেছে গিনির মালা পরে থাকতে—কিন্তু হাতে ক'রে নেড়েচেড়ে দেখবার ভাগ্য কখনও হয় নি। সেও এই প্রথম। টাকাগুলো সামনে সাজিয়ে রেখে হেসে কেঁদে সে অস্থির হ'ল।

কিন্তু তার পরেই বায়না ধরল, একটা পাকাবাড়ি কোথাও ভাড়া ক'রে উঠে যেতে হবে এবার। মেয়ের যখন এতটা নাম হয়েছে তখন আর বস্তিতে থাকা উচিত হবে না।

সুরবালার খুব আপত্তি থাকার কথা নয়, গণেশ তো শুনে নাচতে লাগল, কেবল ভবতারণেরই প্রস্তাবটা তত পছন্দ হ'ল না। তিনি বললেন, 'দ্যাখ্, ঝপ ক'রে অত খরচা বাড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়। আর দুদিন যাক, হাতে দুটো পয়সা জমুক, তখন না হয় বাড়ি বদলানো হবে। খরচা বাড়ানো সহজ, তারপর কমাতে গেলে খুব কষ্ট হয়।...এ তো

ধরাবাঁধা বন্দোবস্ত কিছু নেই। মাস মাস মাইনের মতোও মিলবে না—দু মাস যদি কোন বায়না না-ই পায়—তখন?'

নিস্তারিণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা! নিজে না হয় না-ই পেলে, মতিও কি মজুরো পাবে না—অত বড় গাইয়ে? সে পেলেও তো সুরোর ঘরে কিছু আসবে। দিচ্ছে তো ফি-রোজই। যা আসে, মাসে তিনটে দিন পেলেও বাড়ি ভাড়া উঠে যাবে।'

তবুও ভবতারণ খুঁৎখুঁৎ করেন, 'দ্যাখ, ভূমি লক্ষ্মী, জমিবাড়িরও আয়-পয় দেখে মানুষ। এই ঘরের পয়ে তোর মেয়ের রোজগার, তার আগে এই ঘরের পয়েই তোর ছেলে-মেয়ে—এক কথায় দুটো পয়সা হাতে পড়তে না পড়তে এ ঘর ছেড়ে যাওয়া কি ভাল হবে?'

এইবার একটু দমে যায় নিস্তারিণী—তবে বেশীক্ষণের জন্যে নয়। পরমুহূর্তেই সমস্যা সমাধানের সুরে বলে, 'তা বেশ তো, তেমন বোঝো, এ-ঘরটা থাক না। আটকে রাখলেই তো হয়। কতই বা ভাড়া, এতই যদি টানতে পারি এ-পাঁচসিকেও পারব। কিন্তু এধারের কথাটাও ভেবে দ্যাখো, মেয়ের একটু একটু ক'রে নাম ছড়াচ্ছে। যারা মোটা টাকা দিয়ে মুজ্‌রো করতে ডাকবে, তারা কেউ এ খোলার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবে না। এখান থেকে গাড়ি ক'রে নিতেও আসবে না কেউ। ওর উন্নতিটাও তো দেখতে হবে, চিরকাল কি ও মতি কেত্তনউলীর ন্যাজ ধরে থাকবে?'

কথাটা ঠিক। ভবতারণ চুপ ক'রে যান। আজকাল আর বেশী তর্কাতর্কি ভালও লাগে না তাঁর। শরীরটা ভেঙে আসছে—সেটা বেশ বুঝতে পারছেন। কটা দিনই বা আছে আর, এত গোলমাল ক'রে লাভ কি?...আরও একটা কথা তিনি ভাল বোঝেন। যে সংসার চালায় তারই কর্তৃত্ব করা সাজে। এখন আর তাঁর আয়ে সংসার চলে না। সুতরাং তাঁর কোন কথা না কওয়াই ভাল।

নিস্তারিণীই খোঁজাখুঁজি ক'রে একটা বাড়ি ঠিক করলে। গোলোককে খবর পাঠাতে সে-ই ঠিক ক'রে দিলে। ওদেরই বাড়ির কাছে, বাড়িওয়ালারা দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও হয় বুঝি গোলোকদের। ভদ্রলোকদের অবস্থা এককালে ভাল ছিল, কখনও বাড়ি ভাড়া দেন নি এর আগে। গোলোকই বলে বুঝিয়ে রাজী করাল। একই বাড়ির অংশ, তবু বাইরে যাতায়াত করার একটা আলাদা রাস্তা আছে বলে পৃথক বাড়িও ধরা যায়। নিচে একখানা ঘর, ওপরে দুখানা। ছাদে রান্নাঘর। ওদের পক্ষে এই ঢের, গোলোকও সেই কথা বললে, 'এর চেয়ে বেশি ঘর নিয়ে করবেন কি? ঘর হলেই তার আসবাব চাই। কী দরকার মিছিমিছি এখনই এত খরচ বাড়াবার। ভগবান দিন দেন আর একটা বড় বাড়ি দেখে উঠে যেতে কতক্ষণ?'

বাড়ি নিস্তারিণীর পছন্দ হ'ল। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে কথা পাকা ক'রে ফেলল সে। তারপর ভটচার্যিমশাইকে দিয়ে একটা ভাল দিন দেখিয়ে সেই মাসের মধ্যেই সে বাড়িতে উঠে গেল।

মতি অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারে নি ব্যাপারটা। একেবারে সব ঠিকঠাক হয়ে যেতে তাকে বলল সুরো। আগে কেন বলে নি তা সেও জানে না, জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারত না। কোথায় একটা অকারণ সঙ্কোচে বেধেছিল।

কথাটা শুনে মতির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন।

'চললি কী লো? কথা নেই বার্তা নেই—বললেই হ'ল অমনি যে, চললুম। ওসব হবে না—এই বলে দিলুম। তোমার ওসব যাওয়া-টাওয়া চলবে না।'

অবুঝের মতো বলে মতি। দুশ্চিন্তায় ক্ষোভে দুঃখে তার যেন কথাবার্তাও অসংলগ্ন হয়ে পড়ে।

সুরো বলে, 'বা রে! আমি কি জানি। মা-বাবা ঠিক করলে, তারাই বাড়ি দেখেছে—আমি তো এখনও চক্ষেও দেখি নি।'

'তবে তারাই যাক। তুই আমার কাছে থাক।'

'তা কখনও হয়। বাবা মা ভাই সবাই থাকবে এক জায়গায়—আর আমি এখানে পড়ে থাকব। লোকেই বা কি বলবে।'

'এতই যদি পাকা বাড়িতে থাকার শখ হয়েছিল আমার কাছেই তো সবাই থাকতে পারতিস। নিচে তো কত ঘর পড়ে আছে।'

'সে তো তুমি আর ভাড়া নিতে না। তাতে আমার বাবা-মা রাজী হবে কেন? পরের দয়ায় পরের এক্তাজারিতে থাকা। বাবা একটা কথা খুব বলে যে, পরভাতি ভাল, পরঘরি ভাল নয়।...হুট্ ক'রে যাও বললেই চলে যেতে হবে। সে বড় আতান্তর, অপমানও তো একটা।'

মতি রাগে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ইতরের মতো গালাগাল দিতে থাকে সুরোর বাবা-মাকে। সুরো বলে, 'অমন করছ কেন, আমি কি দু-দশ ক্রোশ দূরে কোথাও যাচ্ছি? এই তো দর্জিপাড়া নাকের ডগায়, চারগণ্ডা পয়সা ফেললেই পালকি আসে। আমি হেঁটেই আসতে পারি স্বচ্ছন্দে। যখন দরকার হবে দারোয়ান পাঠিও, আমি তার সঙ্গে হেঁটে চলে আসব। আর আসতেই তো হবে, তোমার কাছে তো টিকি বাঁধা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইটে যাতে বেশীদিন না থাকে, সেইজন্যেই তো তোর মা-মাগী মতলব ফেঁদেছে। একটু-আধটু নাম হয়েছে, এইবার দালালদের কানে যাবে, তারা ঘোরাঘুরি করবে, ঐখেনে বসেই দেনাপাওনা ঠিক হয়ে যাবে, আলাদা কারবার চলবে। আমার কাছে থাকলে ভাগ দিতে হয় যদি!—তোরও মনোগত অভিপ্পেরায় তাই। আমি কি আর বুঝি না!'

'খুব বোঝ!' সুরবালা একটু দাবড়ি দিয়েই ওঠে এবার, 'আলাদা দল খুললেই হ'ল—না? তার দোয়ার চাই না, বাজনদার চাই না—খোল বাঁশী কিচ্ছু চাই না—ফুশমন্তরে অমনি দল খোলা হয়ে যাবে।...এত্তটি টাকা ঢাললে তবে দল হবে। তারপর, কে আমার কাছে এত ছিষ্টি ক'রে খুঁজে খুঁজে যাচ্ছে শুনি!...চিরকাল বস্তির মধ্যে খোলার ঘরে কাটল—তাই মায়ের একটা শখ হয়েছে বাবাকে নিয়ে পাকাবাড়িতে তুলবে। এর মধ্যে দুষ্যি কি আছে? তুমিই বা এত মতলব খুঁজছ কেন এর ভেতর?'

এবার মতি অন্য পথ ধরে। অনুনয়ের সুরে বলে, 'তবে তারা যাক সেখানে—তুই আমার কাছে থাক। তাদের খরচ দিস, মাঝে মাঝে দেখে আসিস। না হয় ফি হপ্তাতেই যাস। কিন্তু সেখানে থাকা তোর হবে না।'

'না, সে আমি পারব না।' মুখ গোঁজ ক'রে উত্তর দেয় সুরবালা।

মতি রেগে ওঠে, 'তা তো বলবিই এখন। এখন আর পারবি কেন, দিন যে কিনে নিয়েছিস। আমারই ভুল, বুড়ো হয়ে মরতে চনন্—এখনও মানুষ চিনলুম না। সব্বাই আমাকে বারণ করেছিল, পই পই ক'রে বলেছিল—আগে ছুকরী ক'রে নে, তারপর শেখাস; না হলে, বনের গরু খায়-দায় বন বাগে যায়—তাই হবে। তাদের কথা শুনি নি, বলেছিলুম—ও তেমন মেয়ে নয়, দেখিস আমার সঙ্গে কখনও বেইমানি করবে না, আমাকে ফেলে যাবে না। হাত্তোর ভাল হোক রে, ঠাকুরঘরে গিয়ে দিব্যি গেলেছিলি তাও ভুলে গেলি?'

'কেন ভুলব! দিব্যি গেলেছি বুড়োবয়সে দেখব, সে আমার মনে আছে। টাকা যা রোজগার করব তা থেকেও ভাগ দোব। সব মনে আছে আমার। সে আমি দেখবও, টাকাও দোব, যদ্দিন তুমি বাঁচবে। যদি অক্ষম হয়ে পড়ো, শয্যাগত হও—মুখে জল দেবার লোক না থাকে, আমি নিশ্চয় আসব, গুয়েমুতে সেবা করতে হয় তাও করব। তেমন নেমক-

হারাম আমি নই, তেমন বেইমানের ঝাড়ে আমার জন্ম হয় নি। সে যখন দরকার হবে অবশ্য করব, তাই বলে তোমার বাড়ি ছুকরী থাকব কেন? হাজার হোক তুমি খানকী, আমি বামুনের মেয়ে।'

মর্মান্তিক আঘাত। শব্দটা, আর যা-ই হোক সুরবালার মুখ থেকে শুনবে ভাবে নি কখনও। এমনিই—কথাটা যে-কোন লোকের মুখ থেকে শুনলেই রূঢ় আঘাত লাগত। সকলেরই লাগে, পরোক্ষে বলছে বা আড়ালে বলছে শুনলেও লাগে। এমনভাবে মুখো-মুখি সামনাসামনি শুনলে তো লাগবেই। মনকে যতই যা বোঝাক, যে কোন কৈফিয়ৎই থাক, নিজের সম্বন্ধে কতকগুলো সত্য মানুষ কোন অবস্থায় কখনই সহ্য করতে পারে না। বহু ব্যবহারে সত্যটা অনেক সময় ভোঁতা হয়ে যায় হয়ত, সে সম্বন্ধে নিজের অনুভূতি বা সচেতনতা থাকে না তত—কিন্তু কেউ মনে করিয়ে দিলেই সে-সচেতনতা পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসে, আর সে সচেতনতার যে আঘাত—সেও কম দুঃসহ নয়।...

আঘাতটা সামলাতে সময় লাগল মতির, অনেকক্ষণ কথাই কইতে পারল না কিছু। মুখচোখ এমন লাল হয়ে উঠল যে, সুরোর ভয় হ'ল—মাথায় রক্ত উঠে মরে যাবে কিনা। ওদের পাশে দুর্গামার বাড়ি নতুন যারা ভাড়া এসেছে, তাদের বুড়োকর্তা ঐতেই মরেছে, মাথায় রক্ত উঠে শির ছিঁড়ে যায়, সন্ন্যেস রোগ না কি বলে ওকে।...এরও তাই হবে নাকি? তাহলে সুরবালাকে চিরকাল নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকতে হবে।...কিন্তু এখন আর ভেবে কি হবে, হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার ফেললে আর ফেরানো যায় না।

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে যেন কণ্ঠস্বর খুঁজে পায় মতি। দেবার মতো উত্তর বিশেষ নেই তা তার কথা থেকেই বোঝা যায়। প্রতিশোধের একটা ক্ষীণ চেষ্টা হিসেবে বলে, 'হ্যাঃ! মেয়েবেচা ঘরের বামুন, সে-বামুনের মেয়ের আবার বড়াই। তোদের তো সেই দাম নিয়ে মেয়ে বেচেই দেয় পুরুষ ধরে।'

কথার পৃষ্ঠে কথা, না বলে থাকা যায় না। সুরোও বলে ফেলে, 'সে তো একবার, একজনের কাছেই বেচে, আর এ যে বার বার—হরেকরকমের লোকের কাছে। সারা জীবন ধরেই ফিরি ক'রে বেড়ানো।'

তারপর একবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'না মাসী, আমি এখন যাই, থাকলেই কথা বাড়বে। তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। আমিও আবার কি বলতে কি বলে ফেলব। কথাগুলো বলা ঠিক হ'ল না আমার, ছোটমুখে বড় কথা। তুমি যা-ই হও, তোমাকে আমি গুরুজন বলেই জানি, গুরুর মতোই মান্যি করি। যা বললুম দোষঘাট নিও না, ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে মানিয়ে নিও।'

সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে একেবারে বেরিয়ে চলে এল।

সুরবালা ভেবেছিল, এইতেই হয়ত মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ও হয়েছিল বেশ। তাই যেদিন ওরা নতুন বাড়িতে উঠে গেল, তার পরের দিন বেলা দশটা না বাজতে বাজতে নিজেই একটা পাল্‌কি ডেকে চলে এল এ-বাড়িতে। কোন কাজ ছিল না, তবু সারাদিন পড়ে রইল। একেবারে সন্ধ্যার পর দারোয়ানকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু একটু অবাকই হয়ে গেল দেখে, মতি আর উচ্চবাচ্যই করল না এ সম্বন্ধে, কথাবার্তার মধ্যেও কোন খোঁচা বা ইঙ্গিত প্রকাশ পেল না। যেন সুরবালা দূরে কোথাও যায় নি, যেমন ছিল তেমনি আছে। এমন কি, যখন দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে সঙ্গে যাবার জন্যে বলছে, তখনও জোর ক'রে ঝিকে ধরে একটা মিথ্যে ব্যাপার নিয়ে বকাবকি শুরু করল—অর্থাৎ ওর কথাটা কানেই তুলল না। সুরবালাকে বোঝাতে চাইল যে, ওর গতি-বিধিতে কিছু আসে-যায় না। সে-ও আর যেচে কথাটা তুলল না। মিছিমিছি খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কি!

তবু, সুরবালার পুরো ভয়টা কাটে নি তখনও। প্রত্যাঘাত আসবেই, কোন্ দিক থেকে আসবে সেইটেই ভাবনা। মনে মনে বেশ খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিল। রোজগারে না হাত পড়ে—সেই আশঙ্কাটাই বড়। বাবার কথাই হয়ত সত্যি হবে। মার ওপর রাগ ধরতে লাগল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি বদলাবার হাঙ্গামা না করতে গেলেই হ'ত। হাজার হোক, বাবা পুরুষমানুষ, সংসার ঢের বেশী দেখেছেন চিনেছেন, তাঁর কথা শোনাই উচিত ছিল।...

কিন্তু, দেখা গেল যে, আরও অবাক হওয়া কপালে ছিল সুরবালার। তিন-চার দিন পরেই একটা বায়না ছিল। সুরবালা জানত, সে-ই আজকাল পাঁজিতে দাগ দিয়ে রাখে। আগের দিন মনে করিয়ে দেয়। এই দিনটার জন্যেই কাঁটা হয়ে ছিল সে। ভয় ছিল যে, হয়ত সঙ্গে যেতে বলবে না, বা নিজে থেকে এলেও সঙ্গে নেবে না। কিন্তু আগের দিন বাড়ি ফেরার সময় অন্য বারের মতোই বলে দিলে মতি, 'কাল সকাল আটটায় গাওনা—মনে থাকে যেন। খুব ভোরে চলে আসবি তৈরী হয়ে। বেশী কিছু খাস নি, সকালবেলা ভরাপেটে গলা খোলে না। তাই বলে একেবারে উপোস করেও আসিস নি, ফিরতে দেড়টা-দুটো হয়ে যাবে হয়ত। বড়লোকের বাড়ি মুজরো, মেলা লোকজন আসবে। অল্পে ছাড়া যাবে না।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বার কথা, তখনকার মতো ছাড়লও, তবু একটা কি যেন কাঁটার মতো খচখচ করতেই লাগল সুরবালার মনে। তার বয়স অল্প হ'লেও এই বয়সেই ঢের মানুষ দেখেছে সে। ওদের বাড়ি বহু লোক আসত—আশপাশের ঘর থেকে, মতির বাড়িও হরেকরকম লোকের আমদানি। মানুষের স্বভাবের মূল কথাগুলো জানা হয়ে গেছে তার। মতিকেও খুব কম দিন দেখছে না, তাকেও চেনে সে। এত সহজে এত বড় আঘাত ভোলবার লোক নয় মতি। সুরোকে সে ভালবাসে তাতে কোন ভুল নেই। একটু বেশীই ভালবাসে। সত্যিকারের টান আছে। গুণের ওপর গুণীর টান তো বটেই, বাধ্য সৎস্বভাবের মেয়ে—নিঃসন্তান মতির অপত্যস্নেহও পড়েছে খানিকটা। সেইজন্যেই এত বিচলিত হয়েছে সে দূরে যাওয়ার কথায়—আর সেইজন্যেই আঘাতটা এত বেশী লেগেছে। সে-আঘাতের শোধ মতি নেবেই—শুধু কীভাবে নেবে সেইটে বুঝতে পারে না বলে ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্ করে সুরবালা, ভয়টাও তার ঘুচতে চায় না।...

অবশ্য খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয় না—মতলবটা বুঝতে।

আগে যখন পাশে থাকত, তখন অমন বিশ বার আসত যেত, কাজ না থাকলে—রেওয়াজ বা গটানোর কাজ—টানা বেশীক্ষণ থাকত না এখানে। এখন একটু দূর থেকে আসা, হয় পাল্‌কি করে নয়তো লোক সঙ্গে ক'রে আসতে হয়—এলে আর চট ক'রে যাওয়া যায় না। কাজেই একটানা অনেকক্ষণ ক'রে থাকতে হয় প্রতিদিনই। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী দোহার বা বাজনদার দু-একজন—সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার শুরু করল, মানে একটু অন্তরঙ্গতা করার চেষ্টা করতে লাগল। প্রথম প্রথম অতটা বুঝতে পারে নি সুরো, দু-চারদিন যেতে বুঝল। একই রকম ঘটনা প্রত্যহ ঘটতে লাগল। আরও বুঝল যে, এটা তাদের তাগিদ যত না—মতির তাগিদ তার চেয়ে বেশী। সে-ই উস্কে দিয়েছে ওদের, সে-ই অবসর যুগিয়ে দেয়। অন্য সময় কড়া নজর রাখে, শুধু শুধু কেউ বসে বাজে গল্প-ইয়ার্কি করছে কিনা—এদের বেলা নির্বিকার। মতির জ্ঞাতসারেই তারা এসে বসে, ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প করে, খারাপ খারাপ ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, এক-একজন অমন এক ঘণ্টাই কাটিয়ে দেয়—মতি দেখেও দেখে না, উদাসীন থাকে।

শুধু এরাই নয়। মতি যেন ছেলে-ছোকরা বিশেষভাবে আমদানি করতে লাগল। মতির বোন আছে একজন জানু বলে, কে এক বন্ধু কীর্তনওয়ালী আছে পান্না বলে—এক শিক্ষকের কাছেই গান শেখা, খুব ভাব দুজনের—এছাড়াও ভূষণ বেদানা আরও

কত সব মেয়েছেলে বন্ধু আছে ; এদের বাড়ির ছেলেছোকরা আত্মীয় যারা—ছেলে বা ভাইপো বা বোনপো এমনি ধরনের, যারা কখনও সখনও কালেভদ্রে এ-বাড়িতে আসত, তারা এখন ঘন ঘন আসতে লাগল। সকলেরই টাঁক যেন তার দিকে। সকলেই চায় নিরিবিলি বসে তার সঙ্গে গল্প করতে। আর মতিও যেন সেই সুযোগ দেবার জন্যে ব্যস্ত। কাজ থাকলেও জোর ক'রে কোন অছিলায় হয়ত ছাদে পাঠিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোকরা গিয়ে সেখানে উদয় হ'ল—এমনি চলতেই থাকে।

প্রথম প্রথম সুরবালা অতশত বোঝে নি। এগুলোকে আকস্মিক যোগাযোগ ভেবেছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরেই যখন এই ব্যাপার চলল, প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল, তখন আর তত আকস্মিক বলে বোধ হ'ল না। দুই-আর-দুইয়ে চার মিলিয়ে পাবার মতোই এই আক্রমণের অর্থ খুঁজে পেল সে।

এসব সে জানে না একেবারে এমন নয়—শুধু মতি যে এতটা ছোট হবে তা ভাবে নি বলেই বুঝতে এত দেরি হ'ল। তার মায়ের ওখানে রাস্তার কলের ভাবিসাবি হিসেবে এমন কোন কোন মেয়েছেলে আসত—পরে জেনেছিল সুরবালা—যারা ঠিক গেরস্তঘরের মেয়ে নয়। সন্ধ্যের পর মুখে এরারুট মেখে পিদীম জ্বালিয়ে দোরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা, সেই তাদের জীবিকা। তারা বামুন বলে, গেরস্ত বলে নিস্তারিণীকে সমীহ করত সবাই, অনেকে ওদের দাওয়াতে পর্যন্ত উঠত না—তবু তাদের কথাবার্তা সব সময়ে সংযত থাকত না। চেষ্টা করত তারা সাবধান হয়ে কথা বলতে, তবে এক-এক অসতর্ক মুহূর্তে এক-আধটা খারাপ কথা বেরিয়ে যেতই।...মতির এখানে যারা আসে, এই পথের পথিক যেসব মেয়েছেলে বা যারা সোজাসুজি দেহ ভাঙিয়ে খায়—তারা সকলেই যথেষ্ট বিত্তশালিনী ; কীর্তনউলী বাইউলী তো আছেই, যারা অন্যরকম—তারাও কেউ সাধারণ বাজারের মেয়েছেলে নয়, নামকরা জমিদার বা ধনী ব্যবসাদারের রক্ষিতা সবাই। কেউ কেউ বা দীর্ঘকাল একই লোকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করছে। একজনকে তো জানে, তাকে ভালও লাগে খুব সুরবালার, তেরো বছর বয়স থেকে একজনের কাছে ছিল, চল্লিশ বছর তাঁর সঙ্গে কাটাবার পর ভদ্রলোক মারা যেতে একেবারে বিধবার মতো বেশভূষা ক'রে ফেলেছে, থান পরে, একাদশী করে, মাছ-মাংস ছোঁয় না। এদের চালচলন সকলেরই খুব ভদ্র, অনেক বড়ঘরের মেয়েছেলের চেয়েও হয়ত ভদ্র—তবু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় এমন এক-একটা কথা বেরিয়ে পড়ে যা বিশেষ এইদিকেরই—যা সাধারণ গৃহস্থঘরে কেউ কোনদিন ব্যবহার করে না, দরকার হয় না। এমনিই একটি শব্দ 'জুটিয়ে দেওয়া' অর্থাৎ কোন মেয়েকে নষ্ট হ'তে সাহায্য করা, প্ররোচিত করা। মেয়ে আর পুরুষকে নিভৃত সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ দেওয়া—যাতে তারা পরস্পরের দিকে আসক্ত হবার অবসর পায়, কি প্রেরণা পায়।

মতিও তাকে এমনি জুটিয়ে দিতে চায় কারুর সঙ্গে। যেমন করে হোক তাকে নষ্ট করতে চায়। সেদিনের সেই অপমানের শোধ তুলতে চায়, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ঘুচিয়ে নিজের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চায়। কথাটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে ওঠে সুরবালা, সতর্কও হয়। দোহার বা বাজনদারদের ভয় নেই, তাদের ও গ্রাহ্যও করে না। একদিন স্পষ্টই সকলকে শুনিয়ে একসঙ্গে সাবধান ক'রে দিলে, 'যে রস করতে আসবে বেশী—আঁশবটি দিয়ে নাক-কান দুই-ই কেটে নোব তার।...থানা পুলিশ ক'রে কিছু করতে পারবে না, মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করার আইন নেই মহারাণীর রাজত্বে। আমার কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে নিজের জানটা যাবে—মনে থাকে যেন। প্রাণে যদিও বাঁচো, মুখ দেখাতে পারবে না কাউকে।'

ওদের মামলা যত সহজে চুকিয়ে ফেলা যায়, ভদ্রলোকদের বেলা তত সহজে যায় না। তাদের তাই যতটা সম্ভব এড়িয়ে যায়, নিরিবিলিতে একা না পায় বেশীক্ষণ—সে সম্বন্ধে

হ্‌শিয়ার থাকে। কিন্তু কাঙালকে একবার শাকের ক্ষেত দেখানো হয়ে গেলে, সে আর—যে দেখিয়েছে—তার তোয়াক্কা করে না। দেখা গেল, ঐ ছোকরাদের গরজটা তখন নিজস্ব হয়ে উঠেছে, তাগিদটা মতির চেয়ে তাদেরই বেশী। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন স্‌রবালা আবার ম্‌খ ধরে, একদিন সোজাস্‌জি বলে, 'মাসী, রোজ তো ঠাকুরঘরে দ্‌ঘণ্টা ধরে প্‌জো করো—তবে আবার এসব পিরবিত্তি কেন?'

পলকের জন্যে বিবর্ণ হয়ে ওঠে মতি। তারপরই সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে; বলে, 'কেন লো, কী এমন পিরবিত্তি দেখলি আবার আমার?'

'এই কুটনীগিরি করার পিরবিত্তি।'

'কি বললি, যতবড় ম্‌খ নয় ততবড় কথা! আমি কুটনীগিরি করি?'

'তা না তো কি, রাজ্যির যত অগা বাউন্ডুলে মায়ে-মরা বাপে-খেদানো ছোঁড়াকে এনে আমার পেছনে লেলিয়ে দাও কেন!'

'আমি লেলিয়ে দিই? কে বলেছে তোকে? তোর রীতচরিত্তির দেখে ওরা সাহস পায়, তাই এসে ছোঁক-ছোঁক করে। আপনিই আসে ওরা।'

'কই এতকাল তো আসত না। এই তিন-চার মাসই দেখছি সব স্‌তোর টানা দিচ্ছে—যে ক'দিন এখান থেকে উঠে গেছি আমি। তোমার দোয়ার বাজনদাররাও এই নতুন রীত-চরিত্তির দেখছে আমার?'

এর উত্তরে আর একদফা গালিগালাজ করে মতি—স্‌রোকে আর তার মেয়েবেচা ঘরের বাপ-মাকে! তারপর সেও মোক্ষম মার দেবার চেষ্টা করে, 'তুই তো কুড়নো মেয়ে—কী জাত কী বিত্তেন্ত কিছ্‌ই জানে না কেউ। তোর আবার অত বিচক্ষণা কিসের। তুই তো ওদের ঘরেরও নোস।'

'যাদের অন্ন খেয়েছি, জ্ঞান হয়ে পজ্জন্ত যাদের দেখছি, তারাই বাপ-মা, আবার বাপ-মা কি! লোকে প্‌ষ্যি নেয় যে বয়সের ছেলেমেয়ে—আমি তো তার আগে থাকতে আছি ওদের কাছে। ওই মায়েরই দ্‌ধ খেয়েছি। আর এই তো আমার চেহারা দেখছ, এই রঙ—ভাল ঘরের মেয়ে না হলে এমন চেহারা হয়? তুমি তো বলো তোমার মা ভাল কায়েতের ঘরের মেয়ে, জমিদারের ঘরের বৌ ছিল, তা তোমার চেহারাও তো আমার মতো নয়।'

'আ মর ছ্‌ঁড়ি, র্‌পের অংখারে মটমট করছে একেবারে। বয়েসকালে আমার চেহারাও তোর চেয়ে খারাপ ছিল না। আর রঙ—দেখ্‌গে যা বেনেদের ঘরে, তোর চেয়েও ফরসা বেরোবে।'

'বলি তারা নয় বাম্‌ন না-ই হ'ল, ভদ্দরলোক তো। আর যে যতই বলো, আমি এটা বেশ জানি—আমি বাম্‌নের মেয়ে।'

এ প্রসঙ্গে ছেদ টেনে সেখান থেকে সরে যায় স্‌রবালা। সেও মতিকে ভালবাসে, সত্যিই গ্‌র্‌র মতো দেখে। তাকে এসব কথা বলতে ম্‌খে বাধে। কিন্তু মতির যে কী ভূত ঘাড়ে চেপেছে—মরণকালে নাকি যেমন বিপরীত ব্‌দ্ধি হয়, তেমনি যেন হয়েছে—সে-ই বাধ্য করায় কড়া কথা বলতে।

মতি যতই চেঁচামেচি কর্‌ক, স্‌রোর সেদিনের কথাতে কাজ হয় কতকটা। ছোকরার দলের যাতায়াত কমে আসে। দ্‌-একজন যারা হাল ছাড়ে না, তারা মতির নিষেধ শোনবার লোক নয়, সেটা স্‌রোও বোঝে। নিজেদের গরজেই আসে তারা। তা তাদের অত গ্রাহ্যও করে না সে। নিরিবিলি কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করলেই ম্‌খ ছোটায়। ওরই মধ্যে একজন একট্‌ বেশী বেয়াদবি করতে গিছল একদিন, ঝ্‌লঝাড়া লাঠি ছিল একটা বারান্দার কোণে, তারই বাড়ি বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা—তার পরদিন থেকে সে আর আসে নি।

ওদের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও মতির হাত থেকে পায় না। সে এবার অন্য পথ ধরেছে। সোজাস্‌জি লোভ দেখাবার চেষ্টা করছেঃ 'অম্‌ক তোর কাছে আসতে চায়,

মস্ত লোক—কলকাতায় সাতখানা বাড়ি, জুড়ি-গাড়ি, মস্ত কারবার রাধাবাজারে। দ্যাখ, কপাল ফিরে যাবে, জীবনে আর টাকার ভাবনা থাকবে না। প্রেথম দিনই হাজার টাকা নগদ, চল্লিশ ভরি সোনা দেবে বলছে।' কখনও বলে, 'অমুক জমিদার সাধ্যসাধি করছে, দ্যাখ—বাড়ি ক'রে দেবে বলছে কলকেতায়, হীরে-জহরতে সোনায় মুড়ে দেবে।' কিংবা 'অমুক মারোয়াড়ী মহাজন একশ টাকা মাইনে বছরে দু হাজার টাকার গহনা দিতে চায়। খুব সুন্দর চেহারা রাজপুত্তুরের মতো। ভেবে দ্যাখ, একাধারে দুই শখই মিটবে।' ইত্যাদি—

শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে সুরবালা। কখনও এই সব কথা পাড়লেই উঠে চলে যায়, কখনও রাগারাগি করে। বলে, 'গান শিখতে এসেছিলুম, গান গেয়ে রোজগার করব বলে। তুমি কি গান গেয়ে কম রোজগার করেছ? এধারে কি করো তা জানি না, কিন্তু বাঁধা রাঁড় তো নও কারুর, সেদিকে পয়সা আসে না এটা ঠিক—তাতেও তো কোঠা বালাখানা আসবাবপত্তর কম হয় নি তোমার—গয়নাও তো যা আছে দাঁড়িপাল্লা ছাড়া ওজন হবে না। সবই তো তোমার গেয়ে গো।...তবে আমাকে এসব লোভ দেখাচ্ছ কিসের জন্যে? আমার অত পয়সার দরকার নেই। সৎ পথে থেকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলেই খুশী।'

'তা ব'লে এমনি করেই কি চিরদিন কাটবে তোর? স্বভাব চরিত্তির চিরদিন সামলে রাখতে পারবি? মিছিমিছি, পাচ্ছিস যখন—সেধে আসছে—দিন কিনে নে না। আহাম্মুকি করছিস কেন?'

'দেখাই যাক না—কদ্দিন সামলে রাখতে পারি।'

'আমিও দেখব। ওলো—অনেক দেখলুম, এই বয়সে ঢের সতী-সাবিত্তির দেখলুম। এর জবাব তোলা রইল।'

ভয়ঙ্কর মুখ ক'রে বলে মতি।

জবাব যে তোলা রইল তা সুরবালাও বোঝে। ভয় পায় সে সত্যিই। মেয়েমানুষটি বড় সোজা নয়—এই মতি কীর্তনওয়ালী। ক্রমাগতই ওর বিদ্বেষ বাড়িয়ে চলেছে। ভাল হচ্ছে না এটা, ভাল হবে না—তা সুরো বেশ বোঝে। অথচ কী যে করবে, আর কী করা চলত সেইটেই ভেবে পায় না

॥ ৮ ॥

সেই একবারের পর একানে মুজরো আর পায় নি সুরো, যা পাঁচ সাত টাকা মধ্যে মধ্যে পাচ্ছিল মতির সঙ্গে দোয়ার্কি ক'রে তাতেই খুশী ছিল সে, ভাতটা বন্ধ না হলেই হ'ল—এই তার ভাবনা। বাবা আজকাল আর বিশেষ কিছুই আনতে পারেন না। ওর উপার্জনই চারটি প্রাণীর ভরসা।

এরই মধ্যে, এ বাড়ি আসার প্রায় মাস-তিনেক পরে, একদিন রঘুবাবু হঠাৎ খুঁজে খুঁজে ওর বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে আর একটি ছাতা-বগলে ভদ্রলোক, বেশভূষা ও অকারণ বিনয় দেখলে বড়লোকের বাড়ির সরকার কি গোমস্তা মনে হয়। সুরো তো অবাক। বসায় কোথায় সেই তো সমস্যা। নিচের ঘরখানা অব্যবহার্য পড়ে থাকে—ওদের

দরকারে লাগে না বলে, ঘরটা ভালও নয়, অন্ধকার স্যাঁতসেতে মতো। বৈঠকখানা সাজাতে হলে অনেক আসবাব চাই, নিদেন একটা চৌকি আর একখানা জাজিম কি সপ তো বটেই। দরকারই বা কি, এরকম বাইরের লোক তো আসে না কেউ, আসবে তাও ভাবে নি।

অগত্যা ওপরেরই একটা ঘরে নিয়ে যেতে হয়। মাদুর পেতে বসতে দেয় ওদের।

'কী ব্যাপার রঘুবাবু, আপনি হঠাৎ— ? এ গরিবের বাড়িতে!'

'হেঁ হেঁ', গরিবের বাড়িই বটে! তুমি তো বাবা বড়মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করো, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাও না', দাঁত বার ক'রে বলে রঘু, 'আমি মরি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে, বলি চিরদিন কি মেয়েটার এই তাঁবেদারি ক'রে কাটবে—এত এলেম থাকতে! ...কেত্তনউলী যা লোক, কোনদিন আর তোমাকে একা ছাড়বে না, বেশ বুঝে নিয়েছে যে তোমাকে ছাড়লেই তুমি বাজার মাৎ করবে, ওর পসার মাটি!'

'ওসব কথা থাক না রঘুবাবু', বিরক্ত হয়ে ওঠে সুরো কথার পত্তনেই, 'মাসী আমার উপকার বই কখনও অপকার করে নি, ওর দয়াতেই যা দু'মুঠো জুটছে—দয়াই করেছে, যেচে সেধে একটা বিদ্যে শিখিয়েছে। সে আমায় কখনও মন্দ করবে না।...আর বাজার মাৎ করবার কথা কি বলছেন যা তা, মাসীর মতো গাইতে আমার এখনও বিশ বছর সময় লাগবে।'

'অবিশ্যি অবিশ্যি!' মুচকি মুচকি হাসে আর ঘাড় নাড়ে রঘুবাবু, 'তুমি যা বলেছ মানুষের মতোই বলেছ।...তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। তা বলে কথাটা তো কিছু সত্যি নয়, তুমি এখন যা গাও মতি কেত্তনউলী তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। শুধু নামের জোরে ক'রে খাচ্ছে। সে কি আর মতি বোঝে না, বিলক্ষণ বোঝে।'

সুরবালা একেবারে উঠে দাঁড়ায়, 'কাজের কথা থাকে তো সারুন, এসব কথা আমি শুনতে চাই না।'

'এই যে, এই যে, কাজের কথাই তো, কাজের কথাই তো কইতে এসেছি।...আর চটপট সারব বলেই তো ভদ্দরলোককে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলুম। এই চোরবাগান থেকে এয়েছেন ইনি, রাজা ননীলাল সিংহির জামাই, কেষ্টগোবিন্দ সরকারের এস্টেটে কাজ করেন। বর্ধমানের দিকে মস্ত জমিদারি এ'দের—একটা পরগণার মালিক। আসছে রবিবার এ'দের বাড়ি একটা বায়না আছে। ভাল গান শুনতে চান এ'রা—নাম শুনতে চান না। নামের ডাকে গগন ফাটে পাছার মাস দড়ি বাটে—তাতে এ'দের দরকার নেই।...ভাল গাইবে তার সঙ্গে চেহারাটা যেন একটু তাকিয়ে দেখার মতো হয়—এই কথাই বলে দিয়েছেন এ'দের বাবু। আমি শুনে বললুম ঠিক এমনি লোকই আছে আমার হাতে—যেমনটি চাও। চলো নিয়ে যাচ্ছি। তাই ধরে নিয়ে এসেচি একেবারে। একশো একান্ন টাকায় রফা হয়েছে, দোয়ার বাজনদার আমি ঠিক ক'রে দোব, সব মিলিয়ে—মায় আমার পাওনা সুদ্ধু একান্ন টাকা দিও, নিট একশটি টাকা তোমার থাকবে। বায়নার টাকা সঙ্গেই এনেছেন ভদ্দরলোক, একুশটি টাকা দিয়ে যাবেন এখন।'

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সুরো, রঘুর বক্তব্য শেষ না হওয়া অবধি একটা কথাও কইল না। সে চুপ করতে আস্তে আস্তে শুধু বলল, 'তা এখানে কেন রঘুবাবু, কথাবার্তা মাসীর সামনে হওয়াই তো ভাল। ওখানেই যেতে বলুন, বায়নার টাকাও তাঁর হাতেই দেবেন।'

রঘু হাঁ ক'রে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

'য়্যাই দ্যাখো! এতক্ষণ তোমাকে বোঝালুম কি! এ তোমার সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত, মাসীর সঙ্গে সম্পক্ক কি। যেমন তাকে মুজরো এনে দিই, তেমনি এখন থেকে তোমাকে দোব। তার কাছে গেলে বায়না সে-ই নেবে, তোমাকে দেবে কেন?'

'কিন্তু আমি তো মাসীকে না জানিয়ে এ বায়না নিতে পারব না। টাকাও সব তাকেই

দিতে হবে, সে যা হাতে তুলে দেয় দেবে।'

'এই মরেছে! ছুঁড়ি কি বোকা রে। বলি তোর এমন বুদ্ধি কেন, য়্যাঁ?' রঘু 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমে আসে আত্মীয়তার চেষ্টায়, 'তোর ঐ মাসীর ন্যাজ ধরে থাকলে তোর আর জন্মে একানে গাওনা জুটবে না বলে দিলুম।'

'তা না জোটে—কী আর করব!' সুরো নিরাসক্ত সুরে বলে, 'বেশ তো, ওখানে নিয়ে যান, বলুন যে ওঁরা আমাকেই চান, মাসী যদি তখন আমাকে না দেয়—দেখা যাবে। তারপর যদি আমি আলাদা কারবার করি, নিজেই বায়না নিই—অধম্ম কি বেইমানি করা হবে না।...কিন্তু আপনি গিয়ে বলতে পারবেন তো—মুজরোটা আমার জন্যেই বলে ব্যবস্থা করে এনেছেন?'

শেষের প্রশ্নটার প্রচ্ছন্ন কামড় যথাস্থানেই গিয়ে হুল ফোটায়। রঘুবাবুর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। তবুও মুখসাপোট বজায় রেখে বলে, 'তা পারব না কেন? ইঃ, অত ভয় কিসের! বলি মতি কেত্তনউলীর অত পয়সা কার দৌলতে? আর কটা দালাল আমার মতো মুজরো এনে দেয় জিজ্ঞেস করো দিকিনি! সব কটা মিলেও এই শম্মার আদ্দেক দিতে পারে না।...ভয় ক'রে সে আমাকে চলবে।...তা নয়, তবে কথা হচ্ছে তখন যদি মতি বায়নাটা নিজেই নিতে চায়—এরা রাজী হবে কেন? এদের যে অন্যরকম পছন্দ। সে আবার তখন একটা উট্‌কো খিটকেল বেধে যাবে। দেখি চল হে—ওঠা যাক। বাবুদের বলো গে, তাঁরা কি বলেন!'

নিস্তারিণী পাশের ঘর থেকে সব কথাই শুনেছিল। রঘুবাবুরা বেরিয়ে যেতে এ ঘরে ঢুকে তিরস্কারের সুরে বললে, 'বায়নাটা ছাড়লি কেন—যেচে এল বাড়ি বয়ে!... সত্যি কথাই তো, একটু একটু ক'রে নিজের পথ তো ক'রে নেওয়া দরকার—নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। তুই কোথায় চেষ্টাচরিত্তির করবি, না উল্‌টে যাচা লক্ষ্মী ফিরিয়ে দিলি!...যা ব্যাভার করলি, আর কি আসবে তোর কাছে কোনদিন! টাকা কি বার বার সেধে আসে?'

সুরবালার মেজাজটা ওরা যথেষ্টই খিঁচড়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখন আরও বিগড়ে গেল। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'মা, বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনও এটা বুঝলে না—টাকা দেখলেই হাত বাড়াতে নেই। তোমার হাতে ধরে কিনা, ধরে রাখতে পারো কিনা, সেটাও বিবেচনা করা দরকার। এটা নিলে বেইমানি করা হ'ত, তাছাড়া ও রঘুবাবু লোকটি বড় সোজা নয়, ওকে তুমি কিছুই চেনো নি। ওকে যে মাসীই পাঠায় নি আমার মন জানতে—কী ক'রে জানছ তুমি? তার সঙ্গে ষড় ক'রেই হয়ত এসেছে ও!'

ষড় ক'রে রঘুকে পাঠিয়েছিল কিনা মতি তা ঠিক বোঝা না গেলেও—দেখা গেল এর পর থেকেই মতি যেন হঠাৎ একটু বেশী মাত্রাতেই বিরূপ হয়ে উঠেছে। কারণটা ভাল বুঝতে পারে না সুরো। হয়ত রঘুবাবু সেদিনের ঘটনাটা উলটো ক'রে লাগিয়েছে, হয়ত বলেছে যে 'সুরো আমার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে—ওকে আলাদা মুজরো দেওয়ার জন্যে।' কিংবা মতির পরামর্শেই রঘু গিয়েছিল ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে। কিছুতেই কোন-দিকে ওকে জব্দ করতে পারল না দেখে নিজমূর্তি ধরেছে এবার। এতদিন মনের মধ্যে যা-ই থাক, বাইরের আচরণে কোন ইতরবিশেষ প্রকাশ পেত না, গাওনা থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেত, যা হয় চার-পাঁচ টাকা দিতও—আগেকার মতো। এখন সব যেন পাল্‌টে গেল। ভাল ক'রে কথাই হয় না, সুরবালা নিজে থেকে কথা কইলে উত্তর দেয় মাত্র ; তাও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে, দু' একটি শব্দে। তাতেও তত ক্ষতি হত না, কথা না কইলে মনোকষ্ট হ'তে পারে—সাংঘাতিক লোকসান কিছু হয় না। মতি এবার সে ব্যবস্থাও করল, হাতে না মেরে ভাতে মারার। সঙ্গে ক'রে গাইতে নিয়ে যাওয়াও বন্ধ ক'রে দিল।...

প্রথম দিন সুরো অত বুঝতে পারে নি। সাধারণত আগের দিন বলে দেয় মতি, সেদিন কিছু বলে নি ; তৎসত্ত্বেও, ভুল মনে ক'রে সেজেগুজে তৈরী হয়েই এসেছিল। তবু তখনও কিছু বলে নি মতি। আড়ে একবার দেখে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। সুরো তার দণ্ডাজ্ঞা শুনল একেবারে শেষ মুহূর্তে। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে যখন, যন্ত্রপাতি উঠছে—তখন ঝিকে দিয়ে বলাল মতি যে, সুরোর যাওয়া হবে না। এদের সঙ্গে কথা আছে আর কেউ যাবে না, সব গান মতিকে গাইতে হবে।

হতাশা বা ভয়ের থেকেও প্রথম যেটা বেশী ক'রে মনে হ'ল সেটা অপমানবোধ। যে দোহারদের সে কত লাঞ্ছনা করেছে তারা এখন টিটকিরির হাসি হাসছে, প্রবীণ যারা তারা সহানুভূতির চাউনিতে দেখছে। সে আরও যেন খারাপ! ইচ্ছে হ'ল চিৎকার ক'রে খানিকটা ঝগড়া করে কিন্তু মতির মুখের চেহারা দেখে আর সাহসে কুলোল না। আগের সে জোরটা যেন চলে গেছে। সে জোর ছিল স্নেহের, মতি তাকে ভালবাসে, মেয়ের মতো দেখে—তার সব কিছু অত্যাচারই সহ্য করবে—এই জোর। কিন্তু সে ভালবাসাই আর যদি না থাকে তাহলে জোর খাটাবে কার ওপর?

চলে আসাই হয়ত উচিত ছিল, সেইদিনই, তখনই—কিন্তু তাও পারল না। ভাত-ভিক্ষে সবই যে তার এখানে, ঐ মানুষটার দয়ার ওপর নির্ভর করছে। আর কি কোন-দিনই মতি নিয়ে যাবে না ওকে? কথাটা ভাবতেই যে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। অথচ ওর অপরাধটা কি তাও তো বুঝতে পারে না। কী এমন করল সে। মতি নিজেই তো ছিট্‌ফিটিয়ে বেড়াচ্ছে, যত ছেলে-মানুষী কাণ্ড করছে। সুরো তো কিছুই করে নি সে জায়গায়, আজ পর্যন্ত কোন বেইমানি করে নি। তবে হঠাৎ এমন হয়ে গেল কেন? কি করবে সে এখন? রঘুই যদি মিছে ক'রে লাগিয়ে থাকে, সে ভুল ভাঙবারই বা উপায় কি? নিজে থেকে গিয়ে সে কথা তোলাও তো যায় না। তাহ'লে উল্‌টো-উৎপত্তি হবে বরং, ভাববে রঘুর কথাই ঠিক, ঠাকুরঘরে কে—না আমি তো কলা খাই নি, সেইভাবে সাফাই গাইতে এসেছে।

কি করবে, এখন কি করণীয় কিছুই ভেবে পায় না সুরো।...

এ মুজরোর তিনদিন পরেই আর একটা মুজরো ছিল। তার আগের দিনও বাড়ি যাবার সময় যখন কিছু বলল না মতি, তখন সুরো আর থাকতে পারল না, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই কথাটা পাড়ল, 'কাল আমি যাব তো মাসী?'

'না।' সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিল মতি।

খানিকটা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে থেকে সুরো সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমাকে আর কোনদিনই নিয়ে যাবে না?'

সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব এড়িয়ে গিয়ে মতি জবাব দিলে, 'শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী ক'রে দিয়েছি—আর কেন? আর কতকাল ল্যাংবোটের মতো টেনে বেড়াব! এবার নিজের পথ নিজে দেখে নাও!'

আজও সুরবালার দুচোখ জ্বালা ক'রে জল এসে গেল, অপমানে যত না—তার চেয়ে ঢের বেশী অভিমানে। অনেক কথা তাই মুখের কাছে এসে ঠেলাঠেলি করলেও কিছু বলা হ'ল না। প্রাণপণে চোখের জলটা মতির কাছ থেকে আড়াল ক'রে আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এল, শুধু তার ঘর থেকেই নয়, বাড়ি থেকেও। ওর দারোয়ানকেও ডাকল না আজ, একাই হেঁটে বাড়ি চলে গেল।

কে জানে দারোয়ানকে কিছু শেখানো আছে কিনা। সে যদি কোন ছোট-বড় কথা বলে বসে! মাগো।

—

এর পর আর ও বাড়িতে যাওয়া যায় না। গিয়ে লাভই বা কি। অনেক জোড়া চোখের

কৌতুক ও বিদ্রূপের দৃষ্টি সহ্য করা বসে বসে—এই তো।

অথচ না গিয়েই বা কি করবে তাও ভেবে পায় না। কে তাকে খুঁজে এসে মুজরো দেবে, তার দলই বা কোথায়, যন্ত্রপাতিই বা কোথায়? প্রত্যেক কীর্তনউলী বাইউলীরই কিছু কিছু দালাল থাকে, বেশির ভাগ মুজরো তাদের মারফৎ আসে। সোজাসুজি যে আসে না তা নয়—খুব নাম হয়ে গেলে খুঁজে খুঁজে আসে। মতি এমন বায়না কিছু কিছু পায়। কিন্তু ওর মতো যারা নতুন—কিম্বা বয়স হ'লেও যাদের নামডাক তত হয় নি—তাদের সম্পূর্ণভাবেই দালালের ওপর নির্ভর করতে হয়।

দালালী দিতে অবশ্য আপত্তি নেই সুরবালার—কিন্তু তেমন দালাল কে কোথায় আছে তাও তো জানে না। রঘুবাবু ছাড়াও দু'একজনকে ওখানে দেখেছে কিন্তু তখন তাদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করে নি—নাম ঠিকানা জেনে রাখা তো দূরের কথা। রঘু-বাবুর ঠিকানাও তো জানে না সে।

তবু, অনেক ভেবেচিন্তেও, রঘুবাবু ছাড়া অন্য কোন উপায় চোখে পড়ে না। রঘুবাবুকে ধরতে হবে। ঠিকানা জানে না বটে, তবে তার ঠিকানা যোগাড় করা অত কঠিন হবে না। একদিন লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ও বাড়িতে গেলেই ঠিকানা জানা যাবে। দোহার বাজনদার এমন কি চাকর-দারোয়ানরাও রঘুবাবুর ঠিকানা জানে। চাই কি সকালের দিকে গেলে দেখাও হয়ে যেতে পারে। প্রায়ই সকালের দিকে একবার ক'রে আসে, কেউ না থাকলে নিচের চলনে বসে একছিলিম তামাক খেয়ে যায়। রঘুবাবু অবশ্য চটে আছে মনে মনে—মতির 'শিখ্‌নে' হলে চটে থাকার কোন কারণ নেই—তবে সুরবালা যখন কোন অন্যায় করে নি তখন তার ভয়টা কি। তখন আলাদা বায়না নিলে বেইমানি হ'ত, এখন সে ভয় নেই। মতিই তো তাকে পথ দেখে নিতে বলেছে।

যাবে, যেতেই হবে—তবু কোথা থেকে যেন রাজ্যের সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। ভাবতে ভাবতেও দুটো দিন কেটে যায় এমনি ক'রে। শেষে যেদিন প্রায় মরীয়া হয়েই তৈরী হচ্ছে ওবাড়ি যাবে বলে, সেদিন অভাবনীয়ভাবে স্বয়ং রঘুবাবুই এক দূত পাঠাল ওর বাড়ি। হরেকৃষ্ণ, মতির দলের বেহালা-বাজিয়ে, সকালবেলাই গুটিগুটি এসে হাসির হ'ল।

হরেকৃষ্ণকে দেখে সুরো প্রথমটা প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। রঘু যে লোক পাঠাতে পারে—এ কথা একবারও ভাবে নি সে। ভেবেছিল হয়ত মতিরই সুবুদ্ধি হয়েছে, এতদিনে মনটা নরম হয়েছে হয়ত, সে-ই ডেকে পাঠিয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই একটা খট্‌কা উঠেছিল মনে—মতিই যদি ডাকবে—হরেকৃষ্ণ কেন, ঝি দারোয়ান দুজনেই তো এ বাড়ি চেনে, কতদিন পৌঁছে দিতে এসেছে—তাদেরই পাঠাতে পারত। তবু অনেকখানি আশা নিয়েই সে অভ্যর্থনা করল হরেকৃষ্ণকে, 'এসো এসো, কী ভাগ্যি হরেকেষ্টবাবুর পায়ের ধুলো পড়ল! হঠাৎ—? মাসী পাঠিয়েছে বুঝি?'

'মাসী তোমার! তবেই হয়েছে। পায় তো পাঁশ পেড়ে কাটে সে তোমাকে।...এখেনে এসেছি জানলেই হয়ত আর রক্ষে থাকবে না, আমারই গর্দান নিয়ে বসে থাকবে।...না মাসী ফাসী নয়, আমাকে পাঠিয়েছে রঘুবাবু, তার একটু কাজে।' বলে কেমন একরকম ক'রে যেন হাসে হরেকৃষ্ণ!

হাসিটা ভাল লাগে না সুরবালার কিন্তু সে হাসির অর্থও বুঝতে পারে না। বলে, 'রঘুবাবু পাঠিয়েছে—কেন? বায়না আছে? তা তোমাকে কেন, নিজে তো এসেছে এ বাড়িতে। না কি দালালীটা বেশী চায়—নিজের চক্ষুলজ্জা হচ্ছে সে কথাটা বলতে?'

'দালালী? হ্যাঁ, তা দালালীই বলতে পারো,' খুক্‌খুক্‌ ক'রে হাসে হরেকৃষ্ণ, 'ঠিকই ধরেছ, এর মধ্যে চক্ষুলজ্জার কথা আছে বলেই আমাকে পাঠিয়েছে। কথাটা—তা ধরো, নিজে-মুখে বলায় একটু বাধা আছে বৈকি।'

এবার সুরবালা একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, হরেকৃষ্ণর কথা বলার ধরনটা তেমন ভাল

লাগে না—আর ঐ হাসিটাও।

সে একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে, 'ব্যাপারটা কি? সাতসকালে হেঁয়ালি রেখে ঠিক ক'রে বলো দিকি। টাকাকড়ির কি পাওনা-থোওনার ব্যাপারে রঘুবাবুর চক্ষুলজ্জা আছে—কৈ শুনি নি তো!'

'তা মানে, টাকাকড়ি ঠিক নয় কি না।...বলছি বাপু, তুমি উতলা হয়ো নি, আমারও কোন দোষঘাট ধরো নি। আমাকে বলতে পাঠিয়েছে তাই বলছি। একটা টাকা দিয়েছে, সক্কালবেলাতেই তাই ছুটে এয়েছি। বলেছে খবর ভাল হ'লে আরও কিছু দেবে—মিছে কথা বলব কেন।'

এবার গলার সুর আরও কড়া হয়ে ওঠে সুরোর, বলে, 'যা বলবার চটপট বলে বিদেয় হও। আমার এত সময় নেই যে তোমার ঐ ভ্যানভ্যানানি বসে বসে শুনব।'

'ও বাবা, তুমিও যে দশবাইচণ্ডী হয়ে উঠলে দেখছি।...তা, এ বেশ নিরিবিলি তো? কেউ শুনছে না তো আড়ি পেতে?'

'অতশত আমি জানি না। শুনলেই বা কি করছি। গুপ্তকথা তো এত শুনতে হয় না আমাকে যে তার জন্যে আলাদা ঘর ক'রে রাখব—ও শখও আমার নেই। আর আমার কাছে তোমার এমন কি কথা থাকতে পারে যা আড়ালে বলতে হবে?'

ধমক খেয়ে একটু যেন হকচকিয়ে যায় হরেকৃষ্ণ, চুপ ক'রে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করে খানিকটা। তারপর বলে, 'নাঃ, বলেই ফেলি তা হ'লে। আর বলতেই তো হবে—যেকালে এয়েছি। রঘুবাবু তোমার ব্যাপার সব জানে, মতি নিয়ে যাচ্ছে না, এক পয়সা রোজগার নেই—সব শুনেছে। তুমি তার কথা শোন নি—শুনলে এ আবস্তা হ'ত না। যাই হোক, সে জন্যে রাগ দুঃখু নেই তার মনে, সে তোমার ভালই চায়। ভাল ক'রেও দেবে সে, বলেছে যে বায়নায় ডুবিয়ে দেবে একেবারে, মতি হিংসেয় ছট্‌ফট করবে তোমার রোজগার দেখে—সে ভার তার। বললে সে কাল থেকেই বায়না আনতে শুরু করবে। কেবল তার একটি শর্ত। দালালীটে—'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে সে। একটু যেন অপ্রস্তুত ভাব তার মুখে। ভাল কথা কিছু নয়। সোজাসুজি বলবার কথা হ'লে এত ভণিতার দরকার হ'ত না, টাকা ঘুষ দিয়ে লোক পাঠাতে হ'ত না। টাকা-কড়ির ব্যাপার হ'লে সে নিজেই আসত।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে সুরবালা। বলে, 'থামলে কেন, বলে যাও।...দালালীটা বেশী চাই তার, এই তো? তা কত চায় সে, আদ্দেক?'

'রাম বলো।' এতখানি জিভ কাটে হরেকৃষ্ণ, 'টাকাকড়ির কথাই নয়। এক পয়সা নেবে না সে তোমার কাছ থেকে। তার চাই অন্য জিনিস। তোমার ঘরে আসতে দিতে হবে তাকে। আগাম নয়—তুমি জবান দিলেই সে খুশী। মাসে চার-পাঁচটা ক'রে মুজরো পাইয়ে দিতে পারলে তুমি তার পাওনা দিও, তার আগে চায় না সে। তার কথায় বিশ্বাস করতেও সে বলছে না। ডান হাত, বাঁ হাত, বলে দিয়েছে সে। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল—হে হে!'

এদের সাহস আর স্পর্ধা দেখে সমস্ত দেহ রি রি ক'রে জ্বলতে থাকে সুরবালার—লঙ্কাবাটা লাগার মতো। ইচ্ছে করে সামনের এই লোকটাকে ধরে ঘা-কতক বসিয়ে দেয়, কান ধরে ওঠবোস করায়। বুড়ো হয়ে মরতে গেল, নিমতলার দিকে পা—এখনও একথা বলতে মুখে আটকাল না ওর! আশ্চর্য! সামান্য একটা টাকার জন্যে এই কাজ করতে এসেছে! আর রঘুবাবু—খুব কম হ'লেও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছে, এখনও এই রকম প্রবৃত্তি!

রাগে অপমানে ওর ফর্সা মুখখানা আগুনের মতো লাল হয়ে ওঠে। তবু সে শান্ত-ভাবেই বলে, 'তা বেশ তো, আসবেন রঘুবাবু, তার জন্যে আর কি। অতদিনই বা হা-

পিত্যেশ ক'রে থাকবার দরকার কি, আজই আসতে ব'লো না, আজ রাত্তিরেই। জমাদার আসে উঠোন আর স্যোৎখানা ধ্তে, তার কাছ থেকে মড়ো ঝ্যাঁটাটা চেয়ে রাখব'খন। আদর-অভ্যর্থনার কোন খাম্‌তি হবে না, বলে দিও।'

প্রথম দিকটা অত ব্ঝতে পারে নি, হাসি হাসি মখে ঘাড় নাড়ছিল আর দলছিল বসে—শেষের কথাটাতে মখের হাসি মিলিয়ে গেল। বেশ খানিকটা থতমত খেয়ে গেল হরেকেষ্ট। যাদের ঘরে হাঁড়ি চড়ার ব্যবস্থা নেই, অন্নচিন্তা চমৎকারা—তাদের কাছ থেকে এতটা তেজ আশা করে নি সে। বার দই ঢোঁক গিলে মাথাটা চলকে গলাটা আরও নামিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর ভঙ্গীতে বললে, 'তা দ্যাখো, হট্‌ ক'রে অত মাথা গরম ক'রো নি। এ ধারে তো ব্ঝতেই পারছি—বাক্স প্যাঁটরা ঢং-ঢং, ভাঁড়ে মা ভবানী! ট্যাকা তো চাই। বলি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার তো আর বন্ধ রাখলে চলবে না। দালাল ছাড়া এ কারবার চলবে না, দালালকে হাতে রাখতেই হবে। অমন সকলকেই গোড়ায় গোড়ায় ওদের খোশামোদ করতে হয়, ওদের আশকারা দিতে হয়। মতিরও ছেল সেই প্রেথম দিকে, গোবিন সাঁপই বলে একজন, তাকে বহদিন ঘরে আসতে দিতে হয়েছে তবে কারবার জমেছে। এ আমি বেশ ভাল লোকের মখে শনেছি।'

'শনেছ, বেশ করেছ।' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে সরবালা, 'আমি তো মতি নই। ওরা ঐ ঘরেরই মেয়ে। ওরা যা পারে আমরা তা পারি না। সে যাক, কথা যা বলার শেষ হয়েছে তো, এখন সরে পড়ো দিকি ভালয় ভালয়। আমার মেজাজ ভাল না। কি বলতে কি বলে ফেলব, তোমারও শনতে খারাপ লাগবে—আমারও পরে মন খারাপ হয়ে যাবে। নাও, ওঠো—'

'উঠছি, উঠছি। উঠবই তো, থাকতে কি এয়েছি, তা নয়। কিন্তু কথাটা তুমি এখনও ভেবে দ্যাখো ভাল ক'রে, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে। আমি বলছিলম কি, বেশ তো—আসতে না হয় শেষ পর্যন্ত না-ই দিলে, দিনকতক খেলাতে দোষ কি, পাঁচটা-সাতটা মজরো কামিয়ে নাও না, আশায় আশায় রেখে। তাতে তো নামটাও একট আধট ছড়াবে, অপর দালালেরাও আসতে পারে তখন খঁজে খঁজে। অনেক সময় দোয়ার বাজনাদাররাই দালালীর কাজ করে। আর কিছ না হোক, ক'মাসের খরচটা তো ঘরে উঠে যাবে, কিছদিন যোঝবার মতো তো ক্ষ্যামতা হবে!'

'না না না,' সরবালা চিৎকার ক'রে ওঠে, 'তোমার ওসব কথা আমি শনতে চাই না, বেরিয়ে যাও তুমি, গো-টে হেল, কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছ এখনও! ওরকম পয়সায় দরকার নেই আমার, শধ যদি পয়সাই চিনতুম আমার আর ভাবনা থাকত না। জড়িগাড়ি দোরে দাঁড়াত, দেউড়ীতে দারোয়ান বসত। ঐ তোমাদের মতি ঠাকরনই এমন ঢের সাধাসাধি করেছে। সে সব ছেড়ে এখন ঐ তোমাদের পথের ভিখিরী রঘবাবর কাছে মান-ইজ্জত খোয়াব? কেন, কি জন্যে? বামনের মেয়ে রাঁধনীগিরি ক'রে খেতে পারব না? তাও না জোটে, লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করব।'

হরেকৃষ্ণ আস্তে আস্তে ছাতা বগলে উঠে দাঁড়ায় এবার। তারও গলার সর বদলে গেছে, আহত হয়েছে একট তাতে সন্দেহ নেই। তব যাবার আগে বক্তব্য শেষ ক'রেই যায়। বলে, 'মতি যা বলেছে তোমাকে—লম্বা লম্বা কথা—ওর আদ্দেক ঝট্‌ ধরে রেখে দাও। ও শধ তোমার মন বাজিয়ে দেখা। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করলে ও পয়সা-আলা লোক দটোচারটে জটিয়ে দিতে পারত। অত কিছ নয়—তবে সখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতে। সে দ্যাখো, যা তোমার অভিরচি। রঘবাবও নিহাৎ পথের ভিখিরী নয়—আর এ তো দদিনের। চিরদিন কি আর তার সঙ্গে ঘর করতে!...ভাল, ভাল, ধম্ম রেখে টিকে থাকতে পারো, সে তে উত্তম কথা। তবে শক্ত, খব শক্ত এও বলে রাখছি। শত্তর তোমার সঙ্গেই আছে, তোমার রপ-যৌবনই তোমার শত্তর। দেখলম তো ঢের কিনা!...আর

ঐ যে বললে, ঝিগিরি রাঁধুনীগিরি—অত সহজ নয় দিদি, অত সহজ নয়। এই বয়স আর এই রূপোর খাপ্‌রা, কেউ ঝি-রাঁধুনী রাখবে না তোমাকে। কোন গেরস্ত বাড়িতে তো রাখবেই না—পাঁচটা পুরুষ নিয়ে যারা ঘর করে। রাখলেও—পয়লাদিনই মান-ইজ্জৎটি সেখানে রেখে আসতে হবে।...চললুম!'

আস্তে আস্তে নেমে যায় সে। আর কিছু পাওনার আশা রইল না, তা না থাক, ঐ টাকাটাই না ফিরে চেয়ে বসে রঘু—এই তার ভাবনা।

॥ ৯ ॥

অর্থাৎ শেষ আশাটিও গেল। কাপড়চোপড় আবার খুলে ফেলে সুরবালা। এরপর আর ওবাড়ি যাওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু কী করবে এখন তাহলে? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?

এক রাশ টাকা বাড়িভাড়া, এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা। খরচ অনেক, আয় নেই বললেই চলে! বাবা বেরোন এখনও, কিন্তু যা আনেন তা তাঁর ওষুধে আর তামাকেই চলে যায়। আগেকার সে খাটবার শক্তিটাই চলে গেছে। আরও মনটা ভেঙে গেছে ওঁর ইদানীং, ওঁর এক জ্ঞাতি দাদার মৃত্যুতে। বড় বেশী অসহায় বোধ করছেন বলেই বোধ হয় এতটা অশক্ত হয়ে পড়েছেন। বরানগরে থাকতেন সে দাদা, অবস্থা ভাল, মুদীখানার দোকান ছিল—সময়ে অসময়ে দু-একটা টাকা আনা যেত। এখানে আসার দু'একদিন পরেই সে দাদা মারা গেছেন। ছেলেরা আছে বটে, তারা আমল দেয় না—শ্রাদ্ধে একবার দায় জানাতেও আসে নি। গণেশটারও—লেখাপড়া তো হ'লই না, রোজগারেরও কোন চেষ্টা নেই। একেবারেই বকে গেছে। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, বলে নাকি চীনেম্যানদের কাছে ভেল্‌কির খেলা শিখছে। এর মধ্যে তিন দিন বাড়িই এল না ; কোথায় মেটেবুরুজ না কি জায়গা আছে—সেখানে বেদেদের টোল পড়েছে—সেইখানে ছিল ; ভেল্‌কির খেলা শিখছিল তাদের কাছে। মা বকাবকি করে, আগে আগে মারধোরও করত, এখন এত বড় হয়ে গেছে যে মারা যায় না। আর মারলেও কোন ফল হয় না, বাবাও অনেক শাসন ক'রে দেখেছেন—কোন লাভই হয় নি। গায়েই মাখে না সে কিছু। সুরবালা কত বুঝিয়ে বলেছে, 'দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখ, চিরদিন কি এইরকম ক'রে কাটাবি?' তা হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে, 'করব, করব, যখন রোজগার শুরু করব তখন বুঝবি। মোট মোট টাকা পাঠাব তোদের। আমি তো এখানে থাকব না, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব—নানান দেশ দেখব, বেড়ানোও হবে রোজগারও হবে—এই আমার মতলব। কিন্তু পেটে কোন বিদ্যেই নেই, এখন গেলে তো সাহেবের বাবুর্চি কি বেয়ারা হয়ে যেতে হয়। তাতে আমি রাজী নই, খেলাটা শিখে নিই—দ্যাখ্‌ না।'

অবশ্য শিখছে কিছু কিছু ঠিকই। মাঝে মাঝে হাত-সাফাইয়ের নানান খেলা দেখায় ওদের। এই ক'রে পয়সাই কি কম নিয়েছে। বলে, 'দিদি একটা দোয়ানি বার কর,—না, ও বড্ড ছোট, তোর মনে হবে মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে গেছে, সিকিই নে একটা। আমাকে দে একবার—এই যে, আচ্ছা, এখন হাত মুঠো কর, দেখিস, ভাল ক'রে মুঠো করিস, হাতে আছে বুঝতে পারছিস তো...খোল্‌ এবার—'

খুলে দেখেছে সুরবালা হাতে কিছু নেই, গণেশ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে। সে পয়সা আর পায় নি ওরা, গণেশ বলেছে, 'বা রে, আমি কি জানি, তুই মুঠো ক'রে ধরে রইলি, সে পয়সা আমি নোব কী ক'রে?'

আরও নানান রকম খেলা শিখেছে নাকি। তাস নিয়ে দেশলাই নিয়ে—কত কি খেলা দেখায়। সবচেয়ে বাঁধন—দড়ি দিয়ে বলে, 'বেশ ক'রে বাঁধ আমাকে, যত রকম তোদের জানা আছে। খুব শক্ত ক'রে বাঁধিস, আষ্টেপৃষ্ঠে পিছমোড়া ক'রে বাঁধ। হয়েছে? আচ্ছা, একটুখানি চোখ বোজ। বুজেই খুলিস, তাতেই হবে।'

চোখ খুলে দেখেছে ওরা, গণেশ দাঁড়িয়ে হাসছে, দড়িগাছা মাটিতে পড়ে আছে।

এসব শিখছে শিখুক, সুরোর ভয়—ভয় কেন নিশ্চিতই জানে—সে এই সঙ্গে ঐসব পাড়ায় ঘুরে নেশাভাঙও করতে শিখেছে। তাই এত পয়সার দরকার হয় ওর। তামাক তো বটেই, হয়ত গাঁজাভাঙও খায়। ওকে পয়সা যোগানো মানে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া। জানে তা—তবু 'না' বলতে পারে না সুরো। এমন মিষ্টি মিষ্টি মুখ ক'রে চায়, 'না' বললে এমন আউতে পড়ে ওর সুন্দর হাসিভরা মুখখানা যে বড্ড মন-কেমন করে। এই ক'রেই এই দুর্দিনেও দোয়ানি সিকি নিয়ে যায় সে প্রত্যেকদিনই! অবশ্য একটা দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে সুরো ওকে দিয়ে—মদ না খেতে ধরে কখনও। গণেশ হেসে ওকে ছুঁয়ে বলেছে, 'এই তোর দিব্যি, মদ যদি খাই কখনও, তোর পয়সায় খাব না। রোজগার করতে না পারলে ওসব নেশা করব না।'

'ওমা, কী সর্বনেশে ছেলে রে তুই—তাই বলে রোজগার করতে শিখলে মদ ধরবি, আর সেই কথা বলছিস আমাকে।'

'ধরবই যে তা তো বলি নি। রোজগার না ক'রে ধরব না তাই বলছি।'...চিরাচরিত রীতিতে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা।

কিন্তু এবার 'না' বলতেই হবে ওকে। একটি মাত্র ছোট ভাই—কার্তিকের মতো সুন্দর ছোট্ট ভাইটা। তাকে এক আনা দু আনা দেবার মতো সঙ্গতিও ওর আর নেই।...

অভাব দুশ্চিন্তা তো আছেই, সবচেয়ে বেশী অশান্তি মাকে নিয়ে। নিস্তারিণীর বিলাপের শেষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বকছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে। এখানে উঠে আসবার সব দায়িত্ব সে এখন মেয়ে আর মেয়ের বাপের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। কেবলই বলে, 'কী দরকার ছিল আমার এমন কোঠাবাড়িতে উঠে এসে, সে মাটির ঘর আমার ঢের ভাল ছিল। সেই ছিল আমার লক্ষ্মী। মিছিমিছি এ বড়মানুষী দেখাতে এসে লোক-ঢলাঢলি করার কী দরকারটা ছিল। লাভের মধ্যে বেইজ্জাত এখন। মাস পোয়ালেই তো যমদূতের মতো এসে দাঁড়াবে বাড়িঅলা, তখন তাকে কী জবাব দেব? ক'মাস চুপ ক'রে থাকবে সে,...মালপত্তর টেনে রাস্তায় ফেলে গলাধাক্কা দিয়ে একদিন বার ক'রে দেবে। এই জন্যেই এখানে আসা, সে বেশ বুঝছি।...হাত্তোর মেয়ের ভাত রে!...তখনই বলে-ছিলুম মেয়ের বে দাও, একটা সম্বন্ধ গেল আর একটার চেষ্টা দ্যাখো—তা নয়! মেয়ে রোজগার করবে, রোজগার ক'রে স্বগ্‌গবাস করাবে একেবারে।...কী যে রোজগার, জম্মের মধ্যে কম্ম,—একদিন বই তো দেখলুম না।'...

এমনি একটানা বিলাপ চলে দিনরাত। সুরোর তো অসহ্য লাগেই, তার আরও বেশী কষ্ট হয় বাবার জন্যে। মাঝে মাঝে যখন আর সইতে পারেন না—দুহাতে কান ঢেকে বসে থাকেন ভদ্রলোক, সে সময়কার তাঁর মুখের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে জল আসে সুরবালার। মার কি দয়ামায়া বলে কোন জিনিস নেই?

তবে নাকি ভগবান সব কূল ভাঙেন না। সাংসারিক দিক থেকে না হোক, মনের দিক থেকে একটা আশ্রয় দিয়েছেন তিনি সুরবালাকে। খুব যখন অসহ্য বোধ হয়—তখন

সে ছুটে চলে যায় ওদের পাশের বাড়িতে। কী শান্তি যে পায় ঐটুকু একটা দেওয়ালের ব্যবধান পার হয়ে—তা সে কাউকে বোঝাতে পারবে না। এইটুকু না পেলে সে বোধ হয় পাগল হয়ে যেত।

আলাপ হয়েছে এখানে আসার পর। পাশাপাশি বাড়ি, দুটোই দোতলা—ছাদে-ছাদে লাগা একেবারে, মধ্যে হাত-দুই উঁচু আল্‌সের ব্যবধান মাত্র। আগে ছাদ থেকে আলাপ হ'ত—এখন আসা-যাওয়া চলছে। যাওয়াই বেশী অবশ্য, আসাটা কদাচিৎ। সুরোই যায় ওদের কাছে—আগে আগে রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরে যেত, এখন আল্‌সে ডিঙিয়ে চলে যায়।

ওঁরাও অবশ্য ভাড়াটে, চারুবাবুরা। শুধু দোতলাটা নিয়ে থাকেন দশটাকা ভাড়ায়। ছোট ছোট দুটো ঘর, ওপরে কল-পাইখানা নেই, অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাগে, সেজন্যে প্রতিবারই নিচে যেতে হয়। রান্নাঘর ছাদে, তাও ঠিক ঘর সেটা নয়, সিঁড়ির ঘর বা চিলকুটুরিতে কাজ সারতে হয়। অসুবিধা খুবই কিন্তু এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থার বাড়ি নিতে গেলে নাকি আরও বেশী ভাড়া দিতে হবে, সে সঙ্গতি ওঁদের নেই।

তা তার জন্যে ওঁরা কেউই খুব দুঃখিত নন—না চারুবাবু আর না তাঁর স্ত্রী শশী বৌদি। শরৎশশী নাম ভদ্রমহিলার, সুরবালা তাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে শশী ক'রে নিয়েছে, উল্লেখ করে শশী-বৌদি বলে। চারুবাবুরা কায়স্থ।

এঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই অদ্ভুত মানুষ। এঁদের দিকে চাইলেও একটা শান্তি আসে মনে। সর্বদা সন্তুষ্ট এঁরা—হাসি-খুশী। চারুবাবু কী সওদাগরী আপিসে কাজ করেন, ইংরেজের আপিস কিন্তু মাইনে খুবই কম। একাজে নাকি উপরির সুযোগ আছে, সেই বুঝেই সাহেবরা মাইনে অত কমিয়ে রেখেছেন—কিন্তু চারুবাবু সে সুযোগ কোনদিনই নেন না, অথবা নিতে পারেন না। অথচ তা নিয়ে গর্বও করেন না। বরং সে-কথা কেউ তুললে একটু কুণ্ঠিত হয়েই পড়েন। ফলে কোনমতে সংসার চলে, যাকে বলে দিন-গুজরান করা তাই করেন—টানাটানির অন্ত নেই। তা নিয়ে কিন্তু কোন নালিশও নেই যেন ওঁদের মনে, কখনও কোন হা-হুতাশ করতে শোনা যায় না। চারুবাবু তো রীতিমতো ঠাট্টাতামাশাই করেন, বলেন, 'মাসের কুড়ি দিন আমি চালাই বুঝলে সুরো—বাকী দশ-দিন ভগবান চালায়। ও হিসেবটা আর আমি রাখি না।'...ইংরেজী মাস-কাবারে মাইনে হয় ভদ্রলোকের। মাসের শেষ দিকে 'কী রান্না হ'ল' জিজ্ঞাসা করলে শশী বৌদি কোন উত্তর দেবার আগেই চারুবাবু বলে ওঠেন, 'কী রান্না হ'ল আবার জিজ্ঞেস করছ? আজ মাসের ছাব্বিশ তারিখ না? ডাল, ডালের বড়া, পোস্তচচ্চড়ি, মানে মুদীর দোকানে যা পাওয়া যায়। উটনো খাই, ধারে আসে—মাসকাবারে দাম শোধ হয়। নীলকমলের বেটা-বেটি সুখে থাক, ওর দিন দিন ভুঁড়ি আর বাড়ি বাড়ুক—নীলকমল মুদী আছে তাই দুবেলা দুমুঠো জুটছে।'

বলেন আর হা হা ক'রে হেসে ওঠেন চারুবাবু।

আরও শেষের দিকে আরও অধঃপতন। একবার ত্রিশ তারিখে সুরো জিজ্ঞেসা করে-ছিল, 'আজ কি রাঁধলে বৌদি?' সে জবাবও দিয়েছিলেন চারুবাবুই, 'কী আবার, মধুসূদন ডাল ভরসা, তেঁতুল হ'ল তারিণী!...আজ তিরিশ তারিখ না? আজ সন্ধ্যের পর অবিশ্যি আমি অন্য মানুষ, তখন চারু ঘোষই বা কে, আর রাজা তেজচন্দ্রবাহাদুরই বা কে—তখন বলো—কালিয়া-পোলোয়া যা চাও খাওয়াবো, কিন্তু এখন আর রান্না খাওয়ার কথাটা তুলো না।'

ছড়াটার মানে বুঝতে না পেরে বোকার মতো শশীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল সুরো, শশী হেসে বুঝিয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা, 'বুঝলি না, আজ আর কিছুই জোটে নি, শুধু মুশুরীর ডাল পড়ে ছিল চাট্টি—তাই রান্না হয়েছে, আর ঘরে ছড়া-তেঁতুল করা আছে হাঁড়ি বোঝাই—ডালের সঙ্গে টাক্‌না দিয়ে দিব্যি খাওয়া চলবে!'

'কেন—', সুরবালা বলেছিল, 'তা আপনার মুদীর দোকান কী হ'ল দাদা? সেই যে নীলকমল না লালকমল—নিত্যি যার বাড়-বাড়ন্ত বাচান।'

এইবার একটু গম্ভীর হয়েছিলেন চারুবাবু, বলেছিলেন, 'ভাই, ধার নেওয়া তো এমনি নয়, শুধতে তো হবে একদিন। তাই যতটা পারব তার বেশী আর এগুই না। এ মাসে আমার এক বোন এসে সাত-আট দিন ছিল—তাতেই অনেক বাড়তি খরচা হয়ে গেছে, বাকী পড়েছে বেশী, হয়ত সবটা এ-মাসে দিতেও পারব না। আবার কোন্ সাহসে ধার বাড়াবো বল্। অত ধার করা ভাল নয়।...তাছাড়া চলে তো যাচ্ছে। উপোস তো ক'রে নেই!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শশী বৌদি বলেছিল, 'আর এ তো খেতে কিছু খারাপ লাগে না। ছড়া-তেঁতুল তৈরী করি—তা পড়েই থাকে, এমনি মহাদেবের ঘরকন্না হ'লে তবু এক-আধদিন কাজে লাগে। খেয়ে দেখিস না একদিন—বেশ লাগবে। তোরা যে আবার বামুন, নইলে আজই খাইয়ে দিতুম এক গরাস!'

সবদিক দিয়েই শান্তির সংসার ওঁদের। তিনটি ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে একটি ছেলে। শ্রীলেখা আর বিদ্যুল্লেখা, দুই মেয়ের পরে ছেলেটি—জগৎচন্দ্র নাম। ছেলেমেয়ে তিনটিই ভাল, যেমন শান্ত তেমনি ভদ্র। বাপমায়ের মতোই স্বভাব পেয়েছে, কোন দুঃখ না অভাবকেই গ্রাহ্য করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়। অত সুন্দর মেয়ে শ্রীলেখা—তার না আছে উপযুক্ত একখানা গহনা না আছে ভাল কাপড়! তবু সেজন্যে মা মেয়ে কারুরই কোন ক্ষোভ নেই। ছেলেটা এখান থেকে হেঁটে শীলেদের ইস্কুলে পড়তে যায়—ঐখানে বিনা মাইনেতে পড়তে পায়—তা তার পায়ে কোন রকম একটা জুতো পর্যন্ত নেই। কিন্তু তাও কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না—বা তা নিয়ে কাউকে কোন বিলাপ করতে শোনা যায় না। একদিন রাস্তায় ভাঙা কাচে পা কেটে রক্তারক্তি হয়ে ফিরে এল ছেলে, মা তাড়াতাড়ি গিয়ে পা ধুইয়ে একটু চুন লাগিয়ে দিলে, রাত্রে পায়ে ব্যথা বলাতে পিদিমের সল্‌তে পুড়িয়ে আছড়ে আছড়ে সেঁক দিয়ে দিলে—তবু ছেলে বা মা বা ছেলের দিদিরা কেউ জুতো-না-থাকার কথাটা উল্লেখ করল না। সেটা ইচ্ছাকৃত নয়—কথাটা মনেই পড়ল না কারুর।

কিন্তু ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ না করা আর আনন্দে থাকা—দুটো অবস্থায় তফাৎ আছে। সুরো ক্ষণে ক্ষণে এখানে ছুটে আসে তার কারণ এরা সর্বদা আনন্দে থাকে। কিছু না থাকলেও আনন্দ—অনেক কিছু থাকলেও তাই। হাসিখুশি ছাড়া থাকে না এরা। বাবা মেয়েকে ঠাট্টা করছে, মেয়ে বাবাকে করছে। ছত্রিশ বছরে আর এগারো বছরে কোন তফাৎ নেই যেন, সম্পর্ক নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না—বাবা মা মেয়ে ছেলে সবাই সবাইয়ের বন্ধু। আরও যেটা বড় গুণ—এরা কেউ অপরের দোষ দেখে না, অপরের নিন্দা করে না। ওদের সামনে কেউ পরনিন্দা করলে চুপ ক'রে থাকে। খুব আপনা-আপনির মধ্যে কেউ কারও নিন্দা করলে—যার নিন্দা করছে তার ব্যবহার সমর্থন করার চেষ্টা করে। সুরবালা শশীর কাছে তার নিজের কোন কথাই গোপন করে নি ; আগেকার কথা তো বটেই—এখনও যেদিন যা ঘটে প্রত্যেকটি এসে বলে শশীকে। বৌদির মধ্যে এমন একটা সহানুভূতিশীল স্নেহময় মনের দেখা পেয়েছে যে, মনে হয় দুঃখের কথা এর কাছে বললেও দুঃখটা কমে যায় অনেকখানি।

সহানুভূতিটা শুধুই কিন্তু সুরোর দিকে নয়। মতি রঘু সকলের দিক টেনেই বলে সে। মতির কথা উঠলে বলে, 'ভেবে দ্যাখ—ছেলে নেই পুলে নেই, ত্রি-সংসারে এমন কেউ নেই যে আপনার মনে ক'রে দ্যাখে ওকে, রোগে সেবা করে। এত পয়সাকড়ি বাড়ি-ঘর গয়না আসবাব—কাকে দিয়ে যাবে সেই দুঃখেই মানুষটা জ্বলছে অহরহ, ওর কি মাথার ঠিক আছে! কিছু না থাকত তো সে একরকম—এত ভাবনা হ'ত না তাতে। নেই সে এক জ্বালা, থাকার যে শতেক জ্বালা। তোকে ভালবেসেছিল, মেয়ের মতো যত্ন ক'রে

শিখিয়েছিল—ভেবেছিল কাছে থাকবি মেয়ের মতো, অসময়ে দেখবি—বড় আশাটাতে ঘা পড়েছে বলেই ক্ষেপে গেছে, বুঝছিস্ না?...তুই কিছু ভাবিস নি, তোকে সত্যিকারের ভালবাসে, নইলে এতটা ছিটফিটোত না। ও আবার তোকে টানবে দেখিস।'

আশ্চর্য এই রঘুবাবুর আচরণেরও সাফাই খুঁজে পায় শশী, বলে, 'ওর দোষ কি বল, যা দেখেছে চিরকাল, যেভাবে জীবন কেটেছে তার—তার বেশী জানবেই বা কোথা থেকে? কালীয় নাগকে কেষ্ট বলেছিলেন, "তুমি এত বিষ ছড়াও কেন"—তার জবাবে কালীয় বলেছিল, "কী করব, বিষই তো দিয়েছ, বিষই তো সম্বল আমার, আর কি ছড়াবো বলো?"...তা ওরও তাই হয়েছে। বেচাকেনা লেনদেন এ-ই দেখেছে সে চিরকাল, এইটাই বোঝে। যেমন জম্মকম্ম শিক্ষাদীক্ষা তেমনিই হয় মানুষ—তার সেটা ভাগ্যের হাত।'

সব বলে শশী বলত, 'তবে হ্যাঁ, ঐ একটা কথা। সর্বদা সৎপথে থাকবি, দেখবি তোর মন্দ কেউ করতে পারবে না। ওরে, দুঃখকষ্ট বেশির ভাগ মানুষের মনে—দেখগে যা কত লোক সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা রেখেও হাপুস-নয়নে কাঁদছে বসে। আবার, যে ভিখিরী মেয়েটা ঐ মোড়ে ফুটপাতে শুয়ে থাকে—দেখবি সন্ধ্যে হ'লেই দিব্যি পা ছড়িয়ে বসে গান ধরে চেঁচিয়ে। দুঃখ দুদিনের, ধম্ম চিরদিনের। ধম্ম বজায় থাকলেই মনে শান্তি থাকবে, শান্তি থাকলেই সুখ।'

আবার বলে, 'দ্যাখ সুরো—এই বয়সে দেখেছি অনেক, তাই বলছি—তুই যেন দুষ্যু ভাবিস নি কিছু—মনের অগোচরে পাপ নেই. সবাইকে ঠকাবি, নিজের মনকে ঠকাতে যাস নি কখনও। যদি কখনও অসৎপথে যাস—যেতে হয় যদি, বরাতে থাকলে কেউ ঠেকাতে পারবে না—তাই বলে সেই পথটাকেই সৎ পথ বলে যেন মনকে বোঝাতে চেষ্টা করিস নি। খারাপ কাজ করছিস বুঝলে, ভুল করছিস বুঝলে সামলাবার চেষ্টা করবি তবু, শোধরাবার চেষ্টা করবি—তাতে আবার কখনও বেঁচে ওঠবার আশা থাকে, নইলে ডুববি তো ডুববি ঘটিবাটির মতো—জীবনে আর ভাসতে পারবি না। শুনেছি আমাদের গোঁদল-পাড়ায়—গোঁদলপাড়ায় তো আমার বাপের বাড়ি—ওখানে ক্রেস্তান পাদরীরা আসত, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যীশুকেষ্টর মহিমে ব্যাখ্যানা করত—তা কতদিন শুনেছি ওরা বলছে, অনুটাপ করো, অনুটাপ করিলে সব পাপ ক্ষমা হইবে, নহিলে নিস্টার নাই!...কথাই তাই, পাপ করেছি বুঝলে তো অনুতাপ করবে—যে অন্যায় ক'রেও মনকে বুঝিয়েছে আমি ঠিক করছি, তার আর নিস্তার নেই!'

কথাগুলো যখন বলত শশী, সুরো অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। সাধারণ গেরস্তঘরের কোন বৌ যে এমনভাবে ভাবতে পারে আর বলতে পারে—তা নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস হ'ত না তার। কথাগুলো বলার সময় এমন একটি স্নিগ্ধ সুন্দর মুখের ভাব হ'ত তার—সুরোর মনে হ'ত সে তখনই একবার প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নেয়। নিতান্ত —এই নিয়ে জবাবদিহি করার ভয়েই সে পারত না।...

এক একদিন শশীকে তার 'মা' বলে ডাকতে ইচ্ছা করত, কেবল লজ্জায় পড়ে পেরে উঠত না।

তবু মানুষকে এমনি ভাল মনে হোক, স্বার্থের সম্পর্ক না এলে তাকে পুরো-পুরি চেনা যায় না। স্বার্থ বলতে টাকা-পয়সার ব্যাপারটাই আসল। এটুকু জ্ঞান সুর-বালারও হয়েছে এই বয়সেই। সে পরীক্ষাতেও চারুবাবুরা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন সগৌরবে।

হরেকৃষ্ণ আসার পরও মাস-দুই-তিন কেটে গেল। যেখানে যা ছিল সামান্য গোপন সঞ্চয়—ধুয়ে মুছে বেরিয়ে গেল সংসার চালাতেই। তবু ভবতারণ অসাধ্য সাধন করছেন, অসুস্থ শরীরেই টো টো ক'রে ঘুরছেন সারাদিন, দু টাকা চার টাকা আনছেনও মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তাতে কোনক্রমে নুনভাত চলে, বাড়িভাড়া দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত

এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মতির দেওয়া দুখানা সামান্য গহনা ছাড়া কিছু রইল না কোথাও।

মাসকাবারে তারই একটা বার ক'রে দিল সুরবালা। হার ছড়াটা বাবার সামনে রেখে বলল, 'এটা বেচে যা পাও নিয়ে এসো বাবা।'

ভবতারণের চোখে জল এসে যায়, বলেন, 'কখনও কিছু দিতে পারলুম না—তোর গয়না বেচে খাব মা! সে আমি পারব না।'

সুরবালা পীড়াপীড়ি করে, বলে, 'বাড়িওয়ালারা খুবই ভাল—কিছু বলবেন না হয়ত—কিন্তু ওঁদেরও তো অবস্থা ভাল নয় বাবা, সেইজন্যেই ভাড়াটে রেখেছেন। ওঁদের ভাড়া আটকানো ঠিক হবে না। তাছাড়া কতদিন আর ফেলে রাখবেন। যদি পাঁচ মাস ছ মাসই অমন না দিতে পারি, তখনও কি আর চুপ ক'রে থাকবেন? তাছাড়া সে একগাদা টাকা জমে যাবে—সে তো আরও দিতে পারব না। মিছিমিছি মনকষাকষি নালিশ-মকদ্দমা—হয়ত আদালতের প্যায়দা ডেকে মালপত্তর সব কোরক করবে—নয়ত টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আমাদেরও বার ক'রে দেবে।...কি দরকার বাবা, তার চেয়ে সহমানে দিয়ে দেওয়াই ভাল।'

ভবতারণ তবুও ইতস্তত করেন। তাঁর শীর্ণ দুই গালের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ঝরে পড়তে থাকে। সুরবালা কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকে আর কোন কথা বলে না—হারটা কুড়িয়ে নিয়ে শশী বৌদির কাছে চলে যায়। বলে, 'তুমি দাদাকে বলে এইটে বিক্রি করিয়ে দাও বৌদি।'

শশী চমকে ওঠে, 'সে কি রে! এমন অবস্থা?'

মাথা হেঁট ক'রে সুরবালা বলে, 'আর কোথাও কিছু নেই। বাড়িভাড়াটা অন্তত দিতে হবে তো। লোকে কথায় বলে—খাই না খাই বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকি! সেই পড়ে থাকায় জায়গাটুকু নষ্ট করতে চাই না।'

চুপ ক'রে বসে থাকে শরৎশশী। কি যেন তোলাপাড়া করে একটা মনের মধ্যে! তারপর বলে, 'তা না হয় এ মাসের ভাড়াটা এমনিই আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে যা—'

'না বৌদি', প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে সুরো, বলে, 'তোমার অবস্থাও তো জানি। এমন কিছু তালেবর রহমান নয় দাদা, তার ওপর মেয়ের বে'র কথা হচ্ছে। এ সময় এতগুলো টাকা আটকে ফেলা ঠিক হবে না তোমার।...না পারবে তাগাদা করতে না পারবে আদায় করতে। তাছাড়া ক'মাস তুমি এমন ক'রে টানবে বলো? মাস তো কাটছে জলের মতো। ও তুমি বেচেই দাও বৌদি, যে ক'দিন এই ধুলিগুঁড়ি আছে সে ক'দিন তো চলুক!'

'তার পর?' ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করে শশী।

তেমনিই স্থির কণ্ঠে উত্তর দেয় সুরবালা, 'তারপর মা গঙ্গা আছেন। নয়ত বুড়ো বাপের হাত ধরে রাস্তায়—যাক্ সে সব কথা। অত আর এখন থেকে ভেবে লাভ নেই।'

শশী আর কিছু বলে না। হারটা তুলে রেখে দেয়।...

সময় হিসেব ক'রে চারুবাবুর আপিস যাবার আগেই দিয়ে এসেছিল সুরো। আপিস থেকে ফেরারও অনেক পরে আবার গেল খবরটা জানতে। চারুবাবু তখন বেরিয়ে গেছেন। কোথায় যেন তিন টাকা মাইনেতে ছেলে পড়ানো ধরেছেন—সেইখানেই গেছেন বোধহয়।

ওকে দেখে শশী বিনাবাক্যে কুড়িটা টাকা বার ক'রে দিল।

সুরো চমকে উঠল, 'মোটে এই পাওয়া গেল?'

'না রে, উনি বিক্রি করতে পারেন নি। দাম ওঠে না। কেউ বলে পানে বোঝাই, কেউ বলে মরা সোনা। নানা বায়নাক্কা। তাই আপাতত, যে মহাজনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে দরকার পড়লে ধারটার করেন—তার কাছে ওটা বন্ধক রেখে এই টাকাটা নিয়ে এসেছেন। তুই তো এখন কাজ চালা। বলেছেন, পরে দেখা যাবে'খন।'

'কিন্তু বন্ধক মানেই তো সুদ বৌদি! সুদ শুনেছি ছারপোকার বিয়েন।...ও গয়না

কি আর উধরে নিতে পারব—ও ঐ সুদেই চলে যাবে একদিন।'

'দূরে পাগল। অতদিন তারাই বা ফেলে রাখবে কেন? একটু সময় পেলে উনিই কাউকে ধরে ভাল একটা পোদ্দারের দোকান থেকে বেচিয়ে দেবেন।'

তা-ই বোঝে সুরো। বিশ্বাসও করে। নিস্তারিণী যখন পরোক্ষে স্বামীকে উপলক্ষ ক'রে বিলাপচ্ছলে কৌতূহল প্রকাশ করেন—কে কী পরিমাণ ঠকাল তাঁর কাঠবোকা মেয়েকে এই গহনা বিক্রীর ব্যাপারে—তখনও চুপ ক'রে থাকে। নিস্তারিণী স্বামীকে গঞ্জনা দেন, 'কী লাভ হ'ল ভাল সেজে?...ও বেউড় বাঁশের ঝাড়, যা ধরেছে তা তো করবেই জানো। তবু তুমি ঠকলে একবারই ঠকা হ'ত, যেটুকু পেতে ঘরে উঠত। এ তো সাত চোরে মুশুরী বাটা হয়ে গেল—বুঝতেই পারছি!'

মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে সুরো। শঙ্কিতও হয়। কে জানে যদি শশী বৌদির কানে যায় কথাটা—না যাওয়ারও কোন কারণ নেই, মা তাঁর কথা গোপন করার কোন চেষ্টা করেন না, সে গলা সর্বদাই উচ্চতম গ্রামে বাঁধা—শশী বৌদি কি মনে করবেন!...

ইতিমধ্যে ওঁদের বড় মেয়ে শ্রীলেখার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়।

মার সঙ্গে কী একটা যোগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল শ্রীলেখা, সেখানে কোন এক কায়স্থ রাজবাড়ীর গিন্নী ওকে দেখেছিলেন। মেয়েটিকে হঠাৎ চোখে লেগে গিয়েছিল তাঁর। সুশ্রী শান্তশিষ্ট মেয়ে যে খুব সুলভ নয় তা তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন ভাল ক'রেই। সঙ্গে সঙ্গে নেয়ে উঠে আনন্দময়ীতলা পর্যন্ত এসে ওদের পদবী পরিচয় এবং ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিলেন। তারপর তিনিই উপযাচক হয়ে ঘট্‌কী পাঠিয়েছিলেন বিয়ের প্রস্তাব ক'রে।

প্রথমটা চারুবাবু রাজী হন নি। অসমান ঘরে কাজ করা ঠিক নয়। তাঁর মতো লোকের অতবড় ঘরে কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না। তা ছাড়াও আপত্তি ছিল তাঁর। বড় ঘর, জমিদারের বাড়ি—জমিদার কেন রাজাই তো—বহুদিনের নামকরা বনেদী বংশ ঠিকই। কিন্তু ছেলে লেখাপড়া বিশেষ করে নি, ঘরে মাস্টার রেখে পড়ানো হয়েছে, সে কতদূর কী হয়েছে কে জানে। খানিকটা ইস্কুলের পড়াশুনো থাকলেও হ'ত। আজকাল তো একটা-পাস ছেলেও কত পাওয়া যায়।...বাপের মন খুঁৎখুঁৎ করে, দ্বিধা যেতে চায় না। বলেন, 'চিরদিন শুনে আসছি ভাল ছেলে দেখে গাছতলায় দেওয়াও ভাল।...ছেলে যদি তেমন না হয়, রাজপ্রাসাদে দিয়েই কি সুখ হবে? তাছাড়া—রাজবাড়ি ঐ শুনতেই, এতদিনে সরিকে সরিকে ভাগ হয়ে কতটুকুই বা আছে। এরাও তো ষেটের তিনটি ভাই। বাপও কিছু করে না, বসে খায়। তার ওপর বাজারে নাকি বাঁধা রাঁড় আছে শুনেছি।...যদি যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে যায়—এদের দুর্দশার শেষ থাকবে না। মাঝখান থেকে অসমান ঘরে কাজ করতে গিয়ে আমি এখন নাটাপাটি খাব—দেনায় জড়িয়ে পড়ব!'

কিন্তু ঘট্‌কীর মুখে পাত্রের রূপের বর্ণনা শুনে শশী বৌদি স্থির থাকতে পারে না। রাজপুত্তুর শুধু নামে নয়—চেহারাতেও। এমনি জামাই-ই তো কাম্য মেয়ের মেয়েদের। ঘট্‌কী বলে, 'নেই নেই ক'রেও ওদের ঐশ্বর্য কি কম এখনও? এমন বন্দোবস্ত কোম্পানীর সঙ্গে, ছেলেমেয়ে পেটে এলেই তার মাসোহারা ব্যবস্থা হয়ে যায়। না-ই বা রোজগার করল ছেলে, তোমার মেয়ে যেদিন বৌ হয়ে ঢুকবে ও বাড়িতে সেই-দিন থেকেই তার নামেও তো মাসোহারা বরাদ্দ হয়ে যাবে গো।...তারপর ধরো ষেটের পেটে যা ধরবে তারাও ধরো গে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মাসোহারা নিয়ে জন্মাবে। এ একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর নাকি নড়চড় হবার জো নেই।...ও মেয়ে কি আর সোয়ামীর হাত তোলায় থাকবে—না শ্বশুরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে ওকে? দিয়ে দাও বৌদি, এমন পাত্তর ছেড়ো না। যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে অশেষ দুর্গতি হয়। এর

পত্র পক্ষতাতে হবে বলে রাখছি। কী এমন শানসা লোক তোমরা যে মোট মোট টাকা খরচ ক'রে পাস-করা পাত্তরে দিতে পারবে?'

শশীর মনে হয়, অকাট্য যুক্তি। তিনি সেই কথাই বুঝিয়ে বলেন চারুবাবুকে। পীড়াপীড়ি করেন ছেলে দেখবার জন্যে। ছেলের চেহারা দেখে চারুবাবু নরম হবেন খানিকটা—স্বভাবতই এটা আঁচ করেছিলেন শশী বৌদি। হয়ও তাই। বাড়ি ঘর আসবাব, সেই সঙ্গে বাড়ির লোকজনদের চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে কতকটা অভিভূত হয়েই ফিরে আসেন চারুবাবু। তবু দেনাপাওনার কথা তুলে নিজের অসামর্থ্য জানিয়ে কাটাবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু ছেলের মা আড়াল থেকেই এক কথায় চুপ করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ও আর আপনি কি দেবেন ব্যাই মশাই—বৌ আনব আমরা, জড়োয়া গয়না ছাড়া এ বাড়ির বৌ আসবার নিয়ম নেই। সে কি আর মেয়ের বাপের ওপর বরাত দিলে চলে! আর নগদ টাকাও দিতে হবে না—আমাদের এ'য়ার ছেলে বেচতে বড় ঘেন্না...শুধু নমস্কারী কখানা দেবেন একটু ভাল দেখে আর ফুলশয্যের তত্ত্বটা। এর পরের তত্ত্বতাবাস করেন ভাল, না করলেও ক্ষেতি নেই। আমাদের এ বাড়ি নিত্যি এত তত্ত্ব আসে—কার এল আর কার না এল খবরও কেউ রাখবে না।'

এর পর 'যাচা লক্ষ্মী' ঠেলতে চারুবাবুরও সাহস হ'ল না। শশী বৌদি তো আড় হয়ে পড়লেন যাকে বলে। বললেন, 'না হয় এর পর না খেয়ে দেনা শুধব। না হয় ভিক্ষে দুঃখু ক'রে চালাব। তুমি আর দুমত ক'রো না লক্ষ্মীটি। বলছ অমন কাত্তিকের মতো বর, আমার সুন্দর মেয়ে—জোড় মানাবে। তাছাড়া অত বড় ঘর, লোকে বলে বড়র আঁস্তাকুড়ও ভাল। এ পাত্তর ছাড়লে এর পর কী জুটবে তার ঠিক আছে! এধারে মেয়ের বয়সও তো বলতে নেই বারো পুন্নু হয়ে গেল, আর কবেই বা বিয়ে দেবে?... শেষে হয়ত একটা হাঘরের হাতে তুলে দিতে হবে!'

চারুবাবুও বোঝেন কথাগুলো। লোভ তাঁরও হয়েছে একটু, বিশেষ ছেলের চেহারা দেখে। উনিশ বছরের ছেলে—কন্দর্পের মতো কান্তি তার!...শেষ পর্যন্ত মত দেন তিনি। তারপর অবিশ্যি তাঁর আর করার কিছু থাকে না। পাত্রপক্ষই পাঁজিপুঁথি দেখিয়ে দিনক্ষণ ঠিক ক'রে দেন, মায় পাকা-দেখার তারিখ পর্যন্ত।...

অসমান ঘরে কাজ করতে যাওয়ার ফলটা প্রথম থেকেই টের পান চারুবাবু। আশীর্বাদের দিনই তাঁর পুরো চার মাসের মাইনে খরচ হয়ে যায়। পাত্রপক্ষ বাহান্ন রকমের খাবার ক'রে আগাগোড়া রুপোর বাসনে খাইয়েছে—অত না হোক, খানিকটা না করলে মান থাকে না। ছেলের মা একশ একখানা নমস্কারী চেয়েছিলেন—অনেক বলে কয়ে পায়ে হাতে ধরে সেটা প'য়ষট্টিখানায় দাঁড় করালেন চারুবাবু। তাতেও শান্তি নেই, হবু বেয়ান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরপাড়ার এক তাঁতিনীকে পাঠিয়ে দিলেন, বলে পাঠালেন, তাকে বলে দিলে সে চড়ন দিয়ে ফরমাশ মতো শাড়ি ক'রে দেবে। 'আমাদের কাপড় যোগায় বারো মাস, কী কাপড় এ বাড়িতে চলে তা ওরা সব জানে। অন্য ফ্যার-ফ্যারে কাপড় দিলে কেউ পরবে না, নানা কট্‌কেনা করবে তা নিয়ে। ওঁরা এখন আমাদের কুটুম হতে যাচ্ছেন, ওঁদের অপমান হ'লে সেটা আমাদেরও অপমান। ঘরে যা আসবে তার দোষগুণ ঢেকে নিতে পারি—নমস্কারী তো বাইরে যাবে, কার মুখে হাতচাপা দেব?'

তাও, চারুবাবু এ সবই সহ্য করলেন—মুখ বুজে। খরচ করলেনও সব। উনি হিসেবী মানুষ। মেয়ে হবার পর থেকেই প্রতি মাসে আলাদা একটা ঘটিতে দু' টাকা তিন টাকা ক'রে জমিয়ে আসছেন প্রতি মাসে। তবে তাতে আর কত হয়—ধারদেনা করতেই হয় নানান জায়গা থেকে—তার ভেতর কোন কোনটা বেশ চড়া সুদেই নিতে হয়। নেন আর ফিরে এসে বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে হেসে বলেন, 'নাও, সুদটা কষতে থাকো

এখন থেকেই। মধুসূদনও আর চলবে না। শুধুই তেঁতুল দিয়ে ভাত ঠেলতে হবে।' কোনদিন বা বলেন, 'শাড়ি টাড়ি যা পরবে এবার থেকে বাইরে গেলে। ঘরে এখন থেকে জোলাতাঁতির গামছা শুরু করো।'...

সুরোও প্রমাদ গণে। এত ঘনিষ্ঠতা, অন্তত একখানা টাকা-দুয়েকের ভাল শাড়ি আর আটগণ্ডা পয়সার মিষ্টি দিয়েও আইবুড়ো ভাত দিতে হবে। নইলে মান থাকবে না। অথচ টাকার ব্যবস্থাও আর নিজের হাতে কিছু নেই। তাই অনেক ইতস্তত ক'রে, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে—এ সময় শশী বৌদিদের বাজে বেগারের তাগাদায় বিব্রত করা ঠিক নয় বুঝেও—এক সময় কথাটা পাড়তে হয়!...'তুমি সেই হারটা এবার বেচিয়ে দাও বৌদি, যা পাওয়া যায়। দাদার মাথার ঠিক নেই তা বুঝি, তবু এখন স্যাক্‌রা-বাড়িই তো ছুটোছুটি করতে হচ্ছে, এক কাজে দু' কাজ হয়ে যাবে।'

শশী বৌদিও সংক্ষেপে—'ওঁকে বলব আজ', 'হ্যাঁ, ওঁকে বলেছি' ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দেন। শেষে একদিন খুব পীড়াপীড়ি ক'রে ধরাতে পরের দিন রাত্রে ডেকে আর কুড়িটা টাকা ধরে দিয়ে বলেন, 'হারটা তো খুব ভারী নয়—পানমরা-টরা বাদ দিয়ে ষোল টাকা হিসেবে দাম দিয়েছে। আরও হয়ত কিছু খুচরো পাবি তুই, সুদের দরুন কেটে রেখেছে মহাজন—ঝঞ্ঝাটটা চুকে যাক, হিসেব মিটিয়ে এর পর যা হয় তোর দাদা বুঝিয়ে দেবেন!'

অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। এর বেশী টাকা আশাও করে নি সুরো। ওদিক দিয়ে কিছু নয়—মনটা খারাপ হয়ে যায় অন্য কারণে।...তার প্রথম পাওয়া অলঙ্কার, পুরস্কারও বটে। বিক্রী ক'রে দেওয়ার জন্যে সে-ই জেদ করেছিল কিন্তু এখন বিক্রী হয়ে গেছে খবরটা শোনার পর যেন চোখের জল চাপতে পারে না কিছুতেই।

বিয়ের আগের দিন মাকে বলে আইবুড়ো ভাত দেওয়াল সে। ভাত ঠিক নয়—খাওয়াল এই পর্যন্ত বলা যায়। ওরা বামুন হ'লেও নিচু বামুন, ওদের বাড়ি ভাত খেতে বলতে সাহস হল না সুরোর। বিশেষ সে কীর্তনউলী—সে পরিচয় ওঁরা পেয়েই গেছেন। নেমন্তন্ন করলে এড়িয়ে যাবেন। তবে গায়ে-হলুদের পর আর নিজেদের বাড়ি খেতে নেই, এই কারণে পরের বাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছে দেখে সে ভরসা ক'রে বিয়ের আগের দিন রাত্রে খেতে বলল শ্রীলখাকে। কুণ্ঠিতভাবেই বলল, 'বৌদি, ময়দা খেলে তো দোষ হয় না শুনেছি—তা খুকী রাত্তিরে কেন আমাদের বাড়ি খাক না কাল? তাতে কারও আপত্তি হবে কি?'

'না না, আপত্তি আবার কিসের?' শশী বৌদি গলায় বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'ভাত খেলেও আমার আপত্তি হ'ত না। হাজার হোক বামুন তো। তোর বাড়ি তো এমনিই এটা-ওটা খেয়ে আসছে, এই তো সেদিনই রসবড়া খেয়ে এসে কত সুখ্যেত করল।'

মাকে বলে—অনেকদিন পরে এই কারণেই—বিস্তর খোসামোদ ক'রে মন ভিজিয়ে—পরোটা ধোঁকার ডালনা চসির পায়েস করালো সুরো। সেই সময় কাপড়টা পরিয়ে দিল। বাবাকে দিয়ে বড়বাজার থেকে আনিয়েছিল কাপড়টা সাড়ে তিন টাকা দাম, ভাল ধনেখালি ডুরে।

খাওয়ার পর মেয়ে পৌঁছতে গেছে, 'শোন' বলে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুরোর হারটা বার ক'রে দিলেন বৌদি, বললেন, 'কাল পরে আসিস, গয়না নেই বলে যেন ডুব দিয়ে থাকিস নি!'

অবাক হয়ে যায় সুরো।

'তার মানে? হারটা তাহলে তুমিই কিনেছ? তা কৈ বলো নি তো!'

কোথায় একটা সূক্ষ্ম অভিমানের সুর যেন বাজে ওর গলায়।

'ওরে পাগলী, বেচাকেনা কিছুই হয় নি। তোর দাদা কিছুতেই রাজী হলেন না। ও টাকাটা উনিই দিয়েছেন, বলেছেন, সত্যি সত্যিই বেচতে গেলে এর চেয়ে এমন বেশী

কিছু পেত না। কাজেই ধরে নিক এটা আমারই হার, আমিই কিনেছি, ওর কাছে গচ্ছিত রাখছি। আর যেন হাতছাড়া করার চেষ্টা না করে। আমি জানি এমন দিন ওর থাকবে না, ভাল মেয়ে. ভগবান একদিন না একদিন মুখ তুলে চাইবেনই। তখন শোধ দেয় যেন, যা পারবে মাসে এক টাকা আট আনা ক'রে দিলেও আমি নেব। সুদ লাগবে না, সেইটাই ওর লাভ।'

চোখে এক ঝলক গরম জল এসে যায় কোথা থেকে। গলা বুজে আসে কিসে। তবু সুরো অনেক কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করে, 'তোমাদের এই দুঃসময়, সুদে টাকা ধার করতে হচ্ছে চারিদিক থেকে—এ সময় এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে গেলে কেন বৌদি, তোমাদের চলবে কোথা থেকে!'

'ওমা, দুঃসময় কী বল! ও কি অলুক্ষণে কথা! মেয়ের বে হচ্ছে এ তো সুসময়। আর টাকা ধার? সে তো করতেই হচ্ছে, হবেও। ঐ কটা টাকাতে আর কী এসে যেত বল? বলে সমুদ্দুরে পাদ্য-অর্ঘ! তুই ভালবাসিস আমার মেয়েকে—হারটা সত্যি সত্যিই গালিয়ে বিক্রি করলে তোর বুকে কতটা বাজত ভেবে দ্যাখ দিকি। তাতে কি আর আমাদের ভাল লাগত এই আনন্দের সময়? তোর সন্তোষে মেয়ের আমার কল্যাণ হবে। আশীর্বাদ কর ভাল বর হোক ওর, আমি আর কিছু চাই নে। তোর দাদা যেমন ক'রেই হোক চালিয়ে নেবেন, দেনাও শোধ করবেন।'

সুরো আর থাকতে পারে না, বহু দিনের ইচ্ছেটা মিটিয়ে—শশী বৌদি হাঁ হাঁ করতে করতে—হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে নেয় তাঁর!

'ও কি করলি! বামুনের মেয়ে—পায়ের ধুলো নিয়ে নরকে ডোবালি?'

'তা জানি না। তবে আমার পুণ্যি হ'ল এইটে জানি। তোমরা অনেক বামুনের চেয়ে বড়।'

কান্নায় বুজে আসা গলায় অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দেয় সুরো।

॥ ১০ ॥

কথাটা এর আগেও দু-চারজন বলেছিল। মার আলাপী—আগেকার পাড়ার রাস্তার-কলে-জল-তোলার বন্ধু সব। তখন অত কান দেয় নি সুরো। কান দিয়ে লাভও হ'ত না। উড়ো কথায় কোন কাজ হয় না। কাকে ধরলে কোথায় যাওয়া যায়, কাজ পাওয়া যায়—তা কেউই জানে না, তারাও আবছা আবছা অস্পষ্ট জ্ঞান থেকে কথা বলে।

হঠাৎ আবার নতুন ক'রে উঠল কথাটা। আর উঠল একেবারে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছ থেকে। কথা কেন—সোজাসুজি প্রস্তাবই উঠল।

ভবতারণ সেবার পূর্ণিমার দু-চার দিন আগে প্রস্তাব করলেন, 'একবার ঘোষপাড়ায় যাবি মা? মাকে একবার দুঃখু জানিয়ে আসবি? মার জন্মদিনটা—কদিন থেকেই ভাবছি তাই। যে যা বলে বলুক, এপক্ষে তোর এই মার কথাটা আমি এখন খুব মানি—সতীমাই তোকে দিয়েছেন আমাদের কোলে—তাঁরই মেয়ে তুই। তাঁকে প্রণাম ক'রে দুঃখু জানিয়ে এলে হয়ত এই দুর্দিন কেটে গিয়ে একটা উপায় হ'তে পারে!'

প্রথমটায় অত উৎসাহ বোধ করে নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকে খুশী করবার জন্যেই রাজী হয়ে গেল সুরো। বাবার যা চেহারা হয়েছে—বেশীদিন আর বাঁচবেন না হয়ত, বাঁচলেও হাঁটাচলা করতে পারবেন না। শুধু ওদের মুখ চেয়েই এখনও টো টো ক'রে ঘোরেন, মাথা ঘুরে উঠলে এক জায়গায় বসে থাকেন চোখ বুজে, নয়ত রাস্তার কলে গিয়ে মাথায় জল থাবড়ে দেন। এই করতে করতেই হয়ত একদিন সত্যিকারের চোখ বুজবেন, রাস্তাতেই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে মরবেন। মা তো বোঝে না—ওর দ্বারা যদি শান্তি পায় তো পাক মানুষটা!

তবু মুখে বলে, 'কিন্তু টাকা? খরচ তো অনেক হয়ে যাবে বাবা?'

'না রে, সে ব্যবস্থা কি আর মা-বেটি না করেছে ভাবছিস? আমার এক মহাজন—ঐ বড়বাজারেরই, তার কি মানসিক ছিল—পুজো দিতে যাচ্ছে। বড় নৌকো ঠিক করেছে ভাউলে না কি বলে—বিস্তর লোকজন নিয়ে যাচ্ছে। সে-ই বলছে সঙ্গে যেতে। গাড়ি-ভাড়াটাড়া কিছুই লাগবে না, তার রসুয়ে বামুন যাচ্ছে সঙ্গে—খাওয়ার ব্যবস্থাও ওখানে, রেঁধে খেতে হবে না। নিয়ে-দিয়ে যা ঐ কত্তামশাইয়ের গদীতে জমা দেওয়া কিছু!'

নিস্তারিণী শুনে প্রথমটা বেঁকে বসল।

'কথাটা মুখে উচ্চারণ করলে কী ক'রে! রূপের খাপরা মেয়ে—ঐ যত রাজ্যের ইত্তিক জাতের ভীড়ের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাবে? তারপর একটা কিছু হয়ে গেলে—তখন? বলতে নেই যদি কত্তাই সেবার জন্যে ডাকেন?'

এতখানি জিভ কেটে ভবতারণ উত্তর দেন, 'তোর মতো ছোট মন যদি দুটি দেখেছি! মার কাছ থেকে পাওয়া মেয়ে—তুই-ই তো বলিস। তাঁর জিনিস তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তার আবার অত ভাবনা কিসের! তিনিই দেখবেন। এই তো স্বর্ণবাইজীর ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখলি, তবু তোর আক্কেল হ'ল না! মাকে ভরসা ক'রে থাকলে কোন বিপদ হবে না—দেখিস!'

স্বর্ণবাইজীর ব্যাপার সবটা না হোক—খানিক খানিক সুরবালাও শুনেছে বৈকি। অনেক টাকা ছিল স্বর্ণবাইজীর, অসীম প্রতিপত্তি—সেই অহঙ্কারেই মত্ত হয়ে একেবারে বাঘের মুখে হাত দিতে গিয়েছিল, কী একটা আক্‌চা-আক্‌চির ব্যাপারে গুণ্ডা লাগিয়ে নাকি একটা মানুষ খুন করিয়েছিল। কিন্তু টাকাই থাক আর বড় বড় মানুষই হাতের মুঠোয় হোক—কোম্পানীর রাজত্বে খুন ক'রে পার পাওয়া সোজা নয়। বাইজী ধরা পড়ল—গুণ্ডা দুটো সমেত। রাস্তা থেকে ধরে এনে বাইজীর বাড়ির উঠোনে ফেলে ঠেঙিয়ে মেরেছিল লোকটাকে। তাও, যাকে মারবার কথা তাকে নাকি মারে নি—ভুল ক'রে অন্য লোক একটা ধরে এনেছিল, এই পাড়ারই দোকানদার একজন। এক রকমের গায়ের কাপড়—অন্ধকারে অত বুঝতে পারে নি।

কাজটা একটু কাঁচাও হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কারও জানতে নাকি বাকী ছিল না। যাকে মারা হয়েছিল, সে নাকি চিৎকার ক'রে বলেছিল, 'ও স্বন্ন আমি, আমি! ও স্বন্ন এ আমি—তুমি ভুল করছ।' কিন্তু তাতে কান দেয় নি স্বর্ণ, ওপরের বারান্দা থেকে বলেছে, 'একদম জান্‌সে মার ডালো।' অবশ্য লোকটা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ওপর থেকে নেমে এসে আলো ধরে দেখেই বুঝেছে ভুলটা। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। লাশ সরিয়ে গঙ্গায় ফেলে এসে রক্তের চিহ্ন ধুয়ে দিতে বলে গুনে গুনে হাজার টাকা তাদের ধরে দিয়ে দূর দেশে কোথাও চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু তারা যেতে পারে নি, চারিদিকে লোক সজাগ হয়ে উঠেছে দেখে তাড়াতাড়ি একটু দূরেই নালায় লাশটা ফেলে এসে বাইজীর বাড়িতে ঘুটে-কয়লা রাখা অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

পাড়ার বহু লোক সে চিৎকার শুনেছিল। বাইজীর হুকুমও। পরের দিন যখন সেই দোকানদারকে দেখতে পাওয়া গেল না, কেউ কেউ থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এল। লাশ

জলে পড়ে নি। শহরের মধ্যে খুঁজে বার ক'রে সনাক্ত করতেও দেরি হ'ল না। বাইজীর বাড়ি খুঁজে লোক দুটোকে পাওয়া গেল—তখনও তাদের কাপড়-জামায় রক্তের দাগ, সে লাঠিটাও বেরোল পেছনের একটা এঁদোগলি থেকে। তাছাড়া উঠোনের রক্ত ধুলেও দেওয়ালে দরজায় তখনও ছিটে লেগে ছিল, অত কেউ লক্ষ্য করে নি—পুলিসের চোখে তা এড়াল না। একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে—তাই পড়ল বাইজী।

এর পর ফাঁসি অনিবার্য, না হয় দ্বীপান্তর তো বটেই। বহু হীরে-মুক্তোর মালা পরেছে বাইজী—এবার দড়ির মালা পরতে হবে সেই কথা জানত সকলে। উকীল ব্যারিস্টারে কৃপণতা করে নি বাইজী—তবু মৃত্যু যে প্রায় অবধারিত—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকটির তা বুঝতে বাকি ছিল না। স্বর্ণ ঘোষপাড়ার শিষ্য—শেষ অবধি দুই চোখে অন্ধকার দেখে সেইখানে গিয়ে পড়ল। সায়রে চান ক'রে দন্ড খাটতে-খাটতে এসে সত্যি সত্যিই আছড়ে পড়ল মায়ের ঘরে—'মা বাঁচাও' 'মা বাঁচাও' বলে! তা মা বাঁচালেনও —গুন্ডা দুটোর দ্বীপান্তর হ'ল কিন্তু বাইজী বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। এর জন্যে মুঠো মুঠো টাকা খরচ ক'রে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল ঠিকই—কিন্তু গলার ফাঁসটা বাঁচল। 'মা বাঁচাও' বলেছিল, মা বাঁচিয়েছেন—টাকার প্রশ্ন তো ওঠে নি। এর পর অবিশ্যি আর মাথা তুলতে পারে নি, কারবারও আর করতে হয় নি। খুনে মেয়েমানুষের কাছে কে আসবে? কোনমতে প্রাণধারণ ক'রে আছে এই পর্যন্ত. আগের সে বড়মানুষীও নেই, রবরবাও নেই। কেউ কেউ বলে এই বেঁচে থাকাটাই মায়ের দেওয়া দন্ড।

আরও অনেক গল্প শুনেছে স্বর্ণ বাইজীর। বাবার মুখেই শুনেছে। এই তো সে দিনের কথা। সুরো অবশ্য চোখে দেখে নি—কিন্তু আগে আগে যখন ফি শুক্রবারে সমাজ বসত, তখন নাকি ওদের সেই বস্তির ঘরেই এক-একদিন বাইজী এসেছে সশরীরে, দলের সঙ্গে বসে গানও গেয়েছে। বাইজীর অদ্ভুত আকর্ষণ, পতঙ্গের কাছে বহ্নির যে আকর্ষণ—কতকটা সেই রকম। ফলে বহু মানব-পতঙ্গ অকর্মণ্য ধনীর দুলাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে আগুনে—বাইজীও তাদের রক্তচোষা নিশাচর প্রাণীর মতো নিঃশেষে চুষে খেয়ে অন্তঃসারশূন্য ক'রে পায়ে ঠেলে ফেলে দিত, আবার ধরত নতুন মানুষ। এক-একটা লাখোপতিকে পথে বসাতে নাকি তার কয়েক মাসের বেশি সময় লাগত না।

এইভাবে বহু ধনী জমিদারই পথে বসেছে বাইজীর দৌলতে। নতুন 'বাবু' যেদিন প্রথম আসতেন—বাইজীর শর্ত, সে তেতলার ঘরে থাকবে, বাবুকে সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে টাকার তোড়া রাখতে রাখতে উঠতে হবে। জীবনযাত্রার খরচও ছিল তার অসামান্য। গরমের দিনে দুপুরে বাইজী খাটে শুয়ে থাকত, ঘরের নর্দমা এঁটে কার্বা কার্বা আসল গোলাপ জল ঢেলে খাট সমান উঁচু ক'রে সরোবর সৃষ্টি করতে হ'ত, দ্বীপের মতো খাটটা জেগে থাকত শুধু। এ খরচ যোগাতে হ'লে কার টাকা আর ক'দিন থাকে, সত্যি সত্যিই কুবেরের ভান্ডার তো আর নয় কারও!

শেষ পর্যন্ত রাজা ইন্দিরচন্দরও যখন বাইজীর জন্যে দেউলে হয়ে গেলেন তখন নাকি কলকাতার বড় বড় কয়েকজন লোক মিলে বাইজীর নামে নালিশ করেছিলেন—এ কারবার বন্ধ ক'রে দেবার হুকুম হোক কিম্বা বাইজীকে অন্য কোন শহরে চলে যেতে বলা হোক। এইভাবে ওকে চলতে দিলে কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় ধনী বলতে আর একজনও থাকবে না যে! অত বড় মানী মানুষ ইন্দিরচন্দরকে নাকি এখন তার আগেকার খানসামার কাছে মাঝে মাঝে এসে হাত পাততে হয়—নিজের হাতখরচের জন্যে।

বাইজী আর্জির নকল আনিয়ে পড়িয়ে শুনল মন দিয়ে। উকিল-ব্যারিস্টার কিছু দিল না, মামলার দিন-কতক আগে বাবা আউলচাঁদের তিথি পড়েছিল, সেই দিন লোক-লস্কর নিয়ে নৌকোয় করে গদীতে কি মানত ক'রে এল—তারপর আদালতে হাজির হয়ে

নিজের জবাব নিজেই দিল। সাহেব জজ, তাঁর সামনে হাতজোড় ক'রে বলল, 'হুজুর ধর্মাবতার, আপনারা আজ রাজা হয়ে বসেছেন—কিন্তু আসলে আপনারা বেনের জাত, কারবারীর জাত। কারবার করতেই একদিন এদেশে এসেছিলেন। আজও শুনেছি রাজত্ব করার চাইতে কারবারটাই বড় আপনাদের কাছে, দেশে-দেশে ব্যবসা ক'রে বেড়ান। কাজেই আমার কথাটা আপনি বুঝবেন। আমারও এ একরকম ব্যবসা, আমার মাল আমার এই দেহটা। আমার মালের দাম আমি বেঁধে দিয়েছি—যার পোষায় কিনবে, যার না পোষায় কিনবে না। জুলুম তো নেই কিছু। যাদের ক্ষমতা নেই—তারা কিনতে আসে কেন? এত চড়া দাম দিতে কে বলেছে তাদের? এর মধ্যে আমার কী অপরাধ তা তো আমি বুঝলুম না হুজুর!'

সাহেব আর্জি পড়ে আর বাইজীর চেহারা ও চালচলন দেখে আগেই কাঠগড়াতে ফরিয়াদীর জন্যে চেয়ার দেবার হুকুম দিয়েছিলেন, এখন দোভাষী জবাবের অর্থটা বুঝিয়ে দিতে তাঁর দৃষ্টি প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সওয়ালের উপযুক্ত জবাব' বলে বেকসুর খালাস তো দিলেনই—এই একটা অর্থহীন মামলায় ওকে টেনে এনে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখ প্রকাশও করলেন।

বাইজীর কথাটা মনে পড়েই হোক, আর স্বামীর যুক্তিতেই হোক—নিস্তারিণী নরম হ'ল একটু। সতীমায়ের দেওয়া মেয়ে, তাঁর কাছে গেলে হয়ত সত্যিই একটা চারা হ'তে পারে—অন্তত মেয়েটার যদি একটু সুবুদ্ধিও হয় তো বাঁচা যায়।...

সে চুপ ক'রে গেল, আর তার সেই মৌনকেই সম্মতি ধরে নিয়ে ভবতারণ চেষ্টা-চরিত্র ক'রে—বাজার থেকে দু-তিনটে টাকা ধার ক'রে বেরিয়ে পড়লেন মেয়েকে নিয়ে।

সেইখানেই যোগাযোগটা হ'ল।

সায়রে চান ক'রে উঠে চুল মুছছে...মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে আগে থাকতেই লক্ষ্য করেছে সুরবালা, ভাল রঙকরা বজরা নৌকায় চেপে এসেছে, সঙ্গে ঝি—তাছাড়াও দু-দুটো খাটাগুমসো চেহারার দারোয়ান। একা মেয়েছেলে—তায় এত গয়না-গাঁটি পরা, সাধারণত এসব পরে এত দূরে আসতে সাহস করে না কেউ, সেই জন্যেই অত নজরে পড়েছিল। আরও একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার ছিল। বয়স হয়েছে মেয়েটির—পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, হয়ত বেশীও হতে পারে—এক গা গয়না কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর কিম্বা হাতে লোহা নেই। অর্থাৎ আয়তির চিহ্ন নেই কোথাও। এ শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ এখানে বিস্তর আসে—মায়ের রাজত্বে বাছবিচার নেই কারও—কিন্তু সে সবই গরীব, বস্তি কি খোলার ঘরের মেয়েছেলেই বেশী তাদের মধ্যে। এত লোকলস্কর নিয়ে, পাইক-পেয়াদা নিয়ে কেউ আসে না, এত গয়না কাপড়ের বাহারও নেই তাদের। কোন বড় মানুষের রক্ষিতা নিশ্চয়ই—কারও মুখে শুনে মানত করতে এসেছে। অবশ্য গৃহস্থ ঘরেও অনেকে কালীঘাটে শাঁখা-সিঁদুর বাঁধা দেয়—মানসিক করে—তবে তাদের দেখলেই চেনা যায়, বহুদিনের ব্যবহার করা সিঁদুরের চিহ্ন অত সহজে মিলোয় না।

অবস্থাপন্ন যে তাতে সন্দেহ নেই। ঘাট থেকে এই পথটাও পাল্কীতে ক'রে এসেছে। নিজের সঙ্গে দামী ঘেরাটোপ এনেছিল নিশ্চয়ই—ভাড়াটে পাল্কীতে ঢাকা দিয়ে এসেছে। তবে এখানে তো নেমে স্নান করতেই হবে, এখানে আর কোন বড়মানুষীই চলবে না। চুল মোছা হয়ে গেলে পাকানো গামছার ঝাপটায় চুল ঝাড়তে ঝাড়তে অলস চোখে চেয়ে দেখছে সুরবালা, মানুষটা ভিজে কাপড়েই সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর, বিস্মিত সুরোর দিকে বার-দুই আপাদ-মস্তক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গা, তুমি কেত্তন গাও না? ভুল করছি কি না ভেবেই এতক্ষণ রা কাড়ি নি, কিন্তু ক্রমশ যত দেখছি মনে হচ্ছে ঠিক ঠিক চিনেছি। বলি, তুমি তো মতি কীত্তনউলীর সঙ্গে গাইতে যেতে—না কি?'

অগত্যা ঘাড় নাড়তে হয় সুরোকে। স্বীকার করতে হয় কথাটা। চারিদিকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ ও কান। অস্বীকার করতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু গুরুস্থানে এসে স্নান ক'রে উঠে দর্শন করতে যাবার আগে মিথ্যে বলতে পারল না। তাছাড়া এমনিও মিথ্যে কথা ওর সহজে আসে না।

প্রশ্নকারিণী ভারী খুশী হ'ল অনুমানের সমর্থন পেয়ে। খুশিটা আত্মতৃপ্তির। বলল, 'হুঁ হুঁ বাবা! এ বড় সাফ চোখ। একবার যাকে দেখব ঠিক মনে থাকবে। ঐ একবারই দেখেছি, পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গাওনা করতে গিছলে—মনে আছে? কার যেন অন্নপেরাশনে। ভারী পছন্দ হয়েছিল তোমার গলা। সেই জন্যেই আরও মনে করে রেখেছি। মতির চেয়েও তোমার গলা ভাল—তা মানতেই হবে। আর চেহারার তো কথাই নেই। সেই জন্যেই বোধহয় মতির এত রীষ।...দেখা-সাক্ষাৎ না হোক পরিচয় না থাক—খবর সব রাখি বাপু। মতির সঙ্গে যে তোমার ফারকৎ হয়ে গেছে—মতি আর নে যায় না সঙ্গে, আলাদা মুজরোও দেয় না—সব জানি। অবস্থা তো দেখছি সসেমিরে, তা হ্যাঁ ভাই, তোমার এমন রূপ এমন দরাজ গলা—থ্যাটারে যাও না কেন? লুপে নেবে সবাই তোমাকে পেলে। থ্যাটার জান তো? যাত্তারার মতো খোলা মাঠে হয় না—ইংরেজদের মতো বাঁধা ঘরে পালা গাওয়া, আজকাল তাকে নাকি পেলে বলে। দ্যাখো নি কখনও?'

সুরো বিরক্তই হয়ে ওঠে মনে মনে—এই গায়ে-পড়া আত্মীয়তায়। বলে, 'তা আপনাকে তো চিনতে পারছি না—কখনও দেখেছি বলেও তো মনে পড়ছে না?'

'না-ই বা চিনলে! আমি তো বাছা তোমার হিত বৈ অহিত চাই না—সে তো আমার কথাতেই বুঝলে!—পরামর্শটা নিতে দোষ কি? বলে শুনেছি—পরমহংসদেবও বলেন, কে এক অবধূতের চব্বিশজন গুরু ছিল। পিঁপড়েকে দেখেও গুরু বলে মেনেছিল, তার আচরণ দেখে। তুমি বাছা থ্যাটারে যাও, মাস মাস মাইনে পাবে—কোন ঝঞ্ঝাট-ঝক্কি কিছু থাকবে না। তুমি তো তেমন নও—নইলে বাড়িতে কাপ্তেন বাবুদের গাঁদি লেগে যেত। থ্যাটার অবিশ্যি জায়গা ভাল নয়—তবে তুমি যদি খাঁটি থাকো তো তোমায় নষ্ট করে কে? এই যে বড়-গোলাপ, পেলে করে—গাড়ি মুদে যায়, গাড়ি মুদে ফেরে, কৈ—কারও সাহস আছে মুখ তুলে তাকায় তার দিকে দুষ্যভাবে?'

কথাটা একটু একটু ক'রে মনে লাগে বৈকি!

এমনও মনে হয় এক-একবার—সতীমায়ের স্থানে আসারই প্রত্যক্ষ ফল এটা। মা তো আর সশরীরে দেখা দিয়ে কথা বলবেন না, এমনিভাবেই কাউকে দিয়ে বলাবেন।

তবু মুখে একটা ঔদাসীন্য দেখিয়ে বলে, 'সে কোথায় কী ক'রে কি হয় জানি নে তো! ওদিকের কাউকে চিনিও না। আমি কেমন ক'রে চেষ্টা করব বলুন!'

'ব্যাস্ ব্যাস্, উতিই হবে। দয়া ক'রে যে মুখের কথাটি খসিয়েছ তাতেই কাজ হয়ে যাবে। আমার বাবুর ইয়ারবন্ধুদেরই থ্যাটার আছে যে, আমাদের ঘরেই তাদের আড্ডা। মস্ত মস্ত লোক সব, হেঁজিপেঁজি কেওকেটা নয় কেউ।.আমি ফিরে গিয়েই তাদের বলব। এর আগেও খোঁজ করেছি মতির কাছে—তা বলে কি—জানি নে, কোথায় খোলার ঘরে থাকে বুঝি—য়্যাদ্দিনে হয়ত তাও নেই, ভিক্ষে ক'রে খায় হয়ত। বোঝ মাগীর ঝালটা! ...তা কোথায় থাকো বল তো, তোমার ঠিকানাটা কি?'

ঠিকানাও বলতে হয় তখন। বেশ মন দিয়েই শোনে মেয়েমানুষটি, বার-দুই আপন মনে আউড়ে নেয়, তারপর বলে, 'আর বলতে হবে না, ঠিক মনে থাকবে। একবার কানে যা সেঁধুবে তা আর বেরুবে না।...আমাদের বাবু আদর ক'রে বলেন শ্রুতিধর একবার শুনলেই যারা মনে ক'রে রাখে—তাদেরই নাকি শাস্তরে ঐ কথা বলে।'

খুশী-মনেই গা মুছে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে চলে যায় মেয়েছেলেটি। ঝি শুকনো কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ভিজে কাপড় ছেড়ে পরবে বলে। পয়সা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই,

আর তা দেখাতেও জানে—মনে মনে স্বীকার করে সুরবালা।

তবু সুরো ভেবেছিল নিতান্তই কথার কথা এটা। একবার শুনেই সত্যি সত্যি কি মনে ক'রে রাখতে পারবে? বিশেষ যেমন গলির নাম তেমনি নম্বর ওদের—ভারী ভজকটো। তাছাড়া—বলেছে বলেই গরজ করে ঠিকানা মনে ক'রে রেখে ওর চাকরির জন্যে সুপারিশ করবে—এতটা আশা করাও যায় না।

কিন্তু ফিরে আসার তিন-চার দিন পরে সত্যিই একদিন এক গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের দরজায়। বাড়ির গাড়ি—ভাড়াটে গাড়ি নয়। নিস্তারিণী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, 'ওরে একটা বাবু এয়েছে—তোর নাম ক'রে খোঁজ করছে। বলছে সুর-বালা কীত্তনউলী থাকে এখানে? তার সঙ্গে দেখা করব।...বাবুটার জামা-কাপড় এমন কিছু নয় অবিশ্যি—তবে গাড়িটা বড়লোকের। হয়ত সরকার গোমস্তা পাঠিয়েছে কাউকে—মুজরোর জন্যে বায়না করতে।'

সুরোও তাই ভাবল। এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন হয়ত।

ওরই মধ্যে একটু ভদ্র কাপড়-চোপড় পরে দেখা করতে গেল। যে এসেছিল, বেঁটে-খাটো ধরনের—পরনে মাজা-কফওয়ালা কামিজ আর চওড়াপাড় কোঁচানো ধুতি। তবু এ লোকের যে এত বড় বড় ঘোড়ায় টানা এই দামী গাড়ি হ'তে পারে না তা দেখলেই বোঝা যায়। দেখতে আদৌ ভাল নয়, তবে বয়স অল্প, আর চোখ দুটোর ভাব ভারী মিষ্টি, সর্বদাই যেন কৌতুকে উজ্জ্বল।

সামনে মাদুর পাতা ছিল, ভদ্রলোক ছড়িটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে তাতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বসল না, চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, সুরোকে বার-কতক দেখে নিয়ে একে-বারেই কাজের কথা পাড়ল। বলল, 'শোন, তোমাকে তুমি বলছি, মনে কিছু ক'রো না—বয়সে ঢের বড় আমি, একরত্তি পুঁচকে ছুঁড়িকে আপনি-আজ্ঞে করতে পারব না—বলছি, তুমি থিয়েটারে কাজ করবে? বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।'

উত্তর দিতে সময় লাগল। এ প্রশ্নটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সুরো। প্রস্তুত ছিল, আশা করছিল—তার এত যত্নের শেখা বিদ্যের একটা স্বীকৃতির অর্থাৎ কীর্তনের কোন মুজরোর। এখন সেই আশাভঙ্গের আঘাত সামলে মনটা গুছিয়ে বর্তমান প্রশ্নে নিয়ে আসতে হ'ল। ঘোষপাড়ার সেই গায়ে-পড়া মেয়েছেলেটিই তাহ'লে তার কথা মনে ক'রে রেখেছে—ঠিকানাটাও রেখেছে মনে ক'রে!

কিন্তু লোকটির যেন ধৈর্য মানছিল না। সে বলে উঠল, 'কী হ'ল, এত ভাববার কি আছে? হ্যাঁ কি না—একটা বলে দেবে—তাতে এত সময় লাগে কিসের?'

হঠাৎ যেন রাগ ধরে গেল সুরোর। বলল, 'লাগে বৈকি। যারা কোন কাজ করে না, শুধুই পরের বৈঠকখানায় ইয়ার্কি দিয়ে মোসাহেবী ক'রে দিন কাটায়—যাদের কথার কোন দাম নেই—তারাই চট ক'রে হ্যাঁ না যা হয় একটা বলে দিতে পারে। যারা কাজের লোক, তাদের ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়।'

'ও বাব্বা, এ যে ঝাঁঝ আছে দিব্যি দেখছি!' দাঁত বার ক'রে হাসে লোকটা, 'না, তুমি পারবে। বেশ গলা তোমার, তেজ দেখালে আরও খোলে, চেহারারও বেশ খোলতাই হয়, মাইরি বলছি।...এত তো চরালুম, এমন মাল চট ক'রে মেলে না। মাগীর চোখ আছে—সেটা মানতে হবে।...তা এই তো কাজ, য়্যাকটিং করা হ্যাঁকো-ঢ্যাঁকো এমন কিছু নয়। তা আপত্তি নেই তো তোমার?'

তখনও রাগ সম্পূর্ণ পড়ে নি সুরবালার। সে বলল, 'তা এখন কি ক'রে বলব? কী কাজ, কি করতে হবে, কত মাইনে পাব—কিছুই জানলুম না, চট্ ক'রে বলে দেব আপত্তি নেই?'

'তা অবিশ্যি বটে। মানছি তোমার কথাটা। তবে শোন; করতে হবে নাটকে য়্যাক্‌টিং। কী রকম জানো? ধরো তুমি যেন সীতা সেজেছ, সীতার মুখের কথাগুলো এমনভাবে বলতে হবে যাতে অডিয়েন্স মানে যারা শুনছে, তাদের মনে হয় সাক্ষাৎ মা সীতাদেবীই এসে কথাগুলো বলছেন। চলো; অন্য লোকের য়্যাক্‌টো করা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে। আর, সে আমরাই শিখিয়ে নেব, তার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। একটু বাজাতেই যা আওয়াজ মারল—টং ক'রে উঠল পোড়াহাঁড়ির মতো—তাতেই বুঝেছি তোমার এলেম আছে।...আমি নানু দত্ত, একবার হাঁ করলেই বুঝতে পারি।...আপাতক্ শুধু গান গাইতে হবে,—য়্যাক্‌টিং শিখলে তখন অন্য পার্ট। দ্যাখো, যদি রাজী থাকো তো বলো —বিকেলে গাড়ি আসবে। থিয়েটারের ঝি থাকবে—বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে কথা পাকা ক'রে ফিরে এসো—ঝিই আবার পোঁছে দিয়ে যাবে। মাইনেপত্তর বাবুরাই ঠিক করবেন। জি. সি. ঘোষ আছেন—সে তাঁদের ব্যবস্থা। ওর মধ্যে আমি নেই। তাহলে ঐ কথাই পাকা রইল তো?'

সুরবালার বয়স কম কিন্তু অভিজ্ঞতা কম নয়। সে এই বয়সেই দুনিয়া চিনেছে খানিকটা। চিনতে বাধ্য হয়েছে। সে সন্দিগ্ধস্বরে বলল, 'দাঁড়ান, এসব কথা এত তাড়ায় হয় না। আপনারা গাড়ি পাঠাবেন, সে-গাড়িতে আমি যাব—কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবেন তার ঠিক কি? যদি কোন বদ মতলব থাকে আপনাদের? আপনাকে আমি চিনি না, ঠিক যে থিয়েটার থেকেই এসেছেন—তাই বা জানব কেমন ক'রে? মুখপোড়া রঘুবাবুই যে আপনাকে পাঠায় নি—সে-ই বা কেমন ক'রে জানছি!'

'ও বাব্বা, এ যে বুক্‌ড়ির মধ্যে খাসা চাল দেখছি। তবে তো বসতে হ'ল!'

এতক্ষণে সত্যিই মাদুরের উপর চেপে বসল লোকটি, 'যা ভেবেছিলুম, তার চেয়েও টন্‌কো দেখছি তুমি। দেখে তো মনে হয় সতেরো-আঠারোর বেশী হবে না বয়েস—এধারে কথা তো কইছ পাকা উকিলের মতো, আমাদের তারক পালিত কোথায় লাগে!...এত সব শিখলে কি ক'রে চাঁদু—পুলিসের সঙ্গে ঘর করো নাকি? রঘুবাবুটি আবার কে, কোন্ কাপ্তেন? সেই মতির দালালটা বুঝি? সে বুঝি গাঁথতে এসেছিল তোমাকে?'

তারপর মিনিটখানেক ওর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে শিস দিতে দিতে বলল, 'মরুক গে, আমি যে আসল লোক, জাল নই—অত বোঝাতে আমি চাই না। বুড়োবয়সে তোমার কাছে হলপ করতে কি দিব্যি গালতে পারব না—আর তুমি যে মেয়ে—তাতেও বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। বলি, যদি সন্দ থাকে—গাড়ি তো আসবে, মা কি বাবা—কিম্বা অন্য কোন গার্জেন যদি থাকে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, তাহ'লে তো হবে?'

সুরবালা এবার ঘাড় নাড়ে, হবে। এর চেয়ে আর ভালো প্রস্তাব কি হ'তে পারে। সত্যিই যদি কোন বদ মতলব থাকত, মুজরোর নাম ক'রেও ডাকতে পারত। এ আসল জিনিসই—মায়ের তাড়নায় আপনা থেকে ছুটে এসেছে।

নানু দত্ত উঠে পড়ে এবার। চওড়া পাড়ের চুনট করা কোঁচাটা বার-দুই ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'তুমি বাবা অনেক দূর উঠবে, তা তোমার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। তখন এ-গরীবকে স্মরণ রেখো—আমিই যোগাযোগটা করালুম।'

অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা আর করল না, হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।...

আড়াল থেকে নিস্তারিণী শুনছিল সব, বেরিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁরে, তা থ্যাটারে যাবি কি রে, সেখানে তো শুনেছি নষ্ট মেয়েমানুষরাই যায়।...তাই যদি যাবি, ঐ পথেই পা বাড়াবি—য়্যাদ্দিনে তো ঢের টাকা রোজগার করতে পারতিস!'

'নিজে নষ্ট না হ'লে কেউ কাউকে সহজে নষ্ট করতে পারে না মা।...কীর্ত্তনের লাইনেও তো নষ্ট মেয়েমানুষের অভাব নেই। আর আমাকে নষ্ট করবার জন্যে তুমিও তো কম চেষ্টা করো নি—এখন ভূতের মুখে রাম নাম কেন?'

একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দেয় সুরবালা।

মেয়ের আবার রোজগারের সম্ভাবনায় নিস্তারিণী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, এ-আঘাত সে গায়ে মাখে না। শুধোয়, 'তা কে তোর সঙ্গে যাচ্ছে তাহ'লে?'

'কেউ না গেলেও চলবে। আমি ওকে বাজিয়ে দেখছিলুম। এর আগে মায়ের থানে একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল—লোক পাঠাবার কথাই ছিল।...তবু দেখি বাবা যদি রাজী হন, ওঁকেই নেব।'

নিস্তারিণী আশা করছিল তাকে সঙ্গে নেবার কথাই মেয়ে বলবে। এই সুযোগে দেখে আসবে ব্যাপারটা কি—সেদিক দিয়েই যেতে না দেখে ক্ষুণ্ণ হ'ল একটু। তবু বেশী কিছু বলতেও সাহস করল না আর। 'মেয়ে তো নয়—মানোয়ারী গোরা, মেজাজ সপ্তমে চড়েই আছে একেবারে। মা-ই যেন যত শত্তুর। ওরে, এই শত্তুর না থাকলে য়্যাদ্দিন থাকতিস কোথায়? শ্যাল-কুকুরের পেটে সেঁধিয়ে বসে থাকতে হ'ত। ঐ তো অত সোহাগের বাপ, সে তো নিতে চায় নি—এই শত্তুরই সেদিন তুলে এনেছিল তাই—'

আড়ালে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গজগজ করতে থাকে।

॥ ১১ ॥

ভবতারণ প্রথমটা অবশ্য রাজী হন নি। ধর্মভীরু মানুষ, বিশেষ ইদানীং নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে একটু যেন বেশীই সচেতন হয়েছিলেন। আর কেউ বললে কিছুতেই রাজী হতেন না—নেহাৎ ব্যাপারটার মধ্যে মেয়ের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত আছে বলেই শেষ পর্যন্ত তার পীড়াপীড়িতে রাজী হলেন। সঙ্গে গেলেন বটে কিন্তু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে নীরবে একপাশে বসে রইলেন। মেয়ে ও তার হবু মনিবদের মধ্যে আলোচনায় একটি কথাও কইলেন না।

বসতেও হ'ল অনেকক্ষণ। মনিব যে ঠিক কে তা বোঝা গেল না। একাধিক ব্যক্তি এসে সমবেত হ'তে তবে কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। সবচেয়ে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল কে একজন জি. সি. ঘোষ নামক ব্যক্তির জন্যে। ভদ্রলোক কে এবং কী তাঁর পদ এখানে তা না জানলেও তিনিই যে প্রধান তা বাকি সকলের কথা থেকে টের পেল সুরবালা। তিনিই এ'দের মধ্যে সর্বেসর্বা প্রায়, তিনি অভিনয় শিক্ষা দেন, মূল অভিনেতাও। নাটক নির্বাচন থেকে নট-নটী নির্বাচন—সবেরই চরম আদালত তিনি। তিনি নাটক বা পালা রচনাও করেন প্রয়োজন হ'লেই। আর তাঁর নাটক যেমন জমে, তেমন আর কারও জমে না।...অপেক্ষা করার সময় এক ফাঁকে নানু দত্ত এসে ফিসফিস ক'রে এইসব তথ্য শুনিয়ে গেল।*

* এইখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, এই গ্রন্থের ঘটনা বা পাত্র-পাত্রী সবই কাল্পনিক। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কয়েকটি নাম ও ঘটনা—বা তার আভাস হয়ত প্রসঙ্গত এসে পড়েছে—তবে তারও মূলে আছে প্রধানত কল্পনা ও জনশ্রুতি। সুতরাং এর মধ্যে সন তারিখ ধরে ঘটনার পারম্পর্য হিসেব করতে না বসলে বা জীবনীর পাতা থেকে কোন

সে ভদ্রলোক এলেন রাত দশটা নাগাদ। শালপ্রাংশু মহাভুজ—দীর্ঘকায় পুরুষ। অত্যন্ত রাশভারী, সেই মতোই গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সে-কণ্ঠে মেঘগর্জন স্মরণ করায়, অথচ শুনতে ভাল লাগে। একটু ভুঁড়ি না থাকলে সুপুরুষ বলা চলত, অবশ্য মুখশ্রী যে খুব একটা ভাল তা নয়—একটু ঘাড়ে-গর্দানে ভাব আছে, গজস্কন্ধ যাকে বলে। তবে পুরুষ বটে, পুরুষসিংহ বলা চলে অনায়াসে। শুধু দশাসই চেহারাতেই নয়—চাল-চলনে কথাবার্তায় সর্বদাই সম্ভ্রমের উদ্রেক করে উপস্থিত বাকি মানুষগুলোর মনে।

সুরার গন্ধ অল্পস্বল্প আগেও পাওয়া গিয়েছিল—জি. সি. আসতে সেটা আরও প্রকট হয়ে উঠল। তাই বলে তিনি মাতাল নন আদৌ। স্থির হয়ে বসে শুনলেন সব। তারপর তীক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুরবালার দিকে। মিনিট দুই এমনি নিঃশব্দে চেয়ে থাকার পর পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর গান শুনেছ তোমরা কেউ?' কে যেন উত্তর দিলে, 'না, তবে কীর্তনে বেশ নাম করেছিল এককালে, তা আমরা জানি।' 'বেশ, তাহলে তোমরা কথাবার্তা পাকা ক'রে নাও।' এই বলে উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

কথাবার্তার বিশেষ কিছু ছিল না। আপাতত তাঁরা দশ টাকা মাইনে দিতে চাইছিলেন। সুরবালা এবারে বেঁকে দাঁড়াল। বলল, 'জাতও যাবে, পেটও ভরবে না—তাতে আমার লাভ কি বলুন? আমার বাড়ি ভাড়াটা পর্যন্ত ওতে উঠবে না। অথচ এক জায়গায় বাঁধা নিয়মে খাটতে হবে। সে আমি পারব না।'

মনে হ'ল এঁদেরও কিছু গরজ আছে। তাই কড়া মেজাজ কেউ দেখালেন না, শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, শিক্ষানবিশদের বেশী মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে—দিলে চলেও না। সে তো এখন কিছুই জানে না, তাকে দিয়ে আর কতটুকু কাজ পাওয়া যাবে? সখীর দলে যারা নামে—বেশ কিছুদিন ধরে নাচ শিখেছে যারা—তারাও এর চেয়ে কম পায়। সুরবালা এসব কিছুই জানে না, তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতেও তো বেশ কিছু সময় যাবে। সে এখন এতেই রাজী হোক—পরে বরং তাঁরা বিবেচনা করবেন।

কিন্তু সুরবালার এক কথা, এত অল্পে দাসত্ব করতে রাজী নয় সে। বাঁধা মাইনের কিছু সুবিধা আছে সত্যি, তবে সে মাইনে যদি কোন কাজেই না এল তো তার দাম কি?...অনেক টানাটানি দর কষাকষির পর ষোলটি টাকা মাইনে সাব্যস্ত হ'ল। এঁরা গাড়ি পাঠিয়ে আনবেন—আবার পেঁছে দেবেন। থিয়েটারের সময় হ'ল রাত ন'টায়—শনি ও রবি। আপাতত এই দুদিন আসতে হবে। রবিবারটা হয়ত সাতটায় ক'রে ফেলতে পারবেন—কিন্তু সে পরের কথা। এছাড়া রিহার্সাল বা মহড়া আছে—মানে সেইটেই শিক্ষার সময়, সে দুপুরেও হ'তে পারে, সন্ধ্যাতেও হতে পারে—যেদিন যেমন হবে, বলে দেবেন তাঁরা!...

তবে আপাতত এখনই একটু কাজ দিতে পারবেন ওকে। মানে এইটেই গরজ—এতক্ষণে বুঝল সুরবালা। এখন এক বড় অভিনেত্রী চৈতন্যলীলায় চৈতন্য সাজেন—তিনি গাইতে পারেন না। গানের সময় তিনি গাইবার মতো ক'রে ঠোঁট নেড়ে যান—আর একজন ভেতর থেকে আসল গানটা গায়। তবে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, যে যেমন ভাবেই গাক্ না কেন—তিনি সেইভাবেই হাঁ-করা ঠোঁট-নাড়াগুলো ঠিক ক'রে মানিয়ে নেন, দর্শকরা কেউ বুঝতেই পারে না যে, তিনি গাইছেন না। যে মেয়েটি এতদিন তাঁর হয়ে গান গাইছিল, হঠাৎ সে গায়েব হয়ে গেছে। এসব গান যে গাইতে পারে, ভুনি—সে নিতাই সাজে, তার

ঘটনা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা না করলেই বাধিত হবো। সহৃদয় পাঠকরা মহাজনবাক্য স্মরণ করবেন—"উপন্যাস উপন্যাস মাত্র, ইতিহাস নহে।"

পক্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব সময় গাওয়া সম্ভব নয়। সুরবালাকে দিয়েই সেই কাজটা চালিয়ে নেবেন তাঁরা। তাকে কাল-পরশু দুটো দিনই বিকেলে একবার করে আসতে হবে, অপেরা-মাস্টার সান্যালমশাই তাকে গানগুলো গটিয়ে দেবেন—শনিবার থেকে গাইতে হবে তাকে। এ-কাজটা চালিয়ে নিতে পারলে ওকে নাচ শিখতে দেবেন তাঁরা—শরৎ মুখুজ্যে আছে ড্যান্সিংমাস্টার—সেটা তাঁর জিম্মেদারী। মাস্টার দুজনেই নাকি অদ্বিতীয় —দু-এক মাসেই তৈরী ক'রে ছেড়ে দেবেন।

কাজ ভাল নয়—তার উপযুক্ত তো নয়ই। যে-লোক গান গেয়ে একদিন দেড়শ'-দুশো টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছে, তার পক্ষে এ-চাকরি তো আত্মহত্যারই সামিল। যে-শিক্ষা সে পেয়েছে—অনেক সাধনায় যে-স্তরে উঠেছে, তারপর ঐ গানের মাস্টার আর নাচের মাস্টারের কাছে মাথা নিচু ক'রে শেখা বা সখীর দলে নাচা ধেই ধেই ক'রে—ভাবতেই মাথা কাটা যায়। শশী-বৌদি থিয়েটার দেখেছেন। তাঁর মুখে শুনেছে সে কিছু কিছু —মতির ওখানে থাকতেও শুনেছে অনেক। এরা কম মাইনেতে আসে—তার কারণ এখান থেকে অন্য উপার্জনের রাস্তা পায়। সে উপার্জনে রুচি নেই সুরোর। তাকে ঐ ষোলটি টাকার জন্যেই মাথা বিকিয়ে দিতে হবে—ভাবতেও যেন সারা শরীর রি-রি করে, অপমানে আর ঘেন্নায়।

তবু 'না' বলতেও সাহস হ'ল না একেবারে। হাতে আর কিছুই নেই। এক হার ছড়াটা আছে—তবে সে এখন পরের জিনিস—যতদিন না দেনা শোধ করতে পারছে ও-হারে কোন অধিকার নেই তার। আর আছে দুগাছি ফঙ্গবেনে বালা, তাও খুলে কাচের চুড়ি সার করলে কারও সামনে বেরোতে পারবে না আর। উপোস ক'রে থাকতে আপত্তি নেই, তবে উপোস ক'রে পড়ে থাকারও জায়গাটা চাই। মানে বাড়িভাড়া দেবার সামর্থ্যটা থাকা দরকার অন্তত।

বিষণ্ন মুখেই এসে গাড়িতে চাপে সুরবালা। সামনেই বাবা এসে বসে আছেন কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না কোনমতে। তিনি এতক্ষণের টানা-হেঁচড়া দরকষাকষির মধ্যে একটা কথাও বলেন নি, তবে শুনেছেন সবই। তাঁর মনের অবস্থা সুরবালার অজানা নেই। এখনই, মুখ তুললে হয়ত দেখবে নীরবে নিঃশব্দে জল ঝরে পড়ছে তাঁর চোখ দিয়ে। এ অপমান যে ওর থেকেও ভবতারণের বেশী বাজবে—তা সুর-বালা জানে।

বাড়িতে পেঁাছে নামবার সময় বলেনও তিনি সেই কথাটাই, 'বাপ হয়ে বেঁচে থেকেও তোর এই দুর্দশা চোখে দেখতে হ'ল মা, এ-জন্মেই ধিক। বিয়ে দিলে স্বামীর দায়িত্ব, শ্বশুরের দায়িত্ব ভরণপোষণ করা। তা যতক্ষণ না দিতে পারছি আমারই তো খাওয়ানো-পরানোর কথা। সে জায়গায় আমাকে খাওয়াতে কী দুঃখটা না সইছিস তুই! মরে গেলে শান্তি পেতুম—এসব চোখে দেখতে হ'ত না। তাও তো নিচ্ছেন না মা!'

গান শেখাতে গিয়ে সান্যালমশাই চমকে উঠলেন। একবার মাত্র শুনে নিয়েই যখন প্রায় নির্ভুলভাবে পাল্‌টা গেয়ে শোনাল সুরবালা, তখন তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। বললেন, 'তোমাকে আমি কী শেখাব মা, তুমিই আমাকে শেখাতে পারো। এমন আশ্চর্য কান তোমার, এমন আশ্চর্য গলা—তুমি এলে এই আস্তাকুঁড়ে পাছা নাচাতে! অদৃষ্ট আর কাকে বলে!'...

শনিবার প্রথম পরীক্ষা তার। উইংস-এর আড়াল থেকে গাইতে গিয়ে প্রথমটা যে ভয়-ভয় একটু না করেছিল তা নয়—কিন্তু তারপরই নিজের পূর্ব-গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে আর সান্যালমশাইয়ের কথাটা মনে পড়ে মনে জোর পেল খানিকটা। ভালই গাইল মনে হ'ল। প্রথম অঙ্ক শেষ হতে কর্তাব্যক্তিস্থানীয় দু-একজন এসে বাহবাও দিয়ে গেলেন।

সবাইকে চেনে না এখনও, কে বা কারা মালিক কি কর্তা তাও জানে না, ভাবে ভঙ্গীতে বা প্রতিপত্তি দেখে অনুমান করল এঁরা কর্তাস্থানীয় লোক। ফলে পরের অংকগুলোয় বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই গাইল সে। উতরেও গেল ভাল। দর্শকদের মধ্যে থেকে 'এন্‌কোর' 'এন্‌কোর' আওয়াজ উঠল একাধিক বার। এটা কি ব্যাপার তা তাকে আগে কেউ বলে দেয় নি। ও যে এত নতুন তা অনেকে বুঝতেও পারে নি বোধ হয়। ভাগ্যে নানু এসে ঠিক শুরুর আগে বলে সাবধান ক'রে দিয়ে গিয়েছিল যে, একটু হুঁশিয়ার হয়ে থেকো, এন্‌কোর এন্‌কোর আওয়াজ উঠলেই আবার অন্তরা থেকে শুরু করবে সেই গানই, এই নিয়ম। এন্‌কোর মানেই তাই—আবার ফিরে গাইতে বলা। তুমি না ধরলে চৈতন্য অপ্রস্তুতে পড়বে।

অবশ্য অপ্রস্তুতে একবার পড়তে হ'ল চৈতন্যকে। অভিনয় করতে করতে এমনই আত্মহারা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, এদিকের 'এন্‌কোর' চিৎকার কানে যায় নি, ওদিকে সুরো নিয়মমতো ফিরে শুরু করতে হুঁশ হ'ল বটে—তবে বেশ কয়েক মুহূর্ত লাগল ঠোঁট নাড়া শুরু করতে। সত্যিই ভাল অভিনয় করলেন তিনি। এর আগে সুরবালা কখনও এসব দেখে নি, সে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে গাইবে কি বার বার তার চোখে জল এসে পড়তে লাগল। পরবর্তীকালে ঐ নানুর মুখেই শুনেছিল যে, পরমহংসদেব বলে এক মহাসাধক এই পালা দেখতে এসে সত্যিকারের চৈতন্য ভেবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন এঁকে।...

বই শেষ হ'তে বাড়ি যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে—কে একজন এসে বলল, 'জি. সি. ডাকছেন তোমাকে, দেখা ক'রে এসো।'

বুকটা একটু কেঁপেই উঠল। জি. সি, মানে তো সেই মানুষটি! এই বইতে অভিনয় করতে নেমে কী বেলেল্লাগিরিটাই না করলেন—কিন্তু সে তো অভিনয়। তাও যখন সংশোধিত চরিত্র দেখাবার কথা এল—তখন সেই স্ব-রূপ। আসল মানুষটা যে বিষম রাশভারী আর তিনিই যে সর্বময় কর্তা, তা এই ক'দিনেই টের পেয়েছে ও। তবে কি ওর গান গাওয়া তাঁর পছন্দ হয় নি?...বেশ একটু দুরু-দুরু বুকেই গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে।

জি. সি. একটা চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বসে ছিলেন—গালে হাত দিয়ে। আশপাশে আরও তিন-চারটি মেয়ে-পুরুষ। সুরবালা গিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বেশ গেয়েছ বাবা, খুব ভাল হয়েছে তোমার গান। সত্যিই তোমার শিক্ষা ভাল, বলিহারী দিই তোমার ওস্তাদকে। তবে শিক্ষাই সব নয়, তোমার ভেতরেও জিনিস আছে।...তুমি বাবা মিছেই এ-লাইনে এসেছ, এখানে তুমি থাকতে পারবে না। তবে ভেবো না—তোমার ওপর ঠাকুরের কৃপা আছে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর কাছেই গিয়ে পেঁছবে একদিন।'

কথাগুলো ভাল লাগল সুরবালার। ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে গোড়াতে এসে হাত তুলে নমস্কার করেছিল শুধু—এবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

আশার কথা যতই যা শুনুক—ঠাকুরের কৃপা কোথাও চোখে দেখতে পায় না সুরবালা। দিন সপ্তাহ মাস পার হয়ে যায়—অন্য কোন সুরাহা হয় না। ভাগ্যে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই দেখতে পায় না। অথচ এ সংসর্গ এ কাজ একেবারেই ভাল লাগে না ওর। তাও, পেটে খেলে পিঠে সইত—পেটেও খেতে পাচ্ছে না। মাইনে তো মাত্র ষোলটি টাকা, সেটাও একেবারে পাওয়া যায় না। মাসকাবার হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে শুনল এখানে তাগাদা না দিলে মাইনে পাওয়া যাবে না। কদিন তাগাদা ক'রে পেল দশটি টাকা, বাকী ছ' টাকার চার টাকা আদায় হ'ল পরের মাস পার হয়ে যাওয়ার পরে।

এরপর শুরু হ'ল দু' টাকা তিন টাকা করে খরচা দেওয়া। 'আজকের মতো এইতেই কাজ চালিয়ে নাও। দেখছ তো দেড়শ-দুশো টাকা বিক্রি—কাকে কি দেব বলো?' পর পর দু'তিন দিন তাগাদা করার পর সামান্য কিছু হাতে দিয়ে ক্যাশিয়ারবাবু প্রায় প্রত্যহই এই বাঁধা গৎটি ছাড়তেন। ফলে প্রতি মাসেই কিছু কিছু বকেয়া জমতে লাগল। শেষে হিসেবটাই গুলিয়ে গেল সুরোর—ঠিক কতটা যে পাওনা সে তার মনেই রইল না।

আরও মুশকিল হয়েছে এই—একথা কাউকে বলাও যায় না। নিস্তারিণী এমনিতেই ঠেস দিয়ে দিয়ে অনেক কথা শোনায়, ভাবে মেয়ে ইচ্ছে ক'রে সব টাকাটা দিচ্ছে না, অন্য কোথাও জমাচ্ছে। আবার আসল কথাটা ভেঙে বললে টিটকিরি দেবে। যাদের বলা চলত—সেই চারুবাবু কি শশীবৌদির কাছে আর দুঃখের কান্না কাঁদতে সাহস হয় না। তাঁদের অবস্থা তো চোখেই দেখছে। ভদ্রলোকেরা একবেলা খেয়ে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করছেন বলতে গেলে। রাত্রে শুধু ছেলেমেয়ের জন্যে সকালের ভাত দুটি জল দেওয়া থাকে—স্বামী-স্ত্রীর একটুখানি ছাতু, বাঁধা বরাদ্দ। জলে গুলে নুন দিয়ে তাই খান হাসিমুখে। 'এতে যে শুধু চাল-ডালের খরচা বাঁচে তাই নয়—উনুন ধরাতে হয় না, সে খরচ কি কম? রান্নার মেহনৎ নেই। আর পোষ্টাই কত!' চারুবাবু মিষ্টি ভালবাসেন, ঐ ছাতুই গুড় দিয়ে মেখে খেলে অনেক ভাল লাগত, সেটুকুও অকারণ খরচ করবার সাহস নেই আর!

ওঁদের কাছে অবস্থাটা বললে এখনও হয়ত এটা-ওটা দিয়ে সাহায্য করতে আসবেন, হয়ত বা দু'একটা টাকাই দেবেন—কিন্তু সব জেনেশুনে হাত পেতে সে সাহায্য নিতে রাজী নয় সুরো। এমনিতেই তো সেই চল্লিশটা টাকা শোধ করতে পারছে না বলে মরমে মরে আছে। এ সময়ে চল্লিশ টাকা ওঁদের চারশ টাকার কাজ দিত। কী ভাবছেন কে জানে! হয়ত ভাবছেন—চাকরি করছে রোজগার করছে তবুও এক পয়সা দেনা শোধ করছে না, মেয়েটা আসলে জোচ্চোর, দেবার মতলব নেই। সেইটে আরও লজ্জার ব্যাপার হয়ে আছে। অথচ আসল কারণটাও খুলে বলতে পারে না—ওঁদের অধিকতর বিপন্ন করার বা নিজে অধিকতর লজ্জিত হওয়ার ভয়ে।

তাও, এত কাণ্ড ক'রেও যদি মেয়েটা সুখী হ'ত—তাহ'লেও কিছু বলবার ছিল না। বিয়েটা নাকি আদৌ ভাল হয় নি শ্রীলেখার। বড়লোকের বাড়ি কিন্তু বৌদের না আছে খাবার সুখ না আছে শাড়ি-গয়না কিছু পরার স্বাধীনতা। যে জড়োয়া গয়না পরিয়ে ওঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন সে মোটে ঐ একটি সেটই—সব নতুন বৌয়ের সময়ই লোক দেখিয়ে পরিয়ে আনা হয়—যেন তাকে দেওয়া হ'ল। আট দিন পরই আবার তা গিন্নীর সিন্দুকে ফিরে যায়। সোনার গয়না অবশ্য, এক প্রস্থ কেন, বেশীর ভাগ দু-তিন প্রস্থ ক'রেও আছে—মানে মেয়ের বাপ-রা যা দিয়েছেন, তা ছাড়াও এ'রা দিয়েছেন পুরো এক সেট—যৌতুক পাওয়া গয়নাও কম নয় কারুর—কিন্তু সে সবই থাকে শাশুড়ির জিম্মায়। কোন বিয়ে-থা ক্রিয়া-কর্ম, উপলক্ষে অপর বাড়ি যেতে হ'লে তিনিই বার ক'রে দেন—দামী শাড়ি বা গয়না, কে কোন্‌টা পরবে বলে দেন, ফিরে এসে আবার প্রত্যেকটি বুঝিয়ে দিতে হয় তাঁকে। বারোমাস পরার জন্যে সাধারণ তাঁতের শাড়ি নির্দিষ্ট আছে—বছরে চারখানা, কেউ আগে ছিঁড়ে ফেললে তাকে সেই ছেঁড়া কাপড়ই সেলাই ক'রে চালাতে হয়। যদি কোন কোন দিন এমন কুটুম-সাক্ষেৎ কেউ আসেন যাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসতে হয়—ঝি এসে আগে জানিয়ে যায় ঘরে ঘরে—তখন চট ক'রে কাপড় পাল্‌টে নিতে হয় সবাইকে। সেই বিশেষ প্রয়োজনে পরবার জন্যে একখানা ক'রে ভাল তাঁতের শাড়ি দেওয়া থাকে সব ঘরেই। মাঝে মাঝে শাশুড়িকে দেখিয়ে পাল্‌টা-পাল্‌টি ক'রে নেওয়া হয়—অর্থাৎ এরটা যায় ওঘরে—ওরটা আসে এঘরে। পাছে কোন কুটুম্বিনী কোন দিন লক্ষ্য করেন কোন বৌ এক কাপড় পরেই বার বার তাঁর সামনে আসছে—তাই এই ব্যবস্থা।

অবশ্য একটা ব্যাপারে শ্রীলেখার শাশুড়ি খুব উদার—এ ব্যবস্থা সব বৌদের জন্যেই। এ বাড়িতে মেয়ে পোষার রেওয়াজ আছে, তাই ছেলের বৌ ছাড়াও ভাগ্নে-বৌ নাত-বৌয়ের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু কোন বৌকে কোন পক্ষপাত করেন—এ অপবাদ তাঁকে কোন শত্রুও দিতে পারবে না।

এ সবেও তত দুঃখ ছিল না। এমন কিছু ভাল খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত নয় শ্রীলেখা যে, তা না পেলে কষ্ট হবে। যা খাওয়া, সেটাও যদি পেট পুরে খেতে পেত—তাহলেও বেঁচে যেত। খাওয়া দেন শাশুড়ি মেপে, মাপের বাটি ঠিক করাই আছে—বৌদের পেটে চর্বি জমে যাবে বলে পেটভরে খেতে দেন না তিনি, যদিও তাঁর নিজের দেহ বিশাল, সেই মাপে খোরাকও। আসলে তিনি বড়লোকের মেয়ে, তাঁর বাবা নেই কিন্তু ভাইরা আজও মোটা মাসোহারা দেয়, সে টাকার অনেকখানিই এই সংসারে ব্যয় করতে হয় তাঁকে —স্বামী ও ছেলেরা তাই সর্বদা হাতজোড় ক'রে থাকে তাঁর ভয়ে—সবরকম দাপটই মুখ বুজে সহ্য করে। কোন অন্যায় হচ্ছে জানলেও কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না।

শাশুড়িটি দজ্জাল শুধু নন, রীতিমতো বৌ-কাঁটকি। শুধু রসনা নয়—হাতও বেশ চলে তাঁর। বরং বলা উচিত—হাত-পা। এর মধ্যেই, বিয়ের দুমাস না যেতে যেতে—কোন্ বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় গাড়ির মধ্যে একটা মার্কাড়ি ফেলে নেমে এসেছিল বলে—তাও নিজেদের গাড়ি এবং সে মার্কাড়ি পাওয়াও গিয়েছিল—নির্মমভাবে প্রহার করেছিলেন শাশুড়ি। অবশ্য ইজ্জতের জ্ঞান তাঁর খুব, পাছে ঝি-চাকর কি অন্য সরিকেরা কেউ জানতে পারে—এই জন্যে যখনই কোন বৌকে শাসন করেন ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে দেন। মারেনও নাকি এমন কৌশলে—মুখে বা হাতে অর্থাৎ যে অঙ্গগুলো অনাবৃত থাকে —কোন দাগ পড়ে না।

তবে ঝি-চাকরদের জানতে কিছুই বাকী থাকে না, বস্তুত শশী-বৌদি এক ঝিয়ের কাছ থেকেই এসব খবর সংগ্রহ করেছেন। মনিবের নিন্দা প্রচারে ওদের স্বাভাবিক তৃপ্তি, সেই কারণেই এ পাড়ায় নিজের কুটুম আছে—তার সঙ্গে দেখা করতে আসার অছিলায় খুঁজে খুঁজে এ'দের বাড়ি এসেছিল সে। তাকে 'বাপু বাছা' ক'রে—কুটুমের মতোই আসন পেতে বসিয়ে জলখাবার খাইয়ে একে একে সব খবর বার করেছিলেন। তারপর থেকে সে নিয়মিতই আসে এবং মনিবের খিটকেল ক'রে যায়। শ্রুতিসুখকর কিছু নয়— প্রত্যেকটি সংবাদই বুকের অনেকখানি ক'রে দলে পিষে দিয়ে যায়—তবু না শুনেও পারেন না শশী-বৌদি। দুঃসংবাদও সংবাদ। কিছু না পাওয়ার চেয়ে একটু পাওয়া ভাল।

এছাড়া খবর পাওয়ার উপায় নেই। কারণ, সম্ভবত ঘরের কুচ্ছো বাইরে প্রচার হওয়ার ভয়েই বৌদের বাপের বাড়ি পাঠান না শ্রীলেখার শাশুড়ি। কদাচ কখনও, বৌদের বাপ-মা খুব কাকুতি-মিনতি করলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে পাঠান—তাও সঙ্গে ঝি দিয়ে। ঝিকে বলা থাকে, কোনক্রমেই যেন চোখ-ছাড়া না করে বৌকে বা শ্রুতিসীমার বাইরে না যেতে দেয়—'লাগাতে ভাঙ্গাতে না পারে।' বৌদেরও প্রায় শিক্ষা দেন ছড়া কাটিয়ে, 'আহাম্মুক নম্বর চার, ঘরের কথা করে বার। এ ঘর এখন তোমাদের ঘর, আকাশের গায়ে থুথু ফেললে নিজের গায়েই এসে লাগবে—এখানের নিন্দেয় তোমাদের অপমান বই মান বাড়বে না।'

আরও বলেন, 'বড় ঘরের বৌদের বাপের বাড়ি যেতে নেই। সেকালে রামায়ণ মহাভারত কি রাজারাজড়াদের জীবনী পড়ে দ্যাখো—মেয়েরা সাত-আট বছর বয়সের সময় যে হয়ে যে বাপের বাড়ি ছাড়ত—জীবনে আর ওমুখো হ'ত না। যত দুঃখুই পাক, বনে থাকত সেও ভি আচ্ছা, তবু সুখভোগ করতে বাপের বাড়ি যেত না। এই তো পুঁটের রাণী— স্বামী নেই, পুত্তুর নেই, মাথার ওপর কেউ নেই—সংসারে সব্বময়ী, শুনেছি বাপ মরেছে শুনে যেতে চেয়েছিলেন, পালকি প্রস্তুত উঠতে যাবেন, বুড়ো দাওয়ান—দাওয়ানই হোক

আর যা-ই হোক, তাঁরই নফর বই তো কেউ নয়—এসে মাথা চুলকে বললে, আপনি মালিক যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু এ বংশের বৌদের বাপের বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ নেই। শোনা মাত্তর যাওয়া বন্ধ করলেন রাণী। এ তো মান্ধাতার আমলের কথা নয় বাছা, এ আমলেরই কথা!'

সবচেয়ে বেশী দুঃখ শশী-বৌদির জামাইটার জন্যেই। সেও যদি মানুষ হ'ত! বড় বড় বাড়িতে যেমন চরিত্রদোষ থাকে, ষোল বছর হতে না হতেই বাজারের দিকে হাত বাড়ায়-- এর তা নেই। তেমনি কোন সদ্‌গুণও নেই। দিনরাত শুধু ঘুড়ি আর পায়রা ওড়াতেই ব্যস্ত। বলতে নেই, এর মধ্যেই শ্রীলেখা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও না আনন্দ না দুশ্চিন্তা—কোন সচেতনতাই নেই। নিজেই এখনও নিজেকে খোকা মনে করে। পান খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই দাঁত কালো ক'রে ফেলেছে—পেলে তামাকও খায়—আর সবচেয়ে বড় নেশা ঐ ঘুড়ি ও পায়রা। পয়সার জন্যে মায়ের হাতে পায়ে ধরে, মা গাল দিলে বা ধিক্কার দিলে হাসে শুধু হি-হি ক'রে। অথচ বড়লোকের বাড়ি বলেই যে এমন তাও তো নয়। ওর ওপরেই যে ভাই, সে এর মধ্যেই চোগাচাপকান পরে কোন্ বিলিতি হৌসে বেরোচ্ছে, রীতিমতো রোজগার শুরু করেছে। জামাইয়ের পরের ভাইটাও, রোজগার না করুক—কীই বা বয়স তার—কোন বদখেয়ালও নেই। সে একটি পয়সা খরচ করে না। হাতখরচের টাকা আর এদিক ওদিক থেকে যা পায় —জমিয়ে এর মধ্যে নাকি কোন্ কোম্পানীর কী একখানা শেয়ার না কি কিনেছে—তাতে বছর সালিয়ানা বাঁধা আয় হয়। যতই কম হোক—আয় তো! ও ছেলে আরও জমাবে—এই তো সবে শুরু। এখনও আঠারো বছরও বয়স হয় নি বোধ হয়। শশীবৌদির কপালেই এই অপদার্থ অকর্মণ্যটি বর্সোছিল. আশ্চর্য!

অবশ্য এতেও তাঁর কোন নালিশ নেই। কাঁদেন কিন্তু অনুযোগ ক'রেন না, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন না। সে দেয় বরং সুরবালাই। বলে, 'বৌদি. তোমরা তো এত ভাল—তোমাদের কী সুখটা হচ্ছে! তুমি যে কেবল উঠতে বসতে সৎপথে থাকার কথা বলো—সৎপথে থাকার কি এই পুরস্কার? ঐ তো থিয়েটারেও দেখি—দশ টাকা মাইনের এক একটা সখী যে গয়না গায়ে দিয়ে আসে তার দামে এখনও কলকেতায় একখানা ছোটখাটো বাড়ি কেনা যায়। আর আমার দুর্দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। বদনামকে বদনাম হ'ল, যা হবার— আর কি কোনদিন কোন ভদ্রলোক গেরস্তের বাড়ি ডেকে কথা কইবে ভাবো? অথচ বাড়ি-ভাড়ার কটা টাকাও সব মাসে ঘরে তুলতে পারি না। তোমাদের এই দুঃসময়, অথচ তোমাদের পাওনা টাকা পড়ে রয়েছে আমার কাছে—মাসে একটা ক'রে টাকা তাও দিতে পারছি না!'

শশীবৌদি ওর মুখে হাত চাপা দেন. 'ও হরি! পুরস্কারের জন্যে সৎপথে থাকবি তুই! সৎপথে থাকলে যদি পুরস্কার মেলা অবধারিত হ'ত. তা'হলে তো ভাবনাই ছিল না, সবাই তো সৎপথে থাকত রে! তা'হলে সংসারে কেউই অসৎ পথে যেত না।...সৎপথে থাকার পুরস্কার আলাদা—সেটা আসে ভেতর থেকে। শান্তিই সেই পুরস্কার। অসৎপথে ঢের রোজগার হ'তে পারে—মনে সুখশান্তি থাকে কি?'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'আর ঐ যে সখীদের কথা বলছিস—ওরা যে সবাই অসৎ তা তোকে কে বললে? ওরা ওই ঘরে জন্মেছে—ওই ওদের বৃত্তি। অন্য কী কাজ করবে বল? স্বধর্মে নিধন হওয়াও শ্রেয়—শাস্তরে নাকি বলেছে—তা ও-ই ওদের স্বধর্ম—নয় কি? বাঘ যে অন্য প্রাণী ধরে খায়—মানুষ ধরে খায়—তার তাতে পাপ কি? ভগবান তার ঐ খোরাক নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, সে কি ঘাস খেতে পারে? বেশ্যাবৃত্তিতে দোষ নেই—স্বর্গেও তো বেশ্যা আছে—তা নয়, ঐ মেয়েটা যদি একজনের কাছ থেকে টাকা

খেয়ে অন্নদাতাকে লুকিয়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করে—সেইটেই হবে ওর পাপ। দ্রৌপদীর পতন হ'ল পাঁচ জনের সঙ্গে ঘর করার জন্যে নয়—তাঁর সকলকে সমান চোখে দেখবার কথা, তা তিনি দেখতে পারেন নি, অর্জুনকেই বেশী ভালবাসতেন. সেই জন্যেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া হ'ল না।'

মেয়ের কথা উঠলে বলেন, 'বিয়েটা কি জানিস সুরো, একেবারে ভবিতব্য। ঢের দেখলুম এই বয়সে, যতই দেখে-শুনে দাও, যার যা অদেষ্টে আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারে না। সীতা বল, দ্রৌপদী বল, দময়ন্তী বল—কেউ কি আর অসৎ পাত্রে পড়েছিল? অদেষ্টের দোষে গ্রহের কোপে সবাইকেই বনবাসে গিয়ে অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হ'ল। ও নিয়ে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। খুকীর শাশুড়ি বৌদের সঙ্গে ঐ ব্যাভারই শিখেছে, কে জানে হয়ত ওরও ঐরকম দজ্জাল শাশুড়ি ছিল। আমার মেয়েও এককালে শাশুড়ি হবে, তখন কি আর আজকের এই নিজের দুঃখুর কথা মনে ক'রে তার বৌদের সঙ্গে ভাল ব্যাভার করবে? মনে তো হয় না। তখন সেও হয়ত এর শোধ তুলবে নিজের বৌদের ঠেঙিয়ে, আজকের ঝাল মেটাবে।...না, দোষ আমি কাউকে দিই না, গেল জন্মে যা ক'রে এসেছি এ জন্মে তারই দেনা শুধছি। বরং মনকে বোঝাই—ঈশ্বরের দয়া, আরও খারাপ পাত্তরে পড়ে নি। আমাদের চেনা এক ডাক্তার, শান্তি-ডাক্তার—নিজের চেষ্টায় কর সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে ডাক্তারি শিখে—আগে বাংলায় পড়েছিল, তারপর রোজগার করতে শুরু ক'রে মাস্টার রেখে ইংরিজী শিখে মোটা মোটা বই পড়ে ভাল ডাক্তার হয়েছে। সে মেয়ের বে দিলে রাজারাজড়ার মতো, বোধহয় অমন বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচা ক'রে, মেয়ে-জামাইকে দুখানা গাড়ি, দুজোড়া ঘোড়া, একখানা পাল্‌কি গাড়ি, আর একটা মেয়ের জন্যে কৌটো-মতো—আরও কত কি দিয়েছে, কী, না ছেলে লেখাপড়া জানে—রেলির বাড়ির কেশিয়ার। ওমা, বের পরে দেখা গেল জামাই ক-অক্ষর গোমাংস, একেবারে আকাট মুখ্যু, তায় মাতাল—চাকরি-বাকরি কিচ্ছু করে না। চালচুলোও কিছু নেই—মা-মাগী মহা জোচ্চোর, সে-ই দালাল লাগিয়ে বড় ভাড়াবাড়ি নিজের বলে দেখিয়ে এই কাজ করেছে সব বেচে খাবে বলে! সেই মেয়েকে নিয়ে বুকের ওপর বসিয়ে রাখতে হয়েছে, দুবেলা চোখের জলে ভাত মেখে খেতে হচ্ছে মেয়ের মাকে। খুকীর বর আর কিছু না হোক, মাতাল, গেঁজেল কি রাঁড়-খোর তো নয়। যা করে বাড়িতে বসেই করে—এইটুকুই লাভ।'

॥ ১২ ॥

শশীবৌদি যত বড় বড় আর ভাল ভাল কথাই বলুন—সুরবালা সত্যিকারের কোন সান্ত্বনা পায় না মনে। সে নিজে যেন কোনদিকেই কোন আলো দেখতে পায় না। যেদিকে চায় অকূল অতন্দ্র অন্ধকার। হতাশ হয়ে এক-একবার ভাবে, শেষ পর্যন্ত রঘুবাবুকেই খবর পাঠাবে নাকি, তার সঙ্গেই মিটমাট ক'রে নেবে? আবার লোকটার কথা—তার আকৃতি আর প্রকৃতি মনে হ'লে শিউরে ওঠে মনে মনে, ঐ লোকটার ক্লেদাক্ত বিষাক্ত আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দেওয়া—মায়ের দেওয়া এই দেহ ঐ কৃমিকীটটাকে উৎসর্গ করা! তার

চেয়ে গঙ্গার জল ঢের ভাল।

আসলে তার এই বর্তমান কর্মস্থান ভাল লাগে না বলেই এত অসহ্য বোধ হয়। প্রতিটি মুহূর্ত—যেটুকু সময় সেখানে থাকতে হয়—যেন একটা অপমানের জ্বালা ভোগ করে সে।

মতির কাছে যখন শিক্ষানবিশ ছিল, তারও মন যুগিয়ে চলতে হ'ত, গালমন্দ বকুনিও ঢের খেয়েছে—তবু তাতে এরকম অপমান বোধ হয়নি ওর। কে জানে কেন, এখানে প্রতিনিয়তই তার মনে হয় সে এদের চেয়ে অনেক বড়, এদের মধ্যে এসে শিক্ষানবিশি করা তার সাজে না। এর মধ্যে একটা বইতে ছোটখাটো একটা পার্টও পেয়েছে—খুব খারাপও করে নি অভিনয়—অন্য কোন মেয়ে হ'লে সেই নজীর দেখিয়ে বড় পার্ট দাবী করত, আদায়ও ক'রে নিত ঝগড়াঝাঁটি ক'রে—কিন্তু সুরবালা সেদিকে কোন উৎসাহই বোধ করে না। যা করতে বলেন এ'রা, তার বেশী কিছু করতে চায় না। এগিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই করে না। কোনমতে—দিনগত-পাপক্ষয় ক'রে যায় মাত্র।

অবশ্য চেষ্টা করলেও যে এমন কিছু সুফল হ'ত—তা মনে হয় না।

এ এক বিচিত্র জগৎ, এখানে উন্নতি আসে এক বিশেষ পথ ধরে।

গুণের সম্মান নেই তা নয়—কিন্তু তার চেয়েও সমাদর রূপ-যৌবনের। যে-শক্তি, যে-প্রতিভা সুপ্রত্যক্ষ, যা সূর্যোদয়ের মতো উজ্জ্বল এবং অনস্বীকার্য—সে-শক্তিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না বটে—তবে তাকেও বহু লড়াই করতে হয়। সহজে সে পথ পায় না। এখানে মনিব বা কর্তাশ্রেণীর লোকদের কে প্রিয় হ'তে পারবে, রক্ষিতা কি প্রেয়সী হ'তে পারবে—তা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে গোপন রেষারেষি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নেই। সে লক্ষ্যস্থল হিসেবে স্বয়ং জি-সিও বাদ যান না। শুনল, এইমাত্র কিছু দিন আগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে, প্রমদা বলে একটি বড় নামকরা অভিনেত্রী—এক নবাগতা সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের দিকে জি-সির পক্ষপাত লক্ষ্য ক'রে বা অনুমান ক'রে—জি-সিকে কিছু বলতে সাহস হয় নি—তুচ্ছ একটা ছুতোয় ঝগড়া বাধিয়ে সেই নতুন মেয়েটিকে জুতো ছুঁড়ে মেরে বেরিয়ে গেছে থিয়েটার থেকে, আর আসে নি। এখন আর সে থিয়েটারও করে না—বাংলাদেশের এক রাজা খেতাবধারী বড় জমিদারের রক্ষিতারূপে তাঁদের দেশে গিয়ে প্রকাশ্যে রাণীর মতোই বাস করছে। জমিদারটি এত মোটা যে তাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিতে দু-তিনজন চাকর লাগে। তা হোক—শাড়ি-গয়নার দুঃখ নেই। বাড়ি-ঘর কোম্পানীর কাগজ হয়েছে—তাতেই সে খুশী। এমন সু-পরিণাম নাকি অনেকেরই হয়েছে আজ পর্যন্ত। আসলে অনেক মেয়ের কাছেই থিয়েটারটা হ'ল ধনী 'বাবু' ধরবার জায়গা।

প্রমদা তা নয় অবশ্য, তার শক্তি ছিল। ছিল বলেই বোধহয় অধিকতর শক্তির অভ্যুত্থান সহ্য করতে পারল না। নবীন তারকাটির যারা গ্রহ-উপগ্রহ, তারা অবশ্য বলে—জি-সির পক্ষপাত নয়, নিজের অক্ষমতাই প্রমদার পতনের কারণ। কী একটা বইতে—বোধ হয় 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকটার নাম—রিহার্স্যালের সময় ওর পার্ট জি-সি যেমন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, কিছুতেই তেমন তুলতে পারছিল না ও। বিরক্ত হয়ে ঐ নতুন মেয়েটি এক-পাশে বসে একাগ্র হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে লক্ষ্য ক'রে—জি-সি তাকে ডেকে বলে-ছিলেন, 'এই, তুই বল্ তো এইখানটা কেমন বলতে পারিস দেখি!' তাতে সে-মেয়েটি উঠে, উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ক'রে একেবারে হুবহু জি-সি যেমন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন —সেই ভাবে বলেছে, বরং কোন কোন জায়গায় আরও ভাল। সে-কথা অবশ্য সবাই স্বীকার করে—শুধু গ্রহ-উপগ্রহরাই নয়—এমন কি নানু, যে এখানের সব কথা নিয়েই ব্যঙ্গ করে—সেও।

ফলে জি-সি সেই নতুন মেয়েটিকেই সেই পার্ট পুরোপুরি রিহার্স্যাল দেওয়াতে থাকেন। আর সেই কারণেই এই বিপত্তি। 'নাদাপেটা হাঁদারাম বুড়োর মন ভুলিয়ে বড়

পার্ট আদায় করেছিস' বলে ধিক্কার দিয়েছিল প্রমদা। নতুন মেয়েটি শক্তিশালিনী হ'লেও খোলার ঘরের মেয়ে, সেও ছেড়ে কথা কয় নি। অভ্যস্ত গালিগালাজের মালা গে'থে গেছে সঙ্গে সঙ্গে—শেষ পর্যন্ত সে-বিবাদের উপসংহার হয়েছে ঐ জুতো-ছোঁড়া-ছুঁড়িতে।

এই মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছে সুরবালা। পরবর্তী কালেও খবর রেখেছে। তার অভ্যুত্থান লক্ষ্য করার মতোই। পাঁচ টাকা মাইনেতে ঢুকেছিল, অনুবাদ-করা বড় একটা বিলিতী নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় ক'রে যখন বিলেতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের বাহবা পেয়েছে—তাঁরা প্রচুর মাইনে দিয়ে বিলেতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন—তখনও তার মাইনে পঁচিশ টাকার বেশী নয়। আর অন্যদিকে উন্নতির তো কথাই নেই—সেও উল্কার মতো। বিখ্যাত দ্বারিক ঠাকুরের বংশের এক নাতি, উচ্চশিক্ষিত পাক্কা সাহেব একজন—ধনী সুপুরুষ—তাকে রক্ষিতা রেখেছিলেন আমরণ। মেয়েটি আদৌ একনিষ্ঠা নয়, এ সৌভাগ্যের মূল্য সম্বন্ধেও তার কোন সচেতনতা নেই। ভদ্রলোকও তা জানতেন, সে যে প্রায় প্রকাশ্যেই আরও বহু মধুকরকে মধু বিতরণ করে—তা জেনেও কখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। কোন হিতাকাঙ্ক্ষী সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে বলতেন, 'আরে মশাই, নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীর চরিত্রই লোকে পাহারা দিতে পারে না—এ তো বাজারের মেয়েমানুষ।' 'তবে মাইনে দিয়ে পুষছেন কেন?' এ-প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিতেন, 'আমার দরকারের সময় পাবো বলে। আমার সময়টুকু না কাটিয়ে সে কোথাও যাবে না বা অন্য কাউকে ঘরে আসতে দেবে না। আমি ওকে বাঁধা রাখি নি—ওর খানিকটা সময় বাঁধা রেখেছি—এই মনে করলেই আর কোন অসুবিধা হবে না।'

মেয়েটি ফরসা নয় বরং রীতিমতো ময়লাই। শিক্ষিত তো নয়ই—বর্ণপরিচয় পর্যন্ত হয় নি দীর্ঘকাল। অথচ এমনই আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল তার যে, শুধু এই ভদ্রলোকই নন—বহু সম্ভ্রান্ত লোকই তার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতেন। বড় বড় বিখ্যাত উকিল ব্যারিস্টারের মাইফেল অচল হয়ে যেত—এই অশিক্ষিতা মেয়েটি না গেলে। খুব শিক্ষিত এক ব্যারিস্টার, যিনি ঘরেও ইংরেজী ছাড়া কথা বলেন না, তিনিও এই মেয়েটি ছাড়া মাইফেলের আয়োজন করতেন না। এর বিস্ময়কর স্নিগ্ধ রূপজ্যোতিতে (রঙ ছাড়া অবশ্য চেহারাটা দেখবার মতোই) এবং উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে বহু পতঙ্গই ঝাঁপিয়ে পড়ত—নিরাশ হ'ত না প্রায় কেউই। পরবর্তীকালে এই গোপন অভিসারীদের দলে নাকি স্বয়ং জি-সিও যোগ দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই নাকি তার এই উন্নতি। শিখিয়ে বড় বড় পার্ট দিয়ে তার জন্যে বিশেষ নাটক রচনা ক'রে তাকে অমর ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিভা ছাড়া এ-আকর্ষণের আর কি কারণ থাকতে পারে, তা ভেবে পায়নি সুরবালা। বৃন্দাবনের সেই প্রায়ান্ধকার বারান্দায় বসে জীবনের প্রায় অন্তিম মুহূর্তেও সেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে গেছে সে। সেই সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান থেকে একটা সিদ্ধান্তও—রূপের দীপ্তির চেয়ে বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার দীপ্তি ঢের বেশী আকর্ষণ করে মানুষকে।

অবশ্য সেটা দুদিক দিয়েই।

এও দেখেছে সুরবালা, তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে—যে পরবর্তীকালে খ্যাতিতে ঐ 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে—কোন নাট্যকারের পক্ষপাত না পেয়েও—সে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের শিক্ষক অভিনেতার প্রেমে স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে কৃতার্থ বোধ করেছে—এ তো সবাই জানে। আবার সেই মেয়েই মাত্র ষোল বছর বয়সে নাট্যগৌরবের শীর্ষস্থানে পৌঁছে কর্তৃপক্ষকে তথা নতুন নাটককে ডুবিয়ে এক সুদর্শন অভিনেতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে—তার জন্যে হাসিমুখে অশেষ দুঃখ সহ্য করেছে। আবার সে-ই পরবর্তীকালে আর এক নট-নাট্যকারের জন্যে যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, বাড়ি-জমি-টাকা, কোম্পানীর কাগজ—বিপুল বিত্ত নিঃশেষ ক'রে পথের ভিখিরী হয়ে সত্যি-সত্যিই পথে

বসেছে। অনেক দেখেশুনে সুরবালা এইটেই বুঝেছে যে, যে-কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। শুধু প্রতিভার জন্যেই সাধারণ লোক ছোটে না—প্রতিভাও ছোটে অত্যন্ত অপাত্রে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। লেখক কবি নটনটী গাইয়ে বাজিয়ে চিত্রকর—সকলের পক্ষেই এ-কথা সত্য—এমন কি জাদুকরের ক্ষেত্রেও। নিজের ভাইকে দিয়েই আরও চরম শিক্ষা হয়েছে তার, আরও ভাল ক'রে বুঝেছে কথাটা। সাধারণ কেরানী বা খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে যারা একটু আলাদা, তাদের প্রত্যেকেরই মনের গতি জটিল এবং বিচিত্র। আর সে গতি কারও সঙ্গেই কারও মেলে না। সুরবালা নিজের মনেরই কি তল পেল জীবনে? মরবার দিন পর্যন্ত নিজেকে তো সেই প্রশ্নই ক'রে গেছে বার বার।

সবচেয়ে বিপন্ন বোধ করে সুরবালা নিজের ভাইটিকে নিয়েই। সব দুঃখের চেয়ে যেন এই দুঃখটাই বেশী তার। ম্যাজিক ম্যাজিক ক'রে পাগল—কিন্তু সেরকম পাগল তো সব লাইনেই দেখা যায়। এমন মানুষের বাইরে চলে যায় কে? যে জন্যে পাগল, সেই ম্যাজিকটাও তো নিয়ম ক'রে কোথাও শেখে না। ঐ উপলক্ষ ক'রেই বকে গেল শুধু—এখন তো একেবারেই শাসনের বাইরে চলে গেছে। বৃত্তি শিক্ষার যে সুপ্রশস্ত সরল রাজপথ—গুরুমুখী শিক্ষা ও সাধনার পথ—সে-পথে আদৌ হাঁটল না সে। উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবনই তার আসল লক্ষ্য—শিক্ষাটা তার পত্রাবরণ মাত্র।

বাড়িতে বাস করা বা নিয়মিত আসা-যাওয়া করা দীর্ঘকালই ছেড়ে দিয়েছে সে। কোথায় থাকে, কোথায় যায়, কেনই বা এমন সুদীর্ঘ সময় নিড়ুবি খেয়ে থাকে—তা কেউ জানে না। বাবা সে-খোঁজখবর করাও ছেড়ে দিয়েছেন, কোন কথাই কন না ছেলের সম্বন্ধে বা ছেলের সঙ্গে। যেদিন থেকে দেখেছেন ছেলেকে শাসন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—শাসন করতে গেলেই তার মা ও দিদির অতিরিক্ত স্নেহ ও প্রশয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়—সেইদিন থেকেই ও-ব্যাপারে একেবারে নীরব হয়ে গেছেন। মা আর সুরবালা নিজে অবশ্য বিস্তর সস্নেহ মিষ্টি কথায় তথ্যটা বার করার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পরিষ্কার কোন জবাব পায় নি কোনদিনই।

তবে একটা কথা—ওর বক্তব্যের টুকরো টুকরো বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, এই ইন্দ্রজাল বা জাদু শেখার জন্যে কোন অস্থানে কুস্থানে যেতেই পিছ-পা নয় সে: সেই কোথায় কোথায় দূর দেশে—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বেদেদের টোল পড়ে—সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের তাঁবুতে বা লতাপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে দিন কাটিয়েছে সে, তাদের ভাত খেয়েছে। সেই সঙ্গে গোপনে চোলাই-করা পচাই মদও। কোন্ ভেল্‌কিওয়ালা আর্মানিটোলার এক এঁদো গলিতে কোন্ মেয়েমানুষের বাড়ি নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন—সেখানে গিয়ে সেই মেয়েমানুষটার জন্যে রাস্তার কল থেকে বালতি বালতি জল ধরে দিয়ে—ভেল্‌কিওয়ালার পা টিপে গা টিপে সেইখানে তাদের ভাত আর 'ছ্যালন' খেয়ে পড়ে থেকেছে—বাড়িতে যে এক ঘটি জল গড়িয়ে খায় না, কুটি ভেঙে দুটি করে না।

তবু এতকাল মধ্যে মধ্যে—দশ-পনেরো-বিশ দিন অন্তরও আসত, এলে দু-চার দিন অমন থেকেও যেত—আবার যাওয়ার খেয়াল চাপলে এই অভাবের সংসার থেকেও কেড়ে-বিগড়ে মিনতি ক'রে মিছে কথা বলে দু-একটা টাকা সংগ্রহ ক'রে সরে পড়ত। সেইটুকুই ছিল এদের সান্ত্বনা। কিন্তু ইদানীং বেশ কিছুদিন হ'ল একেবারেই নিপাত্তা হয়ে গেছে। সুরবালা থিয়েটারে চাকরি নেবার দিনকতক আগে সেই যে একদিন এদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি কিছু আদায় করতে না পেরে রাগ ক'রে না খেয়েই বেরিয়ে গেছে—এই ক'মাসের মধ্যে আর আসে নি। কোথাও থেকে কোন চিঠি কি কোন খবরও দেয় নি।

প্রথম দু-এক মাস সেজন্যে কেউই বিশেষ উদ্বেগ বোধ করে নি—কিন্তু এখন সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিস্তারিণী প্রকাশ্যেই কান্নাকাটি করে, সে চরমটাই ধরে

নিয়েছে, 'ছেলে আমার বেঁচে নেই, সে আমি বেশ জেনেছি। বেঁচে থাকলে এমন চুপ ক'রে থাকতে পারত না। বাছা আমার অভিমানে হয়ত আত্মঘাতীই হয়েছে—কে জানে! ...যে যাই বলুক—খোকার আমার মা-অন্ত প্রাণ, মাকে না দেখে এই এতটা কাল থাকতে পারত না কিছুতেই।'...

মেয়েকে শুনিয়ে স্বামীকে শুনিয়ে গলা আরও চড়িয়ে দেয়, 'ওরে এ কী অলুক্ষুণে অপয়া বাড়িতেই এসেছিলুম রে! কী কুক্ষণে যে মেয়ের রোজগারে পাকা বাড়িতে বাস করার জন্যে কর্তা পাগল হয়ে উঠলেন—বাড়িতে পা দিয়ে এস্তক হাড়ীর হাল হদ্দ-নাকাল হলুম, শেষপজ্জন্ত ছেলেটাকে অব্দি খোয়াতে হ'ল!'

ভবতারণ মুখে কিছুই বলেন না, স্ত্রীকেও যেমন সান্ত্বনা দেন না, তেমনি নিজেও হা-হুতাশ করেন না,—তবে আজকাল প্রায়ই যে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় পাথরের মতো গুম্ খেয়ে বসে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে বুক-ফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, সে কার জন্যে তা সুরবালা জানে। মজা এই—তার নিজের যে কষ্ট তা এই দু'জনের মাঝখানে প্রকাশ পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ দুঃখ এদের কারও চেয়েই কম নয় হয়ত। আপন ভাই না হোক—তা যে নয় আজও তো মনে হয় না ওর—ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে ফেলে মানুষ করেছে—ভাইটা তার প্রাণ। কার্তিকের মতো সুন্দর ভাই, ভাইয়ের জন্যে ছেলেবেলায় গর্বের শেষ ছিল না ওর।...সেইজন্যেই কখনও শাসন করতে পারে নি, কাউকে করতে দেয় নি।...কী স্বাস্থ্যই না গড়ে উঠেছিল, ষোল বছর বয়সের সময়ই পঁচিশ বছরের জোয়ান বলে মনে হ'ত। সেই স্বর্ণকান্তি না খেয়ে না দেয়ে, স্থানে-অস্থানে বেড়িয়ে টো-টো ক'রে ঘুরে কালি হয়ে যাচ্ছে, ঢলঢলে সুন্দর মুখ চোয়াড়ে কঠিন হয়ে উঠছে—এই তো যথেষ্ট দুঃখ তার। তার ওপর যদি দু-মাস তিন-মাস অন্তরও না দেখতে পায় তো প্রাণ বাঁচে কি ক'রে?...

সুরবালাও হয়ত নিস্তারিণীর মতোই ডাক ছেড়ে কান্না শুরু করত কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল ভাইয়ের সঙ্গে, এটুকু অন্তত বোঝা গেল যে, সে বেঁচে আছে।

দেখা হয়ে গেল বলা ভুল, সে-ই দেখতে পেল। ইদানীং সে দু'-একটা ছোটখাটো পার্ট পাচ্ছে, গান গাইবার পার্টই বেশির ভাগ, তবু গানের সঙ্গে কথাও থাকে কিছু কিছু। সাধারণত গানের ভূমিকাগুলোকে নাট্যকার-প্রধান করেন না—জানাশুনোর মধ্যে তেমন চৌকশ মেয়ে না থাকলে। তেমনিই একটা পার্টে নেমেছে সেদিন, অপর অভিনেতা-অভিনেত্রীর কথোপকথনের ফাঁকে অলসভাবে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নজরে পড়ল—মাঝামাঝি একটা সারিতে মাঝের দিকেই বসে আছে গণেশ।

দেখে আনন্দ হবারই কথা, প্রথমটা ধ্বক্ ক'রে উঠেছিল বুকের মধ্যে—কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার অবসর পেল না। পেল না তার কারণ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজর পড়ল ওর দুপাশে দুটি সঙ্গিনীর দিকে। দুটিই ওর সঙ্গিনী বুঝল—দুজনের সঙ্গেই হাসিগল্প মস্করা চলছে। এরা যে কোন্ পর্যায়ের মেয়ে তা তাদের বেশভূষায়, খড়িমাখা মুখে এবং হাসবার বা কথা বলার ভঙ্গীতে বুঝতে বাকি থাকে না কারুরই। যারা শহরে থাকে, পথেঘাটে যাতায়াত করে—তারা সকলেই এদের দেখেছে, চেনে। সুরবালারা বস্তিতে থাকত, পাড়ার যে-সব মেয়েরা রাত্রে 'বাবু' বসাত ঘরে—যারা ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা কইত, দাওয়ায় উঠতে সাহস করত না, তারা এদের তুলনায় স্বর্গের লোক।

ঘৃণায় সারা দেহ রি-রি ক'রে উঠল সুরবালার। যেন একটা দৈহিক যন্ত্রণা বোধ হ'তে লাগল তার বুকের কাছটায়। কিছুক্ষণের জন্যে এই স্টেজ, পাশের অভিনেতা-অভিনেত্রী, সামনের দু-তিনশো দর্শক—সব যেন চোখের সামনে লেপেমুছে একাকার হয়ে গেল।

এমনই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তার গান ধরবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর হুঁশ হ'ল—বাজনা বেজে ওঠার অনেক পরে তবে গান ধরল।

তারপর আর ওদিকে তাকায় নি। তাকালে নিজেকে সামলাতে পারবে না তা জানত। বারবারই এমনি বেহুঁশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। ঐ প্রথমবারের জন্যেই তো ভেতরে আসতে স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাসবাবুর ধমক খেয়েছে। কে নাকি দর্শকদের মধ্যে থেকে টিটকিরি করেছে—কে শিস দিয়েছে। এমন অচৈতন্য হয়ে কার দিকে চেয়েছিল সুরবালা? কোনও বড়লোক বাবু-টাবু বসে ছিল নাকি কেউ?...যাই হোক, থিয়েটারের কাজ হিসেব-বাঁধা কাজ। এখানে হুঁশ হারালে চলে না—এখানে একজনের ওপর আর একজনকে নির্ভর করতে হয়। সকলে অপ্রস্তুত হবে একজনের গাফিলি হ'লে। ইত্যাদি—

একেবারে ওর কাজ শেষ হ'তে উইংস্-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল—আর একবার দেখবে বলে। যতই রাগ হোক, না এসেও থাকতে পারে নি। কিন্তু তখন কেউ ছিল না আর, তিনজনেই উঠে চলে গিয়েছিল। কে জানে—কারও মুখে শুনে ওরই অভিনয় দেখতে এসেছিল কিনা, ঐ দুটো জীবকে নিয়ে। তাই ওর কাজ শেষ হ'তেই উঠে চলে গেছে। হয়ত তখন ওর এই অধঃপতন প্রসঙ্গেই হাসাহাসি করছিল।

মাগো!

আবারও বুকের মধ্যে তেমনি একটা যন্ত্রণা বোধ করে সুরবালা।

বাড়িতে এসে বলতে নিস্তারিণী বিশ্বাস করল না ওর কথা। বলল, 'ওলো আমি জানি, জানি। তুই আমাকে এস্তোক দিতে এসেছিস। তুই বললি আর আমি বিশ্বাস করলুম। অত নেকী আমাকে পাস নি। সে আর নেই—আমি জানি। আমার মনের মধ্যে যে বলছে নিয়তক—সে বেঁচে নেই। থাকলে এত দিন আমাকে না দেখে থাকতে পারত না কিছুতেই।'

আবার পরের দিন সকালে অন্য কথা বলে, 'আমার দুধের বালক ছেলে ঐ পথের মাগীগুলোর সঙ্গে নষ্ট হবে? কক্ষনও না—আমি বিশ্বাস করি না। তুই মিছে ক'রে বলছিস। চিরদিন ওকে হিংসে করিস তুই—তা জানি না! যতই হোক আপন ভাই তো নয়। তুই ওর শত্তুর, মিথ্যে ক'রে লাগিয়ে আমার মন ভাঙতে চাইছিস। কী ওর বয়স লা—যে দুদিকে দুটো পেঁচি খান্‌কি নিয়ে ঘুরবে?'

সুরবালা আর কথা বাড়ায় না। দুঃখে দুঃখে মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। সে ভাবে ভাইটার কথাই। কীই বা বয়স, এই বয়সে এমন বিগড়ে গেল! অত সুন্দর ভাইটা তার। আর কী ভালই বাসত তাকে। মনে হয়--অন্তত সুরোর তাই বিশ্বাস—মায়ের থেকেও সে দিদিকে ভালবাসত। সেই ছেলে এমন পর হয়ে যেতে পারে! শশীবৌদি শুনলে হয়ত বলবেন, 'ওরে, ও কি করছে, ওর গ্রহতে করাচ্ছে। এক-একজনের ভূমিষ্ঠ হবার সময় এমন কুগ্রহের দৃষ্টি লাগে, নীচ সংসর্গ তাকে করতেই হয়।' শশীবৌদি সব দুঃখ সব অভিযোগেরই একটা সান্ত্বনা খুঁজে বার করতে পারেন, সুরবালা পারে না।

থিয়েটারের কাজ বা তার পরিবেশ কিছুই ভাল লাগত না—তবু চোখ-কান বুজে টিকে ছিল সুরো একটা কারণে, অবিরাম তাগাদা দিয়ে কিছু কিছু ক'রে আদায় হ'লেও বাড়ি-ভাড়ার টাকাটা উশুল হচ্ছিল তার। সংসারের শাক-ভাতের খরচটা এখনও কোন-রকমে বাবাই চালাচ্ছেন, হয়ত ধার-দেনাও করতে হচ্ছে—তবু চলছে। বাড়ি-ভাড়া দেবার সামর্থ্য আর তাঁর নেই। সেইটে এখান থেকে যোগাড় হচ্ছে বলেই অপমানবোধটাকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য ক'রে যাচ্ছিল।

কিন্তু আর পারল না।

এখানে এসে পর্যন্তই, কিছু-না-কিছু উৎপাত যে না হয়েছে তার ওপর তা নয়। কিন্তু সেটা বেশীদূর এগোতে পারে নি। সুরবালা তার চারদিকে স্বভাববিরুদ্ধ এমন একটা কৃত্রিম কাঠিন্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল—এমন একটা গাম্ভীর্য এবং ঔদাসীন্য যে, চট্ ক'রে ওর কাছে কেউ ঘেঁষতে পারত না, ওর বয়সী অন্য মেয়েদের সঙ্গে যেমন রঙ্গরসিকতা ফাজলামি চলে—ওর সঙ্গে তা চালাতে সাহস করত না। ঔদাসীন্যটা অবশ্য কপট নয়, সত্যিই এখানের কোন কাজ বা ভবিষ্যৎ উন্নতির চিন্তায় কোন আগ্রহ ছিল না ওর। সেইজন্যেই সাধারণ লোকেও যেমন সুবিধা করতে পারত না—কর্তৃস্থানীয়রাও না। তাঁদের হাতে যে অব্যর্থ টোপ আছে—এই বিশেষ জগতে উন্নতির চাবিকাঠি—তাতে সুরবালাকে গাঁথা যাবে না, তা তাঁরা বেশ বুঝেছিলেন। যে লোভী, তাকে অধিকতর প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে করায়ত্ত করা যায়, যে কিছুর প্রার্থী নয় তাকে কিসের লোভ দেখাবে?

ওর এই উপেক্ষা বা অবজ্ঞায় আহত হ'ত পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী। তারা যেন এটাকে তাদের প্রতিই অবজ্ঞা বা ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করত। নিজেরা সর্বদা যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে, এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করত। নানারকমে চেষ্টা করত ওকে আঘাত দিয়ে একটা কলহে জড়িয়ে ফেলতে, নিজেদের স্তরে টেনে আনতে।

সুরবালা মনে মনে হাসত ওদের এই চেষ্টা দেখে। 'দেমাকে' 'ঠেকারে' 'অত অংখার কিসের? তবু যদি রুলি-সার হাত না হ'ত! পেটে ভাত জোটে না—দুটো ট্যাকার জন্যে প্রেত্যহ হ্যাংগালি-জ্যাংগালি করতে হয়!' ইত্যাদি মন্তব্য তার অঙ্গের ভূষণ হয়ে গিয়েছিল। কারও নাম না করলেও এ বক্তব্য যে কার উদ্দেশে তা বুঝতে কারুরই বাকি থাকে না—তাও না। কিন্তু এ-বিষের কারণটা জানত বলেই ওরা কী জ্বালায় ছট্‌ফট করছে বুঝে আহত বোধ করত না—বরং কৌতুক অনুভব করত।

তবু একেবারে যে টানাটানি হয় নি, তা নয়। বড়দরের অভিনেতারা, দু-একজন কর্তাব্যক্তিও অকারণে ডেকে কাছে বসিয়েছেন, অকারণেই সদয় ব্যবহার করেছেন, অহেতুক প্রশংসা করেছেন—তার হয়ত অতি সামান্য কোন ভূমিকায় সাধারণ অভিনয়ের—দু-একজন প্রশংসাছলে গায়ে হাত দেবার চেষ্টাও করেছেন। সুরবালা সবিনয়ে ও সুকৌশলে সেসব অন্তরঙ্গতার চেষ্টা এড়িয়ে গেছে। রূঢ় হয় নি—তবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঐহিক উন্নতির এসব সুযোগ সে চায় না, কোন ঔৎসুক্যই নেই তার এদিকে।

কিন্তু সবচেয়ে জ্বালাতন যে করত—নানু দত্ত, তার ওপর সে রাগ করতে পারত না, বিরক্তও হ'ত না।

ঐ এক আশ্চর্য মানুষ! কোন বিষয়ে ওর কোন অনুভূতি আছে বলেই মনে হয় না। অথবা হয়ত একটাই অনুভূতি আছে, সেটা কৌতুকের। সবকিছুই তার কাছে পরিহাসের বস্তু, সব-কিছুই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিতে পারে সে।

নানু এখানকার উন্নতি বা প্রভাব-প্রতিপত্তির এই গোপন সুড়ঙ্গ পথ নিয়ে প্রকাশ্যেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত—পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে তার ব্যঙ্গশাণিত রসনা সর্বদাই মুখর ছিল—তাঁর খোঁচা বিঁধত না এমন মানুষই ছিল না বোধহয় থিয়েটারে। তবু কেউই ঠিক যেন তার ওপর রাগ করতে পারত না। সব কথাই একটা পাগলামি—একটা ভাঁড়ামির আবরণে আবৃত থাকত বলে অতটা জ্বালা কেউ অনুভব করত না। অথবা করলেও বাকি সকলেই হেসে উড়িয়ে দেয় বলে—উড়িয়ে দিতে বাধ্য হ'ত।

নানু নিজেই বলত, 'কী, রাগ হয়ে গেল? রাগ করে কি করবি বল্।—পাগলা ছাগলা মানুষ, আমার কি মুখের আগঢাক আছে, না আমার কথা একটা ধর্তব্যের মধ্যে? আমি কি আর অত বুঝেসুঝে হিসাব ক'রে বলি? যখন যা মুখে আসে, যা ইচ্ছে বলে ফেলি—

আমার কথা গায়ে মাখিস নি। আমার কি জানিস—সেই গোপালভাঁড়ের কথা, মুখখানাই অমনি ব্যাঁকা। মনে নেই, শুনিস নি—গোপালভাঁড় একবার বাজী রেখেছিল খোদ নবাবকে মুখ ভেংগিয়েও জান নিয়ে ফিরে আসবে? প্রথম গিয়ে জিভ ভ্যাংগাতেই তো নবাব রেগে আগুন হয়ে শূলে দেবার হুকুম দিলেন। গোপাল তাতে একটুও দমল না, জিভ্ ভেংগিয়েই যেতে লাগল। কুর্নিশ করতে করতে ঢুকেছিল ঠিকই, তেমনি কুর্নিশ করতে করতেই বেরিয়ে এল—কিন্তু জিভ্ ভেংগানো বন্ধ করল না একবারও। নবাবের তখনই খট্‌কা লাগল। তারপর, দরজার কাছে যেতে যখন শূলে চড়াবার জন্যে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে মশানে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে জিভ্ ভ্যাংগাচ্ছে। নবাব তখন হেসে বললেন, না, ওকে ছেড়ে দাও, ওর মুখখানাই অমনি। তারপর শুধুলেন তুমি কেন এসেছিলে দরবারে? গোপাল সেলাম ক'রে তেমনি জিভ ভ্যাংগাতে ভ্যাংগাতেই জানাল, আজ্ঞে কিছু সাহায্যের জন্যে। নবাব তখনই হুকুম দিলেন একশ মোহর দেবার। জান নিয়ে তো ফিরলই উপরন্তু কিছু রোজগার ক'রেও আনল নবাবকে ঠকিয়ে। তা আমারও হয়েছে তাই, মুখখানাই অমনি, কী করবি বল্?'

সবাই হাসত, বরং সুরবালাই একদিন বলেছিল, 'তা তুমি তো তোমার দৃষ্টান্তেই ঠকে যাচ্ছ নানুদা, তুমিই তো বলছ গোপালভাঁড় ওটা ঠকাবার মতলবেই করেছিল। সত্যিই তো আর মুখখানা তার অমনি ছিল না—তোমারও তাই কিনা কি ক'রে বুঝব?'

উপস্থিত অনেকেই সায় দিয়েছিল, 'ঠিকই তো—ঠিক কথাই তো। তুমিও যে অমনি মতলব নিয়ে বলো না—কি ক'রে বুঝছি?'

সমান সুরে জবাব দিয়েছিল নানু, 'অত বোঝবারই বা কি দরকার, তোরাও নবাব সেজেই থাক না। গোপাল যতই যা হোক—ভাঁড় ছাড়া তো কিছু না। জিভ-ভ্যাংগানো তার মুখের দোষ হ'তে না পারে—ভাঁড়ামিরই অংগ তো। নবাব নবাবই—ভাঁড়ের থেকে অনেক উঁচুতে। তোরা নিজেদের নবাব মনে কর—আমাকে ভাঁড় দেখবি, আর আমার কথা গায়ে লাগবে না।'...

নানু প্রকাশ্যেই প্রেম নিবেদন করত সুরবালার কাছে—থিয়েটারী ঢঙে, ভাঁড়ের মতোই —'একটু দয়া করো না মাইরি। বলি ও সুন্দরী, ফিরে কি তাকাবে না একবার গোলামের দিকে? আর কবে দয়া হবে? বুকখানা যে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। উঃ, প্রাণ যে আর ধরে রাখতে পাচ্ছি না, ঠোঁটের কাছে এসে খাবি খাচ্ছে যে—মাইরি!'

কখনও বা বলত, 'ইংরেজীতে একটা গল্প আছে শুনেছি, আমি পড়ি নি—ঘোড়ার পাতা অব্দি আমার দৌড়—ভাইপোদের মুখে শুনেছি—এক জানোয়ার চাইত সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে। অনেককে বলত, কাকুতি-মিনতি করত, কিন্তু কেউই রাজী হ'ত না। কেনই বা হবে বল? শেষ অব্দি এক সুন্দরীর কী দয়া হ'ল, সে রাজী হয়ে গেল। আর যেমন বিয়ে হ'ল দেখা গেল সে জানোয়ার আসলে এক সুন্দর রাজপুত্তুর, কোন্ এক ডাইনীর জাদুতে না কার শাপে যেন অমনি হয়ে গিয়েছিল। বলাই ছিল যে, যদি কোনদিন কোন সুন্দরী মেয়ে স্বেচ্ছায় তার সংগে ঘর করতে রাজী হয় তবেই সে আবার মানুষ হবে, আগের চেহারা ফিরে পাবে। তা আমাকে একটু ভালবেসে দ্যাখ না—যতটা কদর্য্যি আমাকে দেখায় ততটা আমি নই!'

সুরবালা বলত, 'যে ভালবাসবে তার চোখে ভালবাসার মানুষকে সুন্দর তো লাগবেই। মোদ্দা এত লোক থাকতে তোমাকে আমি ভালবাসতে যাবই বা কেন?'

'দয়া! দয়া! স্রেফ কাইণ্ডনেস্। ইংরেজী বুঝিস? কাইণ্ডনেস্ মানেই দয়া। হেঁ হেঁ, ভাইপোদের কল্যেণে আমি অনেক ইংরিজী শিখে ফেলেছি!...না হয় ভিক্ষেই দিলি মনে কর্।'

'ভিক্ষে দেবার মতো ঢের লোক জুটবে তোমার দাদা, সরে পড়ো। আমার আর খেয়ে-

দেয়ে কাজ নেই, তোমার মতো অপাত্রে দয়া করব।...আচ্ছা নানুদা, তোমার লজ্জা করে না? ঘরে শুনেছি তোমার সুন্দরী সতীলক্ষ্মী বৌ আছে, একটা ছেলেও হয়েছে—তুমি সেখানে না গিয়ে এর ওর তার বাড়ি—কার ঘর কবে খালি থাকবে খোঁজ নিয়ে সেইখানে গিয়ে রাত কাটাও—সাতদোরের লাথিঝাঁটা খেয়ে—না হয় তো নাকি, কোন চুলোয় ঠাঁই না মিললে এই স্টেজে পড়ে রাত কাটাও—কেন? ব্যাপারটা কি?'

কথাটা মিথ্যে নয়। বহুলোকের মুখেই শুনেছে সুরবালা। নানু দত্ত এখানে আলোচনার একটা প্রধান বিষয়বস্তু। তার সম্বন্ধে যেমন কৌতূহলেরও শেষ নেই, তেমনি বিস্ময়েরও না। নানুর সমস্ত জীবনটাই একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। কখনও মনে হয় অপদার্থ—জীবনের যেসব মূল্য মানুষ এতদিন ধরে স্বীকার ক'রে এসেছে সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতাই নেই তার। আবার কখনও মনে হয়—এ সমস্ত আচরণটাই ওর ছদ্মবেশ। আসলে একটা নিদারুণ অভিমানেই জীবনটাকে এইভাবে দু' হাতে বিলিয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করছে—জেনেশুনে।

ধনী না হোক—অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে। বাকী সবক'টি ভাই-ই ভাল রোজগার করে। নানুর লেখাপড়া হয় নি কিন্তু তাই বলে সে নিজেকে যতটা মুর্খ বলে প্রচার করে ততটা নয়, সুরবালা একদিন নিজের চোখে দেখেছে নিবিষ্টভাবে বসে ইংরেজী খবরের কাগজ পড়তে। ওর স্ত্রীও নাকি সত্যিই সুন্দরী, ভাল বড় ঘরের মেয়ে। আর অমন পতিব্রতা নাকি হয় না। এই অপদার্থ অমানুষ স্বামীই তার ধ্যান জ্ঞান। এখনও প্রত্যহ সে কাউকে না কাউকে ধরে নানুর জন্যে খাবার ক'রে পাঠায়। ইদানীং একটা কুকুর পুষেছে নানুর ছোটভাই, কাউকে না পেলে তার মুখেই পুঁটুলি ক'রে ঝুলিয়ে দেয়—সে সোজা থিয়েটারে নানুর কাছে চলে আসে। সে কুকুর আবার এমন ভক্ত—নানু ছাড়া অন্য কেউ সে খাবারে হাত দিতে এলে গর্জন ক'রে ওঠে—মনে হয় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে তাকে।

তবু নানু কিছুতেই বাড়ি যেতে চায় না। গেলেও দিনে দিনে যায়, স্নানাহারও করে হয়ত—তার পরই পালিয়ে আসে। রাত্রিবাস করে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন—মা খুব কান্না-কাটি করলে, মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করলে তবে। এখানের অল্প মাইনের শিক্ষানবিস মেয়ে যারা—সখীর দল বলে যারা অভিহিত—তাদের সকলেরই বাড়ি ওর অবাধ গতি। তাদের কারুর মাকে মাসী বলে, কাউকে বা দিদি। অধিকাংশ দিন তাদেরই কারও কারও বাড়ি রাত কাটায়। সব সময় যে তার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা থাকে তাও না—সুরবালার বিশ্বাস কোনদিনই থাকে না, নানু একটু অন্য ধাতের মানুষ, সত্যিই দুর্জ্ঞেয় তার মনের গতি আর চরিত্রের গঠন—শুধু একটা জায়গায় রাত কাটাতে হবে বলেই কাটায়। যেদিন কোন আশ্রয় জোটে না সেদিন এই স্টেজেই একটা কিছু পেতে শুয়ে পড়ে—হাজার লোকের পায়ের ধুলো-বোঝাই শতরঞ্জি বা কার্পেটে!

সুরবালার প্রশ্নে নানু গম্ভীর হয়ে যায়। গলা নামিয়ে বলে, 'সেই তো হয়েছে মুশকিল। একথা আর কাউকে বলা যায় না, তুই বুঝবি হয়ত। সতীলক্ষ্মী বললে কিছু বলা হয় না—সে দেবী। শাপভ্রষ্টা যাকে বলে শাস্ত্রে, সে তাই। সেই জন্যেই তো তাকে সহ্য করতে পারি না। আমি তো এই, চেহারার কথা বলছি না—আমার চেয়ে ঢের কুচ্ছিত লোক ঢের ঢের বেশী সুন্দরী বৌ নিয়ে ঘর করছে—ভগবান জোড় মেলান শাদা-কালোতেই বেশির ভাগ—তাদের বৌরা তাদেরই ভালবাসে বরং বেশী—তা নয়, চরিত্র আর স্বভাবের কথাই বলছি। কী না করেছি, কী না করছি—ওকে দেখলেই মনের মধ্যে সেই প্লানিটা জেগে ওঠে, নিজেকে যেন বড় বেশী ছোট, ওর অযোগ্য মনে হয়, যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাই! সেই জন্যেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই রে। মনে হয় আমি ছুঁলেও সে ছোট হয়ে যাবে—আমার হাওয়া গায়ে লাগলে কষ্ট হবে তার। তার চেয়ে সে যেমন আছে থাক—

তবু তার পুণ্যে যদি ছেলেটা মানুষ হয় তো সেই আমার ঢের। ছেলেটা মানুষ হ'লে—আমাকে দিয়ে তো সুখ হ'ল না তার—ছেলেকে নিয়ে শেষ জীবনটা অন্তত শান্তি পাবে।'

'ওটা তোমার ভুল নানুদা, স্বামীকে দিয়ে যার শান্তি হয় না, ছেলেও তাকে শান্তি দিতে পারে না। মেয়েদের স্বামীই সব।...তা এত যদি নিচে নেমে গেছ জানো, এ সংসর্গ ছেড়ে দাও না। এখানে তোমার কিসের স্বার্থ, কিসেরই বা টান? এ চাকরিতে যে পেট ভরে না সেটুকু অন্তত বুঝতে পারি।'

সত্যিই বন্ধনের কোন কারণ নেই নানুর। সে সবই পারে যদিও—নাচতে পারে, মানে এখানে এসে শিখেছে, এখন সখীদের শেখায়ও মাঝে মাঝে, গাইতেও পারে কিছু কিছু—অভিনয়েও চলনসই। তবে তার যা চেহারা—বিশেষ মুখখানা এমন, আরও—নিয়ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে ক'রে মুখখানা এমন বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাকে হাসির পার্ট ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না। কখনও কখনও, কেউ না এলে কাজ চালাবার জন্যে বড় পার্টে হয়ত নামাতে হয় কিন্তু দর্শকরা ওকে সে সব পার্টে দেখতে চায় না। নানারকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কোন গভীর আবেগের কথা বললেও সেটাকে ভ্যাঙচানি মনে ক'রে হেসে ওঠে।

অর্থাৎ অভিনয়ের ক্ষেত্রে এমন কোন উন্নতির আশা নেই, হয়ত নাচে উন্নতি করতে পারে, সেদিকে ঝোঁকও আছে, বলে, 'দেখবি দেখবি—একদিন আমার নাম নিয়েও গৌরব করতে হবে, প্ল্যাকার্ডে বড় বড় হরফে নাম ছাপা হবে—"ড্যান্সিং মাস্টার—শ্রীযুক্ত বাবু নানু দত্ত"—যদি বাঁচিস তো দেখে যাবিই একদিন' কিন্তু পুরুষ নাচিয়ের আর কী কদর, কতটুকু দরকারই বা? মাইনে যা পায়—মানে যা আদায় হয় তাতে ওর হাতখরচও চলে না। এখনও, দুপুরে যেদিন খেতে যায়, মার কাছ থেকে দু' পাঁচ টাকা চেয়ে নিয়ে আসে তবে চলে। কাপড়জামা বাবাই করিয়ে দেন বৌমার মুখ চেয়ে। শ্বশুরবাড়ি থেকেও পায়। সেসব নিতে ওর কোন লজ্জা নেই, অম্লানবদনে নেয় আবার সগর্বে পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ায়। এখান থেকে আয় কিছু নেই—খাটুনি আছে বিস্তর। তেমন কোন কাজ নেই আর দিনরাত হাতের কাছে পাওয়া যায় বলেই থিয়েটারসুদ্ধ লোক ওকে ফরমাশ করে। ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে এক-একদিন নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না।

সুরবালার প্রশ্নের উত্তরে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলে, 'কী জানি, কিসের যে টান তা কি আমিই বুঝি ছাই! এমন কোন বন্ধন নেই সত্যিই—তবু না এসেও যেন থাকতে পারি না। আবার ভাবি কি জানিস, আমার মতো জন্ম-ভ্যাগাবেনের আর কোথায়ই বা জায়গা হ'ত। আমাদের জন্যেই বোধহয় ভগবান এই জায়গার সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ার যত বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো লোকের আশ্রয় এটা, ভ্যাগাবেনের স্বর্গ।'

একটু থেমে বলে, 'ঠাকুরবাড়ির দপ্তর বলে একটা বই বেরিয়েছে পড়েছিস? তুই আর কোথা থেকেই বা পড়বি—ইংরিজী বইয়ের অনুবাদ—আগেই পড়েছি অবশ্য, ছোট ক'রে বেরিয়েছিল অভিশপ্ত ইহুদী বলে—তাতে আছে যে, যীশুখ্রীষ্ট নাকি ঘুরতে ঘুরতে একদিন ক্লান্ত হয়ে এক মুচির যন্তর-শান-দেওয়া পাথরের ওপর একটু বিশ্রামের জন্যে বসেছিলেন, সে মুচির তা সহ্য হয় নি, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এখানে বসতে হবে না, যাও সরে পড়ো। ঘুরে বেড়াও গে, ভবঘুরের জায়গা নেই এখানে।" সেই পাপে সে নাকি আজও অমর হয়ে আছে—হ্যাঁ, পাপেও অমর হয় মানুষ, ফল-ভোগের জন্যে; বেচারাকে নাকি সেই থেকে আজও প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াতে হয়, কোথাও একটু বসতে কি বিশ্রাম নিতে পারে না। বসতে গেলেই মনে হয় যেন কে ঠেলে উঠিয়ে দিচ্ছে। তার বংশের যে যেখানে আছে, রক্তের ছিটেফোঁটা—সকলেরই শোচনীয় পরিণাম হয়, চোখে দেখে সেগুলো, কোন প্রতিকার করতে পারে না। অবিরত কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি তাকে ঠেলে নিয়ে বেড়াতে থাকে—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়।...আমিও

বুঝি তেমনি কোন পাপে এখানে এসে পড়েছি, আর কোথাও পালাতে পারি না—কেবলই যেন কে টেনে নিয়ে আসে এই পাঁকের মধ্যে। এখানেই থাকি ভাল, খাপ খেয়ে যায়। মনে হয় অন্য কোন জায়গাতে আমার দরকারও নেই জায়গাও নেই।'

'আছে বৈকি, তোমার বৌয়ের কাছে তোমার চিরদিনের দরকার—তার কাছে তোমার চিরকালের আশ্রয়।'

'কে জানে, হবে হয়ত।' চুপ ক'রে যায় নানু। বোধহয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিজের জীবনটা ফিরে দেখতে চেষ্টা করে।

॥ ১৩ ॥

তবে স্বাভাবিক অবস্থায় নানুর আসল চেহারাটা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। পেলেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আবার ভাঁড়ামিতে ফিরে যায় সে। এ-ভাঁড়ামিতে তার লজ্জাও নেই, সঙ্কোচও নেই। সকলের সঙ্গেই সমান ভাঁড়ামি ক'রে যায়—কেবল জি-সি ছাড়া। তাঁকেই যা-কিছু সমীহ করে, ভয় করে। দেখা হ'লে প্রণাম করে। সুরোকে বলে, 'ওঁর মধ্যে আগুন আছে, বুঝলি? আগুনে যেমন আরশোলা কি কোন পোকা কি নোংরা জিনিস ফেললে কিছুক্ষণের জন্যে একটা দুর্গন্ধ বেরোয় কিন্তু তাতে আগুনের কোন ক্ষতি হয় না—সে-দুর্গন্ধও ঐ বদ জিনিসটা পুড়ে ছাই হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়—ও-মানুষটাও তেমনি। ওঁকে কোন অনাচারই অপবিত্র করতে পারবে না কোনদিন।'

আর সমীহ করে নানু সুরবালাকেই। সেটা অনেকদিন লক্ষ্য করেছে সুরো। মুখে যা-ই বলুক, প্রণয়-নিবেদনটা ওর ভাঁড়ামিরই অঙ্গ, কিন্তু সে সবই প্রকাশ্যে, পাঁচজনের সামনে। আড়ালে কখনও কোন ঘনিষ্ঠতা করতে আসে নি কোনদিন, কাছাকাছি বসে কথা কয় বটে, পাশে বসতে চেষ্টা করে না, স্পর্শ করারও না। অথচ এই থিয়েটারেই এমন কোন মেয়ে নেই বোধহয়—ছোট বা বড়—যার হাত ধরে টানাটানি করে না বা কাঁধে হাত রেখে কথা বলে না। পাঁচজনের সামনে সুরোর সঙ্গেও খিস্তিখেউড় করে, নোংরা রসিকতা করে। কখনও কখনও গালমন্দও দেয়। ওদের বাড়িতেও এসে গেছে এর মধ্যে ক'দিন। প্রথম প্রথম নিস্তারিণী খুব কঠিন হয়েই ছিল, ভ্রূকুটি ক'রে বেশ কড়া সুরেই কথা বলেছিল, কিন্তু নানু 'মা' বলে সম্বোধন ক'রে আর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে একেবারে গলিয়ে দিয়েছে। নানু এখন তার ঘরের ছেলে।

অন্তরঙ্গতা করতে না আসুক—তার খবর সব রাখে নানু। বোধহয় একটা গভীর সহানুভূতিও বোধ করে দলছাড়া গোত্রছাড়া এই মেয়েটার জন্যে। আর তা করে বলেই সমীহ করে। বলে, 'এখানে কেন মরতে এলে বাবা! সাতজন্মেও এদের মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারবে না। একেবারেই গোত্তর-ছাড়া যে তুমি। মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কি? সরে পড়ো। তোমার তো এখানে কোন আখের নেই—মাঝখান থেকে আর একটা মেয়ের অন্ন মারছ! তোমার জায়গায় যে-ই আসত সে-ই এ্যাদ্দিনে কাজ গুছিয়ে নিত।'

খবর যে রাখে তার প্রমাণ প্রথম পেল—যেদিন নিশ্চিত দেবেন বলে কথা দিয়ে রাখা সত্ত্বেও ক্যাশিয়ারবাবু এক পয়সাও দিলেন না। আরও দু'দিন তাগাদা হয়ে গেছে—এই

ধরনের তাগাদার পর নিশ্চিত দেব বলে কথা দিলে তার খেলাপ করেন না ভদ্রলোক সাধারণত—যা-হয় কিছু দেনই। ওঁর কথার ওপর নির্ভর ক'রেই বাড়িওলাকে কথা দিয়ে রেখেছে সুরো—পরের দিন অন্তত কিছু দেবেই। তার নিজের কথা হ'লেও তত ক্ষতি হ'ত না, বাড়িওলার সঙ্গে কথাটা হয় বাবার মারফৎ, সে-কথার খেলাপ হ'লে তাঁর অপমান। ...চুপ ক'রে একপাশে বসে আছে গুম খেয়ে—হঠাৎ নানুই এসে খবর দিলে, 'তোর গাড়ি তৈরী যে রে সুরো, যা—বাড়ি যা।' তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাইরে এসে—গাড়িতে ঢোকার আগেই—হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'যা নিয়ে যা, বাড়িওলাকে দিয়ে দিস।' গাড়িতে অন্য মেয়েও ছিল, তখন আর দেখা হ'ল না, বাড়িতে ফিরে দেখল, কাগজে মোড়ক-করা পাঁচটা টাকা।

তারপর সুরো টাকা হাতে পেয়ে যখন সেটা ফিরিয়ে দিতে গেছে—স্থির-দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলেছে, 'দিবি? কেন—নইলে আত্মসম্মানে বাধবে? তা দে।...তবে দ্যাখ, ও আমার টাকা নয়। আমার সেই অবস্থা—মেগে পাই বিলিয়ে খাই। তুই দিলেও এখনই বাজেখরচে চলে যাবে, হয়ত শুঁড়ি-বাড়িতেই চলে যাবে, খরচ হয়ে যাবে। রেখেই দে না বাপু, বরং পরে যখন তোর খুব পয়সা হবে, এর সুদসুদ্ধ চেয়ে এনে এমনি অপর কাউকে দেব—কিম্বা ফুর্তি ক'রে মদ খাবো।'

শুধু ঐ একবারই নয়—আরও দু-একবার এ-ঘটনা ঘটেছে। দু-টাকা-পাঁচ টাকার ব্যাপার অবশ্য, কিন্তু প্রতিবারই সুরো লক্ষ্য করেছে, তার অতি সংকট-মুহূর্তেই কী ক'রে যেন জানতে পেরে—নিজে থেকে, স্বেচ্ছায় গোপনে হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কিন্তু তার জন্যে কোন সুবিধার দাবী করে নি। ঐ টাকা দেবার সময় ছাড়া স্পর্শও করে নি কখনও।

এই নানুই তাকে প্রথম সাবধান ক'রে দেয়, 'ওরে, এই বেলা মানে মানে সরে পড়, ওরা আদাজল খেয়ে লেগেছে এবার।'

কথাটা তখন বোঝে নি, বুঝল কয়েকদিন পরে।

পরবর্তী নতুন বইয়ের রিহার্স্যাল শুরু হবে শিগ্‌গির—অনেকের মুখেই শুনছিল। তার আগ্রহও নেই—কৌতূহলও নেই। কী নাটক, কবে শুরু হবে—তা নিয়ে আলোচনাও করে নি কারও সঙ্গে। তার কি পার্ট থাকবে, তাও জানার কথা মনে হয় নি। যা হোক একটা ছোটখাটো পার্ট দেবেই তাকে, যখন দেবে তখন শুনবে, যেদিন আসতে বলবে সেদিন আসবে—তার আর কি?

হঠাৎ একদিন রিহার্স্যাল-মাস্টার—এখানের হিরো অভিনেতাও—অমর্ত্য মিত্তির ওকে ডেকে পাঠালেন। সুরো গিয়ে দাঁড়াতে বললেন, 'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সুরবালা বিস্মিত হ'লেও সে-বিস্ময় প্রকাশ করল না। নির্দেশমতো সামনের টুলটার ওপর বসল।

'দ্যাখো, আমি এখানকার শিক্ষক তো, সবাইকেই আমি ওআচ করি, মানে লক্ষ্য করি। সেটা দরকার—সেটাই আমার। নইলে নতুন নতুন লোক তৈরী হবে কি ক'রে?'

এতখানি ভূমিকা কিসের, অবাক হয়ে ভাবে সুরো—বিশেষ তার মতো সামান্য প্রাণীর সঙ্গে কথা বলার। তবে চুপ ক'রেই থাকে। এ-কথার আর উত্তরই বা কি! ওঁর যা বলবার আছে তিনি বলবেনই—তার সায় দেওয়া অনাবশ্যক।

বলেনও উনি—ওর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই—'তোমার মধ্যে অনেক পার্টস্ আছে—আমি লক্ষ্য করেছি। মানে শক্তি আছে, তবে উৎসাহ কম। বোধহয় এইসব ছোটখাটো পার্ট পাও বলেই তেমন আগ্রহ বোধ করো না। কিন্তু এভাবে তো চলবে না। চিরদিনই কি আর তুমি এই মাইনেতে থাকবে? উন্নতি করা দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি,

তোমাকে একটা বড় পার্ট দিয়ে দেখব। জি-সি নতুন বই লিখছেন, কিন্তু তার দেরি আছে —তাতেও বড় পার্টই থাকবে—তবে আপাতত এই সামনের বড়দিনে আমরা বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ খুলব। বিক্কিরি ঝুলে গেছে দেখছই তো—একটা কিছু করা দরকার। তোমাকে— ঠিক করেছি ওতে হীরার পার্ট দেব। হীরা ঝি—তবে তার চরিত্র খুব জটিল। এর আগেও হয়েছে একবার, খুব বড় য়্যাকট্রেস একজন এই পার্ট করেছেন। গান আছে, ম্যাড্‌সিন আছে—বদমাইশী শয়তানী আবার প্রেম—হীরা চরিত্রে একাধারে সব আছে। যদি জমাতে পারো—এই এক পার্টেই নাম করবে।—তুমি বাংলা পড়তে পারো আমি শুনেছি, এই বইটা নিয়ে যাও, ছাপা বই—অসুবিধে হবে না। পড়ে যতটুকু বুঝতে পারো নিজে বোঝবার চেষ্টা করো। তারপর এখানে যেদিন পার্টটা পড়া হবে—সেদিন আমি চরিত্রটা ঠিক বুঝিয়ে দেব। সময় খুব কম, খুব চেপে রিহার্স্যালও দিতে হবে ক'দিন—তেমন দরকার হ'লে ভোরে চলে আসবে, এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব—একেবারে সন্ধ্যে পর্যন্ত রিহার্স্যাল চলবে। আবার সারারাতও থাকতে হবে দু-একদিন। বই খুলব-খুলব সময়ে দিন-দুই অন্তত প্লের পরও রিহার্স্যাল দিতে হবে। সে অবশ্য বলে দেব, কবে কোন্‌দিন, বাড়িতে বলে আসতে পারবে। আচ্ছা—এখন যাও।'

নিতান্তই কাজের কথা। সেইভাবেই বলা। অনুগ্রহ বটে—তবে সেটা যে অনুগ্রহ তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। সেজন্যে কোন সুবিধা আদায় বা দাবী উত্থাপনের ইঙ্গিত নেই। শিক্ষক ছাত্রীর সম্পর্ক যা হওয়া উচিত—মনিব ও কর্মচারীর—সেই ধরনেরই কথা। নিখুঁত। কোন দুরভিসন্ধি থাকলেও তা বোঝার উপায় নেই। কোন বিশ্বনিন্দুক দুর্মুখও এঁর কথার ভঙ্গীতে কোন দোষ ধরতে পারবে না।

তবু বইখানা হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখেই বাড়ি ফিরল সুরবালা। আজ আর নানুকে থিয়েটারের ত্রিসীমানায় দেখা গেল না। তাকে পেলে এর একটা হদিস মিলত হয়ত। অন্তত ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারত—যে সেদিন এই আক্রমণেরই ইঙ্গিত সে দিয়েছিল কিনা। এটা কি অমর্ত্যবাবুর প্রণয়-নিবেদনেরই পূর্বাভাস? ঘুষ দিয়ে হাত করার চেষ্টা? সারা-রাত রিহার্স্যাল দেওয়ার নাম ক'রে কুক্ষিগত করার ইচ্ছা?...ওঁর সম্বন্ধে অনেক দুর্নাম আছে। উনি নাকি যখন যে নতুন মেয়েকে দিনরাত পার্ট শেখাতে শুরু করেন—অনেক সময় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রেও—সে-মেয়ে বড় অভিনেত্রী হয়ে যায় তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু মেয়েদের জীবনে যা বড় জিনিস, সেটি তাকে ঐ রুদ্ধ দরজার ওপারে রেখে আসতে হয়। সুরোর অদৃষ্টেও কি এই পরিণতি নাচছে?...

বাড়িতে এসে পড়ল বইখানা। এর আগেও পড়েছে খানিকটা। গণেশ কোথা থেকে একখানা পাতা-ছেঁড়া বই এনেছিল—শেষের ক'টা পাতা পড়তে পায় নি। এবার সবটাই পড়ল। পার্ট বড় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনটা খুশী হ'ল না। উৎসাহ বোধ তো করলই না। প্রথমত এ-জগতে খ্যাতি তার কাম্য নয়—দ্বিতীয়ত ঐ দুশ্চিন্তাটা। আব্‌ছা অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক। নামহারা আকারহীন ভয়। খালি বাড়িতে একা থাকার মতো।

পরের দিনও যথেষ্ট সংশয় এবং আশঙ্কা নিয়েই থিয়েটারে গেল।

কথাটা এতক্ষণে 'চাউর' হয়ে গেছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-সব কথা এখানে চোখের নিমেষে রাষ্ট্র হয়ে যায়। অর্থাৎ তার সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ বেড়েই গেল। আরও বেশী বাক্যবাণ সইতে হবে। আশঙ্কাটা সেইজন্যে আরও। সইতে পারবে তো শেষ পর্যন্ত? অকারণে সইতে হবে বলেই হয়ত আরও দুঃসহ হয়ে পড়বে।

কিন্তু থিয়েটারে পা দিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল।

যেন কোন্ জাদুমন্ত্রে রাতারাতি এখানের আব্‌হাওয়া বদল হয়ে গেছে। কঠিন ব্যঙ্গ, কদর্য রসিকতা ও কুৎসিত ইঙ্গিতের জন্যেই সে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল—এসে তার

চিহ্নমাত্রও দেখল না। তার বদলে যেন মনে হ'ল—সকলের ব্যবহারেই একটা সম্ভ্রমের ভাব, অমায়িক আত্মীয়তাও। দু-একজন এসে ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করল। শরীর কাহিল হয়ে যাচ্ছে কেন, দুধ খায় কিনা, একটুখানি ক'রে অন্তত দুধ খাওয়া উচিত, ওদের স্বাস্থ্যটাই তো মূলধন ইত্যাদি প্রশ্ন এবং উপদেশ বর্ষণ করতে লাগল। এক বড় অভিনেত্রী পানের ডিবে হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পান খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

হে'য়ালিটা বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। এর সমাধান একমাত্র যার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারত—তারও পাত্তা নেই। সে নাকি কাল থেকে একেবারে গায়েব হয়ে আছে কোথাও। পাঁচটা মিনিটের জন্যে তাকে আড়ালে পেলেও জিজ্ঞাসা করতে পারত এর রহস্যটা কি?

কিন্তু তা হ'ল না। কিছুই জানা গেল না শেষ পর্যন্ত। অধিকতর বিস্ময় ও দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হ'ল।...

পরের দিন সকালে বই পড়ার কথা। গাড়ি আসতে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে সুরো দেখল এক বড় অভিনেত্রী আগে থেকেই গাড়িতে বসে আছেন। কাঞ্চন নাম—কাঞ্চনমালা, কাঞ্চী বলেও ডাকে অনেকে। ইনি সাধারণত তাদের মত সাধারণের দলে যান না, হয় একা যান, নয় তো তাঁর সমপর্যায়ের কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে। দৈবাৎ কোন কারণে এমন যাবার দরকার হ'লেও চুপ ক'রে গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। আজ সুরোকে দেখে অতি মধুর অমায়িকভাবে হেসে বললেন, 'এইটিই বুঝি তোমাদের বাড়ি ভাই? দেখি নি কখনও। ইদিকে তো আসা হয় না ;...তা চলো না ভাই, তোমার মাকে একটু পেন্নাম ক'রে আসি। তোমরা তো শুনেছি বেরাম্ভণ—বর্ণগুরু। না কি তাতে কোন দোষ হবে? না হয় না-ই ছুঁলুম, দূর থেকেই দন্ডবৎ ক'রে আসব?'

এর পর সাদর আহ্বান জানানো ছাড়া উপায় থাকে না। 'না না, দোষ কিসের—আসুন না।' বলতেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এসে একটা মাদুরও পেতে দিতে হয়।

তাঁর দামী চওড়া পাড় শান্তিপুরে শাড়ি আর গা-ভর্তি গহনার দীপ্তিতে নিস্তারিণীও অভিভূত হয়ে যায়। বিশেষ এমন মানুষ যদি দূর থেকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে অনুমতি চায়, 'পায়ের ধুলো একটু পাব মা?' সে গলে যায় একেবারে।

কাঞ্চনমালা একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলেন, 'বাঃ, তা ছোটখাটোর ওপর বাড়িটি তো ভালই!...আপনার ইদিকটা তো অন্তত একানে, কারুর সঙ্গে নেপ্‌চ নেই। আমার অবিশ্যি নিজের বাড়ি—তা পোড়ার কী কুক্ষণে যে ভাড়া বসিয়েছি, রাতদিন ক্যাচর-ম্যাচর—অশান্তি লেগেই আছে।'

নিস্তারিণী এতটা আত্মীয়তায় আরও বিচলিত হয়ে পড়ে। কী বলবে, এক্ষেত্রে কি বলা উচিত, কী বললে এই উপযুক্ত আত্মীয়তার মর্যাদা দেওয়া হয়—ভেবে না পেয়ে যে-চিন্তাটা মনের মধ্যে অগ্রগণ্য সেইটেই প্রকাশ ক'রে ফেলে। বলে, 'হ্যাঁ! আমাদের আবার বাড়ি! কোনমতে মাথাগুঁজে থাকা। বাড়ির আয়-পয়ও যা! এর আগে যে মেটে-বাড়িতে ছিলুম, সে আমার ঢের ভাল ছিল। সেখানে থাকতে মেয়ের যা কিছু উন্নতি, ও-বয়সে অমন কারুর হয় না। সেই মেয়ে আমার শখ ক'রে পাকাবাড়িতে এসে কী কষ্টটা না পাচ্ছে।'

'না না মা, এ-বাড়ির পয়ও ভাল। দেখে নেবেন।' কেমন একরকমের অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে বলেন অভ্যাগতা, 'আপনার মেয়ের এ-অবস্থা কি থাকবে ভাবছেন! বরাতের চাকা ঘোরে মা—কখনও রাত, কখনও দিন। তা রাত কাটল বলে। এবার বোলবোলাওটা দেখে নেবেন।'

এই বলে হেসে, আর একবার বর্ণগুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে চারিদিকে ঐশ্বর্য ও

প্রাচুর্যের যেন তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বসবার কি জো আছে মা, তেমন মাস্টার নয় অমর্ত্য মিত্তির—আবার তার সঙ্গে সোনায় সোয়াগা এসে জুটেছেন সায়েব, দু-ই কড়া হাকিম—রিয়েসালে দেরি হ'লে কাউকে রেয়াৎ করবে না, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে। ...চলো ভাই, চলো—'

এটা সবটাই পূর্ব পরিকল্পিত কিনা বুঝতে পারে না সুরবালা। যে কথাগুলো বলে এলেন ইনি—স্তোকবাক্য না বিদ্রূপ, নিহাৎ সৌজন্যের বিনিময় না আর কিছু—ঠিক করতে না পেরে আরও ছট্‌ফট্‌ করে মনে মনে।

সেদিন আগেই পুরো শাটখানা পড়া হ'ল। নাটকটা লেখা হয় একরকম, তারপর অভিনয়ের সুবিধের জন্যে কাটছাঁট অদল-বদল করা হয়। যেমনটি দাঁড়ায়, মানে যেমনটি অভিনয় হবে—সেইটেকেই 'শাট' বলে। সুরবালা এসব কিছুই জানত না। প্রম্পটার হরিপ্রসন্ন বুঝিয়ে দিল তাকে। ছাপা বই দেখে প্রম্প্‌ট্‌ করা চলে না, তাই যেসব নাটক ছাপা বাজারে পাওয়া যায়, তা থেকেও শাট তৈরী ক'রে রাখা হয় নাকি। প্রম্পটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই শাট দেখে পাত্র-পাত্রীদের কথার খেই ধরিয়ে দেয়।

পড়া শেষ হ'লে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি একটু বুঝিয়ে দিয়ে 'পার্ট' বিলি ক'রে দিলেন অমর্ত্যবাবু। জি-সি ছিলেন না, বাকি সবাই ছিল। দু-তিনটে বড় পার্ট বিলি করার পরই হীরার পার্ট লেখা কাগজের তাড়াটা ইঙ্গিতে সুরবালাকে ডেকে তার হাতে দিলেন। যার যতটুকু বক্তব্য—সেইটুকু শুধু নকল করিয়ে—বাকি এই চরিত্রের সঙ্গে যারা যে-দৃশ্যে কাজ করবে, তাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রথম ও শেষ কটা শব্দ মাত্র রেখে—আলাদা আলাদা লিখে দেওয়া হয়, মুখস্থ করার জন্যে। আগে থাকতে মুখস্থ থাকলে রিহার্স্যালের সুবিধা হয় অনেক।

কথাটা জানাই ছিল, এখানে 'যা রটে' তা প্রায়ই ঘটে। তবু সুরবালাকে ডেকে পার্টটা হাতে দেবার সময় হঠাৎ যেন চারিদিকে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। নীরবে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল এদিকে।

এদের মুখভাব দেখতে পেল না সুরবালা, কিন্তু অনুমান করতে পারল, অবস্থা বা চারিদিকের আবহাওয়াটাও অনুভব করতে পারল। এ-অবস্থা যে স্বাভাবিক নয়, কিছুক্ষণ পূর্বের মৃদু গুঞ্জন যে অকস্মাৎ থেমে গেল কেন—তা অনুমান করা কঠিন নয়। এ-নিস্তব্ধতা ঝড় ওঠারই পূর্বলক্ষণ। এখানের স্তব্ধ বাতাসে বজ্র-বিদ্যুতের পূর্বাভাস।

পার্টটা হাতে দিয়ে অমর্ত্যবাবু বললেন, 'বইটা পড়েছিলে তো—যা বললুম তাও শুনলে। আজ বাড়ি গিয়ে পার্টটা মুখস্থ ক'রে ফ্যালো। কাল তিনটেয় রিহার্স্যাল বসবে, সেই সময় মুখস্থ ধরব। সেই সময়ই দেখব তুমি কি বুঝেছ, কেমনভাবে বলো—তারপর আমি যা শেখাবার শেখাব। খাটতে হবে বাপু। তুমি তো নতুন—এ-পার্ট করতে পাকা য়্যাকট্রেসরাই হিমসিম খেয়ে যায়!'

কে যেন পিছন থেকে খুব আস্তে কি বলে উঠল। সুরবালার মনে হ'ল কে বলল, 'ওরে বাবা, পাকারাই তো হিমসিম খাবে! কাঁচাদের তো সাতখুন মাপ—পাকাদের তো আর তা নয়। কচিমুখে আধো বুলি—যা বলবে তাই শোভা পাবে।'

কে তার জবাবে বললে, আরও আস্তে, 'কচির সবই ভাল, চিবিয়ে খেতেও কচিই ভাল লাগে, বুড়ো জিনিস দাঁতে লাগে, জিভে বিস্বাদ ঠেকে।'

অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে অতি সামান্য শব্দও কানে যায়। অমর্ত্যবাবুরও কানে গিয়ে থাকবে—তিনি কঠিন দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইলেন একবার। সঙ্গে সঙ্গেই আবার তেমনি বিদ্যুৎ-গর্ভ নিঃশব্দতা নেমে এল।

এরপর আরও কিছুক্ষণ পার্ট বিলি চলল। দু-একজন খুচরো দু-একটা কথা বললেও

আগের সে গুঞ্জন আর উঠল না।...

পার্ট বিলি হচ্ছিল স্টেজে বসে, যাদের পাওয়া হয়ে যাচ্ছিল তারা তা নিয়ে সকলেই স্টেজের বাইরে—অর্থাৎ ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। গ্রীনরুমেই বেশী জটলা। একমাত্র সুরবালাই শেষ পর্যন্ত বসে ছিল। ইচ্ছে ক'রেই ওঠে নি। সব শেষ হতে উঠে ভেতরে এল। এখনই স্টেজে রিহার্স্যাল শুরু হবে, এখন আর বসে থাকার কোন অজুহাত নেই।

গ্রীনরুমের জটলার মধ্যে এসে দাঁড়াতেই দু'তিনজন বড়দরের অভিনেত্রী, যাঁদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় নেই—যাঁরা সূর্যমুখী দেবেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বড় বড় পার্ট পেয়েছেন এইমাত্র—চন্দ্রমণি, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি, তাঁরা খুব অমায়িকভাবে ওকে ডাকাডাকি শুরু করলেন, 'এই যে—এসো ভাই, এসো।' 'এখানে এসো ভাই—এই যে এদিকে—'

আগের স্তব্ধতাও যেমন স্বাভাবিক নয়, এখনকার স-কলরব অভ্যর্থনাও তেমনি একটু বেশী অমায়িক। সুরবালা বিব্রত বোধ ক'রে সামনেই একটা চৌকির কোণে যে খালি জায়গাটুকু ছিল—সেইখানে বসে পড়ল। যার পাশে বসল, সে মেয়েটিও প্রায় নবাগতা, সেও এতকাল 'সখী'শ্রেণীভুক্ত ছিল—সম্প্রতি ছোটখাটো পার্ট পেতে শুরু করেছে। সে বললে, 'ভালই হ'ল ভাই, য্যাদ্দিনে তবু তোমার উপযুক্ত পার্ট পেলে! যদি ক্ষ্যামতা থাকে—এবার আখেরের কাজ করে নিতে পারবে।' কণ্ঠস্বরে হৃদ্যতার অভাব ছিল না, কিন্তু সুরবালার মনে হ'ল একটু বেশী রকমেরই হৃদ্যতা। এতটা বেশী চেষ্টা না করলে হয়ত গলার কাছে উপ্‌চে ওঠা বিষ ঢাকা যেত না।

এই অভ্যর্থনার আধিক্যেই সম্ভবত সুরোর নজরে পড়ে নি—নানুও এদের মধ্যে বসে ছিল। কোথাও বোধহয় কারও বেগারে—অর্থাৎ কারও বাড়ি অসুখবিসুখে রাত জাগতে হয়েছে পর পর, দুই চোখ লাল, মুখে কালি—শ্রান্তভাবে একপাশে জড়ো করা একটা শতরঞ্চির ওপর বসে ছিল ; সে এবার বলে উঠল, 'কী বাবা, হঠাৎ রাতারাতি তোর কপাল ফিরে গেল নাকি সুরো? কোথাও কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছিস—হ্যাঁ রে? আজ তোর এত খাতির দেখছি যে!'

সুরোর মুখ তখন সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠেছে, এই ঠাণ্ডার মধ্যেও তার কপালে ঘামের রেখা। সে কোন উত্তর দিতে পারল না, কোনমতে মাথাটা তুলে বসে রইল শুধু। সে যখন কোন অন্যায় করে নি, মাথা নিচু করবে কেন? কিন্তু একটা অসহ্য ক্রোধ আর অপরিসীম ঘৃণায় তার সমস্ত মন তখন বিষিয়ে উঠেছে, উত্তর দেবার মতো অবস্থা নয় তার।

সে প্রয়োজনও হ'ল না অবশ্য। তার হয়ে জবাব দিলেন এইমাত্র যিনি দেবেন্দ্র দত্তের বড় এবং দুরূহ পার্ট নিয়ে এলেন তিনিই—বেশী গান আছে বলে আর মেয়েছেলে সাজতে হয় বলে পুরুষের ভূমিকা হ'লেও দেবেন্দ্র দত্তের পার্ট নাকি মেয়েদেরই দেওয়া হয়—জর্দা দেওয়া পানের পিক্‌টা বাঁচাবার চেষ্টায় মুখটা একটু ওপর দিকে তুলে বললেন, 'তা খাতির করতে হবে বৈকি, এখন তো ওরই দিন। এখন থেকে একটু সুনজরে থাকা ভাল।'

আর একজন টুক ক'রে বলে উঠলেন, 'এবার থেকে আর তোকে সুপারিশ ধরতে হবে না নানু। এখন আমরা ভাল লোক পেয়ে গেছি, আমাদের আপনার লোক!'

এসব ইঙ্গিতের অর্থ পরিষ্কার, তবু এমন স্পষ্ট নয় যে জবাব দেওয়া যায় অথবা ঝগড়া করা যায়। দিতে গেলে 'ঠাকুরঘরে কে, না আমি তো কলা খাই নি' সেই প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ নিরপরাধেও। সুরো ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার তো আর আজ এখন কোন কাজ নেই, আমি বাড়ি যাই না নানুদা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,—তাই যা। তোর মুখ শুকিয়ে গেছে। খেয়ে আসিস নি বুঝি? চ, আমি আবদুলকে বলে দিয়ে আসছি, তোকেই এক খেপ পেঁছে দিয়ে আসুক—'

কত কী প্রশ্ন করবে ভেবেছিল নানুকে, কত কি জানবার ছিল—এখন সে সব কিছুই করা গেল না। কথা বলারই শক্তি নেই যেন। মনের মধ্যেটা রি রি করছে, অপবিত্র ক্লেদাক্ত কিছু স্পর্শ করার মতো ঘৃণা বোধ হচ্ছে। শুধু গাড়িতে উঠতে উঠতে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এ—এ সব কি অসভ্যতা নানুদা! তোমাদের কি এই রকমই চলে এখানে?'

নানুও খুবই শ্রান্ত, অভ্যস্ত ভাঁড়ামিতে জবাব দিতে পারল না। হেসে বলল, 'তা ভাই বড় গাছে নৌকো বেঁধেছিস—ঝড়ঝাপ্‌টা কিছু সইতে হবে বৈকি। ঝড় এসে উঁচু জায়গাতেই আগে পেঁছয় জানিস তো—সেখানে যারা থাকে কাছাকাছি—তাদেরও খানিকটা ভাগ পেতে হয়। বরং আঘাত তাদেরই বেশী লাগে, পাড়ে বাঁধা নৌকোই ঝড়ের হাওয়ায় কি বানের তোড়ে আছড়ে পড়ে ভাঙে, যে নৌকো ভাসছে সে টিকে থাকে।'

'তোমাদের এখানে বুঝি হিংসে আর বিষ ছাড়া কিছু নেই! যারা অনেক উঁচুতে উঠেছে তাদেরও এত রীষ কিসের?'

'যে উঁচুতে উঠেছে তার যে পড়বার ভয় আছে এটা ভুলে যাচ্ছিস কেন, মাটিতে যে আছে তার আর ভাবনা কি, তার তো লবডঙ্কা। যে পেয়েছে তারই সদা হারাই হারাই ভয়।' বলতে বলতে গলাটা কেমন যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'আয়নাতে নিজের চেহারা নজরে পড়ে না বুঝি ছুঁড়ি? না কি গলাটা কেমন শোনায় গাইবার সময় তা বুঝতে পারিস না? দোষ তোরও নয় ওদেরও নয়—দোষ ভগবানের। ভগবান তোকে এত দিয়েছেন যে যেখানে যাবি সেখানেই অন্য মেয়েদের মনে রীষের আগুন জ্বলবে। তুই এখন কতটা উঠেছিস তা তো ওরা দেখছে না—আরও কতটা উঠতে পারিস সেই হিসেব করছে যে। আচ্ছা, যা এখন—বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে নে, হঠাৎ কোন পাগলামি ক'রে বসিস নি।'

নানু ঠিকই ধরেছিল, সে সময়ে দিক্‌বিদিক-জ্ঞান-হারানো হঠাৎ-পাগলামিতেই পেয়ে বসেছিল তাকে। অত তাড়াতাড়ি গাড়ি ঠিক না হ'লে—আর কিছুক্ষণ ঐ টিট্‌কিরি আর আপাতমধুর বাক্যবাণ সইতে হ'লে সে বোধ হয় পাগল হয়ে যেত, তখনই হয়ত অমর্ত্য-বাবুর মুখের সামনে পার্টটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে চলে আসত। নানুই বাঁচিয়ে দিল তাকে।

নানুর কথামতো বাড়িতে ফিরে মাথার সামনেটায় একটু জল থাবড়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম আসে নি—তবু মাথাটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল ঠিকই। ফলে মধ্যাহ্নের সে মনোভাব রাত্রে থাকে নি, বরং মজা দেখার মনোভাবই জেগেছে, 'আচ্ছা, দেখাই যাক না ওরা কতদূর এগোতে পারে। আমি নির্বিকার থাকব, আর আমার মনে তো পাপ নেই—ওরাই নিজেদের বিষে জ্বলে পুড়ে খাক হবে।'

পরের দিন বিকেলে তাই যখন রিহার্স্যালে গেল তখন আর আগের দিনের উষ্ণতার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই, কৌতুকই তখন প্রবল। ওদের আপাতঅমায়িক ব্যবহার খুব সহজভাবেই নিল সে। নিজের ব্যবহারেও কোন ত্রুটি ঘটতে দিল না। এ অমায়িক-তাকে সে স্বাভাবিক ভাবেই বাহ্যমূল্যে গ্রহণ করেছে—এইটেই বুঝিয়ে দিল নিজের কথায় বার্তায় আচরণে।......

রিহার্স্যালের প্রথম পাঠ হিসেবে—সুরো নিজে যেমন বুঝেছে তেমনি ভাবেই বলল খানিকটা। মনে হ'ল ভালই বলেছে। অমর্ত্যবাবু তো খুব বাহবা দিলেনই, স্বয়ং সাহেব সুদ্ধ বললেন, 'না হে, তুমি ঠিকই ধরেছ,—এর মধ্যে জিনিস আছে, গড়ে-পিঠে নিতে পারলে কালে ভালই দাঁড়াবে।'

সাহেবের কড়া মাস্টার এবং পাকা জহুরী বলে খ্যাতি আছে, তাঁর প্রশংসা পাওয়া ভাগ্যের কথা—এ সকলের মুখেই শুনেছে সুরবালা। তাছাড়া তিনি নিজেও বড় অভিনেতা একজন। স্বয়ং জি. সি. ছাড়া তাঁর সমকক্ষ নাকি কেউ নেই।

'তা তুমি একটু দেখিয়ে দাও না।' অমর্ত্যবাবু বললেন, 'তোমার হাতে পড়লে গাধাও

ঘোড়া হয়।'

'গাধাগুলোই থাক বরং আমার জন্যে।' সাহেবও হেসে জবাব দিলেন, 'একে তুমিই মানুষ করতে পারবে।'

কান এদিকে থাকলেও সুরবালা লক্ষ্য করছিল অন্য মেয়েদের। তাদের মুখে যে বিপুল বিস্ময় ফুটে উঠেছে তা তারা অতটা বুঝতে পারে নি বোধ হয়—বুঝতে পারলে সামলে নিত। সামলে নিলও শেষ পর্যন্ত—একটা নৈর্ব্যক্তিক নিস্পৃহতা ফুটিয়ে তুলল—কিন্তু সেই অল্পক্ষণের অসতর্ক অবস্থাটা সুরবালা দেখে নিয়েছে, তাতেই সে খুশী, সেইটেই তার বিজয়-গৌরব।

দুদিন সাধারণ রিহার্স্যাল চলল। এক দিন সকাল থেকে চারটে অবধি চলবার কথা। সেদিন শনিবার, অমর্ত্যবাবু সুরোকে বলে দিলেন, 'তোমার সকালে আসবার দরকার নেই। তুমি তৈরী থেকো, তিনটেয় গাড়ি যাবে। এদের কাজ শেষ হ'লে তোমাকে নিয়ে পড়ব। তুমি রিহার্স্যাল দিয়ে প্লে সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে। বাড়িতে তাই বলে এসো। তোমাকে অবশ্য শেষ অবধি থাকতে হবে না—তোমার তো প্রথম দুটো য়্যাক্‌টেই যা গান আছে কটা—তুমি কাজ শেষ হ'লে আগে সকাল ক'রে চলে যেয়ো, আমি আবদুলকে বলে রাখব।'

সহজ স্বাভাবিক কথা। কিন্তু উপস্থিত অনেকেরই ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির আভাস দেখা গেল। অতি সামান্য অবশ্য, হাসি না বলে হাসির ইশারা বলাই উচিত। এর অর্থ অতি পরিষ্কার। সুরবালারও বুকটা যে একবার কেঁপে না উঠেছিল তা নয়। এইটেই তার অগ্নিপরীক্ষা। আবার প্রায় তখনই মনে জোর আনল। শশীবৌদির কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, 'কেউ নিজে নষ্ট না হ'লে তাকে নষ্ট করা যায় না। পদ্মিনীর গল্প শুনেছিস তো, তার জন্যে একটা রাজ্য ছারখার হয়ে গেল—যা লোক মরেছে শুনেছি তাদের পৈতের ওজনই সাড়ে চুয়াত্তর মণ—যা থেকে সাড়ে চুয়াত্তর দিব্যি হয়েছে—কিন্তু তবুও পদ্মিনীকে পারল নষ্ট করতে? সে তো হাসতে হাসতে স্বর্গে চলে গেল।...আর জোর ক'রে যদি কেউ কিছু করেও—তাতে আত্মাটা তো নষ্ট হয় না। সে রকম ব্যাপারে মেয়েটার কোন পাপ হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

স্বেচ্ছায় নষ্ট হবে না সে, কোন কিছুর লোভেই নয়।

আর জোর? ঐ প্রায়-বৃদ্ধ মানুষটা জোর ক'রে তাকে কাবু করতে পারবে বলে মনে হয় না।......

অবশ্য অগ্নিপরীক্ষাটা আর শেষ অবধি দেবার প্রয়োজনই হ'ল না।

সেদিন বাড়ি ফিরে দেখল তার বাবা সেই অসময়েই শুয়ে পড়েছেন। প্রথমটা ভেবেছিল শরীর খারাপ, ব্যস্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে খবর নিতে যাচ্ছিল—কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা খটকা লাগল। ভবতারণ ওদিকে ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে আছেন, সুরোর গলা পেয়েও এদিকে ফিরলেন না। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক। যত অসুস্থই হোন, আর সে যত রাত্রেই ফিরুক—গাড়ির শব্দ আর পায়ের আওয়াজ পেয়ে এদিকে ফিরে তার কুশল প্রশ্ন করেন নি বা তাকে দেখে স্নেহে আনন্দে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি—এমন একদিনের কথাও মনে পড়ে না।

তবে কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

সে ওঁকে আর বিরক্ত করল না। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে মায়ের সন্ধানে গেল। নিস্তারিণী অন্যদিনের মতোই রান্নাঘরে ছিল, কিন্তু দেখল সেখানেও অবস্থাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। উনুন নিভনো, রান্নাও হচ্ছে না—তবু সেই উনুনের ধারেই মুখ অন্ধকার ক'রে বসে আছে সে।

'হ্যাঁ মা, বাবা এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যে? শরীর খারাপ নাকি? কী হয়েছে বাবার?'

নিস্তারিণী যেন এই প্রশ্নটার জন্যেই এতক্ষণ কষ্টে অপেক্ষা করছিল, সে ফেটে পড়ল এবার, 'তোমার মতো কুল-উজ্জ্বল-করা মেয়ে যার—তার আর শরীর খারাপের অপরাধ কি বাছা? একেবারে ঘুমিয়ে না পড়া পজ্জন্ত তো আর শান্তি হবে না। সেইটে হচ্ছে না বলেই তো যত জ্বালা।...পোড়ারমুখো বিধেতা যত ভরভরন্ত সংসার ভেঙ্গে ঘরুণী গিন্নীদের টেনে নিতে পারে—আমাদের বেলায় একবার মনেও পড়ে না যে যমদূতদের খবরটা দেবে!'

'তার মানে? নতুন এমন কি হ'ল আবার?'

অসহ্য ক্রোধে মাথার মধ্যে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলেও সে অসহিষ্ণু হয় না, শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করে।

'আর কি হ'তে বাকি আছে? আরও কি চাও?...এতকাল কত বড় বড় কথাই না শুনে এলুম। সেই যদি ধম্মটাই দিলি, একটা তুচ্ছ জিনিসের জন্যে একটা বুড়োর কাছে খুইয়ে বসে রইলি! পরকালও গেল, এহকালেও কিছু হ'ল না। কী না বড় পার্ট দেবে সে। ওতে তোর কী জ্ঞাতগুষ্ঠি উদ্ধার হ'ল তাই শুনি? ক পয়সা পাবি তুই? কত টাকা মাইনে হবে তোর? তাতে কোঠাবালাখানা উঠবে—না জুড়িগাড়ি চড়তে পারবি?'

সবটাই অন্ধকার ছিল এতক্ষণ, এইবার যেন কোথায় একটা ঝাপ্সা ঝাপ্সা অস্পষ্ট আলোর আভাস পায়।

'আমি ধর্ম দিয়েছি—বড় পার্টের জন্যে? বুড়োর কাছে? এসব কে বললে তোমাদের? কার কাছে শুনলে এসব কথা?'

'যার কাছেই শুনি না—হ্যাঁ কি না তাই জবাব দে না!'

'জিজ্ঞেস তো কিছু করো নি মা যে জবাব দোব! একেবারে ধরেই তো নিয়ে বসে আছ! যে মেয়েকে বলতে গেলে জন্মের থেকে মানুষ করলে, এতকাল দেখলে—তাকে বিশ্বাস হ'ল না—এক কথায় বিশ্বাস ক'রে বসে রইলে অজানা অচেনা কে পর কি বলে গেছে তার কথায়।...তোমাকে কি জবাব দোব, তোমার সঙ্গে কথা কইতেই আমার ঘেন্না হচ্ছে।'

আর দাঁড়াল না সেখানে সুরবালা। সোজা এসে বাবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমিও ঐ কথা বিশ্বাস করলে বাবা? একবার বলো বিশ্বাস করেছ—আর কিছু বলব না, আমার জন্যে তোমাদের মুখ হেঁট হ'তে দেব না, এ মুখও আর দেখাব না তোমাদের। গঙ্গার জল তো এখনও শুকোয় নি, সেখানে আমার মতো একটা মানুষের ঢের ঠাঁই হবে। গঙ্গায় গিয়ে গা ঢালা দোব নিজের কোন লজ্জা ঢাকতে নয়—যাবো এর পরও যদি তোমাদের সঙ্গে ঘর করতে হয়—এই ঘেন্নায়!'

ভবতারণ ধড়মড় ক'রে উঠে বসে মেয়েকে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে মা, সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে! আমি জানি তুই আমার লোভে পড়ে কোনদিন কোন ছোট কাজ করবি না। তুই মাপ কর মা, বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, মাথার ঠিক নেই আর। ভীমরতি মনে ক'রে এইবারটি মাপ কর।...ওরা এমনভাবে এসে বললে—'

আবেগে দুঃখে ভবতারণ বুকটা চেপে ধরে হাঁপাতে লাগলেন।

সুরবালা তাড়াতাড়ি তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুমি স্থির হও বাবা, তুমি বিশ্বাস করো নি—এইটেই আমি জানতে চেয়েছিলুম। আর আমার কোন দুঃখ নেই। সংসারে আর কে কি ভাবল কিম্বা কি বলল তার জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তুমি ঘুমোও, আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দিই—'

সেদিন আর কোন কথাই হ'ল না। স্বামীর হাড়-ভাজাভাজা-করা ভালমানুষীতে গা জ্বালা করতে থাকলেও নিস্তারিণী আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। কিন্তু কৌতূহলে ছট্‌ফট করতে লাগল মনে মনে। মেয়ের কঠিন কথাতে যত না হোক—কঠিনতর মুখের দিকে চেয়ে দমেই গিয়েছিল একটু। মেয়েটা যদি আর একবার জিজ্ঞাসা করে—কে এসেছিল, বেড়িয়ে যাবার নাম ক'রে বাড়িতে ঢুকে বিষ উদ্গার করেছিল—তাহলে সে সবিস্তারে সবটা বলে বাঁচে, কে ওর মেয়ের এমন বন্ধু তাও বোঝা যায়।

'এই এলুম একবার বেড়াতে বেড়াতে, আপনি আমাকে চিনবেন না মা, আপনার মেয়ে চেনে—আমি তার খুব বন্ধু। বলি এদিকে এলুম—এ পাড়ায় তো আসা হয় না বড় একটা—তা এলুম তো দেখেই যাই একবার আমাদের সুরোর আস্তানাটা। অবিশ্যি বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না এটাও ঠিক, দেখবেন এবার চড়চড় ক'রে উন্নতি হবে। তবে এও বলি মা, এখানে যত উন্নতি হোক—মাইনে আর কত হবে যে বিরাট কোঠাবালাখানা তুলতে পারবে—কি অঙ্গে গহনা উঠবে দু-এক শো ভরির? যে লাইনের যা, মাইনেতে আর আমাদের কী হয় মা?...বোকা বোকা! সেই জাতটাই যদি খোয়াল, ধম্মটাই যদি দিল—একটা উঁচুদরের লোকের কাছে দিলে পারত! ওর যা চেহারা—তবু তো তেমন ছেলাবতে থাকে না—ও রূপের সঙ্গে ভাবন থাকলে মুনির মন টলে যায়! তা সে মরুক গে, এমনিতেই কি আর বড়লোকের অভাব হ'ত? তু ক'রে ডাকলে কত গাড়িজুড়ি দোরে এসে ভিড় করত! ও বুড়োর আর কতটুকু ক্ষ্যামতা—কী বলো মা?...হ্যাঁ, নাম ক'রে দিতে পারবে—সেটুকু ওর হাতে আছে মানছি! কিন্তু তাতে কি আর পেট ভরবে!...তবে হ্যাঁ, বুড়ো আর কদিন, একবার নাম ক'রে নিতে পারলে ওর হাত এড়াতে বেশী দেরি লাগবে না এটাও ঠিক, তখন অবিশ্যি বেছে বেছে মানুষ ধরতে পারবে।' ইত্যাদি—। তারপর নিস্তারিণীর প্রশ্নের উত্তরে বাকী যা বলবার সবই বলে গেছে, কিছুই বাকী রাখে নি।

নিস্তারিণী তার মুখের তোড়ে যেন থতিয়ে গিয়েছিল। এত কথা যে কেউ মিথ্যা বলতে পারে তা ওর একবারও তখন মনে হয় নি। এখন মনে হচ্ছে সত্যি হোক মিথ্যে হোক—দু-চার কথা শুনিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল ওর। ও কেন খামকা অপরিচিত পরের কাছে নিচু হতে গেল—ছোট হয়ে অপরাধী বনে রইল! মুখে দড় থাকতে কোন দোষ ছিল না তো! উল্‌টে বোকার মতো লজ্জিত হয়ে মরমে মরে থেকে তার কথাটাই আরও সত্য প্রমাণ ক'রে দিল।

কিন্তু এসব আপসোস এখন আর ক'রে লাভ নেই। তবু নাম বা পরিচয়টা জানতে পারলেও ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা ক'রেও সে কিছু চোটপাট ক'রে আসতে পারত। মেয়েকেও সমঝিয়ে দিতে পারত যে এইসব তোমার বন্ধু!...কথাগুলো নিয়ে যত তোলাপাড়া করতে লাগল—ততই যেন উত্তেজিত বোধ করতে লাগল—আপসোসও সেই অনুপাতে বেড়ে চলল। তবু এখনও এটা তার মাথায় গেল না, এমন কোন মানুষ কারও বন্ধু হ'তে পারে না। যে এত মিথ্যা বলতে পারে, বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়াটা তার পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আর ঐসব নষ্ট মেয়েমানুষদের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া ক'রে আসাও নিস্তারিণীর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু সে সবই পরের কথা। কে এসেছিল সেটা জানতে পারলেও কিছুটা স্বস্তি পেত সে। কৌতূহলটাই আপাতত বেশী বেদনাদায়ক! কিন্তু পোড়ার মেয়ে একবার জিজ্ঞাসাও করল না যে!...

পরের দিন ঠিক তিনটেতেই গাড়ি এল। অন্য দিন সুরবালা মাকে বলে রাখে কখন বেরোতে হবে। ভবতারণের একটা ঘড়ি ছিল—পয়সার অভাবেই বহুকাল তাতে তেল দেওয়া হয় নি—বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তা ঘড়ির খুব দরকারও হয় না, নিস্তারিণী আলোর

দিকে চেয়েই মোটামুটি সময় বুঝতে পারে, ওকে তাগাদা দেয় তৈরী হয়ে নেবার জন্যে। আজ কিছুই বলে নি, নিস্তারিণীও ভরসা ক'রে প্রশ্ন করতে পারে নি। কাল সেই সন্ধ্যে থেকেই মেয়ে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন গাড়ি এসে দাঁড়াতে ঘরের সামনে থেকে—যেন বা দেওয়ালটাকেই উদ্দেশ ক'রে বলল, 'গাড়ি তো এসে হাজির হয়ে গেল, তা এদিকে তো কোন উয্যুগ সঙ্গোগই দেখছি না। দাসীবাঁদীকে একবার মুখের কথাটা খসিয়ে জানিয়ে রাখলেই হ'ত—আমার আর কোন্‌কালে হায়াপিত্তি আছে, আমি ঠিকই লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে ডেকে দিতুম। বাপসোহাগী বাপের কোন দোষ দেখতে পান না, যত বজ্জাত এই মা মাগী। হাত্তোর কপাল বটে!...এই পাজী বদমাইশ মেয়েছেলেটা না থাকলে বাপকে কোথায় পোঁতিস তার তো ঠিক নেই!'

সুরবালা শুয়ে শুয়ে একখানা পুরনো বঙ্গবাসী পড়ছিল। এ আক্রমণের কোন জবাব দিল না, শুধু দরজার কাছে গিয়ে কোচোয়ানকে ডেকে বলল, 'তুমি চলে যাও আবদুল—আমি যাবো না।'

'এখন যাবে না দিদিমণি? তবে কখন যাবে? আমি কি একশবার এদিকে আসব?' অপ্রসন্নমুখে প্রশ্ন করে আবদুল।

'আর আসতে হবে না। তুমি বাবুদের বলে দিও—আমি আর কোনদিনই যাবো না। ওঁরা যেন আমাকে বাদ দিয়েই ব্যবস্থা করেন।'

'সে সব কথা যা বলবার তুমি ব'লো। না হয় তো খৎ লিখে ভেজে দিও। আমি কোচোয়ান মানুষ গাড়ি চালাই—আমার অত কথায় কাম কি?'

গজ গজ করতে করতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সে।......

খানিক পরেই যথারীতি ভগ্নদূত এল—নানু দত্ত।

ওকেই আশা করেছিল সুরবালা। উঠে নিজে মাদুর থেকে নেমে মেঝেয় বসে মাদুরটা দেখিয়ে বলল, 'বসো।'

'কী হ'ল রে আবার?' বসতে বসতেই প্রশ্ন করে নানু।

'কী হ'ল তুমিই তো জানো। তোমারই তো জানবার কথা। তুমিই তো আমাকে সাবধান করেছিলে।'

গতরাত্রের ঘটনা খুলে বলল সে। গত কদিনের ঘটনাও। নানুর সঙ্গে যে-কদিন দেখা হয় নি—সেই কদিনের ঘটনা।

সব শুনে নানু চুপ ক'রে রইল। বলল, 'হ্যাঁ, এটা হবে তা জানতুম। জানতুম মানে—ওদের জ্বালাটা জানা ছিল। তবে মাস্টার-মশাইয়ের দিক থেকে যে কোন সত্যিকারের বিপদ আছে আমি মনে করি না। ওদেরও নতুন নতুন লোক গড়ে তোলা দরকার—নইলে পুরনোদের বড় দেমাক হয়ে যায়, কাজ চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। এদের সব অম্বল-চাখা অভ্যেস তো—দুদিন অন্তর এ থিয়েটার ও থিয়েটার ক'রে বেড়ায়।'

তারপর বললে, 'সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম, তবু ভেবেছিলুম তুই যা শক্ত—তুই ওদের ঘা ঠিক সইতে পারবি।...কিছু না, চুপ ক'রে থাকলেই ওদের মুখের মতো জবাব দেওয়া হ'ত। নিজেদের আগুনেই নিজেরা জ্বলে পুড়ে মরত।'

'আর কাজ নেই নানুদা। ঢের হয়েছে। অপরকে জ্বালাতে গিয়ে নিজেকেও কিছুটা জ্বলতে হ'ত। ওদের ওপর আমার অত রাগ নেই। ওদের দোষ কি, যেমন শিক্ষা পেয়েছে তেমনিই আচরণ ওদের। শশীবৌদির কথাই ঠিক—কালীয় নাগকে বিষই দিয়েছেন ভগবান—সে বিষ ছাড়া আর কি ছড়াবে?...এমনিতেই আমার ভাল লাগছিল না—তার ওপর এই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে অশান্তি—যা আমি ওদের মতো ভাগ্যি বলে মনে করি না—তাই নিয়েই এত রেষারেষি এত বিষ—ও আর আমার দরকার নেই। ও যাদের ভাল লাগে তারাই নিক।'

'তা তোর এখন চলবে কিসে?' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নানু প্রশ্ন করল।

'জানি না। এ-ই বা আর কি চলছিল। এক বাড়িভাড়াটা। দেখা যাক। এতকাল তো ভগবান চালিয়ে দিলেন। এবারও যা হয় তিনিই করবেন। এ কাজও তো ধরো দৈবাৎই পেয়ে গিয়েছিলুম। কিছুই তো জানতুম না, চিনতুমও না কাউকে। মার যদি ইচ্ছা হয় মা-ই পথ ক'রে দেবেন—না হয়, তাঁর মনে যা আছে তাই হবে। ও আর আমি ভাবব না।'

'দ্যাখ, যা বুঝিস।' নানু চলে গেল।

তার পরও দু'চারজন কর্তাব্যক্তি এসেছিলেন। এসেছিলেন স্বয়ং অমর্ত্যবাবুও—ধর্মদাসকে সঙ্গে ক'রে, কিন্তু কেউই আর সুরোকে থিয়েটারে যেতে রাজী করাতে পারল না। কারণও বলল না কিছু। হয়ত ওঁরাও কিছু আঁচ ক'রে থাকবেন—কারণ জানবার জন্য ওঁরাও বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না।

কেবল শশীবৌদিই সব শুনে বললেন, 'বেশ করেছিস। একটা কুগ্রহ কাটল। সাতটা তুলসী পাতা মাথায় দিয়ে গঙ্গাচান ক'রে আয়। ভগবানের ওপর ভরসা করেছিস, তাঁর ওপরই পূর্ণ বিশ্বাস রাখ। তিনিই যা হোক একটা গতি করবেন।'

ভগবান বোধ হয় এই পূর্ণ বিশ্বাস আর নির্ভরতার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন। এইবার তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মতির কাছ থেকেই ডাক এল আবার।

॥ ১৪ ॥

অবশ্য সেইদিনই কি তখনই নয়। ডাক এল—যখন সত্যিই সুরবালাদের অবস্থা চরমে উঠেছে। দিন আর কাটছে না। এর পর একদিন বাড়িওলা নালিশ ক'রে পেয়াদা এনে ঘটিবাটিসুদ্ধ বোধহয় ক্রোক করবে—তারই দিন গুনছে সুরো।

নানু করেছে ঢের। তার সাধ্যাতীত করেছে। ওখানের পরিচিতদের মধ্যে নানুই নিয়মিত তার খবর নেয়। কোন কোন দিন হয়ত ঘি ময়দা একরাশ বাজার এনে নামিয়ে বলে, 'জননী, পরোটা ভাজো দিকি খানকতক।...তোমার হাতের পরোটা খাওয়ার ঐ তো জ্বালা। একবার খেলে আর অন্য কারও পরোটা মুখে লাগে না। গরম পরোটা আর কপির ডালনা। সেই সঙ্গে যজ্ঞিবাড়ির মতো ফালাফালা বেগুনভাজা। কী বল্ রে?'

সুরোর দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলে, 'মাগীর ঐ বড় দোষ, মাগী রাঁধে ভাল।' বলা বাহুল্য, সে সব বাজার একদিনে কেউ খেতে পারে না, সেইভাবেই বাজার করে নানু, যাতে আরও পাঁচ-ছ'দিন এদের চলে যায়।

এর মধ্যে টাকাও দিয়ে গেছে বার দুই তিন। কোনদিন পাঁচ কোনদিন বা চার। খুচরো টাকা। এ টাকা যে সহজে সংগ্রহ হয় নি তা সুরবালা জানে। হয়ত মার কাছ থেকেই চেয়ে এনেছে শরীর খারাপ বলে। নানুই কথাটা বলেছিল একদিন, 'যখন দেখি মা এমনিতে দিচ্ছে না, মুখটা শুকিয়ে একদিন গিয়ে বলি, অম্বুকটা হয়েছে—হয়ত বলি মাথাতে ন্যাবা হয়ত—তা ডাক্তার যা ফিরিস্তি দিয়েছে ওষুধের—সে আর আমার সাধ্যি নয় কেনা।

...দেখি সামনের মাসে-টাসে যদি মাইনের টাকা কিছু আদায় হয়।...অমনি মা সুড়সুড় ক'রে বার ক'রে দেয় টাকা। এমনি একবার বলেছি, সেদিন অবিশ্যি সত্যিই শরীরটা একটু খারাপ ছিল, জ্বর-জ্বর মতো—দেখি তোর সতীলক্ষ্মী খাবারের পুঁটুলির মধ্যে আরও পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। বুঝলুম বাবা কি ভাইদের কারুর ঘাড় ভেঙেছে। সবাই তো ওর বশ, মুখের কথা খসালেই হ'ল।'

এ একরকম ভিক্ষাই নেওয়া।

বিশেষ কীভাবে টাকাটা সংগৃহীত হচ্ছে জানবার পর আর কিছুতেই নেওয়া উচিত নয়—তবু সুরো হাত পেতে নেয়। কে জানে কেন, নানুকে ওর সঙ্কোচ হয় না। কিছুতেই ওর সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ হয় না। এক একদিন নানু রাত্রেও থেকে যায়। সুরো আর নিস্তারিণী এক বিছানায় শোয়, তার পাশে যে হাত-দুই সংকীর্ণ জায়গা, সেখানেই একটা কাঁথা কি দু-পাট-করা এদের কারও ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে, শীতবোধ করলে নিজের একটি অদ্বিতীয় অলেস্টার কোট আছে সেইটেই পা থেকে কোমর পর্যন্ত চাপা দেয়। কোনদিন বা—আগে থাকতে বললে সুরোই ওদের বিছানার নিচে থেকে একটা কাঁথা বার করে দেয়। নিস্তারিণী থাকে অবশ্য—না থাকলেও সুরোর বোধ করি সঙ্কোচ হ'ত না। নানুর দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হ'তে পারে—একথা তার মনেই হয় না।

তবে এসব সামান্য সাহায্যে দিন চলে না। ভবতারণ জরার প্রকোপে যত না হোক, ভাবনা চিন্তায় আরও যেন ভেঙে পড়ছেন দিন দিন, কিছুই প্রায় আনতে পারেন না আজকাল। আর যত চারিদিক থেকে অভাব চেপে ধরে, ততই নিজের অকর্মণ্যতা, অসহায় অবস্থাটা বেশী ক'রে অনুভব করেন—ভাবনা চিন্তাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। প্রতিকারের সম্ভাবনাহীন দুশ্চিন্তা। সে চিন্তার আদিও নেই অন্তও নেই—ইদানীং বোধহয় চিন্তার স্বচ্ছতাও হারিয়ে ফেলছেন, কী ভাবছেন তাও ঠিক বুঝতে পারেন না, শুধু মধ্যে মধ্যে খানিকটা কেঁদে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন যখন—তখনই কিছুটা শান্তি পান।...

নিস্তারিণী দেখেশুনে আরও প্রমাদ গণে। নানুকে ধরে পড়ে, 'তুমি বাবা একটা ঘটকীর সন্ধান দাও। যেমন ক'রেই পারি মেয়ের বিয়ে দোব এবার, কারুর কথা শুনব না। আমাদের ঘরে বড় মেয়ে—ঢের পণ পাবার কথা—তা মরুক গে, সে যা দেয় দিক—খরচটা উঠলেই হ'ল। ওকে পার করতে পারলে ওর চিন্তে গেলে বুড়োটা অন্তত বাঁচে কিছুদিন। আমাদের জন্যে কোন ভাবনা নেই—ছেলেটা তো গেছেই—আমরা বুড়ো-বুড়ী বৃন্দাবন চলে যাবো। সেখানে শুনেছি মাধুকরী করলে দিন চলে যায়। আর তাতে নাকি তেমন লজ্জাও নেই। অনেকেই করে শুনেছি—বড় বড় লোক শখ ক'রে স্বেচ্ছাসুখে মাধুকরী ক'রে খায়।'

ভবতারণ বলেন, 'তুমি ক্ষেপেছ? ঐ মেয়ের বিয়ে হবে?'

'খুব হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আমার—পেলে লুফে নেবে।'

লুফে যে নেবে না তা নানুও বোঝে, কিন্তু সেটা মুখের ওপর নিস্তারিণীকে বলতে পারে না। কোথা থেকে দুটো ঘটকীকে ধরেও আনে। তার মধ্যে ক্ষীরি নাপ্তিনী স্পষ্টবক্তা লোক, সে মুখের ওপরই বলে গেল, 'তোমার মেয়ে কীত্তন গাইত মা—আমি শুনেছি। তার ওপর আবার দিনকতক নাকি থ্যাটারও করেছে। ওকে কেউ ঘরের বৌ করে নে যাবে না। আমাকে তুমি মাপ করো ঘাট করো মা—ওর সম্বন্ধ করা আমার সাধ্যি নয়।'

'মর মাগী, ঘাট করো কি বলছিস? ঘাট মানছি বল!' ওরই মধ্যে আড়ালে মুখ ফিরিয়ে বলে নানু, আর চোখ মটকে হাসে।

অপর ঘটকীটি দিনকতক ঘোরাঘুরি করল তবু। এই দুঃখের সংসার থেকেও দু'আনা এক আনা পয়সা নিয়ে যেতে লাগল মধ্যে মধ্যে খরচা বলে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন

সম্বন্ধই আনতে পারল না। যত সুন্দরীই হোক, কীর্তনউলী থিয়েটার-করা মেয়েকে ঘরের বৌ করবে এমন কারও বুকের পাটা নেই। শেষে সুরবালাই আর থাকতে না পেরে নিস্তারিণীকে বারণ করল, 'কেন মা এই সাত-দুঃখের পয়সা বাজে খরচ করছ! ঐ দু'আনা পয়সা থাকলে দুদিন বাজারখরচ হবে। কেউ নেবে না এখন তোমার মেয়েকে। আগে দিতে সে এক কথা ছিল!'

নিস্তারিণী দাঁত কিড়ামড় করে, 'ঐ যে, তোমার গুষ্টি! দোব কি—ঐ বিট্‌লে বামনা দিতে দিলে! ধম্মজ্ঞান টনটনে হয়ে উঠল একেবারে, "আমি কারুর জাত মারতে পারব না!" এখন ধম্মজ্ঞান বেরিয়ে যাচ্ছে!'

ঘটকীকে মিনতি করে, 'আর একটু বেয়ে-চেয়ে দ্যাখো মেয়ে, আমি তোমাকে খুশী ক'রে দোব। বামুনের কন্যেদায় উদ্ধার ক'রে দিলে পুণ্যিও হবে।'

ইতিমধ্যে হাতের সেই অদ্বিতীয় রুলি দু'গাছিও গেছে। নানুকে দিয়েই বেচিয়েছে সুরবালা। নানুই কোথা থেকে দুগাছা গিল্‌টির বালা এনে দিয়েছে তার বদলে। বলেছে, 'খুব ভাল দোকানের জিনিস, থিয়েটারে আমরা কিনি এখান থেকে, অন্তত দুমাস এমনি থাকবে। তেলজল না লাগে তো আরও বেশীদিন যাবে।'

'তারপর?' হেসে বলেছে সুরবালা, 'এগুলো যখন কালো হবে, তখন তো কাঁচের চুড়ি কেনবারও পয়সা জুটবে না!'

'সে তখন দেখা যাবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'...

এই আশাটারই কোন চিহ্ন খুঁজে পায় না সুরবালা। শুধু শ্বাসটাই যেন বন্ধ হতে থাকে ক্রমশ। সত্যিই আজকাল এই ছোট্ট বাড়িটার চারপাশের দেওয়াল যেন তাকে চেপে ধরে মধ্যে মধ্যে। একঘেয়ে একাদিক্রমে এই সঙ্কীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ থাকতে থাকতে মনে হয় সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে একদিন। কোথাও যায় না, যেতে ইচ্ছেই করে না—বেশ-ভূষার যা হাল হয়েছে, ঘরের বাইরে যেতেই লজ্জা করে। খুব যখন অসহ্য বোধ হয়, মাঝে মাঝে সেই এতটুকু উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ওপরদিকে একফালি আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, যেন বাইরের মুক্ত প্রকৃতির বাতাস নেবার চেষ্টা করে, পরিচিত বৃহত্তর জগৎটাকে মনে করার চেষ্টা করে।

শশীবৌদিদের ওখানেও যেতে ইচ্ছে করে না আর। তাঁরও দুঃখের কান্না, কাঁদেন না তিনি ঠিকই—কিন্তু কাহিনীটা শুনতে হয়। তাছাড়া ওকে দেখলেই তিনি এটা-ওটা খাওয়াতে চেষ্টা করেন, কিছু কিছু খাদ্যবস্তু—আনাজ-কোনাজ গুছিয়ে দেন। এইটেই বিশ্রী লাগে সুরবালার। তাছাড়া তাঁদেরও অভাব যে কত তা তো সুরবালা জানে—তাদের জীবনযাত্রার ঐ সামান্য উপচারে ভাগ বসাতে লজ্জা করে ওর।

সুতরাং চারখানা দেওয়ালবন্ধ ঘরে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবা ছাড়া কোন উপায় দেখতে পায় না। কোন হাতের কাজ শেখা যায় কিনা, কিছু তৈরী ক'রে বিক্রি করা যায় কিনা—ভাবতে চেষ্টা করে। কে কী শেখাবে—কার কাছে গেলে শেখা যায় তা জানে না, কাজেই ভেবেও কোন লাভ হয় না শেষ পর্যন্ত। দুপুরে ঘুমানো অভ্যেস নেই। আগে গণেশ এর-ওর কাছ থেকে একআধখানা ছেঁড়াখোঁড়া বই চেয়ে আনত, সেইগুলোই দুবার তিনবার ক'রে পড়া চলত। এখন তাও থাকে না। শুধুই বসে বসে ভাবে আর কান পেতে থাকে—বাইরের গলিতে কত হরেকরকম পণ্য নিয়ে ফিরিওলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে; দুপুরের জনহীন পথের শূন্যতায় তাদের বিচিত্র সুরেলা ডাকগুলো গলির চারদিকের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে বিচিত্র রকমের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে। কান পেতে শোনে আর ভাববার চেষ্টা করে এদের এইসব পণ্যের কোন একটা তার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব কিনা। মধ্যে মধ্যে এক-আধজনকে ডাকেও, কে কোন মাল কোথা থেকে কী দরে কেনে—তাই খোঁজ নেয়। তারা যখন বোঝে সে খদ্দের নয়—শুধুই সময়

নষ্ট করার গোঁসাই—বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

এমনি ক'রেই দিন কাটে। শীতের পর বসন্ত নামে, বসন্তের পরে গ্রীষ্ম—তারপরে একসময় ওপরের একফালি আকাশ কালো ক'রে বর্ষাও আসে ঘনিয়ে—শুধু সুরবালাই তার জীবনে কোন বৈচিত্র্য বোধ করে না—বুঝতে পারে না কোন পরিবর্তন। তার দুঃখের বোঝা এতই বাস্তব, এত দুঃসহ যে প্রকৃতিদত্ত দুঃখে আর এসে যায় না বেশী-কিছু ; সমস্ত অনুভূতিগুলোই যেন একাকার হয়ে গেছে ওর জীবনে।...

এক-একবার ভাবে এখানের পাট তুলে সকলে মিলেই বৃন্দাবন বা ঐরকম কোন দূর তীর্থে চলে যাবে কি না। যেখানে গিয়ে বুড়ো বাবার হাত ধরে মন্দিরে মন্দিরে গান গেয়ে বেড়ালে অনেক ভিক্ষা মিলবে—এমন ক'রে প্রতিনিয়ত কীল খেয়ে কীল চুরি করতে হবে না—না খেয়েও বাইরের সম্ভ্রম বজায় রাখতে প্রাণান্ত হবে না সেখানে। আবার ভাবে—যে শান্তির জন্যে তাঁদের নিয়ে যাবে সে শান্তি দিতে পারবে না—অন্যদিক দিয়ে বাপমায়ের বিড়ম্বনা বেড়েই যাবে হয়ত।

কিছুই ঠিক করতে পারে না, একটানা চাপা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখেও পড়ে না।

এরই মধ্যে একদিন খবরটা এল।

খবরটা আনল নিস্তারিণীই। কী একটা যোগে গঙ্গায় চান করতে গিয়েছিল সে, পুরনো পাড়ার সোনার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার মুখ থেকেই শুনেছে।

'শুনেছিস? তোর মতি কেত্তনউলী যে শয্যেগত!'

চমকে উঠল সুরবালা, 'সে কি, কে বললে? কী হয়েছে?'

'বাত। বাতে নাকি সব্ব অঙ্গ পড়ে গেছে একেবারে। যাকে বলে চৌরঙ্গী বাত। পাশ ফিরতে পারে না, উঠতে বসতে পারে না—জলটুকুও খাইয়ে দিতে হয় তবে খায়। খুব কষ্ট পাচ্ছে।'

তারপরই, ভিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'হবে না! বেশ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে মিছিমিছি আকোচ করা...তার ফল ভুগতে হবে না? এখন কি হয়েছে, আরও অশেষ দুর্গতি আছে ওর অদেষ্টে, এই বলে দিলুম!'

'ছি মা!' মৃদু ধমক দিয়ে ওঠে সুরবালা, 'মানুষের অসুখ নিয়ে অমন কথা বলতে নেই। কার কখন কী হয়—বলা যায় কি? তাছাড়া তার দ্বারা যে আমার উপকার হয় নি তাও তো নয়!'

নিস্তারিণী তবু আপনমনেই গজগজ ক'রে যায় অনেকক্ষণ ধরে। তার বিপদের কোন আসান না হোক, মতির বিপদে সে খুশী হয়েছে, অনেকদিন পরে একটা প্রতিহিংসার আনন্দ লাভ করতে পেরে যেন বৈচিত্র্য এসেছে তাদের একঘেয়ে দুঃখ আর অভাবে ভরা জীবনে। সেই খুশিই উপ্‌চে পড়ে তার কণ্ঠস্বরে।...

এর ঠিক দুদিন পরেই মতির ঝি এল।

'ওমা, কী ব্যাপার! এতকাল পরে?...এসো এসো। কী ভাগ্যি!'

সুরবালা সমাদর ক'রেই বসায়। বলে, 'তারপর? কী খবর বলো!'

'রসো, দম নিই বাপু। কম ঘুরেছি! ঠিকানা লিখে ছেড়ে দিলে—নিজে জানি না পড়তে—খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

'কেন, দারোয়ান তো চেনে।'

'সে দারোয়ান কি আছে নাকি? সে কবে চলে গেছে। এখন নতুন লোক এসেছে, সে একেবারে আবর।...এসিছি তো আমিও গো, কবে কোন্‌কালে একদিন এসিছি—অত বাপু মনে-টনে নেই।'

সুরবালার বুকের মধ্যেটা ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করছে। আশা হচ্ছে, তবু—এতবার এতদিন নিরাশ হয়ে হয়ে—আর যেন আশা করতে সাহসও হচ্ছে না ঠিক।

সে একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'তারপর? মাসী কেমন?'

'বলছি। সেইজন্যেই তো আসা। তুমি শোন নি কিছু?'

'কী শুনব?'

'মায়ের অসুখের কথা?'

মিথ্যে কথাটা মুখে আটকাল শেষমুহূর্তেও। বললে, 'কী যেন শুনছিলুম বটে— হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাত না কি হয়েছে। তা খবর আর কে দেবে বলো, তোমরা কি খবর দাও না, নাও, মলুম কি বাঁচলুম!'

শেষের দিকটায় গলায় জোর দিতে পেরে যেন বেঁচে যায় সুরো।

ঝি এবার একটু অপ্রতিভ বোধ করে। বলে, 'আমরা আর কি করব বলো দিদি, আমরা হলুম গে হুকুমের চাকর। আমাদের ওপর কড়া হুকুম ছেল যে এতকাল। খবরদার—আমার বাড়ির টিকটিকি মাকড়শা পজ্জন্ত যেন ওমুখো না হয়।...তা সেখেনে আমরা আর কি করতে পারি? আজ আবার উল্‌টো হুকুম হয়েছে—এয়িছি।'

'তা উল্‌টো হুকুমটা হ'ল কেন?'

ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে সুরবালা।

'তাও জানি নি। বলে পাঠিয়েছে যে আমার খুব অসুখ, সুরোকে বলো গে যাও —যেন শেষ দেখা দেখে যায় একবার। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—মনে যেন কিছু রাখে না, শয্যেগত রুগীর ওপর রাগটাগ না রাখে, ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে যেন অতি অবিশ্যি আসে। আরও বলে দেছে একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে যেতে—যাওয়া-আসা গাড়িভাড়া যা লাগে সব সে দেবে। বললে লোকও পাঠাতে পারে।'

চুপ করে থাকে সুরবালা। শুধুই কি মরণাপন্ন রোগীর শেষ দেখার আকিঞ্চন— না, এখনও ওর আশার কোন কারণ আছে?

'খুব কি বাড়াবাড়ি নাকি দাশুর মা?'

'বাড়াবাড়ি—মানে শয্যেগত ঠিকই। বাতে সব্ব অঙ্গ পড়ে গেছে, হাতটা-পাটা পজ্জন্ত নাড়বার উপায় নেই, কেউ দয়া ক'রে এক ঝিনুক জল দিলে তবে গলা ভিজবে—নইলে টাক্‌রা শুকিয়ে মরবে। তা বলে আর উঠবে না কি বাঁচবে না—কৈ, তেমন তো মনে হয় না।'

'কি চিকিচ্ছে হচ্ছে?'

'কবরেজী। কে এক বড় কবরেজ আছে যামিনী কবরেজ বলে—সে-ই দেখছে। তেল দিয়েছে, পুলটিশ দিয়েছে—কী দুগ্‌গন্ধ মা কি বলব। কাছে যায় কার সাধ্যি! আর দুগ্‌গন্ধের অপরাধটাই বা কি বলো, তাতে নেই কি, হিং আছে রসুন আছে মুসব্বর আছে—'

'তা কে দেখছে? মানে করছে-কম্মাচ্ছে কে?'

'আমরাই করছি। এই দুদিন কে এক বোনঝি এসেছে কোথা থেকে। আর আছে রঘুবাবু—ছুটোছুটির কাজ সব তার, বাজার-হাট ওষুধ কবরেজ তাকেই করতে হচ্ছে। মানে যেম্‌নে দিয়ে যা হোক—রঘুবাবুর দু পয়সার কামাই নেই।'

এই বলে ওর মুখের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে দাশুর মা।

সুরবালা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলে, 'আচ্ছা, তুমি বলো গে যাও, কাল দুপুরের দিকে যখন হোক আমি যাবো। কিন্তু কেউ এসো বাপু।'

'দারোয়ান পাঠালে হবে? না কি আমিই আসব?'

'দারোয়ান তো শুনছি নতুন লোক। তুমিই এসো না হয়। বারোটা-একটা নাগাদ

এসো। আমি তৈরী থাকব।'

আর কখনও সুরবালার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল মতি। বলেছিল, 'পথের ময়লার পানে তাকাব তবু ও-মুখের দিকে তাকাব না—দেখে নিস তোরা।'

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না।

এত অল্পে যে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে, তা তখন স্বপ্নেও ভাবে নি।

ভাঙতে হ'ল তার কারণ—টাকার ওপর অদ্ভুত মায়া তার।

টাকার তার অভাব নেই। কলকাতা শহরে তিনখানা বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কে জমানো টাকা—এ ছাড়াও তার বাড়িতে যে পরিমাণ নগদ টাকা আর গহনা লুকনো আছে তাতে একটা ছোটখাটো পরিবারের বিশ বছর কেটে যেতে পারে হেসে-খেলে। যে সব গরীব আত্মীয় কোনকালে সাহায্যপ্রার্থী হ'তে পারত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছে অনেক দিন। আর যে সব বোন-বোনঝিদের সঙ্গে এখনও আত্মীয়তা বজায় আছে—তাদের কারুরই পয়সার অভাব নেই। বোনও নামকরা গাইয়ে। বোনঝিরা কেউ এ লাইনে আসে নি কিন্তু তাদের ভাল ভাল বাঁধা বাবু আছে, তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে কবে। সুতরাং কেউই তার অর্থের প্রত্যাশী নয়। বরং প্রয়োজন হ'লে অসময়ে দেখতে পারে তারা।

তবু একবার শয্যাগত হয়ে পড়তেই চোখে অন্ধকার দেখল।

দৈহিক কষ্ট তো আছেই—কিন্তু সেটা মতির কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা—আয়টা বন্ধ হয়ে গেল। 'টাকা আছে ঠিকই—কিন্তু কুবেরের ভাণ্ডার তো আর নয়। বলে কুবেরের ভাণ্ডারও বসে খেলে শেষ হয়ে যায়।' একটার পর একটা বায়না ফেরত যায়, মুজরো দিতে এসে লোক ফিরে যায়—মতির মনে হয় তার বুকের এক-একখানা পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। হায় হায় করে শুয়ে শুয়ে—চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

দাসী-চাকররা সকলেই প্রায় পুরনো লোক। তারা সান্ত্বনা দেয়, 'ও অমন দু-চারটে ফিরুক না মা। অসুখবিসুখ করে না মানুষের? ভগবানের দয়ায় সেরে ওঠো—তোমার কি বায়নার অভাব হবে?'

'তোরা যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা কইতে আসিস নি বাপু,'—অসহিষ্ণু বিরক্ত মতি ঝেঁঝে ওঠে, 'এসব হ'ল গে কারবারের কথা। এ তোরা কি বুঝবি? ক্রমাগত লোক ফিরতে ফিরতে চারদিকে চাউর হয়ে যাবে—মতি বুড়ো হয়ে গেছে, ও আর গাইতে পারে না—গাওনা ছেড়ে দিয়েছে। তখন কি আর কেউ আসবে এ দরজায়?'

'তা গোটা-কতক না হয় তোমার বোনকে দাও না, যদ্দিন না সেরে ওঠো?'

'তারই কি আর মুজরোর অভাব আছে! তাছাড়া, তাকে দিতে দিতে তো তার ঘরেই চলে যাবে খদ্দেরগুলো। তাকে দিয়েই যদি কাজ চলে, সে বেশ ডাঁটো আছে এখনও, খারাপও গায় না—তাহলে আমার কাছে আর পরেই বা আসবে কেন? ঐটেই রাষ্ট্র হবে—"মতি আর গাইতে পারে না, পারবেও না। আর দরকারই বা কি, ওর বোনকেই খবর দাও।" আমার দরজায় যে লক্ষ্মী আসছে তাকে আমি সাধ ক'রে ওর দরজা দেখিয়ে দেব?'

এর পর আর কে কী বলবে? সবাই চুপ ক'রে থাকে। এ বৃথা বিলাপের অর্থ বোঝে না তারা। উঠতে যখন পারবেই না কোনমতে—তখন এ ক্ষতি সহ্য করতে হবে, উপায় কি?

চুপ ক'রে থাকে মতিও। আকাশ-পাতাল ভাবে। কবে উঠবে, কবে আবার কর্মক্ষম হবে, গাইতে যাবার মতো হবে—তার কোন হিসেবই পায় না, এই হয়েছে মুশকিল। প্রথম প্রথম ভেবেছিল বাত তো—এ আর কদিন, সেরে উঠবেই। কিন্তু দিন গুনতে

গুনতে সপ্তাহ, মাস, দু মাস হয়ে গেল, সেরে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। গোড়ায় ডাক্তার ডেকেছিল, সবাই বললে বাতে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না, কবিরাজ দেখাও। কবিরাজ প্রথম যাঁকে ডাকা হয়েছিল তিনি মাঝারি দরের, এক মাস দেখে তাঁকে বিদায় দিয়ে সবচেয়ে নাম-করা কবিরাজ যিনি তাঁকেই ডাকা হয়েছে। ইনি নিজস্ব পাল্কি ক'রে আসেন, ওষুধ দেন—আসা আর ওষুধ নিয়ে হপ্তায় পঞ্চাশ টাকা চুক্তি। গা করকর করে মতির, তবু তাই দেয় সে। কিন্তু কৈ, তাতেও তো সেরে ওঠার কোন গতিক দেখা যায় না।

যদি আর উঠতে না পারে? আর কোন দিনই না সেরে ওঠে?

ইদানীং এই ভয়টাই বেশী হয়েছে তার। শুনেছে রোগ 'গোড় পাতলে' আর সারে না। সারবার হলে এতদিন সেরেই যেত। যদি ছ মাস কি বছরখানেক এমনি শুয়ে থাকতে হয়?

যে টাকা আসছে না, সে তো লোকসান বটেই, যা খরচ হচ্ছে তাও তো কম নয়। আয় আদৌ নেই—ব্যয় বেশী ভাবতেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে। রোগযন্ত্রণার চেয়ে এ যন্ত্রণা অনেক দুঃসহ। তার ওপর যে খরচটা 'সদরে' অর্থাৎ প্রকাশ্যে হচ্ছে সেটা একরকম—যেটা আড়ালে মানে চুরি হচ্ছে সেটার পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে না বলেই আরও যন্ত্রণা তার। লোক যতই পুরনো হোক—চুরির এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে না কেউ। বিশেষ ক'রে ঐ রঘোটা! রঘু তো নয়, রাঘব নাম হওয়াই উচিত ছিল ওর। রাঘব বোয়াল একেবারে, ওর খাঁই আর মেটে না।

না, এভাবে আর চলবে না। কিছু একটা উপায় বার করতেই হবে। আর শীগ্গির।

গত দু সপ্তাহ ধরে এই কথাটাই ভাবছে মতি, ক্রমাগত ভাবছে। সুরবালার কথাটা যে মনে পড়ে নি তা নয়—প্রথমেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওর কথাটা মনের কোণে সরিয়ে রেখে অন্য উপায় কি হ'তে পারে সেইটে ভেবে দেখছিল। অনেক ভাবল এই কদিন—অনেকের কথা ভাবল—কোনটাই মনে ধরল না। কেউই পারবে না তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ চালাতে—এক সুরবালা ছাড়া।

সেই জন্যেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে আবার সেই সুরোকেই ডেকে পাঠাতে হ'ল। যেখানে সম্বন্ধ যেতে বসেছে সেখানে তুচ্ছ মান-অভিমান ধরে বসে থাকলে চলে না। মা লক্ষ্মী জেদ পছন্দ করেন না। জেদের বসে যারা মা লক্ষ্মীকে অবহেলা করে, মা তাদের একেবারে ছেড়ে যান। আর—এখন নিজের মনকে বোঝাল মতি—এমন কিছু ঝগড়াঝাঁটি হয়ও নি তাদের মধ্যে। সুরবালাও, সত্যি কথা বলতে কি—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখলে কথাটা মানতেই হবে—এমন কিছু অন্যায় করে নি। সে বেইমান নয়—একটু 'বাবু বাছা' করলেই হয়ত তাকে গলানো যাবে আবার। তারও দুরবস্থা যাচ্ছে—আয় নেই এক পয়সাও, অত বড় সংসারটা তার ঘাড়ে। এই বিছানায় পড়বার আগে পর্যন্ত সব খবর রেখেছে মতি, থিয়েটারে যায় বটে, তবে সেও, ক-পয়সা আয় হয় তা মতি জানে। থিয়েটারে গিয়ে বাবু ধরতে না পারলে কোন সুবিধে নেই।

মতি সুরবালাকে বিলক্ষণ চিনত। আজ এতকাল পরে শুধু মুজরোর লোভ দেখিয়ে আনা যাবে না হয়ত। বড় শক্ত মেয়ে, ভাঙবে তবু মচকাবে না। তার চেয়ে অন্য কথা বলাই ভাল। মৃত্যুপথযাত্রিণী শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে জানলে আর থাকতে পারবে না—ঠিক আসবে। তাছাড়া কারবারের কথা লোক মারফৎ হয়ও না। তাই সে কথা আর তোলে নি—এদের কাউকেই বলে নি ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটা। আসল মতলবটা নিজের মাথাতেই ছিল।...

বহুকাল পরে সুরবালা এ বাড়িতে ঢুকল।

এর মধ্যে কত কীই ঘটে গেছে তার জীবনে। কত দুর্দশা। এরাও কি আর খোঁজ

রাখে না কিছু? চাকর দারোয়ানরা আগের মতোই হেসে অভ্যর্থনা জানাল বটে, সেই সঙ্গে তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে বর্তমান অবস্থাটাও নিশ্চয় আঁচ ক'রে নিল। গিল্‌টির বালা আর সেই অদ্বিতীয় ফঙ্গবেনে হার—গয়না বলতে তো এই, শাড়িও সেই মতির আমলেরই—ভাল কাপড় বলতে এই একখানাতেই ঠেকেছে এখন।

তারা কেউ সত্যিই অত লক্ষ্য করছিল কিনা কে জানে—সুরবালার কিন্তু মনে হ'ল সবাই সেই দিকে তাকিয়ে আছে। কোনমতে—প্রাণপণে লজ্জা দমন ক'রে যতটা সম্ভব সহজভাবে ওপরে উঠে গেল বটে, তবে কানের-কাছে-জ্বালাকরা ভাবটা থেকেই বুঝতে পারল—লজ্জা ও অপমানের রক্তাভা ঢাকা পড়ে নি, যদি কারও চোখ থাকে সে বুঝতে পারছে।

মতির ঘরের সামনে গিয়ে কিন্তু আর এসব কথা মনে রইল না। সত্যিই চমকে উঠল সে। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত নিজের ব্যথা—নিজের প্রতি অবিচারের কথাটা ভুলে গেল। এ কী হাল হয়েছে মাসীর। দাশুর মা মিছে কথা বলে নি—কী দিয়েছে কবিরাজ পুলটিশে—মনে হচ্ছে হিং রশুন ছাড়াও ঐ জাতীয় কিছু আছে। তাদের মিলিত দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না। তার সঙ্গে মালিশের একটা উৎকট কটু গন্ধ। এই দুর্গন্ধের মধ্যে মেঝের বিছানাতে অসহায়ভাবে পড়ে আছে মতি—হাত-পা-হাঁটু সব ন্যাকড়া জড়ানো-জড়ানো কুষ্ঠরুগীর মতো, রোগে ভুগে ভুগে মুখের চামড়া কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে, চুলগুলো অর্ধেকের ওপর উঠে গেছে—যে কটা অবশিষ্ট আছে তারও বেশির ভাগ পাকা—সবটা জড়িয়ে সত্যিই মনে হচ্ছে—মৃত্যুর আর বেশী দেরি নেই।

সেদিকে চেয়ে দেখে অকস্মাৎ সুরোর দুই চোখে জল এসে গেল। সে ছুটে গিয়ে মতির গায়ে হাত রেখে বলল, 'এ কী হাল হয়েছে তোমার মাসী, আমাকে দু-দিন আগে ডাকতে পারো নি? এ কী অবস্থায় পড়ে আছ! এই দেখতে ডেকে পাঠালে আমায়!'

সুরোর এই চোখের জলটা মতি আশা করে নি। আন্তরিকতার চেহারা সে দেখেছে —চেনে। আনন্দে আবেগে অনুশোচনায় তারও চোখে জল এসে গেল। সে প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'ওরে কী মুখ নিয়ে তোকে ডাকব সুরো, আমার কি পাপের শেষ আছে! তোর ওপর যে অন্যায় করেছি ভগবান তারই সাজা যে দিচ্ছেন আমাকে। আর আমার বেশী দিন নেই রে—তুই আমাকে মাপ করে যা মা, নইলে এ যন্ত্রণা থেকে আমি রেহাই পাব না।'

সুরবালা তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিল, 'ছিঃ! ওসব কথা কী বলছ মাসী। অমন ক'রে বলো না। আমার কাছে তোমার এমন কোন অন্যায় হয় নি যে—সেইজন্যে তোমার এই ব্যামো হবে। ওকথা বলতে নেই। যা-ই হোক, রাগ ক'রে অভিমান ক'রে যা করেছ—মিথ্যে হ'লেও তার বেশি কিছু নয়। তেমনি তোমার কাছে আমার দেনাও কম নয়, সে কথা যদি আমি গরমান্যি যাই তো আমি মহাপাতকী বুঝতে হবে।...তুমি চুপ করো মাসী, বাত একটা সাংঘাতিক ব্যামো কিছু নয়—আবার সেরে উঠবে। বড় কবিরাজ দেখছে—ভয় কি।...কিন্তু তুমি এ কী হালে পড়ে রয়েছ, একটু সাফ-সুতুরোও ক'রে দিতে পারে নি কেউ?'

সত্যিই বিছানাটার দিকে তাকানো যায় না। মালিশের তেল লেগে চাদরটায় ছাব্‌কা ছাব্‌কা দাগ হয়েছে, তাতে ধুলো আটকে চিট-চিট করছে ময়লা। এমনিতেও—কতকাল সে চাদর বদলানো হয় নি তার ঠিক নেই। হয়ত অসুখের শুরু থেকেই এর ওপর পড়ে আছে। ভিখিরিরাও এমন বিছানায় শোয় না। সেই শৌখিন মতির এই হাল!

ঝিয়ের দল এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকে চেয়ে সুরবালা তিরস্কারের সুরে বলল, 'তোমরা এতগুলো মানুষ করো কি? চাদরটাও বদলে দিতে পারো নি?'

'বদলাবো কেমন ক'রে বলো। মাকে নাড়া যায় নি যে। মা উঠতে পারলে তবে তো বদলাবো।' মালতী ঝি বলে উঠল। সে নতুন লোক, কোথাকার কে হঠাৎ এসে তাদের ওপর তম্বি শুরু করল—ব্যাপারটা তার ভাল লাগছিল না একটুও।

'ওমা, তাই বলে রুগীটা এই এক চাদরে এতকাল পড়ে থাকবে। বলিহারী তোমাদের আক্কেল তো।'

সেই বোনঝিটিও ইতিমধ্যে ওর সাড়া পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—দামী শান্তিপুরে শাড়ি আর চন্দ্রহারের ঝিলিক খেলিয়ে, সে বলল, 'আমিও তো তাই বলছিলুম—তা মাসী যে নাড়াতে গেলেই চিল চে'চায় একেবারে!'

'আচ্ছা, আমি দেখছি। দিন তো দেরাজ থেকে একটা কাচা চাদর বার ক'রে, আর গোটা কতক বালিশের অড়।'

বোনঝি অসহায়ভাবে ঝিয়েদের দিকে তাকায়।

'ঐ যে—ঐ দেরাজটায় থাকে সব। চাদর অড় সব কাচা থরে থরে সাজানো আছে।' সুরবালাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দেরাজটা। এ বাড়ির কিছুই তার অজানা নেই।

মতি নাকে কে'দে ওঠে, 'ও তুই পারবি না সুরো, সত্যিই হাত-পা ধরে কেউ নাড়লে যেন মরণ-যন্তন্না হয়। তার চেয়ে এ বেশ আছি।'

'তা তুমি পাশ ফিরছ না?'

'সে অতিকষ্টে, প্রাণটা বেরিয়ে যায় যেন সে সময়টায়।'

'সেই অতিকষ্টেই হবে। ওরা একটু পাশ ফেরাতে পারবে তো? আমিও ধরব এখন—'

এইটে সে শশীবৌদির কাছ থেকে শিখেছে। একবার ছেলের খুব অসুখের সময় —বদ্যিরা বলেছিল সান্নিপাতিক বিকার—বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ হয়ে গিয়েছিল। অথচ বৌদি কেমন সুকৌশলে তাকে না তুলে চাদর পাল্টে দিতেন।

সেই বিদ্যেটাই কাজে লাগল আজ। ধরাধরি ক'রে অতিকষ্টে ফিরিয়ে দিয়ে এদিক থেকে ময়লা চাদর গুটিয়ে সাদা চাদর পাততে পাততে গিয়ে আবার এ পাশ ফিরিয়ে ওদিকটা বদলে দিল। একটু-আধটু 'উ'-আঁ' 'বাপ্রে মারে' অবশ্য করল মতি, সুরো তা গায়ে মাখল না। চাদর বদলে দেবার পর বালিশের ওয়াড় পরানো দু মিনিটের কাজ।

বিছানার পালা শেষ হ'তে ছলছল চোখে মতি বললে, 'দেখলি দেখলি তোরা, কেন আমি সুরো সুরো করি—দেখলি নিজেদের চোখে? ভগবান যাকে রূপ দেন, গুণ দেন, তাকে বুদ্ধিও দেন। শুধু গানই গাইতে শেখে নি—সব দিকে নজর ওর, সব দিকে মাথা। ওর কড়ে আঙুলের যুগ্যিতা তোদের কারও নেই।'

হরিমতী বহুকালের রাঁধুনী, সে আর থাকতে পারল না, বলে ফেলল, 'আমরাও তো সুরো সুরো করি দিদি, তুমিই তো এতকাল শাসিয়ে আমাদের মুখে গো দিইয়ে রেখেছ—ও নাম করবে নি আমার কাছে।'

'তবেই দ্যাখ কত ভালবাসি। ভালবাসি বলেই তো এত অভিমান। যার কোন দাম নেই, যাকে আমার কোন দরকার নেই—তার কথায় রাগই বা করব কেন, রীষই বা করব কেন? শোন্ সুরো, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—আমি তো এই মড়া পড়ে আছি—মড়ার চ্যাকড়াতেই পড়ে ছিলুম, তুই এলি তবু তোর দৌলতে একটু ভদ্দর নোকের মতো হ'ল বিছানাটা—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, আমি কবে উঠব, উঠলেও কবে আবার বাইরে যেতে পারব, গান গাইতে পারব তার তো ঠিকই নেই—তাই বলছি, বাঁধা ঘরগুলো সব নষ্ট হচ্ছে—মুজরোগুলো তুই ধর। কী বলিস?' বলা শেষ ক'রে একটু যেন উদ্বিগ্ন-ভাবেই চায় সুরোর মুখের দিকে।

কী বলিস!

বুকের মধ্যেটা আশায় আনন্দে মুক্তির আশ্বাসে যেন লাফিয়ে উঠে কিছুকালের জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—মনে হ'ল বুকের ভেতরের যন্ত্রটা থেমেই গেল বুঝি একটা তীব্র আনন্দের আঘাতে। তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলেই নিল, স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। এত দীনতা দেখাতে নেই চট ক'রে। তাছাড়া মতিকে সে চেনে, হঠাৎ এত উদারতা স্বাভাবিক নয়, এর আড়ালে আরও কোন কথা আছে, আরও কোন শর্ত। সেইটে কি, শুনে নেওয়া দরকার—রাজী হওয়ার আগে।

মতি কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারে না, মিনতি করে। বলে, 'লক্ষ্মী মা আমার, হাজার হোক আমি তোর গুরু—ম্যাস্টার, গুরুর শতেক অপরাধও মেনে আর মানিয়ে নিতে হয়। ওস্তাদের কাছে গান-বাজনা শিখতে গেলে তার সমস্ত কান্না করতে হয় তবে শেখায় সে। আমার ওপর আর রাগ অভিমান রাখিস নি। আমার ধারাটা বজায় থাক —ঘরগুলো, এইটুকু দেখেই আমার শান্তি।'

এবার উত্তর দিতে হ'ল। কিন্তু গুছিয়ে সাজিয়ে কিছু বলতে পারল না, কোন 'কথাশোনানো'ও গেল না। কেমন যেন দুর্বলই শোনাল জবাবটা, 'কিন্তু মাসী, এত-কালের অনব্যেস—এখন কি আর গাইতে পারব? তুমি ভাল থাকলেও না হয় একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে!'

মতিও আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'নে! তোর কি সেই শিক্ষে—না সেই গলা! ঈশ্বর দত্ত ক্ষ্যামতা তোর। জাত-গাইয়ে তুই। তুই কি আর অগত্যে-গাইয়ে!...যাদের কিছু হয় না, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকে—মড়ার সঙ্গে যাবার জন্যে ভাঙা খোল-কত্তাল কিনে কেত্তনের দল করে, বেসুরো বেতালা যা হোক হলেই হ'ল—ভাঙা গলা, চেরা গলা—তারাই হ'ল গে অগত্যে-গাইয়ে।...তুই একদিন দোয়ারদের নিয়ে বাজনদারদের নিয়ে বোস—তাহলেই দেখবি গলা আবার ঠিক সুরে বলছে। না হয় আমার ঘরে এইখানেই বসবি, আমি দেখে দোব, দরকার হয় তো ধরিয়েও দোব। দরকার হবে না অবিশ্যি—'

আর একটু চুপ ক'রে থেকে—মতি একটু যেন কি ইতস্তত করছে দেখে নিজেই কাজের কথাটা পাড়ল, 'তা আমি কি পাব মাসী?'

'ওমা, তুই আবার পাবি কি! সবই পাবি। এ কি মাইনের বন্দোবস্ত, তুই হলি এখন মূল গায়েন একজন, তোকে কি মাইনে ক'রে রাখব! শুধু মুজরোর যে টাকাটা ধরে বায়না হবে তার অদ্দেক আমার। আর পেলা যা পাবি—যদি বাড়তি কিছু দেয় —অনেক সময় দেয় অমন—একশো এক টাকা হয়ত বায়না হ'ল—দেবার সময় খুশী হয়ে একশো পঁচিশ কি একশো একান্ন টাকা ধরে দিলে—সে সব তোর। তুই শুধু ধম্মত আমাকে মুজরোর অদ্দেক টাকা ধরে দিস—আমি আর কিছু চাই নে। যেখানে দোয়ারদের আলাদা খরচা দেবে না—সেখানে সেটা আমরা ভাগাভাগি ক'রে দোব—তোকে সবটা দিতে হবে না।...দ্যাখ্, অন্যেহ্য কিছু বলেছি? আমার নামে মুজরো আসবে, ঠাটবাট সব আমার—যন্তর-পাতি দোয়ার বাজনদার সব আমার—মজুরীর অদ্দেক চাইছি। বলি, আপিস ভাড়াও তো একটা লাগত, কোথাও প্রেথক্ আড্ডা খুলে বসতে!'

না, অন্যায় কিছু চায় নি মতি সত্যিই। এতটাও আশা করেনি সুরবালা। সে ভেবে-ছিল মতি বারো আনা নিজের রেখে চার আনা ওকে দেবে কিম্বা সবই নিয়ে ওর সঙ্গে একটা মাইনের বন্দোবস্ত করবে। তাতেও বেঁচে যেত সুরো, এমন কি শুধু পেলার অর্ধেক পাবে বললেও রাজী হ'ত।

'তা তুমি স্বচ্ছন্দে নিও। পেলার অদ্দেকও নিও, আমি তোমাকে ঠকাব না। সব এখানে এনে তোমার সামনে গুনে গেঁথে চুলচেরা ভাগ ক'রে বুঝিয়ে দোব।'

'না না, পেলা তোর। ও আমি চাই না। মুজরোর অদ্দেক দিবি তো? পসার জমিয়ে

মুখে নাতি মেরে চলে যাবি না?'

'ছি, মাসী। আমাকে কি তাই মনে হয়? এতকাল কি দেখলে তবে?'

'তা বটে। তবু আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গাল। কালটা যে কলি! তাছাড়া পয়সা হ'লে নানা মন্তরণাদাতা এসে জোটে। বয়সটাও কাঁচা তোর হাজার হোক।'

'এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—যা পাব অন্ধেক দোব, কোনদিন এর নড়চড় হবে না—তুমি বেঁচে থাকতে নয়।'

'আ বাঁচলুম। এতেই অন্ধেক পেরান ফিরে পেলুম যেন। তবে একটা কথা, তোকে রোজ সকালে একবার ক'রে এসে বসতে হবে। বায়না এলে দরদস্তুর করা, কথাবাত্তারা বলা—তোকেই সব করতে হবে তো। আপিস করার মতো সকালে দুঘণ্টা হাজির থাকতে হবে। মানে—আমার যে টাইম দেওয়া ছেল—ঐটেই জেনে গেছে তো সবাই, সকাল নটা থেকে এগারোটা—এর মধ্যেই আসে বেশির ভাগ। অবিশ্যি যেদিন সকালেই গাওনা পড়বে সেদিন বাদ—যে এসে ফিরে যাবে, কী আর হবে, সে আমারও ফিরত। আমাদের তো আর কোন বাঁধা টাইম নেই থ্যাটারের মতো। এসব কথা বাত্তারা কি দরদাম করা, নিজে ছাড়া হয় না। রঘোটা রাঘব বোয়াল একেবারে, মহা ধড়িবাজ আর মহা জোচ্চোর। রঘো কেন—যে কটা দালাল আছে, সব কটাই সমান। তবে রঘোটা একেবারে পুকুর চুরি করতে চায়। তোর কাছে গেছল আলাদা কারবার খুলতে আর পীরিত করতে—তুই স্যেংখানার খ্যাংরা দেখিয়েছিস—সব শুনেছি। ভাবিস নি আমার কানে কিছু এড়িয়েছে। বেশ করেছিস। সাপের পাঁচ পা দেখেছিল দিন কতক।'

এতেও রাজী হ'ল সুরো। এ একরকম শাপে বরই হ'ল বরং। এইটেই আসল কারবার। কারা বায়না আনে, কোন্ কোন্ বাঁধা বাড়ি আছে—এ সবগুলো জানা হয়ে যাবে। এর পর—মতির সঙ্গে বেইমানী করতে চায় না সুরো কিন্তু মতি মারা গেলে—যদি নিজেকে স্বাধীনভাবে এই কাজ ক'রে খেতে হয় তখন এ জ্ঞান বা যোগাযোগ কাজে লাগবে। সব কাজেই একটা বাইরের দিক আছে, সব কারবারেরই বাইরের ঠাট্—সেগুলো জানা দরকার বৈকি!...

স্থির হ'ল সকালেই চলে আসবে সুরো প্রত্যহ। যাওয়া আসার গাড়ির ব্যবস্থা করবে মতি। লোকজন তো আর রোজ কি অষ্ট-প্রহর আসছে না, এইখানে এসে তার গলা-সাধা গান গটানো সব কাজই চলবে—আবার কেউ বাবু-ভাই এলে কথাবার্তাও কইতে পারবে। কি বলবে, কি বলতে হয়—প্রথম প্রথম মতিই শিখিয়ে দেবে, ভেতরে এসে জেনে যাবে জবাব—তারপর পোক্ত হয়ে গেলে সুরোই বলতে পারবে। যেদিন দুপুর থেকে গাওনা পড়বে সেদিন এখানেই খাবে, নইলে বাড়ি চলে যাবে। বিকেলে আসবার দরকার নেই। যদি কোনদিন তেমন প্রয়োজন হয় তো মতি খবর দেবে কি গাড়ি পাঠাবে।......

সুরো বাড়ি ফিরে দেখল নানু রান্নাঘরে বসে নিস্তারিণীর সঙ্গে গল্প জমিয়েছে। মতি ডেকে পাঠিয়েছে শুনেই আরও অপেক্ষা করছিল সে, খবরটা শুনে যাবে বলে। এখন সুরোর মুখ দেখেই অনেকটা অনুমান করতে পারল। বলল, 'কী রে, মনে হচ্ছে মতি কেত্তনউলীর ঘাড়টা মট্‌কে সাফ্ ক'রে দিয়ে এসেছিস? বেশ ক'রে ঘা-কতক দিয়ে এলি নাকি—মনের ঝাল মিটিয়ে?'

সব শুনে মন্তব্য করল, 'মাগী তাহলে তোকেই যখ্ দিয়ে গেল বল্—ও-ই হ'ল, এও একরকম যখ্ দেওয়া। তোকেই তো বসাল কারবার পাহারা দিতে। যাক—যা হবার হ'ল—বুঝতে তো পারছি আর তাকে উঠো-ধানে পত্তি করতে হবে না। ও সেরে উঠতে উঠতে খদ্দের সব তোর হাতে চ'লে আসবে। হাজার হোক তোর উঠতি বয়েস, চাঁচা-

ছোলা গলা। তোর গান শোনার পর কি আর ওর ঐ শেলেষ্মধরা গলা শ্নতে চাইবে কেউ? ওর দফা নিকেশ ক'রেই ছাড়বি তুই।...নে, এখনই যা, দাঁড়া, হরির-নোটের ব্যবস্থা করগে যা। রোস্—তুই-ই বা কি করবি, দাঁড়া, আমিই বাতাসা কিনে আনছি। আর অমনি বাজারও ক'রে আনছি—পরোটা-খোঁকা হয়ে উঠবে না এত তাড়াতাড়ি—আলুর দম আর আলুবোখারার চাটনির যোগাড় করুক মা মাগী।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। এখনও এক পয়সাও ঘরে আসে নি।' সুরো বাধা দেবার চেষ্টা করে।

'তেমনি ঘর থেকে যাচ্ছেও না এক পয়সা। আমি খরচ করছি, তোর জামাইয়ের কি?'

নানু প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে চলে গেল।

সুরো গেল শশীবৌদিকে খবরটা দিতে।

বৌদির সঙ্গে পরিচয় হবার পর এই প্রথম দেবার মতো একটা সুসংবাদ পাওয়া গেছে। তাঁকেই আগে দেবে সে।

॥ ১৫ ॥

সুরবালার মনে হ'ল সে টানা একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল যেন। কিম্বা যেন কোন ডাইন বা জাদুগরের মায়ায় মরে ছিল এতদিন—নতুন ক'রে সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে বেঁচে উঠল আবার। খোলের আওয়াজে আর খঞ্জনীর বোলে যে এত আনন্দ তা জানত না, এমনভাবে কোনদিন অনুভব করেনি সে। আজ বুঝল এই তার জগৎ, এই তার জীবন।

মুজরো আসতে আরম্ভ হ'ল প্রায় প্রথম দিন থেকেই। সুরো খাটতেও লাগল প্রাণ-পণে। ক্লান্তি জানে না সে, বিশ্রাম নিতে চায় না। বাজনদাররা দোহাররাই বরং ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হরেকৃষ্ণ তো একদিন স্পষ্টই বলে ফেলল, 'সুরোদি, দুটো-একটা দিন রেহাই দাও বাপু, এত খাটলে আমরা পারি কি ক'রে! আমাদের তো বয়েস হচ্ছে!'

সুরো বলে, 'কেন কেষ্টদা, এই তো দু'-তিন মাস টানা ছুটি খেলে—এখনও অরুচি হ'ল না ছুটিতে। কাজ ছাড়া তোমরা থাকো কি ক'রে?'

'ওগো, হ্যাঁ হ্যাঁ—কাকে নতুন ময়লা খেতে শিখলে অমনি হয়। আমাদের তো আর নতুন নয়—খেটে খেটে অরুচি ধরে গেছে।'

সুরো কিন্তু শোনে না। সে যা পায় তাই নেয়। কোন বায়নাই ফেরায় না প্রায়। আগের সে 'কিন্তু কিন্তু' পরমুখাপেক্ষী ভাব আর নেই—এই গত বছর দুয়েকে তার যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে। কর্তৃত্ব করার শক্তি আপনা থেকেই আয়ত্ত হয়ে গেছে কতকটা—সবাই সেটা মেনেও নিয়েছে। মতির সংসার ও কারবারের সে-ই এখন সর্বেসর্বা। দরদস্তুরও করে সে পাকা পুরনো লোকের মতো। একশো, এমন কি তেমন শাঁসালো মানুষ পেলে সওয়াশো দেড়শো টাকা পর্যন্ত আদায় ক'রে নেয়। আবার পঞ্চাশ-ষাট টাকার মুজরোও ছাড়ে না, সেক্ষেত্রে নানা অজুহাতে বাজনদার দোহার দেখিয়ে উপরি কয়েকটা টাকা আদায় করে। তার দিনে দু' জায়গা গাইতেও আপত্তি নেই। গাইলেও

দু-একদিন। অল্প টাকার বায়না হ'লে তাদের স্পষ্ট বলে নেয়, 'টাকা কম নিচ্ছি আমরা —কিন্তু বেশীক্ষণ গাইতে পারব না। সবসুদ্ধ তিন ঘণ্টা থাকব আমরা। সওয়া দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা গাইব। আসর তৈরী রাখবেন, দেরি হ'লে আপনাদেরই ক্ষতি। তখন ধরপাকড় করলেও থাকতে পারব না। বৈকালা আগে থাকতে কথা দেওয়া আছে, বড়-লোকের বাড়ি, বেশী টাকার বায়না সেটা—ঠিক সময়ে যেতেই হবে। আমাদেরও তো নাওয়া-খাওয়া আছে, মানুষের জান বৈ তো আর নয়।...এ-ই আমার লোকজন মার-মার করছে। আপনাদের উপরোধে পড়ে, বলতে গেলে হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়েছি।'

কথাটা খুব মিথ্যেও নয়, একদিনে দু' জায়গায় গাইতে রীতিমতো বিদ্রোহই করে এরা—অনেক ক'রে বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নেশার খরচ বাড়তি দেবে বলে রাজী করায় সুরো।

আসলে সুরবালার যেন একটা ভয় হয়ে গেছে। মনে মনে সর্বদাই একটা 'হারাই হারাই' ভাব! অথবা—তার এই নবজন্মের একটা ঘণ্টাও সে বাজে খরচ করতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তে এই জীবনে বাঁচতে চায়, এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করতে চায়।

মতি খুব খুশী। এতটা আশা করে নি সে। তার সামনেই কথা হয় খদ্দেরদের সঙ্গে, দালালদের সঙ্গে। পাশের ঘর অবশ্য—কিন্তু শোনার কোন অসুবিধা নেই। মাঝের দরজাটা একটু আড়-ভেজানো থাকে মাত্র। মতির মনে হয় এমনভাবে দর সেও করতে পারত না। এত খাটতে তো পারতই না। দালাল আর দোহার বাজনদারদের ঐটুকু মেয়ে যা দাপটে রেখেছে, ভাবতেও অবাক লাগে। সেদিনের সে অনুগ্রহপ্রার্থিনী যেন রাতারাতি সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছে।

একটু ঈর্ষা বোধ করারই কথা। যাকে অসহায় অবলম্বনপ্রার্থী বলে জানি সে যদি কোনদিন মাথা তুলে আমার সমপর্যায়ে উঠে আসে—আমার কোন ক্ষতি না হ'লেও সেক্ষেত্রে আমি ঈর্ষা বোধ করব—এইটেই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক সকল মানুষের ক্ষেত্রেই। কিন্তু সে-ঈর্ষাও মতিকে বিশ্বিষ্ট ক'রে তোলে না এইজন্যে যে. শিল্পীসত্তার থেকেও বিষয়ীসত্তা বোধ করি তার মধ্যে প্রবল। সুরোর কাজ-কারবার খুব পরিষ্কার। একটা মোটা খাতা করেছে, তাতে কত টাকায় কার সঙ্গে রফা হচ্ছে. কে কত আগাম দিচ্ছে—পরে কত আদায় হচ্ছে তা পরিষ্কার লেখা। খরচপত্র বাদে যা আদায় তার অর্ধেক—পাই পয়সা পর্যন্ত হিসেব ক'রে চুকিয়ে দেয় সুরবালা—রোজকার রোজ। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কি অস্পষ্টতার অবকাশ রাখে না।

প্রথম প্রথম দু-একদিন 'আজ থাক না. হবেই এখন। এই এত খেটেখুটে এলি হাক্লান্ত হয়ে—আবার হিসেব নিয়ে বসলি কেন' বলতে গিয়েছিল মতি। সুরবালা বলেছে, 'না মাসী, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। ঐ ক'রে গাফিলি ক'রে ফেলে রাখলে পড়েই থাকবে হয়ত—তারপর আমার একটা ভুল হ'ল কি খরচ ক'রে ফেললুম—কিম্বা তোমারই মনে রইল না, মনে মনে একটা সন্দ জেগে রইল—আমি বুঝি গোঁজামিল দিচ্ছি—অথচ মুখ ফুটে বলতেও পারবে না—মনের মধ্যে একটা পাঁচিল পড়বে অকারণ! ওতে আমার কাজ নেই। এতক্ষণ এত চেঁচিয়ে আসতে পারলুম—এটা পারব না? ও যখনকার যা তখন তখনই তা মিটিয়ে ফেলা ভাল।'

টাকা-পয়সা গুনে গুনে থাক দিয়ে মতিকে দেখিয়ে ছোট হাতবাক্সে পুরে বাক্সটা লোহার সিন্দুকে তুলে চাবি মতির বিছানার তলায় গুঁজে রেখে সুরো বাড়ি যায় তবে। আজকাল সেইজন্যে ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস হয়েছে মতির—তার সংসারের খরচপত্র সব ওকে দিয়েই করায়। মানে সুরোর একটা খাটুনি বেড়েছে। রোজ সকালে এসে সে-সব জমাখরচ ঠিক দিয়ে খাতায় লিখে রাখতে হয়, নিত্যকার যা খরচ তা ঠাকুর-চাকর-

সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হয়।...

কবিরাজী ওষুধে যত না হোক—এতেই যেন মতি সেরেও উঠছে দ্রুত। ইদানীং হাঁটু-কনুইয়ের ফুলো অনেকটা কমেছে। হাত-পা নাড়তে পারছে, ধরে বসিয়ে দিলে কিছুক্ষণ বসে থাকতেও পারে। কারবার বন্ধ হয়ে গেল বলে হতাশ হয়ে পড়াতেই শরীরটাও যেন ভেঙে পড়েছিল। এখন দেখছে যে, পুরো টাকা তার থাকলেও যা আয় হ'ত—অর্ধেকেও তার চেয়ে কিছু কম হচ্ছে না। আরও সেই আনন্দে নতুন আশায় সেও যেন নতুন ক'রে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে, তারও নবজন্ম লাভ ঘটছে। দেড়মাস দু' মাসেই মুখের চেহারা বদলে গেছে আবার।

তবে টাকার ওপর লোভ যতই বেশী হোক—একটা ব্যাপারে মতি সেটা খুব সম্বরণ করেছে। নিজের কথার ঠিক রেখেছে। প্রথম প্রথম সুরবালা পেলারও ভাগ দিতে এসেছে, ঠিক ঠিক হিসেব ক'রে অর্ধেক, মতি নেয় নি। জিভ কেটে বলেছে, 'না রে। বলেই তো দিয়েছি। ওটা তো বকশিশ। ব্যবসার মধ্যে তো নয়। ও হ'ল খুশির সওদা। তোর কাজ দেখে খুশি হয়ে যে-যা দেয়—ও আমি ছোঁব না এক পয়সাও।'

'কিন্তু মাসী ভেবে দ্যাখো—পেলার টাকা মজুরোর টাকার চেয়েও বেশী হয়ে যেতে পারে—তেমন তেমন বাড়ি হলে। এখন ছেড়ে দিচ্ছ, এরপর আপ্‌সে মরবে না তো? মনটা ছোট হবে না তো?' সুরবালা জেদ করে।

'সে তো বেশী হয়ই। বিশেষ ক'রে ছেরাদ্দ বাড়িতে পেলা তো বেশীই ওঠে—দুনো তিনগুণও হয়ে যায়—বড়লোকের বাড়ি হ'লে। সে জানি। তবুও ও লোভ করব না। সেটা অধম্ম হবে। আর তাতে আবার তোর মন ছোট হয়ে যাবে। হ'তে বাধ্য। মনে হবে আমি ভূতের ব্যাগার খাটছি। তাছাড়া একটা কথা কি জানিস, ওটা হ'ল বেহিসেবী পয়সা। লোভে লোভ বেড়েই যায়—বিশেষ টাকা বড় পাজী জিনিস, ওদিকে লোভ দিলে এরপর মনে হবে—হিসেবের মধ্যে তো ধরা যাবে না—মনে হবে তুই সব দিচ্ছিস না, কিছু হাতে রাখছিস। তারপর ভাবব বেশীটাই হয়ত তুই রাখছিস। ও-পাপ আর দরকার নেই। ও তোরই থাক। পেলুম না সে এক জ্বালা—পাবার শতেক।'

পেলা পায়ও এক-একদিন খুব। কোন কোনদিন সত্যিই মজুরী ছাড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে সোনাও পায়। বড়লোকরা রুমালে বেঁধে গিনি দেন অনেকে। গিন্নীরা হার খুলে দেন গলা থেকে। এক বিয়ে-বাড়িতে বেনারসী শাড়িও পেল। এমনি শাড়ি তো আছেই। সকালে গোষ্ঠ গাইলে হাঁড়ি-ভর্তি ঘি-মাখন পাওয়া যায়। টাকা না হোক—এসব জিনিসের ভাগ নেবার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করেছিল সুরো। বিশেষত গিনি-গুলো নেবার জন্যে। গিনি ভালবাসে মতি—তবু সে রাজী হয় নি কিছুতেই। একখানা শাড়ি পর্যন্ত নেয় নি। তার ঐ এক যুক্তি, একটা সুতোর খেই নিতে শুরু করলেই এরপর যথাসর্বস্ব নিতে ইচ্ছে করবে। বলে, 'তুই যা আমায় করলি মা, পেটের মেয়েও তা করে না। আমি আবাগী মানুষ চিনতে না পেরে নিজেও কষ্ট পেলুম, তোকেও দিলুম। আমার আর দরকার নেই রে। নিহাৎ এতকাল এই ব্যবসা ক'রে এসেছি—এটা চালু না থাকলে যেন মনে হ'ত জ্যান্তেই মরে গেছি—তাই ঐ বন্দোবস্ত। নইলে আমার যা আছে যদি আর বিশ-পঁচিশ বছরও বাঁচি—একরকম ক'রে কেটে যাবে।'

মতির এ-কৃতজ্ঞতা যে আন্তরিক—তা আরও বেশী ক'রে বোঝা গেল মাস-দুই পরে। সে আরও একটু সুস্থ হয়ে উঠে যখন বাড়ির মধ্যে অল্প অল্প চলাফেরা করতে লাগল, এক-আধবার ওপর-নিচেও করতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে—সুরো প্রস্তাব করল, 'এইবার তুমি নিজে এক-আধটা মুজরো নাও মাসী, দেখবে সেই হুপে আরও চটপট সেরে উঠবে। না-ই বা দাঁড়িয়ে গাইলে, বসে বসেই গেও। তুমি গেলেই লোক

কৃতার্থ হয়ে যাবে।'

'যাবো যাবো—দাঁড়া, গলাতে তো জঙ্গ ধরে গেছে একেবারে, একটু মেজেঘষে সেটা পোষ্কার ক'রে নিই।...এখন গাইতে গেলেই লোকে তোর সঙ্গে তুলনা করবে। বলবে, ওমা—মতি কেত্তনউলী এই—! এরই এত নাম! এরচেয়ে সুরো তো ঢের ভাল। না, বুড়ো বয়সে তোর কাছে ব্যাভ্রম হতে পারব না। গাইব যেদিন আবার—লোককে তাক লাগিয়ে দিতে হবে না!' বলে হাসতে লাগল।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল নিজের গলার জঙ্গ্ ছাড়ানোর চেয়েও সুরোর গলায় শান দেওয়ায় তার উৎসাহ বেশী। সে ভাল হয়ে উঠেই ওকে নিয়ে পড়ল। সকালে রোজই একটু-আধটু 'রেওয়াজ' চলত, এবার মতি তাতে নিয়মিত গিয়ে বসতে শুরু করল। সে বলত, 'রিয়েস্যাল', শব্দটা সুরোর কাছ থেকেই শিখেছিল। থিয়েটারের বুলি এটা।

এই আসরে দু-একদিন বসবার পরই সুরবালা বুঝল মতি কত বেশী জানে—আর সে কত কম। কীর্তনের যে এত অঙ্গ আছে, এতও শেখবার মতো জিনিস আছে—সে সম্বন্ধে সুরোর, এতকাল মতির গান শোনা সত্ত্বেও—কোন ধারণা হয় নি। দেখলে, এ এক নতুন জগৎ শুধু নয়—বিপুলও। মতি শুধু তাকে চালু ক'রেই ছেড়ে দিয়েছিল, আসল জিনিস কিছু এতকাল দেয় নি। ভরসা করে বিশ্বাস করে দিতে পারে নি। শিল্পীরা দেয়ও না সাধারণত, নিজের সন্তান বা প্রিয়তম ছাত্রর জন্যে রেখে দেয়। বিশেষ সংগীতশিল্পীরা। এতকাল পরে সুরো সেই আস্থা আর স্নেহ অর্জন করেছে, তাকে উপযুক্ত আধার বলেও বুঝেছে মতি। সে যত্ন আর শ্রম ঢেলে দিল যেন। সুরোকেও যেমন খাটাতে লাগল তার সঙ্গে নিজেও তেমনি খাটতে লাগল।

'ভাবছিস এ আবার কি এক ঝামেলা হ'ল! এর চেয়ে বুড়িটা পড়ে ছিল সে ঢের ভাল—সেরে উঠে কাল হ'ল—খাটিয়ে খাটিয়ে বুঝি দফা নিকেশ ক'রে দেবে আমার। না?...ওলো, এই বেলা এই হাড় ক'খানা থাকতে থাকতে আদায় ক'রে নে—যতটা পারিস। এরপর কেউ আর এত দিতেও পারবে না। এককে জন এক এক ধারা ধরে সাধনা করেছে, শিক্ষা করেছে, তারা কেউই অপরের কোন খবর বলতে পারবে না। জানেও না কিছু। অনেক খেটে, অনেক দুয়োর ঝাঁট দিয়ে, অনেকের পায়ে তেল দিয়ে, বেস্তর নাথিঝ্যাঁটা খেয়ে তবে আমাকে শিখতে হয়েছে, জানতে হয়েছে এ সব। সে-সব তো তোকে কিছুই করতে হ'ল না—দিব্যি দোতলার ঘরে জাজিম গাল্‌চেতে বসে আরাম ক'রে শিখছিস। এত সহজে পাই নি আমরা, এত সহজে কেউই পায় না। আরাম ক'রে শেখবার নয় এ সব।'

শেখায়, আর শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসও বিবৃত করে। দোহার বাজনদাররা তামাক খেতে নিচে নেমে গেলে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটুতে হাত বুলোতে বুলোতে মালাসুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'আমি যে গান গাই—সাধারণ কোন কেত্তনউলী এ-লাইনে গায় না। শুনেছি এর আদি জন্ম হল খেতুরে। এতে খাটুনি বড্ড বেশী, এদান্তে লোক হাল্‌কা গানের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে, কিন্তু আগে এতটা ছেল না। আর আমারও কেমন একটা ঝোঁক ছেলেবেলা থেকেই—যা সহজ, যা অল্পে হয়, তাতে আমি যাবো না; যা অপরে পারে না আমি যদি তা না পারি,—তবে আর বাহাদুরি কি?'

আর একবার হাতটা কপালে পেঁছিয়, 'কেত্তন শুরু করেন প্রেথম মহাপ্রভুই। তবে তিনি লীলাকেত্তন গাইতেন কি পালা, তা বলতে পারব না। খোলকত্তাল জগঝম্প—পাঁচটি জিনিস নিয়ে, অনেক দল লোক নিয়ে গাওয়া হ'ত বলে সংকীত্তন বলা হ'ত। শুনেছি—ঠিক জানি না, ভগবানের কীত্তি গাওয়া হয় বলে কীত্তন, তা থেকে আমরা বলি কেত্তন। তবে শ্রীল রূপ গোসাঁই আর তাঁর ভাইপো জীব গোসাঁই প্রেভু—এ'রা

লীলাই গাইতেন বলে শ্নেছি। এ'দের তিরোধানের পর এ'দেরই শিষ্য-পরম্পরায় একজন ঠাকুর নরোত্তম—ধনী নরোত্তম যাকে বলে কেউ কেউ. তিনি খেতুরে এক মোচ্ছব দেন,. মহামোচ্ছব—চারিদিক থেকে বহু বোস্টমসাধু গাইয়ের দল আসে, রাঢ় থেকেই বেশী—সেইখানেই এই ঠাটের গান চালু করেন নরোত্তম ঠাকুর। আগে যা গাওয়া হ'ত. তাতে ভক্তির কথাটাই প্রেবল—গানের চেয়ে চোখের জলের দাম ছেল বেশী। ইনিই একটা আইনে ফেললেন সবটাকে। নতুন ধ্রুপদাঙ্গ রূপ দিলেন কেত্তনের।'

এই ব'লে আর একটু থেমে নিঃশব্দে কয়েকবার জপ ক'রে বলে, 'আর এই নরোত্তম ঠাকুরই গৌরচন্দ্রিকার রেওয়াজ করেন। মানে—কথাটা বুঝিয়ে বলি একটু। বোস্টমরা বলেন, ওঁরা বিশ্বেস করেন. শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে রাধিকা যে একশ' বছর কে'দেছিলেন—যে দশাটার কথা আমরা মাথুরে গাই—সেও ভগবানের এক লীলা। তা রাধিকার শাপেই হোক আর ভগবানের সেই লীলা আস্বাদনের শখ হওয়ার জন্যেই হোক—গৌরাঙ্গ অবতারে তিনি রাধিকার দেহ দিয়ে তাঁর মন নিয়ে জন্মেছিলেন। সেইজন্যেই হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ক'রে কে'দে কে'দে বেড়ানো তাঁর, সেইজন্যেই কান্তাভাবে সাধনা। মানে ওঁরা যেন সবাই গোপী, শ্রীকৃষ্ণ ওঁদের বল্লভ. ওঁদের সোয়ামী—এইভাবে দেখেন ও'রা ভগবানকে। তা গৌরাঙ্গ যদি শ্রীকৃষ্ণই হন. আর সে জন্মের লীলা আস্বাদ করতেই ধরায় অবতীর্ন হয়ে থাকেন—তাহলে এ-জন্মেও সেইসব লীলা করবেন তো! তাই গৌরকে দিয়েই শুধু যে গান আরম্ভ করা হয় তা নয়—এ-লীলায় সে-লীলায় মিলিয়েও দেওয়া হয়। ধর, যেমন নৌকাবিলাস। গৌর নৌকায় বিহার করছেন এই দিয়ে আমরা শুরু করি—তারপরই চলে যাই শ্রীকৃষ্ণলীলায়। কেউ কেউ অবশ্য শুধুই গৌরাঙ্গের স্তব গেয়ে শুরু করেন। যাই হোক—গোরাচাঁদই আমার এই কেত্তনের মূল তো—সেইজন্যে তাঁকে পেন্নাম না ক'রে কেউ লীলা শুরু করি না। গৌরচন্দ্রের কথা দিয়ে শুরু বলে ঐ শুরুটাকে বলে গৌরচন্দ্রিকা। দ্যাখ্ না, এই থেকে কথাটা এমন ছড়িয়ে গেছে. কেউ যদি কোন কথা বলতে এসে. বাত্তারাটা সরিয়ে রেখে আগড়ুম বাগড়ুম বকে, আমরা বলি. নে বাপু তোর গৌরচন্দ্রিকে রাখ দিকি, যা বলবার বলে ফেল্।'

এই বলে হাসে মতি। 'শুধু ভগবানের নাম গাওয়া কি হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট গাওয়া যা—এও একরকমের কেত্তন। কিন্তু আমরা যা গাই তা হ'ল কৃষ্ণ-রাধিকার লীলা—তাই একে বলে লীলাকেত্তন, কেউ কেউ আবার পালাকেত্তনও বলে। ভগবান যেসব লীলা করেছিলেন. তারই এক একটা অংশ এক এক পালা ক'রে গাওয়া হয়। এমন পালা এক-আধটা নয়—চৌষট্টিটা আছে। প্রাচীন পদকত্তারা যেসব গান লিখে গেছেন, ভেন্ন ভেন্ন রাগ-রাগিনীতে ভেন্ন ভেন্ন তালে—পছন্দ মতো বেছে বেছে মিলিয়ে মিশিয়ে গাই আমরা, একটা পালার মতো খাড়া করি। তাই পালাকেত্তন বলে। তা চৌষট্টি রসের মধ্যে সব চালু নেই, সব গান গাওয়াও যায় না, আমরা মোটামুটি যা গাই. তার মধ্যে গোষ্ট, পূর্বরাগ, দান, মান, রাস. ঝুলন, মাথুর—এই কটারই চল বেশী। এর আবার গাইবার সময়-বিশেষ আছে। গোষ্টপালা কেউ সন্ধ্যেয় গাইবে না—সকালে ছাড়া গোষ্ট হবে না। তেমনি রাস বা ঝুলন সকালে গাওয়া যায় না।'

বলতে বলতে হয়ত চুপ করে মতি. হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কিম্বা মনের মধ্যে গুছিয়ে নেয় বক্তব্যগুলোকে. মনে করার চেষ্টা করে কথাগুলো। দু-এক কলি গানও হয়ত গুনগুন ক'রে ভেঁজে নেয়—তারপর আবারও মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বলে. 'আ মলো যা, হরেকেষ্টর আক্কেলটা দেখেছ। সেই গেল আর ফেরবার নাম নেই। তামুক খেতে গেল—না গাঁজা? কোথায় দ্যাখো গে যাও দাঁত-ছরকুটে ভিরমি লেগে পড়ে আছে!...হ্যাঁ, যা বলছিলুম, খেতুর হ'ল গে রাজশাহী জেলার গরানহাটি পরগণার মধ্যে, তাই নরোত্তম ঠাকুর যে ঠাট প্রেবর্তন করলেন, তাকে বলা হয় গরানহাটি। গরান-

হাটি ঠাটের কেত্তন। কিন্তু এ-ধারার গান গাওয়া অত সহজ নয়, সহজ হ'লও না। উ'চ্দরের গান, রীতিমতো শিক্ষে মেহনৎ দরকার। আমিও তেমন আসর দেখলে এ-ঠাটে গাই না, হালকা চালে রেনেটি ঠাটে গাই। গরানহাটি ঠাট যে-সে যেমন গাইতেও পারে না—তেমনি বুঝতেও না।'

তারপর একটু থেমে, দম নিয়ে বলে, 'নরোত্তম ঠাকুর যেমন-তেমন গাইয়ে ছেলেনও না, শুনেছি তিনি গান শিখেছিলেন খোদ হরিদাস ঠাকুরের কাছে। হরিদাস ঠাকুর ছেলেন সেকালের সবচেয়ে বড় গাইয়ে তানসেনেরও ওস্তাদ—মানে গুরু। লোকের মুখে তাঁর গানের কথা শুনে আকবর বাদশা নাকি ডেকে পাঠিয়েছিলেন—তা হরিদাস ঠাকুর যান নি। কেনই বা যাবেন—তিনি তো আর খেতাব কি টাকার কাঙাল ছেলেন না। বলে পাঠিয়েছিলেন, আমি ভিখিরি-নাকিরী মানুষ, ওসব রাজা বাদশার দরবারে আমার কি কাজ? অপর কোন নবাব বাদশা হ'লে হয়ত তখনই শূলে চড়াবার হুকুম হ'ত—কিন্তু আকবর ছেলেন অন্য ধাঁচের মানুষ, গুণীর মর্যাদা বুঝতেন। বললেন, তানসেন তুমি তৈরী হও, আমিই যাবো। তানসেন বললেন, উ'হু, তা হবে না, বাদশা দেখলে গাইবেনই না আমার গুরু—আর লোকলস্কর দেখলে গান চমকেও যাবে। তখন ঠিক হ'ল দুজনেই বৈরিগী সেজে গিয়ে আড়াল থেকে গান শুনবেন।...লোকে বলে, হরিদাস ঠাকুরের গান শুনে বাদশা নাকি তানসেনকে জিজ্ঞেস করেছেলেন, এ'র কাছেই তো তোমার শিক্ষা, তা কৈ, তুমি তো এমন গাইতে পারো না। তাতে তানসেন জবাব দিয়েছেলেন, হুজুর আমি গান শোনাই দুনিয়ার বাদশাকে, আমার গুরুজী শোনান বাদশার বাদশাকে—তফাৎ একটু থাকবে না?'

এই প্রসঙ্গের জের টেনে হয়ত আর এক সময় কি আর একদিন আবার ধরে, 'গরান-হাটি ঠাটে গাওয়া চার পাটি দাঁতের কম্ম, বুকের জোর থাকা চাই। এতে কীর্ত্তন গাইলে সবাই শুনবেও না, বুঝবেও না—তাই ভাবগতিক দেখে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর এক নতুন ধারা আনলেন। তাকে বলা হ'ল মনোহরশাহী। খেতুরিতে মহামোচ্ছব হবার বেশ কিছুদিন পরে রঘুনন্দন ঠাকুর এই ধারায় গাইতে শুরু করলেন। রঘুনন্দন ঠাকুর হলেন কাঁদড়ার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর। কাঁদড়া হ'লগে রাঢ় দেশে—বীরভূম না কি বলে—সেই দেশে। আমরা যে পদকত্তা জ্ঞানদাস ঠাকুরের গান গাই—ইনিও এই ধারার গাইয়ে। জ্ঞানদাস গান বাঁধতেন, গাইতেনও খুব ভাল। রঘুনন্দন ঠাকুর অনেকটা হাল্কা ক'রে আনলেন, তাই বলে একেবারে—এখন যে সব ঢবআলীরা হয়েছে, ঢব্ গেয়ে বলে কেত্তন গাইলুম, তেমন নয়—এতেও মেহনৎ ছেল বেস্তর। বৈঠকী আমেজটা এল, কিন্তু সুরের কারিগরীও রইল, অনেকটা খেয়াল গানের মতো। তার মধ্যে খেয়াল গান তো তুই বোধহয় শুনিস নি। সে যাক্ গে মরুক গে—এতেও অনেকটা সহজ হয়ে এল। লোকে বুঝতেও পারল, আনন্দও পেল। মনোহরশাহী কেন? এ নিয়ে বাপু নানান মুনির নানান মত—কেউ বলে কাঁদড়া মনোহরশাহী পরগণায় বলে ঐ নাম হ'ল, কেউ বলে এই দশঘরার কাছে মনোহর শাহ্ বলে একজন প্রেথম ঐ ঢঙ প্রেবর্তন করেন বলে ওর ঐ নাম। কেউ বলে কাঁদড়াতেই আউলে মনোহর দাস বলে এক বৈরিগি ছিলেন, তিনিই এই ঢঙ্ আমদানি করেন। কিন্তু আমার মনে হয় মনোহরশাহী পরগণার কথাটাই ঠিক, সব জায়গাতেই তো দেখি জায়গার নাম থেকেই ঠাটের নাম।'

এসব ইতিহাস ভাল লাগার কথা নয়—কিন্তু সুরবালার লাগে। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শোনে সে। তার কাছে এ এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। গাইছে সে, বাহবাও পাচ্ছে এতকাল—কিন্তু এ গান সম্বন্ধে যে এত কথা জানবার আছে তা কখনও কল্পনা করে নি। মতি শুধু মুখেই বলে না—একই পদ নিজে বিভিন্ন ঠাটে গেয়ে শুনিয়ে দেয়—তফাৎটা বুঝিয়ে দেয়। তারও যেন নেশা লেগেছে একটা। এতকালের অধীত বিদ্যা আর জ্ঞান

কাউকে দেবার জন্যেই বুঝি এতকাল ছট্‌ফট করছিল সে, আধার পায় নি। আদৌ শুনতেই চায় না কেউ—এমন মুগ্ধদৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে একাগ্রমনে শোনা তো দূরের কথা, মনে ক'রেও রাখে না। এ রাখবে—এই মেয়েটি, তা ওর মুখের দিকে চেয়েই বোঝে। (রেখেও ছিল। পরবর্তী জীবনে সুরোদিদি বলেছিলেন আমাকে, 'সেদিনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। আজও তেমন চেলা বা সাগরেদ পেলে শিখিয়ে যেতে পারি, আর কিছু না হোক, গুরুঋণ শোধ হয় খানিকটা। কিন্তু শোনাব কাকে? কেউ কি আর আজকাল শিখতে চায়? না শুনতেই চায় এসব?')

ঠাট বা ধারা কি একটা?' কোন কোন দিন, মুজরো-টুজরো না থাকলে পূর্ব অভ্যাসমতো বিকেলে গা ধুয়ে কুঁচনো শাড়ি পরে আতর মেখে পা-ছড়িয়ে বসে মালা জপতে জপতেও এসব প্রসঙ্গ ওঠে, 'গরানহাটি থেকে একটু হালকা করার জন্যে মনোহর-শাহীর চল করা হ'ল কিন্তু তাতেও লোক তেমন নিলে না। তাই লোকের মেজাজ বা মন বুঝে আর একটু হালকা ক'রে ফেললেন পদকত্তা ঠাকুর বিপ্রদাস ঘোষমশাই। ঠাকুরমশাই ছিলেন হুগলী জেলার রাণীহাট পরগণার লোক, সেই জন্যেই ঐ ধারাটাকে বলে রাণীহাটী, তা থেকে রেনেটি। এটা কিরকম দাঁড়াল জানিস? গরানহাটিকে যদি ধ্রুপদ বলো তাহলে মনোহরশাহী হ'ল গে খেয়াল—রেনেটি ঠুংরি। এই রকম তফাৎ পেরায়। এই যে এখন আখরের চল হয়েছে—গাইতে গাইতে আসল গান ছেড়ে আখর দেওয়া—এও শুনেছি ঐ বিপ্রদাস ঠাকুরের আমল থেকেই শুরু হয়েছেল।'

'এ ছাড়া ধরো গে ময়নাডালের দল। মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন গদাধর ঠাকুর, তাঁর বংশের সন্তান ছেলেন মঙ্গল ঠাকুর, তাঁর বংশ এখনও কাঁদড়ায় বাস করেন—আদি বাস অবিশ্যি ওখানে নয়—সে ঐ মুকশুদোবাদের ওদিকে কোথায় ছেল শুনেছি—কাঁদড়া তো আমাদের দেশের কাছে—মানে কাটোয়ার কাছাকাছি বর্ধমান জেলায়। তা সে যাকগে মরুক গে, নিসিংহি মিত্তির হলেন ঐ মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্যিসাগরেদ, ওঁদের কাছেই গান শেখেন। এ'দেরই বংশে সেই ধারাটা বজায় রেখেছেন, ময়নাডালের ধারা বলে।...এমন কত বলব। মন্দারিণী ঠাট বলে একটা, গড়মান্দারণ বলে কী একটা নাকি জায়গা আছে—সেখান থেকেই ঐ ঠাটের নাম। সে জায়গাও নাকি বাংলার মধ্যে। তবে এসব নতুন নয় কি হাল আমলের নয়। যখন খেতুরে মোচ্ছব হয় তখনও এসব ধারায় লোকে গেয়েছে। ঝাড়খণ্ডী বলো, মন্দারিণী ধারা বলো—এ সবই বহুকাল থেকে লোকে গেয়ে আসছে। ঝাড়খণ্ডী তো খুবই পুরনো, আমাদের কড়ুইয়ের গোকুল ঠাকুর পঞ্চ-কোটের শেরগড়ে গিয়ে বাস শুরু করেন—তিনি যে ধারায় গাইতেন সেইটেই ঝাড়খণ্ডী বলে চলছে। পঞ্চকোট ঐ ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ে তো। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যেতেন ঝাড়খণ্ডের পথেই যেতেন নাকি—পুঁথিপুরাণে লেখা আছে। তবে এসব গানের খুব চল হয় নি—যেখানকার জিনিস সেখানেই—ঐ জেলায় কি ঐ পরগণার ভেতরেই লোকে গায়। এসব শুনেছি আমি পয়সা খরচ ক'রে লোক আনিয়ে আনিয়ে। তবে ওসব আর শিখি নি, অত পেরে উঠব না, মজুরীও পোষাবে না—তা জানতুম। মোটামুটি বড় যে তিনটে ঠাট—মনোহরশাহী গরানহাটি রেনেটি—এ কটা ভাল ক'রে শিখেছি, গাইতেও পারি। গাইও মধ্যে মাঝে মিলিয়ে মিশিয়ে। ওস্তাদরা শুনলে গাল দেবে—কিন্তু আমার ভাল লাগে—যারা শোনে, তাদের মুখ বদল হয়! যে যা বলুক, আমাদের তো এই রোজগার, লোকের ভাল লাগাটা আমাদের আগে দেখা দরকার।'

টাকা হাতে আসতে প্রথমেই শশীবৌদির ধার শোধ ক'রে এসেছে সুরো। আরও কিছু নেবার জন্যে অনেক করে ধরেছিল, বৌদি রাজী হন নি। সুরো বলেছিল, 'চড়া সুদে যেগুলো নেওয়া আছে সেগুলো অন্তত শোধ ক'রে দাও না বৌদি, সুদটা তো

বাঁচবে! আমি তো দান করছি না, সে আস্পদ্দা আমার নেই—ধারই দিতে চাইছি। না হয় আমাকেও কিছু সুদ দিও।'

চারুবাবু ধমক দিয়েছেন শুনে, 'এত দুঃখেও তোর চৈতন্য হয় নি সুরো। টাকা জমা, দু'চারখানা গয়না গড়িয়ে নে এইবেলা। দিনকতক খুব ডাক আসছে—ভাবছিস এমনিই চলবে এখন থেকে—না? পর পর যদি কিছুদিন কোন বায়না না আসে—তখন? টাকা হাতছাড়া করিস নি!'

শশীবৌদি প্রস্তাব করেছিলেন, সেই হারটা ভেঙে আর কিছু সোনা দিয়ে ভারী দেখে একটা হার কিম্বা—কী এখন নেকলেস হয়েছে বলে—তাই গড়াতে। সুরো প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছে, 'ও হার আমি গলাতে দেব না বৌদি, ও তোমার দেওয়া—ও আমার লক্ষ্মী। ও আমার তোলা থাকবে। যদি কোন দিন নিজের ঘরবাড়ি হয় —লক্ষ্মী পাততে পারি—ঐ হার পেতে লক্ষ্মী বসাবো।'

অবশ্য সে সোনার দরকারও হয় না। মাস তিন-চারের মধ্যে চুড়ি বালা হার গড়িয়ে নেয় একে একে। মাকেও গড়িয়ে দেয় কিছু কিছু। ভাল কাপড়-চোপড় তো কিনতেই হয়—এগুলো ঠাট বজায় দেবার অঙ্গ। নিত্য বাইরে যাওয়া, ভাল ভাল শাড়ি না হ'লে চলে না। প্রথম প্রথম মতিই শাড়ি বার ক'রে দিয়েছিল, গয়না পরিয়ে দিয়েছিল, এখন আর তার কাছে নিতে হয় না। মতি বলেছে, এবার দু'তিন সেট সবরকম গয়না গড়িয়ে দেবে তার স্যাকরাকে দিয়ে, এক গয়না রোজ পরে গেলে ইজ্জত থাকে না।

'হাতে একটু বেশী জমুক তোর, ভাল দেখে সীতেহার আর মুক্তোর কণ্ঠী করিয়ে দেব। সেই সঙ্গে কানের জড়োয়া কেরাপাৎ আর পাশা-ঝুমকো। এদিকে গা-সাজানো হ'লে টায়রা গড়িয়ে নিস একটা ভালো দেখে—' ইত্যাদি।

আরও বলে, 'কী সব এখন নতুন বিলিতি জিনিস বেরিয়েছে মুখে মাখে, তাই একটা-আধটা কিনিস। আমিও মেখেছি, ফরাসীদের তৈরী, দাম কি—একো একো শিশি পাঁচ-সাত-দশ-বারো টাকা পজ্জন্ত। এদান্তে ছেড়ে দিয়েছিলুম, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই বলে। নতুন নতুন, এখন কাঁচা বয়স তোদের—একটু ছেলাবতে থাকা দরকার। এসব খরচে কেপ্পনতা করতে নেই, যে কাজের যা। বলে, আগে দর্শন ডালি, পরে গুণ বিচারি। মানুষটাকে দেখে যদি ভাল লাগে তখন তার সবই ভাল লাগবে।'

দুঃখদিনের স্মৃতি, দুর্দিনের স্মৃতি প্রথম বয়সের উজ্জ্বল পটে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে একটু একটু ক'রে—কিন্তু দুঃখ অত সহজে অব্যাহতি দেয় না। অভাবের চিন্তা ছিল একটা—এখন অসংখ্য দুশ্চিন্তা মাথা তোলে। প্রাচুর্য অন্য বেদনা জুটিয়ে আনে। ভাইটা এখনও নিরুদ্দেশ। নিস্তারিণী আগের মতো আর কান্নাকাটি করে না, সে ধরেই নিয়েছে ছেলে আর তার নেই—তবু এখনও কিছু সুখাদ্য রাঁধতে গিয়ে তার চোখে জল আসে, এক এক দিন—গণেশ যা বেশী ভালবাসত সে সব খাবার রেঁধে—নিজে মুখে তুলতে পারে না।

তার চেয়েও দুর্ভাবনা সুরোর বাবার জন্যে। ভবতারণ যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। কোন যে স্পষ্ট রকমের ব্যাধি আছে তা নেই, মনে হয় যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছেন। অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে জোর ক'রে ঘুরেছেন, মড়া ঘোড়াকে চাবুক মেরে চালানোর মতো—সম্ভবত এবার তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভবতারণ নিজেই ঘোড়ার সঙ্গে উপমা দেন, ম্লান হেসে বলেন, 'আমরা কি জানিস মা, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া। ঐ যে দেখিস হাড়-জিরজিরে রোগা ঘোড়াগুলো—কোনমতে ঠেলেঠুলে তুলে দাঁড় করিয়ে জোত্ পরিয়ে দাও, ঘা-কতক চাবুক মারো—ঠিক চলতে শুরু করবে, আর করল তো সারাদিনই ঘুরছে, জোরেও না আস্তেও না, একভাবে চলে যাবে—যে মাত্তর জোত-লাগাম খুলবে একেবারে শুয়ে পড়বে, তখন মড়া একেবারে। তা আমারও হয়েছে

সেই এক দশা।'

সুরবালা কবিরাজ ডেকেছিল এর মধ্যে। ভাল নামকরা কবিরাজ একজন। তিনি এসেও সেই কথাই বলেছেন, 'শরীরে কিছুই নেই মা, বুকটাও খুব দুর্বল, রক্তহীন হয়ে পড়েছেন অনেকদিন ধরে। নিজের দিকে নজর দেন নি কখনও—অনেক আগে থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে। এখন একটু ভাল ক'রে খাওয়াও দাওয়াও—আর কী করবে! মকরধ্বজ দিয়ে যাচ্ছি, দুধের সর আর মিছরির গুঁড়োর সঙ্গে দুবার ক'রে খাইও, সেই সঙ্গে একবল্‌কা দুধ খানিকটা ক'রে। একটা হজমের ওষুধও দিয়ে যাচ্ছি, দুধ ফল যা খেতে চান নির্ভয়ে খেতে দিও। এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না!"

কিন্তু ভবতারণ কিছুই খেতে চান না। আজকাল বেশির ভাগ সময়ই চুপ ক'রে চোখ বুজে পড়ে থাকেন শুধু। কিম্বা দুপুরের পর খেয়ে দেয়ে উঠোনের যে কোণে একফালি রোদ এসে পড়ে—সেইখানে গিয়ে বসেন। সুরবালা চাকর রেখেছে একটা, আরও এই বাজারের জন্যেই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান জিনিস আনায়, নিস্তারিণী রাঁধেও—কিন্তু ভবতারণ কিছুই খেতে পারেন না। পীড়াপীড়ি করলে হাসেন। বলেন, 'মশাই এ পৃথিবীর খাওয়া শেষ ক'রে এনেছেন, আর কেন?...হ'লও তো অনেক দিন, এবার ছেড়ে দে বৌ।' কোন কোন দিন মেয়েকে বলেন, 'কেন মিছিমিছি টানাটানি করছিস মা, শুধুশুধু খরচ-অন্তর কতকগুলো! তার চেয়ে এবার ভরসা ক'রে ছেড়ে দে। তোর জন্যেই ভাবনা ছিল—এখন সেটাও কমেছে, আর কিছু না হোক, তোর ভাত-কাপড় তুই চালিয়ে নিতে পারবি মনে হচ্ছে, তোর মাকেও কিছু ফেলবি না।...আর তোর ভাই—? না, তার কথা আর ভাবি না। ভেবেই বা কি করব বল! সে তো একরকম নিজের পথ নিজেই দেখে নিয়েছে—।'

মুখে বললেও—তার কথা যে বেশী রকম ভাবেন, আর সেই ভাবনাই যে দিন দিন তাঁকে এমন ক্লিষ্ট এমন কৃশ এমন জীবনবিমুখ ক'রে তুলছে—তা সুরো জানে। তবে এও জানে যে, শুধু ভাইয়ের কথা নয়, সেই সঙ্গে ওর কথাও ভাবেন—এখনও পর্যন্ত।

এক একদিন নিস্তারিণীকে বলেন ভবতারণ, 'তখন তুই বিয়ে দিতে চেয়েছিলি সুরোর—তোর কথা শুনি নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দিয়ে দিলেই হ'ত। সত্যিই ও ব্রাহ্মণের মেয়ে ছাড়া হ'তে পারে না। এত তেজ ওর, এত সত্যি কথা ভালবাসে—। তাছাড়া, মায়ের দেওয়া—আজ পর্যন্ত অন্য জাতের ভাতও খায় নি।...তখন বে দিলে আজ একঘর নাতিনাতনী দেখে যেতে পারতুম। ছেলেটা তো বাদে-ছরাদেই গেল। বংশটা আর রইল না। এমন কি আর মহাশয় লোকের বংশ—তা কিছু না, তবু পিতৃকুলের কাছে ঋণটা থেকেই গেল।...যাক গে, কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম। ঠাকুর যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। আমরা মিছেই ভেবে মরি বৈ তো নয়।'

ঠাকুর যে শেষ ক'রে আনছেন, প্রদীপের তেল যে কমে আসছে—তা সুরোও বোঝে। তবু সে তার চেষ্টার ত্রুটি করে না। শেষ পর্যন্ত বড় সাহেব-ডাক্তারও ডাকে একদিন। কিন্তু তিনিও দেখেশুনে ঘাড় নাড়েন—অর্থাৎ ভেতরে কিছু নেই, আর বেশী দিন নয়। ভবতারণ তিরস্কার করেন সুরোকে, 'পয়সাগুলো কি তোর কুট্‌কুট্‌ করে রে? গরীবের এসব ঘোড়া-রোগ কেন? দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না? কলকব্জা অনেকদিন বিনা তেলে ঘুরলে যা হয়—সব ক্ষয়ে গেছে একধার থেকে! এবার এ ফেলে দেবার সময় হয়েছে। মিছিমিছি এর পেছনে এত পয়সা খরচ করচিস কেন?...তোর এত দুঃখের পয়সা!... তোর রোজগার কিছু ব্যাপারীর গদির রোজগার নয়, যে মালিক পড়ে থাকলেও অপরে চালাতে পারবে। ঈশ্বর না করুন—ঠাণ্ডা লেগে দুদিন গলা ভাঙলে এ কারবার বন্ধ। একটা লোকের শরীরের ওপর সব নির্ভর করছে।...মতিকে দেখেও শিক্ষে হ'ল না তোর? অত বড় ডাকসাইটে গাইয়ে—একটু বাত ছুঁলো তো রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। এইবেলা—

মা লক্ষ্মী যদ্দিন আসছেন—দুর্দিনের জন্যে জমিয়ে রাখ, পোস্টাপিসে কি সব জমানোর আইন হয়েছে, সেখানে রাখ। কোম্পানীর ঘরে টাকা থাকলে কোন ভয় নেই। সোনাদানা গড়্ছের করাও ঠিক নয়, কোনদিন চোর-ডাকাতের পেটে যাবে—এক রাত্তিরে আবার যে-কে সেই, পথের ভিখিরী। লক্ষ্মী দু'চার দিন মানুষকে দিয়ে যাচাই করেন, যে যত্ন ক'রে ধরে রাখে তাকেই ঢেলে দেন। টাকা নিয়ে এমন অযথা ছিনিমিনি খেলিস নি।'...

শেষ হয়ে আসছে তো বটেই। বেশীদিন আর নয়—তা সুরোও জানে। কেবল ভগবানকে ডাকে, মানুষটা তো কখনও অধর্মের পথে চলে নি, শেষ ইচ্ছাটা ওর পূরণ করো ঠাকুর। ছেলেটাকে এনে দাও! একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পাবে না?...

ছেলের জন্যে যে কী পরিমাণ আকুলি-বিকুলি করছেন ভবতারণ তা মুখের ভাষায় প্রকাশ করেন না সহজে—বোধহয় এদের মুখ চেয়েই আরও, অকারণে কষ্ট পাবে ভেবেই প্রাণপণে চেপে থাকেন—কিন্তু এক এক সময় মনের সে আকুলতাটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, চাপতে পারেন না কিছুতেই।

কীর্তনের মুজরো সাধারণত ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষেই হয়—মতির ভাষায় 'যজ্ঞিবাড়ি' ছাড়া শখ ক'রে কেত্তন আবার কে কমনে দেয়? দোহার বাজনদাররা বসে খায়, তেমন 'এউঢেউ' দেখলে চেয়েচিন্তে ছাঁদাও বাঁধে—যে গাইতে যায় সে বিশেষ খায় না। মতি খেত না, সেই দেখাদেখি সুরোও খায় না কোথাও। মতি বলে, 'ওতে ইজ্জত থাকে না। কেত্তনআলীকে তো কেউ আর ভদ্দরলোক বামুন-কায়েতের মেয়েদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাবে না, আলাদা বসিয়ে খাওয়াবে—হয়ত আমারই দোয়ার বাজনদারদের সঙ্গে বসাবে, উঠোনে বসানোও আশ্চয্যি নয়। সে অপমান সেধে নিতে যাই কেন? গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া।...কেন, আমরা কি খেতে পাই না যে, দুখানা নুচি খেয়ে স্বগ্‌গে যাবো একেবারে!'

বসে না খেলেও—বেশির ভাগ বাড়িতেই—ঝুড়ি ভরে খাবার তুলে দেয় গাড়িতে। সুরো প্রথম প্রথম নিজের বাড়ি আনত না, মতির বাড়িতেই রেখে আসত—ঝি চাকর ঠাকুর দারোয়ানের জন্যে। ইদানীং মতি রাগ করে, বলে, 'অত খাবার রেখে যাস কেন? যখন নিয়েই এলি তখন খেতে দোষ কি? এখন তো আমিও গাইছি, খাবার তো আসছেই। তোর পাওনা তুই নিবি নে কেন? কিছু রেখে কিছু নিয়ে যা অন্তত—এ তো আর কেউ পাতকুড়োনো এ'টোকাঁটা মাল দেয় না।'

তবু সুরোর যেন কোথাও একটা বাধত। শেষে মতিই জোর ক'রে বামুন ঠাকুর বা ঠাকরুন—যখন যে থাকে রাঁধুনী—তাকে দিয়ে ভাগ করিয়ে কিছু রেখে কিছুটা আবার গাড়িতে তুলে দিতে শুরু করল। শ্রাদ্ধ-বাড়ির খাবার বড় একটা দিত না—খুব নাম-করা বড়লোকের বাড়ি ছাড়া—তবে বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনের খাবার নিঃসঙ্কোচে দিত, নির্বিচারে। খাবার অনেক বেশী থাকত, এদের প্রয়োজনের ঢের বেশী। তিনটে তো প্রাণী, একটা ঠিকে-ঝি অবশ্য হয়েছে এখন—তেমনি ভবতারণ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন বলতে গেলে। শশীবৌদিদের এসব খাবার দিতে লজ্জা করত সুরোর, শেষে একদিন খুব ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করতে তিনি হেসে বললেন, 'যজ্ঞিবাড়ির খাবার উনি এমনিই খেতে চান না, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়েও পংক্তিতে বসেন না—নিয়ে দিয়ে তো আমি আর ছেলেটা, ওসব মাছ-টাছে দরকার নেই, যদি ভাল মিষ্টি আসে কোনদিন—আলাদা ক'রে কেউ দেয়—দু'একটা দিয়ে যাস। এই তো সোজা কথা—তুইও যেমন জিজ্ঞেস করলি আমিও তেমনি উত্তর দিলুম, এতে আর তোর এত লজ্জা কি?'

তাই দেয় সুরো। অধিকাংশ জায়গাতেই মিষ্টির ভাগ আলাদা ক'রে দেয়—হাঁড়ি ভরে। সুরোও আলাদা ক'রে আগভাগ দই মিষ্টি রাবড়ি ক্ষীর ওদের দিয়ে আসে।

নিস্তারিণীর এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না। আড়ালে চাপা গলায় গজগজ করে, 'তোকে দিয়েছে ভাল জিনিসগ্‌লো, তুই বেছে রাখ, নিজে খা—তা নয়, আগভাগ সেরা জিনিসগ্‌লো নিয়ে চললেন দাতব্য করতে। ধোত্তোর কপাল, চিরটাকাল আমার সমান জ্বালা গেল, যেমন বাপ তেমনি বেটি। এত ঠেকে এক শিখেও চৈতন্য হ'ল না।'

স্‌রবালা এসবে কান দেয় না। সে জানে এত দিয়েও যা থাকবে তা ওরা খেয়ে শেষ করতে পারবে না, ফেলা যাবে। যেতও তাই। মিষ্টি তব্‌ দ্‌'একদিন রেখে খাওয়া যায়, মাছ তরকারি পচে ওঠে, ফেলে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। আর আজকাল তো প্রায় নিত্যই আসছে, সঞ্চয়ের প্রয়োজনও হয় না।

এক একদিন খাবারের ঝ্‌ড়ি এনে ঘরে নামাবার পর নিস্তারিণী যখন একে একে নানা স্‌খাদ্যর—তাদের ঘরে স্বপ্নসম্ভব-মাত্র এমন সব মহার্ঘ্য ভোজ্যের রাশি—নানা আকারের ভাঁড় খ্‌রি মালসা হাঁড়ি চ্যাঙারি নামিয়ে মেঝেতে সাজাত—ভবতারণ মনের ভাব বা চোখের জল চেপে রাখতে পারতেন না, বলেই ফেলতেন, 'কোথায় কোথায় যে ঘ্‌রে বেড়াচ্ছে হতভাগাটা—কী অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, দ্‌বেলা খাওয়াই জ্‌টছে না হয়ত—এখানে এমন সব দেবভোগ্য খাবার নিত্য আস্তাকুঁড়ে যাচ্ছে, নয়ত কুকুর-বেড়ালের পেট ভরছে। কপাল! আমারও কপাল তারও কপাল। বেটা জীবনে এসবের নামও জানতে পারল না কোনদিন।'

চোখে স্‌রবালারও জল এসে যেত। বলত, 'তাই ব্‌ঝি এসব তুমি দাঁতে কাটতে চাও না বাবা?'

'ওরে না না', নিমেষে ব্যাকুল ও বিব্রত হয়ে পড়তেন ভবতারণ, 'তা নয়। তুই খাচ্ছিস, তোরা খাচ্ছিস তাতেই কি আমার কম তৃপ্তি। খাইও তো। একেবারে দাঁতে কাটি না তা তো নয়।...তবে এখানের খাওয়া আমার ফ্‌রিয়ে আসছে তা ব্‌ঝছিস না? ক্রমশ কমতে কমতে একদিন একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। ভগবান মান্‌ষকে পাঠান খাবার মেপে দিয়ে, সেট্‌কু শেষ হ'লে আর কিছ্‌ই ম্‌খে ওঠে না তার—এ যে নিয়ম-করা একেবারে।'

নিস্তারিণীর প্‌ত্রশোক এতদিনে কিছ্‌ মন্দীভূত হয়ে এসেছে, ঠিক এতটা প্রাচুর্যের জন্যেও হয়ত নয়—আসলে হাল ছেড়েই দিয়েছে—সে বলে, 'তুমি মিছেই মন খারাপ করছ। সে কি আর আছে যে কোথায় কি খেয়ে বেড়াচ্ছে তাই ভেবে হাঁপিয়ে মরছ! বেঁচে থাকলে এমনভাবে নিড্ডুব খেয়ে থাকতে পারত না।'

'না না, তা হয় না বৌ'—সরবে সজোরে প্রতিবাদ ক'রে উঠতেন ভবতারণ, 'ও-কথা বলিস নি আমার কাছে। জপতপ মন্তর-তন্তর কিছ্‌ই জানি না—গ্‌র্‌কেও প্রাণ ভরে ডাকব, সবদিন হয়ত তাও হয়ে ওঠে না—তবে এট্‌কু কর্তামশায়ের দরবারে পেঁাছে ব্‌কে হাত দিয়ে নিভ্‌ভরসায় বলতে পারব, অকারণে কোনদিন একটাও মিথ্যে বলি নি আর জ্ঞানত কার্‌র কোন অনিষ্ট করি নি—এত বড় আঘাত ঠাকুর আমাকে কখনও দেবেন না। ব্‌ড়ো বয়সে প্‌ত্ত্রশোক দেবেন না কিছ্‌তেই। আমি হয়ত দেখতে পাব না—তবে সে বেঁচে আছে, একদিন ফিরবেও নিশ্চিত—এই বলে গেল্‌ম। দেখে নিস্‌ তোরা।'

ফিরলও গণেশ, আশ্চর্যভাবেই ফিরল। বিনা খোঁজে, বিনা খবরে—যেন আকাশ থেকেই পড়ল সে, বাপকে শেষ দেখা দেখবে বা দেখা দেবে বলেই।

কবিরাজ, সাহেব ডাক্তার—শেষ পর্যন্ত নতুন কী এক চিকিৎসা উঠেছে হোমিও-প্যাথি বলে, জলে একফোঁটা ওষ্‌ধ ফেলে খাওয়ানো—তা পর্যন্ত হয়ে গেল কিন্তু ভবতারণ আর সেরে বাইরে বেরোতে পারলেন না। প্রদীপের তেল ফ্‌রিয়ে গেলে

সল্‌তেটা যেমন একটু একটু ক'রে নিভে যায়, ঠিক তেমনিই একটু একটু ক'রে শেষ হয়ে গেলেন তিনি। মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে থেকে একেবারেই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, জলও আর খেতে পারছেন না—এই যখন অবস্থা, হাত-পা আস্তে আস্তে পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, সেঁকে, তেল মালিশ ক'রে গরম জলের বোতল দিয়েও গরম করা যাচ্ছে না ; ওদিকে কপালে দিন-রাত আঠার মতো চটচটে ঘাম, অবিরাম ইশারা ক'রে বলছেন বাতাস করতে মাথায়, কবিরাজ নিদান হেঁকে গেছেন—আর বড়জোর দুটো দিন, আটচল্লিশ ঘণ্টা পরমায়ু—ঠিক সেই সময় গণেশ তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

না, ভিখিরীর মতো নয়, দীনহীন বেশেও নয়। অস্নাত অভুক্ত রোদেপোড়া না-খেতে-পাওয়া চেহারাও নয়, বরং বলা যায় এল রাজপুত্রের মতোই ; হেঁটেও এল না, একটা ভাড়াটে গাড়ি থেকেই নামল ওরা—গণেশ আর তার এক বন্ধু। দুজনেই সম্ভবত একবয়সী, যদিও বন্ধুকে আরও ছেলেমানুষ দেখায়। তার বেশভূষায় পারিপাট্যও একটু বেশী। কুঁচনো ফরাসডাঙ্গার ধুতি, কুচনো চাদর, রেশমের পিরান, পায়ে বিলিতি চামড়ার পাম্প-শু। গণেশের অতটা না হ'লেও তারও আড়ং-ধোলাই করা দিশী ধুতি, আব্‌-রোঁয়ার জামা, তারও বিলিতি জুতো। কিন্তু বেশভূষাটাও বড় কথা নয়, চেহারারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। গণেশ চিরদিনই রূপবান—তবে মধ্যে টো-টো ক'রে অস্থানে-কুস্থানে ঘোরার জন্যেই হোক বা অনিয়মিত জীবন-যাত্রার জন্যেই হোক, চেহারাটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল ; অমন সোনারমতো রঙে যেন কালি মেড়ে দিয়েছিল কে—বিশেষ যেদিন থিয়েটারে আড়াল থেকে সুরবালা দেখতে পায় ওকে—সেদিন তো তার চোখে জলই এসে গিয়েছিল—চেহারা, বেশভূষা ও সঙ্গিনীদের দেখে। আজ সে কালিমার চিহ্নমাত্রও নেই। যেন এই ক'মাসে—দেড় বছরে দু'বছরে কে ভেঙে গড়েছে তার ভাইকে। প্রথম যৌবনের দীপ্তিতে, স্বাস্থ্যে ঝলমল করছে। চিরদিনই বয়সের তুলনায় ঢের বেশী বড় দেখায়—আজ তো মনে হচ্ছে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছোকরাবাবু একজন এসে দাঁড়াল। নিস্তারিণী তো চিনতেই পারে নি—'বলি কে গা তোমরা, সরাসরি না বলা-কওয়া ভদ্দরলোকদের বাড়ির মধ্যে ঢুকছ?' বলে তেড়ে এসেছিল—প্রায় মিনিট-দুই লেগেছিল তার ছেলেকে চিনে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠতে। সুরবালা চিনতে পারলেও প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল রীতিমতো, আগের মতো এসে একেবারে হাত ধরে কাছে টেনে আনবে বা কান মলে দেবে কিনা—ভেবে স্থির করতে পারে নি অনেকক্ষণ।

সঙ্গে যে বন্ধুটি এসেছিল—কিরণ তার নাম, গণেশের মতো অত রূপবান স্বাস্থ্যবান না হ'লেও, তারও চেহারা ভাল, সুশ্রী। তাছাড়া বেশ একটি সুকুমার লাজুক লাজুক ভাব আছে। খুব ঠাণ্ডা মেজাজের হাসি-মুখ ছেলে। দোষের মধ্যে—দোষ নয়, খুঁৎ বলাই উচিত—সেটা অনেক পরে আবিষ্কার করেছিল সুরবালা, কিরণের ডান হাতের থেকে বাঁ হাতখানা ছোট, নইলে তাকেও দস্তুরমতো সুপুরুষই বলা চলত হয়ত। বেশ একটু ছোট এবং একটু রোগা—অপুষ্ট। কামিজ কি পিরানের মধ্যে থাকলে বোঝা যায় না অতটা, কিন্তু জামা খুলে ফেললে, মেরজাইপরা অবস্থায় বড় দৃষ্টিকটু লাগে।

তখন অবশ্য আর অত আলাপ-পরিচয়ের সময় ছিল না। অভ্যস্ত হাল্‌কা ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল গণেশ, হয়ত সবিস্তারে কিরণের পরিচয়ই দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুরবালার দিকে চেয়ে তার কেমন খট্‌কা লাগল, বুঝল তার সাধারণ অপরাধ নয়—এদের সেই চিরপরিচিত অপরিসীম দৈন্যও নয়—অন্য একটা কি বড়রকমের গোলমাল বেধেছে কোথায়। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিদির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ভেতরে মেঝেতে শোয়ানো মৃত্যুপথযাত্রী ভবতারণের কঙ্কালসার দেহটার দিকে চেয়ে তার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। মুহূর্তকয়েক স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে 'বাবা' বলে

অস্ফুটস্বরে ডেকে উঠে ছুটে গিয়ে পাশে বসল। তাঁর একটা হাত দু'হাতে ধরে যেন ডাকবারই চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল আবার। এমন হিমশীতল যে মানুষের স্পর্শ হয় তা বোধহয় জানত না সে, শুনলে বা কেতাবে পড়ে থাকলেও এর আগে কখনও নিজে হাতে ছুঁয়ে দেখে নি। কিন্তু সেই একবার ডাক, সেই একটু স্পর্শই ভবতারণের অনুভূতিগোচর হয়েছিল, অবসন্ন হয়ে থাকলেও জ্ঞান হারান নি তিনি, প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ চাইলেন একবার। তবে প্রথমটা দেখেও ঠিক বিশ্বাস হ'ল না সম্ভবত, কিম্বা তিনিও চিনতে পারলেন না। শ্রান্ত হয়ে চোখ বুজলেন আবার। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়, তাঁরও কানের মধ্যে সে-ডাক হয়ত এক অভূতপূর্ব শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল যা তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। আর কিছুক্ষণ পরে তেমনিই চেষ্টা ক'রে যখন চোখ খুললেন আবার, তখন যে অসীম আনন্দ আর অপরিসীম তৃপ্তি সেই স্তিমিতপ্রায় চোখে ফুটে উঠল, তাতেই বোঝা গেল যে, এবার চিনতে পেরেছেন তিনি, বুঝতেও পেরেছেন। অবশ্য কথা আর বলতে পারেন নি, আর চোখও চান নি। তারপর, সেই অবস্থাতেই আরও একটি দিন কাটিয়ে চিরদিনের মতোই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তবু সে-তৃপ্তির হাসিটি, অথবা হাসির ভঙ্গীটি মৃত্যুর পর পর্যন্ত মুখে লেগে ছিল, মৃত্যুর কালিমাও তাকে ম্লান করতে পারে নি। অন্তত সুরবালার মনে হয়েছিল তাই।

॥ ১৬ ॥

সেই প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয় কিরণের সঙ্গে। অত্যন্ত দুর্দিনে, অত্যন্ত দুঃখদিনে। শোকের কালোছায়ার মধ্যে, মৃত্যুর অন্ধকারে বলতে গেলে প্রথম দেখল ওরা দুজনে দুজনকে। একেবারে অতর্কিতে, অপ্রত্যাশিতভাবে। কোন প্রস্তুতি কি কোন পূর্বাভাসও ছিল না কোথাও।

সেদিন প্রথমটা একটু বিব্রতই বোধ করেছিল সুরবালা, ভাইয়ের অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। অর্থাভাব আর নেই এটা ঠিক, একটা লোককে খাওয়ানো এখন কিছুই নয়—কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অর্থটাই বড় কথা নয়। আত্মীয় বিয়োগ—বিশেষ মা-বাবার মতো একান্ত আপনজন বিয়োগে—শোকের মধ্যে একটু অন্তরঙ্গতা খোঁজে মানুষ ; একটু আড়াল, একটু নির্জনতা চায়। বাইরের লোক সেখানে অপ্রয়োজন শুধু নয়, অবাঞ্ছিত। যেখানে শোক কাউকে দেখানোর প্রশ্ন নেই—সেখানে মানুষ তার সমস্ত মুখোশ খুলে কাঁদতে চায়—বাইরের কোন কৌতূহলী—হোক তা সমবেদনাপূর্ণ—চোখের সামনে ততটা স্বচ্ছন্দ হওয়া কঠিন। সুরবালাও সম্ভবত বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করেছিল এইজন্যেই—এবং বিস্মিত বোধ করেছিল নবাগন্তুক এ অবস্থা দেখেও চলে না যাওয়ায়।

কিন্তু পরে বুঝেছিল, এ যোগাযোগের মধ্যে সেদিন ঈশ্বরেরই নির্দেশ ছিল। কে জানে তার বাবার সতীমাই তার প্রয়োজনে এই ছেলেটিকে টেনে এনেছিলেন কিনা।

এর যা লৌকিক পরিচয় তা পরে একটু একটু ক'রে পেয়েছিল সুরবালা—কতক ভাইয়ের মুখে, কতক ওর নিজের মুখেই—আর সেই সঙ্গে ভাইয়ের আপাতসচ্ছল অবস্থার কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে পরিচয় তখন না পেলেও চলত।

কিরণের অন্য পরিচয়ও একটা ছিল, মানুষ হিসেবে পরিচয়। সেইটেই তার বড় পরিচয়, সত্য পরিচয়। আর সেটা বোধহয় এই একান্ত অসময়ে এসে না পড়লে এমন-ভাবে পেত না সুরবালা।

পরোপকারী বা মহাপ্রাণ—এসব শব্দ মামুলী, বহু ব্যবহৃত। আর তা বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। তেমন লোক হয়ত আরও আছে। সুরবালাই দেখেছে তেমন লোক। এই ছেলেটি তার চেয়েও বেশী। অথবা কম। কারণ সে সর্বত্রই যে এই ধরনের পরোপকার ক'রে বেড়ায়—তাও তো নয়।

এই রকম সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার পৃষ্ঠপটে, একটি আসন্ন মৃত্যুর মধ্যে এসে পড়েও—এক মুহূর্ত বিপন্ন বোধ করল না ছেলেটি। দ্বিধা বা ইতস্তত করল না, চলে যাবার চেষ্টা তো করলই না। অথচ অনায়াসেই তা করতে পারত, করাই হয়ত উচিত ছিল, লোকের চোখেও সেইটেই শোভন দেখাত। আস্তে আস্তে দু-এক কথায় গণেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলে কেউ দোষ দিত না, বরং যা করা স্বাভাবিক তাই করেছে মনে করত। না যাওয়াতেই সকলে বিস্মিত হয়েছে সে সময়ে। আর সে ব্যবস্থা বা উপায়ও তার ছিল। আশ্রয়, মানে থাকার একটা আস্তানা এবং অর্থ—কোনটারই অভাব ছিল না।

কিন্তু সে দিক দিয়েই গেল না কিরণ। বরং চোখের নিমেষে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে রোগীর কষ্ট বুঝে—এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় এতকাল পরে ভাইকে দেখে পাখা ফেলেই সুরো বাইরে চলে এসেছিল—ছুটে গিয়ে ভবতারণের শিয়রে বসে পাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করল। অপ্রতিভ সুরো অন্যায়টা বুঝতে পেরে এসে পাখাটার দিকে হাত বাড়াতে খুব সহজ অথচ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনি ওদিকটাই বরং একটু দেখুন। এ'র খুব কষ্ট হচ্ছে, এ সময়টা একটু জোরে বাতাস করা দরকার। আপনার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক এখনই আপনি পারবেন না অত জোরে হাওয়া করতে।' আদেশ নয়, অথচ ঠিক যে কী তা সুরবালাও তখন বুঝল না, বোঝবার চেষ্টাও করল না বরং যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপরও যাওয়ার কথাটা যেন চিন্তাই করল না, সম্ভাবনাটাই মাথায় এল না ওর। তার বদলে অতি অল্পক্ষণ, বোধহয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই সুরোকে দিদি এবং নিস্তারিণীকে মাসিমা সম্বোধন ক'রে—কখন সুরোর সম্বোধনের ফাঁকে সম্পর্কটা জেনে নিয়ে শশী-বৌদির সঙ্গে বৌদি পাতিয়ে একেবারেই এদের আত্মীয় হয়ে উঠল। এমন অল্পবয়সী তরুণ—তরুণ কেন প্রায় কিশোর ছেলে এত সহজে আপনজনের মতো মিশতে পারে—তা এর আগে আর কখনও দেখে নি সুরবালা। এই বয়সটা যত-রাজ্যের অকারণ কুণ্ঠা ও লজ্জা টেনে আনে,—আত্মীয়তা বা অন্তরঙ্গতা স্থাপনে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। এই বয়সের ছেলেরা সাধারণত কোন লোকের সঙ্গেই সহজে মিশতে পারে না—এমন কি অপরিচিত অন্য সমবয়সী ছেলের সঙ্গেও না। স্বল্পপরিচিত আত্মীয়দের পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। কিরণ কিন্তু অনায়াসে এক মুহূর্তে এদের পাশে এসে দাঁড়াল, আর তার আচরণে একবারও মনে হ'ল না যে, এই প্রথম এদের দেখল সে ; মনে হ'ল না যে, কিছুক্ষণ আগেও এই সমস্ত পরিবারটাই ছিল একেবারে অপরিচিত—তার জীবনযাত্রা আর এদের জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক, ভিন্নস্তরের ; বলতে গেলে দুই ভিন্নজগতের মানুষ তারা। মনে হ'ল না বোধহয় আরও এই জন্যে যে, এই ধরনের যে-সব মানুষ এমনি অপরিচিত ঘরে এসে আপন হ'তে চায় বা হয়—তাদের মতো উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নেই ওর। কথাই কম বলে, নিজেকে জাহির করে না, ঠিক প্রয়োজনের সময়টির জন্যে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারে। অথচ কথা যে কম বলে তাও ঠিক বোঝা যায় না, দরকারের সময় কম বলেও

না। অর্থাৎ সে একেবারেই সহজ হয়ে যায়, সত্যকারের আত্মীয়রা যেমন সহজ আচরণ করে—তেমনি ক'রেই।

সেদিন তো সে কোথাও গেলই না, পরের দিনও নড়ল না।

তার পরের দিন, তার পরের দিনও না।

ভবতারণের মৃত্যুর পর অশৌচের কটা দিন ঐখানেই কাটল। ওরই মধ্যে ঐ সামান্য জায়গাতেই স্থান ক'রে নিয়ে কোনমতে যেন মাথা গুজে পড়ে রইল। কায়স্থ জেনে শশী-বৌদি ওর খাওয়ার ভারটা নিয়েছিলেন কিন্তু কিরণ এদের সকলের ভার নিজের হাতে তুলে নিল। শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থাই তো একটা গুরু দায়িত্ব ; তখন ব্রাহ্মণ শব-বাহক পাওয়া এখনকার মতো এত সহজ ছিল না। বিশেষ ঐ পাড়ায়। শ্মশানযাত্রার নাম করলেই আত্মীয়রা নানা অছিলায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। কিরণ যে কোথা থেকে কোন্ মন্ত্রে এতগুলো লোক ডেকে আনল তা সে-ই জানে। সৎকারের ব্যবস্থা থেকে শুরু ক'রে হবিষ্যির যোগাড়, পুরোহিত ডেকে শ্রাদ্ধের ফর্দ নেওয়া, টোলে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধান সংগ্রহ, বাজার-হাট, একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ ক'রে গণেশকে টেনে বার ক'রে দায় জানাতে পাঠানো—সব কাজই যেন আপনা থেকে তার ওপর গিয়ে পড়ল, অথবা তাকে বর্তাল।

সেদিন সেই দুঃসময়ে নানুও এসে দাঁড়িয়েছিল কোথা থেকে খবর পেয়ে, এসে-ছিলেন গোলোকবাবু, দুর্গামারাও ; শশীবৌদিরা তো করবেনই, ক'রেওছেন ঢের, এঁরা সকলেই করেছেন, যার যতটুকু সাধ্য—বরং হয়ত সাধ্যের অতীতই করেছেন—তবে কিরণ যা করল তার যেন তুলনাই হয় না। ছোট নয়—বড় ভাইয়েরই কাজ করল সে। সুরবালার বারবারই মনে হতে লাগল কিরণ না এসে পড়লে কী করত তারা! তার জীবন বেশী দিনের নয়—বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দুইই কম। মৃত্যু এই প্রথম দেখল সে। আত্মীয়স্বজন থেকে চিরদিন পৃথক থেকে এসেছে তারা। যেদিন থেকে তার বাবা ঘোষ-পাড়ায় যাতায়াত শুরু করেছেন, সেইদিন থেকেই প্রায় সকলে সম্পর্ক ছেদ করেছে, অন্তত খুব একটা আসা-যাওয়া নেই আর, তাছাড়া ওদের দারিদ্র্যও একটা বড় অন্তরায় আত্মীয়তা-অন্তরঙ্গতার। এখন দারিদ্র্য নেই, কিন্তু 'কেত্তনউলী', 'বাইউলী', 'ঢবউলী' ইত্যাদি বিশেষণ আছে। সকলে চায় গোপনে এসে অর্থসাহায্য নিয়ে যেতে। সুরবালার তাতে বিষম আপত্তি।... তা সে যাই হোক, ওরা যাদের এতকাল পরিহার ক'রে এসেছে, তারা এখন এসে বুক দিয়ে পড়ে সাহায্য করবে, এতটা আশা করা অন্যায়, করেও না সে। সেইজন্যেই আরও কিরণের এই আন্তরিকতার এত মূল্য। সে না এলে এই অসহায় দুঃখের দিনগুলো কেমন ক'রে পার হ'ত সে—কেমন ক'রে এই দায় পার হ'ত—এখন যেন কল্পনাই করতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মনে হ'ত তার, সে এর দ্বারা শশীবৌদিদের, নানুদাকে কি গোলোকবাবুদের ছোট ক'রে দেখছে না তো, অবিচার করছে না তো তাঁদের ওপর? সুরবালা এই বয়সেই নিজের মনকে দেখতে শিখেছে। এটাও সে জানে যে, মানুষ যখন যাকে প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করে, যখন যার সাহচর্যে আনন্দ পায়, তখন তার ক্ষুদ্রতম আনুকূল্য বা চরিত্রগুণও অনেক বড় ক'রে দেখে। আসলে হয়ত এই প্রিয়দর্শন, বিনত, মিতভাষী ও স্মিতমুখ তরুণটি এই কদিনে আপন ছোট ভাইয়ের মতোই অনেক-খানি স্নেহ অধিকার ক'রে নিয়েছে, ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে যতটা পাওয়া উচিত—ওর স্বভাবে ও ব্যবহারে তার চেয়ে অনেক বেশীই আদায় করেছে—সেইজন্যেই ওর উপকারকে এতটা বাড়িয়ে দেখছে, কিন্তু এ বিচার-বুদ্ধিটা বেশীক্ষণ থাকত না, আবারও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

তখনও সে জানে না, সেদিন কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না—কিরণের এই পরিচয়টাই তার জীবনে বার বার পেতে হবে, তার জীবনে বারবারই এসে দাঁড়াবে ও এমনি নিঃশব্দে,

এমনি বিনা আমন্ত্রণে ও আড়ম্বরে—ঠিক প্রয়োজনের ক্ষণটিতে, চরম সংকটের দিনে, মর্মান্তিক দুঃখের দিনে!

কিন্তু কিরণের কাছ থেকে তার বা তাদের উপকার নেওয়ার এটাও শুরু নয়। পরে ক্রমে ক্রমে যা শুনল, গণেশকে এইভাবে ফিরে পাবার মূলেও—ভদ্র, সভ্য বেশে এই বাড়িতে এসে ঢোকা নয়, ফিরে পাওয়া কথাটার পরিপূর্ণ অর্থেই—এই কিরণ।

কিরণ হ'ল এই দিককারই গোবরডাঙ্গা না দত্তপুকুর কোথাকার কোন্ জমিদারের একমাত্র ছেলে (জায়গাটার নাম প্রায় সারা জীবনেও মুখস্থ হ'ল না সুরবালার)—খুব ভাল অবস্থা না হ'লেও খুব ছোটখাটোও নয়, মাঝারি দরের জমিদার ওরা। মূর্খও নয় একেবারে, লেখাপড়াও কিছু কিছু করেছে। ইস্কুল কলেজে কোথাও পড়ে নি, বাবা মাস্টার রেখে বাড়িতেই মোটামুটি বিষয়কর্ম চালাবার জন্যে যেটুকু শেখা দরকার—শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের ঘোরতর থিয়েটার করার শখ, সে মা ও দিদিমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ মোটামুটি কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে ঐ বয়সেই কলকাতায় এসেছিল, হয় টাকা খরচ ক'রে নিজেই নতুন থিয়েটার খুলে তাতে নতুন বই নামিয়ে নিজে নায়ক সাজবে, নয় তো কোন চলতি থিয়েটারকে অর্থসাহায্য দিয়ে তার আধামালিক হয়ে বসবে। এটুকু সে বুঝে নিয়েছিল যে, টাকার জোর ছাড়া তার কোনও নাটকে নায়ক সাজবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সেই সময়টা নাকি গণেশও কোন্ এক সূত্রে থিয়েটার মহলে বা তার ধারেকাছে ঘোরাফেরা করত। সেইখানেই পরিচয় হয় কিরণের সঙ্গে। সমবয়সী সুশ্রী চেহারার ছেলে দেখে কিরণই যেচে আলাপ করে। গণেশের মধ্যে কী একটা চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি আছে, যা সহস্র লোকের মধ্যেও চোখকে টানে—একথা পরেও অনেকবার বলেছে কিরণ। গণেশেরও, সুশ্রী-সুকুমার ছেলেমানুষের মতো সরল চেহারার এই ছেলেটিকে দেখে, ওর সঙ্গে মিশে—ওর ভদ্র কথাবার্তায় ও আন্তরিক ব্যবহারে—কেমন একটা মায়া পড়ে যায় কিরণের ওপর। সে-ই কিরণকে বোঝায় যে এ ব্যবসায় আজ পর্যন্ত কেউ বড়লোক হতে পারে নি, বরং অনেক বড়লোকই পথে বসেছে। টাকার লোভে আজ যারা ওর তোষামোদ করছে, টাকা ফুরোলেই ওকে ছেঁড়া জুতোর মতো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। আর, টাকা ছড়িয়ে এক-আধটা বইতে নায়ক সাজার মধ্যে কোন কৃতিত্বও নেই। গুণের সমাদর না হ'লে, নিজের দক্ষতার জোরে প্রতিষ্ঠিত বা যশস্বী হ'তে না পারলে কিসের সার্থকতা? যদি বা সত্যিই ওর কোন শক্তি কি অভিনয়-ক্ষমতা থাকেও, সেটার জন্যে কোন বাহবাও পায়, সেটুকুও উপভোগ করতে পারবে না। মনে মনে এই গ্লানিটাই বরং বেশী ক'রে থেকে যাবে যে, শক্তি নয়, অর্থ দিয়েই এই সম্মানটা কিনেছে সে।

তাছাড়া আরও বুঝিয়েছিল গণেশ, যতদূর সম্ভব মোলায়েম ক'রেই বুঝিয়েছিল, ঈশ্বরই তাকে বঞ্চিত ক'রে পাঠিয়েছেন, চেহারায় মেরে রেখেছেন। জীবনে কোন-দিনই কোন দর্শক তাকে 'হিরো' বলে মানতে পারবে না। যেটা কিরণ পারবে সেটা কোন 'কমিক পার্ট' বা হাস্যরসের ভূমিকা, আর সে ধরনের অভিনয় সে সত্যিই ভাল করে নাকি। সে সব অভিনয়ে এমনিই প্রতিষ্ঠা পাবে সে, নিজের শক্তিতে। তার জন্যে টাকা খরচ করতে হবে কেন? গণেশই পারবে তাকে সে ধরনের পার্ট যোগাড় ক'রে দিতে।

এমনি হয়ত এসব কথা, সৎ-বুদ্ধির কথা ভাল লাগত না, অন্য কেউ বললে রেগেই যেত তার ওপর, মোহ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি, কিন্তু গণেশের কথা শুনল। কারণ তার আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েই হোক, আর ব্যক্তিত্ব কি রূপে অভিভূত হয়েই হোক—তার সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল কিরণের মনে। এ ক্ষমতা গণেশের আশৈশব—

কোনদিনই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না, তার কোন অনুরোধ বা আব্দার প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সুরবালা তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাল ক'রেই জানে।

কিরণও ক্রমশ একটু একটু ক'রে পোষ মানল। আর সেই সুযোগে—পরে কোন ধাড়িবাজ জোচ্চোরের ধাপ্পায় মতিগতি আবার বদলে যাবার সময় না দিয়েই গণেশ ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেশ পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে এল, ওর বাবা-মায়ের কাছে। তাঁরা এত শিগ্‌গির ছেলে বা ঐ টাকা—কোনটাই ফিরে পাবার আশা করেন নি। ছেলে ফিরে আসবে তা তাঁরা জানতেন, কলকাতাতেই যে ঘোরাফেরা করছে সে, এ খবরটা পেয়েছেন আগেই, কিন্তু সে জন্যেই টাকাটা ফিরবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। টাকাটা ফুরোলে ছেলে ফিরবে রিক্তহস্তে, ভগ্নমনে—ওদিকের নেশাটাও ছুটে যাবে ততদিনে, ঘরে ও বিষয়-কর্মে মন বসবে ; তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে সেরেস্তার কাজে জুতে দেবেন সেই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সেই ছেলে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসতে—আর সেই সঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হারানিধি টাকাটাও, স্বভাবতই খুশী হয়ে উঠলেন, এবং সমস্ত বিবরণ শুনে গণেশের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন। কিরণের মা তো একে-বারেই বড় ছেলে সম্পর্ক পাতিয়ে—'তুই আমার যথার্থ বড় ছেলের কাজ করলি বাবা' বলে কোলে বসিয়ে চুমু খেয়ে আদরে আদরে অস্থির ক'রে তুললেন। কিরণের বাবাও কিছুতে তাড়াতাড়ি ছাড়তে রাজী হলেন না, একরকম জোর করেই ধ'রে রাখলেন। কৃতজ্ঞতা ছাড়াও গণেশের চেহারায় আর কথাবার্তায় ইতিমধ্যেই তাঁরা যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সময়েই কথাপ্রসঙ্গে কিরণ একদিন বলেছিল—গণেশের শখ বা নেশার কথাটা।

গণেশ এর মধ্যে কয়েকদিনই তার ম্যাজিকের খেলা কিছু কিছু এ'দের দেখিয়েছিল। প্রায় অবিশ্বাস্য সেসব এ'দের কাছে। পরে যখন শুনলেন যে, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও এই জাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল শেখার জন্যে সে পথে পথে ঘোরে, বেদেদের দলে মিশে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—তখন রামকমলবাবুই ওকে বলেন—এসব বিদ্যা ভাল ক'রে শিখতে হ'লে কামরূপে যাওয়া দরকার। সেখানে নাকি ঘরে ঘরে—মেয়েরা পর্যন্ত এসব বিদ্যা জানে। শুধু বলাই নয়, ওর উৎসাহ দেখে খরচপত্র সব দিয়ে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে।

কামরূপের কথা তিনি কার কাছ থেকে শুনেছিলেন কে জানে—বোধ হয় 'কামরূপ কামিখ্যের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া ক'রে রাখে' এমনি একটা জনশ্রুতি থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে তারা ইন্দ্রজাল জানে। কিন্তু সেখানে খুব কিছু সুবিধে হয় নি গণেশের। সুবিধে হয়েছিল—তবে সে অন্যত্র। রামকমলবাবুর দৌলতে—খরচ দেবার সময় কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নি তিনি—আর গণেশেরও আতিথেয়তা আদায়ের শক্তি প্রায় অলৌকিক, গোটা আসামটাই সে দেখে নিয়েছে প্রায়, আর সেই সুযোগে পাহাড়ীদের কাছ থেকে অনেক-কিছু শিখেও নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আসাম ঘুরে মাত্র এই কদিন আগে ফিরেছে কিরণের টানে বা তার বাবা-মার টানে, তাদের দেশেই।

ইতিমধ্যে কিরণও তাদের সেরেস্তার জাব্‌দা চিঠা, দাখিলা ও রোকড়ের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছিল, কলকাতায় আসবার জন্যে ছট্‌ফট করছিল। গণেশ যে তাকে থিয়েটারে ঢোকবার সুবিধে করে দেবে—সে প্রতিশ্রুতি কিরণ ভোলে নি। কিরণের সে ইচ্ছাতে পরোক্ষে ইন্ধন যোগালেন রামকমলবাবুরাই। গণেশের মতো ছেলে হারিয়ে, এতকাল না দেখে না জানি ওর বাবা-মা কত কষ্ট পাচ্ছেন অনুমান ক'রে তাঁরাই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ কিরণকে সঙ্গে দিয়ে গণেশকে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটাও একটু ঘুরে আসুক, গণেশ সঙ্গে থাকলে বিগড়ে যাবার ভয় নেই, হয়ত এ কথাও ওঁদের মনের মধ্যে ছিল।

ভবতারণের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যেতে কিরণ তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। চোরবাগানের

দিকে কোথায় তাদের নাকি একটা বাড়ি ভাড়া করাই আছে দীর্ঘকাল থেকে। সেখানে একটা ভাগের চাকরও আছে। ভাগের চাকর মানে সে অন্য বাড়িতে ঠিকে কাজ করে, কাছেই বাজে মেয়েছেলেদের পাড়া, সেখানে ঘর ঘর বাজার ক'রে দিয়ে আসাই তার প্রধান জীবিকা —থাকে এদের এই বাড়িতে, কতকটা চৌকিদার হিসেবে। ছোট বাড়ি, ওপরে দুখানি নিচে একখানি ঘর। চিকিৎসা কি মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে কলকাতায় এলে রামকমলবাবুরা এখানে ওঠেন, ওঁদের আত্মীয়মহলেও মধ্যে মধ্যে, প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করেন কেউ কেউ।

তখন এত হোটেল হয় নি, হোটেলের ভাত খাওয়ার এত চল্‌ ছিল না। বড়, মাঝারি এমন কি খুব ছোট জমিদারদেরও একটা বাসা ভাড়া করা থাকত কলকাতায়। অনেক ছোট জমিদার পুরো বাড়ি ভাড়া করতে পারতেন না, নতুন বাজারের ওপর একখানা ক'রে ঘর ভাড়া ক'রে রাখতেন। সেখানে খান-দুই মাদুর, দু' সেট হুঁকো-কলকে তামাকের সরঞ্জাম ও দড়ির আলনায় বারোয়ারী গামছা থাকত একখানা। বাকী যার যা দরকার সঙ্গে আনতে হ'ত।

এ'দের বাসাতে ঋবুরা কেউ এলে ঐ চাকরটিই এ'দের কাজকর্ম ক'রে দিত, ঠিকে বামুন ডেকে আনত রান্নার জন্যে। রামকমলবাবু নিজে এলে অবশ্য রান্নার লোক সঙ্গেই আনতেন—বাকী সকলের ঠিকে রাঁধুনী ভরসা। কাউকে না পাওয়া গেলে—'লগনসা'র বাজারে ঠিকে রসুয়ে বামুন দুর্লভ হয়ে পড়ত মধ্যে মধ্যে—ঐ ভৃত্যটিই যোগাড়যন্ত্র ক'রে দিত, কিরণ বা অপর যে আসত নিজেরা ভাতটা নামিয়ে নিত। এটুকু তখন জানত প্রায় সকলেই। তখন ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কোন অনাত্মীয়দের হাতে ভাত খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারত না কেউ।...

বাসায় উঠে গেলেও এ বাড়িতে আসা-যাওয়া অব্যাহত রইল কিরণের। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে গণেশের টানেই আসত সে, কিন্তু দেখা যেত যে গণেশ না থাকলেও ফেরবার জন্যে বা গণেশের খোঁজে বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয় না। বরং রান্নাঘরের সামনেব সংকীর্ণ রকে বসে নিস্তারিণীর সঙ্গে গল্প করার দিকেই তার যেন ঝোঁক বেশী। অনেক সময় গল্পও করত না, নিস্তারিণী একাই বকে যেত, সে শুধু চুপ ক'রে বসে শুনত। ইতিমধ্যে সুরবালার গান শুনেছে সে ; গান শুনে যে মুগ্ধ হয়েছে, সে কথাও বলেছে সে সরলভাবেই। আজকাল কোথায় কবে ওর মুজরো থাকে কৌশলে জেনে নিয়ে অনিমন্ত্রিতই সেখানে যায় গান শুনতে। আলাদাই যায়—আর প্রাণপণে চেষ্টা করে সুরোর চোখের বাইরে আত্মগোপন ক'রে বসে থাকতে। তবে এক আধ দিন ধরা পড়েও যায়—তখন যা হোক একটা অছিলায় গোঁজামিল দিয়ে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। সুরবালা ওর এই লজ্জা কি সংকোচের কোন কারণ খুঁজে পায় না। একটু অবাক হয়েই বলে, 'তা গান ভালবাসো গান শুনতে যাবে, এর মধ্যে দুষ্য তো কিছু নেই, তবে এত লজ্জা পাও কেন? আর লুকোবারই বা চেষ্টা করা কেন? তোমরা বড়ঘরের ছেলে, বিনা-নেমতন্নে তোমার যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু সে চেনা-বাড়িতে। অচেনা জায়গায় আর দোষ কি? সেখানে তো আর সম্মানের প্রশ্ন নেই।'

কিরণ এ প্রশ্নেরও ভালরকম কোন জবাব দিতে পারে না, ঈষৎ লজ্জিত স্মিত মুখে চুপ ক'রে থাকে।...

ঐ গান শোনা, আর এদের বাড়িতে বসে বা আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো—এবং বেশির ভাগ দিনই রাত্রের খাওয়াটা এখানে সারা ভিন্ন কিরণের কোন কাজই হয় না। প্রথম প্রথম নিস্তারিণী খাওয়াতে চায় নি—একটু 'কিন্তু' বোধ করেছে। লুচি, ভাজা, পায়েস এ সবের কথা আলাদা, ভাত রুটি কি ডাল—এ খাওয়াগুলোতে ঝুঁকি আছে। ব্রাহ্মণ হ'লেও তেমন উঁচু ঘরের ব্রাহ্মণ নয় তারা, তাদের ঘরে

খেলে যদি ওর বাবা-মা কিছু মনে করেন? কিন্তু সে আপত্তি কিরণই উড়িয়ে দিয়েছে, 'আপনি থামুন দিকি মাসিমা, ঐ যে ঠাকুরটাকে জুটিয়ে এনেছে দুর্যোধন —সে-ই একেবারে সৎ ব্রাহ্মণ আপনাকে কে বললে? খোঁজ নিয়ে দেখুন গে যান—কোন ছোট জাতের কেউ একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে রাঁধুনী বামুন হয়ে এসে বসেছে হয় তো। এমন তো আকছারই ধরা পড়ছে। আর ও ব্যাটা রাঁধে যা তাতে তো সেইরকমই মনে হয়, সব তরকারীই একরকম, ভাত তো পিণ্ডি ক'রে রাখে একদম। যতক্ষণ বাড়িতে মার হেঁসেলে খাই, ততক্ষণই যা-কিছু খাওয়ার বিচার, বাইরে এলে কি আর অত চলে? এমন তোফা রান্না ছেড়ে সেই পিণ্ডি গিলতে যাব আমি কোন্ জাত বাঁচাতে?'

গণেশের দেখা প্রায়ই পায় না সে। কেউই পায় না অবশ্য। আবার সে নিজ মূর্তি ধরেছে। কোথায় যে ঘোরে টো টো ক'রে তা কে জানে। তার উন্নতিও হয়েছে খুব। গাঁজা-ভাঙ আগেই খেতে শিখেছিল সে, এবার—সুরাবালা পরিষ্কারই দেখল, অনুমান নয়—মদও ধরেছে। মধ্যে মধ্যে বেশী হয়ে গেলে, মুঠোভর্তি ছোট এলাচেও ঢাকা পড়ে না। বকাবকি রাগারাগি করে সে, যতটা সম্ভব—কিন্তু তার বেশী পারে না, তাড়িয়ে দিতে পারে না। একটা মাত্র ভাই। সদ্য বাপ-মরা। না থাকলে বাবা-মায়ের কি কষ্ট তা তো চোখেই দেখেছে। তার নিজের কষ্টও কম নয়। আর গণেশও এমন, ওকে শাসন করাও যায় না। মিথ্যে কথাও বড় একটা বলে না সে, ধরা পড়ে গেলে অযথা ঢাকবার চেষ্টা করে না। হি-হি ক'রে হেসে বলে, 'দিদি, তুই এখনও তেমনি পাড়াগেঁয়ে ভূত আছিস।...আরে, মদ তো মানুষেই খায়। গোরু কি কুকুরে মদ খায় কখনও দেখেছিস?—একটু আধটু মধ্যে মধ্যে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।'

সে দিদিকে চেপে ধরেছে হাজার তিন-চার টাকার জন্যে। এই টাকাটা পেলে সে সাজ-পাট কিনে সাহেবদের মতো ম্যাজিক দেখাবার দল করবে আলাদা। জাদুকর গণেশ চক্রবর্তী কি জাদু-সম্রাট গণেশ চক্রবর্তী বলে তার নাম হবে। চারিদিকে প্ল্যাকার্ড পড়বে, দেশ-বিদেশে নাম ছড়াবে, রাজা-মহারাজাদের বাড়ি থেকে 'কল্' আসবে, তখন তাকে পায় কে! দিদিরা যাকে মুজরো বা বায়না বলে—তা-ই নাকি 'কল্'। বহুদিনের স্বপ্ন ওর, অনেকদিনের সাধ। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে সে, এখান থেকে খেলা দেখাতে দেখাতে জাভা, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর যাবে, শ্যামদেশে যাবে, রেঙ্গুন মান্দালে মৌলমেন। আরও কত জায়গার নাম করে সে—বহুদূরে সাগরের পারে সে সব দেশ, কস্মিনকালে নামও শোনে নি সুরবালা, ধারণাও নেই, সে কোথায় কতদূরে হ'তে পারে। ওকে বোঝাবার উৎসাহে কোথা থেকে একটা ভূচিত্রাবলী যোগাড় ক'রে এনে খুলে বোঝাতে চেষ্টা করে—কোন্ দেশটা কোথায়, এখান থেকে কতটা দূর হ'তে পারে।

তাও ভাল বুঝতে পারে না সুরবালা। তবু টাকাটা হয়ত দিয়েই দিত সুরো, নিস্তারিণী আড়ালে বারণ করে, 'খবরদার দিস নি, আমাকে কিরণ বলেছে, ও নাকি অনেক দূর দেশ সব, বড় বড় সাহেবদের জাহাজে চেপে সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতে হয়, এক মাস দেড় মাসের পথ। সেখানে নাকি সব মানুষখেকো লোক থাকে, তারা কাঁচা মানুষের মাংস খায়—আর তাদের রাক্কুসীরা সব দিনের বেলায় পরী সেজে ঘুরে বেড়ায়, সোন্দর পুরুষ বিশেষ বাঙালী দেখলে ভুলিয়ে নে যায়। ওখানে গেলে বাছা আমার ফিরবে না। ওর ছন্নমতি হয়েছে তাই ঐসব বায়না ধরেছে!'

এতটা বিশ্বাস করে না সুরো, তবু ঐ ভূচিত্রাবলী দেখে সেও একটু ঘাবড়ে যায়। ঐটেই কতকটা কাল হ'ল গণেশের, দেশগুলো যে বহু—বহু দূরে, সে সম্বন্ধে একটা আবছা অস্পষ্ট ধারণা হয়। সুরোও ইতস্তত করে। সত্যিই যদি জন্মের মতো দেশভূঁই ছেড়ে চলে যায় ভাই?...মাগো। আর কখনও দেখতে পর্যন্ত পাবে না তাকে? ঐ দেশে ঐসব মেয়েছেলে বিয়ে-থা ক'রে ঘর বেঁধে বসবে!...ভাইয়ের পীড়াপীড়ির মুখে বলেও

ফেলে দ্বিধার কারণটা। গণেশ হাসে হা-হা ক'রে, বলে, 'দূর পাগল! ঘর বেঁধে বসব তো আসল ঘর ছেড়ে যাচ্ছি কেন? ওসব আমার পোষায় না। দেশ-বিদেশ ঘুরব, দেশ-বিদেশের বাহবা নেব, লোক বলবে এ লোকটা নেটিভ কালা-আদমী হ'লেও সায়েব ম্যাজিকওলার চেয়ে কম যায় না কোন দিকে—এই নাম-যশেই আমার লোভ। ওদিকে যাবার কথা কেন বলি জানিস? শুনেছি, অনেকের কাছেই শুনেছি—ঐসব দেশের লোক ম্যাজিক আর সার্কাস দেখার জন্যে পাগল। ওরা অন্য কোন ফূর্তি জানে না, আর কিছুর তোয়াক্কা করে না। নিতান্ত না খেলে নয়, তাই খাওয়ার জন্যে যে কটা পয়সা খরচ করে, পোশাকের নাকি বালাই-ই নেই—কোনমতে লজ্জা নিবারণ করে শুধু। বাকী যা পয়সা—প্রতিদিনের রোজগার প্রতিদিন ফূর্তি ক'রে উড়িয়ে দেয়। সে ফূর্তির মধ্যে আবার এই দুটোই ওদের বেশী পছন্দ। পরের দিন কি খাবে সে কথা কখনও ভাবে না।...সেইজন্যেই এই সব দেশে যেতে চাই, একবার গিয়ে পড়তে পারলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।...হ্যাঁ, ওদের মেয়েরা খুব সুন্দর হয় শুনেছি, কিন্তু সে আমি তোকে কথা দিচ্ছি, যা করি, ওদের নিয়ে ঘর বাঁধব না কোনদিন। যদি কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধি দেশের মেয়ে নিয়েই বাঁধব, দেশেও ফিরব মাঝে মাঝে। দে না ভাই, তোর তো এখন অভাব নেই কিছু, আমার কিন্তু অনেক দিনের সাধ। সাজপাট যদি কিছু কিনতে পারি—দুনিয়ায় ভেল্‌কিওলাদের ভেল্‌কি লাগিয়ে দেব।'

অভাব নেই সেটা সত্যি কথা। তা সুরোও মানে। এতদিন পরে যেন সতীমা সত্যিই মুখ তুলে চেয়েছেন। মুজরো এক রকম বাঁধা—মাসে অন্তত কুড়ি দিন গাওনা থাকে। বেশী বা কম—কিন্তু রোজগার কোনটাতেই একেবারে কম হয় না। মুজরোর চুক্তিতে যেদিন অঙ্ক কম থাকে—সেদিনই হয়ত পেলা বেশী পড়ে। মতিও এখন বায়না নেওয়া শুরু করেছে—কিন্তু তাতে সুরোর ডাক কিছুমাত্র কমে নি। এখন তার আলাদা নাম হয়ে গেছে। রূপসী মেয়ে, তৈরী গলা, অল্প বয়স—তার দাম আলাদা। মতির যতই পুরনো নাম-ডাক হোক, সুরোকেই যেন লোকে চায় বেশী। অনেকে পর পর দুদিন দুজনের গান দেয়—মিলিয়ে দেখবে বলে।

অভাবও যেমন নেই, লোভও নেই তেমন, অথচ এই লোভটাই নাকি দুর্নিবার। টাকাতেই টাকার লোভ বেড়ে যায়। যতই পাও—পাওয়ার তৃষ্ণা কমে না। আর তাতেই যা কিছু অশান্তি ভোগ করতে হয়। তার সাক্ষী এই তো নিস্তারিণীই। এত আসছে বলেই যেন নিস্তারিণীর আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। সে মেয়েকে বুদ্ধি দিতে আসে, 'এখন মতি ভাল হয়ে গেছে, নিজে গাইছে—তবে আবার তুই তাকে নিজের টাকার ভাগ দিতে যাবি কেন? এখন তো আর তার এন্‌তাজারিতেও নেই, এখন তো দালালরা তোর কাছেই সোজা আসে, বন্দোবস্ত করে। মতি এখন তোর কি কাজে আসছে শুনি?'

এতখানি জিভ কাটে সুরো, বলে, 'ছি! ওসব কথা আমাকে শুনিও না মা। ও মহা-পাপ! পাপের পয়সাই যদি খাবো তো এতদিন এত কাণ্ড করলুম কেন? ঘরে বাবু বসালেই তো বাড়ি-ঘর ক'রে গয়না-টাকার আণ্ডিলে বসে থাকতে পারতুম। কথা দিয়েছি, দিব্যি গেলেছি, যতদিন সে বেঁচে থাকবে কিম্বা যতদিন আমি বেঁচে থাকব—রোজগারের ভাগ তাকে দোব। তবু তো পেলার এক পয়সা সে ছোঁয় না, তাও তো আমি তাকে দিতে গিছলুম।'

নিস্তারিণী গজগজ করে, 'পাঁড় বোকা' বলে গাল দেয় মেয়েকে।

মেয়ে যে ওদের পুরনো পাড়ায় একটা ছোট বাড়ি বায়না করেছে কিনবে বলে—তাতেও যেন বিশেষ সান্ত্বনা পায় না। বলে, 'ওর বাপ মিন্‌সে চিরকাল আমার হাড় ভাজা-ভাজা ক'রে জ্বালিয়ে খেয়েছে—ও আর খাবে না! নইলে আমার বরাতের নেখন খোলতাই

হবে কেন? আমার পাওনাটা যাবে কোথায় বলো?...যেমন দিয়ে যা হোক, আমাকে জ্বলতেই হবে।...ভাবছে চিরকাল এমনি যাবে! মতিকে দেখেও চৈতন্য হল না, আশ্চর্য! গতর খাটিয়ে রোজগার কি একটা রোজগার? না, তার কোন ভাবিষ্য আছে? বলি গলা ফাটিয়ে পরবেলা চেঁচিয়ে তো ঐ কটা টাকা ঘরে আনিস। আজ যদি গলাটা ভেঙে থাকে এক মাস তো এক পয়সা ঘরে আসবে না। যদ্দিন পাচ্ছিস—দিন কিনে নে, তা নয়।... আমারই ভুল, বলতে যাওয়াই অন্যায়। চোরা না শোনে—ধম্মের কাহিনী, এ তো জানা কথাই।'

সুরবালা আর কথা বাড়ায় না। 'ধম্মের কাহিনী' শব্দ দুটো শুনে হাসি পেলেও সে হাসি চেপেই যায়। সে দেখেছে যে নিস্তারিণীর সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে যাওয়া বা কোন যুক্তি দেখাতে যাওয়া নিরর্থক। মিছিমিছি নিজেরই কষ্ট। এক-আধ দিন তবু সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে এর আগে, শশীবৌদিদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাই এখন আর কিছু বলে না।...

শশীবৌদিদের একটা কথা সে কোন দিন ভুলবে না। ওঁদের আগেকার ধোপানী চারুবাবুর কাছে তার গোপন কিছু সঞ্চয় জমা রাখত। কত রাখত মানে কত জমছে তা সে কখনও হিসেব রাখে নি, যখন যা পেত—দু' টাকা এক টাকা দু আনা চার আনা, এনে ফেলে দিয়ে চলে যেত, কত কি জমেছে কখনও জিজ্ঞাসাও করে নি। চারুবাবুই গুনে গেঁথে একটা খাতাতে জমা করতেন, ওর জন্যে একটা আলাদা ছোট্ট খাতা করেছিলেন খেরো বাঁধানো—একটা টিনের কৌটো করেছিলেন, তাতেই ঐ টাকাটা রেখে দিতেন। হঠাৎ কি হ'ল, সে ধোপাবৌ আর এল না। কাপড়গুলো যা নিয়ে গিয়েছিল, কে একটি ছেলে এসে দিয়ে গেল, বলে গেল বৌ দিন দুই পরে এসে ওঁদের ময়লা কাপড় নিয়ে যাবে। আর সে এল না। সে-ও না, ঐ ছেলেটাও নয়—তার বাড়ি থেকে কেউই এল না। তার খবরও নিতে পারলেন না চারুবাবুরা, কারণ আগের যে ঠিকানা জানতেন সে বস্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বলে তারা উঠে গেছে—নেহাৎ গড়িমসি ক'রেই এ ঠিকানা লিখে রাখা হয় নি।...অনেক দিন দেখে দেখে নতুন রজক ঠিক করেছেন চারুবাবু, করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আগেকার সেই বৌয়ের গচ্ছিত টাকা আর শেষ কদিনের থান-ত্রিশ-চল্লিশ কাপড়ের কগণ্ডা পয়সা থেকেই গেছে ওঁদের কাছে।

সুরোর মনে আছে, একবার ওঁদের খুব অনটন যাচ্ছিল, কী কারণে মাইনে পেতে দেরি হয়েছিল চারুবাবুর কদিন, ঘরে কিছুই ছিল না। শেষে এমন হ'ল একদিন ঘরে হাঁড়িই চড়ে না—মুদীর দোকানে কত ধার করা উচিত সে সম্বন্ধে চারুবাবুর আইন খুব কড়া ছিল—সেদিন সুরোই মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'সেই ধোপাবৌয়ের টাকাটা তো আছে, তা থেকে একটা টাকা নিয়ে এখন চালান না, পরে হাতে এলে আবার পুরিয়ে রেখে দেবেন!'

চারুবাবু যেন শিউরে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'তাই কখনও পারি! বাপ রে, ও যে পরের গচ্ছিত করা টাকা। বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গেছে। ও টাকা খাওয়া আর গোমাংস খাওয়া একই কথা!'

সুরো তবু তর্ক করেছিল, 'আপনি তো তাকে ফাঁকি দিচ্ছেন না, চুরিও করছেন না। হাতে এলেই আবার ভোক্তন ক'রে রাখবেন—তাতে দোষটা কি?...তাছাড়া সে কোথায়? বেঁচে আছে কিনা তাই দেখুন। সে কি আর কোনকালে ঐ টাকা চাইতে আসবে আবার?'

'যদি বেঁচে থাকে? যদি কালই সে নিতে আসে? তার মধ্যে যদি পুরিয়ে রাখতে না পারি? একটা টাকা ভেঙেছি শুনলে তার মনে হবে হয়ত আরও ভেঙেছি—মুখে বলছি এক টাকা!'

'বলবারই বা দরকার কি! সে তো জানেও না কী আছে কত আছে। পরে বরং অন্য

হুতোর ঐ টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন!'

'সেই তো আরও বিপদ। সে জানে না বলেই তো আমার এতখানি দায়িত্ব। এ টাকা স্বয়ং ভগবান পাহারা দিচ্ছেন তার হয়ে, তিনিই হিসেব রাখছেন। সেইজন্যে তো আরও সাবধানে থাকা দরকার। মিথ্যে বললে কি গোপন করলে তার আর কতটুকু ক্ষতি, আমারই মনুষ্যত্ব চলে গেল তো!...তাছাড়া কি জানিস, এ অভ্যেসটাই খারাপ। একবার ভাঙ্গলেই জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে, তখন সামান্য দরকারেই আগে ঐ টাকাটার কথা মনে পড়বে। নেবও তখন। আর বার বার নিতে নিতে একবার হয়ত লিখতেই ভুলে যাব, হিসেব থাকবে না—হয়ত আর সেটা ফিরিয়ে দেওয়াই হবে না।...না সুরো, তার চেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।'

'আর যদি সে কোনদিনই না আসে? এত তো বুক দিয়ে আগলে রাখছেন—!'

'আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার দায়িত্ব, তারপর আমার ছেলে বুঝবে। কিম্বা আর যে মালিক হবে তখন সে বুঝবে। আমি বলে যাবো—এ টাকা কোন অনাথ আশ্রমে কি কোন দাতব্য আতুরালয়ে দিয়ে দিতে। তারপর তার ধর্ম!'

'তা আপনার একটা মেহনতানাও তো আছে। একটা টাকা একদিন ধার করলে একেবারে যত অধর্ম্ম হয়ে গেল!' সুরো জেদ করে।

এর উত্তরে হেসেছিলেন চারুবাবু, 'ধার করার কথা বলছিস? তবে শোন্ বলি একটা গল্প। দিল্লীতে এক সুলতান ছিল জানিস, তিনি জানতেন রাজকোষের টাকা জনসাধারণের টাকা, রাজাবাদশা তার জিম্মাদার মাত্র। তিনি সুলতান হিসেবে খাটতেন, অন্য রোজগারের সময় ছিল না বলে তিনি দৈনিক এক টাকা হিসেবে মাইনে বা তন্‌খা নিতেন। তাঁর স্ত্রী নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করতেন। একবার রান্না করার সময় বেগমসাহেবার সত্যিই হাত পুড়ে যায়—তিনি সুলতানকে গিয়ে ধরেন, "অন্তত দু-তিন দিনের জন্যে একটা ঝি রাখার হুকুম দাও।" "টাকা?" শুধোলেন সুলতান, "বেশী টাকা আমি দিতে পারব না।" বেগম বললেন, "বেশ, তুমি সাতদিনের টাকা আমাকে আগাম দাও, আমি ঐ থেকেই বাঁচিয়ে ওর খরচাটা চালিয়ে নেব।" সুলতান নির্বিকার মুখে বললেন, "তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই, শুধু যদি তুমি একটু কষ্ট ক'রে আল্লার কাছ থেকে একটা ফর্মান এনে দাও যে, এই কটা দিন আমি নিশ্চিত বাঁচব, তাহ'লেই টাকাটা আমি রাজকোষ থেকে আগাম নিতে পারি, নইলে কোন্ ভরসায় নেব বলো?" তা আমারও সেই কথা, টাকাটা ভেঙে কালই যদি আমি মরে যাই—বৌ যদি আর শোধ করতে না পারে? কি ওর মনে না থাকে?'

সেদিন সুরোর অবশ্য মনে হয়েছিল, বড্ড বাড়াবাড়ি। তবু কথাটা ভোলে নি।

আজও মনে আছে সে কথা। এখন যেন এই বাড়াবাড়ির কারণটাও কতক বুঝতে পারে। সাংঘাতিক নেশা টাকার। নেশা আর লোভ। টাকার লোভই মানুষকে সবচেয়ে নিচে নামিয়ে আনে।

আরও বলেন চারুবাবু, 'ইমান বিশ্বাস—এ বড় যত্নের জিনিস, সর্বদা কড়া পাহারায় রাখতে হয়। পরে না জানতে পারলেও নিজের কাছে তো আর চাপা থাকবে না। মনের অগোচর পাপ নেই। এগুলো হারালে নিজের কাছে নিজেই তো ছোট হয়ে যাবো। আর, একবার এ পথ থেকে সরে এলে, নামতে শুরু করলে—নামার কোন শেষ নেই দেখবি। কোথায় গিয়ে যে ঠেকবি তা তুই নিজেও ভাবতে পারবি না।'

সবটা না হ'লেও কতকটা বোঝে একথা।

অনেক দুর্দিন সে পেরিয়ে এসেছে, অনেক দুর্দশা। সে সব দিন যিনি চালিয়ে দিয়েছেন, যিনি হাল ধরে পার ক'রে এনেছেন—সেই একান্ত নিঃস্বতার ভয়াবহ কাল তিনিই চালিয়ে দেবেন, যদি ভবিষ্যতে আবারও তেমন কোন অভাব কি সংকটের দিন দেখা

দেয়। এই মনের জোরটা ইদানীং তার হয়েছে খুব। না খেয়ে মরবার হলে এবারেই মরত। আর অসুখ-বিসুখ? হয় তো সইতে হবে। অদৃষ্টে যা আছে তা সইতে হবেই। তার ভয়ে আগে থাকতে ধর্ম হারাবে না সে কিছুতেই। কথা যা দিয়েছে, দিব্যি গেলেছে যা—তা থেকে অন্তত জ্ঞানত একচুল নড়বে না। যার যেটুকু প্রাপ্য ভগবানই তা হিসেব ক'রে দিয়ে পাঠান, সেইটুকুই সে পায়—কমও না বেশীও না। আজ মতির সঙ্গে বেইমানী করলে কে জানে কাল থেকেই বায়না কমতে শুরু করবে কিনা—কিম্বা কোন সাংঘাতিক অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে কিনা।

দিন ভগবানই চালান, সেই বিশ্বাসটা সম্প্রতি বদ্ধমূল হয়েছে। এই তো সেদিনই শুনেছিল, এক বিখ্যাত বাইজী, কোথাকার কে এক গরিব, বয়সে-তার-থেকে-অনেক-ছোট ছোকরাকে বিয়ে করেছিল, শুধু তার পীড়াপীড়িতে আর অনুরোধ-উপরোধে পড়ে। খুবই গরিব—তবে বড় ঘরের ছেলে, এককালে অবস্থা ভাল ছিল। এই বিয়েতে সকলের আপত্তি ছিল, সবাই ছি ছি করেছিল। ভয় দেখিয়েছিল যে তোমার টাকার লোভেই এই কাজ করতে এসেছে, বিয়ের পর গলা টিপে মেরে ফেলবে দেখো। কারও কথাই শোনে নি বাইজী। ছেলেটা বলেছিল, তুমি চাও তো তোমার সব টাকা বিলিয়ে দিয়ে এসো, আমি তোমাকে মোট বয়ে খাওয়াবো। আমি তোমাকে সাদী করছি তোমার গলার জন্যে। বিয়ের পর বাইজী কলকাতায় এসে আর্মানীটোলায় একটা বাড়ি কিনে গেরস্তর মতো বসবাস শুরু করল—বরকে কিছু টাকা দিয়ে শুকনো মেওয়া ফলের আড়তদারী কারবার ধরিয়ে দিল। কিন্তু তার পরই সেই বাইজীর গলায় হল যা, কর্কট রোগ না কি বলে—দুরারোগ্য ব্যাধি, সেই ছোকরা বর কী সেবাই না করল তার, দু-হাতে রক্ত-পুঁজ-ময়লা ঘেঁটেছে, দিন-রাত শিয়রে বসে রাত জেগেছে, বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। টাকাটা থাকলে তারই থাকবে তা একবারও ভাবে নি। বৌ মরবার পর তার জন্মস্থানে বিপুল টাকা খরচ ক'রে নাকি হাসপাতাল ক'রে দিয়েছে। পেটের ছেলে কি কোন নিকট আত্মীয় থাকলেও এতটা করত না। ভগবান কাকে দিয়ে কি করিয়ে নেন কেউ বলতে পারে?

না, টাকার মায়া অত নেই সত্যি কথা। গণেশকে যে টাকাটা দিতে ইতস্তত করছিল তা অভাব কি টাকার মায়ার জন্যে নয়—ইতস্তত করছিল গণেশের জন্যেই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাও আর করল না। অনেক ভেবে দেখল—ও যা ধরেছে তা করবেই, যেমন ক'রেই হোক। মাঝখান থেকে ঠিকমতো সাজসরঞ্জামের অভাবে হয়ত ভালো ক'রে কিছুই করতে পারবে না, জীবনটা সত্যি-সত্যিই বরবাদ হয়ে যাবে। কিম্বা এই চেষ্টায় আরও হয়ত অনর্থক নিচে নামবে, পাঁক ঘাঁটবে—আরও বেশী উচ্ছন্নয় যাবে। সে গণেশকে ডেকে ভাল ক'রে হিসেব করিয়ে টেনেটুনে কতটুকু না হ'লে নয় জেনে টাকাটা সব বার ক'রেই দিল।

গণেশের সে কী হাসি, সে কী আনন্দ! বলে, 'দিদি, যা ভুলি ভুলি, তোর এ ঋণ কখনও ভুলব না।...দেখিস তুই—তুইও যেমন একদিকে নাম করেছিস, আর একদিকে আমিও নাম করব। তোর তো এই কলকাতা শহর ভরসা, আমার নাম হবে জগৎজোড়া। আমার নাম করতে বুক তোর দশ হাত হবে—সেই হবে আমার যথার্থ দেনা শোধ।'

তার সেই সময়কার আনন্দ-উদ্ভাসিত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সুরবালাও তৃপ্তিবোধ করে, মনে হয় টাকাটা দেওয়া সার্থক হয়েছে তার!

এ ভাইকে বেঁধে রাখা যাবে না—তা মা যাই বলুক। এর মায়া-দয়া-বন্ধন কিছুই নেই। জাত-ভবঘুরে হয়েই জন্মেছে।...

সেই যে টাকাটা নিয়ে চলে গেল, কদিন আর কোন পাত্তা রইল না। খেতে কি শুতেও এল না, রাঁধা ভাত নষ্ট হ'তে লাগল দুবেলা। এল একেবারে কুড়ি-একুশ দিন বাদে—ঝড়ের মতো। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, আরক্ত চোখ। বলল,

'আমার মরবার ফুরসৎ নেই। সব যোগাড় হয়ে গেছে—একটা ঘর ভাড়া ক'রে সেইখানে সব মাল জড়ো করেছি, সেখানেই থাকি রাত্তিরে। গঙ্গার ধারে জাহাজঘাটার কাছে ঘর, কেউ না থাকলে সব চুরি হয়ে যাবে। এক বেটা আমার পেছনে লেগেছেও খুব, মালপত্র দেখলেই অনেক খেলা শিখে যাবে—সেই বেটাই চুরির তালে ঘুরছে। সে আমি হ'তে দিচ্ছি না। এই তাই একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। শুধু কিরণের জন্যেই আসা। কিরণকে খবরটা দিস, যেখানে দেখা করবার কথা বলেছিলুম, কালই যেন সেখানে যায় একবার। সব বলা-কওয়া আছে, নতুন বইতে একটা কমিক পার্ট দেবে নিশ্চয়।'

তখনই চলে যেতে চায় সে, সেই অবস্থায়। অনেক অনুনয়-বিনয় ধরপাকড়ের পর শুধু কোনমতে স্নান ক'রে একটু জলখাবার খেয়ে গেল। ভাতও তৈরী ছিল, খেল না। ভাতে নাকি বড় নেশা লাগে, শরীর ভার বোধ হয়। খাটা যায় না। আগের দিন সুরবালা কোথায় গাইতে গিয়ে খাবার এনেছিল—সেই বাসি লুচি আর সন্দেশ খেয়ে চলে গেল।

চলে গেল একেবারে দীর্ঘকালের মতো। বাইরে যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যাবে বলে গিয়েছিল, সেও আর বোধহয় হয়ে উঠল না। মাস দুই পরে রেঙ্গুন থেকে একটা চিঠি পেল ওরা। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। আলাদা দলটল হয়ে ওঠে নি। টাকা অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চুরিও হয়েছে কিছু। এক বাঙালী সার্কাসওয়ালাকে কিছু টাকা দিয়ে বখরা বন্দোবস্তে তার দলের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছে। কপালে থাকে এইখান থেকেই টাকা জমিয়ে আলাদা দলের চেষ্টা ক'রে দেখবে একবার। যাই হোক চিন্তার কোন কারণ নেই, যখন যেখানে থাকে মধ্যে মধ্যে খবর দেবে সে।

সে খবর অবশ্য এরা আর আশা করে নি। আসেও নি তা। দিন সপ্তাহ মাস বছর গড়িয়ে গেছে ক্রমে। না চিঠি, না খবর। নিস্তারিণীও এবার আর অত কাতর হয় নি। বে'চে আছে, থাকবেও। মায়ের দান তার ছেলে, ওর কোন অনিষ্ট হবে না।

তবে এবার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দু বছর পরে হোক, তিন বছর পরে হোক—যখনই ফিরুক, সঘরের একটি মেয়ে দেখে গলায় পাথর ঝুলিয়ে দেবে সে—যেমন ক'রেই হোক। তারপর দেখে নেবে ছেলের এই উড়ু-উড়ু মন কদিন থাকে।

॥ ১৭ ॥

যতদিন অভাবের চিন্তা ছিল, শিক্ষার চিন্তা ছিল, ততদিন অন্য কোন চিন্তার অবসর পায় নি সুরবালা। মানুষের যে অন্য চিন্তা থাকতে পারে, তা জানতও না বোধহয়। বিশেষ অল্পবয়সী মেয়েদের যে-চিন্তাটা স্বাভাবিক, নবযৌবনের সঙ্গে যেটা ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত, সেটাও কখনও অনুভব করে নি। কোন শূন্যতাও বোধ করে নি কোনদিন। শুধু একমনে গ্রাসাচ্ছাদনের কথাটাই ভেবেছে, উন্নতির কথা চিন্তা করেছে। ভেবেছে, তার গানের ভাবনা, গানকে, গলাকে কাজে লাগাবার ভাবনা। কিন্তু এখন মোটামুটি শিক্ষাটা শেষ হয়েছে, সে যা শিখেছে অনেক ওস্তাদ পুরুষ গাইয়েও তা জানে না, খাওয়া-পরার দুঃখ তো ঘুচেইছে। দিন-আনা দিন-খাওয়ার অবস্থাও আর নেই, হাতে যা জমেছে

তাতে বছর-দুই বসে-খেলেও আটকাবে না। এইবার সে যেন নিঃশ্বাস ফেলে পৃথিবীর দিকে, নিজের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর পেল—আর সংগে সংগেই বুঝল, অভাবের যেমন কিছু কিছু নিজস্ব সমস্যা আছে, তেমনি পূর্ণতারও আছে কিছু কিছু উপসর্গ। যা অবসর থাকলেই এসে জোটে।

কেমন যেন সবটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে আজকাল। কী যেন নেই, কী যেন পেলে ভাল হ'ত। একা থাকলেই যেন এই ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা আরও চেপে ধরে। নিজের বাড়ি কিনে উঠে এসেছে তার পুরনো পাড়ায়, মতির বাড়ির কাছাকাছি। ছোট বাড়ি, তবু নিচে একঘর ভাড়াটে রেখেছে সে ইচ্ছে ক'রেই, একা থাকার দায় এড়াতে। মনকে বুঝিয়েছে দুটো মেয়েছেলে একা থাকা ভাল না। অবশ্য নানুই সে-কথাটা মার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে-ই জোর করে এই ভাড়াটে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে, তার চেনা। 'বলি তোমাকেই তো বেশীক্ষণ একা থাকতে হয় গো ঠাকরুণ। ওঁর আর কি! যাই হোক, এখন একটা পয়সার কথাও তো রটেছে। ধন-অপবাদ বড় সাংঘাতিক। যত রাজ্যের চোর-ডাকাত টেনে আনে। শেষে কোন্‌দিন কে কি ছুতোয় ঘরে ঢুকে গলাটা টিপে যথাসব্বস্ব নিয়ে যাবে, সেটা কি ভাল? বুড়ো বয়সে অপঘাতে জানটা দেবে?' নিস্তারিণীও বুঝেছে কথাটা, আর কোন প্রতিবাদ করে নি।

প্রতিবাদ করে নি সুরোও, তবে সে অন্য কারণে, নিজের ব্যক্তিগত কারণে। কেবল ভাড়াটে ঠিক করার সময় একবার ভেবেছিল শশীবৌদিদেরই এসে থাকতে বলবে—বেশ হয় তাহলে, সুরোর দুটো মনের কথা কইবার লোক হয়—কিন্তু তার পরই মনে হয়েছে, বড় বেশী আস্পদ্দার মতো শোনাবে। কী মনে করবেন ওঁরা, ভাববেন তাঁদেরও পয়সার জাঁক দেখাচ্ছে। ছিঃ...তাছাড়াও, ও-পাড়ায় থাকলে তবু শ্রীলেখার খবরটা পাবেন মধ্যে মধ্যে, ঐখান থেকে ঐখানে, ঝিয়েরা মধ্যে মধ্যে দু' আনা চার আনা বকশিশের লোভে এসে বলে যায়; এখানে উঠে এলে সেটাও বন্ধ হবে। দেখা তো তারা করতে দেয়ই না, চিঠিও লিখতে দেয় না—এখন ভরসা এই খবরটুকুই।

কথা বলার জন্যেই ভাড়াটে রাখা, কিন্তু বাড়ি ফেরার পর কারও সঙ্গেই কথা বলতে আর ইচ্ছা হয় না সুরোর। না মা—না ভাড়াটে বৌ। মধ্যে মধ্যে মতির বাড়ি যায়—কিন্তু সেই সব সাহচর্য সেইসব কথাবার্তা—বড্ড একঘেয়ে, বড্ড পুরনো মনে হয়। অস্বস্তি আর অস্থিরতা বেড়েই যায়। এমন কি অত যে প্রিয় তার গান তাতেও যেন আগের মতো নেশা অনুভব করে না আর। কখনও কখনও একেবারেই যন্ত্রের মতো গাইছে, গাইতে হচ্ছে বলেই গাওয়া—এমনি মনে হয়। শুধু এক-একদিন গাইতে গাইতে—রাস কি নৌকাবিলাসের পালায় যখন রাধা বা সমগ্রভাবে গোপীদের আকুতি—তার চেয়েও বেশী—আকুলতা ফুটিয়ে কৃষ্ণকে ডাকত, তখন হঠাৎ এক-এক সময় কেমন যেন মনে হ'ত এ শুধু তার গান নয়—সে-ই ধরতে চাইছে তাঁকে। তাঁকে ধরতে পারলে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারলে এই গান গাওয়া সার্থক হ'ত, এই দেহও ধন্য হ'ত। সেই সময়টা আশ্লেষ-আবেশে যেন অবশ বিহ্বল হয়ে পড়ত সে, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত শিহরিত হ'তে থাকত বার বার, সমস্ত দেহের প্রতিটি বিন্দু যেন আকুল হয়ে উঠত সে সময়। মনে হ'ত কল্পনার সেই নওলকিশোর বা এমনি একটি মানুষের তপ্ত কঠিন আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার মতো তৃপ্তি বুঝি আর কিছুতে নেই।

এটা যে তার জৈবিক, সত্যকার কামনা—সে নিজেও বুঝতে পারে না, মনে করে এটা ভক্তিই। তাকেও এবার ভক্তি স্পর্শ করেছে একটু একটু ক'রে। নিজেকে প্রতারণা ক'রে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। প্রতারিত হয় দোয়ার বাজনদাররাও, তারাও এটাকে ভাবাবেশ বিহ্বলতা মনে ক'রে 'হরিধ্বনি' করতে করতে কাছে গিয়ে কানের কাছে হরিনাম শুনিয়ে তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে। শ্রোতারাও তাই মনে করেন—এত

অল্পবয়সী সুশ্রী একটি মেয়ের এত ভক্তি দেখে অভিভূত হন তাঁরাও। বায়না দেন খুব, পেলাও দেন বেশী ক'রে।

সে-সব দিনগুলোতে বাড়ি ফিরে রাত্রে আর কিছুতে ঘুম আসত না। কী যেন এক দুঃসহ যন্ত্রণায় শয্যাকণ্টকীতে ছট্‌ফট করত। বৃথা খানিকটা এপাশ-ওপাশ করার পর উঠে বার বার জল থাবড়ে আসত মাথায়। একেবারে শেষ রাত্রে কি রাত্রি শেষ হ'লে ঘুম আসত হয়ত, বেলায় উঠে দেখত চোখের কোলে গভীর কালি, সমস্ত দেহে মনে অসম্ভব অবসাদ।

সে-অবস্থা নিস্তারিণীর চোখে পড়লে সে ডাব কি মিশ্রীর জলের ব্যবস্থা করত, বলত, শরীর গরম হয়ে আছে। আর নানুর চোখে পড়লে মুচকি হেসে থিয়েটারী ঢঙে বলত, 'আজও প্রতীক্ষিছে দাস তব সুবদনী, আজ্ঞা দেহ পুরাইব সকল বাসনা, নিভাইব মনের আগুনে।' তারপর চুপিচুপি বলত, 'মরুক গে, নিতান্তই আমাকে যদি পছন্দ না হয়, কোন ফুটফুটে ছোকরা দেখব নাকি?'

এদেরই কথাবার্তায়—নানু ছাড়াও নিচের ভাড়াটে বৌও এই ধরনের ইঙ্গিত দিত, বলত, 'এসব বয়সের গরম ভাই, দেহের একটা ধর্ম তো আছে!'—ইদানীং ব্যাপারটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের পরিষ্কার হচ্ছে সুরোর কাছে। অন্ন-বস্ত্র, মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন —এছাড়াও কিছু অভাব আছে মানুষের। মানুষের অভাব। মানুষকেও মানুষের কম প্রয়োজন নয়। মনের মতো মানুষ, জীবনের সঙ্গী একজন। খ্যাতি, অর্থ, যশ ছাড়াও কিছু কাম্য আছে—বিশেষ মেয়েদের। একটা অবলম্বন। এখন মনে হচ্ছে এই রকম একটা অস্বস্তি বোধ হয়েছিল দিন কতক—শ্রীলেখার বিয়ের সময়। বিশেষ যখন শ্রীলেখা প্রথম দিন আসে শ্বশুরবাড়ি থেকে, ওর উজ্জ্বল মুখ ও ক্লান্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে কে জানে কেন একটা অকারণ ঈর্ষা অনুভব করেছিল। রাত্রে ঘুমোতে পারে নি, দিনে স্বস্তি অনুভব করে নি। কারণটা তখন বোঝে নি, অনুমানও করতে পারে নি। আজ মনে হয়, সেদিনও তার এই অভাববোধটাই পীড়িত করেছিল তাকে।

কিন্তু এসব চিন্তাকে সে আমল দিতে চাইত না, স্বীকার করতে চাইত না। এই কামনার আভাসেই যেন নিজেকে অপবিত্র, নোংরা মনে হ'ত, সমস্ত ব্যাপারটা কলুষিত, লজ্জার কারণ বলে ভাবত। সে নিজেকে বেশী ক'রে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করত তার কাজের মধ্যে, গানের মধ্যে। এই গানের যিনি লক্ষ্য, যিনি এর দেবতা—তাঁর কাছে শরণ নিতে চাইত। মনকে বোঝাতে চাইত যে মানুষের আসঙ্গলিপ্সা নয়—আসলে এটা তাঁর ঈশ্বররতিই। তাঁর গান তাঁদের গান গাইতে গাইতে কখন সে ঐ কল্পনার গোপিনীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে—তাই তার আর শুধু শব্দ-উচ্চারণে মন ভরছে না, কিছু উপলব্ধিতেও সাধ হয়েছে।...

তবু, শুধু কল্পনায় মন ভরে না যেন কিছুতেই—সত্যকার আলিঙ্গন, সত্যকার একটি প্রেমকোমল অথচ পুরুষ পুরুষ-স্পর্শই কামনা করে তার সমস্ত সত্তা।...

এরই মধ্যে একদিন আহিরীটোলার রাজবাড়ি থেকে বায়না এল সুরবালার। রাজা-বাহাদুরের বড় নাতির অন্নপ্রাশন। মেয়ে ছেলে মিলিয়েও এই প্রথম নাতি বাড়ির—খুব নাকি ঘটা হবে। যাত্রা-থিয়েটার তো আছেই—বড় বড় পেশাদারী দল বায়না করা হয়েছে; এছাড়া বাইনাচ, খেমটা নাচ, তরজা, কবির লড়াই, কীর্তন, ঢব—মায় পুতুলনাচ পর্যন্ত—প্রমোদ-উৎসবে কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। 'মুক্শুদোবাদ না কোথা থেকে পুতুলনাচের দলই এসেছে দু-তিনটে; রাঢ় দেশ কোথায়—সেখান থেকে এসেছে কবির দল, তরজার দল, ঝুমুর নাচের দল। মালদ'র ওদিক থেকে পাঁচালী-গাইয়েরা এসেছে, গম্ভীরা না কি এক নাচের দল। এছাড়া কলকেতার যত বিখ্যাত বাইউলী-কীত্তনউলী বায়না করা হয়েছে।

স্বয়ং মালকাজান গাইবে, তার সঙ্গে ওর মেয়ে গহরজানও। গহরজানও এর মধ্যেই বেশ নাম ক'রে ফেলেছে। কেত্তনে ধরো, মতি, পান্না আসবে—তুমি তো আছই—রাজাবাবুর আবার কেত্তনের শখ খুব—তিনজনকেই চান তিনি। কে কী গাইবে জানলে সময় ঠিক করবেন তাঁরা সেই মতো।' দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে ফিরিস্তি দেয় দালাল রঘুবাবু।

সুরবালা স্থির হয়ে বসে শুনল সব। রঘুবাবু খোদ ওদের ম্যানেজারকে ধরে এনেছে। সুরবালা নতুন চেয়ার কিনেছে—সেইখানে এনে বসিয়েছে সে সমাদরে। আজকাল রাত-দিনের ঝি রেখেছে সুরো। আরও এই লোকজনের আসা-যাওয়ার জন্যেই রাখতে হয়েছে—ঝি রুপোবাঁধানো হুঁকোতে তামাক সেজে এনে দিয়েছে। হুঁকো—কিন্তু শুকনো, জল নেই। সকলে যার-তার হাতে জলভরতি হুঁকোয় তামাক খায় না। আর এখানে তো নিত্যি নানান্ জাতের আনাগোনা। ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুঁকো আছে। রঘুবাবু বা বাজন-দারদের জন্যে একটা খেলো হুঁকোর ব্যবস্থা—বাকী বাবুভাইদের জন্যে এই রুপো-বাঁধানো হুঁকো। জল দিলেই বিপদ, সোনার বেনের ব্যবহার করা কি কায়স্থর—এই ধরনের প্রশ্ন উঠবে।

প্রাথমিক আপ্যায়ন শেষ হ'তে সুরবালা প্রশ্ন তুলল, কে কী গাইবে কিছু স্থির হয়েছে কিনা।

'হ্যাঁ—তাও স্থির হয়েছে। পান্না নিয়েছে রাস, মতি ঝুলনলীলা। এখন তুমি কি গাইবে তাই বলো।'

সুরবালা হেসে বলল, 'তাহলে আমার তো দেখছি গোষ্ঠ ছাড়া কিছু নেবার নেই। অন্নপ্রাশনে গিয়ে তো আর মাথুর গাইব না। পূর্বরাগ কি মানও আমার ভাল লাগে না। আজকাল নিজের বড় শরীর খারাপ হয়ে যায় ঐসব পালা গাইলে। তাছাড়া অন্ন-প্রাশনের ব্যাপার—গোষ্ঠই ভাল। তবে সকাল ছাড়া গোষ্ঠ গাওয়া চলবে না।'

সে একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল ম্যানেজারবাবুর দিকে।

'সে তো ভালই হয়—আমাদের দিক দিয়েও,' সোৎসাহে মাথা নাড়েন ম্যানেজার-বাবু, তাঁর কাঁচাপাকা চুলে মোষের শিংয়ের মতো পাকানো টেরি দুলে ওঠে সেই ঝোঁকে, 'ওরা একজন নিয়েছে রাত্তির, একজন বিকেল। পান্না গাইবে রাত্তিরে—মতি বিকেলে। তুমি একদিন সকালে গাইলে আসরও বেশ মানানসই হয়। ভালই হবে।...তা, তাহলে এই সামনের শুক্রবার?'

পাঁজিটা দেখে দিয়ে—পাঁজির পাশে পাশেই লেখা থাকে কোন্‌দিন কোথায় কি বায়না, —রাজী হয়ে যায় সুরো। বলে, 'হ্যাঁ, শুক্কুরবারেই ভাল, শনিবার সকালে আর একটা বায়না রয়েছে কম্বুলেটোলায়—'

'তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল' বলে কথা শেষ করলেন ম্যানেজারবাবু। এবার ওঠাই উচিত কিন্তু উঠলেন না, একবার রঘুবাবুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'তা ওটার কথা, মানে কি দিতে-টিতে হবে—?'

রঘু তাকায় সুরোর দিকে। আজকাল কোন্ দৃষ্টির কি অর্থ তা বোঝা হয়ে গেছে সুরবালার। আজকের এ-চাউনির অর্থ হ'ল, 'মক্কেল শাঁসালো, বেশ ক'রে দুয়ে নিতে পারো। ছেড়ো না।' কিন্তু সুরবালার হঠাৎ কী হ'ল আজ, সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'অত বড় লোকের বাড়ি আবার দামদস্তুর ক'রে কি যাবো? গান শুনে রাজাবাবুর যা ন্যায্য বলে মনে হয় তাই দেবেন!'

রঘু মেয়েটার বোকামি দেখে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওমা, তাই কখনও হয়। যা হয় একটা কিছু বলো তুমি, পছন্দ হয়—সে তো আলাদা পাওনা রইলই—বকশিশ হিসেবে। মজুরি একটা কিছু ঠিক ক'রে নাও।'

দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘাড় নাড়ে সুরো, 'উঁহু, মজুরী বকশিশ সব আমি তাঁর ওপরই

ছেড়ে দিলুম। তিনি গান ভালবাসেন কীর্তন গান—তাঁকে শোনাব। যা দেবার তিনি ঠিক করবেন। তিনি তো এত দিচ্ছেন—কার কি রেট তিনিই তো জানেন। তাঁর কাছে দাম ক'রে খেলো হবো কেন?'

'এই তো প্যাঁচে ফেললে মা!' ম্যানেজারবাবু হাসেন, 'তা ধরো যদি রাজাবাবু পঁচিশ টাকাই ধার্য করেন তোমার মজুরী—তখন নিতে পারবে? আমরা জাতে বেনে, তা জানো তো মা, সহজে পয়সা বার করতে চাই না। যেখানে এক পয়সায় কাজ চলে—সেখানে দেড় পয়সা খরচ করা আমাদের স্বভাবে নেই।'

'সে কি কথা! পঁচিশ কেন, রাজাবাবুর বিবেচনায় যদি পাঁচ টাকাই আমার মজুরী ধার্য হয়—মাথায় ক'রে নেব। বলেছি যখন তখন জবান ফিরোব না এটা ঠিক, আর অত বড় লোকের অসম্মানও করব না—তখন ঐ নিয়ে কেজিয়া ক'রে। আমাদেরও সে স্বভাব নয় ম্যানেজারবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাহলে তাই হবে। রাজাবাহাদুরকে যেয়ে তাই বলব।' ম্যানেজারবাবু ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে ডিবে বার ক'রে সুগন্ধি পানের মিষ্টি সুবাসে ঘর পূর্ণ ক'রে নিজে একটা মুখে পুরলেন, রঘুকেও একটা দিলেন, তারপর যথোপযুক্ত সম্ভাষণ ক'রে বিদায় নিলেন।

রঘু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে অপ্রসন্ন ব্যাজার মুখে বললে, 'হঠাৎ আবার কী হ'ল তোর আজ? একেবারে রাণীভবানী হয়ে উঠলি যে! তারপর? ওরা হ'ল ডাকসাইটে কিপ্‌টের জাত, যদি সত্যিই পঁচিশ-তিরিশ টাকা ঠেকায়?'

'সে সবটাই তোমাকে ধরে দেব—তোমার দালালী। তাহলেই হ'ল তো?' সুরবালা হেসে জবাব দেয়।

এ বাড়িতে মুজরো এই প্রথম। এর আগে আর কখনও আসে নি, যোগাযোগ হয় নি তেমন। মস্ত বড় বাড়ি, সে মাপেও বেশ বড় উঠোন। উঠোন ঠাকুর-দালান ও চারিদিকের রোয়াক মিলিয়ে বোধহয় হাজার লোক বসেছে—মেয়েতে পুরুষে। ঠাকুরদালান ও রোয়াক-গুলোয় চিক টাঙিয়ে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা কিন্তু সকালবেলা বলে চিকের বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে, সেখানেও এতটুকু জায়গা খালি নেই।

দেখেই প্রসন্ন হয়ে উঠল মন। শ্রোতা বেশী থাকলে মনে হয় গাওয়া সার্থক হ'ল। আজকাল ছোট আসরে দেড়শ' দুশ' লোকের সামনে গাইতে ইচ্ছে করে না, জমেও না তেমন। মেহনৎ বাজে খরচ বলে মনে হয়।...মাঝখানে আসর, শ্রোতাদের সব মেঝেতে ফরাস পেতে বসবার ব্যবস্থা। কেবল এক কোণে, বড় জোড়া থামের সামনে—পিছনের কারও দেখার না ব্যাঘাত ঘটে সেইটে বাঁচিয়ে—খানতিনেক চেয়ার; স্বয়ং রাজাবাহাদুর আর তাঁর জন-দুই মান্যগণ্য অতিথির জন্যে।

সুরো যখন গেছে তখনও সে চেয়ার খালি। গৌরচন্দ্রিকা ধরার পর রাজাবাহাদুর এসে বসলেন, সঙ্গে দু'জন সাহেব। বোঝা গেল সাহেবদের জন্যেই চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।...এসে বসা মাত্রই কিছু ভাল ক'রে চেয়ে দেখা যায় না, তা ছাড়া সুরোর অত কৌতূহলও ছিল না। এত বড় আসর—একটু গোলমাল, খোশগল্পের গুঞ্জনধ্বনি উঠবেই—মন ছিল সেইদিকেই। এমন সুর ধরতে হবে যাতে প্রথমেই চড়া তান তোলা যায়। চড়া তান না ধরলে গোলমাল থামানো যায় না চট ক'রে।

ভাল সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়েছিল, সুরো খোলে নি গলা থেকে। ওর বলাই থাকে, আসরে হয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি নয়তো মহাপ্রভুর পট রাখতে হবে। আর, গাইয়ের মালা ছাড়াও একগাছা অতিরিক্ত গোড়ে মালা। সে-মালা সে নিজে হাতে পটের চরণে—না, গলায় নয়, পটই হোক মূর্তিই হোক—বাবা বলে দিয়েছেন মেয়েদের কখনও ঠাকুরকে মালা পরাতে নেই—পায়ের কাছেই রেখে দেয় সুরবালা গান শুরু করার আগে। ঠাকুরকে

পায়ে আলাদা মালা দেয় বলেই নিজের গলারটা খোলে না। আজকের গোড়ে মালা দুটোই বেশ ভাল, টাটকা তাজা সুগন্ধি ফুলের মালা, সম্ভবত জুঁই। সম্ভবত এইজন্যে যে, জুঁই হ'লে এত বড় জুঁই আগে কখনও দেখে নি সে। তাজা ফুল আর সদ্য-পেষা চন্দনের তিলক তার সঙ্গে। আসরের চারিদিকেও সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়ে ঝালর ঝোলানো হয়েছে। শুনল, ঝাজনদার দুকড়ি বলল চুপিচুপি, রাজাবাহাদুরের নিজের বাগানেই এত ফুল ফোটে প্রত্যহ। শেষরাত্রে মালী দিয়ে যায় তুলে।

পুষ্পচন্দনের মিলিত সুবাস, ঝলমলে প্রভাতের আলো, সুবেশ সুকান্তি শ্রোতার ভিড়—মন প্রথম থেকেই খুশী ছিল। গলাও ছিল পরিষ্কার। গান ধরতে নিজের কানেই ভাল শোনাল। ফলে দেখতে দেখতে চারিদিকের গুঞ্জরণ থেমে গেল—আসরের এমন অবস্থা হ'ল যে, সেই প্রবাদবাক্যের মতোই, একটি ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়।

এইবার ধীরেসুস্থে চারিদিকে তাকাবার অবসর মিলল। গাইতে গাইতে এটা অভ্যাস হয়ে যায়, গানের কোনরকম ক্ষতি না ক'রেই ঘর বাড়ি চারিদিকের মানুষ সব লক্ষ্য করা যায়। দেখতে দেখতে চোখটা রাজাবাহাদুরের দিকে একটু বিশেষভাবে পড়বে সেও স্বাভাবিক। দেখল ফিট গৌরবর্ণ সুপুরুষ প্রৌঢ় ব্যক্তি। বয়স হয়ত প'য়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে—কিম্বা দু'এক বছর এদিক ওদিক, কম বা বেশী। কিন্তু বয়সে প্রৌঢ় কি যুবা—সে মুখের দিকে চেয়ে কিছুই মনে থাকে না। অন্তত সুরবালার মনে রইল না। সুপুরুষ বললেও কিছু বোঝানো যায় না। সুন্দর পুরুষ। অতি সুন্দর। সে যে-গান গায় সেই গানে শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণ কেউই পরস্পরের চেহারার কোন নিখুঁত হিসেব করা বর্ণনা দিতে পারেন নি—মনের আবেগবিহ্বলতায় যেন সব হিসেব সব তথ্য গোলমাল হয়ে গেছে—কবির লেখনীতে। আজ এই মুহূর্তে সুরবালা ব্যাপারটা বুঝল। মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, কফ দেওয়া শার্টের ওপর কুঁচনো চুনোট-করা চাদর—মনোহর কোন নবযুবকের বেশ নয়। মেয়েদের মন ভুলনোর জন্যে ছেলেছোকরারা যেভাবে কাপড়-জামা পরে—সেদিকেও যান নি। সাধারণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মতোই সাজসজ্জা। এমন কি গায়ের জামাটাও রেশমের নয়। ধুতিখানা ফরাসডাঙারই হয়ত—কিন্তু আশ্চর্য এমন কিছু মূল্যবান কাপড় নয়, নেহাৎই সাধারণ।

না, ছোকরা সাজার চেষ্টা কোথাও নেই। বয়স গোপন করারও না। তাহলে বোধহয় নাতির ভাতে এত উৎসব সমারোহ করতেন না, নিজের পিতামহত্ব প্রচার করতেন না। শান্ত গম্ভীর মুখ, গম্ভীর, কিন্তু উদ্ধত বা কঠোর নয়। সে মুখ বিশেষ সে চোখের দিকে চেয়ে ভয় করে না—কোথায় যেন একটা আশ্বাস বা অভয় পাওয়া যায়। তার কারণ ওঁর দৃষ্টি। চোখের চাউনিতে এমন একটি উদার প্রসন্নতা আছে যে দেখামাত্র নিমেষে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

মুগ্ধ হ'ল সুরবালাও। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। ফেরাবার ইচ্ছা শুধু নয়—শক্তিও রইল না। কী গাইছে, কোন্ পালা তাও যেন খেয়াল রইল না, নিতান্ত অভ্যাসেই গেয়ে যেতে লাগল। অনেকদিনের গাওয়া গান—আপনিই এক পংক্তির পর আর এক পংক্তি মুখে এসে যায়, আখর সুদ্ধ, কোন প্রয়াস না করলেও চলে। তাই গাইতে পারছিল, বাইরের কোন লোক কোন ত্রুটি ধরতে পারছিল না। তার তখন অন্য সব গানের কথা মনে পড়ছে। "নাহি জানিনু সোহি পুরুখ কি নারী, নয়নে লাগল রূপ হামারি।" ইচ্ছে করছে গাইতে—"আঁখি আঁখি লাগি রহল, পলক পড়ল না, পড়ল না!" অর্থাৎ ইচ্ছে করছে গোষ্ঠ নয় সোজাসুজি পূর্বরাগই গাইতে।

ফলে, যে প্রভাত সদ্য ফোটা সুগন্ধি ফুলের মতো আজ তার জীবনে উন্মীলিত হয়েছিল, সেই প্রভাতটিই তেজস্কর সুরার মতো এক সকল-চৈতন্য-একাকার-করা তীব্র নেশায় আচ্ছন্ন করল ওকে। যূথিকার গন্ধ মহুয়ার গন্ধে রূপান্তরিত হ'ল। সকালের এই

উজ্জ্বল বেলা, চারিদিকের ঝাড়ে ঝোলানো বেল-জুঁই-মল্লিকার গন্ধের সঙ্গে ধূপধুনোর কৃত্রিম গন্ধ মিলে—সবটা যেন কেমন অবাস্তব দিবাস্বপ্নের মতো মনে হ'তে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল—এই মানুষটির জন্যেই তার এত দিনের গান গাওয়া, গান শেখা—সঙ্গীতের সাধনা, তবু পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে গান শোনানোরও ক্ষমতা আজ যেন আর তার নেই, সে শক্তি সে শিক্ষা গেছে হারিয়ে। কী এক মাদক-রসে, অজানা এক নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে সে। গাইছে যে—সে যেন আর কেউ। সে শুধু সুরবালার এতদিনের অভ্যাস এতদিনের চর্চা—তার সঙ্গে সাধনা শিক্ষা বা ইচ্ছা কোনটারই যেন যোগ নেই আজ।

তবু বোধ করি শ্রোতারা মুগ্ধই হ'ল। ঘন ঘন বাহবায়, বলিহারি শব্দে আর হরি-ধ্বনিতে তাই মনে হ'ল অন্তত। কোন কোন শ্রোতা—বিশেষ শ্রোত্রীরা হয়ত কীর্তন-উলীকে নির্লজ্জ বেহায়া ভাবল কিছুটা, অমন সকলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এক-দৃষ্টে রাজাবাবুর দিকে চেয়ে থাকায় ; দোয়ার-বাজনদাররাও হয়ত বিস্মিত হ'ল, কারণ এটা ঠিক সুরবালার স্বভাব নয়, এতদিনের মধ্যে এরকম কোথাও দেখে নি তারা কেউ : অন্য কোন তরুণ যুবাপুরুষ হ'লেও না হয় কথা ছিল—এক প্রৌঢ়ের মুখে সুরবালার মতো নবযুবতীর আকর্ষণের কিছু থাকতে পারে তা তাদের চিন্তারও অতীত ; কিন্তু তবু এত লক্ষ্য করার মতো লোক খুব বেশী ছিল না সে আসরে। ধনী গৃহস্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, বেশী ক'রে বিশেষভাবে তাঁকে শোনাবার জন্যেই পেশাদার গায়িকা গান গাইবে—এ এমন একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা কি দুর্লভ দৃশ্য নয়। সাধারণ লোকেও এইটেই আশা করে।

রাজাবাহাদুর কী ভাবলেন তা তাঁর মুখের সেই শান্ত প্রসন্নতায় বোঝা গেল না। তবে তাঁর যাঁরা অন্তরঙ্গ তারা লক্ষ্য করলে বুঝত যে গান শুনে তিনিও মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ তাঁরও দৃষ্টি অন্য কোন দিকে ছিল না—ঐ গায়িকার মুখের দিকে ছাড়া। এটা তাঁর পক্ষেও অস্বাভাবিক ঘটনা। অতিথি-অভ্যাগতদের দিকে দৃষ্টি রাখা—তারা ঠিকমতো পান জল পাচ্ছে কিনা, সম্মানিত বা আমন্ত্রিত যাঁরা তাঁদের সামনে দিয়ে সাজা কল্‌কে ও হুঁকো ঠিকমতো ঘুরছে কিনা—অন্যদিন এইদিকেই তাঁর নজর থাকে বেশী। বিশেষ আজ যে দুজন সাহেব শ্রোতা এসেছেন—ব্যবসা সম্পর্কে এঁদের দুজনের সঙ্গেই রাজা-বাহাদুরের খুব অন্তরঙ্গতা, এবং সেই হিসেবে বিশেষ মাননীয় অতিথি। অনেক বাধ্য-বাধকতা এঁদের সঙ্গে। গড়গড়া বা পানীয় ইত্যাদি সরবরাহে ভুল না হলেও যেটুকু ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন সেটুকুও দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে। সব সময় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও হয়ে উঠছে না, দিলেও অযথা বিলম্ব হচ্ছে।

মুগ্ধ যে হয়েছেন রাজাবাবু তা আরও বোঝা গেল পেলা দেবার সময়। কাল পরশু দুদিনই তিনি পেলা দিয়েছেন—জোড়া গিনি নতুন রুমালে বেঁধে। আজও সেই মতো সরকার মশাই একখানা নতুন রুমালে বেঁধে দুটি গিনি রেখে গেছেন এক সময়, তা জেব্‌এও পুরেছেন কামিজের। সাহেবরাও সঙ্গে গিনি এনেছিলেন, কিছুক্ষণ গান শুনে উঠে যাবার সময় অব্যর্থ লক্ষ্যে একখানা ক'রে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু রাজা-বাবুর যখন পেলা দেবার সময় এল তখন দেখা গেল যে সেই সাধারণ মামুলী পেলা দিতে ঠিক যেন মন উঠল না তাঁর। এগিয়ে গিয়ে জেব্‌এ হাত পুরেও একটু যেন ইতস্তত করলেন, তারপর গলা থেকে তাঁর ভারী মোটা সোনার হার-ছড়াই খুলে সুরবালার হাতে দিলেন।

সুরবালা খুশী হ'ল, খুশী হবারই কথা, সমবেত জনসমুদ্রেও যেন বাহবার ঢেউ ভাঙল রাজাবাবুর এই উদার স্বীকৃতিতে, গুণের এই যথার্থ সমাদরে—কিন্তু কে জানে কেন—সে লজ্জাতে রাঙা হয়ে উঠল অকস্মাৎ—অকারণেই। এ পেলা যে কপালে ঠেকিয়ে স্বীকার করে নিতে হয়—(ঐটেই ধন্যবাদ জানানোর রীতি) তাও ভুলে গেল কয়েক

মুহূর্তের জন্যে, ঠিক সেই সময়টা খুশীতে লজ্জায় যেন তার বুদ্ধি সব ঝাপুসা একাকার হয়ে গিছল—যখন মনে পড়ল, শিথিল হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকাল, তখন রাজাবাবু আবার পিছন ফিরেছেন, স্বস্থানে ফিরে আসতে।

দেওয়া সম্ভব নয়, দিলে অশোভনই হয়ে পড়ত ব্যাপারটা, সুরবালারও তখন অপমান-কর মনে হ'ত সম্মানের এই নিদর্শনীটা—তবু বিচিত্র কারণেই সুরবালার এক একবার মনে হ'তে লাগল এ হার রাজাবাবু তার গলায় পরিয়ে দিলে সে বেশী খুশী হ'ত।

বাড়ি ফেরার আগে মতির কাছে নেমে দেখা ক'রে যাওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। মতির যা প্রাপ্য তা ফেরার পথেই চুকিয়ে দিয়ে যায় সে। না দিলেও চলে, ইদানীং আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। মতির দিক থেকে অনেকদিনই চলে গেছে সে সংশয়, সুরোকে ও চিনে নিয়েছে ভাল ক'রেই, এক আধলাও তঞ্চকতা করার মেয়ে নয় সে—সুরবালার মনেও 'মাসী কি ভাববে' 'মাসী কোন সন্দেহ করবে'—এ ধরনের কোন কুণ্ঠা নেই, তবুও এ পাট চুকিয়েই যায় সে টাটকা টাটকা। কেমন গান হ'ল, কী রকম আসর হয়েছিল, কী রকম বাহবা পাওয়া গেল—এটা মতিকে না শোনালে যেন তৃপ্তি হ'ত না। কাউকে শোনানো দরকার। শিল্পীর গরজ এটা। কোন শিল্পীই তার শিল্পকর্ম কোন সমানধর্মী বা বোদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করতে না পারলে তৃপ্তি বোধ করে না। যার সে সুযোগ নেই সে নিতান্তই হতভাগ্য। এমন কি ঈর্ষী প্রতিদ্বন্দ্বী কি প্রতিযোগীর কাছে বলতে পারলেও সুখ হয় খানিকটা—অনিষ্ট হতে পারে বা সে বিশ্বাস করবে না—জেনেও। সেই কারণেই আরও সুরবালার মতির কাছে ছুটে আসা। বাড়িতে মা আছে একমাত্র—সে এসব রসে বঞ্চিত। গানের কিছুই বোঝে না—বোঝে নগদ কি হাতে এল সেই পাওনাটা। কদাচিৎ কোনদিন নানু এলে তবু একটু গল্প ক'রে বাঁচে। নানু যে কীর্তনের কিছু বোঝে তা নয়—সে শিল্পীর মনটা বোঝে, তার সুখদুঃখ বোঝে, তাই তার কাছে গল্প ক'রেও খানিকটা শান্তি।

ইদানীং মতিকে সবদিন পায় না। এমন হয় যে সুরবালা যখন ফিরল মতি তখন তার মুজরোয় বেরিয়ে গেছে বা তখনও ফেরে নি। সে সব দিনগুলোয় ভারী খারাপ লাগে সুরবালার। আজ সৌভাগ্যক্রমে মতি বাড়ি ছিল। খবর পেয়ে—প্রায় ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠল সুরো, 'মাসী আজ কি পেয়েছি দ্যাখো, তোমার গান শেখানো সার্থক হয়েছে। এটা তুমি রাখো মাসী, রাখতেই হবে তোমাকে—তোমার গুরু-দক্ষিণে।'

মতি ওর মুখের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। সুরো এর আগে পেয়েছে ঢের, নানান জায়গায় নানা বিচিত্র পুরস্কার পেয়েছে। গয়না পাওয়াও নতুন নয়। টাকা গয়না গিনি শাড়ি শাল—অনেক পেয়েছে। তবে আজ এমন কি অভাবনীয় জিনিস পেল যে এত খুশী? খুশির এমন চেহারা এর আগে চোখে পড়ে নি আর কখনও। ওর মুখের দিকেই প্রথম কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। তখন বেলা চারটে বাজে, তার মানে আড়াইটে পর্যন্ত গানই চলেছে বোধহয়। সে ক্লান্তির ছাপও স্পষ্ট, তবু তারই মধ্যে কী এক নবীন পুলক নতুন সুখের আবেশে ঝলমল করছে তার মুখখানা, টলমল করছে তার কান্তি। লজ্জা কি উত্তেজনা কে জানে—কিন্তু মনে হচ্ছে ওর সুগৌর মুখে কে যেন মুঠো মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছে—এত লাল। এর সবটাই পরিশ্রম হ'তে পারে না। ওর কপালে জড়ানো অবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে গলার খাঁজে যে স্বেদরেখা—বুকে যে ঘন ঘন নিঃশ্বাস—তারও যে সবটা পরিশ্রম, এই সিঁড়ি ভেঙে ছুটে আসার ফল—তাও মনে হ'ল না মতির। মনে হ'ল এ উত্তেজনার কোন কারণ ঘটেছে। অভূতপূর্ব কিছু।

সুরবালা মতির এ বিস্ময় লক্ষ্য করে নি। সে নিজের সুখেই মশগুল ছিল। মতির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জামার মধ্যে হাত পুরে বুকের কাছ থেকে ঈষদুষ্ণ আর্দ্র হার-ছড়া

বার ক'রে আর এক হাতে মতির হাতটা জোর ক'রে তুলে ধরে তার মধ্যে গুঁজে দিল। বলল, 'এই নাও মাসী, তোমার রাজাবাবু নিজের গলা থেকে খুলে পেলা দিয়েছেন। টাকা নয়, গিনি নয়—আলাদা গড়ানো নয়, বৌদের গলা থেকে খুলে দেওয়া নয়—খোদ মালিকের গলার হার, নিজে খুলে দিয়েছেন সকলের সামনে!...এবার আর তুমি না বলতে পারবে না!'...

বলে যেন উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসে, আবেগে, শ্রান্তিতে হাঁপাতে লাগল সে।...

নিজের খুশিতে যথেষ্ট মশগুল ও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ না থাকলে হয়ত এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত না। অথবা এখনও লক্ষ্য করত যে কয়েক লহমার জন্য মতির মুখখানা কী ভয়ঙ্কর কালো হয়ে গেল। কিন্তু আজ সে-সব কিছুই চোখে পড়ল না সুরোর, বরং ছেলেমানুষের মতোই, বাল্যকালের মতোই মতির কোলে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি খুশী হও নি মাসী? আর রঘুবাবু কোথায় গেল, তার তো ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না, তাকে বলো মজুরী হিসেবে পুরো আড়াইশো টাকা ধরে দিয়েছেন রাজাবাবু। চাইলে আর কত বা চাইতুম, বড়জোর দুশো টাকা। এর বেশী তো তোমরাও চাইতে পারো না গো।'

মতিরও বহুদিনের শিক্ষা। আঘাতটা সামলে নিতে তার কয়েক মুহূর্তের বেশী সময় লাগে নি। অপমানটা লেগেছে জানতে পারলে অধিকতর আঘাত লাগবে। সে হেসে বলল, 'তবে আর কি, এবার তোর কপাল ফিরল বুঝি দ্যাখ। রাজাবাবুর গাড়ি এসে নিত্যি দোরে এসে দাঁড়াবে এবার। শুনেছি ওঁর অনেক টাকা, ভাল ক'রে দুয়ে নিতে পারিস তো রাজরাণী। খেটে খেতে হবে না আর এই জীবনে।...তা হারছড়া আমাকে দিচ্ছিস কেন, এ তো আরও তোর কাছে রাখবি যত্ন ক'রে।...গলায় পরিয়ে দিতে পারে নি এই আপসোস? আমিই না হয় পরিয়ে দিচ্ছি আয়। এটা পরেই থাক, রাজারাজড়ার ব্যাভার-করা হার—এর আয়পয় কত!'

মতি সত্যিই একরকম জোর ক'রে হারটা ওর গলায় পরিয়ে দেয়।

'পোড়া কপাল আমার! অমন কপাল তোমার ফিরুক জন্ম-জন্ম।...ভাল বলতে গেলে মন্দ হয় এদের। আমি কি বলতে গেলুম উনি তার কি মানে ধরলেন। পুরুষমানুষের গলার বারোমেসে হার, ছিরি নেই, ছব্বা নেই—ভারী পাথরের মতো হার—ও-ই গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্যে তো আমার প্রাণ ছটফট করছে একেবারে।...বাড়ি না গিয়ে ছুটে এলুম বলে—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কখন একখানা পরোটা খেয়ে বেরিয়েছি সেই কোন ভোরে—উনি এলেন এখন রস করতে!'

গজ গজ করতে করতে টাকা কটা গুনে সামনে রেখে নেমে যায় সুরো।

মতি পিছন থেকে একটু চেষ্টা ক'রেই হাসে, শব্দটা যাতে নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়।...

কিন্তু সুরোর গাড়ি গলির মোড় পেরনোর আগেই আবার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখ। রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে, 'বুড়োর নিয্যশ ভীমরতি ধরেছে। হম্বিদীঘ্ঘি জ্ঞান নেই। মানীর মান-মর্য্যেদাও ভুলে গেল এতকাল পরে। সেদিনের ছুঁড়ি—আমাদের ডিঙিয়ে আমাদের অপমান্যি ক'রে তাকে তুই বেশী মজুরী, বেশী পেলা দিস কোন্ আক্কেলে...কাঁচা বয়েস আর চাঁদপানা মুখ দেখে সব ভুল হয়ে গেল! জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বসে রইল! মরণদশা আর কি! সেই যে বলে না—মরণের ভগ্নদশা, মুখে আগুন দিয়ে বাইরে বসা—তাই হয়েছে বুড়োর। জ্যান্তে মুখে নুড়ো জেবলে দিতে হয় অমন একচোকো মিন্সের।'

উচ্ছ্বাস বাড়িতে এসে মায়ের কাছেও করে সুরবালা। হার খুলে দেখায় তাকে। মতিকে যাই বলে আসুক, গলা থেকে হারটা খোলে নি, পরেই ছিল। এখনও মাকে দেখিয়ে

আবার গলায় পরে। নিস্তারিণী কিন্তু ঠিক অতটা উচ্ছ্বাসে সায় দিতে পারে না, শেষ অপরাহ্নের ম্লান আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলে, 'কে জানে বাবা, কেমন রাজা-রাজড়ার গলার হার, যেন ম্যাড়ম্যাড় করছে। নিশ্চয় মরা সোনা—আমি বেশ বলতে পারি।'

সুরবালা রাগ ক'রে উঠে চলে গেল সেখান থেকে। ওর মনের তন্ত্রীতে যে-গোপন মধুর সুরটি বেজেছে—সেটির কথা কাউকেই বোঝাতে পারল না সে। তার অনুরণন আর কারও প্রাণেই প্রতিধ্বনি তুলল না। এ যে কী একটা অভাবনীয় সম্মান সেটা তার মায়ের বোঝার ক্ষমতা নেই সত্যি কথা—কিন্তু মাসীও বুঝল না। আশ্চর্য!...

সেই অবস্থাতেই, কাপড়চোপড় ছাড়বার চেষ্টা না ক'রেই, অনেকক্ষণ বসে রইল সুরবালা। ঠিক এখনই কিছু করতে ইচ্ছে করছে না তার। স্নানাহারের তোড়জোড় তো নয়ই। ইচ্ছে করছে কোথাও নির্জনে বসে এইমাত্র যে অঘটন ঘটে গেল তার জীবনে, সেইটে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে—একটু নিভৃতে বসে মনের মধ্যে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত আবার পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করে সে। সকালের প্রতিটি মুহূর্ত আবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

কেন যে অঘটন, কেন যে অভাবনীয়—তা কেউ জেরা করলে তখন বোঝাতে পারত না সে। এ আলোড়ন মনের মধ্যে কিসের জন্যে—পাওয়াটা, না দাতা মানুষটা—কী তাকে এমন উত্তেজিত ক'রে তুলেছে, তা তখন নিজেও বুঝতে পারে নি! আসলে এ যে তার জীবনেই একটি বিরাট অঘটন ঘটে গেল—আর সেইটেই যে সে একান্তমনে অনুভব করতে চায়, বুঝতে চায়, ধারণা করতে চায় মনে মনে, আস্বাদন করতে চায় তার প্রতি বিন্দু রস—সেটুকু বোঝার মতো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা কোনোটাই লাভ হয় নি বলেই তার এই আপাত-অর্থহীন আকুলতা।

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে—মার তাগাদা ও সহস্র প্রশ্নে বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তেই হ'ল তাকে। প্রশ্ন যে, আজ ওর হ'ল কি? কিছুই তো খেয়ে যায় নি বলতে গেলে সকালে—দুপুরের ভাতও তো কড়কড়িয়ে গেল, পেটে একদানা পড়ল না,—এখনও কি ক্ষিদেতেষ্টা বলতে কিছু বোধ হচ্ছে না?...ওখান থেকেও একরাশ খাবার এসেছে। সুরোর সঙ্গে কিছু দেন নি তাঁরা, দারোয়ানের সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়ে এক বাঁক—দু'ঝুড়ি খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব গরম, এ-বেলায় তৈরি—সেগুলোর বা কি হবে? সুরো কিছু খাবে, না সব বিলনো হবে? না কি কিছু সকালের জন্যে থাকবে? নিস্তারিণীও তো এ-বেলার জন্যে আবার নতুন ক'রে ঝোলভাত রেঁধেছে—সুরবালা কি তাই খাবে এখন? অমন থুম হয়ে বসে আছে কেন? অত ঘামছেই বা কেন বসে বসে? তেমন গরমও তো নেই। শরীর খারাপ লাগছে না তো? কাপড় ছাড়া থাকলেও না হয় নিস্তারিণী গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারত—ও তো সেই রাজ্যের সত্তিক জাত ছোঁয়া কাপড়—এখন গায়ে হাত দিলে তাকে আবার কাপড় কাচতে হবে। কী.বুঝছে সুরো—ঝিকে পাঠিয়ে কি মোড়ের ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে আনাবে? না নানুকে খবর দেবে একটা? ইত্যাদি—

তিতিবিরক্ত হয়েই উঠে পড়তে হয় অগত্যা। ওঠা দরকারও অবশ্য। সন্ধ্যে উৎরে যাবার পর গায়ে জল ঢাললে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় আছে। গলার জন্যে সর্বদা ওদের সতর্ক থাকতে হয়।...কিন্তু কাপড় কেচে গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে বেশ পরিবর্তন করতে গিয়ে আবারও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বড় আয়না কিনেছে একটা সম্প্রতি, নানুই কিনে দিয়েছে কোন্ সায়েববাড়ি থেকে—জামা পরতে পরতে সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজের দেহের দিকে চেয়ে থাকে আপন মনে।...সত্যিই কি সে ভাল দেখতে? লোকে তাকে সুন্দরী বলে, ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে সে—কথাটা কি ঠিক? তাকে দেখে পুরুষ ভুলবে? যে-কোন পুরুষ? ঐ রাজাবাবুর মতো শান্ত-সৌম্য-গম্ভীর বয়স্ক লোকও

ভুলবে? কতখানি ভুলবে—কতটা ভোলা সম্ভব পুরুষের পক্ষে?...

নিচে থেকে নিস্তারিণীর কণ্ঠ ভেসে আসে, 'বলি আমি কি সারারাত হাঁড়ি-হে'সেল নিয়ে বসে থাকব? সারাদিন তো পেহারী গেল, না পারি বসতে, না পারি শুতে—কেবল ঘরবার ক'রে মরছি, তা রাতেও কি একটু সকাল সকাল রেহাই মিলবে না? যা খাবে, খেয়ে নিয়ে অব্যাহতি দিলেই হয়—না খাও তো তাও বলে দাও একটা কথা, যে আমার আর খাবার দরকার নেই, বাতাস খেলেই চলে যাবে আমার মা-দুগ্‌গার মতো। এর পরেও আমার অনেক কাজ পড়ে থাকবে। এখন বাড়ি ফিরে আবার এত কিসের ভাবন তাও তো জানি না—কোন্ রসের নাগর আসবে এখন!'

লজ্জিত সুরবালা তাড়াতাড়ি আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নেমে যায়।

খাওয়া সেরে সকাল ক'রেই শুয়ে পড়ে। দিন-রাতের মতোই খাওয়া। সন্ধ্যের পর ভাত খেয়ে আর রাত্রে খাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ক্লান্তিও বোধ হয় অপরিসীম। পরিশ্রম বা সারাদিনের অনাহারই শুধু নয়—মানসিক উত্তেজনাও ক্লান্তির আর একটা কারণ।...তবু শুয়ে পড়লেই কিছু ঘুম আসে না। অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়লেই যে ঘুম আসবে তারও কোন অর্থ নেই। সুরবালাও বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। মার কাজ সারা হ'ল, যথেষ্ট গজগজ করতে করতে ঘরদোর সেরে খাবার ইত্যাদি গুছিয়ে দোরে দোরে তালা দিয়ে এক সময় এসে শুয়ে পড়ল সে, একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল তার ফুরুৎ ফুরুৎ ক'রে। বড় রাস্তায় ছ্যাকড়া গাড়ির শব্দ কমে এল, ফিরিও'লার ডাক। আশপাশের বাড়িতেও ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। স্তিমিত হয়ে এল তাদের মিলিত-কণ্ঠের গুঞ্জন। দূরে কাদের বাড়িতে কে যেন মদ খেয়ে এসে এতক্ষণ হল্লা করছিল—সে শব্দও এক সময় থামল। পথ জন-বিরল শব্দ-বিরল হয়ে এল, তবু সুরোর চোখে তন্দ্রা নামল না। কেন তা সে জানে না। হয়ত ঘুমোতে ইচ্ছাও নেই তেমন। কেবলই মনে হয় আজ সকালে অনাস্বাদিতপূর্ব যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার, যে অচিন্তিত ঘটনা ঘটে গেছে, ঘুমোলেই তার অভিনবত্ব চলে যাবে, আস্বাদনের বৈচিত্র্য নষ্ট হবে। সকালের সেই প্রথম দেখা থেকে কী কী ঘটেছিল, পারম্পর্য বজায় রেখে যতবার মনের মধ্যে গুছিয়ে সাজাতে যায়—ততবারই যেন গোলমাল হয়ে যায় সব। আবার নতুন ক'রে শুরু করতে হয় তাই।

তবু বয়সের, স্বাস্থ্যের একটা ধর্ম আছে। সেই চিন্তাদ্বন্দ্বের মধ্যেই ঘুমিয়েও পড়ে এক সময়। কিন্তু চিন্তাটা—জেগে থাকার ইচ্ছাটা প্রবল বলেই বোধহয় ঘুমটা খুব গাঢ় হয় না। স্বপ্নই দেখে বেশী, স্বপ্ন দেখে চমকেও ওঠে মধ্যে মধ্যে। শেষ রাত্রের দিকে দেখল যে ওর বিয়ে হচ্ছে। প্রথমটা খুবই দুঃখ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এ-বিয়ে হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ছিল কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় বরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল তার মন। বরের মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, গায়ে কামিজের ওপর কুঁচনো চাদর—চোখে আশ্চর্য এক উদার প্রসন্নতা।...

সকালে উঠে লজ্জায় স্বপ্নের কথাটা কাউকে বলতে পারল না। অথচ গতদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কারও সঙ্গে আলোচনা না ক'রেও থাকা সম্ভব নয়। আজ তার কেবলই মনে পড়ছে শশীবৌদির কথা। তাঁরা যদি কাছাকাছি থাকতেন, ছুটে গিয়ে তাঁকেই বলত সে সকলের আগে। তিনি বুঝতেন—কী এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল ওর জীবনে। বুঝতেন, উপদেশ দিতেন। মনকে শান্ত ক'রে দিতেন। তিনি জানেন ওর মনের শান্তির চাবিকাঠি কি। নিচে ভাড়াটের বৌ আছে কিন্তু সে তার সংসার নিয়ে বড়ই ব্যস্ত। তাছাড়া সে নিতান্তই গোলা মেয়েছেলে—নিজের স্বামী-পুত্রের বাইরে কোন জগৎই তার নেই।

অগত্যা মা। মার তবু এতদিনে মেয়ের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু একটা ধারণা হয়েছে —ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা গোছের। সকালে দুধ খেতে বসে মাকেই শোনায় সে, কালকে কেমন গান হ'ল তার বিবরণ। ওঁদের বাড়ি কেমন সাজিয়েছিল, সব টাট্‌কা জুঁই বেল মতিয়ার গোড়ে দিয়ে; সব মালাই নাকি ওঁদের নিজস্ব বাগানের, কিনতে হয় নি এক পয়সারও ফুল; ওঁদের নাকি মস্তবড় বাগান, একটা গ্রাম বসানো যায় এত বড়; বারো-তেরোজন মালীই আছে মাইনে করা।...যাই বলো বাপু, এই তো এত জায়গায় যাচ্ছে সুরো গান গাইতে—কত তাবড় তাবড় লোকের বাড়িও তো গেল—রাজা-মহারাজা—অবিশ্যি হ্যাঁ, কলকাতার বাইরে মুজরো সে নেয় না বড় একটা, সঙ্গে অভিভাবক হয়ে যাবার তার লোক নেই বলে; মতি নেয়—তার বয়স এবং অভিজ্ঞতা অনেক বেশী, তাছাড়া অল্পবয়সের যা ভয় সে-বয়সে মতির সে-ভয়ও ছিল না অত—সে যাক গে, তা কলকাতাতেও তো কম দেখল না—কৈ, এমন সুন্দর রুচি, এমন চমৎকার ক'রে বাড়ি সাজানো—আর তো কোথাও চোখে পড়ে নি এই এতকালের মধ্যে!

বাড়ি থেকে প্রসঙ্গটা বাড়ির মালিকে কখন চলে আসে, সুরো টের পায় না। সে উৎসাহের সঙ্গেই বলে যায়, 'রাজাবাবুর চেহারাও তেমনি। কী সুন্দর দেখতে কি বলব মা। ধপধপ করছে রঙ, মোটা নয়—তবে পুরুষের মতোই চেহারা—সর্বদিকেই মানানসই। চোখ-মুখ-গড়ন কোনটাই খুব আহামরি নয়, তবে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেখানে যা সাজে যা দিলে ঠিক মানায়—বিধেতা যেন ঠিক সেইখানে সেই জিনিসটিই দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর কী সুন্দর চাউনিই বা! দেখলেই বোঝা যায়—হ্যাঁ, বনেদী বংশের লোক বটে, রাজা খেতাব সাত্থক। আর অত পয়সা তো, এতটুকু দেমাক নেই, একটা শৌখিন জামা পর্যন্ত পরে না। উঠে এসে এই যে এত টাকার জিনিসটা দিয়ে গেল—তা একটু হ্যালদোল নেই। অহঙ্কারের অ পর্যন্ত নেই। আসবার সময় জনে জনে সবাইকে জিজ্ঞেসা—কিছু অসুবিধে হয় নি তো, কোন কষ্ট হয় নি তো, খাওয়া হয়েছে তো সক্কলকার—এইসব। আর কি বিবেচনা আমার জন্যে—তখনই গাড়িতে খাবার তুলে দিচ্ছিল, উনিই তো বারণ করলেন। বললেন, এই তিনটে বেজে গেল—এখন বাড়ি গিয়ে কি আর ঐ ঠাণ্ডা লুচি তরকারী খাবে? তুমি ও রেখে দাওগে সরকারমশাই, রাত্রে আবার টাটকা সব তৈরি হ'লে পাঠিয়ে দেব!'

নিজের উৎসাহে ও আনন্দে বকে যাচ্ছিল সুরবালা। অত লক্ষ্য করে নি যে, শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ ধরেই নিস্তারিণীর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। এবার তার অর্থটা প্রকাশ পেল। সুরবালা একটু থামতেই সে বলে উঠল, 'পোড়ার দশা আর কি! তুই যে দেখছি তার পীরিতে পড়ে গেলি একেবারে! সক্কালবেলা উঠে ঠাকুর-দেবতার নাম চুলোয় গেল—বুড়োর নামই দশকাহন শুরু করলি। অষ্টোত্তর শত নামেও তো কুলোবে না দেখতে পাই। আরে, তার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে, তার মধ্যে এত রূপ কি দেখলি!...বলি তারই তো নাতির ভাত লো। ছেলে উপযুক্ত না হলে তার আবার ছেলে হয় কি করে? আর রাজা তো ছাই। নামেই লোকে বলে রাজাবাবু, রাজা-বাহাদুর। কোম্পানীর খেতাব-টেতাব কিছু নেই—কালই রঘু বলছিল। জমিদারও এমন কিছু বড় নয়। পয়সা ওদের এই একপুরুষেই, কারবার ক'রে। ওরা আবার রাজা। ছ্যা!'

সুরবালা ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করল। আশ্চর্য, ওর কথাটা এরা কেউই বুঝতে পারল না। সুন্দরকে সুন্দর বললেই বুঝি অমনি পীরিতে পড়া হয়ে গেল! মাসী কাল দুম্‌ ক'রে একটা কথা বলে বসল, 'দ্যাখ্‌ এবার বুঝি রাজাবাবুর গাড়ি এসে তোর দোরে দাঁড়াতে শুরু করে!'...এরা মানুষের সব আচরণেরই ঐ একটা ব্যাখ্যা ধরে রেখেছে। ওর গান যদি তাঁর সত্যিই ভাল লেগে থাকে, তিনি বকশিশ দেবার সময়—পেলা আর বকশিশে তফাৎ কি—একটু বিশেষ ধরনের বকশিশ দিয়ে থাকেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে

হবে যে, ওর চেহারাটাও তাঁর মনে ধরেছে—সেইজন্যেই মোটা বকশিশ, ওর গানটা কিছু নয়? তাহলে এতকাল কি শেখাল মাসী?...আর ওর যেন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই ও শুধু পীরিত করবার জন্যেই ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে। যাকে হোক একটা পেলেই হ'ল। মা মুখে আনল কী বলে কথাটা। এই তো এতকাল দেখছে ওকে। পীরিত করার ইচ্ছা থাকলে এতদিন দুপায়ে জড়ো করতে পারত বাঘা বাঘা পুরুষকে।...সুরবালা মনে মনে গজরাতে থাকে।...

বিকেলের দিকে আর থাকতে না পেরে একখানা পাল্‌কী ডাকিয়ে সত্যি সত্যিই শশীবৌদিদের বাড়ি গেল—কিন্তু গিয়ে দেখল তাঁদের ঘরে তালা বন্ধ। নিচের তলার ভাড়াটেদের কাছে শুনল, মেয়ের কল্যাণে বৌদি তারকেশ্বরে গেছেন ধন্না দিতে। অগত্যা ফিরে আসতে হ'ল তখনই—অনালোচিত সেই বিশেষ প্রসঙ্গের গুরুভার বুকে নিয়ে। তবে আজ মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, চিন্তাটা অন্তর্মুখী হতে পেরেছে বলেই শান্তি। বুঝেছে এসব কথা নিজে নিজে ভাবায় অনেক সুখ। যারা বুঝবে না, অনধিকারী—তাদের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। সেই কারণেই নানুকেও আর ডাকতে পাঠাল না। আগে ভেবেছিল একবার ডাকতে পাঠাবে—কিন্তু সেও হয়ত উল্‌টো বুঝত, ঠাট্টা-তামাশা করত, পাঁচ জায়গায় বলে বেড়াত। মাগো, যদি এসব ঠাট্টা রাজাবাবুর কানে ওঠে! ভাবতেই শরীরে কেমন ক'রে ওঠে।

সেদিন রাত্রেও রাজাবাবুকে স্বপ্ন দেখল সুরবালা। কী সব এলোমেলো স্বপ্ন—সব মনেও রইল না সকাল পর্যন্ত। কিন্তু সেই আসর আর সেই মানুষটাকে যে বার বার দেখেছে—এটা মনে আছে। এখন যেন লোকটার মুখচোখ আর তেমন পরিষ্কার ভাবতে পারছে না—তবু আদলটা ঠিক আছে।

সেদিনও সকালে গান ছিল এক জায়গায়। ভোর থেকে উঠে আর বিশেষ কিছু ভাববার সময় পায় নি। কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি গান শেষ ক'রে বেলা দেড়টার মধ্যে বাড়ি ফিরে এল। তারপর খেয়েদেয়ে মাদুর পেতে ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ভাবতে শুরু করল পরশুর কথাটা। দুর ছাই, এত কি ভাববারই বা আছে। সত্যিই তো, সে যেন একটু বাড়াবাড়িই করছে। লোকে যদি পাগল বলে দোষ দেবার কিছু নেই। এক আধবুড়ো মিন্‌সে টাকা না দিয়ে একগাছা হার পেলা দিয়েছে—এই তো!

না, তা নয় অবশ্য। সব দিক দিয়েই—। এই তো আজকের এরা, বামুন-বাড়ি, এরাও যেন কোথাকার জমিদার। যেমন বাড়ি, তেমনি বিশ্রী ক'রে সাজিয়েছে! হোকগে শ্রাদ্ধ-বাড়ি, তবু কত তো শ্রাদ্ধ-বাড়িও কেমন সুন্দর ক'রে সাজায়! ওরই মধ্যে আর একটু ভাল ব্যবস্থা করলে কি এমন খরচা বেশী হ'ত!...এই প্রসঙ্গেই আবার রাজাবাবুর আসর-সজ্জা এবং শেষ পর্যন্ত কখন মানুষটার চিন্তায় চলে যায় যে—টেরও পায় না। নির্জনে নিভৃতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগল আজ। ভাবতে ভাবতে উদ্বেলিত আবেগে যেন অকস্মাৎ ঘেমে নেয়ে উঠল। এবার মনের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে আর একটিবার অন্তত দেখতে চায় তাঁকে। কেন? সত্যিই কি তাঁর প্রেমে পড়ল? দুর! তা কেন, এমনি। এমনি কি কোন মানুষকে দেখতে ইচ্ছে করে না? খুব ইচ্ছে করছে, সত্যি। মতি বলেছে, এবার রাজাবাবুর গাড়ি এসে তার দোরে দাঁড়াতে শুরু করবে। রোজ রোজ দাঁড়াবার দরকার নেই, তবে একবার এসে দাঁড়ালে খুশী হ'ত সে। আর একদিন যদি মুজরো পেত ওখানে—! এবার আর লজ্জা করত না—ভাল ক'রে চেয়ে দেখত, দুটো কথাও কয়ে নিত কোন ছুতোয়...

আচ্ছা, এমন তো কত লোকের কত কথা ফলে যায়, হঠাৎই ফলে যায়। বাবা বলতেন, 'ক্ষ্যাণে কথা জাগে'। শিব নাকি মধ্যে মধ্যে 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' বলে ওঠেন, সেই ক্ষণটিতে

যে যা বলে ঠিক ফলে যায়। মতির কথাটা যদি ফলে তো মন্দ হয় না।...

ভাবতে ভাবতে কখন—ঠিক ঘুম নয়—মা যাকে বলে 'আবিল্যি' অর্থাৎ একটু আচ্ছন্ন ভাব এসেছে, টের পায় নি। হঠাৎ ঝি এসে গা ঠেলতে একেবারে খেয়াল হ'ল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। শুনল, ঝি যেন বলছে, 'দিদি, কী যেন আইরিটোলা না কি যেন বাপু বললে, সেখানকার রাজবাড়ি থেকে পেল্লায় এক গাড়িতে চেপে ভদ্দরলোক এসেছেন। সইস বলছে রাজাবাবু। রাজাবাবু নিজে এসেছেন নাকি তোমার সঙ্গে দেখা করতে! মা ডেকে দিতে বললে তোমাকে। আর জিগ্যেস করতে বললে, ওপরের ঘরে এনে কি তেনাকে বসানো হবে?'

মতি যখন কথাগুলো বলছিল, কে জানে সেই ক্ষণেই ঠিক শিব 'স্বস্তি' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন কিনা!

সেই আচ্ছন্ন, কাঁচা ঘুমে অবশ চৈতন্যের মধ্যেও এই কথাটাই প্রথম মনে পড়ল সুরবালার।

॥ ১৮ ॥

কথাটা শুনতে, বুঝতে—সর্বোপরি বিশ্বাস করতে আর খানিকটা সময় লাগল সুরবালার। প্রথমটা তো শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল ঝিয়ের মুখের দিকে। অসমাপ্ত নিদ্রার বিহ্বলতা তো আছেই, ঝিয়ের মুখে যে বার্তা শুনছে বলে ওর ধারণা—তার আকস্মিকতা ও অবিশ্বাস্যতাও কম বিহ্বলকর নয়। মানুষ যখন দুর্লভ কোন বস্তু প্রাপ্তির কল্পনা করে—ভাবে এটা পেলে ভাল হ'ত, আমি তাহলে অমুক করতুম ইত্যাদি —তখন তা সুদূর দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য জেনেই করে। সেটা পেলেও সহজে পাবে না— এটুকু জানা থাকে বলেই তাকে ঘিরে এত কল্পনা, এত আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং সেটা সেই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হাতে এসে গেলে চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চায় না! সুরবালারও সেই অবস্থা। কি শুনছে তা বুঝতেও যেমন দেরি হচ্ছে, বিশ্বাস করতেও। অথচ আর একবার প্রশ্ন করতেও যেন সাহস হচ্ছে না—পাছে এবার অন্য কথা শোনে।

ঝিয়ের এত কথা জানা বা বোঝার অবস্থা নয়, সে একটু অসহিষ্ণুভাবেই প্রশ্ন করল, 'তা কি বলব তেনাকে? ওপরে এনে বসাবো? দেখা করবে নাকি বলো বাবু। অতবড় একটা মান্যিবর লোক গাড়িতে বসে আছে ঠায়! মা জিজ্ঞেস করতে বলল।'

'কে, কে এসেছে বললি?' অতিকষ্টে সুরবালা যেন স্বর খুঁজে পায় গলায়।

'ঐ তো বনন্ু বাপু।' ঝি এবার বিরক্ত হয়, 'কী একটা যেন জায়গা বললে, আইরি-টোলা না কি, সেখানকার রাজাবাবু। তুমি সেখানে গেছলে নাকি গাওনা করতে, তেনাকে চেনো—সইস বললে।'

'ওমা, তা অত বড় একটা লোক এসেছেন, বসাবি কিনা জিজ্ঞেস করছিস?...বায়না দিতে যাঁরা আসেন তাঁদের সবাইকেই তো বসানো হয়। এ তো পুরনো ঘর! মার আক্কেল হ'ল কি, এখনও তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছে! যা ওপরে এনে বসাগে যা।।...আর কী কালো কাপড় পরে থাকিস দামিনী! হপ্তায় একদিন ক'রে ক্ষার ফুটিয়ে নিতে পারিস

না? এই চেহারায় গিয়ে দাঁড়াবি—কী মনে করবেন ওঁরা বল তো!'

ঝি একটু অবাকই হয়ে যায়। এতকালের মধ্যে—এত লোক এসেছে গেছে—কৈ, তার কাপড়ের কথা তো মনে হয় নি দিদির!...অবিশ্যি, মনকে বোঝায়,—আসে তো বাবুদের লোকই, বড় বড় বাবু, এমন রাজারাজড়ারা নিজে আসে না এটা ঠিক।

তন্দ্রার জড়তা কেটে গেছে কিন্তু তার জায়গায় নতুন এক জড়তা বিহ্বলতা পেয়ে বসেছে যেন। এর আগে বহু লোকই এসেছে বায়না দিতে, সব ক্ষেত্রেই যে ম্যানেজার কি সরকার আসে তা নয়—বাবুরাও আসেন মধ্যে মধ্যে—কিন্তু আর কখনও তো সুরোর এমন অবস্থা হয় নি। এ কি অসময়ে কাঁচা ঘুম ভাঙার জন্যেই? বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, এত বুক ধড়ফড় করছে যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এক এক সময়। আর ঘাম, এত ঘাম কোথা থেকে আসছে কে জানে! ঝি এসে খবর দেওয়ার পর এই চার-পাঁচ মিনিটে যেন স্নান ক'রে উঠল।

অত বড় 'মান্যিবর' লোক বসে আছেন—কথাটা ঠিকই। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি করতে যায়—ততই যেন দেরি হয় আরও। মনে হ'ল একবার কলতলায় চলে গিয়ে মুখ-হাতটা একটু ধুয়ে নেয়। সংগে সংগেই মনে হ'ল—কলতলায় যেতে গেলে ঐ পাশের ঘরের সামনে দিয়েই নেমে যেতে হবে। পুরো সামনে না হলেও—কোণ থেকে দেখা যায়। দামিনীকে কতবার বলে দিয়েছে, কেউ এসে বসলে—বাবুভাইরা—সংগে সংগে দরজা ভেজিয়ে দেবে, আজও সেটা মুখস্থ হ'ল না ওর!

এমনিই—কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে মুখে চোখে একটু দিয়ে—ঢকঢক ক'রে খেয়ে নিল খানিকটা, তারপর মুখখানা গামছায় খুব ঘষে মুছে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ইচ্ছা—একটু প্রসাধন ক'রে যায়। মতি আর নানুর দৌলতে নানান বিলাসদ্রব্য জড়োও হয়েছে আজকাল। ব্যবহারও যে করতে জানে না, তাও নয়—কিন্তু এখন কতটুকু করবে, কোন্‌টা মাখবে কিছুই যেন মাথাতে গেল না। হাত-পাও কাঁপছে থরথর করে—পারতও না মাখতে, শিশিতে হাত দিতে গেলে হাত থেকে পড়ে বোধ হয় ভেঙে যেত।

কিছুই করা হ'ল না—শাড়িখানা পালটানো ছাড়া। তাও যেসব শাড়ি ধোপা-বৌ কুচিয়ে দিয়ে গেছে—তার একটাও যেন এখন পছন্দ হ'ল না। নতুন-পাওনা একখানা আড়ং-ধোলাই শাড়ি পাট ভেঙে হাতকুচনো ক'রে পরে—পরা বলা ভুল—কোনমতে জড়িয়ে এক সময় সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুকের রক্তস্রোত আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঘামের নোনা-জল লেগে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, হাত পা আরও বেশী কাঁপছে। তবু, উপায়ও আর নেই। আর বেশীক্ষণ ওঁকে বসিয়ে রাখলে অপমান করার সামিল হবে। ইস—আর কেউ যদি থাকত, একটা কোন তৃতীয় ব্যক্তি! নানু এমন কি রঘুবাবুও যদি এসে পড়ত। গণেশের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়ছে তার, বলিয়ে-কইয়ে ছেলে, সে থাকলে এতক্ষণে জমিয়ে নিতে পারত।

ওর সে দুরবস্থা রাজাবাবু লক্ষ্য করলেন কিনা কে জানে, তাঁর ব্যবহারে কিছু বোঝা গেল না। ব্রাহ্মণের মেয়ে সে, হাত তুলে নমস্কার করা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে হাতটা তুলতে গিয়েও যে নামিয়ে নিল সুরো, তাও বোধহয় বুঝতে পারলেন না অত, (মনে মনে ঠাকুরকে ডাকছিল সুরো, বুঝতে যাতে না পেরে থাকেন) স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধু বললেন, 'এসো, বসো। না না, লজ্জার কোন কারণ নেই, ঐখানেই না হয় বসো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি এসেছি দুটো কাজের কথা বলব বলে, ঠিক দু' মিনিটেই চলে যাচ্ছি না। বসো।...ইস, তোমার পা যে কাঁপছে দেখছি। শরীর-টরীর খারাপ করে নি তো?'...

ওরে হতভাগী, এই তো তোর সেই বহু-ঈপ্সিত সুযোগ, চোখ তুলে ভাল ক'রে দেখার, দুটো কথা বলার! এ তোর হ'ল কি?—নিজেকেই নিজে গাল দেয় সে! কিন্তু, তবু কিছুতেই মুখটা তুলতে পারে না। কোনমতে সেইখানে মাটিতেই বসে পড়ে, না

বসে উপায় ছিল না বলেই বসতে হয়। পা দুটো অবশ হয়ে আসছিল ক্রমশ, দাঁড়াবার মতো এতটুকু শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না।

'আহা-হা, মেঝেতেই বসলে! মাদুরটা টেনে নিয়ে তো—'

সুরবালা এবার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। অস্ফুট একটা শব্দ শুধু বেরোয় মুখ দিয়ে। কোনমতে ঘাড় নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে সে বেশ বসেছে, তার জন্যে চিন্তা কি উদ্বেগের কোন কারণ নেই। নিজের ব্যাপার দেখে ওর মধ্যেই একটু হাসিও পায় তার ; সে যেন কনে-দেখা দিতে বসেছে। এত রাজ্যের লজ্জা আর সংকোচ কোথা থেকে এসে জড়ো হ'ল আজ তার দেহে, তাকে পেয়ে বসল। আজ তাকে এই অবস্থায় দেখলে মতি আর রঘু দুজনেই চমকে উঠত। কে বলবে যে এই লোকই কেউ বায়না দিতে এলে অমন নির্লজ্জের মতো দর-কষাকষি করে।

হয়ত এতক্ষণে ওর এই বেপথুমানা অবস্থা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন রাজাবাবু, তিনি ওর তরফ থেকে কোন কুশল প্রশ্ন বা কোন সাদর সম্ভাষণের অপেক্ষাও রাখলেন না। নিজেই কথা শুরু করলেন, 'তার পর? সেদিন কোন অসুবিধে হয় নি তো? অত বেলায় ফিরলে—চান-খাওয়া সব অনিয়ম হয়ে গেল, শরীর-টরীর খারাপ হয় নি তো?'

এবার সুরবালা কথা খুঁজে পেল, বলল—অবশ্য সেই করুণাপ্রার্থিণী নবীনা পাত্রীর মতো নতমস্তকে এবং জড়িত কণ্ঠেই, 'না, ও আমাদের অব্যেস আছে। প্রায়ই তো সকালে গাইতে হয়!'

'হ্যাঁ, তা হয়। তবে সেদিন একটু বেশী দেরি হয়ে গিয়েছিল তো—!'

'সবদিন তো সমান গান হয় না, অত সময় হিসেব ক'রেও গাওয়া যায় না। যেদিন মন লেগে যায় সেদিন দেরি হয়ে পড়ে। আসর ভাল দেখলে ভাল ক'রে বেশীক্ষণ ধরে গাইতে ইচ্ছে করে!'

'আমাদের আসর তাহলে সেদিন ভাল লেগেছিল তোমার?'

কী মিষ্টি গলা, আর কী মিষ্টি কথাবার্তা!—সুরো মনে মনে বলে। কে বলবে এত বড় লোক। মাসী আর মাকে ডেকে এনে শোনাতে ইচ্ছে করে। কেন যে তার অত ভাল লেগেছিল, এখন এসে এ'র কথা শুনলে বুঝতে পারত!

মুখে বলল, 'খুব। খুব ভালো লেগেছিল। অনেকদিন অত লোকও পাই নি। আর খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল।'

'আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজাই।' হেসে বললেন রাজাবাবু, 'ও শখ আমারই। লোক-জনের ওপর ছেড়ে দিলে চলে না।...যাক, তবু যে তোমার ভাল লেগেছিল—শুনেও তৃপ্তি। কেউ তো অত লক্ষ্যও করে না বোধহয়।'

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকায় সুরো। এ'র প্রশ্রয়স্নিগ্ধ কণ্ঠে ও ভাষায় যেন মনে মনে কোথায় আশ্রয়লাভ করে একটা। তাকায়, তবে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, প্রাণ-ভরে দেখা হয় না—তখনই আবার চোখ নেমে আসে লজ্জায় ও সংকোচে।

সেই মুখ, সেই বেশ। সেদিন যা দেখেছিল। কিছুই এমন 'আহা-মরি' করার মতো নয়। এর আগে এই রকম বেশভূষা নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাশা করেছে সে অপরের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজ মনে হ'ল চোখ জুড়িয়ে গেল তার। সে মুখের দিকে সেই ক্ষণিকের জন্যে চেয়েই যেন বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল আবার, আরও প্রবলধারায় ঘাম ঝরতে লাগল কণ্ঠ-কপোল-ললাট বেয়ে।

'ইস্—কী ঘামছ তুমি! পাখা—ও, টানাপাখা তো নেই। একখানা হাতপাখা পেলেও তো হ'ত।'

কথাটা ভুল বুঝল সুরবালা। টানাপাখার বাতাসে অভ্যস্ত এ'রা, গরীবের এই ছোট ঘরে বসে অস্বস্তি হবারই কথা। বিপন্নভাবে এদিক ওদিক চেয়ে সে একটা বাঁধানো

ছবির পেছন থেকে একখানা হাত-পাখা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাতাস করতে গেল ওঁকে—কিন্তু অবাধ্য হাতে পাখা কেঁপে প্রথমেই ঠক ক'রে লাগল ওঁর গায়ে।

চোখের নিমেষে পাখাখানা ওর প্রায়-শিথিল হাত থেকে টেনে নিলেন রাজাবাবু, নিজেই ওকে জোরে জোরে বাতাস করলেন খানিকটা। বাতাস করতে করতেই বললেন, 'আরে না না, আমি নিজের জন্যে বলি নি। পাখাটা তোমারই দরকার। তুমি যে নেয়ে উঠলে একেবারে।...বাবা, তোমার হাতও তো কাঁপছে দেখতে পাই—থরথর ক'রে।...এ কি আমার জন্যে? হরি হরি।...আমাকে দেখে কি খুব ভয় করছে তোমার? আমার চেহারা কি এমনই ভয়ানক! না কি মনে করলে আমি তোমার গানের নিন্দে করতে এসেছি? ...এ তো তোমাকে খুব কষ্ট দিলুম দেখছি। এমন অবস্থায় পড়বে জানলে আসতুম না কখ্খনো!'

ঐ পাখা ওঁর হাত থেকে জোর ক'রে কেড়ে নেওয়াই শোভন। উনি বাতাস করবেন আর সে আরাম করবে—ওর দিক থেকে এ অসহ বেয়াদবি একটা। বামুনের মেয়ে হ'লেও বেয়াদবি। ঐ পাখা নিয়ে ওঁকে বাতাস করাই উচিত। উনি অতিথি এবং বিশেষ মাননীয় অতিথি। ওঁকে বুঝিয়ে বলাও উচিত যে, বিপদে তিনি কিছুমাত্র ফেলেন নি। এ কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ, আশাতীত সৌভাগ্যেরই অঙ্গীভূত। অনেক প্রার্থনার বস্তু—অবিশ্বাস্যভাবে অযাচিতভাবে পাওয়ারই প্রতিক্রিয়া এটা। অপ্রত্যাশিত সুখেরও একটা সংঘাত আছে—ওর এ বিহ্বলতা সেই আঘাতেরই ফল। উনি যেন কিছু মনে না করেন, এ ওঁরই প্রশস্তি বা পুজো বলে গ্রহণ ক'রে ওকে যেন ক্ষমা করেন।

বলা উচিত ছিল এসব—কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না। আরও সঙ্কোচ, আরও লজ্জা এসে যেন অনড় নীরব ক'রে দিল তাকে সেই মুহূর্তে।

রাজাবাবুও হয়ত বুঝলেন। হয়ত বুঝেই খুশী হলেন। হয়ত পেশাদার গায়িকার মধ্যে নবীনা কিশোরীর এই ব্রীড়ানম্র ভাবটি দেখবেন বলে তিনিও আশা করেন নি। আরও মুগ্ধ হলেন। আশ্বস্ত হলেন কিছুটা। রত্ন চিনতে ভুল করেন নি বলে গর্বিতও বোধ করলেন। আর—আর হয়ত, আশান্বিতও হলেন খানিকটা।...বহুদর্শী লোক তিনি, বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। মানুষ চিনতেও যেমন ভুল হয় না—তাদের ভাবভঙ্গীও না। বুঝলেন একেবারে পাথরে মাথা ঠুকতে তিনি আসেন নি।

আরও কোমল, আরও স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'শোন, তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি, আমি না গেলে তোমার এ অসোয়াস্তি ঘুচবে না। কাজের কথা যেটা, সেরে নিই।'

এই বলে তবু থামলেন একবার। যেন একটা উত্তর প্রত্যাশা করলেন এ তরফ থেকে। উত্তর দেবার জন্য যে ব্যাকুল হয়ে উঠল সুরবালা তাও লক্ষ্য করলেন। তখন সেই ভাষা-হীন আকুলতাই অনুকূল মনোভাব বলে ধরে নিয়ে বললেন, 'আমি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছি কিন্তু। আমাকে পাগল-টাগল ঠাউরো না, বাপু। উদ্ভট কথা বলেই নিজে এসেছি বলতে—এসব কথা সরকার কি ম্যানেজারকে দিয়ে হয় না!'

এই বলে আবারও চুপ করলেন। হাসলেন একটু। কেমন একরকম অপ্রতিভের হাসি। সোজাসুজি মুখ তুলে চাইতে না পারুক—এবার সুরবালা একটু অপাঙ্গে চেয়ে দেখতে পাচ্ছে। দেখছেও। সে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল ওঁর এই ঈষৎ অপ্রতিভ হাসি দেখে। কী এমন কথা যে বলতে উনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন!...আশঙ্কাটা কোন আকার না নিলেও কেমন যেন পরিচিত বোধ হ'ল, মনের অবচেতনেই। সামান্য একটু শিউরে কেঁপে উঠল সে।

তবে বেশীক্ষণ সংশয় বা শঙ্কার মধ্যে রাখলেন না রাজাবাবু, একটু কেশে কণ্ঠের আপাত-অনুপস্থিত জড়তা কাটিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার সেদিনের গান আমার খুব

ভাল লেগেছিল। সত্যিই বলছি। তোমার আগে দুদিন বাঘা বাঘা গাইয়ে গাইল বটে—তবে তারা যেন মনে হ'ল কলের মতো গেয়ে গেল—পয়সা নিয়ে গাইলে যেমন হয় তেমনিই। গান খারাপ হয়েছিল বলব না, ভুল-ত্রুটিও কিছু হয় নি—সেদিক দিয়ে নিখুঁত—কিন্তু ঠিক যেন আমার মন ভরে নি। তোমার গানে আমার মন ভরেছে। যেটা চাইছিলুম সেইটেই পেয়েছি। মানে তোমার গলাই শুধু গায় নি—মনে হ'ল তোমার মনও গাইছে।... আমার কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। আমরা সাত পুরুষে বৈষ্ণব, বাড়িতে বিগ্রহ আছেন, ঠাকুর্দা মশাই আর তাঁর বাবা, কর্তাবাবা বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ঠাকুরবাড়ি ক'রে দিয়ে গেছেন। আমার নামও রাধিকাপ্রসাদ, রাধিকাপ্রসাদ রায়। কে পয়সার জন্যে গাইছে আর কার প্রাণে এ রস আছে কিছুটা—আমরা শুনলেই বুঝতে পারি। তোমার ওপর রাধারাণীর কৃপা আছে, নইলে এ বয়সে গাইতে গাইতে চোখে জল আসে না, তোমার মতো ভাবে বিভোর হয়েও যায় না।'

বলতে বলতে থামলেন আর একবার। নিজের প্রশংসা—যেটা ওর প্রাপ্য মনে করে সুরবালা, ওর যা নিজেরও বিশ্বাস—শুনতে শুনতে কখন সঙ্কোচ একটু কেটেছে, লজ্জা কিছু ভেঙেছে, সেও এবার চোখ তুলে চেয়েছে। চেয়ে আছে। দুই চোখ দিয়ে আর দুই কান দিয়ে যেন পান করছে—এই দুদিনের অহোরাত্র স্বপ্নদেখা মানুষটার মুখ দিয়ে বেরুনো প্রশংসার সুধা ; তন্ময় হয়ে শুনছে বলেই কখন দুই চোখে দুই চোখ মিলেছে তা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারল যখন রাজাবাবুর দৃষ্টিতে মুগ্ধতা ফুটে উঠতে দেখল, বুঝল ওকে দেখতে দেখতে দৃষ্টি স্থির গেছে বলেই কথাটা বন্ধ হয়েছে। সে আরও লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল আবার।

আর তাইতেই চমক ভাঙল রাজাবাবুরও। তিনিও এবার লজ্জিত বোধ করলেন, সুরোর মুখের গভীর রক্তাভা তাঁর মুখেও রক্তোচ্ছ্বাসের কারণ ঘটাল। একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যেন কোন বিপুল হৃদয়াবেগ দমন ক'রে নিলেন। তারপর বললেন, 'তাই আমার ইচ্ছে তোমার কীর্তন গান আরও শুনি। তা রোজ তো আর বাড়িতে গান দেওয়া সম্ভব নয়—তেমন কোন ক্রিয়াকর্মের অজুহাত থাকলেও না হয় কথা ছিল। কিছুই তো দেখছি না সে রকম। খামকা একটা আসর ক'রে তো আর কীর্তন দেওয়া যায় না—লোকে বলবে কি, আমিই বা বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের কি বলব?...তার চেয়ে আমি বলি কি, আমি যদি মধ্যে মধ্যে এক-আধদিন তোমার বাড়িতে এসে—তোমার সময়মতো অবশ্য—দু-একখানা গান শুনে যাই—ক্ষতি কি? যেদিন তোমার বাইরে কোথাও বায়না থাকবে না আমি আগে জেনে যাবো—আমারও বিকেলে বা সকালে যেদিন অবসর থাকবে—চট ক'রে এসে একখানা কি দুখানা পদ শুনে যাবো—এ্যাঁ? আধ ঘণ্টার বেশী থাকব না, তোমাকে সেজন্যে বিব্রত হতে হবে না। বলি রেওয়াজও তো করতে হয় তোমাদের শুনেছি, তাই কেন ধরে নাও না!'

প্রস্তাবটা অভাবনীয় শুধু নয়—এমনই অপ্রত্যাশিত যে সুরবালা ক্ষণিকের জন্যে তার লজ্জা সঙ্কোচ সব ভুলে গেল। বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল প্রস্তাবকারীর দিকে। পুরোপুরি কথাটাও সে ধরতে পারে নি তখনও পর্যন্ত—ঠিক কি উনি বোঝাতে চাইছেন। এ কি সবই বিনা পয়সায় সারতে চান নাকি?

তার সেই ভ্রুকুটি ও বিস্মিত চাহনির অর্থ বুঝতে দেরি হ'ল না রাজাবাবুর। তিনি তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'আমি এমনি মেহনৎ করাব না তোমাকে দিয়ে—আমি, ধরো যেদিন গান শুনতে আসব—পঁচিশ টাকা ক'রে দিয়ে যাবো? কম হবে?'

ব্যবসার কথায়, নিজের বৃত্তির প্রসঙ্গে সুরবালা যেন তার স্বরূপে ফিরে আসে খানিকটা। বলে, 'আমার এখানে আসর বসাবার জায়গা কোথায়? অতগুলো বাজনদার দোয়ার বসাবারই তো জায়গা নেই। সেই জন্যে যা রোজ আমায় মাতিমাসীর কাছে দৌড়তে

হয় রেওয়াজ করতে।'

'উঁহু, উঁহু—দোয়ার বাজনদার কিছু চাই না, কারুর থাকবার দরকার নেই। আমি শুধু তোমার গান শুনব—খালি গলার গান—একখানা কি বড়জোর দুখানা! দোয়ার-বাজনদারদের দিয়ে থুয়ে কি আর ঐ টাকায় গান হয়? সেটুকু জ্ঞান আমার আছে।...না না, শুধু তুমি যা পারো তাই। আর কারও গলা এর মধ্যে শুনতে চাই না আমি। দ্যাখো ভেবে দ্যাখো—যদি খুব কম মনে করো আরও পাঁচ সাত টাকা বেশী দিতে রাজী আছি। কদিনই বা হবে, তোমার আর আমার দুজনেরই অবসর মেলা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। হপ্তায় এক দিন হয় কিনা সন্দেহ—এতে আর আপত্তিরই বা কি আছে?'

'ওমা, বাজনা নেই, দোয়ার নেই—খালি গলায় কি গান হবে?'

'খুব হবে। যা হয় তাই আমার ভাল। বলি গুনগুনিয়ে তো গাও মধ্যে মধ্যে—সেই-ভাবেই গেও। তার চেয়ে বেশী কারদানি আমি চাই না। বলেছি তো, আমি চাই মনের গান—যন্তরের গানে রুচি নেই আমার।'

সুরো বিপন্ন মুখে চুপ ক'রে বসে থাকে। এ প্রস্তাব এতই অভিনব, এত উদ্ভট যে, এ সম্পর্কে কোন উত্তর তাড়াতাড়ি মাথাতে আসার কথাও না। এতক্ষণ অন্য যা-ই ভেবে থাক অসময়ে ওঁর আগমন নিয়ে—এমন একটা প্রস্তাব উঠবে, উঠতে পারে, তা কখনও ভাবে নি। তাই কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তার আগে মনের মধ্যে—এই প্রস্তাবের আড়ালে কী কথা থাকতে পারে, কোন্ অভিসন্ধি—তাই খুঁজে বেড়ায় সে।

রাজাবাবু খানিকটা অপেক্ষা ক'রে থেকে নিজেই বুদ্ধি দেন, 'তোমার অভিভাবক কে? মা আছেন শুনেছি না? তাঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে দ্যাখো না।'

সুরো যেন অগাধ সমুদ্রে কূলের আভাস দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে ভেতরে আসে।

নিস্তারিণী আড়াল থেকে কতক কতক শুনেছে। আগেকার কথাগুলো না হোক, আসল প্রস্তাবটা গোড়া থেকেই শুনেছে। কিন্তু কি বলা উচিত তা ভেবে ঠিক করতে পারে নি সেও। এখন সুরবালার মুখেও শুনল আর একবার। তাতেও কোন সুবিধা হ'ল না। বিপন্ন মুখে মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। সুরবালা যদি এতটুকু আগ্রহ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করত তাহ'লেই বিরূপ হয়ে উঠত সে—জোর করে নিষেধ করত। সুরবালা কতকটা নির্বিকার। তার মানে সেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ প্রস্তাবের কতদূর কী অর্থ, এর কি সুদূরপ্রসারী ফলাফল সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। যে চাইছে তাকে কোন কিছুতেই বিমুখ করার কথা যেন ভাবা যায় না, অথচ যা চাইছে তা একেবারেই অচিন্তিতপূর্ব; এমন কেউ কখনো প্রস্তাব করে নি, কেউ করতে পারে তাও জানা ছিল না। একটা অজ্ঞাত সম্ভাবনার দুশ্চিন্তায় মন শঙ্কিত হচ্ছে—অথচ পরক্ষণেই এও মনে হচ্ছে যে 'না' বললে এর পর আপসোস করতে হবে না তো?

'কী বলব বলো!' একটু পরে অসহিষ্ণু সুরবালা প্রশ্ন করে।

'তাই তো, কি বলবো বলো বাছা! এ আবার কি উৎপরীক্ষে শখ তাও তো জানি না।...তা আজই বলতে হবে? দুদিন সময় নে না। কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে দ্যাখ না একটু—জবাব দেবার আগে।'

'সে কখনও হয়। উনি নিজে এসেছেন—এত বড় একটা মানী লোক! ওঁকে কি আর ভেবে জবাব দেব বলে পাঁচ দিন ঘোরানো যায়। আর জিজ্ঞাসা কাকে করব বলো, যাকে বলতে যাবো সে-ই উলটো মানে ক'রে পাঁচ রকম ব্যাখ্যানা করবে।...তার চেয়ে না-ই বলে দিই বরং।'

'না বলবি?' নিস্তারিণী সঙ্গে সঙ্গে যেন 'হ্যাঁ'র দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে, 'ভেবে দ্যাখ বাপু ভাল ক'রে, এর পর আমাকে দোষ দিস নি। আধ ঘণ্টা গান গেয়ে পঁচিশটে

টাকা রোজগার—বড় চাট্টিখানি কথা নয়। একটা কেরানীর পুরো মাসের মাইনে!'

'কিন্তু লোকে যদি পাঁচ রকম বদনাম দেয়?' সুরবালা সংশয়-কণ্টকিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে। আসলে ভয় তার দুদিকেই। এ যেন উভয়-সংকট। যদি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর হয়ত জীবনে ও মানুষটার সংগে দেখাই হবে না। কী এমন কারণটাই বা ঘটবে দেখা হওয়ার! এক কোন পালেপার্বণে গানের ডাক পড়তে পারে। কিন্তু আজ অপমানিত হয়ে ফিরে গেলে কি আর তাকে ডাকবেন কোন দিন?

'তা অবিশ্যি দিতে পারে।' নিস্তারিণী সায় দেয়, 'যা সব হিতেকাঙ্ক্ষী সুরিং সব! তা এক কাজ কর্ না। বলছে তো আধ ঘণ্টা। তা বল না যে যেদিন আপনি গান শুনতে আসবেন সেদিন কিন্তু মাও উপস্থিত থাকবে, মার সামনে গাইব। একা গাইব না। তাতে রাজী থাকেন তো দেখুন।'

সুরবালা সংগে সংগে খুশী হয়ে ওঠে।

মা যে এমন চমৎকার একটা বুদ্ধি বাতলাবে—তা ভাবতেও পারে নি। এই বোধহয় প্রথম দেখল, মা বুদ্ধিমতীর মতো একটা প্রস্তাব করেছে। এ-কথা তার মাথাতে যেত না—হাজার ভাবলেও। আর মা গিয়ে আধ ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে রাজী হবে, এও ভাবতে পারত না।

সমাধানটা ওর কাছে যতই সমীচীন ও সহজ মনে হোক—রাজাবাবু কী ভাবে নেবেন—সে বিষয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আবার একটা নতুন সংশয় দেখা দিল। এ এক রকমের—একটা বিশেষ দিকে বিষম অবিশ্বাস প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে উনি অপমানিত বোধ করেন যদি?...বলতে গিয়েও যেন কথাটা মুখে আটকে যায়। অথচ, এ ছাড়া অন্য কী উপায়ই বা আছে, সোজাসুজি 'না' বলা ছাড়া!...

কে জানে ওর সেই লজ্জারক্তিম দ্বিধাগ্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে, ইতস্তত বিপন্ন ভঙ্গীতে কি বুঝলেন রাজাবাবু। তিনি নিজেই কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। বললেন, 'ওহো, দ্যাখো, একটা কথা বলা হয় নি তোমাকে। বলছিলুম দোয়ার বাজনদারে দরকার নেই—কিন্তু তাছাড়া যদি মনে করো যে আমি যে সময় গান শুনতে আসব সে সময় অন্য কাউকে—মা কি তোমার দিদি কিম্বা কোন বোনটোনকে ডাকতে চাও কি গানের সময় পাশে রাখতে চাও—অনায়াসে রাখতে পারো। মানে যদি মনে করো যে, তাতে তোমার কোন সাহায্য কি সুবিধে হবে। সে ছাড়াও—আমার জন্যে তোমার একটা মিথ্যে বদনাম হয়, তাও আমি চাই না।'

সুরবালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। বলে, 'বেশ, সেই ভাল তা'হলে। বোন কি দিদি আমার নেই, মা-ই থাকবেন। মাও সেই কথাই বলছিলেন।'

'খুব ভাল কথা। তাহলে তো কথাই নেই। তা এর মধ্যে কবে তোমার সুবিধে হ'তে পারে বলো।'

একটু ভেবে নিয়ে সুরবালা বলে, 'পরশু দিন এমনি সময়ে আসতে পারেন। সে দিনও সকালে আমার গান আছে। বিকেলে মাসীর বাড়ি যাবার কথা—মানে সাধারণত যাই আমি, তা সেদিন না গেলেও চলবে।'

'পরশুই আসব তাহলে।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে বলেন, 'কিছু টাকা রাখবে নাকি—আগাম? শ'খানেক? আগাম না ধরে মর্যেদাও ধরে নিতে পারো—'

এইবার, এই প্রথম সুরবালা তার অভ্যস্ত এলাকা খুঁজে পায়, দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'গান না গেয়ে টাকা আমি নিতে পারব না। অমন টাকা নিলে আজ আর মুজরো করার দরকার হ'ত না।'

তার সেই দৃপ্ত ভঙ্গী ও প্রদীপ্ত কণ্ঠে কী বুঝলেন কে জানে রাজাবাবু, বেশ বিনত-

ভাবেই বললেন, 'আমি কিন্তু সে ভাবে বলি নি। কিছু মনে ক'রো না লক্ষ্মীটি।...আমি গুণীর মর্যাদা হিসেবেই দিতে চেয়েছিলুম সত্যি-সত্যিই।...আচ্ছা, আসি।'

তিনি ধীর গম্ভীর পদক্ষেপেই বেরিয়ে চলে গেলেন।

সুরবালার মনে হ'তে লাগল—একটু বেশী বলা হয়ে গেল না তো? কিছু মনে করলেন না তো—অত বড় লোকটা? আবার ভাবল, 'ভালই হয়েছে, আমি যে ভিখিরী কি লুভী নই, ঠিক টাকার জন্যে রাজী হই নি—বুঝুক কতকটা।'

ঐটুকু গলিতে অত বড় গাড়ি যদি প্রায় একদিন-দুদিন অন্তরই এসে ঘণ্টাখানেক ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহ'লে একটু জানাজানি হয় বৈকি। তবু রাজাবাবু তাঁর পাল্কী গাড়ী আর ওয়েলার জুড়ি ছেড়ে ব্রুহাম ধরেছিলেন, কিন্তু সে ব্রুহামও সাধারণ গাড়ির থেকে বড় হবে—এ তো জানা কথাই। তা ছাড়া, খুব সাধারণ গাড়ি হ'লেও একই গাড়ি যদি এক বিশেষ বাড়ির সামনে প্রত্যহ দাঁড়ায়—তা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। এবং বলা বাহুল্য আধ ঘণ্টাও ঠিক আধ ঘণ্টায় শেষ হয় না। গান দীর্ঘায়ত হয়, গানের থেকে গল্প হয় বেশী। আধ ঘণ্টা ক্রমশ এক ঘণ্টায়—কয়েক দিনের মধ্যে দেড় ঘণ্টায় পরিণত হয়। সে তথ্যটা এদের গোচরেও আসে না। কেউই সচেতন হতে পারে না—এমন কি নিস্তারিণীও না। সেও বসা ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম দু-একদিন কাপড় পাল্টে ফর্সা থান কাপড় পরে ভাবিযুক্ত হয়ে এসে বসেছিল, কিন্তু রাজাবাবুকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্দ ধারণা করতে পারে নি। বিশেষ সে থাকলে রাজাবাবু তার সঙ্গেই বেশী কথা বলেন, নানা ধরনের গল্প। প্রতিশ্রুতি দেন ওদের রেঙ্গুনে যে আপিস আছে সেখানে চিঠি লিখবেন—গণেশের খবরের জন্যে। এর পর সম্ভ্রান্ত মানুষটা সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণ করে কি ক'রে?...সে আজকাল নিজের কাজে থাকে, নয়ত একটু শুয়ে পড়ে। ফলে এদের সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা কেউই টের পায় না—নবীনা গায়িকা ও প্রৌঢ় শ্রোতা দুজনের একজনও না। এতে যে দোষের কিছু আছে সে সম্বন্ধেও অবহিত হ'তে পারে না।

সুতরাং কানাকানিটা ক্রমে কানাঘুষো, শেষে ঢাঁঢিক্কারে পরিণত হ'ল এক সময়। যখন সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে আর উপায় রইল না সুরোর, তখন সে বহুদূর চলে গেছে, হারিয়ে তলিয়ে গেছে ঐ সৌম্যকান্তি বয়স্ক লোকটার প্রসন্ন দৃষ্টির গভীরে, তার আর ফেরার উপায় নেই! এর মধ্যে যে কিছু 'দুষ্য' আছে, এর মধ্যে যে কোন দৈহিক আকর্ষণ আছে—একেই যে প্রণয় বলে—যে 'পীরিতি'র গান গায় সে, এও যে তাই—তা অবশ্য এখনও মানতে রাজী নয়, জানেও না—কিন্তু তেমনি বিনাদোষে অমন একটা মানুষকে 'আর এসো না' বলতেও প্রস্তুত নয় সে।...

মতিই প্রথম টিটকিরি দেয়, 'কী লো, বলি নি যে এবার রাজাবাবুর গাড়ি তোর দোরে নিত্যি এসে দাঁড়াবে! তখন তো খুব মেজাজ দেখিয়েছিলি। এখন গরীবের কথা বাসি হ'লে খাটল তো?'

সুরো অরুণবর্ণ হয়ে উঠে বলে, 'কখ্খনো না। তুমি যেভাবে বলেছিলে সেভাবে তো নয়। এ তো কারবারের সম্বন্ধ, দেওয়া-নেওয়া। পয়সা নিই গান গাই—ফুরিয়ে গেল!'

'তা আমিই বা কি-এমন অন্য কথা বলেছিলুম? ব্যাখ্যানা ক'রে কিছু বলেছিলুম কি? গাড়ি এসে দাঁড়াবে শুধু এই কথাই বলেছিলুম।'

তারপর বলে, 'ওলো, কারবারের কথাই হচ্ছে। সবই তো কারবার। দেওয়া-নেওয়া ছাড়া কি বল্? ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। আর গান গাওয়া—ও তো হ'ল গে ভটচাষ্যির পত্তর আড়াল—ও আমরা খুব জানি। মনকে আঁখি ঠারা। বয়স আমাদের কম হয় নি,

বুঝলি! তা নয়,' কথা হচ্ছে সেই তো মল খসালি, তবে লোকটা কেন ঢলালি! সেই কাজই যদি করবি তো ঢের বড় লোক—ছোকরাবাবু জুটিয়ে দিতে পারতুম।'

'তুমি ও জিনিস বুঝবে না মাসী। ন্যাবা হলে দুনিয়াসুদ্ধ হল্‌দে দেখে। তোমরাও তেমনি—যা জানো, যা ক'রে এসেছ তার বাইরে কিছু দেখতে শেখো নি। তোমাদের সঙ্গে তক্ক ক'রে কোন লাভ নেই।' রাগ ক'রে চলে আসে সুরো।

কিন্তু মতি একাই নয়। একদিন নানু এসে বলে, 'কী রে, এসব কি শুনছি! শেষে ঐ বুড়োটার ফাঁদে ধরা পড়লি!...সাগর সমুদ্দুর সব পেরিয়ে এসে নালার জলে ডুবলি! ...তাই যদি মনে ছিল রাণী, কিবা দোষ করেছিল দাস!...এখনও প্রতীক্ষায় আছি আমি, ধৈর্য ধরি—যদি কৃপা করো অধম সেবকে—নিয়োজিব তুচ্ছ এই প্রাণ, তোমার সেবায়!... মাইরি বলছি, ঐ বুড়োর এঁটো পেসাদেও আপত্তি নেই।'

থিয়েটারী ঢঙেই কথাগুলো বলে, অর্ধ-পরিহাসছলে, কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝে সুরো যে সে সত্যিই দুঃখিত হয়েছে।

'তুমিও ঐসব ছাইপাঁশ বিশ্বাস করলে নানুদা! মা বসে থাকে, মায়ের সামনে একখানা দুখানা গান শোনে, তারপর পঁচিশ টাকা গুনে দিয়ে চলে যায়। এর মধ্যে দোষটা কি?'

'ঐ পঁচিশ টাকার কি তোর খুব দরকার? না হ'লে চলে না?'

শান্ত, কিন্তু প্রশ্নটা সহজ নয়। সুরবালা স্পষ্টই বিব্রত হয়ে ওঠে।

'বা রে! তা কেন। তা নয়। বলি রোজগার কোনটাই বা খারাপ। যদি এটা বাড়তি পাওয়া যায়—'

'নিজেকে ঠকাস নি বোন!' নানুর গলার সুর পালটে যায়। কদাচিৎ গম্ভীর হয় সে। সুরো জানে যে খুব বিচলিত না হ'লে তার ভাঁড়ের মুখোশ সহজে খোলে না। আজ সে সত্যিই খুব দুঃখিত হয়েছে নিশ্চয়। খুব আস্তে আস্তে বলে নানু, 'মানুষ তখনই সবচেয়ে অধঃপাতে গেছে বুঝতে হবে—যখন সে নিজের কাছে নিজে মিছে কথা বলতে শুরু করে!...ওরে, এখানে আসি না আসি আমার একটা চোখ একটা কান তোর কাছে থাকে সর্বদা। তোর কথা কেন ভুলতে পারি না জানিস, তোকে নিয়ে এত মাথা ঘামাই কেন? তোর মতো মেয়ে আমি, আমার এ দুনিয়ায় একটাও দেখি নি। দুটি মেয়েছেলেকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি, একটি আমার বৌ, আর একটি তুই! তোর এই হাল হ'ল! ...এর মধ্যে ঐ লোকটার পঁচিশ টাকার জন্যে কটা মুজ্‌রো লুকিয়ে নষ্ট করেছিস বল তো! ভাবছিস যে কেউ টের পায় নি? আমি জানি, সব নাম ক'রে ক'রে বলে দিতে পারি। ...এখন যদি আমি ঐ পঁচিশ টাকা ক'রে দিই রোজ—তুই ওকে "এসো না" বলতে পারবি? মা এখন আর তোর সামনে বসে থাকে না, তাও আমি জানি। তার অত সময় নেই।... তা ছাড়া তাকেও ও মিষ্টি কথায় ভুলিয়েছে কিছু। আধঘণ্টা নয়, গাড়ি আজকাল দেড়-ঘণ্টা দুঘণ্টা এখানে দাঁড়াচ্ছে, প্রায় প্রত্যহই। এর মধ্যে এমনও এক একদিন গেছে—এক কলিও গাওয়া হয় নি, গানের গুন্‌গুনুনি পর্যন্ত শোনে নি কেউ। শুধুই গল্প করে-ছিস বসে! টাকাও হয়ত সবদিন নিস না! না নেওয়াই উচিত। কিন্তু কিসের জন্যে এত ক্ষতি করছিস বল তো? কার জন্যে? ও তোর উপযুক্ত নয় কোন দিক দিয়েই।'

ওর এই অস্বাভাবিক—ওর পক্ষে অস্বাভাবিক—কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় সুরো, কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, 'সত্যিই বলছি নানুদা, বিশ্বাস করো, তোমার কাছে মিছে বলব না—তেমন কোন অন্যায় আমি করি নি। হ্যাঁ, গল্প করেছি ঠিক কথা, সবদিন গাওয়াও হয়ে ওঠে নি; তা সে সব দিনে টাকাও নিই নি ওঁর কাছ থেকে। গল্প করতে ভাল লাগে তা মানছি। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।'

'তাও জানি। তার মানে লোকটা পাকা খেলোয়াড়, টোপ গিললে কতটা নোল দিতে হয় সুতোতে তা জানে। এসব এইভাবেই শুরু হয়। তোদের মতো যারা ভাল মেয়ে, সৎ

মেয়ে, তাদের টাকায় কেনা যায় না তাও ও জানে। তাই এই চাল চেলেছে। কিন্তু আর কি তুই ফিরতে পারবি, বুকে হাত দিয়ে সত্যি ক'রে বল তো!'

চুপ ক'রে থাকে সুরো। উত্তর দিতে পারে না। ফাঁদে-পড়া বিপন্ন হরিণীর মতো অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে শুধু।

নানু বলে, 'যদি পারিস, যদি এখনও সময় থাকে—ফিরে আয় বোন। নইলে সেই জাতও যাবে পেটও ভরবে না। এর পর দেখবি আপসোসের সীমা থাকবে না।'...

•

কোথা থেকে খবর পেয়ে শশীবৌদি একদিন আসেন দেখা করতে। পাশে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'চিরদিন এমনি থাকতে পারবি না জানতুম। বয়সের ধর্ম একটা আছেই। অভাব যদ্দিন ছিল বুঝতে পেরেছিলি, এখন বোঝা শক্ত তাও জানি। তবু তুইও এমনি ক'রে নোংরা মেয়েদের খাতায় নাম লেখাবি তা ভাবি নি।... এখনও সময় আছে হয়ত—গরীবের ছেলেটেলে দেখে একটা মালা বদল ক'রে নে না। এমন ভাল ছেলে ঢের পাবি যাকে তোর মা ঘরজামাই রাখতে পারবে।...সে তোর কাজকর্ম হিসেবপত্তরগুলোও দেখতে পারত—। তাতে আর যাই হোক—এমন আঘাটায় এ'দো পুকুরে ডুবে মরতে হ'ত না।'

'তুমিও এইসব মিথ্যে দুর্নাম বিশ্বাস করলে বৌদি!' অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে সুরো বলতে যায়। ওকে থামিয়ে দিয়ে বৌদি বলেন, 'দুর্নাম একেবারে শুধু শুধু রটে না রে। তবুও প্রথমটা বিশ্বাস করি নি, যে বলতে এসেছিল তার সঙ্গে ঝগড়াই করেছি। কিন্তু কান যে আর পাতা যাচ্ছে না ভাই। একবার নিজের চোখে দেখতে এসেছিলুম। দেখেও গেলুম। সবটা যে মিথ্যে তা আমিই বা বলতে পারছি কৈ?'

'তুমি—তুমি দেখলে? কী দেখলে তুমি?' উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুরো, বিস্মিতও হয়। কথাটা বুঝতে পারে না ঠিক।

'তোকেই যে দেখলুম। তোর মুখেই পড়লুম সব ঘটনাটা। নেশায় বুঁদ হয়ে আছিস। জাতধম্মটা পুরো যায় নি, সেও চোখ দেখে বুঝতে পারলুম কিন্তু দেরিও বোধহয় আর নেই। দ্যাখ, পারিস শক্ত হ'তে—একবার চেষ্টা ক'রে দ্যাখ। কী আর বলব।...তবে আর হয়ত ভাই আমার আসা হবে না, তোর বিয়ে-থা না হ'লে তোরও আর আমাদের ওখানে না যাওয়াই ভাল। কানের কাছে কানাইয়ের বাসা—মেয়ের শ্বশুরবাড়ি—এমনিতেই দিনরাত তরস্ত থাকতে হয়। ছেলের বিয়ে দিতে হবে—'

অর্থাৎ ওর এতদিনের অভ্যস্ত পুরাতন জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও বুঝি আর থাকে না।

তাহলে কি সত্যিই সে ফাঁদে পড়েছে? একেই কি প্রেম—তার গানের ভাষায় 'পীরিতি' বলে? 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর,—পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর'—তারও কি সেই দশা হ'ল? এতদিন যাদের আপন বলে জানত সে—তাদের সকলকে পর ক'রে দেওয়াচ্ছে ও লোকটা কি ইচ্ছে ক'রেই? যাতে কোন অবলম্বন বা আশ্রয় আর কোথাও না থাকে! ফেরবার সব পথ ঘুরিয়ে দিচ্ছে নিজের দিকে, টেনে নেবার সুবিধে হবে বলে—এই একটিই পথ যাতে খোলা থাকে? লোকটা কি সত্যিই খেলোয়াড়?

কিন্তু তা জানলেও কি এখন আর ফিরতে পারবে?

ব'ড়শি বড় বেশী গেঁথে গেছে না কি?

মাও উশখুশ করছে। তার কানেও পেঁ'ছেছে কথাটা। নিহাৎ উপরি নগদ পঁচিশটা ক'রে টাকা আসছে বলেই কিছু বলে নি এখনও। কিন্তু যেদিন শুনবে যে এর মধ্যে সত্যিই চার-পাঁচটা বায়না ফিরিয়ে দিয়েছে মেয়ে, সেদিন তুলকাম বাধিয়ে তুলবে একে-বারে। হয়ত অপমানই ক'রে বসবে অত বড় লোকটাকে। মা সব পারে। আর তখন

সুরোরও কিছু বলবার মুখ থাকবে না। নিজের ফাঁদে সে নিজেই পড়ে গেছে।...

অনেক ভাবল সে। শশীবৌদি যেদিন গেলেন, সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারল না—শুয়ে ছট্‌ফট করল শুধু। ঐ লোকটা আর আসবে না, আর দেখতে পাবে না কোনদিন, ভাবলেই যেন বুকের মধ্যেটায় কেমন করে, চোখ ফেটে জল আসে। প্রথম দিককার সে আকুলতা আর নেই—অনেকটা থিতিয়ে গেছে এর মধ্যে, তাই ভেবেছিল যে নেশা কথাটা এরা ভুল বলছে। কিন্তু এখন বুঝল যে তা আরও বেড়েছে। যতক্ষণ তাঁর সামনে থাকে গল্প করে, গান গায়—ততক্ষণ যেন অন্য জগতে থাকে সে, সবটাই তার মনের জগৎ, স্বপ্নের জগৎ। সমস্ত সময়টা এক অনির্বচনীয় সুখের মধ্যে ডুবে থাকে। কী পেল আর কী পেল না—তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যখন উনি চলে যান তখন থেকে সারাক্ষণ আসন্ন মিলন-দিনের চিন্তায় ডুবে থাকে—কী কী আজ বলা হ'ল না, কোন্ কোন্ কথা কাল বা আগামী দিনে বলবে—শুধু এই চিন্তায় থাকে। সেও এক অতীন্দ্রিয় জগৎ। তাঁর চিন্তায় তাঁর সান্নিধ্যরসে ডুবে থাকে বলেই দৈহিক জৈবিক আকুলতা অতটা অনুভব করে না। কিন্তু এও নেশাই। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে বলেই অপেক্ষাকৃত স্থূল আকর্ষণ-গুলো এড়িয়ে যেতে পারে। এখন, সেই নেশার বস্তু আর পাবে না মনে করতেই যেন দেহের নাড়িতে নাড়িতে টান ধরে, বুকের মধ্যেটা কি যেন পিষে গুঁড়িয়ে দেয়। বোঝে যে আগের—প্রথম দিককার সে আকর্ষণ আরও বেড়েছে, প্রণয়ে পরিণত হয়েছে। কমে নি একটুও।...

তবু সারারাত ভেবে ও কেঁদে মন স্থির ক'রেই ফেলে সে। আর না। এবার ছেদ টানতে হবে। পূর্ণচ্ছেদ। এমনিতেই যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। তার এভাবে অনির্দিষ্ট-কাল চলতে পারে না। তার এতদিনের শিক্ষা সাধনা সব নষ্ট হ'তে বসেছে। নানুদা ঠিকই বলেছে; এতে কি লাভ হবে, কী পাবে সে! ঐ মানুষটাকে? কিন্তু তাহ'লে তো মতির কথাই ঠিক হবে, সেই সাধারণ স্বৈরিণীর পর্যায়ে নেমে আসতে হবে। লোকে হাসবে আর টিটকিরি দেবে। কষ্ট আজ হ'লেও হবে, কাল হ'লেও হবে। যত দেরি হবে ততই বরং প্রতিকারের বাইরে চলে যাবে ব্যাপারটা। এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে, আর না। রঘুবাবুর মক্কেল বেশী ফেরে নি তাই রক্ষে, তার স্বার্থে ঘা পড়লে সে মাকে খবরটা দিয়ে যাবেই। আর তা হ'লে—। না, মা বা অপর কেউ অপমান করার আগেই সে ওঁকে বুঝিয়ে বলে ইতি টেনে দেবে ওদের এই—কী বলবে?—প্রণয়লীলা?—না শুধু লীলা!

সেদিন খুব মন দিয়ে গাইল সুরবালা। পর পর তিন-চারখানা গান। রাজাবাবুর প্রিয় গান যেগুলো। দরদ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে গাইল। কিন্তু শুধু কি এই পরিশ্রমেই ওর মুখে ঘন ঘন রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে উঠছে, ললাটের প্রান্তে চূর্ণ কুন্তলগুলিকে আশ্রয় ক'রে বার বার স্বেদরেখা দেখা দিচ্ছে—যা রাজাবাবুর অনভ্যস্ত হাতের পাখা চালানোতেও মিলোচ্ছে না? এমন গল্প বাদ দিয়ে শুধুই গান গাওয়া—এ তো অস্বাভাবিক কতকটা।

রাজাবাবু গানে বাধা দেন না, কিন্তু একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে আজকের এই আচরণের অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করেন। একটা বড়রকমের খটকা লাগে তাঁর মনে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, মানসিক অস্বস্তি। কোন বিপর্যয়ের সঙ্কেত পান—কিন্তু তার প্রকৃতিটা ধরতে পারেন না।

তবু নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করেন না। শ্রান্ত হয়ে এক সময় সুরো নিজেই থামে। বিচিত্র দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'হ'ল?'

'হ'ল বৈকি! তা হঠাৎ আজ এত ক'রে গান শোনানোর অর্থ?'

'গান শুনতেই তো আপনি আসেন। গান শোনানোরই তো কথা। এতগুলো ক'রে

টাকা খরচ করেন কেন নইলে?' সুরবালা তেমনিভাবেই প্রশ্ন করে, তেমনিভাবে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু তবু, সে যে আরও বেশী ঘামছে এবং হাত দুটোও—প্রথম দিনের মতো অত না হ'লেও বেশ কাঁপছে—তাও রাজাবাবুর নজর এড়ায় না।

মুখে বলেন, 'গান ছাড়া তুমি যে কথাও এত ভাল কইতে পারো তা তো জানতুম না। এটা জানলে শর্তটা দুরকমই ক'রে রাখতুম—গান গাওয়া কিম্বা গল্প করা।'

'তা হয়ত জানতেন না, কিন্তু আধঘণ্টার শর্তটা মনে আছে তো? এখন কতখানি ক'রে সময় লাগছে সেটা ভেবে দেখেছেন? আপনার ঘণ্টা কতক্ষণে হয়?'

চেষ্টা ক'রে কঠিন হ'তে গিয়ে একটু বেশীই বুঝি কঠিন শোনায় গলাটা।

অন্তত সুরবালার তাই মনে হয়।

'তা বটে।' নিমেষে যেন অনুতপ্ত হয়ে ওঠেন রাজাবাবু। কোথায় কী একটা ঘটেছে অঘটন, বড় রকমের একটা কিছু গোলমাল, বুঝতে পারেন, কিন্তু তা নিয়ে আর ঘাঁটাতে চান না। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন যে, এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ আলোচনা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল, সময় দিলে আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এখন গরম অবস্থায় ঘা দিলে লাল লোহা পেটানোর মতো অবস্থা হবে, গরম লোহার টুকরোই ছিটকে উঠবে। সে টুকরো আঘাতকারীর গায়ে ছিটকে পড়াও অসম্ভব নয়। মুখে বলেন, 'খুবই অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে যে পারি না তা নয়। রোজই ভাবি সামলে নেব—এখানে এলে যেন সব ভুলে যাই।...আচ্ছা, আজ উঠি—তাহলে, আজ এমনিতেই ঘণ্টা-খানেক বোধহয় হয়ে গেছে।'

টাকাটা প্রত্যহ তাকিয়ার তলায় রেখে যান যাবার আগে। আজও তার অন্যথা হয় নি। কখন রেখে দেন টেরও পায় না সুরবালা। অন্যদিন হাসি-হাসি মুখে সেও সঙ্গে যায় দরজা পর্যন্ত, এগিয়ে দেয়। আজ আর গেল না, সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খট্‌কাটা আরও প্রবল হয়। সংশয়টা শঙ্কায় পরিণত হ'তে চলেছে যে!...অজানা একটা বিপদেরই আভাস পান বুঝি।

'তা হলে কাল?' দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন। অন্যদিনও করেন—নিতান্তই মামুলী প্রশ্ন হিসাবে—উত্তর যে কী হবে তা জানাই থাকে। কিন্তু আজ তাঁরই কণ্ঠ কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

'না, কাল বিকেলে আমার বায়না আছে।'

কোনদিন বিকেলে মুজরো থাকলে পরের দিনের কথা সুরোই বলে দেয়। দিত অন্তত। ইদানীং তো রোজই আসছেন, সুরবালার যে মুজরো আছে বা থাকতে পারে তাই যেন তাঁরা ভুলে গেছেন। রাজাবাবুও—সুরবালা নিজেও।

রাজাবাবু আজও তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরে কবে আসতে পারেন—পরের দিন কি না—সেটা ওর মুখ থেকেই শুনতে চান।

'দেখুন', কোনমতে যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলে সুরো, 'দিনকতক শখ হয়েছিল একটা, তা সেটা তো ভালভাবেই মিটেছে। এবার আমাকে বরং ছুটি দিন। আমার কাজ-কারবারের খুব ক্ষতি হচ্ছে। এর মধ্যে—এর মধ্যে অনেক কটা বিকেলের মুজরো আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। এমন হ'তে থাকলে দুদিন বাদে বদনাম হয়ে যাবে যে আমি আর গাইতে পারছি না। কেউ আর ডাকবেই না।'

'তাই নাকি? ফিরিয়ে দিয়েছ? কৈ, তা তো জানতুম না। বলো নি তো একবারও। তোমার অবসর সময়ে শুনব—এই রকমই আমার ইচ্ছে ছিল—যেদিন বাইরে কোথাও গাওনা থাকবে না। সেইরকম বলেওছিলুম তোমাকে। ইস! খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তা তুমি ফিরিয়েই বা দিলে কেন? আমাকে বললেই পারতে।'

'কেন দিলুম তা জানি না। বোধ হয় আমার গান শোনবার যতখানি শখ আপনার

—তার চেয়েও বেশী শখ আমার—আপনাকে শোনানোর।...যাই হোক, এ আসরটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে আমাকে। সেই জন্যেই বলছি—এর চেয়ে বেশী অনিষ্ট হবার আগে আমাকে অব্যাহতি দিন। আপনারা বড় মানুষ, এমন কত শখ হয় আবার মিটে যায়—এতদিনে আপনারও যাবার কথা। আর কেনই বা মিছিমিছি এই এতগুলো ক'রে টাকা নষ্ট করবেন। আবার কোন নতুন শখ, নতুন মানুষ দেখা দেবে জীবনে—এ পালা এইখানেই চুকিয়ে দিন।'

চোখের জল অপরিহার্য, সে জল চোখের প্রান্ত পর্যন্ত এসে ছলছলও করে। কিন্তু কঠিন শাসনে সেইখানেই বেঁধে রাখে সে। এখন দুর্বল হয়ে পড়লেই সর্বনাশ ; লোকটা পেয়ে বসবে। কঠোর হয়ে ফেরাতে হবে, কঠোর হয়েই থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন রাজাবাবু। আবার দু পা পিছিয়ে ঘরের মেঝেতে পাতা জাজিমের ওপর এসে দাঁড়ান। একটু কি ভাবেন যেন, তারপর বলেন, 'একটা কথা বলব? আমার শখ আজও মেটে নি। বড়লোকের দু'দিনের শখ হ'লে তো আমিই আসা বন্ধ করতুম। বরং—বরং এ যেন আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। ঘড়িতে দুটো বাজলেই মৌতাতের জন্যে ছট্‌ফট করি।...আমাকে শোনানোয় যদি তুমিও আনন্দই পাও, তাহলে এক কাজ করো না কেন, ও বাইরের মুজরো তুমি ছেড়েই দাও না! আমি তোমার সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত ক'রে নিচ্ছি—ফি মাসে পাঁচশ টাকা ক'রে দোব। দ্যাখো, মুজরো কোন্ মাসে কি পেলে না পেলে—তার অনেকটা অনিশ্চিত তো। এ পাঁচশো টাকার হাজাশুকো নেই। সময়ও আমি বেশী চাইছি না—এই যেমন আসছি, তেমনই আসব।'

'তারপর? এ-কুল ওকুল দুকুল যাবে যখন?' কেমন যেন যান্ত্রিকভাবেই প্রশ্নটা করে সুরবালা, রাজাবাবু যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন তার সম্যক্ অর্থ বা সে কি বলছে তা না বুঝেই। কথাগুলো যেন আপনিই বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

'মানে, মরে যাবো যখন?...যদি হঠাৎ মরে যাই—তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি—এক বছরের মধ্যে ম'লে এককালীন থোক দশ হাজার টাকা তোমাকে দেবে আমার এস্টেট থেকে। আর বেশীদিন যদি বাঁচি—আমি নিজে তোমাকে বাড়ি কোম্পানীর কাগজ এমন ক'রে দিয়ে যাবো—তোমার কোন অভাব থাকবে না।'

যেন চমকে ওঠে একটা ঘুমের ঘোর থেকে সুরবালা, বলে, 'না-না—ছিঃ, আমি সে কথা বলছি না। আপনার মরার কথা আমি একবারও ভাবি নি। আমার শিক্ষা, আমার একটা নামডাক যা হয়েছে সব খুইয়ে বসে থাকব—অথচ আপনারও শখ মিটে আসবে একদিন—সেই কথাই বলছি। না, সে হয় না। আপনি আজ আসুন—কটা দিন যাক। আমার—আমার খুব ক্ষতি হয়েছে, হচ্ছে—মাইরি বলছি। এমনভাবে চললে, মুজরো নিলেও ব্যাভ্রম হবো হয়ত—গাইতে পারব না। কতদিন মাসীর ওখানে যাই নি। সবাইকার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। সবাই বদনাম দিচ্ছে, অন্য বদনাম। আপনি দয়া ক'রে এবার রেহাই দিন আমাকে!'

আর নিজেকে সামলাতে পারে না সে, এতক্ষণের বাঁধ-দেওয়া অশ্রু অঝোরধারে ঝরে পড়তে থাকে।

সেই অশ্রু আর কণ্ঠের সেই আকুলতাতে রাজাবাবুর মতো ধীর স্থির ব্যক্তিও অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত স্বাভাবিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন বুঝি। আর তার ফলে যা কখনও করেন না—এতকালের মধ্যে যা কখনও করেন নি—তাই ক'রে বসেন। দ্রুত কাছে এসে নিজের চুনোট করা চাদরের প্রান্তে ওর কণ্ঠ কপোল ললাট—চোখের জল আর ঘাম মুছিয়ে নিয়ে চাপা গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আর তা হয় না সুরো, আমরা কেউই কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। স্বয়ং রাধারাণী—আমার মদনমোহনই আমাদের বেঁধে দিয়েছেন অদৃশ্য

বাঁধনে। আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি—কথা দিচ্ছি সাতদিন আর আসবো না—তুমি নিজের মন বুঝে দ্যাখো। পারো ভুলতে—ভুলে যেও। দেখাও ক'রো না—নিচে থেকেই ফিরে যাবো। নইলে পাঁচশ কেন—যদি মাকে ভোলাতে হয় আরও একশ দুশো টাকা বেশীও দিতে রাজী আছি। ভেবে দেখো—'

এবার আর তিনি দাঁড়ান না, দ্রুত নেমে চলে যান। আর সেই বহুঈপ্সিত অথচ অপ্রত্যাশিত দুর্লভ স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে সুরবালা সেখানেই দাঁড়িয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। কিছুই যেন বুঝতে পারে না, কিছুই যেন মাথাতে যায় না। দেখতেও পায় না কিছু। চোখের জলে স্বেদবিন্দু মিশে ঘরদোর আসবাব দিনের আলো—বাইরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত জীবন একাকার ঝাপ্সা হয়ে যায়।

। ১৯ ॥

রাজাবাবু যা বলেছেন, যা বলে গেছেন সে প্রস্তাব যে একেবারেই অবাস্তব অচল, তা সুরবালার থেকে বেশী কেউ জানে না। মাসিক পাঁচশ কেন, সাতশ টাকার জন্যেও যদি সে বাইরের গাওনা ছেড়ে দেয় তো সেটা তার লোকসানই। সব মাসে যে পাঁচ-ছশ' টাকা আয় হয় তা নয়—কিন্তু তেমনি কোন কোন মাসে বেশীও হয়। আরও বেশী হবে। নামডাক ছড়াচ্ছে। আগে পঞ্চাশ-ষাট টাকাতেও বায়না নিয়েছে—এখন একশ টাকার কম বড় একটা নেয় না। নেহাৎ কেউ এসে কাকুতিমিনতি করলে, কোন পুরনো ঘর এসে ধরলে দশ বিশ কমায়। পঞ্চাশ-ষাট টাকা এখন কেউ বলতে সাহসই করে না তাকে। ওদিকে দেড়শ, দুশো টাকার বায়নাও আসে। বড়লোক মক্কেল দেখলে দালালরাই ওর হয়ে মোটা টাকা হেঁকে বসে, দু'একবার গাঁইগুঁই ক'রে রাজীও হয়ে যান তাঁরা। তাছাড়া, এটা তো বাঁধাবরাদ্দ যেটা—পেলার হিসেব ধরলে অনেক বেশী আয় হয়। বিশেষ শ্রাদ্ধ-বাড়িতে, বাঁধা মজুরীর ডবল তে-ডবল উঠে যায় পেলা থেকে।

আরো আছে। সাধনার কথা আছে। শিক্ষার কথা আছে। এতদিনের সাধনা তার, এতদিনের চেষ্টা। আজ বলতে গেলে সিদ্ধি তার করায়ত্ত। এখনই সে যে-কোন পুরুষ কীর্তনিয়ার সংগে পাল্লা দিয়ে গাইতে পারে। তাকে আর চবউলী বলে নাক সিঁটকোতে সাহস করে না কেউ। বড় বড় আসরে তার নাম উল্লেখ হয়—নানু নিজে শুনে এসেছে। এখন গান ছেড়ে দেওয়া মানে আত্মহত্যাই করা একরকম।

আর, এ তো শুধু বৃত্তি হিসেবেই নেওয়া নয়—এ যে তার প্রাণের জিনিস। মনেই পড়ে না—কোন্ শৈশবে মতির কীর্তন শুনে আত্মহারা বিভোর হয়ে যেত সে। শত শাসনেও তাকে বেঁধে রাখা যায়নি—নিবৃত্ত করা যায় নি এই বিশেষ সংগীতের আকর্ষণ থেকে। এ গান ছেড়ে দিলে কি বাঁচবে সে? মনে তো হয় না।

অথচ—রাজাবাবুকেই কি আজ বিদায় দেওয়া সম্ভব?

ভাবতেই যে বুকের মধ্যেটা টনটন ক'রে ওঠে! এই যে সারাদিন দেখে না, এমনও হয় পর পর দুদিনও দেখা হয় না—নিছাৎ এক-আধটা মুজরো না নিলে মা অগ্নিদগ্ধ হয় বলে নিতে হয়—সে সময়টা প্রত্যাসন্ন মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে বলেই সহ্য

করতে পারে। সন্ধ্যাটা কাটে চর্বিত-চর্বণে, প্রভাতটা কাটে অপরাহ্ণকালের কল্পনায়।... বলে গেছেন সাতদিন পরে আসবেন, মনে করতেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই কদিন তার কাটবে কি ক'রে, কেমন ক'রে বেঁচে থাকবে সে। এখনই—উদ্দাম উন্মাদ চিন্তা তার কল্পনা করছে—কোনো ছুতোয় গিয়ে দূর থেকে দেখে আসা যায় কি না। প্রৌঢ়? বৃদ্ধ? বয়স্ক? তা সুরো জানে না। অত ভেবে দেখে নি। 'নয়নে লাগল রূপ হামারি'—এই শুধু জানে। ওঁকে দেখলে মনে যে আনন্দ হয়, প্রাণে যে শান্তি অনুভব করে, রক্তে যে উন্মাদনা জাগে—সমস্ত সত্তা যে পরিপূর্ণতা বোধ করে—এমন আর কাউকে দেখে করে না, কখনও করে নি—এইটুকুই শুধু জানে। এতদিন ভাবে নি, ভাবার দরকার হয় নি—ভাবার কথাও মনে আসে নি—আজ বুঝছে যে ওঁর জন্যে চরম স্বার্থ ত্যাগ ক'রেই তৃপ্তি।...

না, নানুদা ঠিকই বলেছে। বহুদূরে এগিয়ে গেছে সে, আর ফেরার উপায় নেই।...

তবু কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করে কদিন। কিছুতেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। কী উত্তর পাবে জেনেও একদিন মতির কাছে তোলে কথাটা। মতি চমকে ওঠে, বলে, 'তুই কি পাগল? এই কথা চুপ ক'রে শুনে গেছিস আবার মনে মনে ভিনোচ্ছিস?...পাগল ছাড়া একথা কেউ পাড়েও না, কেউ তা বসে শোনেও না। তুই এখন বায়না ছাড়বি কি? কোন সত্যিকারের রাজা বা রাজপুত্তুর এসে বে করতে চাইলেও আমি তোকে বারণ করতুম। তোর এই উঠতিকাল, এই তো উন্নতির সময়। সত্যি কথা বলতে কি, তোর বয়সে আমাদের এত নামডাক হয় নি—তোর যা হয়েছে। আমাদের বয়সে তুই দিনে মজুরী-পেলা মিলিয়ে হাজার টাকা গুনে নিতে পারবি—এই বলে দিলুম। ...আমার কাছে পষ্ট কথা—ঐ মিনসেকেই যদি তোর এত পছন্দ হয়ে থাকে ওকে তুই শখের পতি কর—বাড়িতে বাবু বসা, আর তাই তো কথাটা দাঁড়াচ্ছেও। পাঁচশ' টাকা মাইনে দিয়ে যে বাঁধা রাখবে সে কি আর বেশী দিন শুধু আধঘণ্টা বসে দুখানি গান শুনে ছেড়ে দেবে?...ওলো নেকী, আমরাও ধানের চেলের ভাত খাই, বয়স তিন কুড়ি পেরিয়ে গেল—যে যতই বলুক সুয্যি যা পুবে ওঠবার ঠিকই উঠবে। সে কখনও পশ্চিমে উঠতে পারে না। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে ঘি ঠিকই গলবে, আরও কাছে এলে পুড়েও যাবে। অত আর সতীপনায় কাজ নেই—পছন্দ হয়ে থাকে, পয়সা দিতে চায়, দুয়ে নে—এক কাজে দু' কাজ হবে। তা বলে গান ছাড়িস নি খবরদার। আমাদের তো বিদেয়ের সময় হ'ল। এবার তো তোদেরই রামরাজত্বি।...এতকাল চেলাগিরি ক'রে মলি—গুরুগিরি করবি নি?'

পছন্দ হয় না কথাটা—বলা বাহুল্য। মতিকে একদিন সুরো ন্যাবার উপমা দিয়েছিল। আজ ওরও চোখ এক বিশেষ রঙে আচ্ছন্ন হয়ে না থাকলে বুঝত এই সমাধানই সবচেয়ে সরল। সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে এছাড়া কোনদিকে ফেরার উপায় নেই। কিন্তু সেই সোজাপথ সহজভাবে দেখার মতো অবস্থা তার নয়। আবারও সে অকারণেই মতির ওপর বিরূপ হয়ে উঠল, মতির এই যথার্থ হিতোপদেশের বিপরীত অর্থ করল মনে মনে। শখের পতি ক'রে ওদের খাতায় নাম না লেখানো পর্যন্ত মাসির যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না! মাসি সেই 'খানকী' শব্দের জ্বালাটা এখনও ভুলতে পারে নি।...

আরও একটা দিন চুপ ক'রে বসে ভেবেও যখন কূলকিনারা পায় না—তখন মায়ের কাছেও কথাটা পাড়ে।

নিস্তারিণী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে একেবারে। উদ্দেশে রাজাবাবুর মুখে নুড়ো জেলে তাঁর ঊর্ধ্বতন যত পুরুষের হিসেব শটকেয় আসে—মানে নিস্তারিণী যত সংখ্যা পর্যন্ত সহজে গুনতে পারে—তাদের অখাদ্য খাইয়ে নরকে পাঠিয়ে বলে, 'ইস্, তা আর নয়! তার কমে আর নেশা জমবে কেন! আমার ছেলেমানুষ, বোকা মেয়েটাকে পেয়ে

ভুচুং-ভাচুং দিয়ে এইসব দুর্বুদ্ধি যে মাথায় ঢোকাচ্ছে—তার সব্বনাশ হবে না!...এই নামডাক, তোকে নিয়ে যাবার জন্যে লোকে পয়সা দিয়ে সাধাসাধি করছে—এখন গান ছাড়বি! তোর বয়সে ঐ মতি কেত্তনউলী পঁচিশ-তিরিশ টাকায় গেয়ে আসত—তা-ই আজ ওর অতগুলো বাড়ি, আঙ্গুলের পাবে গুনে শেষ করা যায় না। ডালিম, পান্না এদের একেকজনের টাকায় দেখ্‌গে যা ছ্যাৎলা পড়ছে। তোর যখন ঐ বয়স হবে দোরে হাতী বাঁধা থাকবে তোর। তুই এখন ওর ভোচ্‌কানিতে ভুলে গান ছাড়বি কি! পাঁচশ' টাকা মাইনে দিয়ে কেদাত্ত করবেন একেবারে।...তোর যা রূপ—তুই মাইনে নিয়ে বাঁধা মেয়ে-মানুষ হয়ে থাকবি শুনলে এই গলির মোড়ে গাড়ির গাঁদি লেগে যাবে। তোকে গান ছাড়তে হবে কেন সেজন্যে? কথাটা খারাপ লাগছে শুনতে কিন্তু ও-বুড়ো যা বলেছে তা বাঁধা রাঁড় রাখা ছাড়া কি? সলিয়ে-কলিয়ে গান শুনতে আসছি বলে নাকটা ঘুরিয়ে ধরছে—এই তো! খবরদার বলে দিলুম, ওসব মতলব করতে যাস নি, অনথ করব তাহলে আমি। ঐ মিন্‌সের বাপের চোদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দোব। আমি নিস্তার বামনী, তোর মতো বেহদ্দ আকাট বোকা নই।'

সুরবালা আরও বিপদে পড়ে, কাঠ হয়ে থাকে। তার অবস্থাটা সত্যি সত্যিই এবার দাঁড়ায় ফাঁদে-পড়া হরিণের মতো। বোকা! বোকা! আগাগোড়াই বোকার মতো কাজ করেছে সে, করছেও। ঐ লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাই উচিত হয় নি তার। ও-ই তার মূর্তিমান সর্বনাশ। আর—আরও বোকামি হ'ল এদের বলা। যা করত সে নিজেই করত। নিজেই বলে-কয়ে বুঝিয়ে পায়ে ধরে নিবৃত্ত করত—কিম্বা তাঁর আসাটার ব্যবধান দীর্ঘতর করাত। সে ঢের ভাল ছিল। এ একেবারেই চারিদিকে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল, সবাই জেনে গেল—অথচ সম্পূর্ণ অকারণে। তার কোন উপকার এতে হ'ল না।

ভয় হ'তে লাগল, মা সত্যি সত্যিই অপমান ক'রে বসবে না তো? মা সব পারে। মান-মর্যাদা জ্ঞান নেই একটুও। হে ঠাকুর, যেদিন আবার রাজাবাবু আসবেন—সেদিন যেন মা বাড়ি না থাকে সে-সময়ে—কিম্বা ঘুমিয়ে থাকে। সে-ই যা হয় ক'রে বলে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেবে। হে ঠাকুর!...এক-একবার ভাবে একটা চিঠি লেখে। কিন্তু কি ঠিকানা, কেমন-ভাবে ওসব লোককে চিঠি লিখতে হয়, কিছুই জানে না। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। আরও ভয় হয় যদি চিঠি তাঁর হাতে না পড়ে! অতবড় বাড়ি, অতবড় সেরেস্তা—অত লোকজন —সব তো নিজেই দেখে এসেছে। টপ্‌ ক'রে কি আর কোন চিঠি সোজা তাঁর হাতে পেঁছবে? তাছাড়া বাড়িতে মেয়েরা আছে, তাদের কারও হাতে পড়লে ভদ্রলোক হয়ত আরও অপমানিত হবেন। তাদের এ-ঘনিষ্ঠতা বা তার দুঃসাহস—কেউই প্রীতির চোখে দেখবে না, নানা কদর্থ করবে।...নানুদাটাও যদি এসে পড়ত এর মধ্যে—তার হাতে পায়ে ধরে পাঠাত একবার—সাবধান ক'রে দিতে। সেও তো সেই যা গেছে—এর মধ্যে এক দিনও আসে নি। অগত্যা ঠাকুরকেই ডাকতে হয়—হে ঠাকুর বাঁচাও। মানীর মান রাখো।

কিন্তু ঠাকুর দেখা যায়—এক-এক সময় সত্যিই পাষাণ হয়ে যান, আর্তজনের কোন প্রার্থনাই তাঁর কানে পেঁছয় না। অথবা পেঁছলেও, মৃদুস্মিত কৌতুকহাস্যে অন্য আর্জিতে মন দেন—কেন যে এটা শুনলেন না, তা তিনি ছাড়া কেউ বুঝতেও পারে না।

এবারও তাই হ'ল। নিস্তারিণী যে ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকতে লাগল—তা সুর-বালা বুঝতে পারল না। তাই দু-একদিন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। গাড়ির আওয়াজ পেলে সে-ই নেমে গিয়ে দরজার কাছে দেখা ক'রে বুঝিয়ে বলবে। বলবে এ-বন্দোবস্ত সম্ভব নয়। তার চেয়ে তাঁর ইচ্ছা হ'লে তিনি যেন পনেরো-বিশ দিন অন্তর দারোয়ান পাঠিয়ে খবর নিয়ে এমনিই ঘুরে যান। এখনকার মতো—দু-একখানা গান শুনে চলে যান।...

কিন্তু সে-সব কিছুই করা গেল না। এমনই অদৃষ্ট, যেদিন রাজাবাবু সত্যিই এলেন —সেইদিনই আবার একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল একেবারে শেষমুহূর্তে—বেলা সেই সাড়ে তিনটে নাগাদ। চটকাটা যখন ভাঙল, তখন শুনল নিচে একেবারে রৈরৈকার পড়ে গেছে, মার গলা সপ্তমে উঠেছে, মনে হচ্ছে দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচছে সে দস্তুরমতো।

ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল সে—কিন্তু তখন—ততক্ষণে রোগ প্রতিকারের বাইরে চলে গেছে। ভাগ্যিস তবু গাড়ি থেকে নেমে চলনটায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন রাজাবাবু, আর সইসটাও বুদ্ধি ক'রে সদর দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছে— নইলে কেলেঙ্কারির আর কিছু শেষ থাকত না। রাস্তার লোক তো এতক্ষণে জড়ো হয়ে গিয়েইছে—মার যা গলা, তাতে এপাড়া কেন, ওপাড়ার লোকও শুনতে পাবে—সকলের সামনে বেইজ্জত হতেন ভদ্রলোক।

'বুড়ো মিনসে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গা পানে পা হয়েছে, নাতি-পুতিতে ঘর ভরে গেল—এখনও এইসব বজ্জাতি ঘুচল না! আমার গুয়ের-গোবলা কচি মেয়েটার মাথা খাবার জন্যে তার সব্বনাশ করার জন্যে ফন্দী আঁটছে! সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে—বসে বসে ছেলে-নাতির মিত্যু দেখবে আর বুক চাপড়াবে—এই বলে দিলুম। বোকা মেয়েটা বিশ্বাস ক'রে বাড়িতে আসতে দেয়—এমনিতেই তো সেই দুন্নামে পাড়ার কান পাতা যায় না—তার ওপর আবার এহকাল পরকাল খাবার ফন্দী। গান গেয়ে রোজ-গার ক'রে, স্বাধীন রোজগার—সেটা ঘুচিয়ে যাতে তোমার হাততোলার ওপর নিভ্ভর করে—সেই মতলব তোমার?...কেন, নইলে আর কোথাও জুটছে না বুঝি, কচি মেয়েটার মাথা না খেলে চলছে না?...ওকে উনি এসেছেন বাঁধা রাখতে পাঁচশ' টাকায়। কেন, ওর এমন কি দন্যিদশা হয়েছে তাই শুনি! বাবু বসাবে মনে করলে দুপায়ে জড়ো করতে পারত—তেমন মেয়ে আমার নয়। কলকাতা শহর ঝেঁটিয়ে রাজা-মহারাজারা সায়েবসুবোরা পর্যন্ত ছুটে আসত। কী ভেবেছ কি, সস্তায় কিস্তিমাৎ করবে? তাই এত মিষ্টি মিষ্টি বুলি, আমি গান বড্ড ভালবাসি, গান শুনতে আসি। বজ্জাতির আর জায়গা পাও নি! কেন, বাজারে বুড়ী রাঁড়ের এত অভাব?...নেকালো বলছি। নিকাল যাও আমার সামনে থেকে। আভি নেকালো। গোটে হেল! ভেবেছ মরে গেছি, না সেখানায় মুড়ি খ্যাংরা জুটবে না একগাছা!...ফের যদি কোনদিন এই গলির ত্রিসীমানায় তোমায় দেখি বাছা, রাজাই হও আর মহারাজাই হও, আঁশ-বটি দিয়ে তোমার নাক-কান কেটে ছেড়ে দোব বলে রাখছি। কোন বাবা তোমায় রক্ষে করতে পারবে না!'

ততক্ষণে সুরবালা মার পায়ে মাথা খুঁড়ছে, 'মা, ওমা—কাকে কি বলছ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো। এরপর যে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। ওঁর কি দোষ!'

'না, দোষ ওঁর কেন হবে—দোষ আমাদের। আমার। কলি কলিয়ে সলিয়ে মেওয়াভী-পানা কথা কয়ে টাকা ঘুষ দিতে কে এসেছিল? আমরা গেছলুম ওকে সাধতে?...আগা-গোড়া বলছি তোকে ওর মতলব ভাল নয়।'

এতক্ষণে যেন—এই প্রথম—কথা বলার সুযোগ পান রাজাবাবু। তাঁর মুখের দিকে সুরবালা চেয়ে দেখে নি, দেখতে পারে নি—নইলে দেখত তাঁর গৌরবর্ণ মুখ অপমানে প্রথমে কেমন ক'রে টকটকে লাল হয়ে এখন কালো হয়ে উঠেছে। গলার কাছের জামাটা এই মাত্র পাঁচ মিনিটেই ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু কথা যখন বললেন, আশ্চর্য শান্ত শোনাল তাঁর গলা, এত শান্ত যে নিস্তারিণী পর্যন্ত চমকে উঠল। বললেন, 'না, দোষ আমারই হয়েছে সুরো। অপরাধ আমার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মনের অগোচর পাপ নয়—তুমি ছেলেমানুষ, আমারই বোঝা উচিত ছিল। তোমার ভবিষ্যৎ আছে, তোমার গোটা বয়সটাই পড়ে আছে। তোমার মা ঠিকই বলেছেন। তুমি দুঃখ ক'রো না; এ-

অপমানও আমার পাওনা ছিল—এ-ই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমি চললুম, আর কখনও বিরক্ত করব না তোমাকে। তবে পালে-পার্বণে যদি কখনও বায়না দিয়ে পাঠাই—তখন যেয়ো—এই অপরাধে তখন যাওয়া বন্ধ ক'রো না।'

এই বলে, আর দাঁড়ান না তিনি, আস্তে আস্তে কপাট খুলে বেরিয়ে যান। রাস্তায় সত্যিই ভিড় জমে গিয়েছিল ইতিমধ্যে, হাসাহাসিও শুরু হয়েছিল। রাজাবাবুকে বেরোতে দেখে দু'-একজন টিটকিরিও দিল কিছু কিছু—তবে তা যে তাঁর কানে পেঁচিছে বা সে-সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্রও সচেতন—তাঁর মুখ দেখে তা মনে হ'ল না। বড়লোকের বাড়ির সইস-কোচোয়ানও এরকম বহু নাটকে অভ্যস্ত, তাদের চোখ বা কান থাকলে, অথবা ও-দুটো ইন্দ্রিয় থাকার অস্তিত্ব জানতে দিলে চাকরি থাকে না, চাকরিতে উন্নতি হয় না। সইস প্রশান্তমুখে—যেন ওসব কিছুই সে দেখে নি বা কানে যায় নি—আশ-পাশে কোন লোক কৌতুক-মুখর হয়ে ওঠে নি, এইভাবে—এদের দরজাটা দ্রুত টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গাড়ির পিছনে উঠে পড়ল, কোচোয়ানও একবার চাবুকটা শূন্যেই আস্ফালন ক'রে নিয়ে ঘণ্টা দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। উপস্থিত জনতা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই চারিদিকে সরে পথ ক'রে দিতে বাধ্য হ'ল—তামাশাটা জমাবার সময় পেল না।

নিস্তারিণীদের নিচের তলার ভাড়াটে বৌ বাইরে ভিড় আর ভেতরে এই রণরঙ্গিণী কাণ্ড দেখে আগেই নিজের ঘরে ঢুকে খিল এ'টে দিয়েছিল, সুতরাং রণাঙ্গন একেবারেই খালি হয়ে গেল। শুধু সুরোই তখনও মাথা কুটছে, 'কী করলে মা, কী করলে! কাকে কি বললে! এরপর ওঁর কাছে আমি মুখ দেখাব কি ক'রে?'

'আবার মুখ দেখাবি কি! মুখ যাতে আর না দেখাতে হয়, সেই ব্যবস্থাই তো করলুম। মুখ দেখা!...এই তোকে বলে রাখছি সুরো, ঐ মিন্সে যদি ফের কোনদিন এমুখো হয়, ওকে খুন ক'রে তবে ছাড়ব। তার জন্যে আমার যদি ফাঁসি হয় হবে।'

সত্যি সত্যিই নিস্তারিণী কড়া পাহারা বসাল এবার। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস, তাও ছেড়ে দিল ; যদিও অত ভোরে কলকাতার কোন বনেদী বড়লোক কারও সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এ-কল্পনাটাই হাস্যকর। কেউ বায়না দিতে এলেও, কোথাকার লোক তারা, কার বাড়ি গান হবে—তাদের সঙ্গে নিজে কথা কয়ে তবে ছাড়ত। এমন কি পাড়ায় দত্তদের বাড়ি চণ্ডীর গান শুরু হ'তেও তার কোন উৎসাহ দেখা গেল না শুনতে যাওয়ার, যদিও এর আগে এই চণ্ডীর গান শুনতে অন্য পাড়া পর্যন্ত হে'টে গেছে সে। এ-গান তার বড় প্রিয়। যেখানেই হয় শুনতে যায়, যেদিন যা দেবার তাও দিতে ভুল হয় না। বিশেষ খুল্লনার সাধের দিন শাড়ি-সিধে তার বাঁধা। তার মানসিকও আছে, গণেশ যদি কোনদিন এখানে ফিরে এসে সংসার পাতে—সে পুরো খরচ ক'রে চণ্ডীর গান দেবে এক মাস, ছাদে মেরাপ বাঁধতে হয় বাঁধবে।

সুরবালা ঐ ঘটনার পর দুদিন মুখে জল দেয় নি, ওঠে নি। তাতেও নিস্তারিণীকে নরম হতে দেখা গেল না বিন্দুমাত্র। উলটে ভাড়াটে বৌকে উপলক্ষ ক'রে চেঁচিয়েই বলল, 'যে রোগের যা ওষুধ। পুরনো ব্যামো হ'লে কড়া ওষুধ চাই বৈকি। দু-একদিন ওপোস দেওয়া ভাল, শরীর ভাল হয় মাঝে-মধ্যে ওপোস দিলে, মাথাও ঠাণ্ডা হয়।' এমন কি মেয়ে যখন একটা মোটা টাকার বায়নাও প্রত্যাখ্যান করল 'মন ভাল নেই' এই অজুহাতে, তখনও নিস্তারিণীকে খুব একটা বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। সে এবার কড়া হাতে রাশ ধরেছে—এস্‌পার-ওস্‌পার দেখে নেবে! মেয়েকে অনেকদিন ভয় ক'রে এসেছে—আর নয়। বড় ভয়ের জন্যেই এবার ছোটখাটো ভয়গুলোকে দমন করতে পেরেছে অনায়াসে।

একটু একটু ক'রে অগত্যা সুরবালাকেই উঠতে হয়। ভাতও মুখে তুলতে হয়—বায়নাও নিতে হয় আবার। যদিও মনে হয় বুকের একটা দিক অসাড় হয়ে গেছে তার

চিরদিনের জন্যে। আনন্দ শান্তি সুখ তৃপ্তি—এসব কথাগুলোর আর কোন অর্থই বুঝি কোনদিন খুঁজে পাবে না। মার সঙ্গে কথা কয় না সে ; কারও সঙ্গেই কয় না—অন্নদাটে বৌয়ের সঙ্গেও না। গাড়ি এলে কোনমতে মাথা নিচু ক'রে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে পাড়ার সকলেই তাকে বিদ্রূপের চোখে দেখছে, টিটকিরি দিচ্ছে।

মাসখানেক পরে একটি ভদ্রলোক এলেন দমদম থেকে। তাঁদের বাড়িতে উপনয়ন উপলক্ষে কীর্তন দেবেন তাঁরা, সকালে সুবিধে হবে না, সন্ধ্যায় গাইতে যেতে হবে।

সুরবালা বলল, 'অতদূরে সন্ধ্যেবেলা গাইতে গেলে ফিরব কখন! অজপাড়াগাঁ শুনেছি ওদিকটা। যদি বিকেলবেলা হ'ত তাহলেও না-হয় কথা ছিল।'

'দেখুন সে আপনার যা অভিরুচি।' বেশ শুদ্ধ বাংলা বললেন ভদ্রলোক, 'আমরা বাড়ির গাড়ি, ঝি-দারোয়ান পাঠাতে পারি আপনার জন্যে। তারা নিয়ে যাবে আবার পেঁাছে দিয়ে যাবে। দোয়ার-বাজনদারদের যাওয়া-আসা গাড়ি ভাড়া দোব ; ফেরার সময়ও গাড়ি ঢের পাওয়া যাবে, সে আমরা ডেকে দোব। যতটা অজ পাড়াগাঁ ভাবছেন ততটা নয়—আমাদের ওখান থেকে শ্যামবাজার সেই রাত দশটা পর্যন্ত শেয়ারে গাড়ি চলাচল করে। আপনি নটার মধ্যে গান ভেঙে দেবেন, তাতে আপত্তি নেই। আমাদের বাবুর আপিস থেকে সায়েবসুবো আসবে—তাদের বিকেলে আসার সুবিধে হবে না। তাছাড়া রাত্তির বেলা থিয়েটার দেওয়া আছে—তারা রাত দশটার আগে শুরু করতে রাজী নয়। সন্ধ্যের আগে গান ভাঙলে অতগুলো লোককে আমরা রাত দশটা পর্যন্ত কোথায় বসিয়ে রাখব বলুন?'

সাফ্ সাফ্ কাটাকাটা কথা। অর্থাৎ তুমি যদি রাজী না হও তো আমরা অন্য ব্যবস্থা করব—কিন্তু সময় পাল্টাবে না।

যদিও কথাবার্তা নেই, তবু কেউ বায়না দিতে এলে নিস্তারিণী আজকাল সামনে এসে দাঁড়ায়। আজও দাঁড়িয়ে ছিল। সুরবালা মার মুখের দিকে তাকাল একবার। নিস্তারিণী বলল, 'অসময়ে অতদূরে গাইতে যাওয়া—টাকা কিন্তু বেশী পড়বে।'

'টাকার কথা তো এখনও ওঠে নি। বেশী-কমের কথা তুলছেন কেন?' ভদ্রলোকের কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার, 'আমাদের বাবু একটা ঠিক ক'রে দিয়েছেন, তার মধ্যে হ'লে আমিই ঠিক ক'রে যাব—নয়তো সে-কথা গিয়ে তাঁকে জানাতে হবে।...তা কত নেবেন বলুন।'

'দেড়শো টাকা পড়বে।' নিস্তারিণী গলায় জোর দিয়ে বলে।

'বাবু অবিশ্যি সওয়াশো পর্যন্ত উঠতে বলেছিলেন, ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের ব্যাপার—তা পঁচিশ টাকার জন্যে আটকাবে বলে মনে হয় না। তাই হবে, আমি এই পঁচিশ টাকাই বায়না দিয়ে যাচ্ছি। পরশু পাঁচটায় গাড়ি আসবে, ঝি দারোয়ান থাকবে গাড়ির সঙ্গে। ছোট গাড়ি, বেশী লোক নেওয়া যাবে না। আবার ঐ গাড়ির চালেই মিষ্টি যাবে বাগবাজার থেকে। বাজনদারদের দুখানা গাড়ি করতে বলবেন, ওদের সঙ্গেও লোক দেব, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। ঠিক সময়ে যেন তৈরী থাকে—দেরি হ'লে আমাদের চলবে না, সায়েব-সুবোর ব্যাপার, টাইম-বাঁধা কাজ।'

পঁচিশ টাকা গুনে দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক। বাজনদাররা মতির ওখান থেকে উঠবে—সে ঠিকানা দিয়ে দিল সুরো। তার ছোট বাড়ি—যন্ত্র রাখবার জায়গা নেই, অতগুলো লোক জড়ো হ'লেই বিপদ বাধে। নিজে সে অনেক যন্ত্র কিনেছে বটে, খোল বেহালা ইত্যাদি—কিন্তু সেগুলোও মতির ওখানেই থাকে। নতুন যন্ত্র ব্যবহারও হয় না বিশেষ। যারা বাজায় তারা পুরনো যন্ত্রই বাজাতে চায়, মতির আছেও প্রায় সব

বস্তুই দু-তিন দফা ক'রে—কাজেই কোন অসুবিধা হয় না।...

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি এল। নিস্তারিণী উঁকি মেরে দেখল ওপর থেকে দেখল সুরবালাও। ছোট বুহাম গাড়ি। ঝকঝকে নতুন। বুহাম দেখে নিস্তারিণী একবার ভ্রূ কুঁচকেছিল বটে কিন্তু সইস কোচোয়ান কোন মুখটাই চেনা নয় দেখে একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। যে ঝি-টি নিতে এসেছিল, তারও চালচলন ভাল, বেশ বিনত। এসেই দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রে প্রণাম করল নিস্তারিণীকে, সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় আঁচল বুলিয়ে মাথায় ঠেকাল—না ছুঁয়ে পায়ের ধুলো নেওয়া হ'ল। ঝিয়ের সহবৎ দেখে খুশী হ'ল নিস্তারিণী। সে প্রায়ই বলে, ঝি-চাকরের চালচলন দেখে বুঝবে মনিবরা কী ধরনের লোক। আস্তাকুঁড়ে আনাজের খোসা আর মাছের আঁশ দেখে বুঝবে কেমন খায়, কী কাপড় শুকোচ্ছে দেখে বুঝবে মেয়েদের নজর কেমন!' দারোয়ান বুড়ো, তার ভারিক্কি চাল—কিন্তু কথাবার্তা তারও ভাল।

সুরবালা সেদিনের পর থেকে মায়ের সঙ্গে একটা কথাও বলে নি, কে জানে তারই বা কি মতি হ'ল—একটু ইতস্তত ক'রে যাবার আগে ওদিককার দেওয়ালের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি আসছি তাহলে।'

এতেই বিগলিত হয়ে গেল নিস্তারিণী। প্রথম দিনেই এর চেয়ে বেশী উত্তাপ আশা করা যায় না। 'এসো মা, এসো। দুর্গা, দুর্গা। সকাল ক'রে এসো। রাত হয়ে গেলে আজ আর মতির ওখেনে যাওয়ার দরকার নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল সে।

কদিনের অসহ দুঃখের পর সত্যিই অনেকটা যেন শান্ত হয়ে এসেছে সুরো। অনেক-দিন পরে আজ বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল, মুখচোখের কি হাল হয়েছে দেখে নিজেই শিউরে উঠেছিল যেন। তার পর তাই ভাল ক'রে স্নান করেছে—চুলের জট ছাড়িয়ে তেল দিয়েছে। গায়েও তেল বেসম সাবান উঠেছে। খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছেও। বেশ গাঢ়, নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুম থেকে উঠে আবার আয়নায় মুখ দেখেছে। অনেকটা মানুষের মতো মনে হয়েছে নিজেকেই।...একদৃষ্টে আয়নার দিকে চেয়ে কি ভাবছে অত, নিস্তারিণী একটু অবাক হয়েই দেখে গেছে বার দুই—বাইরে থেকে। তবে মেয়েকে ভাবনের দিকে মন দিতে দেখে একটু নিশ্চিন্তও হয়েছে। ওষুধের ফল ফলেছে দেখে খুশীও। এ জানত নিস্তারিণী, কাঁচা বয়সে কোন দুঃখই পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকে না। তার পরই ভুলে যায়, আবার ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়—জীবন স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে।

আজ সুরোও যেন সেই সব দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিয়েই উঠেছে। পরিপাটী ক'রে চুল বেঁধেছে। আবারও অনেকক্ষণ ধরে গা ধুয়েছে—প্রসাধনও করেছে বেশ সময় নিয়ে—অনেকক্ষণ ধরে। সাজসজ্জাতেও মন গেছে। ভাল দামী বেনারসী শাড়ি পরেছে একখানা। নতুন কেনা মুক্তোর কণ্ঠী বার ক'রে গলায় দিয়েছে। তবে সোনার গয়না খুব বেশী একটা পরে নি—সে জন্যে নিস্তারিণী বরং একটু ক্ষুণ্ণ। কথা নেই তখনও—নইলে নতুন মান-তাসাটা পরতে বলত, আর বাজু। কোমরের গয়না মুখপোড়া মেয়ে তো পরবে না সাত-জন্মে, কত শখ ক'রে ওর জন্যে গোট আর চন্দ্রহার গড়িয়েছিল নিস্তারিণী—আনকোরা পড়ে রইল, মেয়ে একবার অঙ্গে ঠেকাল না বলতে গেলে।...যাকগে, মেয়ের যে আবার ভাবনে মন এসেছে—এই ভাল। কালই আনন্দময়ীতলায় পুজো দিয়ে আসবে সে!...

রাস্তায় পড়েও খুব ভাল লাগল সুরোর। মনে আজ একটা আশ্চর্য শান্তি ফিরে পেয়েছে—একটা আশ্চর্য স্থৈর্য। ভাল লাগছে আরও হয়ত সেই জন্যেই। গাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে দুদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। পুরনো পাড়া। বলতে গেলে জন্মাবধিই

দেখছে। যে মাটির ঘরে ওরা ছিল, মতির বাড়ির পেছনে—তার কাছেই এ বাড়ি এই পাড়া, এসব রাস্তাঘাট বহু পরিচিত, তবু মনে হ'ল অনেকদিন, যেন তাকিয়ে দেখা হয় নি। কত নতুন বাড়ি হয়েছে, কত দোকানপাট। ঐ বেগুনির দোকানটা শুধু সে-ই আছে এক. সেই নটবর বসে ঝ্যাঁটার উলটো দিক ধরে মুড়ি ভাজছে। বোসেদের বাইরের গাঁথা বেঞ্চি দুটো আরও খানিকটা ভেঙে গেছে। মাগো, কত বড় একটা পেল্লায় মুদির দোকান হয়েছে ঐ ঘরটায়। ঐখানে এক বামুন দিনকতক পাঁউরুটির দোকান করেছিল না? বামুনের রুটি বলে খুব চল হয়েছিল প্রথম প্রথম। সেটা বুঝি উঠে গেল তাহলে?...

দুঃখকষ্টে যখন দিন গেছে তখন তো বেরনোর প্রশ্নই ছিল না। থিয়েটারে গিছল যে ক'মাস, গাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে যেত, ঘাড় হেঁট ক'রে বসত। ইদানীং বাইরে মুজরো করতে যাওয়া আসার সময়ও অত যেন কোনদিকে তাকাবার কথা মনে পড়ত না। নিজের চিন্তা—কি গান গাইবে, কোনটার পর কোনটা, আবার যা গাইল তার মধ্যে কোন্ গানটা শ্রোতারা 'নিল' বেশী—এসব তো থাকতই—বাড়ির ভাবনাও থাকত, বাবা, ভাই, মা, ঘর-বাড়ি, ভবিষ্যৎ। চেয়ে থেকেছে হয়ত বাইরের দিকে, চোখেও পড়েছে সব—কিন্তু নজরে পড়ে নি। আজ যেন নতুন ক'রে শহরটা নজরে পড়েছে—বহুকাল পরে। থিয়েটারের প্ল্যাকার্ডগুলোও আজ পড়ে দেখতে লাগল। নানুদার নামও আজকাল বেশ বড় হরফে ছাপা হচ্ছে তো। বাবা! নানুদার এত নাম হয়েছে! বলে নি তো, কী চাপা লোক দ্যাখো! এ বইটা খুব চলছে বটে। অপেরা—শুধু নাচগানের বই—মোটে সাড়ে তিনঘণ্টা হয় নাকি—তবু বিক্রী খুব! ভাড়াটে বৌটি দেখতে গিয়েছিল, সে-ই এসে গল্প করছিল। তবে নানুদারই যে জয়-জয়কার তাতে—তা বলে নি। আশ্চর্য! কত কী কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, সে কোন খবরই রাখে না।...

গাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে সোজা উত্তর দিকে চলল। জনবিরল গৃহবিরল রাস্তা। পথে গাড়ি-ঘোড়া চলছে বটে—তবে অধিকাংশই ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়ি—শেয়ারে ভাড়া নিয়ে যাতায়াত করছে। বড় বড় বাগান মধ্যে মধ্যে—নইলে জলা আর জঙ্গল, এ ছাড়া কিছু নজরে পড়ে না। বস্তি আছে—গোলপাতার চালা নয়ত খোলার ঘর। তবে সেও খুব বেশী নয়। জঙ্গলই বেশী।

দেখতে দেখতে সে জঙ্গল যেন আরও নিবিড় হয়ে এল দুপাশে—বসতি আরও বিরল।

দমদম জানে সুরবালা। দমদমে দু-এক দিন গেয়ে এসেছে সে এই হালেই। সকালের দিকেই গেয়েছে—দুপুরে ফিরেছে, মোটামুটি দু'একটা চৌরাস্তার মোড় সে জানে, দেখলে চিনতে পারবে। এ সে রাস্তা নয়। এত দূরও নয় দমদম। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণও ম্লান হয়ে এল, গাড়ি চলছে তো চলছেই—পথ আর ফুরোচ্ছে না। এমন কিছু আস্তেও চলছে না ঘোড়া, একভাবে ছুটছে। বুহাম গাড়ি বটে—ছোট ঘোড়ার জুড়ি, কিন্তু দামী শক্ত ঘোড়া, একভাবেই চলছে, এতক্ষণে বহুদূরে এসে পড়ার কথা।

গাড়ি ক্রমশ কাঁচা রাস্তায় পড়ল। অন্ধকার তো বটেই—সংকীর্ণও হয়ে এল পথ। মনে হ'তে লাগল দু পাশের ঘন জঙ্গল যেন মুষ্টি বন্ধ করছে আস্তে আস্তে, এখনই একেবারে টিপে ধরবে। ফাঁদে পড়ার মতো মনে হ'তে লাগল।

ভয় পাবারই কথা। চেঁচামেচি করার কথা। গাড়ি থামাতে বলার কথা। নিজের লোক কেউ নেই সঙ্গে। দোয়ার বাজনদার কত দূরে, কোন্ গাড়িতে তা কে জানে, এইদিকেই আসছে কিনা তারই বা ঠিক কি! এইভাবে অপরিচিত লোকের সঙ্গে অজানা জায়গায় আসতে রাজী হওয়াই ভুল হয়েছে। মস্ত বড় ভুল! মা এত সতর্ক, সাবধানী—অথচ তারও একবার মনে পড়ল না কথাটা। রূপসী অল্পবয়সী মেয়ে, গায়ে একগা গহনা। কে গাড়ি পাঠিয়েছে, কারা নিতে এসেছে, সঙ্গে নিজের কোন লোক দেওয়া দরকার—এসব প্রশ্নই তার মনে জাগল না। একেই কি তবে নিয়তি বলে? বাবা বলতেন, অদৃষ্টে যেদিন

বিপদ থাকে সেদিন ভাগ্য এসে মানুষের চোখ বন্ধ ক'রে দেয়, সোজা সহজ তথ্যগুলোও তার চোখে পড়ে না।

খুবই ভয় হবার কথা—কিন্তু কে জানে কেন তেমন ভয় হয় না সুরবালার। বরং সে যেন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় শান্ত হয়ে কথাগুলো ভাবে। কী কী ভুল হয়েছে তাদের, মার কি নজরে পড়া উচিত ছিল ; বাইরে অচেনা বাড়িতে যাকে মুজরো করতে যেতে হয় তার সঙ্গে নিজের দারোয়ান থাকা দরকার ; মতি দারোয়ান বা চাকর ছাড়া কোন অপরিচিত জায়গায় যায় না—বাগবাজার বৌবাজারেও না ; ওরও একজন দারোয়ান রাখা উচিত ছিল। চেনা বিশ্বাসী দারোয়ান ; আজও অন্তত দুজন পুরুষ দোয়ার বা বাজনদারের সঙ্গে ছাড়া আসতে রাজী হওয়া উচিত হয় নি। সন্ধ্যের পর এ রাস্তায় আসা বা এ পাড়ায় মুজরো নেওয়াই উচিত হয় নি কোনমতে।...

বেশ শান্ত হয়েই ভাবে সুরো—হিসেব ক'রে ক'রে। যেন এসব ভাবার মতো অবসর প্রচুর—চিন্তাটাও বিলাস মাত্র। তার যেন একটু কৌতুকও অনুভব হয়। সে কৌতুকের একটা ক্ষীণ চিহ্ন হাসির ভঙ্গীতে লেগে থাকে দুই ওষ্ঠপ্রান্তে। সামনের আসনে ওদের যে ঝি বসেছিল সে একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এতক্ষণ চেঁচামেচি শুরু করবে, কান্নাকাটি করবে সুরো—এইটেই সে আশঙ্কা করেছিল বোধহয়। তার এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে—এই ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে সে যেন কেমন হকচকিয়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।...

শেষ পর্যন্ত গাড়িটা একটা বড় ফটক পেরিয়ে একটা বাগানে ঢুকল। প্রায় অন্ধকারই হয়ে এসেছে তখন, তবুও কিছু কিছু নজর চলে। বেশ বড় বাগান। বাগানের ভেতরের পথ সরকারী রাস্তার চেয়ে ঢের বেশী চওড়া। পথের দুদিকে দুটো বড় পুকুর। নানান ফল ফুলের গাছ, ফুলের কেয়ারি। মধ্যে মধ্যে বোধহয় কিছু আনাজের চাষও আছে, সেটা এই সামান্য আলোয় বোঝা গেল না এতদূর থেকে। তবে বাগান যত বড়ই হোক—কোন ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান যে এখানে নেই তা ঢুকেই বোঝা যায়। কর্মবাড়ির প্রধান লক্ষণ আলোকসজ্জা—তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। বেশ খানিকটা বাগান ভেঙে ভেতরে দোতলাবাড়ি—বড়লোকের বাগানবাড়ি যেমন হয় তেমনিই—হয়ত মাঝের ঘরটা নাচঘর হবে —গাড়িবারান্দাও আছে, সবই ঠিক—কিন্তু না আছে লোকজন না আছে আলো। গাড়িবারান্দার মাথায় একটা তেলের আলো ঝুলছে মিটমিটে রকমের ; তার ভেতর দিয়ে হলঘরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে—ঝাড় জ্বলছে বটে, সম্ভবত একটিই ছোট ঝাড়, তাতে এমনিতেই যথেষ্ট আলো হয় নি। ওপরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে তবে সেও সাধারণ আলো— প্রতিদিন তাদের ঘরে যা জ্বলে তেমনি। আর লোক তো একেবারেই নেই, কোথাও একটা দারোয়ান মালী পর্যন্ত চোখে পড়ল না। যে দারোয়ান সঙ্গে এসেছিল সে কোচোয়ানের পাশে বসে ছিল এতক্ষণ, সে-ই লাফিয়ে নিচে নেমে ফটক খুলে দিল আবার গাড়ি বাগানে ঢুকলে বন্ধ করল। তারপর সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি থামতে প্রায় অন্ধকারের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন যে মানুষটি —তাঁকে অন্ধকারেও চিনতে পারত সুরবালা—রাজাবাবু। নিজে গাড়ির দরজা খুলে হাত ধরে সুরবালাকে নামালেন।

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?' ভেতরে যেতে যেতে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন রাজাবাবু। সুরবালার মুখে চোখে কোন বিস্ময় বা অপ্রত্যাশিতের চমক লাগল কিনা, কিম্বা বিরক্তির, সেই ক্ষীণ আলোতেই লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন।

'কৈ, না তো।' সহজভাবেই উত্তর দেয় সুরো।

'ভয় পাও নি? সে কি! আমি ভেবেছিলুম খুবই ভয় পাবে। ঝিয়ের কাছে চিঠি

দেওয়া ছিল আমার। চেঁচামেচি করলে বার ক'রে দেখাবে—বলা ছিল।'

পিছন দিকে ঈষৎ ফিরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান ঝিয়ের দিকে।

ঝি আঁচলে বাঁধা চিঠিটা তুলে দেখিয়ে বলে. 'দরকারই হ'ল নি যে! দিদি সব জানে বলে মনে হ'ল তো আমার। একটা রাও কাড়লে নি,—ঠায় চুপ ক'রে বসে অইল গ্যাত্‌টা পথ!'

'আশ্চর্য তো! কিসে বুঝলে?' রাজাবাবু প্রশ্ন করেন সুরোকে।

'ঠিক যে কোন লক্ষণে বুঝেছি তা নয়। হঠাৎই মনে হ'ল। এমনিই ভাবছিলুম, ঠাকুরকে ডাকছিলুম তুমি যেন জোর ক'রে তোমার কাছে টেনে নাও, নিতে পারো। সেদিন কেমন মনে হ'ল ঠাকুরই স্থানে থেকে কানে শুনেছেন। সেদিন মানে—ঐ লোকটা যেদিন বায়না দিতে গেল।...মন অন্তর্যামী বলে—তাই হবে বোধহয়। তখন থেকেই মনটা আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেল। দুঃখ দুশ্চিন্তা কিছুই রইল না। কী করব—একদিকে তুমি আর একদিকে আমার গান, আমার নাম যশ প্রতিপত্তি টাকা, মা ভাই—বড় সাংঘাতিক দোটানায় পড়েছিলুম, কিছুই ঠিক করতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল তুমিই আমার হয়ে যা ভাল হয় ঠিক করবে। সেদিন মনে হ'ল ঠিক করেছ। আশ্চর্য একটা শান্তি পেলুম মনে, আমার আর কোন দায়দায়িত্ব রইল না—যেন বেঁচে গেলুম।'

খুব আস্তে আস্তে বলছিল সুরবালা, ছেলেমানুষের মতোই। থতিয়ে থতিয়ে, যেন কতকটা আধো আধো কথার মতো। রাজাবাবুর হাত ধরে তাঁর হাতে ভর দিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে। রাজাবাবুও আবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন। এ তাঁর কাছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য, সুদূর আশাতীত সুখ। এতটা ভাবতে পর্যন্ত যেন সাহস করেন নি—যখন এই চক্রান্ত করেছিলেন, যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই করেছিলেন, চরম দুঃসাহসের কাজ করছেন বুঝেই। এখন মনে হচ্ছে কথা নয়, খুব—খু-ব মিষ্টি কোন গান শুনছেন। এত বিস্ময় এত আনন্দ আর কখনও বোধ হয় নি। কোন বিস্ময়, কোন অভাবনীয়ত্বে যে এত আনন্দ থাকতে পারে, তাও তিনি জানতেন না।

ওপরে পৌঁছে হলঘর পেরিয়ে পূর্বদিকের ঘরে ঢুকল ওরা। বড় খাটে শুভ্র সুন্দর শয্যা। খাটের বাজুতে বাজুতে ফুল। ফুলের গোড়েমালা জড়ানো। সুরবালা যা ভালবাসে—জুঁই বেল মল্লিকার গোড়ে। সেই প্রথম দিনের—মানে ওদের দেখা যেদিন প্রথম—আসরের মতো গোড়ে মালারই ঝালর ঝুলছে চারদিকে, খাটের ছত্রিতে ছত্রিতে। দেওয়ালের গায়েও। খাটের পাশে সাদা পাথরের উঁচু চৌকীতে ঝকঝকে দুটি রুপোর চুমকী ঘটিতে খাবার জল। একটা জলচৌকীতে গড়গড়া। মেঝেতে নরম জাজিমের মতো কি পাতা। খাটের ওপরে টানা পাখা—তাতেও ফুলের সমারোহ। একটিমাত্র ঝাড়—তাতে চার-পাঁচটা রেড়ির তেলের শেজ জ্বলছে, সেটুকু আলোও লতাপাতায় আবছা অস্পষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।

মিনিট কয়েক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজাবাবু; সুরো কোন প্রশ্ন করল না, কেন দাঁড়াচ্ছে তাও বুঝতে চাইল না। রাজাবাবুর হাতটা শক্ত ক'রে ধরেছে—সেটা তার পরম নির্ভর, পরম নির্ভয়। আর কিছুই জানতে চায় না সে, ভাবতে চায় না।

খানিকটা সেখানে থেকে ঈষৎ একটু আকর্ষণ ক'রে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন রাজাবাবু।

এ ঘরের সম্পূর্ণ ভিন্ন সজ্জা। প্রথমেই মনে হয় বুঝি কোন পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের বড় যুগল মূর্তির পট, ফুলে-মালায় সাজানো। তার সামনে আলপনা দেওয়া জায়গায় আম্রপল্লব দেওয়া পূর্ণ ঘট। পাশে একটি বড় থালায় দুটি মালা, রুপোর বাটিতে চন্দন।

'আমি সকাল থেকে উপবাস ক'রে আছি সুরো। বাইরের অনুষ্ঠান তো সম্ভব নয়,

তুমি বামুন, আমি বেনে—কিন্তু তোমার ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুরের কাছে তো সব সমান, তাঁর কাছে প্রেমই বড়। তাঁর সামনে তাঁকে সাক্ষী রেখেই আমরা আজ মালা বদল করব। আমাদের বিয়ে হবে।'

সুরো গলায় আঁচল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই পটমূর্তির সামনে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল, তারপর ফিরে রাজাবাবুকেও। তারপর উঠে সে নিজেই এবার তাঁর হাত ধরে আকর্ষণ করল, 'চলো ও ঘরে যাই!'

'এ ঘরে—এ ঘরের কাজটা করবে না।'

'না। ওতে আর দরকার নেই। আমার ঠাকুরের কথা বলছিলে না—আমার এই গানের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর? উনিই শিখিয়েছেন ভালবাসার লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হ'লে সব বিসর্জন দিতে হয়। মেয়েদের কাছে লজ্জা অনেক বড়, বস্ত্রহরণ ক'রে তিনি গোপিনীদের লজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন দিইয়েছিলেন। মাসী কথাটা বার বার বলেছে আমাকে, এই সেদিনও বলেছে। দ্যাখো, যশ আর টাকা—মানুষের কাছে সবচেয়ে লোভের বস্তু, আকিঞ্চের বস্তু—চিরদিনের মতো ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি, নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিতে সঁপে দিতে—সেখানে ঐ তুচ্ছ মালাবদলের অহঙ্কারটুকুই বা রাখব কেন? তুমি আমাকে দাসীর মতোই পায়ে ঠাঁই দাও, বাঁধা মেয়েমানুষের মতো ক'রেই নাও, তুমি আমাকে বেশ্যার চোখে দ্যাখো—যা খুশি। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাবো না। কোন কথাই ভাবব না।...তোমার পায়ে সঁপে দিলুম আমাকে—এইটুকুই শুধু জানব, এর বেশী নয়। কোন অহঙ্কার কোন ভরসা কোথাও না থাকে। আজ থেকে যা ভাববার যা করবার তুমি ভাববে, তুমি করবে। যদি কোনদিন তাড়িয়ে দাও, সেদিনও ঝগড়া করব না, কপাল চাপড়াব না। বলব না যে আমার কি হ'ল। এইটুকু ক'দিনে বুঝেছি—তুমিই আমার সেই ঠাকুর, তোমাকে পাবার জন্যেই এতদিন এত গান গেয়েছি, এত কেঁদেছি।'

॥ ২০ ॥

রাত দশটার পর থেকেই নিস্তারিণীর প্রশান্তি নষ্ট হয়েছে। এগারোটা বাজতে চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে সে। আরও রাত হ'তে আর স্থির থাকতে পারল না, ঘরদোরে তালা লাগিয়ে ভাড়াটেদের একটু নজর রাখতে বলে ঝিকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়ল মতির বাড়ির উদ্দেশে।

মতিরা তখন সব শুয়ে পড়েছে। কোথাও গানের বায়না না থাকলে মতি ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়ে। রাত্রে আজকাল একটু দুধ—বড়জোর তার সঙ্গে একটু আম মিষ্টি খায়। তার জন্যে রাত অবধি বসে থাকার দরকার হয় না। ক্ষিদে হ'ল কিনা অত ভাবে না।

ঝি-চাকর দারোয়ানদের অবশ্য একটু দেরি হয়, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাড়িঘরে চাবি দিয়ে শুতে। কিন্তু সে-সময়ও পেরিয়ে গেছে। বাজনদাররা কোথাও যন্ত্র নিয়ে গেলে আবার এখানে এসে জমা ক'রে রেখে যায়। কিন্তু সেটারও কোন বাঁধাধরা আইন নেই। খুব রাত হয়ে গেলে, এমন হয়ও—গান শেষ হ'লেও খেতে ছাঁদা বাঁধতে দেরি হয়ে যায়, যন্ত্রপাতি যে-যার বাড়িতে নিয়ে যায়—সকালে এসে আবার এখানে জমা

করে। এরা সেই সময় পর্যন্ত দেখে আজ শুয়ে পড়েছে। এগারোটা বেজে গেছে, আর কখন ফিরবে?

নিস্তারিণীর কান্নাকাটি চেঁচামেচিতে দারোয়ান উঠল। নিস্তারিণীকে সে দেখেছে এর আগে. চেনে। খবর শুনে গিয়ে গিরি-ঝিকে ডাকল। গিরি-ঝি মতিকে ডাকবে কিনা ইতস্তত করছিল—নিচে চেঁচামেচি শুনে মতি নিজেই উঠে এল।

'সেকি! সুরো এখনও ফেরে নি? কোথায় গেছে? দমদম? ঠিকানা কি? কার বাড়ি?...হ্যাঁ রে শিউনন্দন—এরা ফেরে নি এখনও? সেকি কথা! ওমা—আমার আবার পেটটা মুচড়ে উঠল দ্যাখো—'

মতির এ দীর্ঘদিনের রোগ। কোন বিপদ বা দুঃসংবাদ শুনলেই পেট মুচড়ে ওঠে। গিরি ওর মধ্যেই চোখ টিপে হেসে অভয় দিল নিস্তারিণীকে, 'ভয় নেই, দু' মিনিট। এ বরং ভালই হ'ল, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, বুদ্ধি খেলবে মাথায়।'

হ'লও তাই। মতি এসেই গিরিকে প্রশ্ন করল, 'কে কে গেছে রে আজ ওর সঙ্গে জানিস? ওর ব্যায়ালাদারের তো অশৌচ, সে যাবে না। আমার হারানচন্দর গেছে কি? গেছে?...সে তো এই মোড়ের মাথাতেই থাকে। শিউনন্দন, যা বাবা যা—ছুটে যা একবার, খবরটা নিয়ে আয়।'

কিন্তু শিউনন্দন যা খবর আনল তাতে দুশ্চিন্তা বাড়ল বই কমল না! হারান তখনও ফেরে নি। তার বৌও ভাবছে। হারানের অবশ্য একটু নেশাভাঙ করা অভ্যাস আছে, হাতে পয়সা পেলে আর বাগবাজার পথে পড়লে একবার নামে সাধারণত—কিন্তু যন্তর সুদ্ধ কখনও যায় না। গাড়ি গেলে গাড়িতে তুলে দেয়, না হ'লে অন্য কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কেউ ফেরে নি, যন্তরও আসে নি শুনে নাকি হারানের বৌ এখন পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

খবর আরও দু-তিনজনের কাছে নিতে পাঠানো হ'ল। সর্বত্র সেই একই বার্তা—কেউ এখনও ফেরে নি, যন্ত্রও আসে নি।

এবার মতির মুখও অন্ধকার হয়ে উঠল দুশ্চিন্তায়, সে নিস্তারিণীর ওপরই ঝেঁঝে উঠল, 'অত দূরে—কেউ চেনা নেই শুনো নেই—বাজনদার দোয়াররা একদলে যাবে, সুরো আর একদলে যাবে প্রেথকভাবে—না দিদি, তোমার এ পাঠানো ঠিক হয় নি। এ আমি একটুও ভাল বুঝছি না। ঠিকানা পর্যন্ত রাখো নি। আশ্চর্য! তারা বললে ঝি-দারোয়ান পাঠাবে আর তুমি মেয়ে ছেড়ে দিলে! সোমত্ত সোন্দর মেয়ে। ই কি কথা! ...বেশ করেছ, এখন থানায় যাও!'

'থানায় যাবো! আমি যাবো!'

'ওমা, তা যেতে হবে না! তোমার মেয়ে। তাছাড়া কী বলে গেছে, কোথায় বায়না কী বিত্তান্ত—তোমাকেই তো জেরা করবে তারা, সব না জানলে কি করবে বলো।... আমি বরং কোচোয়ানকে গাড়ি বার করতে বলি, শিউনন্দন সঙ্গে যাক...থানায় গিয়ে লিখিয়ে এসো।'

নিস্তারিণী এবার পা ছড়িয়ে হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে। শিউনন্দন ঘড়ি দেখে বলে, 'মা, রাত তো চারঠো বাজিয়ে গেল—আর আধঘণ্টা যাইতে দেন, সোকাল হোক—এখন গেলে কেউনো থানাদার কেস লিখবে না।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত। এমনিই পূর্বদিক ফরসা হয়ে এসেছে! আর আধঘণ্টা না হোক, একঘণ্টার মধ্যে বেশ সকাল হয়ে যাবে। এর মধ্যে একবার সুরোদের বাড়িও লোক পাঠিয়ে খবর নেওয়া যাবে—এল কিনা।

কিন্তু তার আগেই হৈ-হৈ করতে করতে দোয়ার-বাজনদারের দল এসে পড়ল। যন্ত্র-

পাতি কারও সঙ্গেই কিছু নেই ; জামাকাপড় ছেঁড়া, চেহারাও তথৈবচ, মারধোর খাওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

এদের ঐ অবস্থা দেখে কোন প্রশ্ন করার কথাও মনে এল না নিস্তারিণীর, আর একদফা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল সে। মতিই প্রশ্ন করল, ওরা কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'সুরো, সুরো কৈ?'

'জানি না। কিচ্ছু জানি না।' হারান মুখ গোঁজ ক'রে উত্তর দেয়, 'তার জন্যেই তো এই হাল! কোথায় কি কেউ জানে না—যমের দক্ষিণ দোর না উত্তর দোর, ধাধধাড়া গোবিন্দপুর—বায়না নিয়ে বসল। সেও এমনি মার খায় তো আমাদের শান্তি, আমাদের দুর্গতির শোধ ওঠে।'

'আচ্ছা হয়েছে, হয়েছে! কী খবর কি না—কিছু শুনলুম না, মিনিয্য কাটতে বসল। বলি কি হয়েছেটা কি?' ধমক দিয়ে ওঠে মতি।

খবরটা ছিদাম খোলবাজিয়ের কাছ থেকেই পুরো পাওয়া গেল। সে বুড়োমানুষ, তবু সে-ই এদের মধ্যে মাথাঠাণ্ডা লোক, গুছিয়ে বললও সে। যে পথ দেখাবে বলে এসেছিল ওদের নিতে, সে শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে হারানের হাতে দিয়ে নেমে যায়, বলে তার মিষ্টি না কি নিয়ে যাবার কথা, সেখানে বাবুরা থাকবেন, সরকার থাকবে, ওরা গেলেই ভাড়া চুকিয়ে দেবে, কোন অসুবিধা হবে না।...সেই মতো গিয়েও ছিল ওরা, কিন্তু অনেকদূরে যাবার পরও, যে-ঠিকানা লিখে দিয়েছিল, সে-নামের কোন বাড়ি কি রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল না। এ বলে বোধহয় ঐদিকে—সেদিকে গেলে বলে—না, এখানে ও নামে কেউ নেই, অমুক জায়গায় দ্যাখো, থাকলে সেদিকেই থাকবে। খুঁজতে খুঁজতে যখন সন্ধ্যে হয়ে গেল, একটা জঙ্গলপানা জায়গায় গিয়ে গাড়োয়ানরা গাড়ি থামিয়ে বলে—মিছিমিছি তারা ঢের হয়রান হয়েছে, তাদের ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হোক : আরও বলে, যে-ভাড়া ঠিক হয়েছিল, সে-ভাড়া তারা নেবে না, বেশী ভাড়া চাই। আর যদি ফিরতে হয়—সেও আগাম ভাড়া হাতে পেলে তবে গাড়ি ছাড়বে তারা।

এরা তো একেবারে অগাধ জলে পড়ল। ট্যাঁক সকলেরই ঢু-ঢু। টাকা রোজগার করতে যাচ্ছে, খরচ করতে তো যাচ্ছে না, সঙ্গে নেবেই বা কেন? 'ঠেঙ্গে' যা আছে—সকলের সব পয়সা জড়ো করলেও পুরো একটা টাকা হবে কিনা সন্দেহ। এরকম কোন অভিজ্ঞতাও তো নেই, এমন কাণ্ড কখনও হয় নি তাদের জানাশুনোর মধ্যেও, যারা নিয়ে যায় সমাদর ক'রে নিয়ে যায়, হয় তারা নিজেদের গাড়ি পাঠায়, নয় তো তারাই গাড়ি ভাড়া করে, কত ভাড়া সে-খবরও রাখে না এরা অনেক সময়। দৈবাৎ যদি বা চেনাশুনো জায়গায় এদের ভাড়া ক'রে যেতে বলে, দরজার কাছেই সরকার দাঁড়িয়ে থাকে, যাওয়া মাত্র ভাড়া চুকিয়ে দেয়।

এরা সেই কথাই বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিল, 'বাপু, আমাদের তো ভাড়া দেবার কথা ছিল না, আমরা কেউই টাকা নিয়ে বেরুই নি। তা যা হবার তা হয়ে গেছে—এখন যেখানকার লোক সেখানে পৌঁছে দাও—ভাড়া যা হয় পাই-পয়সা চুকিয়ে দোব।'

তারা সে-কথা কানে করে নি। মারমুখো হয়ে উঠেছিল। তাই নিয়ে তর্কাতর্কি, ঝগড়া। দেখতে দেখতে কোথা থেকে সেই জঙ্গলের মধ্যেই গুণ্ডাগোছের গোটাকতক লোক এসে জড়ো হ'ল, এক রকম ঘিরেই ধরল ওদের। কে জানে আগে থাকতেই কোন যড় ছিল কিনা—দেখেশুনে তো তাই মনে হয় ; হয়ত সুরোকে আলাদা ক'রে নিয়ে গেছে সেই কারণেই ; এতক্ষণে হয়ত গঙ্গার পার ক'রে দিল, মগেদের হাতে কিম্বা পাঠান মুলুকে, সেসব দেশে নাকি বাঙ্গালীর মেয়ের খুব কদর, সুন্দরী মেয়ে হ'লে

তো কথাই নেই—চার-পাঁচ হাজারে বিক্রী হয়ে যাবে। পাঠানরা নাকি কিনে আরও পশ্চিম-দিকে চালান দেয়, সেখানে একো একো সুলতানের দু' হাজার আড়াই হাজার ক'রে বাঁদী আছে—তারা পনেরো-বিশ হাজারে লুফে নেবে।

তা সে যা-ই হোক, মোদ্দা কথা দেখা গেল, সেই গুণ্ডাগুলো সব ঐ গাড়োয়ানের দিকে, সব কটার এক রা, তোমাদেরই অন্যায় হয়েছে, গরীব বেচারাদের হয়রান করেছ —এখন ভাড়া চুকিয়ে দাও, দুখানা গাড়ির পাঁচ টাকা, আর যদি ফিরে যেতে হয় তো আরও অন্তত তিন টাকা, নইলে সহজে ছাড়া হবে না। যাদের একটা পুরো টাকারই সংস্থান নেই—তারা দশটা টাকা কোথায় পাবে? ফলে আরও খানিকটা তকরারের পর ওদের মারধোর ক'রে যন্তরগুলো কেড়ে নিয়ে সেই দুখানা গাড়িতে চেপেই চলে গেল। ওরা সেই সেখান থেকে সারাটা পথ হেঁটে লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে ফিরছে। তাই কি সোজা? আশেপাশে না আছে বাড়িঘর, না আছে কোন লোকালয়—কাকে পথ জিজ্ঞাসা করবে? সঙ্গে একটা আলো পর্যন্ত নেই কারও যে চাকার দাগ দেখতে দেখতে ফিরবে। আন্দাজে এ-পথ ও-পথ ক'রে অনর্থক কত যে ঘুরেছে তার ইয়ত্তা নেই। পরে তো আরও মুশকিল, রাত হয়ে গেছে, যদি বা কোন বাড়ি পাওয়া যায়, তারা অতগুলো লোকের গলার আওয়াজ পেয়ে ডাকাতের দল ভেবে সাড়া দেয় না, আলো নিভিয়ে ভেতরে বসে দুর্গা নাম জপ করে। এই ক'রে এক সময় যদি বা শ্যামবাজারের মোড়ে পোঁচেছে, গাড়ির আড্ডায় গিয়ে গাড়ি ভাড়া করতে যাবে—ওদের ঐ চেহারা আর জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে মাতাল মনে ক'রে কেউ গাড়িতে চড়ায় নি, আগাম ভাড়ার চেহারাটা দেখতে চেয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত হেঁটেই ফিরতে হয়েছে ওদের। ক্ষিধে, মার খাওয়া—তার ওপর এতটা হাঁটা—আধমরারও বেশী হয়ে গেছে ওরা, প্রাণটা ঠোঁটের কাছে এসে ধুক ধুক করছে—এখনই কিছু খেতে না পেলে বাঁচবে না।

এই বলে আর একদফা নিস্তারিণীর সামনেই সুরবালার অবিমৃশ্যকারিতার জন্যে তার পিতৃমাতৃ-উচ্ছন্ন ক'রে—তাদের বিবরণ শেষ করল।

তা হোক—ওরা যখন ফিরেছে, ওদের জন্যে চিন্তা নেই—যন্ত্রও আবার হ'তে পারবে কিন্তু সুরবালার কি হবে?

নিস্তারিণী পাঠান নয় তো মগের কাছে বিক্রীর কথা শুনে মাথা খুঁড়ে কপাল চাপড়ে পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা বাধিয়েছিল। এখন বলল, 'তাহলে তোমার কোন লোককে দাও দিদি, আমি এখুনি থানাতে চলে যাই।'

থানায় যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও কারও মনে পড়ল না। হারান বলল, 'যা হয়েছে না হ'তে আছে. চলো এক গেলাস ক'রে জল খেয়ে নিয়ে আমরাও যাই একসঙ্গে থানায়—মামলাটা লিখিয়ে আসি। একসঙ্গেই লেখানো ভাল। জোর হবে।'

মতি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। সে এবার বলল, 'দিদি, তার আগে কিন্তু আর একটা কাজ করলে ভাল হ'ত ভাই। কে তোমার নানু না কে ছেলে আছে—তার ঠিকানা তো জানো—তাকে একটুকুন খবর দিলে হ'ত। ঐ আহিরীটোলার রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে একটু জিজ্ঞেসবাদ ক'রে আসত! তারই হাত নেই তো এর মধ্যে? তুমি নাকি একদিন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেলে? আমার ঝি বলছেল, তোমার ঝিয়ের কাছে শুনে এসেছে?...এরা গেলে তো পাত্তাই পাবে না, নানু শুনেছি সাত-হাটের কানাকড়ি—সে ঠিকই খোঁজটা আনতে পারত।'

নিস্তারিণীর মাথায় এতক্ষণ কথাটা যায় নি, সে চোখের জলের মধ্যেই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, 'তাহলে তো আরও থানায় যাব, ওর হাতে দড়ি পরিয়ে তবে ছাড়ব। রাজা! অমন অনেক রাজা দেখিছি। কোমরে দড়ি হাতে হাতকড়ি পরাব। এ মহারাণীর রাজত্ব, কোম্পানীর রাজত্ব—ওসব রাজাগিরি খাটবে না।'

মতি আর বাধা দিল না! ঘরে মিষ্টি অঢেল পড়ে থাকে—দোয়ারবাজনদারের দল এক-একটা মুখে দিয়ে একঘটি ক'রে জল খেয়ে দল বেঁধে থানায় গেল নিস্তারিণীকে নিয়ে। নিস্তারিণীই শুধু মুখে একবিন্দু জল দিল না।

থানায় দারোগাবাবু মন দিয়ে সব শুনলেন। সুরবালার কথাও। নিস্তারিণীর এজাহারও লিখে নিলেন। এদেরই কার মুখে রাজাবাবুর নামটা বেরিয়ে পড়েছিল—তাও শুনলেন। জেরা ক'রে সে বিবরণও জেনে নিলেন নিস্তারিণীর মুখ থেকে—ব্যাপারটা কি, কতদূর গড়িয়েছিল। সবটা নিস্তারিণী বলল না, বলতে পারল না, যতটা জানে বলল। সব বলে বলল, 'তুমি বাবা লক্ষেশ্বর রাজ্যেশ্বর হবে—হেই বাবা, মেয়েটাকে আমার এনে দাও!'

দারোগা বয়স্ক লোক, নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়। সিপাই থেকে দারোগা হয়েছেন। তিনি এক ধরনের শুষ্ক হাসির সঙ্গে বললেন, 'দেখুন বুড়িমা, মেয়ে আপনার ডাকসাইটে মেয়েছেলে। অনেকেই একডাকে চিনবে। তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে—এত সোজা নয়। এ সে আগেকার নবাবী আমল নয়, বর্গীর আমলও নয়। এ ইংরেজ রাজত্ব। তাছাড়া এ যা শুনছি, মেয়ের আপনার সায় না থাকলে এ ধরনের বায়না সে নিত না। একেবারে অজানা-অচেনা বাড়ি, অত দূর, সঙ্গে নিজের লোক একজনও থাকবে না—এতে খুব ছেলেমানুষও রাজী হয় না। দেখুনগে, তার কে ভালবাসার লোক নিয়ে গেছে, সবটাই সাজানো। জেনেশুনে স্বেচ্ছায় গেছে।'

'তা—তা বলে তার প্রতিকার হবে না', নিস্তারিণী রুখে ওঠে, 'এ তোমাদের কেমন আইন?'

'প্রতিকার হবে না কেন? মেয়ে আপনার নাবালক হ'লে হ'ত। মেয়ের কি আপনার একুশ বছর বয়স হয় নি?...সে যদি বলে আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি?'

'যদি বলি একুশ বছর হয় নি?'

'আপনি বললে তো হবে না—প্রমাণ করতে হবে। ওসব ছাড়ুন। আপনি দেখুন তার কে ভাবিসাবি আছে—আপনাদের ঠিকই মনে পড়বে—সেখানে খোঁজ করুন। আর যদি মনে করেন আপনার মেয়ে নাবালক, প্রমাণ করতে পারবেন তো খবরটা এনে দেবেন, আমরা গিয়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে আনব।...কিন্তু পারবেন কি? ভেবে দেখুন। আপনার মেয়ে এত নামকরা গাইয়ে, এতদিন ধরে গাইছে, তার এখনও একুশ বছর বয়স হয় নি—এ শুধু মুখের কথায় হাকিমকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। তাহ'লে আবার ডাক্তারি এগজামিন করাতে হবে। সে বড় ফৈজৎ। তখন যদি প্রমাণ হয় মেয়ে সাবালক—ইচ্ছে ক'রে গেছে, তখন ঐ হাতকড়া উলটে আপনার হাতেই পড়তে পারে। মহা কেলেঙ্কার হবে—কাগজে লেখালেখি। ভেবে দেখুন!'

খাতা বুজিয়ে রেখে দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ এদের আর সময় দিতে চান না।

বাইরে বেরিয়ে এসে ছক্কাড়ি লাফাতে লাগল, 'এ ঘুষ খেয়েছে মাসিমা, বলতে পারি দারোগা শালা লিঘ্যশ ঘুষ খেয়েছে। ঐ যে সেই বলেছেন, রাজা বাহাদুর না কে—সে-ই ঘুষ খাইয়েছে লিঘ্যাৎ!'

'নে নে, থাম বাপু! খুব হ'ল থানায় এসে, প্যাজ পয়জার দুনোগার!' অপ্রসন্ন মুখে শম্ভু দোয়ার বলে, 'ঘুষ খাওয়ার তো প্রমাণ নেই, কী করবি তার? মাঝখান থেকে বাড়িতে এখনও পজ্জন্ত একটা খবর নেওয়া হ'ল না—বৌ বোধহয় হাতের নোয়া খুলেই ফেললে এতক্ষণে!'

'ভালই হ'ল, হাড়-কখানা জুড়োল তার। ঐ নোয়া ছাড়া তো কিছু রাখিস নি হাতে।

ও খুলে ফেলাই ভাল!' পিছন থেকে হারান টিপ্পনি কাটল।
নিস্তারিণী বাড়িতে ফিরে এসেও রাঁধল না, খেল না। আগের রাত্রের বাসি ভাত পচে উঠেছিল। রুটি তরকারি যা ছিল ঝিকে ধরে দিল। তারপর ভাড়াটে ছেলেটির হাতে পায়ে ধরে পাঠাল থিয়েটারে নানুর খোঁজে। কিরণের ঠিকানাটা মনে পড়ল না যে এখানে আছে কিনা খবর নেবে। নানুরও বাড়ির ঠিকানা জানে না। এক ভরসা—মনে মনে ঠাকুর ঠাকুর করতে লাগল—থিয়েটারে যদি ধরা যায়।
ভাগ্যক্রমে থিয়েটারেই ছিল নানু। নিস্তারিণী ডাকছে শুনে ছুটতে ছুটতেই এল। কিন্তু সব শুনে তার মুখও কালো হয়ে উঠল, বললে, 'ও তুমি খরচের খাতায় লিখে রাখো জননী, যে মেয়ে পীরিতে পড়ে তার অসাধ্য কিছু নেই। সে ঠিকই গেছে ঐখেনে। খবরও দেবে, ভেবো না। তবে মেয়েকে আর হাতে পাবে না এখন কিছুদিন। ছোবড়া সার কল্লার আগে ও আর ফেরৎ দিচ্ছে না। ঘুঘু লোক, ঢের মেয়ের সব্বনাশ করেছে এমন। সব জানে।...তুমি আর উপোস দিয়ে কি করবে মিছিমিছি? মুখে মাথায় জল দাও, উনুনে জ্বালো। যতক্ষণ শরীরটা আছে, পেটে দিতে হবে তো। ছেলেমেয়ে মরে গেলেও উঠতে হয়, রাঁধতে হয়, খেতে হয়। সেসব কিছু নয়, ভালই আছে, এখন দিন-কতক সুখেও থাকবে। খবরও পাঠাবে, খবরও দেবে তোমায় মাতা, ভয় নেই। তবে সেসব আসতে সময় লাগবে। অত অধৈর্য হ'লে চলবে না। আমিও দেখছি। শুনেছি ঐ বেল-ঘোরের দিকে কি বাগানবাড়িটাড়ি আছে ওর—খবর নিচ্ছি। তবে তাড়াহুড়ি কিছু তো হচ্ছে না—সময় দরকার। কাঁহাতক আর তুমি এমন ক'রে শুকিয়ে পড়ে থাকবে? আর এ-তো দিব্যি পরিষ্কার। এর মধ্যে তো কোন ভাবনার কারণই দেখছি না আমি।'
কথাটা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে হয়ত—নিস্তারিণীর কাছে ছাড়া। তার তখনও অমঙ্গলের ভয়টাই বেশী। সে পড়েই থাকে উপোস ক'রে। নেহাৎ ভাড়াটে বৌটি একবাটি শরবৎ তৈরী ক'রে একেবারে সামনে এনে ধরতে আর ছেলেমেয়েদের অকল্যাণের প্রশ্ন তুলতেই উঠে সেটা মুখে দিয়েছিল। রান্না-খাওয়া করা কি উনুনে আঁচ দেওয়ার কথা সে বৌটিও মুখে তুলতে পারে নি। সেও ছেলের মা। এ-ব্যথা কতকটা বুঝতে পারে। বাপ্‌রে, তার নাদু যদি অমনি হারিয়ে যায় কোনদিন—সে কি মুখে জল দিতে পারবে?...ঝিকে বলে দিয়েছে রাত্রে তার কাছে খেতে, নিস্তারিণী তার হাতে ভাত খাবে না জানা কথাই—অন্য কিছু লুচি-পরোটা ক'রে দেবে কিনা—তাও ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।...
খবর অবশ্য সেইদিনই পাওয়া গেল।
নানু নয়, খবর নিয়ে এল ওপক্ষেরই কোন এক ব্যক্তি, দাসী বা ঐ ধরনের একটি স্ত্রীলোক।
লম্বা-চওড়া মিলিটারী গোরার মতো চেহারা, তেমনি কঠিন বাজখাই ধরনের গলার আওয়াজ। শুধু হাত, ওপরের এক হাতে একগাছা তাগা। বোধহয় অনেক বেছে বেছেই একে পাঠানো হয়েছে।
কটকট ক'রে কড়া নাড়তে নিস্তারিণীই ব্রস্তেব্যস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দুর্ভাবনায়, উপবাসে, রাত্রি-জাগরণে মাথা ঘুরছে তার—তবুও সে-ই ছুটে এল আগে।
'কে গা বাছা তুমি? তোমাকে তো চিনতে পারছি না—? কাকে চাও তুমি?' নিস্তারিণীই প্রশ্ন করল আগে। বোধহয় আগন্তুকের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমটা।
'আমি আপনার মেয়ের কাছ থেকে আসছি। আপনিই নিস্তার দেবী তো?...যদি বিশ্বাস না করো বলে এই দু-কলম পত্তরও লিখে দেছে', ঠিক কোনো মানুষের মুখের দিকে না চেয়ে—নিস্তারিণী, ওদের ঝি আর ভাড়াটে বৌয়ের মাথার ওপর দিয়ে দেওয়ালে

চোখ রেখে গড়-গড় ক'রে বলে গেল সে, মুখস্থর মতো, 'সে ভাল আছে, সুখে আছে, তার জন্যে তোমরা কোন ভাবনা ক'রো নি। এখন কিছুদিন সে বাড়ি আসবে না—তবে তোমার খরচ-পত্তর ঠিক ঠিক পাঠাবে, খবরও নেবে সময় সময়। ঝি ছাড়াবার দরকার নেই—সব খরচই সে চালাবে। সময় মতো এসে দেখাও ক'রে যাবে—বলে দেছে।'

বক্তব্য শেষ ক'রে আঁচল থেকে একটুকরো কাগজ বার ক'রে ধরল, সম্ভবত সুরোর লেখা সেই দু'কলম চিঠি। বলল, 'আপনি তো নেকা পড়তে পারবে নি—আর কাউকে দেখিয়ে নিতে বলেছে, তেনার হাতের নেকা কিনা—'

অকস্মাৎ বোমার মতো ফেটে পড়ল নিস্তারিণী। রাজাবাবুর নাম ক'রেই তাঁর চোদ্দ-পুরুষ নরকস্থ করাল, অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়াল তাঁর পিতৃপুরুষকে, তারপর বলল, 'এসব শেখানো কথা, মেয়েকে দিয়ে জোর ক'রে লেখানো। তাকে লুটে নিয়ে গেছে, চুরি ক'রে জুলুম ক'রে আটকে রেখেছে। সে-মেয়ে আমার নয় যে, আমাকে না বলে বেরিয়ে যাবে বুড়ো নোচ্চার সঙ্গে।...আমিও সহজে ছাড়ব না এই বলে রাখলুম।...থানায় ডাইরী করানো হয়েছে, বলো গে যাও তোমার গুণ্ডো মনিবকে, আমার দুধের মেয়ে ফুসলে নিয়ে যাবার শোধ তুলে তবে আমি ছাড়ব। ঐ বুড়োর কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে না নিয়ে যেতে পারি তো—'

সেই খাণ্ডারনী ঝিয়ের গলা তার ওপরও চড়ে। বলে, 'সে-কথার জবাবও দিয়ে দেছে তোমার মেয়ে—রাম না হতে রামায়ণ। বলেছে যে, সে এখন সাবালক, নিজের ইচ্ছেয় যেখেনে খুশি যেতে পারে, কারও এক্তাজারীতে আর নেই সে। তুমি যদি থানা-পুলিস করো—মামলা টিকবে না, উল্টে সে তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পক্ক ঘুচিয়ে দেবে। এক পয়সা খরচও দেবে না—তুমি আইনেও কিছু আদায় করতে পারবে না। সে তোমার পেটের মেয়ে নয়। আর এসব যা-কিছু দেখছ তার নিজের রোজগার, এতে তোমার জোর কিছু নেই।'

এই বলে—সম্ভবত যেটুকু তাকে মুখস্থ করানো হয়েছিল সেইটুকু বলা শেষ ক'রে—আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, কোন কুশল প্রশ্ন বা বিদায় সম্ভাষণেরও চেষ্টা করল না—চিঠিখানা কেউ তার হাত থেকে না নেওয়াতে সেই চলনেই মেঝের ওপর ফেলে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেল। সেও স্ত্রীলোক, পয়সার জন্যেই এ-কাজ করতে এসেছে। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া দেখার তার প্রয়োজন বা রুচি কোনটাই ছিল না।...

নিস্তারিণী আর একটি কথাও বলল না। তার এতক্ষণের সমস্ত দাপাদাপি চেঁচা-মেচি যেন কোন্ মন্ত্রবলে নীরব হয়ে গেছে। একটা সামান্য কথা,—গুটি চার-পাঁচ মাত্র শব্দের যে এতখানি ক্ষমতা, এমনভাবে যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে নিতে পারে, তা এর আগে নিস্তারিণী কখনও অনুভব করে নি। প্রবল দমকা বাতাসে কখনও কখনও প্রদীপের শিখা যখন দপ্ করে নিভে যায়, তখনও দু-এক মুহূর্ত তার সলতেয় আগুনের শেষ একটু চিহ্ন লেগে থাকে। নিস্তারিণীর পূর্ব শক্তির সেটুকুও বোধ করি অবশিষ্ট ছিল না। সে যেন এক নিমেষে কোন তপস্বীর অভিশাপে বা কোন ডাকিনীর জাদুমন্ত্রে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তেমনি নিশ্চল, তেমনি নীরব। শুধু পাথরের মূর্তিরও যে শক্তি থাকে, তার পাদুটোর যে বহন-ক্ষমতা—সেটা ছিল না। প্রথম দু-তিন মিনিটের স্তম্ভিত অবস্থা কাটতেই পাদুটো কাঁপতে শুরু করল। চলনের আলো-আঁধারিতে ঝি অতটা লক্ষ্য করে নি, ভাড়াটে বৌটি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল। নইলে পাথর বা কাঠের মতোই আছড়ে পড়ত।

কিন্তু ততক্ষণে একেবারেই অশক্ত হয়ে গেছে নিস্তারিণীর পায়ের পেশী, সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে তার স্নায়ু ও মন—পাথরের মতোই ভারী হয়ে উঠেছে দেহটা। বৌটি ক্ষীণজীবী মানুষ, তার পক্ষেও সে-বোঝা সামলানো সম্ভব নয়। দুজনেই পড়ে যেত জড়াজড়ি ক'রে হয়ত—'ও ঝি, ধরো ধরো' ক'রে চেঁচিয়ে উঠতে, ঝিও ওদিক থেকে

ধরে ফেলে কোনমতে আস্তে আস্তে সেইখানেই শ্বইয়ে দিল। ধরাধরি ক'রে ভেতরে নিয়ে যাওয়া বা বিছানায় শোওয়ানো সম্ভব হ'ল না—কারণ নিস্তারিণী ততক্ষণে ম্বর্ছিত হয়ে পড়েছে!

সুরোদি তাঁর কাহিনীর এই অংশে এসে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন খ্বব। বাতের পায়ে হাত ব্বলোতে ব্বলোতে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কাজটা ভাল করি নি। আজ ব্বঝি। এতবড় আঘাত দেওয়া উচিত হয় নি মাকে—বিনা অপরাধে। আমার মা গর্ভ-ধারিণীর বেশী ছিলেন. আরও বেশী ঋণী আমি তাঁর কাছে ; যমের ম্বখ থেকে ছিনিয়ে এনে বাঁচিয়ে ছিলেন।'

তারপর নিঃশব্দে খানিকটা মালা জপ করার পর ঈষৎ কে'পে-যাওয়া গলায় বলে-ছিলেন, 'ঠিক আমি এসব বলতে বলিও নি। শিখিয়েও দিই নি। উনিই গড়েপিটে তৈরী ক'রে পাঠিয়েছিলেন। রাজাবাব্ব। আসলে কি জানিস, উনি তো পাকা লোক, থানাটানা সব জায়গায় আটঘাট বে'ধে কাজ ক'রেছিলেন। ওঁদের থানায় যাওয়ার খবর সকালেই পে'ছে গিয়েছিল। আর কিছ্ব নয়, মাসীও ছিল তো ঐদিকে. একটা উকিল খাড়া ক'রে থানা-প্বলিস টানাটানি করা খ্বব আশ্চর্য ছিল না। তেমন চাপ দিলে প্বলিস কিছ্ব চ্বপ ক'রে থাকতে পারত না—একটা কিছ্ব করতে হ'তই শেষ অবধি। অবিশ্যি হ'ত না কিছ্বই, তব্ব একটা জানাজানি ঢিঢিক্কার পড়ে যেত তো। হয়ত খবরের কাগজেও লিখে দিত। ওঁর খ্বব শখ ছিল সরকারের কাছ থেকে সত্যিকারের রাজা-বাহাদ্বর খেতাব পাবার—যদি ইংরেজী কাগজে লেখালেখি হয়, এই রকম কেচ্ছা-খিটকেলের খবর বেরোয়, সে-আশা তো আর থাকবে না। এই ভেবেই, উনি আরও ভয় দেখাবার জন্যেই বলেছিলেন কথাটা—আঘাতটা কতখানি লাগবে, অত বোঝেন নি।'

প্রশ্ন করেছিল্বম স্বরোদিকে. 'তা আপনার জন্মব্বত্তান্ত ওরই মধ্যে উনি জানলেন কি ক'রে?'

'এই দ্যাখো বোকারাম! তার আগে যে নিত্যি গিয়ে দেড়ঘণ্টা দ্ব-ঘণ্টা ধরে গল্প করতেন—কী এত কথা হ'ত বল! এই সবই বলেছি।...হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে আমার দায় ছিল খানিকটা। আমিই আসল দ্বষী তাতে আর সন্দ কি! আমি যদি ওসব বলতে বারণ করতুম, তাহ'লে আর অতটা লাগত না। থানা-প্বলিস কিছ্ব একদিনেই হ'ত না, তেমন দেখলে নিজে গিয়েও ব্বঝিয়ে বলতে পারতুম, হাতে পায়ে ধরে থামিয়ে দিতে পারতুম। তখন অতটা মাথায় যায় নি।...আহা. মা নাকি জ্ঞান হবার পর ঐ কথাই সর্বপ্রথম বলে-ছিল. তখনও নাকি ঠিক হ্বঁশ হয় নি—কে বসে আছে কে বাতাস করছে কিছ্ব জানেও না। নান্বদা এসে গিয়েছিল। নান্বদাই নাকি স্মেলিং সল্ট্ না কি নাকের কাছে ধরে, মাথায় ম্বখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে জ্ঞান ফিরিয়েছিল—নান্বদার কাছে আমার অনেক দেনা—তা ওর কাছেই শ্বনেছি. তখনও চোখ বোজা—প্রথম সহজ নিঃশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই. যেন চ্বপি চ্বপি বলেছিল, "আমি তোর মা নই. তুই আমার পেটের মেয়ে নোস! আমি যে—আমি যে—যমের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসে তোকে মান্বষ করেছি রে! পেটের ছেলেকে অত করি নি—যত তোকে করেছি। তুই বললি এই কথা! বলতে পারলি"!'

তারপর, আরও খানিকটা চ্বপ ক'রে থেকে স্বরোদি বলেছিল, 'ঠিক এমনি ধারা করেছিল আর একজন—খ্বব বড় য়্যাকট্রেস। এখনও বে'চে আছে, তার নাম বলব না—এক ডাকে বাংলাদেশের লোক চিনবে. তখনও নাবালক,—পীরিতের বাব্বর সঙ্গে পালিয়ে গেছল মাকে ফেলে—চাকরি ফেলে মনিবদের ডুবিয়ে! নামকরা নাটক—খ্বব জমেছিল, তাতেই ওর নামও হয় প্রথম—দ্বরাত্তির হবার পরই পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা অবিশ্যি

কিছু বলেন নি কিন্তু মা নালিশ করেছিল সেই বাবুর নামে—তা মেয়ে নাকি এমন সাক্ষী দিয়েছিল যে মার হাতে দাঁড় পড়ার জো...শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানি নে—মা শাপ দিয়েছিল, "হে ভগবান ওকে মেয়ে দাও, ওকে মেয়ে দাও, ওর মেয়ে হোক, বুঝুক আমার কি জ্বালা!" তা মেয়ে নাকি হয়েও ছিল, বুঝেও ছিল। কিন্তু আমার মা আমাকে কোন শাপমন্যি দেয় নি—একটা কথাও বলে নি আর। এমনও বলে নি যে ভগবান এর বিচার করবেন। সেই জন্যেই তো আরও কষ্ট হয় এখন—যখন মনে পড়ে তখন নিজের গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে।'

আমি আস্তে আস্তে বলেছিলুম, 'কিন্তু শাপমন্যি কি সব সময় মুখ ফুটেই দেয় মানুষ? মা বলেন যে মুনির শাপ আর মনস্তাপ দুই-ই সমান। মনের কষ্ট যা তা ঠিকই বাজে, মুখে কিছু বলুক না বলুক!'

'বাজেই তো, ঠিকই বলেছিস!' সুরোদিও সায় দিয়েছিলেন, 'মারও কি কম বেজে-ছিল! মার মতো লোক একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল কি আর যে-সে আঘাতে,—যার এতটুকুতেই চেঁচিয়ে শোরগোল ক'রে হাট বাধিয়ে তোলা অভ্যেস!'

সুরোদি সেই আধো-অন্ধকারেও যেন মাথা তুলতে পারছিলেন না লজ্জায়। খানিক পরে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'নানুদা আমার অনেক করেছে, মিছে কেন বলব—সে শুনতে আসছে না তার ধম্ম শুনছে।...ঐ খরচা দেবার খোঁটাটাও মার খুব লেগেছিল। ভাল ক'রে জ্ঞান হবার পর যখন সব আবার মনে পড়েছিল—মা নাকি ওখানে জলবিন্দু স্পর্শ করতে চায় নি : নানুদাই বুঝিয়ে বলেছিল, জননী বলত তো, বলেছিল, "জননী, কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাচ নয়।...কার ওপর রাগ করছ বেটি, ওসব কি সে বলেছে? পীরিতে পাগল হয়ে যায় শোন নি? পাগল না হ'লে কেউ এ কাজ করে? তুমি যদি ওর ওপর রাগ করো মা, ওর যে সব্বনাশ হয়ে যাবে! এ কাজ ক'রো না—তোমারও এ অভিমান থাকবে না, ও তোমার বুক জুড়ে আছে, গণেশের বড়ো, তা কি আর আমি জানি না! ছিঃ। ও পাগল হয়েছে ব'লে তুমিও পাগল হবে!...ওঠো, রাঁধো খাও। সে ঠিক আবার এসে একদিন পায়ে পড়বে। তখন কিছু ঠেলতেও পারবে না। মিছিমিছি এ মন্যিতে যদি তার অনিষ্ট হয় সে আরও বাজবে।"...তা নানুদার কথাতেই কাজ হয়েছিল, নানুদা নিজে খাবে বলে বাজার ক'রে দিয়ে জোর ক'রে রাঁধিয়েছিল।...অবিশ্যি তার পর এসে আমাকেও যাচ্ছেতাই করেছিল খুব, ওঁর সামনেই। উনি জানতেন তো ওকে, আমার মুখে শুনেছিলেন ওর সব কথাই—তাই রাগ করেন নি, বরং মাপই চেয়েছিলেন।...নানুদা মহাপ্রাণ লোক।।...মনে হয় এমনি দুনিয়ার কল্যেণ করবে বলেই অমন ধারা আধ-পাগলার মতো ঘুরে বেড়াত...।'

বলতে বলতে সুরোদির চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেদিন আর কিছু বলতেও পারেন নি। আমিও আর কথা বাড়াই নি। বুঝেছিলুম, স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে সেদিনের সেই সুখদুঃখের আস্বাদ করছেন আবার নতুন ক'রে। এ এক ধ্যান-মূর্তি ওঁর। এখন ব্যাঘাত করা ঠিক হবে না।]

এ এক নতুন জগৎ, নতুন জীবন। সুরবালার মনে হয় সত্যিই তার জন্মান্তর ঘটেছে। এক এক সময় ভাবে—এ বুঝি তার দেহান্তরও। মনে হয় সে স্বর্গেই এসেছে—সে জীবন সে দেহ ত্যাগ ক'রে। এ অভিজ্ঞতা পৃথিবীর নয়, পৃথিবীতে থেকে পৃথিবীর দেহ-মন নিয়ে এ জিনিস পাওয়া যায় না, ধারণাও করা যায় না। ভালবাসার যে এত সুখ, এত আনন্দ—শুধু ভালবেসেই, শুধু নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে আর এক-জনের কাছে, নিজেকে বিলীন ক'রে দিয়ে,—তা সে কোনদিন ভাবতেও পারে নি। নিজের সুখ-দুঃখ চিন্তা-ভাবনা—এমন কি নিজের ইচ্ছা বলতেও কিছু না রেখে—অপরের ইচ্ছায়, অপরের সুখে, অপরের সম্ভোগে—নিজের সত্তাকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়ে যে এত আনন্দ থাকতে পারে—এ তাকে দুদিন আগে কেউ বলতে এলে বা বোঝাতে এলেও বিশ্বাস করত না।...তার আর কিছু ভাবতেও ইচ্ছা করে না, নিজে থেকে কিছু করতেও না। কেবলই বলে, 'আমি কিছু জানি না, তুমি যা ইচ্ছা, যা খুশি করো আমাকে নিয়ে। তুমি যা করবে, যা করাবে—তাইতেই আমার আনন্দ।'

এমন কি, মাঝে মাঝে এ রকমও মনে হয় এক এক সময়, রাজাবাবুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে, তাঁর গলার খাঁজে মুখটাকে গুঁজে দিয়ে—রাজাবাবু যদি তাকে মধ্যে-মধ্যে খুব নির্যাতন করেন তাহলে মন্দ হয় না। যদি খুব মারধোর করেন, লাথি মারেন, কষ্টসাধ্য কোন কাজ করিয়ে নেন, উৎকট কোন সম্ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করেন—তাহলেও যেন তার আর এক রকমের আনন্দ হয়; আর এক ধরনের সুখ, কৃতার্থতা লাভ করে। মনে হয় রাজাবাবু যেন বড় আলুতোভাবে বড় সন্তর্পণে আদর করেন তাকে, যেন বড় ভয়ে ভয়ে। খুব নিষ্ঠুরের মতো নির্দয়ের মতো ব্যবহার করলে যেন আরও খুশী হ'ত সে, মনে হ'ত সত্যি সত্যিই রাজাবাবুর কাজে লাগল, অর্থাৎ তাঁর জন্যে খানিকটা দৈহিক কষ্ট স্বীকার করতে না পারলে যেন ওর নিজের ভালবাসা সার্থক হচ্ছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠে তাই সে রাজাবাবুর পা টিপতে বসে, মাঝে মাঝে তাঁর পা দুটো নিয়ে নিজের অনাবৃত বুকে চেপে ধরে। রাজাবাবু বুকের কাছে টেনে আনতে গেলেও আসে না। বলে, 'বেশ করব সেবা করব আমি। তুমি কেন আমার সেবা নাও না, কেন ফরমাশ করো না আমাকে কিছু, কেন আমাকে দিয়ে খুব খানিকটা খাটিয়ে নাও না?'

মাঝে মাঝে রাজাবাবুর দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। কখনও বা ওঁর সর্বাঙ্গে চুমো খেতে থাকে পাগলের মতো। কোন কোন দিন বুকের ওপর চেপে ধরে রাখে, নামতে দেয় না কিছুতেই।

'ওরে পাগল, লাগবে যে তোমার। ছাড়ো ছাড়ো, শেষে বুকে ব্যথা করবে।'

'করুক। লাগুক আমার। আমি বুক থেকে নামাব না। এমনি সারাদিন থাকব, সারা দিন-রাত—সারা জীবন। মরে যাবো সেও ভাল।'

বিস্ময় লাগে রাজাবাবুর। এমনটা তিনি ভাবেন নি, এমন কখনও জানেন নি। তাঁর এই এতদিনের জীবনে—প্রায় প'য়তাল্লিশ বছর বয়স হতে চলল তাঁর, স্ত্রী ছাড়া যে অন্য স্ত্রীলোক সম্ভোগ করেন নি তা নয়—ঐশ্বর্য তার আনুষঙ্গিক অপরাধ জুটিয়ে আনবে এইটেই স্বাভাবিক—যে সমাজে তিনি বাস করেন, যে সব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে, তাতে এ এমন কিছু গর্হিত কর্মও নয়—কিন্তু এ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন, কল্পনাতীত। ...শুধু যে তাঁর জীবনে অভিনব তাই নয়, অপর কারও জীবনে ঘটেছে বলেও শোনেন নি! বাজারের স্ত্রীলোক যাদের বলে—অর্থভোগ্যা, তাদের কাছ থেকে প্রেম অবশ্য কেউ

আশা করে না, কিন্তু তা ছাড়াও দু-একটি ক্ষেত্রে অন্য ধরনের স্ত্রীলোকও রাজাবাবুর জীবনে এসেছে। আত্মীয়ের মধ্যে—অর্থের জন্যে নয়—তারা এসেছে প্রাণের গরজেই। সে তখন প্রথম যৌবন তাঁর, এ সব যে কোন অন্যায় কি অপরাধ তাও বুঝতে শেখেন নি তখন—কিন্তু তাও, তারাও কেউ এমনভাবে ভালবাসে নি। বরং তারা যেন ওঁকেই কৃতার্থ করেছে, উনিও তাই বুঝেছেন। তার চেয়ে বেশী আশা করেন নি। কোন ক্ষোভও ছিল না তাই। যেটুকু পেয়েছেন সেইটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন। আজ এই পরিণত বয়সে, তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট এই সুন্দরী মেয়েটি তাঁকে কেন—কী দেখে এত ভালবাসল, এইটেই ভেবে পান না।

মাঝে মাঝে একেও সে প্রশ্ন করেন—সুরবালাকে, 'তুমি আমার মধ্যে কি দেখলে এমন? এত লোক থাকতে আমাকে কেন ভালবাসলে? তুমি সত্যিই আমাকে এত ভালবাস? আশ্চর্য! এ যে আমার এখনও বিশ্বাস হ'তে চাইছে না।...জানো আমি আগে বড়-একটা আয়নায় মুখ দেখতুম না, এখন দেখি। দেখি শুধু আমার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ আছে কিনা যাতে কোন অল্পবয়সী মেয়ে ভুলতে পারে! কিন্তু সত্যিই বলছি আমার চোখে তো তেমন কোন জিনিসই ধরা পড়ে না। তুমি কী দেখলে আমার মধ্যে?'

'জানি না—ভেবে দেখি নি আজও। ভাল লেগেছে তাই জানি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাল লাগে নি আজ পর্যন্ত। কেন ভাল লাগে মেয়েছেলেদের কোন কোন পুরুষকে—তাও জানি না। একেই বোধহয় জন্মান্তরের সংস্কার বলে। তুমিই আমার স্বামী ছিলে আগের সব জন্মে, কী পাপে এবার তোমাকে আগে কি সোজাসুজি পাই নি, তোমার ঐ বৌ আগে-ভাগে এসে দখল করেছে।...আবার এক এক সময় মনে হয়—তুমিই আমার ইষ্ট, তুমিই আমার ভগবান। তোমাকে পুজো করতে ইচ্ছে করে।'

আবার বলে কখনও, 'দ্যাখো, তুমি পুরুষমানুষ কি না—তাও আমার সব সময়ে মনে থাকে না। তুমি কেমন দেখতে, কত বয়স—এসব তো দূরের কথা। আমাদের কীর্তনে আছে, শ্রীমতী বলছেন, "নাহি জাননু সোহি পুরুষ কি নারী, নয়নে লাগল রূপ হামারি"—গাইতে হয় গাইতুম কিন্তু হাসি পেত। ভাবতুম এ আবার কি ঢঙ্, এসব পদকর্তাদের বাড়াবাড়ি। এখন তোমাকে পেয়ে বুঝেছি যে একটুও বাড়িয়ে বলেন নি তাঁরা—ভালবাসলে এমনি অবস্থাই হয়ে যায় সত্যি সত্যিই!'

'তা হবে।' অন্যমনস্ক হয়ে—এক হাতে ওকে জড়িয়ে ওর মাথাটা নিজের গলার খাঁজে টেনে নিয়ে চিবুক দিয়ে চেপে ধরে—যেন ওর উপস্থিতিটা ওরই উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে অনুভব করতে করতে বলেন রাজাবাবু, 'জানো, ছেলেবেলা থেকেই কীর্তন ভালবাসি। আমরা বৈষ্ণব জানো তো, দীক্ষাও হয়ে গেছে খুব ছোটবেলাতে : আমার গুরুদেব খুব উচ্চ স্তরের সাধক—বৃন্দাবনে থাকেন, বৃন্দাবনও ঠিক নয় গোবর্ধনের কাছে জঙ্গলের মধ্যে ঝোপড়া বেঁধে বাস করেন, মাধুকরী ক'রে খান। শহর নয়, সে অজ পাড়াগাঁ, কোনমতে দেহ-ধারণের মতো খাবারও জোটে না সব দিন—তবু আমাদের কাছ থেকে কিছু নেন না, বলেন, ইষ্টকে আমার ঠাকুরকে ভালবাসো তাহলেই গুরুঋণ শোধ হবে, সেই আমাকে যথার্থ প্রণামী দেওয়া হবে। তা ওঁরই আশীর্বাদ বলো আর যাই বলো—কীর্তন শুনলেই মনে অদ্ভুত একটা আনন্দ হয়। গান শুনতে শুনতে বহুদিন ভেবেছি, এই প্রেমের কোন স্বাদ কি কোন দিন পাব? বৃথাই দীক্ষা নিলুম আর বৃথাই জপ ক'রে গেলুম। শুধু বাইরের ভড়ং সার হ'ল। ভালবাসার যথার্থ কী আনন্দ তা আর জানা হ'ল না। একদিন—বছর দুই আগে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হ'তে বলেও ছিলুম কথাটা। তিনি বলেছিলেন, "সে বড় মজার ঠাকুর রে, যে মনেপ্রাণে চায়—তাকে ঠিক দেন। তোর এত জিনিস থাকতে সেই প্রেম আস্বাদনে যখন মনে হয়েছে, তাঁর কাছে চা—ঠিক পাবি। ...তাই হয়ত পেলাম তোমাকে। তুমিই আমার সেই গুরুর আশীর্বাদ।'

তাঁকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে তাঁর দেহের মধ্যে যেন নিজেকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে, তাঁর দেহের খাঁজে মুখ গুঁজে—সেই প্রিয়দেহের আঘ্রাণ নিতে নিতে চুপি চুপি অস্পষ্ট গলায় সুরবালা বলত, 'তুমিই আমার কাছে ঠাকুরের আশীর্বাদ, তাঁর কৃপা। কৃপা ছাড়া এমন বিনা সাধনায়, বিনা দীক্ষায় তোমাকে পাব কেন?...জানো, একদিন মাসীর গুরুদেব এসেছিলেন, খুব যে একটা বড় পণ্ডিত কি সাধু তা নয়—ভাবগতিক দেখে, অন্তত তা মনে হয় নি—যাই হোক একদিন আরতির পর মাসীর ঠাকুরঘরের সামনে বসে নানারকম উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমার কেমন হাসি পাচ্ছিল ঐ সব বড় বড় কথা শুনে। অত বোঝার চেষ্টাও করি নি অবশ্য, সে রকম বিদ্যেবুদ্ধিও তো নেই, বলেছিলুম, "দেবতার বেলায় লীলে-খেলা, পাপ লিখেছে মনিষ্যির বেলা—লোকে যা বলে তা নেহাৎ মন্দ নয়। দেবতারা ক'রে গেছেন বলেই এই সব বেলেল্লাগিরি বুঝি এত ভাল হয়ে গেল? মানুষ করলেই যত দোষ" তিনি কিন্তু রাগ করেন নি, হেসেই জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দোষ কেন হবে মা, মানুষ করলেও দোষ হয় না। গোপীদের যা প্রেম—সেইভাবেই যদি কোন মানুষ কাউকে ভালবাসতে পারে—তাহলে আর তা দোষের থাকে না। ঐ ভালবাসাটাই যে দুর্লভ মা। একটু ভেবে বুঝে দেখো—তাহলেই বুঝতে পারবে ও ভালবাসা কি বস্তু। সর্বস্ব লোপ ক'রে দিয়ে অমন ভালবাসা—এত সহজ জিনিস নয়। মহাপ্রভু নিজে স্বীকার ক'রে গেছেন যে, কান্তাপ্রেম সবচেয়ে বড়। তাঁর সাধনাও সেই ভাবের ছিল, সেই লীলা আস্বাদন করতেই তাঁর দেহধারণ করা।"... তাঁর সেই মিষ্টি কথাতেই আমার চৈতন্য হয়ে গেছল, তাড়াতাড়ি তাঁকে পেন্নাম ক'রে মাপ চাইলুম। তিনি কিন্তু পায়ে হাত দিতে দিলেন না, বললেন, "তোমার ওপর মা রাধারাণীর কৃপা আছে মা, তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। আমরা চিনির বলদ, এসব বলেই গেলুম, নিজেরা অনুভব করতে পারলুম না, আমাদের জীবনে হয়ত কোনদিনই হবে না—তবে তুমি পাবে মা, গোপীপ্রেম কী বস্তু তা তুমি তোমার জীবনে অনুভব করতে পারবে। তোমার ওপর রাধারাণীর অশেষ কৃপা।"...আজ—আজ তোমাকে ভালবেসে বুঝেছি সত্যিই তাঁর কৃপা। এত আনন্দ যে এই দেহে মানুষের জন্মে কেউ পায়—তা বুঝি নি ভাবি নি কোনদিন। কেউ বোধহয় বুঝতে পারেও না—পাবার আগে।'

এক একদিন প্রশ্ন করত সুরবালা, 'আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল না গো, আমি কি সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে?'

বুকের ওপর চেপেধরা মুখখানা জোর ক'রে তুলে ধরে রাজাবাবু উত্তর দিতেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

'সত্যি বলছি, ঠিক বুঝতে পারি না। মেয়েদের চোখে কি মেয়েদের রূপ ঠিক তৌল হয়? তাছাড়া আমার আর চোখ বলে কিছু নেইও। আমি যখন আয়নার দিকে তাকাই, সব সময় কি নিজের চেহারা চোখে পড়ে ভাবো? তখন হয়ত তোমার কথা ভাবি, তোমার চেহারা চোখের সামনে ভাসে। নিজের মুখখানা আর দেখাই হয় না।'

সুরোর মুখখানা একটু দূরে সরিয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গাঢ়-কণ্ঠে জবাব দেন রাজাবাবু, 'তুমি খুব সুন্দর। তোমার মতো রূপ সত্যিই আমি আর দেখি নি। অন্তত আমার দেখা কোন মেয়েরই এত রূপ নেই। এত রূপ বলেই যেন তোমার গায়ে হাত দিতে আমার ভয় হয়—যেমন কোন দামী শৌখীন জিনিস বেশী নাড়াঘাঁটা করতে ভয় হয়—তেমনি। মনে হয় ঈশ্বরের গড়া এই অদ্ভুত জিনিসটা যদি আমার হাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়!'

'যাও!' রাগ ক'রে বলে সুরো, 'সব তাইতে তোমার ঐ আদিখ্যেতা! সত্যি বলছি তোমার ঐ পুতু পুতু ভাব আমার ভাল লাগে না।' তারপরই আবার বলে, 'আচ্ছা, কত সুন্দর? তোমার বাগানে ঐ যে সাদা পাথরের মূর্তিগুলো আছে—শুনেছি নাকি বিলেত

থেকে আনিয়েছ—ঐ রকম কোন মেয়ে দেখেছ কখনও? সত্যি সত্যিই অত সুন্দর কেউ হয়? ওরা কি কাউকে দেখে অত সুন্দর তৈরী করে? মেয়েদের মধ্যে সত্যিই ঐ রকম চেহারা পাওয়া যায়?'

এক বিচিত্র ধরনের হাসি ফোটে রাজাবাবুর মুখে, বলেন, 'আগে ভাবতুম পাওয়া যায় না—এখন দেখছি যায়। ওর চেয়েও সুন্দর মানুষ, সুন্দর দেহ আছে। মেম কেন, আমাদের দেশেই আছে।'

'সত্যি? তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি কি গো, এখনও তো দেখছি। এই তো আমার সামনেই দেখছি।'

'যাও! খোশামোদ হচ্ছে বুঝি?'

'কে বললে খোশামোদ! সত্যি কথাই বলছি, মাইরি, বিশ্বাস করো। ওদের চেয়েও সুন্দর তুমি।' তারপর সুরোর অসম্বৃত দেহের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে বলেন, 'ও মূর্তি তো নড়তে পারে না,—ঘুরলে ফিরলে উঠলে বসলে চললে হাঁটলে—নানাভাবে নানা অবস্থায় যে নতুন নতুন রূপ দেখা যাবে সে উপায় তো নেই। ও মূর্তি কথা বলে না, ওর মুখ ক্ষণে ক্ষণে লাল হয় না, তোমার মতো হাসিতে জ্বলে ওঠে না, অভিমানে আউতে-পড়া ফুলের কথা মনে পড়ে না। সবচেয়ে—পাথরে ঘাম হয় না। তোমার যে সে-ই সবচেয়ে বড় জিৎ। এই শোন—না, না, লজ্জা পেয়ো না. যে-কোন দিব্যি গালতে বলবে গালব—এ আমার অন্তরের কথা—তুমি এমনিই সুন্দর, খুবই সুন্দর কিন্তু ঘামলে তোমাকে আরও যে কত সুন্দর দেখায় তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। এক এক সময় মনে হয়, অদ্ভুত হয়ত—কোন মাথামুণ্ড নেই এসব ভাবনার—ভয় হয় স্বয়ং গোবিন্দ যদি তোমাকে সেই সব ক্ষণে দেখতে পান, বুঝি তোমাকে আর মর্তে থাকতে দেবেন না, তাঁর লীলার মধ্যে টেনে নেবেন। আমরা আর ধরাছোঁওয়ায় পাব না। তাই তাড়াতাড়ি তোমাকে ঢেকে দিই, বুকের মধ্যে টেনে নিই।...আসলে কি জানো, তুমি আমার হয়েছ, আমার থাকবে—এ যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। মনে হয়—এ তো আমাকে মানায় না, যাকে মানায় সে বুঝি এই কখন টেনে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে।'

রাজাবাবুর আশঙ্কা ছিল যে, সুরবালার এই উন্মত্ত প্রেম বুঝি তাঁর পায়ে বেড়ির মতো চেপে বসবে। তাঁর ঘরবাড়ি আছে, বিষয়সম্পত্তি বিরাট কারবার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েরা আছে। সেখানে যাওয়া দরকার, সেইখানেই বেশীক্ষণ থাকা দরকার। সে কথাটা সুরবালার কাছে পাড়বেন কি ক'রে—এ তাঁর একটা দুশ্চিন্তা ছিল। তাই বলি বলি ক'রেও বলতে পারছিলেন না। সুরবালাই একদিন ওঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'কিছু বলবে? কি যেন একটা মনে নিয়ে বেড়াচ্ছ?'

রাজাবাবু অপ্রতিভ ভাবে হাসেন একটু, বলেন, 'একবার তো ওদিকে যেতে হয়। পনেরো ষোল দিন কেটে গেল, শহরের মুখ দেখি নি।'

'ওমা, তা যাবে বৈকি! বা রে, পুরুষ মানুষ কাজকর্ম দেখবে না—সব ভাসিয়ে বাগানবাড়িতে মেয়েছেলের কাছে বসে থাকবে—এ আবার কেমন কথা!'

'তা তুমি—? তোমার একলা খারাপ লাগবে না?'

'তা তো লাগবেই। তাই বলে তোমার কাজকর্ম পণ্ড ক'রে দেবো?...তা ছাড়া তোমার সংসার আছে, সেটাই বা ভুলে গেলে চলবে কেন?...এমনিই তো তোমার বৌ বোধহয় আঙুল মটকে শাপ দিচ্ছে আমাকে। না না, তুমি যাও, বেরোতে শুরু করো।'

রাজাবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। একটু পরে বলেন, 'আমার খুব ভয় ছিল, জানো—যে যাবার কথা শুনলে তুমি হয়ত বেঁকে বসবে, ছাড়বে না আমাকে।'

'কেন, আমাকে কি তেমন অবুঝ বলে মনে হয় তোমার? তাছাড়া, আমি তো বলেছি

—তোমার কাছে যখন স'পে দিয়েছি নিজেকে, নিজের ইচ্ছা বলতে আর কিছু রাখব না, নিজের কোন জোরই খাটাব না।'

গাড়ি তৈরী হয়ে এলে, যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'তে রাজাবাবু প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি করবে সারাদিন?'

'তোমার কথা ভাবব। তাতেই তো সময় কেটে যাবে।' খুব সহজ ভাবে উত্তর দেয় সুরো।

ঠিক এ উত্তর বোধহয় আশা করেন নি তিনি। একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

'কী দেখছ?'

'তোমাকে দেখছি। তুমি আশ্চর্য। সত্যিই তোমার মতো কাউকে দেখি নি।'

'তা নয়। তুমি পুরুষ। তোমাকে আমার দেবতা বলে মনে হয়। তুমি ছোট হবে সেটা আমি সইতে পারব না। পুরুষের কাজই সব, সেটা না থাকলে পুরুষের জীবনে কোন কিছুই থাকে না।—তা কি জানি না! পুরুষ কেন—পুরুষের কাজ করতুম যখন—তখন আমারও কাজের মধ্যেই প্রাণ পড়ে থাকত, কিসে আরও নাম হবে, আরও পয়সা হবে, আরও বেশী লোক ছুটে আসবে—এইটিই ছিল সবচেয়ে বড় চিন্তা। সেইজন্যেই তোমাদের দিকটা বুঝি, মনটা বুঝি। আমাদের বুকে রেখেছ ঠিকই—কিন্তু ফুলের মালার মতো বুকে থাকাই ভাল। যদি পাথরের মতো ভার হয়ে চেপে বসি, আর তার জন্যে তোমাদের অতলে তলিয়ে যেতে হয়, তাহলে বেশীদিন সহ্য করতে পারবে না। বোঝাটা টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার ওপরে ভেসে তীরে এসে উঠবে।'

তারপর বলে, 'একটা কাজ করো বরং—এ বড় দূরে। তোমার অযথা টানাপোড়েন হবে, আমারও ভাল লাগবে না। শহরের কাছাকাছি একটা বাড়ি ঠিক ক'রে আমাকে সেইখানে রাখো। ও বাড়িতেও যেতে পারতুম কিন্তু মার সামনে—আর পুরনো পাড়া, সে বড় খারাপ লাগবে। তুমি আর একটা বাড়ি ভাড়া করো বরং—যেখান থেকে যখন তখন আসা যাওয়া করা যাবে।'

ওর গালটা টিপে আদর ক'রে রাজাবাবু বলেন, 'ভাড়া নয়, আমি কেনার জন্যেই লোক লাগিয়েছি, কাছাকাছির মধ্যে ভাল বাড়ি পেলেই তোমার নামে কিনে দেব। এত-দিনে নিশ্চয় সন্ধানও এসেছে কিছু—আজ আপিসে গেলেই বুঝতে পারব।'...

এর মধ্যেই একদিন খবর এল, নানু দেখা করতে চায়।

রাজাবাবুই খবর আনলেন। তাঁর আপিসেই দেখা করেছিল নানু।

খবরটা দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী বলব?'

'তা আমি কি জানি। তোমার যা খুশি।'

'আমার আর কি আপত্তি। তোমার মুখে যা শুনেছি, সে তোমাকে ভালবাসে। হিতাকাঙ্ক্ষী। তাছাড়া মার খবর পাবে।—দেখা হওয়া তো ভাল। এভাবে শুধু আমাকে নিয়ে তোমার বেশীদিন ভাল লাগবে না, দুটো চেনা মানুষের মুখ না দেখলে হাঁপিয়ে উঠবে।'

যেন চমকে ওঠে সুরো, 'কে বললে ভাল লাগবে না? আমার তো মনে হয় এমনি যুগ যুগ থাকলেও পুরনো হবো না, আশ মিটবে না আমার।'

চুপ ক'রে থাকেন রাজাবাবু। কথাটা যেন উপভোগ করেন মনে মনে। তারপর বলেন, 'এখানকার ঠিকানা দিয়ে দেব তো?'

'তাই দিও। কিন্তু এখানে আসবে কি ক'রে? তোমার গাড়ি ক'রে বরং পাঠিয়ে দিও।'

আরও একটু চুপ ক'রে থেকে রাজাবাবু বলেন, 'বলছিলু, তোমার দোয়ার বাজন-

দারদের কি হবে? ওদের জবাব দিয়ে দেবে কিনা। তাহলে ওদের কিছু কিছু খরচা দিয়ে তো জবাব দিতে হয়। ওরাও অন্য জায়গায় কাজ খুঁজুক।'

'তাই দিয়ে দাও।'

'আমি দেব কি? আমি ওদের হিসেবের কি জানি?'

'তা বটে। তবে নানুদা আসুক—ওকেই বলে দেব। মাসি যা ভাল বোঝে ঠিক ক'রে দেবে।...যা দিতে বলবে দিয়ে দোব। নানুদাই আমাকে দিয়ে সই করিয়ে টাকা সব পোস্ট আপিসে জমা দেবার ব্যবস্থা করেছিল—দু-চারখানা বুঝি কি কোম্পানীর কাগজও কিনিয়ে দিয়েছিল। সে-ই সব জানে, টাকা তুলে মাসীকে দিয়ে দেবে'খন।'

'না না, তুমি টাকা তুলে দেবে কেন? যা দরকার আমি দিয়ে দেব। নানু হিসেবটা ঠিক করলেই ওর হাতে বুঝিয়ে দেব।'

ঘরের এক প্রান্তে শেজ-এর আলো জ্বলছে। মশারীর মধ্যে তার কিছুই আসে না প্রায়। মানুষটা ঠাওর হয়, মুখচোখ কিছুই দেখা যায় না। তবু তারই মধ্যে রাজাবাবু সুরোর মুখটা তুলে দেখবার চেষ্টা করেন। সুরো আশ্চর্য হয়ে বলে. 'কী? কি হ'ল আবার?'

'তুমি কি গান গাইতে চাও মাঝে মাঝে? দল থাকলে তুমি খুশী হবে?'

'একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'এ তোমার কর্মক্ষেত্র। তুমিই সেদিন বলছিলে না. পুরুষের কাজ যে করে তার কাছেও কাজই বড়, কাজই জীবন। একেবারে ছেড়ে দিতে খারাপ লাগবে না? যদি চাও তো থাক না দল, এরপর কখনও তেমন ইচ্ছে হ'লে আবার গাইবে—?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সুরো। স্থির হয়ে শুয়ে কী যেন ভাবে। এক সময় রাজাবাবুর মনে হয় বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। তারপর বলে, 'না। ও দল ভেঙেই দাও। একটু বেশী ক'রে বরং টাকা দিয়ে দিও ওদের। আবার কোথায় কাজ পায় না পায়—'

তারপর নিজেই আবার বলে. 'মানুষের যশের মোহ বড় সাংঘাতিক. জানো? আবার যদি গাইতে শুরু করি. ঐ গানই আমার কাছে বড় হয়ে উঠবে। তোমার চেয়ে তোমার চিন্তার চেয়ে আর কিছু বড় হয়—আমি তা চাই না। তা ছাড়া. তুমি গান গাইতে পারো না—আমি রেওয়াজ করব, বাইরে গাইতে যাব, বায়না নেব, লোকের সঙ্গে কারবার করব—সে যেন আলাদা একটা জীবন হয়ে যাবে আমার, তোমার থেকে আলাদা. সে আমার সইবে না।'

'কিন্তু এত সাধের জিনিস তোমার. এতদিনের সাধনা—একেবারে ছেড়ে দেবে? কষ্ট হবে না?'

'এত সাধের জিনিস বলেই তো তোমার জন্যে ছাড়ব। তোমাকে তুচ্ছ জিনিস দেব কেন? যা সবচেয়ে প্রিয় তাই যদি না দিলুম তোমাকে তো—কি দেওয়া হ'ল!...শ্রীক্ষেত্তরে গিয়ে জগন্নাথকে একটি ফল দিয়ে আসতে হয়, সব চেয়ে যা প্রিয় ফল তাই দিয়ে আসে মানুষ। আর জীবনে সে' ফল কখনও নিজের মুখে তোলে না। ভগবানকে সব শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে প্রিয় জিনিসই দিতে হয়। তোমাকেও আমি সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাই দিতে চাই।'

আরও একটুখানি নীরব থেকে রাজাবাবুর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'অনেকদিন তো গাইলুমও, আর কেন! এখন কি সাধ হয় জানো, তোমাকে রান্না ক'রে খাওয়াবো. তোমার জামায় সাবান দেব. তোমার জুতো বুরুশ ক'রে রাখব—সারাদিন তোমার কাজ আর তোমার সংসার নিয়ে থাকব। যদি কলকাতায় বাড়ি কেনো—ছোট দেখে কিনো বাপু, যাতে একটা ঝি থাকলেই চলে যায়। এত বড় বাড়ি এত লোক—সব সময় আতুপুতু ভাব, একটা আঙুল নাড়লেই সবাই ছুটে আসে—এ যেন মাঠের মধ্যে থাকা।

তোমাকে একেবারে আলাদা ক'রে পাওয়া যায় না। আমি গরিবের মেয়ে, এত বড়মানুষী আমার ভাল লাগে না, যেন হাঁফ ধরে। আমি চাই তোমাকে নিয়ে গেরস্তালি পাততে।'

'তাই হবে গো লক্ষ্মী, তাই হবে। সে তো আমারও একটা নতুন জীবন লাভ হবে। আমারও কি সাধ যায় না ভাবো? আমাদের ঐ আহিরীটোলার বাড়িরই আশেপাশে কত গেরস্তবাড়ি আছে, ছাদ থেকে দেখা যায়—বাবুরা আপিস থেকে এসে দাঁড়ালেই তাদের বৌরা ছুটে এসে জুতোর ফিতে খুলে দেয়, হাত থেকে চাদর ছাতা নিয়ে আলনায় ঝুলিয়ে রাখে। কামিজ খুলে মেলে দেয় বাইরে—ঘাম শুকুবে বলে; তারপর বাবুরা গামছা পরে মাদুরের ওপর বসে কিংবা শুয়ে পড়ে, বৌরা পাখা এনে বাতাস করতে বসে। কোন কোন বাবু আবার তাদের হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বৌকেই বাতাস করে খানিকটা; কেউ বা পাখার বাঁট দিয়ে ঘ্যাঁষ ঘ্যাঁষ ক'রে পিঠের ঘামাচি চুলকে নেয়। কেউ বৌকে বলে চুলকে দিতে। বৌরা তারপর মুখ হাত ধোওয়ার জল এনে দেয়। জল-খাবার এনে সামনে সাজিয়ে দেয়, ছেলেমেয়েরা বাপের সেই খাবারটুকুতে ভাগ বসাবার জন্যে চারপাশে ঘুরঘুর করে—কতদিন এসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। মনে হয়েছে এও তো মন্দ নয়, এ জীবনেও সুখ আছে, শান্তি আছে। অমনি ছোট সংসারে নিজের বৌয়ের সেবা পাবার, তার রান্না খাবার সাধও যে কখনও কখনও হয় নি তা নয়।...দ্যাখো, তোমাকে দিয়ে যদি সে সাধ পোরে।'

'খুব পুরবে। তাহ'লে আমি কিন্তু দিনকতক ঝিও রাখব না। রাখলেও ঠিকে-ঝি রাখব—শুধু দুবেলা বাসন মেজে ঘর মুছে দিয়ে চলে যাবে।...ঠিক তো?'

'যা খুশি তোমার তাই ক'রো। কিন্তু একলা থাকতে পারবে তো?'

তারপর হেসে বলেন, 'কিন্তু তুমি আমার এত সেবা করবে—আমার যে মহাপাপ হবে। হাজার হোক আমি বেনে আর তুমি বামুনের মেয়ে। জাতসাপের বাচ্ছা!'

'বড় বামুনের মেয়ে থাকতে দিলে কিনা! জাতের কি রইল আর?' হেসে বলে সুরবালা। তারপর গুনগুন ক'রে গান ধরে,

'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়ে একমন হয়ে নিচয় হইনু দাসী!'

তারপর পুরো গানটাই গায়—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—আখর দিয়ে দিয়ে। স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে শোনেন রাজাবাবু।

নানুর কাছে অনেক খবর পায় সুরবালা।

এত খবর পাবে তা আশাও করে নি।

প্রথম অবশ্য খুব একচোট গালাগালি দেয়—যা খুশি। খিস্তিও করে রাগের চোটে। হাসি-হাসি মুখে মাথা নিচু করে শোনে সুরাবালা, বাধা দেয় না, প্রতিবাদও করে না। অনেকক্ষণ ধরে ঝাল ঝাড়ার পর যখন একরকম শ্রান্ত হয়েই চুপ করে নানু, তখন শুধু বলে, 'আমার কিছুই বলবার নেই নানুদা, তুমি যা বলছ সবই সত্যি, আমার অপরাধ আমার পাপের শেষ নেই কিন্তু তুমি তো জানোই, তুমিই কতবার বলেছ, পীরিতে পড়লে মানুষের কোন পদার্থই থাকে না—জ্ঞানগম্যি মনুষ্যত্ব সব লোপ পায়। মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমিও সেই পাগল হয়েই এ কাজ করেছি—এই ভেবে মাপ করো। মাকেও মাপ করতে বলো।'

'তা বলে তুই!...তোকে যে আমি অন্য চোখে দেখতুম রে! সাধারণ মেয়ের চেয়ে অনেক বড় ভাবতুম।'

'সে তোমার চোখের দোষ নানুদা। আমিও মানুষই। খুবই সাধারণ মানুষ, সাধারণ মেয়ে।'

'তাও পীরিতে পড়লি পড়লি—ওর সঙ্গে! কী দেখে ভুললি?'

'কে কাকে দেখে ভোলে, কার মধ্যে কি দেখে—কেউ কি বলতে পারে? আর ঐ তো বললুম, পাগল না হলে কেউ পীরিতে পড়ে না—কিম্বা পীরিতে পড়লেই পাগল হয়ে যায়—একই কথা। তা পাগলের আবার হিসেব কি বলো?'

এবার হেসে ফেলে নানু, 'তা বটে। তাহ'লে তো দেখছি হাল ছেড়ে না দিয়ে লেগে থাকলে তুই আমার প্রেমেও পড়তে পারতিস!'

'তুমি অনেকের চেয়ে বড় নানুদা, যে তোমার মনের চেহারাটা দেখেছে সে জানে তুমি কত সুন্দর। তা নয়, তোমাকে যদি প্রথম থেকেই দাদার মতো না দেখতুম—তাহলে হয়ত তোমার প্রেমেই পড়তুম।...আর এটা কি জানো, পূর্বজন্মের সংস্কার। সত্যি কী দেখে যে মজেছি, তা আমিও জানি না। কিন্তু সেই প্রথম চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মনে হয়েছে সমস্ত দেহের নাড়িতে নাড়িতে টান পড়েছে। চুম্বক পাথর যেমন ক'রে লোহা টানে তেমনি ক'রে টেনেছে আমাকে। সত্যি বলছি—আমি আজও আড়ালে বসে ভাবলে ওঁর মুখ চোখ কিছুই মনে করতে পারি না, একটা আদল ফুটে ওঠে—এই পর্যন্ত। স্পষ্ট কিছু মনে পড়ে না। ওঁর দিকে চোখ পড়লেই সমস্ত শরীর মন যেন এলিয়ে পড়ে। ভাল ক'রে দেখা ঘটে ওঠে না।'

'কী বলব বল্—তুই ওর মেয়ের বয়িসী বলতে গেলে—কী দেখে এত মজেছিস কে জানে। সত্যিই বোধহয় এ জন্মান্তরের টান, তোর সাধ্যি ছিল না, এ টান ছিঁড়ে যাস। ভগবানের কাকে নিয়ে কি লীলা করার শখ হয়—তা তিনিই জানেন।...আমাকে দিয়েই কি কম উদ্ভট লীলার শখ মেটালেন!'

নানুর মুখেই খবর পায়, রাজাবাবু বিস্তর টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন নিস্তারিণীকে—সুরোর নাম ক'রে। একজন সরকার গোছের লোক ঠিক ক'রে দিয়েছেন, সে গিয়ে বাজার-হাট ক'রে দিয়ে আসে, কী দরকার না দরকার খোঁজখবর নেয়। টেক্স খাজনা জমা দেবার থাকলে দিয়ে আসে। সুরো জানত না এত সব। তবে তার এ বিশ্বাসটা ছিল—কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই রাজাবাবু। তাই সে নিশ্চিন্ত ছিল। আবার এসব যে তাঁর ব্যবস্থা, সুরো কিছু বলে নি বা জানে না—নানুও এই প্রথম জানল। দোয়ার-বাজনদারদের মোটা টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, তাছাড়াও তাদের বলে দিয়েছেন রাজাবাবু, যতদিন না নতুন কাজ তারা পায়—উনি তাদের মাসে মাসে কিছু ক'রে দেবেন। কাউকে চাইতে হবে না—সে টাকা ফি মাসের পয়লা তারিখে মতির কাছে পেঁছে যাবে। মতিকে বলা আছে, রাজাবাবুর ম্যানেজার বলে দিয়ে এসেছেন—নতুন কাজ পেল কিনা সে যেন খবরটা রাখে।

সবচেয়ে কষ্ট হয়েছে নাকি মতিরই। রাগ, অভিমান—দুঃখও। সে নাকি লোক দিয়ে নানুকে ডেকে পাঠিয়েছিল এর মধ্যে। নানুর কথা অনেক শুনেছে সে সুরোর মুখে। সুরো যে ওকে বড় ভাইয়ের মতো দেখে, নানুও সুরোকে খুব স্নেহ করে—তা সে জানে, সেই ভরসাতেই সে নানুকে ডেকে পাঠিয়েছে—ইত্যাদি ভূমিকার পর সে আসল কথাটা বলেছে—কীভাবে ঐ পিশাচ বুড়োটার হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচানো যায়—নানু কোন যুক্তি দিতে পারে কি না। রাজাবাবুর ওপর বিষম রাগ তার, যদি সাধারণ লোক হ'ত তো পয়সা খরচ ক'রে গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়াত। এমন মার দিত যাতে হাত-পা কিম্বা শির-দাঁড়া ভেঙে ছ-মাস এক বছর বিছানায় পড়ে থাকে। তা সম্ভব নয়—কারণ গাড়িতে যাতায়াত করেন রাজাবাবু। আজকাল বাগানবাড়িতে যান বলে একটা মুসলমান গুন্ডা-গোছের লোককে সঙ্গে নিয়ে যান। তাকে মাইনে ক'রে রেখেছেন পাহারা দেওয়ার জন্যেই। সে কোচোয়ানের পাশে বসে যায়, ফেরার সময়ও তাই। ওখানে বাগানে বন্দুকধারী দারোয়ান আছে, সেও পুরনো সিপাই, তার নাকি এমনিই রাত্রে ঘুম হয় না, সারারাত ঘুরে পাহারা দেয় সে। তার হাতের তাগও নাকি অব্যর্থ।

এ সমস্ত খবরই মতি যোগাড় করেছে। শুনে সুরোর অবাক লাগে। এ সব কোন কথাই সে জানে না। কে কোচোয়ানের পাশে বসে যায়, কে রাত্রে পাহারা দেয়—জানবার কথা কখনও মনে হয় নি তার। মতি নাকি আজকাল রাজাবাবুকে গালাগালি শাপমন্যি না দিয়ে জল খায় না, সুরোকেও শাপশাপান্ত করে। নানুর কাছে কান্নাকাটিও করেছে খুব। তার বিশ্বাস রাজাবাবু 'গুণ' করেছেন মেয়েটাকে। তেমন যদি কোন ওস্তাদ গুণীনের খবর আনতে পারে নানু—যে এই 'গুণ' কাটাতে পারে—তাহলে তার জন্যে যা খরচ হয় সব দিতে রাজী আছে মতি।

সুরো হাসে। বলে, 'তা তুমি কি বললে?'

'আমি আর কি বলব। বলেছি দুচারজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব, কেউ যদি তেমন কোন গুণীনের সন্ধান দিতে পারে। আমি তো জানি না। শুনেছি বীরভূম অঞ্চলে এই ধরনের পাকা গুণীন কিছু কিছু আছে। তবে এও বলেছি, ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে—এইসব টানাটানিতে মেয়েটার জীবন নষ্ট হবে না তো? যদি পাগল হয়ে-টয়ে যায়?' নানুও হাসে মুখ টিপে।

'তা মাসীর এত মাথা খারাপ হ'ল কেন? এখনও কি কারবার বন্ধ হবার ভয়?'

'ঠিক কারবারের চিন্তাও নয়', নিমেষে গম্ভীর হয়ে যায় নানু, 'তুই ওকে বুড়ো-বয়সে অসুখবিসুখ হ'লে কি মরবার সময় দেখবি বলেছিলি—সেইটে ওর খুব মনের জোর ছিল। ও বলে, সুরোই একমাত্তর যে নিঃসাথকপরের মতো দেখবে, আর সবাই তো আমার পয়সা টেঁকে বসে আছে। জানে গেলেই মঙ্গল।'

'এই কথা! তুমি নানুদা মাসীর সঙ্গে দেখা ক'রে বলে এসো একবার যে, সুরো যেখানেই থাক, যে ভাবেই থাক—যদি কোনদিন ওর কোন অসুখের খবর পায়—নিশ্চয়ই ছুটে যাবে, দরকার হয় তাকে আগলে দুমাস ছমাসও পড়ে থাকবে। যে দিব্যি গেলেছি তা ভুলি নি। তেমন হ'লে কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। মাসী আমার গুরু—তাকে যদি অসময়ে না দেখি তো সাতজন্ম নরকে পচতে হবে। লক্ষ্মীটি নানুদা, কথাটা বলে এসো একবার—অবিশ্যি অবিশ্যি।'

আরও খবর পাওয়া যায় নানুর কাছে।

বড় খবর সেটাই। বহুদিনের বহু প্রত্যাশিত, বহু আকাঙ্ক্ষিত সংবাদ।

গণেশের খবর।

নানুই সংগ্রহ করেছে এটা। অতি কষ্টে বহু লোককে ধরে, একটু একটু ক'রে।

প্রেমে পড়েছে গণেশও, আর সেটাই তারও উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'এ তোদের বংশের দোষ দেখছি। পিছে কেন খাড়া—না বংশীবলীর ধারা।' খবরটা বলতে বলতেই হেসে বলে নানু।

গণেশের আলাদা ম্যাজিকের দল করা আর হয়ে ওঠে নি।

হয়ে ওঠে নি সেটা শুনেছিল সুরোও। কেন হয় নি সেইটে এতদিনে জানা গেল।

ইংরেজ কোম্পানীরা সার্কাস দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা লুটে নিয়ে যায় দেখে—ইদানীং অনেক দেশী কোম্পানী চেষ্টা করছে অনেকদিন থেকেই, দেশী সার্কাসের দল করবে বলে। বাঙালী কে এক ঘোষ আছেন, তিনিও করেছেন। 'প্রোফেসর ঘোষের সার্কাস' নাম দিয়ে দল করেছেন একটা। কিছুদিন ধরেই টুকটাক ঘুরছে সে দল, এদেশ ওদেশ। যখন কোথাও থেকে কোন টাকা-পয়সা পাবার আশা ছিল না, তখন এদের দলে ভিড়ে পাড়ি জমানো যায় কিনা—সেই মতলবে গণেশ গিয়ে মালিকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে-ছিল। গণেশের চেহারা আর কথাবার্তা এমনই যে রাজার দরবারে গেলেও পাঁচ মিনিটে নিজের একটি বিশিষ্ট আসন ক'রে নিতে পারবে—তবে ওর টানটা চিরদিনই যেন অশিক্ষিত নিম্নস্তরের শিল্পীদের দিকে; বেদে, ভেলকীওয়ালা, সার্কাসের খেলা দেখায়

যারা—তাদের দিকে। তাদের সঙ্গেই যত বন্ধুত্ব ওর।

যাই হোক—ঘোষ খুবই প্রীতির চোখে দেখেছিলেন ওকে। গণেশের ম্যাজিক দেখে বুঝেছিলেন, ওকে দলে টানতে পারলে তাঁদের দল বাজিমাৎ করবে—বিশেষ যেখানে ওঁদের ভাল বাজার—জাভা, সুমাত্রা, বালি, বোর্ণিও, বার্মা—ওসব দিকে এ দুটোই চায় তারা, আর তাদের অন্য কোন আমোদের দিকে ঝোঁকও নেই। কিন্তু নানা কারণে—বোধহয় দেশের টানে—ভারতবর্ষে এসে বোম্বে মাদ্রাজে খেলা দেখাতে গিয়ে ঘোষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন সে সময়টায়। সেই সময় সদ্য হারমোস্টোনের সার্কাস এসেছে বিলেত থেকে—তা দেখার পর, সেই ছবি চোখে থাকতে কে আর ঘোষের সার্কাস দেখবে? ঘোষের দলও তখন, এদেশে আসার পর একেবারে ভাঙা—কারণ খেলোয়াড় বেশির ভাগই দক্ষিণ ভারতীয়—ত্রিবাঙ্কুর কোচিন মহীশুরের দিকের লোকই অধিকাংশ—তারা দীর্ঘ-কাল পরে দেশে ফিরে যে যার বাড়ি চলে গেছে। সেখান থেকে কেউ কেউ—মাদ্রাজে কী এক নতুন সার্কাস দল হয়েছে—বেশী মাইনেতে সেখানে ঢুকে পড়েছে। থাকার মধ্যে আছে ওঁর সেরা খেলা যেটা—বাঘের খেলা। এইটেই তখনও পর্যন্ত কোন এদেশী—সাহেবরা যাদের নেটিভ মেয়ে বলে—কেউ শিখতে পারে নি, এক এই ঘোষের দলের দুটি মেয়ে হিমি আর কুসী ছাড়া, অর্থাৎ হেমাঙ্গিনী ও কুসুমবালা। এরা যে শুধু সাধারণ বাঘের খেলা দেখায় তাই নয়—অসমসাহসিক কাণ্ডকারখানা করে, কোন সাহেব সার্কাস কোম্পানীও আজ পর্যন্ত এ ধরনের খেলা দেখাতে পারে নি, কেউ সাহস করে নি। এরা মাথার বালিশ হিসেবে একটা বাঘের হাঁ-করা মুখের মধ্যে মাথা পুরে—একটা বাঘকে পাশবালিশ ক'রে, আর একটা বাঘকে তাকিয়া ক'রে তার ওপর পা তুলে দিয়ে শুয়ে পড়ে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে—এমনি ভাব করে।*

এই এক খেলার জন্যেই ঘোষের সার্কাসের এত নাম—এবং ওদেশে এত পয়সা। তবু, অন্য পাঁচটা খেলা ছাড়া বাইরে যাওয়া যায় না—যারা পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কাটবে তারা পাঁচ মিনিটের বাঘের খেলা দেখে কিছু খুশী-মনে বাড়ি ফিরে যাবে না। তাদের অন্তত সওয়া দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মতো প্রোগ্রাম চাই।

অবশ্য ভাঙা দল গড়তে জানেন প্রোফেসর ঘোষ, কোথা থেকে নতুন লোক সংগৃহীত হ'তে পারে তাও তাঁর অজানা নেই। কিন্তু সবই টাকার খেলা। কিছু টাকা হাতে পেলেই ত্রিবাঙ্কুরে গিয়ে আবার লোক ধরে আনতে পারেন—বার বার সেই আপসোসই করে-ছিলেন। পুরো দল দেখলে মহাজনরা টাকা আগাম দিতে পারে, ভাঙা দলে কেউ দেবে না।...এই যখন অবস্থা—সুরোর টাকাটা গণেশের হাতে এসে পড়ে। গণেশ সেই টাকাতেই নিজের একটা দল জুটিয়ে সাজপাট কিনে চলে যেতে পারত—ঘোষের অবস্থা দেখে পারে নি। সে টাকার মোটা অংশটাই ঘোষের হাতে তুলে দিয়েছে। তবে ঘোষ করেওছেন অসাধ্যসাধন, সেই টাকা থেকেই কিছু কিছু দাদন আর গাড়িভাড়া দিয়ে লোক এনে

---

*এর মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই। সত্যিই দুটি বাঙ্গালীর মেয়ে সেই অত কাল আগেও এই খেলা দেখাতেন। যতদূর মনে পড়ছে তাঁদের নাম সুশীলাবালা ও হিঙ্গনবালা। 'সুশীলার বাঘের খেলা' দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিল। তবে মুখের মধ্যে রসগোল্লা নিয়ে তার স্বাদ গ্রহণে বিরত থাকা মানুষের পক্ষেই কঠিন—জন্তুর পক্ষে তো হবেই। এই খেলা দেখাতে গিয়েই সুশীলাবালা আহত হন, বাঘ একদিন হাঁ-টা বুজিয়ে ফেলে। চকিতের জন্য হ'লেও তাতেই মাথার ছাল সম্পূর্ণ উঠে গিয়েছিল। সুশীলা সেই আঘাতেই অনেক দিন ভুগে মারা যান। হিঙ্গনবালা কিন্তু আরও বহুদিন বাঘের খেলা দেখিয়েছেন। বোধহয় গত যুদ্ধের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। হয়ত আজও আছেন। তবে এ কাহিনীর সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, বলা বাহুল্য।

জড়ো করেছেন, তারপর তৈরী দল দেখিয়ে জাহাজভাড়াটা ধার ক'রে রেঙ্গুনে গেছেন। গণেশও তাঁদের সঙ্গেই গেছে, সার্কাস দলের অংশীদার হিসেবে, দশ আনা ছ আনা বখরায়। ঘোষের দশ আনা, গণেশের ছ আনা—এই বন্দোবস্তে।

তারপর অবশ্য ঘোষের অবস্থা ভাল হয়েছে। বর্মা ঘুরে ওখান থেকে সিঙ্গাপুর, জাভা সুমাত্রা বালি—এই সব জায়গাতে গেছে, সেখানে খুব নাম হয়েছে গণেশের। বিশেষ তার বাক্সর খেলার নাকি জুড়ি নেই। তখনও পর্যন্ত কোন বিলিতি ম্যাজিকওলাও সে খেলা দেখাতে পারেন নি। হাত-পা বেঁধে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে একটা বাক্সয় পুরে দর্শকরা নিজেদের তালা লাগিয়ে এলেও—অনায়াসে এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসে গণেশ, কেউ বুঝতে পারে না কেমন ক'রে এল। শুধু একটা মশারী চাপা দেওয়া হয় বাক্সর ওপরে। বাইরে এসে দেখা দিয়ে আবার মশারীতে ঢুকে পড়ে, এবং পরক্ষণেই টান মেরে মশারী সরালে দেখা যায় যেমন বাক্স বন্ধ তেমনি আছে, বাক্সর মধ্যে গণেশও তেমনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায়।

ওর ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরের কোন্ এক চীনা মহাজন বিস্তর টাকা দিতে চেয়েছে ওকে—তার ইচ্ছে, পুরো সাহেবী ফ্যাশানে ম্যাজিকের দল করে বিলেত আমেরিকা জাপান ঘুরবে, লাভের আধা বখরা তার থাকবে। এ সুযোগ দু বছর আগে পেলে গণেশ বোধহয় পরমায়ুর বেশ কয়েক বছর বাদ দিয়ে দিতে রাজী ছিল। কিন্তু এখন আর যাওয়ার উপায় নেই তার, মানসবিহঙ্গের ডানা কাটা গেছে—এদের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে পুরোপুরি। এদের বললে কিছু ভুল হবে হয়ত—বাঁধা পড়েছে ঐ দুই সার্কাসওয়ালীর টানেই। বাঙ্গালীর মেয়ে অবলীলাক্রমে বাঘ বশ করে—এই দেখেই গণেশ ওদের বশীভূত হয়ে পড়েছিল সেই প্রথম থেকে। প্রথমে ছিল বিস্ময় আর শ্রদ্ধা—এখন সে শ্রদ্ধা প্রেমে দাঁড়িয়েছে। ঠিক কোনটির সঙ্গে প্রেম তা নানু বলতে পারবে না। সম্ভবত হিমির সঙ্গেই। কিন্তু যে-ই হোক, তারা দুজনেই গণেশের থেকে বয়সে বড়, দেখতেও ভাল নয় আদৌ, রঙ কালো। কিন্তু তবু তার জন্যেই বা তাদের জন্যেই গণেশ তার বিপুল সম্ভাবনা, এতদিনের স্বপ্ন আশা—সব নষ্ট ক'রে ভবিষ্যৎটি সম্পূর্ণ ক্ষুইয়ে বসে আছে। সে ওদের ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী নয়।...

বিস্তৃত কাহিনী। সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুরো, তার চোখ ছলছল করতে থাকে। এ সবই সত্যি—অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এ-ই গণেশ—তা তার দিদি ভাল রকমই জানে। এই ভাইটাকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত, মা-বাবার চেয়েও। তার উন্নতি হবে, দশের একজন হয়ে দাঁড়াবে—এইটুকুই চেয়েছিল সে। আর বোধহয় কোথাও কোন আশা রইল না।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কী বলব বলো, মার অদেষ্ট।...তা তার ঠিকানাটা কোথাও থেকে পাওয়া যায় না নানুদা? মার খুব অসুখ, কি আমার নাম ক'রেই যদি তার করো যে তোর দিদি মরো-মরো—আসবে না?'

'তার ঠিকানাটা পাওয়াই তো মুশকিল। ওদের দলের যে লোক এখানে এসেছে, যার কাছে এসব খবর পাওয়া গেল—সে ওখান থেকে রওনা দিয়েছে মাসখানেক আগে। এখন দল কোথায় আছে সেও বলতে পারবে না। এক জায়গায় দু সপ্তাহ কি বড়জোর তিন সপ্তাহ খেলা দেখানো হয়, তারপরই আবার পাততাড়ি গুটিয়ে আর এক জায়গায়। কেবলই তো ঘুরে বেড়ানো! তাছাড়া দলের সঙ্গে কাজ করছে—ওর একটা প্রধান খেলা—হঠাৎ চলে আসতে কি পারবে? তারা আসতে দেবে কেন? বাঁধা বড় প্রোগ্রাম একটা। একজন ছুটকো লোক চলে আসে—ট্র্যাপিজ কি বারের লোক—সে আলাদা কথা। তবে ফেরার সময় এমনিই হয়ে এল। দু বছর আড়াই বছর অন্তর ফিরতেই হয়, খেলোয়াড়রা নইলে গোলমাল করে, আর, একবার এলে দু-তিন মাসের আগে কেউ নড়েও না। সে

সময় নিশ্চয় গণেশও আসবে একবার কলকাতায়, তোদের সঙ্গে দেখা করতে।...কিন্তু এলেই বা কি হবে, ও নেশা কি ছাড়াতে পারবি? তোর নেশা কি তোর মা—আমরা ছাড়াতে পারলুম? সেই জাত তোরা? কী বলবি তুই? সে যদি তোর দৃষ্টান্ত দিয়েই তোকে জবাব দেয়?'

আর দাঁড়ায় না নানু, একেবারে উঠে পড়ে।

আর থাকা নিরাপদ নয়। আবারও কি বলতে কি বলে ফেলবে। এ প্রসঙ্গ আর তোলার ইচ্ছে ছিল না। যথেষ্ট বলেছে সে এসেই। এতটা বলারও তার অধিকার নেই। তাছাড়া সুখ নিয়েই যেখানে কথা—সেখানে এসব বিচার অনর্থক। যদি এতেই সুখী হয়ে থাকে মেয়েটা—হোক, তার কি বলবার আছে?...অনেক যুঝেছে, অনেক সয়েছে। সহজে হার মানার কি পোষ মানার মেয়ে যে সুরো নয়, তা নানুর চেয়ে বেশী কে জানে। ওর যে অনিষ্ট বা লোকসান কল্পনা করছে তারা—সে তো নিজেদের হিসেব দিয়েই। নিজেদের মন দিয়েই বিচার করছে ওকে। কোন মনই তো বাঁধা হিসেবে চলে না চিরদিন। বোধহয় কখনই চলে না। নানুই তো তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। সুরো যদি এবারে—নানুর অভিযোগের উত্তরে সেই উদাহরণই দেয়—নানু কোন জবাব দিতে পারবে না।

তবুও, মনকে যতই বোঝাক, ফটক পার হয়ে রাস্তায় পড়তে পড়তে চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসই বেরিয়ে আসে নানুর, চোখ দুটোও ঝাপ্‌সা বোধ হয় খানিকটা।

এর কি সবটাই সুরবালার দুঃখে, তার ক্ষতির সম্ভাবনায়?

না কি এর মধ্যে নানুরও কোন সূক্ষ্ম ক্ষতি, কোন বেহিসেবী লোকসানের প্রশ্ন আছে? কোন আকারহীন, অস্পষ্ট আশাভঙ্গের বেদনা?...

বেশী ভাবতে গেলে পাছে নিজের মনের চেহারাটা নিজের চোখেই পড়ে যায়—কতকটা সেই ভয়েই যেন—দাঁড়িয়ে চলতি গাড়ির অপেক্ষা না ক'রে হন-হন ক'রে হাঁটতে শুরু করল সে।

॥ ২২ ॥

আরও কিছুদিন পরে নানুর কাছ থেকে খবর এল, গণেশের বন্ধু কিরণ সুরোর সঙ্গে দেখা করতে চায় একবার। ঠিকানার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করছে। নানু অবশ্য এখনও ঠিকানা দেয় নি, তবে আপত্তিরও কোন কারণ তেমন খুঁজে পায় নি বলে সুরোকে জানাচ্ছে, যদি সে বলে তো পাঠিয়ে দেবে ছোকরাকে।

সুরো তখনই পাঠাতে বলে দিল। সে উৎসুক শুধু নয়, ব্যগ্র। আসলে এমনি একজন পরিচিত মানুষের জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল তার।...অনেক দিন এখানে এসেছে। তাদের সেই প্রথম প্রেমের তীব্রতা কিছুমাত্র কমে নি এখনও—কিন্তু এখন রাজাবাবুকে একটু-আধটু বেরোতে হচ্ছে প্রত্যহই ; ব্যবসা ও সম্পত্তি দুটোই বিপুল তাঁর, নিজে না দেখলে চলে না। সেই সময়গুলো সুরোর যেন কাটতে চায় না। এত বড় বাগান পেরিয়ে তবে রাস্তা, রাস্তায় পড়লে জনবসতি। সে বসতিও খুব ঘন নয়। লোকই কম

এ পাড়ায়, সামান্য যা দু-চার ঘর দরিদ্র মানুষ আছে, তারা ভরসা ক'রে এ বাড়িতে ঢুকতে পারে না। এক কোন কাজে-কর্মে 'জন' খাটতে আসে হয়ত। এত বড় বাড়িটায় সুরো একা—আর তিন-চারজন ঠাকুর চাকর ঝি, তারা কেউই ঠিক সুরোর সঙ্গী নয়। দারোয়ান থাকে দেউড়ীর পাশের ঘরে। চৌকিদার আছে একজন, সে সারা রাত জেগে বাগানে পাহারা দেয়, সারা দিনই পড়ে ঘুমোয়। দুপুর আর বিকেল একেবারেই নিঃসঙ্গ কাটে সুরবালার। প্রথম প্রথম রাজাবাবুর চিন্তাতেই কাটত, এখনও তাই কাটে—তবে, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আর অতটা থাকা সম্ভব নয় বলেই, মাঝে মাঝে এই নির্জনতায় হাঁপিয়ে ওঠে।

অভ্যস্ত জীবন আর পরিচিত মানুষের জন্যে একটা অভাববোধ স্বাভাবিক। মনে হয় যেন কতকাল তাদের দেখতে পায় নি—কত যুগ। মনে হয় তার বুঝি সত্যিই জন্মান্তর ঘটেছে; যাদের সে চিনত, যাদের সঙ্গে জীবন কেটেছে এতকাল, তারা সব পূর্বজন্মের পরিচিত, পূর্বজীবনের আত্মীয়। মা তো বটেই—এমন কি মাসীর জন্যেও তার খুব মন-কেমন করে আজকাল, ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে। যাওয়ার এমনি কোন বাধা নেই, রাজাবাবুকে বললেই তিনি গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, সঙ্গে লোকজন দেবেন—বাধা সুরোর মনেই। গেলেই অনেক অপ্রীতিকর কথা শুনতে হবে, অনেক কটু কথা। বিস্তর জবাবদিহি করতে হবে। যেটা তার নিজস্ব অনুভূতির কথা, উপলব্ধির কথা—একেবারেই গোপন অন্তরের কথা, সেটা নিয়ে যুক্তি-তর্ক বাগবিতণ্ডা জবাবদিহি করতে ইচ্ছে করে না।

তারপর, মতির কাছে গেলেই সে আবার গান গাওয়াবার চেষ্টা করবে, পীড়াপীড়ি করবে মুজরো নেওয়ার জন্যে। সেটাই আর সুরো পারবে না। এইখানটাতেই রাজাবাবুর ঘোর আপত্তি। লোকের বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে পেলা কুড়িয়ে বেড়াবে তাঁর প্রিয়তমা—এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। সে কথা পরিষ্কার না বললেও সুরো জানে। বন্ধুবান্ধব ডেকে শখ ক'রে গান শোনাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু পয়সা নিয়ে গাওয়াতে তাঁর ঘোর অমত। অবশ্য সুরবালা জোর করলে তিনি বাধা দিতে পারবেন না—সুরবালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার আর সাধ্য নেই তাঁর—কিন্তু সেই জোরটাই সে করতে চায় না। যাকে ভালবাসে মানুষ তার জন্যে খানিকটা স্বার্থত্যাগ করতে চায়—না করতে পারলে ক্ষুণ্ণ হয়। সুরবালাও চায় তার দয়িতের জন্যে চরম স্বার্থত্যাগ করতে। এ যাবৎ তার জীবনে সব থেকে প্রিয় যে জিনিসটি—এই গান, সেইটিই সে উৎসর্গ করেছে তার ইহজীবনের দেবতাকে। তিনি গাওয়ালে সে গাইবে, তাঁর ভোগে লাগলে সে নিবেদন করবে তার গান—এ গান অন্যের অনুরোধে, বেসাতি ক'রে বেচার মতো আর গাইতে পারবে না কোন দিন।

কিরণকে পাঠিয়ে দিতে বলে তার বা তাদের সুবিধার জন্যে অপেক্ষা করারও যেন ধৈর্য রইল না সুরোর, সে বিকেলেই নানুর কাছে দারোয়ান পাঠাল—কী হ'ল কিরণবাবুর, কৈ তিনি তো এলেন না! শুধু পরিচিত বা পূর্বজীবনের অন্তরঙ্গ মানুষ বলেই নয়, গণেশের বন্ধু বলেও ওর আরও বেশী দুর্বলতা কিরণ সম্বন্ধে।

সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোট ভাইটা আর ওর মধ্যে যেন সেতু বলে মনে হয় কিরণকে। কিরণ হয়ত গণেশের খবর বেশী রাখে, হয়ত বন্ধুকে সে চিঠি দেয় নিয়মিত। এমনিতেও এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে তার ভাল লাগে। বাবার মৃত্যুর সময় করেওছে খুব। ভারি অমায়িক আর শান্ত মিষ্ট স্বভাবের ছেলে, পরোপকারী। দেখা হ'লে মাকে একটু দেখা-শোনা করা বা খবরাখবর নেওয়ার অনুরোধ করতে পারবে সে অনায়াসে।...

কিরণ এল দিন-দুই পরে। নানুর সঙ্গে তার দুদিন দেখা হয় নি, সেই জন্যেই ঠিকানা পেতে দেরি হয়েছে। এর মধ্যে যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে সে, আরও সুন্দর হয়েছে

দেখতে। গণেশের মতো অত লম্বা-চওড়া নয়—কিরণের চেহারাটা বরং একটু মেয়েলি ধরনের। তাহলেও—খুব একটা বেমানান মনে হয় না, মেয়েলি চেহারার দৈন্যটা তার স্বভাব-মিতভাষিতায় অনেকখানি পূরণ হয়ে যায়।

না, গণেশের কোন চিঠিই সে পায় না, অনেকদিন পায় নি। শেষ চিঠি পেয়েছে সুমাত্রা থেকে, সেও বহুদিনের কথা হ'ল, অন্তত মাস-ছয়েক। চিঠি আসে এক-তরফা, সে দিলে তবে পায় কিরণ, কিরণের উত্তর দেওয়ার কোন উপায় নেই। নানু যা খবর দিলে সেদিন—ততটা কিরণ জানে না, তবে হিমি আর কুসীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গণেশ প্রত্যেক চিঠিতেই। ওদের দল ছেড়ে যে তার আসবার উপায় নেই, সে কথাটা অবশ্য বারবারই লেখে। অতগুলো এদেশী লোক ক'রে খাচ্ছে, গণেশ চলে এলে সার্কাস দলই ভেঙে যাবে, লোকগুলো বেকার হয়ে পড়বে। বিলিতী সার্কাসের দল হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে ঐ সব দেশ থেকে, এমন কি মাদ্রাজের একটা দল এসেও বিস্তর টাকা রোজগার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—বাঙালীর এই কারবার উঠে গেলে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হবে।

তার মানে বেশ জড়িয়ে পড়েছে সে ওদের সঙ্গে। ঐ মেয়ে দুটোই কাল হয়েছে। দুটো কিম্বা একটা। চিরদিনই গুণীর ভক্ত গণেশ। নিমতলাঘাটের ধারে প্রথম একটা বেদেকে দেখে—তখন বোধহয় বছর পাঁচেক বয়স হবে—ভেল্‌কি খেলা দেখাচ্ছিল লোকটা, তখনই মার হাত ছেড়ে ভিড় ঠেলে বেদের কোলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একেবারে। তারপর থেকেই ওর এই ভেল্‌কি বা জাদুবিদ্যা শেখবার শখ। সেই স্বভাব আজও যায় নি। কে জানে, বোধহয় ঐ মেয়ে দুটোর কাছে বাঘের খেলাই শিখছে এখন। আর যার কাছে শেখে—চিরদিনই দেখে আসছে সুরো—তার কোন সেবা কি দাসত্বেই পিছপাও হয় না। সেই জন্যেই সম্ভবত বুক দিয়ে যথাসর্বস্ব দিয়ে, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে ঐ সার্কাস দল আঁকড়ে পড়ে আছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এক্ষেত্রে। চোখের বাইরে, আয়ত্তের বাইরে যে প্রবাসী তাকে ফেরাবার কি শাসন করবার কোন চেষ্টা করবে—সে উপায় নেই। সুরোও জোর ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গেই ভাইয়ের চিন্তা সরিয়ে দেয়, কিরণের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, বলে, 'তারপর? তোমার খবর কি বলো? থিয়েটার করছ, না দেশে আছ?'

'থিয়েটার করছি, কিন্তু সে নামেই। জুৎ হচ্ছে না।' মাথা নিচু ক'রে জবাব দেয় কিরণ।

'কেন, জুৎ হচ্ছে না কেন?'

'ছোটখাটো পার্ট—কমিক মানে হাসির পার্ট দেয় তো—তাতে আর কি হয় বলো। এর চেয়ে উন্নতির কোন আশা নেই। মাইনে তো নাম-মাত্তর—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। পঁচিশ টাকা মাইনে—খাতায়-কলমে লেখা থাকে, কোন মাসেই পনেরো ষোল টাকার বেশী আদায় হয় না।'

'তা তাহলে আর এখানে পড়ে আছ কেন মিছিমিছি? দেশে চলে যাও না। শখ যা ছিল সে তো মিটেছে খানিকটা। আর কেন!'

লাল হয়ে ওঠে কিরণ, খানিকক্ষণ কোন জবাবই দিতে পারে না। তারপর বলে, 'না—তা নয়। কি জানো, তোমাকে খুলেই বলছি, দেশ মানেই সেই জমি-জমা-প্রজা-খাজনা পত্তনি বন্ধকী—মানে বিষয়কর্মে জড়িয়ে পড়া, সে যা বাঁধন, একবার তার মধ্যে পড়লে আর কোথাও যাওয়া যাবে না, যতদিন বাঁচব ঐ নিয়েই থাকতে হবে—বাবার মতো। বাবাকে দেখছি তো, কোথাও তীর্থ-ধর্ম করতেও যেতে পারেন না। এই যে আমি এখানে একা থাকি, আমার খবর নিতে আসবেন—চার ঘণ্টার তো রাস্তা—তাই বা কদিন আসেন,

দেখেছ তো!...এখন থেকেই আর ঐ কুয়োর গিয়ে ঢুকতে ইচ্ছে করে না।'

'তা কি করবে তাহলে? এমনি শুধু শুধু এই কলকাতায় পড়ে থাকবে? এই বয়স তোমার, ওরই মধ্যে কিছু পয়সাও আছে, সুন্দর চেহারা—এভাবে একা তোমার এখানে পড়ে থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া আবার থিয়েটারে যাতায়াত করো—ও হ'ল গিয়ে সাতশ রাক্ষসীর আড্ডা, কোন্‌দিন ইহকাল-পরকাল দুই-ই খুইয়ে বসে থাকবে।'

'সেই জন্যেই তো এত কাণ্ড ক'রে ঠিকানা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি', অনেক ইতস্তত ক'রে যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলে, 'তুমি রাজাবাবুকে বলে আমার একটা চাকরি ঠিক ক'রে দাও! যা হয় কিছু পেলেই হবে, এখানে বাড়িভাড়া তো লাগে না, ও বাড়িটা বাবা কিনেই নিয়েছেন, চাকরের মাইনেও বাবাই দেন, নিয়ে-দিয়ে আমার খরচাটা। ওটা দেশ থেকে নিতে না হ'লেই হ'ল। থিয়েটার বজায় রেখে যদি করতে পারি তো সে আরও ভাল, নতুন পার্ট ধরেছি, বইটা চলছেও খুব—তবে ওতে তো আর পেট ভরে না—যদি থিয়েটার ছাড়তে হয় তাতেও রাজী আছি!'

'তুমি চাকরি করবে! সে কি কথা! তোমার বাবা শুনলে রাগ করবেন না?'

'তা হয়ত করবেন, এবার—এই নতুন বই খোলার আগে যখন দেশে গিয়েছিলুম—একটু বকাবকিই করেছিলেন, বলেছিলেন, দুদিন শখ মেটাতে ছেড়ে দিয়েছিলুম তাই বলে কি তুই সেখানেই বারো মাস পড়ে থাকবি, এসব কাজকর্ম শিখবে কে? আমি যদি হঠাৎ মরে যাই—পাঁচভূতে লুটে খাবে যে, একেবারে পথে বসবি।'

'তা তুমি কি বললে তাতে?'

'অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আর একটা বছর সময় নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'নতুন বইতে কাজ করছ? কী বই?'

'মৃণালিনী। বঙ্কিম চাটুজ্জের বই। জি-সি নাটক করেছেন। উনিই পশুপতি সাজেন।'

'তুমি কি করো?'

একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলে, 'দিগ্বিজয়। গিরিজায়ার সঙ্গে ডুয়েট আছে, নাচ-গান। নাচতে শিখেছি আজকাল। তুমি যাবে দেখতে একদিন?'

'না। ওদিকের ফুটপাথেও আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না...আর তোমার ও পার্ট দেখতে তো যাবই না। তোমার এত নেশা! ভদ্দর লোক জমিদারের ছেলে, স্টেজে ভাঁড়ামো ক'রে নাচছ! না ভাই, লক্ষ্মীটি, এ পথ ছাড়। যখন বুঝতেই পেরেইছ যে এখানে তোমার খুব একটা উন্নতি হবে না—তখন আর মায়া করছ কেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে বিষয়কর্ম দ্যাখো গে।'

কিরণ লজ্জিত হয়ে পড়ে। সে যেটাকে উন্নতি বলে মনে ক'রে—উৎসাহভরে বলতে এসেছিল—সেটার যে এরকম ব্যাখ্যা হবে তা ভাবে নি। সে আবারও মাথা নিচু করল। যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারেরই একটা হাতল খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'এদের সঙ্গে একটা কথা হয়ে গেছে—বইটাও জমেছে—এ সময় যাওয়া—! তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, বাবাকে বলে এক বছর সময় নিয়ে এসেছি—তারও পাঁচ মাস কেটে গেছে। ফিরতে তো হবেই। এত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নেই। সব সম্পর্ক চুকিয়ে খিরে কুয়ার মধ্যে ঢোকা, যে কটা দিন এখানে থাকতে পারি—সেই কটা দিনই লাভ।'

সুরো আর কথা বাড়াল না! ছেলেটার সব ভাল—কেবল কী যে শহর আর থিয়েটারের নেশা! ওকে বোঝাতে যাওয়াও বৃথা। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলল, 'দেখি রাজাবাবু আসুন, তাঁকে বলি। কাজটাজ কি আছে—কী ক'রে দিতে পারেন—সে সব খবর আমি বলতে পারব না। উনি কি করেন তা-ই জানি না। আমি তোমার কথা বলে রাখব, তুমি কাল এসে বরং একবার খবর নিয়ে যেও।'

রাজাবাবুর কাছে একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা পাড়তে গিয়েছিল সুরো। কখনই কিছু চায় না সে, এর মধ্যে কোন সামান্য জিনিসও চায় নি। কেমন যেন লজ্জা করে ওর, কেবলই ভয় হয় উনি কি মনে করবেন, হয়ত লোভী ভাববেন। ইতিমধ্যে অনেক কিছু এনে দিয়েছেন রাজাবাবু। শাড়ি গয়না জামার স্তূপ জমে উঠেছে, শুনেছে যে তার জন্যে একটা বাড়ি কেনারও চেষ্টা করছেন শহরে—রাজাবাবুর পাড়ার কাছাকাছি—কিন্তু নিজে থেকে সুরো কোন দিন কোন প্রার্থনা জানায় নি, যা উনি স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন তার জন্যে বরং যথেষ্ট অনুযোগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এটা অবশ্য পরের জন্যে চাওয়া,—তবু একটা কুণ্ঠা যেন থেকেই যায়। যতই হোক, যার জন্যে সুবিধা চাইছে—সে ওরই পরিচিত, ওরই ভাইয়ের বন্ধু।

কিন্তু রাজাবাবুর কাছে কথাটা পাড়ামাত্র তিনি যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'কে কোথায় সে? কবে আসবে? কাল? কখন আসবে বলে গেছে? খুব ভাল হয় আমার—ওর মতো একটি ছেলে পেলে।'

'কেন বলো দিকি?' সুরো একটু অবাক হয়ে যায়, 'তাকে তো চোখেও দ্যাখো নি। তাকে দিয়ে তোমার এমন কী উপকার হবে?'

'চোখে দেখি নি কে বললে? দেখেছি বৈকি!' প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন রাজাবাবু।

'তুমি আবার তাকে কখন দেখলে?' আরও অবাক হয় সুরবালা।

'অনেকবার। তোমার চোখে দেখেছি যে! তোমার মুখে তার অনেক কথাই শুনেছি, সেই তো দেখা হয়ে গেছে। তুমি তাকে স্নেহ করো, বিশ্বাস করো—ভদ্দরলোক জমিদারের ছেলে, সচ্চরিত্র পরোপকারী—আর কি চাই? নিজের এই চোখ দুটো দিয়ে দেখলেই কি বেশী দেখা হ'ত?

'ও, এই!' সুরবালা হেসে ফেলে, 'কখন আসবে তা জানি না। আজ তো এসেছিল দেড়টা নাগাদ।'

'কাল আমি এমনিতেও থাকতুম! ভালই হ'ল। এলেই আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও।'

কৌতূহল হয় সুরবালার, 'কী কাজ গা?'

'সে তোমার জেনে কি হবে? তুমি কি কাজ করবে?' হেসে ওর গাল টিপে দেন রাজাবাবু।

তখন কিছু বুঝতে পারে নি সুরবালা, কী কাজের প্রস্তাব করবেন। পরের দিন সকালেও ও প্রসঙ্গ আর ওঠে নি। একেবারে কিরণ আসতে ব্যাপারটা ভাঙলেন রাজাবাবু। বললেন, 'দ্যাখো, আপিসের কাজ তোমাকে দিয়ে তো লাভ নেই—যা শুনলুম দেশেই যেতে হবে তোমাকে একদিন। আর সত্যিই, নিজের অত বিষয়-সম্পত্তি থাকতে পরের দোরে চাকরিই বা করতে যাবে কেন? তার চেয়ে আমি বলি কি, তুমি এখানেই থাকো। সকালে আসবে—সারা দিন থাকবে, বাগান-টাগানে, মালীগুলো কি করে না করে দেখবে একটু সময়মতো, দিদিকে দেখাশুনো করবে, ওঁর কিছু দরকার হ'লে বাজার-হাট ক'রে দেবে—সন্ধ্যেবেলা তোমার থিয়েটারের সময় বুঝে তার আগে চলে যাবে। বাঁধাধরা কিছু নেই—রিহার্স্যাল-টাল থাকলে দুপুরে বা বিকেলে যখন দরকার চলে যেও, তাতে আটকাবে না। নিজের কোন দরকার থাকলেও যেতে পারবে। যখন যাবে দিদিকে বলে যেও, আমার মুখ চেয়েও থাকতে হবে না।...দুপুরবেলা এখানেই খেও, তাছাড়া পঁচিশ টাকা দোব তোমাকে—মাইনে হিসেবে নয়, ওটা হাতখরচ বলেই ধরে নিও। দ্যাখো, পোষাবে তোমার?'

প্রস্তাব শুনে সুরবালা যত অবাক, কিরণ তার চেয়েও বেশী। তবে দুজনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ দু রকমের। কিরণের মুখ দেখে মনে হ'ল—এ প্রস্তাব তার কাছে অভাবনীয় শুধু নয়—সুদূর কল্পনার অতীত কোন সৌভাগ্য। বোধহয় তাকে তখন অন্য কোন

একশ' টাকা মাইনের চাকরির কথা বললেও এতটা ভাগ্যবান মনে করত না নিজেকে। সে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তাই যেন খুঁজে পেল না—একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

রাজাবাবু অবশ্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। তার স্পষ্ট সম্মতিরও না। মুখ দেখেই উত্তরটা বুঝে নিলেন। বললেন, 'তাহলে ঐ কথাই থাকল। তুমি কাল থেকেই কাজে লেগে যাও। সকালবেলা—তোমার সময়মতো চলে এসো। একটা সময়ের মধ্যে যে আসতেই হবে—তার কোন মানে নেই, নটা-দশটা যখন হোক এলেই হবে!'

রাজাবাবু চলে যেতে সুরবালা কিরণকে বলল, 'এ কাজ নিয়ে তোমার লাভটা কি হ'ল? যেতে-আসতে গাড়ি ভাড়াতেই তো সব বেরিয়ে যাবে। পঁচিশ টাকার মধ্যে কুড়ি টাকা তো যাবেই। মিছিমিছি এই টানাপোড়েন, সারা দিনের দায়িত্ব নিতে গেলে কেন? কী বোকা তুমি!'

কিরণের মুখখানা অকস্মাৎ যেন টকটকে লাল হয়ে উঠল। আমতা-আমতা ক'রে বলল, 'বা, তা কেন? একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা, সারা দুপুর তো বসেই থাকি...এ তো তবু তোমার সঙ্গে গল্প করেও খানিকটা সময় কেটে যাবে। খাওয়ার খরচটাও বাঁচবে একবেলার—সেটাও ধরতে হবে বৈকি।'

'হ্যাঁ, তোমার ওখানে লোক আছে, দুবেলা রান্না হচ্ছে—তার খরচ আসছে বাবার কাছ থেকে—সেখানে একবেলা তুমি না খেলে ভারী সাশ্রয় হবে!'

'না—লাভ যেমন হবে না তেমনি লোকসানও তো কিছু হচ্ছে না। আমার থিয়েটারের কাজটা তো রইলই, কোন ক্ষেতি ক'রে তো আর এ কাজ নিচ্ছি না!'

রাত্রে রাজাবাবুর কাছেও বলে সুরবালা, 'এটা কি হ'ল? মিছিমিছি খানিকটা খরচ! ও এখানে কী কাজ করবে?'

'কিছুই না, তোমার সঙ্গে গল্প করবে, কাছে কাছে থাকবে—সে-ই তো বড় কাজ আমার কাছে।' হেসে জবাব দেন রাজাবাবু 'না, তুমি বুঝছ না, অনেকদিন ধরেই ভাবছিলুম—দুপুরবেলা একা-একা থাকো—এত বড় বাড়িতে, নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে। একজন কেউ থাকলে ভাল হয়। অথচ কাকে রাখব, যাকেই রাখব মাইনেকরা লোক—সে ঠিক তোমার সঙ্গে বন্ধুর মতো থাকতে পারবে না। মানে তেমন কোন লোক—ভদ্দরলোকের মেয়ে এত দূর নির্জন বাড়িতে আর একজনকে আগলাতে এসে থাকবেই বা কেন? এ ছেলেটাকে যেন ঠাকুরই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। তোমার চেনা, তোমার কাছে থাকলে খুশী থাকবে অথচ সঙ্কোচ করবে না—ঠিক যেমনটি চাইছিলুম!'

সুরো স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'তাই—? না, আমাকে পাহারা দেবার জন্যে রাখছ ওকে?'

হাসলেন রাজাবাবু, স্নিগ্ধ ক্ষমা-সুন্দর হাসি। বললেন, 'পাগলী! তাই যদি হবে, যদি সেই সন্দেহই করব তো ওকে রাখব কেন? যে ভক্ষক হ'তে পারে অনায়াসেই—তাকে রক্ষক ক'রে দেব? তোমাকে পাহারা দিতে হবে না—সে আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, শ্রীমতীর দান। তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না কোনদিন।'

সুরো বলে, 'ওকে দিয়ে যে ভয় নেই তা তুমি বেশ জানো, ছোট ভাইয়ের বন্ধু—'

আবারও হাসেন রাজাবাবু, 'ভাইয়ের বন্ধু, কিন্তু ভাই নয়। তবে তুমি এসব বুঝবে না, আশীর্বাদ করি বুঝতেও না হয়। সংসারের এসব নোংরা পাঠ না তোমাকে নিতে হয় জীবনে—'

যত দিন যায় কিরণের চাকরি করার ব্যাপার দেখে অবাক লাগে সুরবালার। সে

যেখানে থাকে সেখান থেকে প্রতিদিন এসে পৌঁছতেই প্রায় ছ-সাত আনা গাড়িভাড়া লাগে। ওদিকে ট্রাম গাড়িতে আসে কিন্তু শ্যামবাজারের মোড় থেকে শেয়ারের গাড়ি ভরসা। তাও এইদিকটা এত নিরিবিলি, লোকজনের আনাগোনা এত কম যে একটু বে-টাইম হ'লে গাড়ি শেয়ারে আসতে চায় না। তখন পুরো গাড়ি নিয়ে আসতে হয়। এমন যে হয় মধ্যে মধ্যে তা ওর কথাতেই ধরা পড়ে যায়। সে ভাড়াও খুব কম নয়—বারো আনা চোদ্দ আনা—কোন কোন দিন এক টাকাও লাগে।

কিন্তু শুধু গাড়িভাড়ার প্রশ্ন হ'লেও অত কথা ছিল না। প্রতিদিনই আসে কিছু-না-কিছু জিনিস নিয়ে, কোনদিন ফুল, কোনদিন ফল বা আনাজ। কোন কোন দিন মাছও। সুরবালা যা যা ভালবাসে—এর আগে থেকেই জানত সে, এখনও কথায় কথায় বার ক'রে নেয় মধ্যে মধ্যে, অসতর্ক মুহূর্তে—দেখে দেখে সেই সব জিনিসই আনে। বাধা দিলে অনুরোধ করলে কাকুতি-মিনতি করে। বলে, 'সত্যিই বলছি তুমি রাগ ক'রো না—মোড়ে গাড়ি ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, ফিরিওলা নিয়ে যাচ্ছিল দেখে তোমার কথা মনে পড়ল তাই—। আর সত্যি কি সস্তা, তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না হয়ত—মোটে এক পয়সা নিয়েছে আনারসটা।'

'থাক, আর কতকগুলো মিথ্যে বলতে হবে না এই সক্কালবেলাই।'

'ঐ তো, তুমি আমার কথা একটাও বিশ্বাস করতে চাও না।'

কোনদিন বা বলে, 'এমনিই শখ হ'ল বাজারে ঢুকে পড়লুম। সামনেই দেখি ইলিশ মাছ। টাটকা গঙ্গার ইলিশ। তাই নিয়ে এলুম। তা বেশ তো বাপু, তোমার যদি এতই অপছন্দ হয়—তুমি আমাকে দাম দিয়ে দিও, তাহলেই তো হবে?'

ওর ভাব-ভঙ্গীতে হাসিই পায় সুরবালার, হেসে বলে, 'আসল দাম বললে দিতুম। তা তো তুমি বলবে না। মিছিমিছি, জাতও যাবে পেটও ভরবে না—ওতে লাভ কি!'

কোন কোন দিন ভয় দেখায়, 'এমন করলে আমি কিন্তু রাজাবাবুকে বলে ছাড়িয়ে দোব তোমাকে। এ বিনি পয়সার চাকরিতে আর দরকার নেই।...না, আমার বড় বিরক্ত লাগে সত্যি সত্যিই!'

তাও পারে না অবশ্য। হাতে-পায়ে ধরতে আসে কিরণ। খুব ভয় দেখালে হয়তো দু-একদিন চুপ ক'রে থাকে আবার যে-কে সেই!

শুধু কি উপহার আনা! সুরো কোন ফরমাশ করলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। ত্রিভুবন ঘুরে জিনিস যোগাড় ক'রে আনে হয়ত—গাড়িভাড়া নিতে চায় না। বলে ট্রামে ট্রামে ঘুরেছে. ট্রাম ভাড়ার প্রশ্ন তুললে বলে, একবারই পয়সা লেগেছে. ভিড়ের মধ্যে দুবার টিকিটই নিতে আসে নি কেউ।

ক্রমে ক্রমে এ সংসারের বাজার সরকারের পুরো ভার এসে পড়ে, সেই সঙ্গে বাগান-বাড়ির তদারকিও। আগে রাজাবাবুর ওখানকার যিনি সরকারমশাই, তিনিই লোক দিয়ে এখানকার বাজার-হাট উটনোর মাল সব পাঠিয়ে দিতেন, সেই লোকই জেনে যেত আর কি চাই, না চাই। কিন্তু সে ফর্দের মাল আসত পরের দিন, তাতে বেশ অসুবিধে হ'ত মধ্যে মধ্যে। এখানে পাড়ায় কোন বাজার নেই, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে—দোকান যা আছে তাও নামমাত্র, সে সব জায়গায় এ'দের রুচিমতো মাল পাওয়া সম্ভব নয়। এখন কিরণ আসাতে সে অসুবিধাটার প্রতিকার হ'ল খানিকটা। সেই সঙ্গে কখন যে একটু একটু ক'রে সরকার-মশাইয়ের সব দায়িত্বটাই কিরণের ওপর এসে পড়ল—তা কেউই তেমন লক্ষ্য করল না। এমন কি সুরোও না। জিনিস চাওয়া মাত্র পেলে সকলেই খুশী হয়, সেও হবে—এ আর আশ্চর্য কি! বাড়ি বাগানের তদারকিও এতদিন খোদ ম্যানেজারবাবুর হাতে ছিল, তিনি আসতেন কদাচিৎ, সপ্তাহে একদিন হয়ত। লোক মারফৎই কাজ চলত, তাও যে করত সে অবসর সময়েই করত কতকটা। এখন কিরণকে পেয়ে তাঁরাও

সে-দায় নামিয়ে দিলেন। ফলে যা আরামের চাকরি বলে মনে হয়েছিল, তা ক্রমশ সারা-দিনের কাজ হয়ে উঠল। এক-একদিন নাইবার-খাবার সময় থাকত না কিরণের, কোন কোন দিন হয়ত ভাত খেতে বেলা চারটে বেজে যেত। কিন্তু কিরণ একটি প্রতিবাদও করত না। কিম্বা বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নও তুলত না। বরং কাজের চাপ যত বাড়ে ততই যেন সে খুশী হয়ে ওঠে। এই বাড়ির কাজ এই সংসারের কাজ যেন তার তপস্যার মতো মনে হয়—এমনই নিষ্ঠার সঙ্গে করে সে।

সুরোও আগে যতটা বকাবকি করত, এখন আর ততটা করে না। একটু একটু করে হাল ছেড়েই দিয়েছে সে। ব্যাপারটা সয়েও গেছে কতকটা। এখন এই সেবাটা আর অস্বাভাবিক লাগে না, সঙ্কোচও বোধ হয় না তত। শুধু থিয়েটারের দিনগুলোয় সে সন্ধ্যের আগে তাড়া দিয়ে নিয়মিত পাঠিয়ে দেয়, কবে রিহার্স্যাল আছে জানলে, সেদিনও। খরচের কথাটাও তোলে মধ্যে মধ্যে। গাড়িভাড়ার হিসেব করতে বসে। বেগতিক দেখলে নানা প্রসঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে দেয় কিরণ, ট্রামভাড়ার কথা উঠলে হয়ত বলে বসে, 'জানো আমার বাবা কলকাতায় এলে কখনও ট্রামে চড়েন না। আমাদের ওপরও বারণ আছে। ট্রামে চড়ছি জানলে যাচ্ছেতাই করবেন। বলেই রেখেছেন, ঘোড়ার গাড়িতে চড়বি, দরকার হয়, বেশি খরচ হয়ে যায়—টাকা চেয়ে নিবি—কিন্তু খবরদার, ট্রামে চড়বি না।'

স্বভাবতই কৌতূহল বোধ করে সুরবালা, 'কেন? ট্রামে আবার কি হ'ল?'

'সে আর বলো না, উনি নাকি একবার কলকাতায় এসে ট্রামে চেপেছিলেন, আপিসের সময় সেটা, কেরানীতে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, ঘোড়াগুলো টানতে পারছিল না, চাবুক মারতে তারা মুখোমুখি আড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, হাজার মার খেয়েও নড়ল না এক-পা! বাবা ড্রাইভারের ঠিক পেছনে বসেছিলেন, সবই দেখেছেন। কিছুতে ওদের বাগ মানাতে না পেরে ড্রাইভারটা করল কি পকেট থেকে কী জীন মদ আছে তাই বার ক'রে কন্-ডাক্টারকে কি বললে, সে নেমে এসে দু'হাতে ঘোড়াগুলোর মুখ হাঁ করিয়ে ধরল, ড্রাইভারটা বোতল থেকে খানিকটা ক'রে সেই মদ ঢেলে দিল ওদের গলায়। তার দু-পাঁচ মিনিট পরেই—নেশাটা জমে উঠতে আবার বোধহয় একটু গায়ের জোর ফিরে পেল, গাড়ি টানতে শুরু ক'রে দিল ঘোড়াগুলো। বাবা জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলেন—এ ওদের হামেশাই করতে হয়—কোম্পানী থেকেই এই মদ দিয়ে দেয় ওদের কাছে। সে-ই তাঁর কেমন ঘেন্না হয়ে গেল, বললেন, নিরীহ পশুগুলোকে ধরে এই অত্যাচার যারা করে—তাদের গাড়িতে পয়সা দিয়ে চড়ব না।...টানতে পারছে না বেচারীরা—তাদের মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে সেই ভার টানানো মানে তো তাদের পরমায়ু ক্ষইয়ে দেওয়া।...বাতিক আর কি!'

কথার পৃষ্ঠে কথা ওঠে। সুরবালা বলে, 'ঐরকম হয়ে যায় এক-একজনের—চিরকালের মতো অচ্ছেন্দা কি ভয় হয়ে যায়। মাসী—মানে আমার মতিমাসীর কথা বলছি—মাসী একবার নাকি অনেকদিন আগে ছেলেবেলাতে রেলগাড়ি চেপেছিল। গাড়িতে আলো নেই, কলঘর নেই, বসবার বেঞ্চগুলোও সরু সরু, কোমরে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। সেই যে নাক-কান মলেছিল—আর কিছুতেই চাপতে চায় না। এখন নাকি গাড়িতে আলো-টালো শুধু নয়, সব-কিছুই হয়েছে—কিন্তু মাসী সে-কথা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব আমি বুঝে নিয়েছি, রেলগাড়ি তো নয়—মানুষ-মারা কল"।*

---

* ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম এদেশে রেলপথ খোলা হয়, কিন্তু ১৮৬৮ সালের আগে ট্রেনের কোন কামরাতেই আলো জ্বালা হ'ত না। ১৮৯১ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথম পাইখানার ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে নাকি চতুর্থ শ্রেণীও ছিল একটা—এখনকার লাগেজ-

এইভাবেই আসল সেই গাড়িভাড়ার প্রশ্নটা চাপা পড়ে যায়—প্রশ্নকর্ত্রীর নিজেরও মনে থাকে না।

তবু কিরণের চাকরি যে এতখানি জমে উঠেছিল, তা ওরা কেউই অত বুঝতে পারে নি, কিরণ তো নয়ই। বুঝিয়ে দিলেন একদিন ওর বাবা রামকমলবাবু এসে পড়ে।

রামকমলবাবু প্রথম এসে নিজেদের বাড়িই গিয়েছিলেন, সেখানে চাকরের মুখে যে-খবর শোনেন, তাতে খুব আশ্বস্ত হ'তে পারেন নি, দুশ্চিন্তা বেড়েই গিয়েছিল। দাদাবাবু কোথায় থাকে, কি করে, তা সে জানে না, তবে ভোরে উঠে কোনমতে মুখে চোখে জল দিয়েই বেরিয়ে যায়—ফেরে কোনদিন রাত দশটায়, কোনদিন এগারোটায়—থ্যাটার থাকলে রাত দুটো তিনটে বেজে যায়। দিনে ফেরেও না, খায়ও না। রাতেও সবদিন খায় না। খাবার যেমন ঢাকা দেওয়া তেমনি পড়ে থাকে। কোথায় নাকি কি চাকরি নিয়েছে, সেইখানেই নাকি খায়। কি খায় তা কে জানে—শরীর তো দিন দিন কালি হয়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরে বাবু বোধহয় তাকে চিনতেও পারবেন না দেখলে।

এ খবর শোনার পর আর—ছেলে কখন গভীর রাত্রে ফিরবে সেজন্যে—অপেক্ষা করতে পারেন নি রামকমলবাবু, ছুটে গিয়েছিলেন থিয়েটারে। দৈবক্রমে সেখানে নানুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, পরিচয় পেয়ে নানুই তার নতুন চাকরির জায়গাটা বলে দেয়—ঠিকানাটাও জানিয়ে দেয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এও বলে যে, রামকমলবাবুর খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই, মেয়েছেলের কাছেই থাকে বটে, সেখানেই সারাদিন কাটায় এও ঠিক, চাকরিতে লাভও বিশেষ কিছু নেই—তবু এসব ক্ষেত্রে যা মনে করা চলত, যা মনে করে মানুষ সাধারণত—সে ভয় যেন উনি না করেন। কারণ, সে-মেয়েকে ভাল ক'রেই জানে নানু, তার দ্বারা ও-ধরনের কোন অনিষ্ট হবে না কিরণের।

কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেও পুরোপুরি আশ্বস্ত হ'তে পারেন নি রামকমলবাবু। হাজার হোক নানুও থিয়েটারের লোক, যোগসাজস কিছু থাকা বিচিত্র নয়। চোর-ডাকাতরাও নিজের দলের লোকের নামে চুকলি খায় না সহজে!...সাতপাঁচ ভেবে তিনি সেই কোরামূর্তিই একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে এসে হাজির হলেন একেবারে রাজাবাবুর বাগানে।

কিরণ তখন ওখানে ছিল না, কি একটা কাজে বড়বাজার গিয়েছিল—এদেরই কী একটা কাজে। গাড়ির শব্দ পেয়ে সুরবালা ভাবল, সে-ই ফিরেছে গাড়ি ক'রে। তাই প্রথমটা কোন ঔৎসুক্য বোধ করে নি। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি বড়বাজার থেকে ফেরার কথা নয়—যাতায়াতে অন্তত ঘণ্টা-দুই, আর একঘণ্টার মতো কাজ—মোট তিনঘণ্টা সময় লাগা উচিত। গেছে তো মোটে একঘণ্টা আগে। তবু হয়ত কোন কারণে যাওয়া হয় নি, শ্যামবাজারের মোড় থেকে ফিরে এসেছে—এই ভেবেই নিশ্চিত ছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের সীমা রইল না—যখন দারোয়ান এসে খবর দিল, কে একটি বাবু এসেছেন, কিরণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান। বলছেন তিনি কিরণবাবুর বাবা, দাদা-বাবু কখন ফিরবেন জানতে চাইছেন।

কিরণবাবুর বাবা! সেকি?

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল সুরবালার সংবাদটার পূর্ণ মর্ম বুঝতে। তারপর ছুটে এসে জানলায় দাঁড়াল। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে একটু অসহিষ্ণুভাবেই পায়চারি

ভ্যানের মতো। ১৮৬২ সালে কিছু কিছু দোতলা কামরাও চালু করা হয়, তবে সে বেশীদিন চলে নি।

করছেন। মধ্যবয়সী, বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। হঠাৎ দেখলে একটা আদলও টের পাওয়া যায় কিরণের সঙ্গে। সে দারোয়ানটাকে বলল, 'ওপরে এনে বৈঠকখানা ঘরে বসাও। আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে।...'

রামকমলবাবু দু-একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে অতি সহজেই ওপরে এসে বসলেন। তিনি জানতেই এসেছেন, জানতে দেখতে—পুত্রের অধঃপতনের পরিমাণ। দেখলেনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের চারি দিক, আসবাবপত্র। ধনী জমিদার বা ব্যবসায়ীর বাগানবাড়িতে নাচঘর যেমন হয়—ঠিক তার সঙ্গে না মিললেও, বাগানবাড়ির বৈঠকখানা যে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-বাড়িতে যে স্ত্রীলোক বারোমাস বাস করে, তার পরিচয় সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকা উচিত নয়।

কতকটা সেই কারণেই, সুরো এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে রামকমলবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, বোধ করি নবাগতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে পূর্বের হিসেবটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। দুই আর দুইয়ে চারের মতো সে-হিসেব মিলেও গেল। মনে হ'ল ছেলের এখানে এমনভাবে পড়ে থাকার অর্থটাও খুঁজে পেয়েছেন। ফলে তাঁর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে মুখ কালো হয়ে উঠল।

সুরো অতটা ঠিক বুঝতে পারে নি। প্রথমে সে বিনতভাবেই নিজের পরিচয় দিল, 'আমি গণেশের দিদি।'

'গণেশের—? অ, তুমিই সেই কেত্তনউলী?'

সুরো চমকে উঠল, ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল এবার রামকমলবাবুর মুখের দিকে। তাঁর অন্তরের বিষ আর উষ্মা অপ্রকাশ নেই—এতক্ষণ ঠাওর ক'রে দেখে নি বলেই, দেখতে পায় নি। কিন্তু সে নিজে বিচলিত হ'ল না, বেশ ধীর বিনম্রভাবেই বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিরণ কোথায়?' বিরসকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রামকমলবাবু।

'সে বোধহয় বড়বাজারে গেছে একবার।'

'কখন ফিরবে?'

'দেরি হবে। এই সবে ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।'

'হুঁ। তা সে এখানে কি চাকরি করে? বাজার-সরকারী?'

রামকমলের কণ্ঠে তিক্ততা চাপা থাকে না। রাখার চেষ্টাও করেন না বোধ করি।

'চাকরি কেন বলছেন, মেসোমশাই, চাকরির তার দরকারই বা কি? আমি একা থাকি বলে একটু দেখাশুনো করে। তাও আমি বারণ করেছি কতবার, কিরণ বলে, সময় কাটে না। সারা দুপুর তো বসেই থাকতে হয়—তাই।'

'তাই!' ভেংচি কেটে ওঠার মতো শব্দ করেন রামকমলবাবু, 'ওখানে আমার বিষয়-সম্পত্তি সব নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে—উনি এখানে সময় কাটে না বলে মেয়েমানুষের বাড়ি বাজারসরকারি করছেন। করাচ্ছি আমি—আসুক একবার!'

বার বার এক ধরনের খোঁচায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটবারই কথা। তবু সুরো নিজেকে সামলেই রাখল। শুধু উত্তর দেবার সময় প্রয়োজন বুঝেই কণ্ঠস্বরের পূর্ব-বিনম্রতা পরিহার করল। বেশ একটু জোর দিয়েই বলল, 'দোষ তো আপনারই মেসোমশাই। এত যদি বিষয়-সম্পত্তি দেখার দরকার ছিল তো আপনি ছেলেকে এই শহরে একা—একটা বাড়ি আর চাকর ব্যবস্থা ক'রে টাকা-পয়সা দিয়ে ফেলে রেখেছেন কেন? থিয়েটার করে সে—করতে চায়, জেনেই তো পাঠিয়েছেন। সেখানে কাদের সংসর্গ করে তা জানেন না? তারা কি সব খড়দার মা-গোসাঁই?...অল্প বয়স সুন্দর চেহারা, হাতে পয়সা আছে—এমন ছেলেকে কলকাতা শহরে একা রাখা মানেই তো একমাত্র ছেলেকে ডাইনীর হাতে সঁপে দেওয়া!'

ঠিক এ-ধরনের কথা আশা করেন নি রামকমলবাবু। যাকে এতক্ষণ অপরাধিনীর স্তরে রেখে বিচার করছিলেন, সে যে এমন ক'রে তাঁকেই অভিযুক্ত করবে—তা ভাবেন নি। তিনি

বিস্মিত হয়ে আর একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন। সুরবালার ভাবে-ভঙ্গীতে কোথাও অপরাধিনীর ছাপ নেই। মেয়েমানুষ বা কেত্তনউলী বলে উনি যে-ধরনের স্ত্রীলোক বোঝাতে চেয়েছেন এতক্ষণ—সে-ধরনের লাস্যময়ী নষ্ট মেয়েমানুষের চিহ্নমাত্র পেলেন না এর মধ্যে। এবার তাঁর সুর কিছুটা নরম হয়ে এল অগত্যাই। বললেন, 'হ্যাঁ—তা অবশ্য বটে। দোষ আমারই। ভেবেছিলুম দিনকতক একটু আমোদফুর্তি ক'রে নিক, এরপর তো সেই জোয়ালে কাঁধ দেওয়া চিরদিনের মতো—'

'সেও সেই কথাই বলে। আমি যথেষ্ট বকেছি ওকে, বার বার বলেছি দেশে ফিরে যাবার কথা, সে বলে, বাবা সময় দিয়েছেন এক বছর, তারপর তো ফিরতেই হবে, এখন থেকে আর আগ-বাড়িয়ে জোয়াল কাঁধে নিই কেন?...আপনি একটা সোমথ ছেলেকে আমোদফুর্তি করবার জন্যে শহরে রেখেছেন—তবে আবার অত ব্যস্ত হয়ে উঠছেন কেন? এই ধরনের জমিদারের ছেলেদের আমোদফুর্তি করা বলতে এখানে আমরা সকলেই বুঝি মদ আর মেয়েমানুষ।...আপনিই কি তা জানেন না—না শোনেন নি কখনও? নেহাৎ আপনার ভাগ্য ভাল যে, ছেলে এখনও সেদিকে টলে নি। আপনি এখানে যে সম্পক্কটা মনে ভাবছেন—সে সম্পক্ক নেই বলেই, আর এখানেই সারাদিন আটকে থাকে বলেই বেঁচে গেছেন। আমার শাসনে চোখে চোখে আছে বলে রক্ষে—নইলে ও-ছেলে আর কোনদিনই ফিরিয়ে নিতে পারতেন না।'

এবার রামকমলবাবুর গলার আওয়াজ আরও নরম হয়ে আসে। তাঁর আরক্ত মুখে স্বেদবিন্দু জমে ওঠে দেখতে দেখতে ; সেটা অপমানে, না অপরাধবোধে, না উদ্বেগে তা কে জানে! তিনি বেশ একটু বিনতভাবেই বলেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে মা, তোমার সঙ্গে ওভাবে কথাটা বলা। তোমার গল্প অনেক শুনেছি খোকার মুখে। তা নয়।—গত দু' মাসে একখানি চিঠিরও জবাব পাই নি, তার ওপর ঐ চাকর ব্যাটার বাঁকা কথাতেই আরও—কেমন যেন রক্তটা চড়ে গিছল মাথায়।...হ্যাঁ, ওকে এভাবে ছেড়ে দেওয়াটা খুবই ভুল হয়েছে। পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে যায় বলে লোকে—তাই হয়ে পড়েছিলুম আর কি। আরও ওর গর্ভধারিণীর জন্যেই—ছেলে যত না বলে তিনি ওর হয়ে আরও বেশী বলেন। বিশেষ বিয়ে-থা হয়ে গেছে—এখন আর ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি।'

'বিয়ে-থা হয়ে গেছে! কিরণ বিয়ে করেছে? সেকি! কৈ বলে নি তো—'

এবার সুরবালারই বিস্মিত হবার পালা। এতদিন এত গল্প করেছে, একবারও বলে নি তো, কেমন চেপে রেখেছে দ্যাখো কথাটা! কিন্তু এত লুকোছাপার মানেই বা কি?

রামকমলবাবুও কম অবাক হন না।

'বিয়ের কথা বলে নি? সেকি! বোধহয় লজ্জাতেই বলে নি। বিয়ে করতে তো খুবই আপত্তি ছিল। বিষম লজ্জা ওর। কলকাতার কোন বন্ধু-বান্ধবকে জানাতে দেয় নি।... সেই জন্যেই তো ছুটে আসা। ছোট মেয়ে তো—বিয়ের পর এতকাল বাপের বাড়িতেই ছিল। বেয়াই হঠাৎ চিঠি দিয়েছেন পুনর্বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, জামাইকে চাই। এদিকেও নাকি সামনের মাসের ছ'তারিখের পর দ্বিরাগমনের দিন নেই—সামনে প্রায় চারমাস অকাল। তার মানে একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি।...চিঠি লিখব, ও তার জবাব দেবে, হয়ত কোন কাটান-মন্তর ঝাড়বে, আবার আমি লিখব কি লোক পাঠাব—সে বিস্তর দেরি হয়ে যাবে বলেই নিজে চলে এলুম।'

'তাহলে একেবারে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে চলে যান, এখানে আর ফেলে রাখবেন না এক-দিনও।' সুরবালা দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

'এখানে ওর থিয়েটারে দু'-একদিন সময় দেওয়া দরকার না? ও যে পার্টটা করে—সেটার জন্যে নতুন লোক গড়ে না নেওয়া পর্যন্ত—'

'ও যে পার্ট করে—তাতে অন্য যে-কোন লোকই নামাতে পারবে ওরা। তার জন্যে

ওদের বইয়ের কোন ক্ষতি হবে না। বলে রাজা বিনে রাজ্য আটকায় না—এ তো তুচ্ছ একটা র‍্যাকটিং-এর ব্যাপার। এমন কিছু বড় র‍্যাকটার নয় আপনার ছেলে। পার্টও কিছু বড় গোছের নয়। তাছাড়া ঈশ্বর না করুন, ওর যদি একটা অসুখই হয়ে পড়ে—ওদের বই কি বন্ধ হয়ে যাবে? না না, ওসব কোন কথা শুনবেন না আপনি। এসেছেন যখন—এমনি আপনার দু-একদিন কোন কাজ থাকে সে আলাদা কথা—নইলে আমি তো বলি আজই নিয়ে চলে যান।'

এরপর আর রামকমলবাবুর বিদ্বেষ থাকা সম্ভব নয়, রইলও না। তিনি খুবই কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত বোধ করতে লাগলেন তাঁর পূর্ববিদ্বেষের জন্যে। নানা রকমে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি—যতদূর সম্ভব আগেকার আঘাতটার বেদনা দূর করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।...থিয়েটারের সেই লোকটা ঠিকই বলেছিল, এ মেয়ে একে-বারেই স্বতন্ত্র ধরনের, এর জাত আলাদা।

আর তার ফলেই, ব্রাহ্মণ রান্না করে শুনে তিনি এখানে স্নানাহার করতেও রাজী হয়ে গেলেন। কিরণ যখন ফিরল, তখন রামকমলবাবু খাওয়া-দাওয়া সেরে মেরজাই গায়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে বেশ জমিয়ে গল্প করছেন সুরবালার সঙ্গে, বহুদিনের পরিচিতের মতো. সুরবালা বসে পাখার বাতাস করছে।

কিরণের মুখ শুকিয়ে গেল—বলা বাহুল্য। এভাবে সকলের কাছে ধরা পড়ে যাবে একসঙ্গে—বাবার কাছে এই চাকরির কথা এবং সুরবালার কাছে বিয়ের কথাটা একই সঙ্গে ফাঁস হয়ে যাবে তা ভাবে নি।

তবু যাওয়ার ব্যাপারে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল কিন্তু সুরবালার নির্দেশেই রাম-কমলবাবু সে-সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে পরের দিন ভোরবেলাই ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। সুরবালা নিজেই থিয়েটারে জানিয়ে দেবার ভার নিয়েছিল নানুর মারফৎ। সে-কারণেও দেরি করার আর কোন অজুহাত রইল না।...

যতক্ষণ কিরণ যায় নি, ততক্ষণ তার মঙ্গলের দিকটা চিন্তা ক'রেই সুরো প্রাণপণে কঠিন হয়ে ছিল। এমন কি কিরণকে সে বেশ রূঢ়ভাবেই তিরস্কার করেছে, করতে বাধ্য হয়েছে—কিন্তু কিরণ চলে যেতে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই ক'মাসে বড় বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল সে—আত্মীয়ের অধিক অন্তরঙ্গ। এখন আবার ও একা পড়ল, বরং আরও বেশী একা মনে হ'তে লাগল। বেশী ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল সারা-দিনের নির্জন জীবনযাত্রাটা। সাহচর্যের প্রশ্ন ছাড়াও ইদানীং অনেক কাজও সে করত। সে-সেবাটা যেন একরকম অভ্যাসেই পরিণত হয়ে গেছে এতদিনে। হয়ত মাইনে-করা লোক দিয়েও তা হতে পারবে এর পর কিন্তু সে ঠিক এমনভাবে করবে না, কিরণ যেভাবে করত। নিজের কাজ বলে আর কেউ ভাববে না—কিরণের মতো।...

কিরণ চলে যাওয়ার পর যেন একটু একটু ক'রে বুঝতে লাগল সুরবালা যে, চাকরির কথাটা, সময় কাটানোর কথাটা কিরণের ওজর মাত্র। আসলে সুরবালার সান্নিধ্যেই তার লোভ. সুরবালার সেবাটাই তার লক্ষ্য ছিল।

আর কিছুদিন পরে—এই সংশয় ও ধারণাটা প্রত্যয়ে দাঁড়াতে মনে মনে সে ঠাকুরকে ধন্যবাদই দিল। আরও বেশী ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই কিরণকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন বলে। নিজের জন্যে তার কোন চিন্তা ছিল না, এখনও নেই—কিরণেরই ক্ষতি হ'ত বেশী। হয়ত তার সুখশান্তি নষ্ট হ'ত, ভবিষ্যৎ হ'ত বিড়ম্বিত, বিঘ্নিত। বড় সরল, বড় ভাল ছেলেটা। সে তার নিজস্ব জীবনে বাপ-মা-স্ত্রী এবং আসন্ন পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে থাক, শান্তিতে থাক—সুরবালার জন্যে না তাকে কোনদিন কোন অশান্তি ভোগ করতে হয়, তার না কোন অনিষ্ট হয়।

মানুষ যখন কোন জিনিস একাগ্রভাবে কামনা করে তখন—বিশেষ যদি তা মূল্যবান, আয়ত্তের বাইরের কোন জিনিস হয়—ভেবে রাখে যে কোন দিন তা হাতে এলে সে নিজেই একান্তে একা সে জিনিসটা ভোগ করবে, কাউকে তার কণামাত্রও ভাগ দেবে না। কিন্তু দুর্লভ বস্তু পাওয়ার একটা গৌরব আছে, অহঙ্কার আছে—অহঙ্কারের নেশাও বড় কম উগ্র নয়—সেই অহমিকাই শেষ পর্যন্ত তাকে নিভৃতে গোপনে সে বস্তু উপভোগ করতে দেয় না, প্রাপ্তির গৌরবটা জনসমাজে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থির ক'রে তোলে।

রাজাবাবুও—যখন সুরবালার প্রেম তাঁর কাছে কল্পনারও অতীত বস্তু ছিল, কামনা করেছেন কিন্তু আশা করতে সাহস করেন নি, তখন—মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন যে, দেবদুর্লভ এই কন্যা যদি সত্যিই কোন দিন তাঁর করায়ত্ত হয় তো—একান্ত নিভৃতে তার প্রেমাস্বাদন করবেন, শুধু তিনি আর সে, কারও স্থূল লালসা বা উপস্থিতিকে তাঁদের ধারে কাছে আসতে দেবেন না। সেই কারণেই আরও—মনে মনে তাঁর দোয়ার বাজনদারের দল জুটিয়ে রাখায় খুব আপত্তি ছিল। সুরবালা রাখতে চাইলে হয়ত বাধা দিতেন না—তবে অস্বস্তি বোধ করতেন এটা ঠিক। ওরা থাকলে বাইরে যাবার, গাইতে যাবার পথ খোলা থাকবে, আর তা হ'লেই বহুলোকের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়বার সম্ভাবনাও বজায় থাকবে।...কে জানে, তেমন কোন দৃষ্টি এর দৃষ্টিতে কোনদিন প্রশ্রয় পাবে কি না—

কিন্তু এখন—এই বহু-ঈপ্সিতা নারী সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর—তাঁর করায়ত্ত ও বশীভূত হওয়ার পর—কেবলই মনে হ'তে লাগল যে, তাঁর এই সৌভাগ্যের কথা যদি কেউ জানতেই না পারল, ঈর্ষিতই না হ'ল তো—কি লাভ হ'ল তাঁর? পরের ঈর্ষাতেই নিজের বিজয়-গৌরব সার্থক হয়।

অর্থাৎ সুরবালাকে এবার একটু আধটু বাইরে নিয়ে যেতে চান তিনি। বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশে-মাইফেলে, গার্ডেন পার্টিতে—দেখাতে চান এই অল্পবয়সী সুন্দরী সুগায়িকা মেয়েটি তার নাম যশ-খ্যাতি-ভবিষ্যৎ—অধিকতর বিত্তবান লোকের আশা ছেড়ে কী উন্মত্তভাবেই না তাঁকে ভালবেসেছে? তাদের ঈর্ষার আলোতে নিজের এই সৌভাগ্য-গৌরবটা ভাল ক'রে দেখে নিতে চান নিজেও—যাচাই ক'রে দেখতে চান।

কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ হবে না—তাও তিনি জানেন। সুরবালার কাছে কথাটা পাড়া যাবে না। সে যতটা সরল ততটা অনভিজ্ঞ নয়। এই যাওয়ার কি অর্থ সে জানে। কারও 'মেয়েমানুষ' বা রক্ষিতা উপপত্নী হয়ে কোথাও যেতে চাইবে না সে সহজে। এই-খানে তার অভিমানবোধ অত্যন্ত প্রবল। এমনিতেই সে যখন তখন বলে, 'তুমি কি কম সেয়ানা, আমার সব কুল সব দিক ঘুচিয়ে দিয়েছ, তুমি ছাড়া আমার গতি রাখো নি। কীর্তনউলীই হই আর যা-ই হই—এতকাল নিজের মনে জানতুম তো আমি পরিষ্কার আছি। মেয়েছেলের যা আসল জিনিস সেটা ঘোচে নি, যে কোন জায়গায় গিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারতুম। সেই উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেছে। আমিই করেছি অবশ্য—তোমাকে দোষ দিতে চাই না—তবে লোকালয়ে কোথাও যাওয়া-আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে।'

'কেন?' হয়ত শুধোন রাজাবাবু।

'কেন আর কি! কোথায় কার বাড়ি যাবো বলো?...রাজাবাবুর মেয়েমানুষ—বাঁধা রাঁড়, এই তো পরিচয় এখন আমার। সে পরিচয়ে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?'

হালকাভাবেই বলে অবশ্য, কণ্ঠে কোন অনুযোগ কি আক্ষেপ বিশেষ প্রকাশ পায় না। তবু এটা যে তার গভীর ব্যথার স্থান একটা, গভীর ক্ষত—তা বুঝতে পারেন রাজা-

বাবু। প্রসঙ্গ উঠলে তখনকার মতো এটা-ওটা নানা কথায় ভুলিয়ে দেন। চাপা দিয়ে দেন কথাটা।

তবে হালও ছাড়েন না একেবারে। কোন বিষয়েই হাল ছাড়ার অভ্যাস নেই তাঁর, নইলে কারবার ক'রে এত পয়সা করতে পারতেন না। ধৈর্য ধরে লেগে থাকাই যে সাফল্যের মূল কথা, এটা তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন। এক্ষেত্রেও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই—শুধু একটু সন্তর্পণে ধৈর্য ধরে অগ্রসর হ'তে হবে মাত্র।

সেইভাবেই অগ্রসর হ'তে লাগলেনও।

কখনও কখনও—নিতান্তই সাধারণভাবে হয়ত, কথাপ্রসঙ্গেই কথাটা তোলেন, 'আমার অমুক বন্ধু, বড় ব্যারিস্টার—একবার দাঁড়ালে সাতশ' গিনি ফী—সে তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল একেবারে!'

কিম্বা বলেন, 'অমুক মহারাজকুমার—ঐ যে গো, খুব নামডাক, পোলো খেলার সায়েবরা পর্যন্ত পেরে ওঠে না—বড্ডই পেড়াপীড়ি করছে তার পার্টিতে একদিন নিয়ে যাবার জন্যে'—পরক্ষণেই হয়ত সুরবালার কঠিন ভ্রূভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে সামলে নেন আবার, 'আমি অবিশ্যি বলেই দিয়েছি—সে সুবিধে হবে না, বাগানবাড়িতে কি মাইফেলে নিয়ে যাবার মানুষ সে নয়।'

অনেক সময় তাতেও সুরবালার মুখ প্রসন্ন হয় না, শুধোয়, 'তা তারা সব আমার কথা জানল কি ক'রে? তুমিই নিশ্চয় গল্প করো বসে বসে—' কণ্ঠে তার অনুযোগ ও তিরস্কারের সুর চাপা থাকে না।

'পাগল!' আকাশ থেকে পড়েন রাজাবাবু, 'তোমার মতো একটা গাইয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল বাজার থেকে—এ কি একটা চাপাপড়ার মতো কথা? এ নিয়ে হৈচৈ হয় নি—না আলোচনা হয় নি! তাছাড়া আমাদের বন্ধুবান্ধব সমাজে সকলেই সকলকার হাঁড়ির খবর রাখে। বলি চাকর-বাকর তো আছে প্রত্যেকেরই।'

শেষে এই ধৈর্য ধরা আর লেগে থাকারই সুফল ফলে। একটু একটু ক'রে নরম হয় সুরবালা। কে জানে, তারও এই নিঃসঙ্গ জীবন, এই অরণ্যের মধ্যে নির্জনবাস—ক্রমশ কারাবাসের মতোই তার মনে তার চিন্তায় ভারী হয়ে চেপে বসছিল কি না! তাকে বললে সে হয়ত স্বীকার করত না, করতে পারত না—কিন্তু ইদানীং যেন কোনমতে যে-কোন উপলক্ষে একটু বাইরে বেরোবার জন্যে, দুটো বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তার সমস্ত অন্তরাত্মা ছট্‌ফট করছিল। রাজাবাবুকে পেয়ে সে জগৎ ভুলেছে সত্য কথা—কিন্তু যখন তাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির কালগুলোয়, সেই জগৎই তার সমস্ত রূপ রস গন্ধ বর্ণ, তার সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত কুশ্রীতা, তার অপরিমেয় মহত্ত্ব ও অপরিসীম নীচতা নিয়ে ওর মনের দুয়ারে ঘা দেয়, অহরহ বাইরের দিকে টানে। সেই আকর্ষণেই কঠিন অভিমানবোধ আর জন্মগত ভদ্র সংস্কার, তার সহজাত আত্মসম্মান জ্ঞান দুর্বল হয়ে আসে একটু একটু ক'রে। মনের মধ্যে তার শিক্ষা ও পরিবেশগত যে প্রাচীরটা অলঙ্ঘ্য বলে বোধ হ'ত—তার উচ্চতাও ক্রমে কমতে থাকে। অবশ্য খুবই ধীরে ধীরে চলে পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া—এত ধীরে যে সুরবালা নিজেও তা টের পায় না।

কিন্তু সে না পেলেও আর একজন পায়। রাজাবাবুর অভিজ্ঞ দৃষ্টি এই পরিবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে। হিমকঠিন তুষারশিলা কেমনভাবে অল্পে অল্পে উষ্ণ ও আর্দ্র হয়ে ওঠে—সে ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশও তাঁর অজ্ঞাত থাকে না।

তবু, তখনই কোন তাড়াহুড়ো করেন না তিনি। আরও অপেক্ষা করেন কিছুদিন। তিনি বিষয়ী লোক, তিনি জানেন যে মামলায় জিতলেও সব সময়ে তখনই ডিক্রিজারী করতে নেই। বিশেষ দাম্পত্য মামলায় সর্বদা এই নীতিই আচরণীয়। তাই প্রথমেই ওকে

বাইরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব না তুলে বাইরের লোকই এক-আধজন ওখানে আসতে শুরু করলেন। তাও কোনদিন যেন দৈবাৎ এসে পড়েছে এইভাবে। এ'দের সামনে বেরনোতেও যে সুরোর আপত্তি না ছিল এমন নয়। গৃহস্থ ভদ্রঘরের কোন মেয়ে বাইরের পরপুরুষের সামনে বেরোয় না—স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সামনেও না। খুব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আড়াল থেকে কথাবার্তা কয় হয়ত। সুরবালা অবশ্য অতটা আইন মেনে চলতে পারে নি, বৃত্তির খাতিরে অনবরতই বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে, কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন নেই। এখানে সোজাসুজি অপর পুরুষের সামনে বেরিয়ে কথা বলা মানেই—সে যে কুলনারী নয়, কুলটা—সেই কথাটা স্বীকার ক'রে নেওয়া। রাজাবাবু কি তাঁর এই সব বন্ধুদের নিয়ে নিজের অন্তঃপুরে হাজির হ'তে পারতেন, না স্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারতেন এদের সঙ্গে কথা বলতে?

প্রথম যেদিন রাজাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ব্যারিস্টার তারক দত্ত আসেন—সেদিন এই প্রশ্নটাই করেছিল সুরবালা। হেসে হেসেই করেছিল অবশ্য—তবু তার কণ্ঠস্বরে সূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপ এবং সূক্ষ্মতর বেদনার সুরটি একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকে নি।

রাজাবাবু অপ্রতিভ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'থাক তবে। আসল কথা কি জানো. ব্যারিস্টার মানুষ, বহুদিন বিলেতে ছিল, এখনও পুজোর ছুটি পড়লেই বিলেতে পালায় ফী বছর—ওদের অত জ্ঞানই নেই। আমাদের এই আব্রু আর পর্দা ওদের ঠাট্টার জিনিস। এ ওকে বোঝানো যাবে না। ওর খুব শখ তোমাকে দেখবে একবার। মানে—কি দেখে আমি এত মজেছি, কাজ-কারবার সব ভাসিয়ে দিতে বসেছি—সেইটেই দেখতে চায়। বলে. তিনি তো এতকাল পাঁচশ' হাজার লোকের সামনে বেরিয়ে গান গেয়ে এলেন—এখন এক-আধজনের সামনে বেরোতে এত আপত্তি কেন? আর একেবারে তো নেহাৎ সেকেলে পর্দানশীন ঘোমটা দেওয়া মুখ্খু মেয়েছেলে না—শুনেছি একটু-আধটু লেখা-পড়াও জানেন, তাঁর তো এ রকম কুসংস্কার থাকা উচিত নয়।...মরুক গে, আমি বলে দিই—শরীর খারাপ। মাথা ধরেছে—উঠতে পারছে না।'

'থাক! আর এই ভরসন্ধ্যেবেলায় একবুড়ি মিছে কথা বলতে হবে না তোমাকে। ...যাচ্ছি আমি। পয়সা খরচ ক'রে বাঁধা মেয়েমানুষ রেখেছ, এতবড় বাগানবাড়িতে এনে তুলেছ—ইয়ারবক্সী এনে ফুর্তি না করলে চলবে কেন। আমারই বোঝার ভুল!'

সুরবালার গলাটা এবার স্পষ্টই অভিমানে বিকৃত হয়ে ওঠে।

রাজাবাবু আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ওর হাত দুটো ধরে বলেন, 'না, না—থাক। মিছে কথা নয়—আসল কথাই ওকে বলছি। তুমি এই ধারণা করবে জানলে একথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতুম না—বিশ্বাস করো। গোবিন্দর নাম নিয়ে বলছি।...দেখাবার শখ আমারই বেশী—স্বীকার করছি। কিন্তু সে বাঁধা মেয়েমানুষকে নয়, শেষ জীবনে রাধা-রাণীর যে প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ লাভ করেছি, যে বর পেয়েছি—সেইটেই দেখাতে চেয়ে-ছিলুম সুরো, তুমি আমার সম্ভোগের জিনিস নয়—সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আমার জীবনে, মাথায় করে রাখার জিনিস।'

গলা কেঁপে যায় রাজাবাবুরও।

আর তাতেই নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে ওঠে সুরবালা। নিজের ইচ্ছা বলতে, নিজের চিন্তা বলতেও আর কিছু রাখবে না—সেই প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে যায়। কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা অবশ্য তখনই কাটানো যায় না সম্পূর্ণ। কিন্তু মুখে হাসি ফোটে। সে হেসে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'অমনি অভিমানে ঠোঁট ফুলে গেল বাবুর—খোকাছেলের মতো? আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি যাচ্ছি! তোমার অপমান হ'তে দেব না—এ তুমি বেশ জানো, আর সেই জোরেই তো বন্ধুকে নিয়ে এসেছ! তুমি যাও, আমি আসছি!'

ব্যারিস্টার তারক দত্ত যতই যা ভেবে এসে থাকুন, ঠিক এমনটি দেখবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাঁর চিন্তা বাঈজী, নর্তকী, ঢপউলী—এই পথ ধরেই চলেছিল ; সেই জিনিসই, বড় জোর একটু উন্নত সংস্করণের কিছু দেখবেন—এই ভেবে রেখে ছিলেন। একেবারে সম্ভ্রান্তঘরের গৃহস্থবধূর মতো ঈষৎ ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় জলখাবারের থালা হাতে যখন ঘরে এসে ঢুকল সুরবালা, তখন তার অলোকসামান্য রূপ, তার সলজ্জ মধুর হাসি—তার চলার অপূর্ব ভঙ্গীটি—সব জড়িয়ে নিমেষে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তারক দত্ত।

এবং এই অভাবনীয় আবির্ভাবে—আবির্ভাব বলেই মনে হ'ল তাঁর সেই মুহূর্তে—তিনি যেন বিষম বিচলিত হয়ে উঠলেন। একটা বিলাতী অভ্যাস তাঁর মজ্জাগত হয়ে গেছে—দিনরাত মদ্যপান করা। মাতাল হন কদাচিৎ—কোন পার্টি বা মাইফেলে যোগ দিলে মাত্রা বেড়ে যায় যখন—কিন্তু মদটা চলে সব সময়েই। সে বিলাতী সুরার গন্ধ ঢাকা যায় না, ঢাকার চেষ্টাও করেন না। তবে সেই বেপরোয়া ভাবটা থাকে বন্ধুমহলে কি মক্কেলদের মহলে। যতই সাহেব হোন, ভদ্র গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে যে মদ খেয়ে যাওয়া যায় না, যাওয়া উচিত নয়—এ জ্ঞান তাঁর আছে। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে—সুরবালার এই অপরূপ শ্রীমণ্ডিত আবির্ভাবে, সে যে তাঁর বন্ধু বা মক্কেলের রক্ষিতা—এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, তাঁর সঙ্কোচ ও লজ্জার অবধি রইল না। তাড়াতাড়ি বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একটা অভিবাদনের ভঙ্গী ক'রে বলে উঠলেন, 'আ—আপনি আবার এ সব কষ্ট করতে গেলেন কেন বৌঠাকরুন। আমি—আমি অনেক খেয়ে এসেছি এখনই—'

কথাটা বলতে বলতে—সুরবালা যেমন একটু একটু ক'রে তাঁর সামনেকার পাথরের টেবিলটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তারক দত্তও তেমনি একটু একটু ক'রে পিছিয়ে যেতে লাগলেন—উভয়ের মধ্যকার দূরত্বটা বজায় রাখার চেষ্টায়। সুরাপানের প্রমাণটা কি ভাবে এই মালিন্যস্পর্শহীন মেয়েটির কাছে গোপন রাখা যায়—সেইটেই তখন তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। আর অত বড় তীক্ষ্ণধী ব্যবহারজীবীও সেই মুহূর্তে মনের কাছে বার বার মাথা খুঁড়েও সরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবতে পারলেন না।

তাঁর এই কুণ্ঠা ও বিব্রতভাব দেখে রাজাবাবুর খুশির সীমা রইল না। খুশী হ'ল সুরবালাও। সব চেয়ে 'বৌঠাকরুন' এই ডাকটির জন্যে তারক দত্তের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল। ফলে বিনা প্রয়াসে বা পরিকল্পনাতেই রাজাবাবুর এদিক দিয়ে খানিকটা সুবিধা হয়ে গেল। মুগ্ধ তারকবাবু অনভ্যাস সত্ত্বেও অসময়ে সুরবালার আনা খাবার কতকগুলো খেয়ে নিলেন—সুরাবালাকে খুশী করতে ও নিজে খানিকটা সহজ হ'তে। কিছু গল্পও হ'ল—সাধারণ প্রসঙ্গ ধরে সাধারণ কথাবার্তা। তাতে আরও বিস্মিত হলেন তারকবাবু। 'বাজারের মেয়েছেলে' বলতে যাদের বোঝায় এমন অনেককে দেখেছেন—আবার সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহস্থ কন্যা সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, এই কলকাতাতেই তাঁর বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনও কম নেই এখানে—আর তার বেশির ভাগই অবস্থাপন্ন ও অভিজাত—কিন্তু সে দু শ্রেণীর কোনটাতেই ফেলা যায় না সুরবালাকে। প্রথম শ্রেণীর বাচালতা বা প্রগল্‌ভতা—গায়েপড়া ভাব নেই একেবারেই, ব্যাপিকা তো নয়ই—আবার গৃহস্থঘরের জড়পুটুলিও নয়। পরিষ্কার কথাবার্তা—বিনম্র ও ভদ্র, কিন্তু অকারণ কুণ্ঠা কি জড়তা নেই।...

আধ ঘণ্টার বেশী থাকেন নি তারক দত্ত। থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। কেবলই ভয়—নেশার ব্যাপারটা বুঝি ধরা পড়ে যায়। তাহলে আর লজ্জার শেষ থাকবে না বৌঠানের কাছে। যাবার সময় অবশ্য বার বার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, 'একদিন আমাদের পার্টিতে আসুন না, খুব আমোদ পাবেন!'...

এই লোকটিকে নিয়ে আসাতেই যথেষ্ট কাজ হয়েছিল। এই এক চালেই মাৎ ক'রে দিয়েছিলেন রাজাবাবু। সুরবালাকে দেখে তারক দত্ত যতটা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন— তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর ব্যবহারে সুরবালাও তার চেয়ে কম হয় নি। ওর যে কুণ্ঠা— ওর যে ভয়—রাজাবাবুর বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বেরুনো বা তাঁদের সঙ্গে মেশায় ওর যে প্রবল আপত্তি—সেটা অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল। এর পর, আর দু-একজনকে এইভাবে নিয়ে আসার পর বাইরে যাবার কথাটা ভরসা ক'রে তুলতে পেরেছিলেন রাজা-বাবু, সুরবালার তরফ থেকেও তেমন কোন প্রবল প্রতিবাদ ওঠে নি আর।

কিন্তু এটা যে কতবড় ভুল—সুরবালারও রাজাবাবুরও—তা প্রথমদিন বেরিয়েই বুঝতে পারলেন ওঁরা। সুরবালার অবশ্য আগে জানবার কথা নয়, কিন্তু রাজাবাবু জানতেন। জানতেন সুরবালার ওপর এর কি প্রতিক্রিয়া হবে। তবু এতখানি সম্পদ— সম্পদ ভোগ করার সৌভাগ্য—দেখাবার লোভটা সামলাতে পারেন নি কিছুতেই।

রাজাবাবু অবশ্য বেছে বেছে, যা সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত 'মাইফেল' বলে মনে হয়েছে, তাতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজা খেতাবধারী এক ধনী জমিদারের বাগান-বাড়ি— তাও পাড়াগাঁয়ের কোন অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জমিদার নয়—খাস কলকাতার নাম-করা জমিদার—উচ্চশিক্ষিত, গুণী—সারা বাংলা দেশের লোক একডাকে চেনে এমন পরিবার তাঁদের। মাইফেলে এসেও ছিলেন বাছাই-করা লোক—জজ, ব্যারিস্টার, য়্যাটর্নী, বড় ডাক্তার, রাজা জমিদার, বিলেতফেরৎ বড় সরকারী কর্মচারী, দু-একজন ধনী মহাজনও ছিলেন, তাঁরাও শিক্ষিত, বিশিষ্ট ব্যক্তি সব, সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

আহার ও পান—এইটেই লক্ষ্য, আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ। 'মাইফেল' নামটার মর্যাদা রাখার জন্যেই মাত্র দরকার সেটা। তবু সেদিকেও আয়োজনের কোন ত্রুটি হয় নি। বড় বাঈজী এসেছিলেন একজন গাইতে, দুজন তয়ফাউলী-নাচউলীও, একজন ওস্তাদ গাইয়েও এসেছিলেন—যদিও তাঁর গানের অবসর মেলে নি শেষ পর্যন্ত, একজন ম্যাজিক দেখাবার লোক—একজন ভাঁড়—ক্যারিকেচার না কি করবে যেন, সুরবালা কথাটার অর্থ জানত না—এখানে এসে দেখল ভাঁড়ামিই তবে সে ভাঁড়ামির ভাষাটা ইংরেজী এই যা। ...দু-একজন সুরবালার গান শোনবার প্রস্তাবও তুলেছিলেন—কিন্তু সুরবালা আগেই রাজাবাবুকে বলে রেখেছিল—সে কিছুতেই এই সব আয়োজনের মধ্যে গাইবে না, তয়-ফাউলী-নাচউলী পর্যায়ে নামতে রাজী নয় সে—রাজাবাবুই কাটিয়ে দিলেন তার হয়ে প্রস্তাবটা।

কিন্তু শুধু নাচগান ভাঁড়ামি বা ইন্দ্রজালই নয়, মনোরঞ্জনের অন্য আয়োজনও ছিল। কিছু কিছু অন্য মেয়েও আমদানি করা হয়েছিল। তাদের কাউকে কাউকে চেনেও সুর-বালা। থিয়েটারের মেয়ে। সবাইকে নাম ধরে চেনে না হয়ত—তবে দেখেছে, মুখচেনা। থিয়েটারের মেয়ে ছাড়াও ছিল কেউ কেউ। খুবই নিচুস্তরের, খোলার ঘরের মেয়ে যাদের বলে—সেই ধরনের। এরা—সুরবালা ছোটবেলায় দেখেছে—তাদের মাটির ঘরের দাওয়াতেও উঠতে সাহস করত না। কুণ্ঠিতভাবে উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলত। হয়ত তাদেরই কারও মেয়ে বা নাতনী হবে এই মেয়েগুলো—কে জানে?

এই সব দেখেই মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল সুরবালার। রাজাবাবুও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে-ছিলেন। আসলে তিনি নিজে খুব একটা এই সব পার্টি বা মাইফেলে যোগ দেন না— তাঁর সময়ই অল্প। গেলেও অল্পক্ষণ থেকে চলে আসেন, এই পার্টির শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও নেই।

অবশ্য বাগানের মালিক মহারাজা বা অন্য বাবু ও 'সাহেব'রা এসে যখন আলাপ করলেন সুরবালার সঙ্গে, তখন ওকে যে তাঁরা একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সম্ভ্রমের চোখে

দেখছেন—সেটা বেশ ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দিলেন। হয়ত সেটা আগে থেকেই বলা ছিল। রাজাবাবুই সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁদের। সুরবালাও তাতে কিছুটা প্রসন্ন হ'ল। আরও নিশ্চিন্ত হ'ল দেখে যে বাকী সব মেয়েরা কেউ গায়ে-পড়ে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল না। থিয়েটারের যে সব মেয়েরা এসেছিল তারাও না। তারা সুরবালার এই বিশিষ্ট মর্যাদায় যথেষ্ট ঈর্ষিত বোধ করলেও—সেই সম্ভ্রমের গণ্ডী লঙ্ঘন করতে সাহস করল না।

বাগানবাড়িতে অতিথিরা এসে জড়ো হয়েছিলেন সকাল দশটার মধ্যেই। ঠিক ছিল যে প্রভাতের জলযোগ থেকে খাওয়া শুরু হবে, একেবারে রাত্রের খাওয়া শেষ ক'রে তবে সকলে ফিরবেন। সেই মতোই আয়োজন ছিল। হালুইকর বামুন ও মুসলমান বাবুর্চি'র বিচিত্র সমাবেশে—ভোজের ব্যবস্থাটাও যতদূর সম্ভব সাড়ম্বর ক'রে তোলা হয়েছিল। পাছে কেউ সমাপ্তির আগেই রসভঙ্গ ক'রে চলে যান—সে জন্যে, যার যার গাড়ি সব মালিককে পেঁৗছে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল, বলে দেওয়া হয়েছিল রাত নটার পর আবার আসবে। মহারাজার নিজের অনুরোধ এটা—সুতরাং কেউই জেদ করেন নি। অবশ্য মহারাজার নিজের দুখানা গাড়ি হামেহাল মজুত থাকবে—বিশেষ দরকারে যখন খুশি পাওয়া যাবে তা—সে আশ্বাস মহারাজা দিয়ে রেখেছিলেন সকলকে।...সারা দিনব্যাপী আনন্দ আমোদের অবিরাম স্রোত বয়ে যাবে—যার যেমন খুশি সেইভাবে উপভোগ করবে—মহারাজার এই ছিল পরিকল্পনা।

সকালের জলযোগ শেষ হ'তে কিছু কিছু গান-নাচ, ক্যারিকেচার, ইন্দ্রজাল দেখানো হ'ল। দোতলার নাচঘরে এই সব অবসর-বিনোদনের আয়োজন হয়েছিল। কেউ বা ঢালা ফরাসে বসেছিলেন—কেউ বা গদী-আঁটা বিলিতি চেয়ারে। প্রথম দিকে অতিথিরা মধ্যে মধ্যে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে মদ খেয়ে আসছিলেন। সম্ভবত সুরবালার জন্যেই আব্-ডালের ব্যবস্থাটুকু করা হয়েছিল। কিন্তু দামী বিলিতি মদের তেজস্কর নেশা খানিকটা চড়ে ওঠার পর আর সে সতর্কতা রাখা সম্ভব হ'ল না। বোধ হয় বার বার উঠে যাওয়ার অবস্থাও ছিল না অনেকের। বেয়ারাদের ঐখান থেকেই ডাকাডাকি শুরু হ'ল—সুরা ও সোডার বোতল প্রকাশ্যেই আসরে এসে জাঁকিয়ে বসল।

সুরবালা এসবে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের 'বাগান পার্টি'র কথা গল্প শুনেছে মাত্র মতির মুখে—মতির বোন-বোনঝিদের মুখে। কিন্তু শোনা আর চোখে দেখায় অনেক তফাৎ। মদের গন্ধেই তার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল—এখন প্রকাশ্যে বোতল গ্লাস ডিকেন্টার নিয়ে বেয়ারাদের আসতে দেখে অসহ্য হয়ে উঠল। কেমন যেন অপমানিত বোধ করতে লাগল নিজেকে। যে সম্ভ্রম ও মর্যাদার বাষ্পাবরণ এতক্ষণ ঘিরে ছিল ওকে—তা এই মাতলামির বাতাসে উড়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক কী চোখে ওকে দেখে সবাই—সে সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না আর।...প্রবল আত্মধিক্কারে তার চোখে জল এসে যেতে লাগল বার বার। আত্মধিক্কার প্রধানত এখানে আসতে রাজী হওয়ার জন্যে। বোঝা উচিত ছিল তার—এ রকম যে হবে তা ভাবা উচিত ছিল।...

তবু এখনই এ স্থান ত্যাগ করা সম্ভব নয়। গাড়ি নেই যে চলে যাবে। জেদ ধরলে রাগারাগি করলে—একটা নাটকীয় কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তুললে হয়ত যাওয়া যায়। মহারাজাই গাড়ি দিতে বাধ্য হবেন তখন—কিন্তু তাতে এই সব সম্ভ্রান্ত বন্ধুদের কাছে রাজাবাবুকে কিছুটা অপ্রস্তুত হ'তে হবে, তাঁর ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। এদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবসার সম্পর্ক আছে সেটা এতদিনে খানিকটা বুঝেছে। যতই যা হোক—রাজাবাবুকে বিব্রত করতে বা হাস্যাস্পদ করতে ও পারবে না। তাঁর খুব একটা দোষও নেই—তিনি জেনেশুনে ওকে এ ব্যবস্থায় ফেলেন নি—তাঁকে এটুকু চিনেছে ও। ঠিক এই রকম অবস্থা দাঁড়াবে তা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন না। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে

সেটা।...

দিন যত বাড়তে লাগল তত এদিকের আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে উঠল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের ডাক পড়ল যখন—তখন বেলা চারটে বাজে। আয়োজন বিপুল—সুরবালা ওপর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখল অবশ্য—ওর মনে হ'ল রাক্ষস ছাড়া এত রকমের খাদ্য একটুখানি ক'রেও মুখে তোলা সম্ভব নয় সব! অথচ তখন অনেকেরই আর খাওয়ার মতো অবস্থা নেই। নিচে যাওয়ারই সাধ্য নেই অনেকের। কিছু কিছু বিলিতী খানা—চপ কাটলেট ইত্যাদি —আগেই ওপরে এসেছিল, সুরার উপাদান হিসেবে তা খাওয়া হয়েছে। তাতেই পেট ভরে গেছে অনেকের। কেউ ইতিমধ্যেই বমি ক'রে এলিয়ে পড়েছেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত খুব কম লোকই গিয়ে খেতে বসলেন। মহারাজা নিজে এসব কিছুই খাবেন না—তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই আছে বেশ একটু—তিনি পৃথক ব্যবস্থায় আগেই খেয়ে নিয়েছেন। তবে তিনি দাঁড়িয়ে এ'দের খাওয়ালেন। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটটা আসনে চৌদ্দ-পনেরোজনের বেশি বসাবার লোক পাওয়া গেল না। তাঁরাও কেউ সব আহার্য এক-বার ক'রে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না। একটু-আধটু তুলে মুখে দিলেন, বেশির ভাগই অস্পর্শিত অনাস্বাদিত রইল। প্রচুর খাবার ফেলা গেল। সুরবালার মনে হ'ল যা এখানে পড়ে রইল পাতায় পাতায়, শুধু তার খরচেই একটা দরিদ্র পরিবার এক বছর সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারত—মধ্যে মধ্যে ভাল-মন্দ খেয়েও। এর অধিকাংশই একেবারে নষ্ট হবে ; এ অঞ্চলে বসতিই কম—কাঙাল গরীব যা দু-চারজন এসে সসঙ্কোচে ও সভয়ে ফটকের বাইরে বসে আছে—তারা বাদে ভীড় ক'রে আসার মতো লোক এখানে নেই। আর খাদ্যও—যা পরিবেশিত হয়েছে এখানে, তা সমগ্র আয়োজনের ভগ্নাংশ মাত্র। আরও অনেক খাবার ফেলা যাবে। হয়ত ভাড়া করা ঠাকুর-চাকর ও বেয়ারা বাবুর্চি'রা কিছু কিছু নিয়ে যাবে। তাও, তারা কি সে রকম ব্যবস্থা নিজেদের জন্যে আগে থেকেই করে রাখে নি?

রাজাবাবু অবশ্য সে পংক্তিতে খেতে বসেছিলেন, তবে তাঁরও খোরাক কম—প্রভাতের গুরু জলযোগই তাঁর পক্ষে যথেষ্টর বেশী। তিনি লোকদেখানো একবার বসলেন মাত্র। সুরবালা নিচে নামে নি, সে কিছুই খাবে না বলেছিল—মহারাজা সে কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে একরাশ মিষ্টি দই পায়েস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিষ্টির আয়োজনও অন্য বিভাগের চেয়ে খামতি যায় না—মানানসই ক'রেই করা হয়েছিল বোধ হয়। খনেখালির খইচুর, বেলডাঙ্গার মনোহরা, খাগড়ার ছানাবড়া, নাটোরের রাঘবশাহী কাঁচাগোল্লা, কেষ্টনগরের সরভাজা সরপুরিয়া, গোটপাড়ার ঝুরো সন্দেশ, বর্ধমানের সীতাভোগ খাজা থেকে শুরু ক'রে সিমলের সন্দেশ, বাগবাজারের রসগোল্লা পর্যন্ত—তার সংগে কাঁসারিপাড়ার সরের দই—আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না কোথাও। সুরবালার তখন কিছু খাওয়ার অবস্থা নয়—দৈহিক মানসিক কোন দিক দিয়েই—তবু মহারাজার অসম্মানের ভয়েই সামান্য একটা কি তুলে নিল শুধু।...

বিকেলের দিকে অসভ্যতা ও বেলেল্লাগিরি আরও বাড়ল। সুরবালার তখন সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। বাধ্য হয়েই রাজাবাবুকে জানাতে হ'ল যে তার শরীর খুব খারাপ লাগছে—এ 'রহুট' তার অভ্যাস নেই কোনকালে—ভীষণ মাথা ধরে উঠেছে, সে এখনই বাড়ি যেতে চায়। রাজাবাবুর নিজেরও আর ভাল লাগছিল না, কিন্তু তিনি মহারাজাকে সে কথা জানাতে চাইলেন না, সুরবালাকে আর আধ ঘণ্টা ধৈর্য ধরতে বলে—বকশিশের লোভ দেখিয়ে ওখানকারই একটা বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিলেন নিজের বাগানে—কোচোয়ানকে তখনই গাড়ি জুতিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে। তাঁর বাগান এখান থেকে খুব বেশী

দূরে নয়—জোরে হে'টে গেলে পনেরো মিনিটেই পৌঁছতে পারবে।

সারা দিনের তুলনায় আধ ঘন্টা সময় কিছু না—কিন্তু সুরবালা তখন আর এক মিনিটও থাকতে পারছে না—এমনি অবস্থা। মাথা ধরার কথাটাও মিথ্যা নয়। অপেক্ষা যদি করতেও হয়—এখানে বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারবে না। সে পায়ে পায়ে যতটা সম্ভব সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাগানে নেমে এল।

আঃ! তবু এখানে অনেক শান্তি। বেলা তখন আর বিশেষ নেই—অপরাহ্নের আলো গাছের মাথায় কিছু কিছু লেগে থাকলেও নিচের দিকটা বেশ ঘোরঘোর হয়ে এসেছে। আগেকার দিন হ'লে—শহরের মেয়ে সে—এ সময়ে এই রাক্ষুসে বেলায় এত বড় বাগানে একা ঘুরে বেড়াতে ভয় করত, কিন্তু গত বছরখানেকে এই নির্জনতা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, ভয় তো করেই না বরং ভাল লাগে আজকাল। নাম-না-জানা সে আতঙ্কটা অনেক কমে গিয়েছে। ভয় এখনও আছে—বদ প্রকৃতির মানুষকে, তা সে ভয় ওখানে বিশেষ নেই—বন্দুকধারী চৌকিদার ঘোরে বাগানে পাহারা দিয়ে। এখানেও নেই নিশ্চয়, অন্তত আজ নেই। বহু লোক এসেছে, বহু সম্ভ্রান্ত লোক—তাছাড়া তাদের ভৃত্যে-পরিজনে, পাচকে-বাবুর্চিতে, বেয়ারায় দাসীতে—অতিথির চতুর্গুণ লোক এসেছে। চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে তারা, এই পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যেই। একটা হাঁক পেলেই ছুটে আসবে।

সুরবালা নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বাঁধানো বকুল গাছের তলায় বসল। চারিদিকে বিস্তর ফুল ঝরে পড়ে আছে, গাছের শাখায় শাখায় ফুলের সমারোহ। বকুলের গন্ধ বড় তীব্র, কেমন যেন নেশা লাগে—তবু বোধহয় তার এতক্ষণের গ্লানি কাটানোর জন্যে এমনি তীব্র গন্ধেরই প্রয়োজন ছিল—উত্তেজিত উত্ত্যক্ত স্নায়ুতে সুরভির এই আঘাত। সে বসে বসে যেন বুক ভরে প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করতে লাগল মাদকের মতো সেই সুগন্ধ।

কিন্তু শুধু বকুলই নয়। আরও কত কি ফুলের গন্ধ চারিদিকে। ফুলের গন্ধ আর পাখির ডাক। কত কি পাখি ডাকছে—জানা-অজানা, সারা দিনের আনন্দ উৎসব শেষ করে এবার এই সব পত্র-পল্লবের আচ্ছাদনের নিচে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। তাদের মিলিত ডাকে কানও জুড়িয়ে গেল সুরবালার। মনে হ'ল এ গানের তুলনা নেই। মনে হ'ল বৃথাই এত দিন গান শিখে মরেছে—তার, তাদের সাধ্য নেই এই পাখীর গানের সঙ্গে পাল্লা দেয়। ঐ যে বিখ্যাত বাইজীটি সকালে অতক্ষণ ধরে গাইল—অত কসরৎ দেখাল—তারও না।...বাবা বলতেন 'তির্যগযোনি'—পাখী পশুর বহু জন্ম পেরিয়ে বহু ভাগ্যে তবে মানুষ মানব-জন্ম লাভ করে। কিন্তু মানবের দেহ ধারণ করলেই মানুষ হওয়া যায় না, ভগবানের নাম ক'রে সাধনা ক'রে তবে মানুষ 'মানুষ' হয়। সেই শ্রেষ্ঠ মানুষকেই ওঁরা 'মানুষ' বলেন, কর্তা বলেন। কথাটা আজ মনে পড়ে গেল। কে বলেছে বহু ভাগ্যে প্রাণীরা মানব দেহ ধারণ করে। তির্যগযোনির এই সব প্রাণী—'ইতর প্রাণী' বলে মানুষ যাদের অবজ্ঞা করে—মানুষের চেয়ে ঢের ঢের ভাগ্যবান। অন্তত এই মুহূর্তে সুরোর তাই মনে হচ্ছে, সে রীতিমত ঈর্ষাই বোধ করছে ওদের সম্বন্ধে। বাধা নেই—মুক্ত জীবন, দায়-দায়িত্ব দুশ্চিন্তা কিছু নেই, মনের আনন্দে অসীম শূন্যে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাদ্য ভগবানই যুগিয়ে রেখেছেন, ভগবানই ওদের কণ্ঠে দিয়েছেন চির-আনন্দের সুর, দিয়েছেন সুমধুর গান—সেই গান গেয়ে বেড়াচ্ছে যেমন খুশি। শিক্ষার প্রয়োজন নেই, মজুরোর জন্যে ভাবতে হয় না, প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ওদের চেয়ে সুখী, ওদের চেয়ে ভাগ্যবান কে?......

আগের সে ক্লান্তি আর গ্লানি চলে গেছে, কেমন যেন এক মুগ্ধতার মধ্যে দিবাস্বপ্নে ডুবে গেছে সব চেতনা আর চিন্তা। কিন্তু বেশীক্ষণ সে সৌভাগ্য ভোগে এল না। দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল রূঢ় বাস্তবের আঘাতে। ফুলের গন্ধে ও পাখীর গানে যে পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল ওর চারপাশে, তা ইতরেতর প্রাণী মানুষের কলুষিত কামনায়

কদর্যতায় দূষিত ও কলুষিত হয়ে উঠল।

দেখা গেল যে 'সাহেব'রাও কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েছেন বাগানে, এই আধো অন্ধকারকে কাজে লাগাতে। তাঁরা এসেছেন তাঁদের বাতাবরণ নিয়েই। মানুষের চাপা কথা চাপা হাসি, মাতালের জড়িত কণ্ঠ—আগেই শোনা উচিত ছিল তার, কানেও গিয়েছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারে নি, সতর্ক হয় নি। মন তখন মশগুল হয়ে ছিল যেন—হঠাৎ-আবিষ্কার-করা প্রকৃতির এই বিপুল ঐশ্বর্যে। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের এই বিভূতি অনুভব করছিল। যখন অবহিত হ'ল—যখন সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় রইল না—তখন আর সতর্ক হয়ে কোন লাভ নেই—তখন উঠে অন্য কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয়। কদর্য দৃশ্যটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে। ওদের লজ্জা নেই—কিন্তু যে দেখছে তার লজ্জা আছে, সে সময় নিঃশব্দে নিশ্চল হয়ে বসে থাকাই বুদ্ধির কাজ। সে যে সেখানে আছে সে সম্বন্ধে ওরা না সচেতন হয়, তাকিয়ে না দেখে।

আঘাতটা যদি শুধুই কোন কুৎসিত জঘন্য দৃশ্য দেখার হ'ত—তাহলেও অতটা মন খারাপ হ'ত না—এক্ষেত্রে যতটা হ'ল। যে মানুষটি এই দৃশ্যের নায়ক, আর যাই হোক ঠিক তাকে এ অবস্থায় দেখবে মনে করে নি সুরবালা। সেই জন্যেই আরও কষ্টকর, আরও দুঃসহ বোধ হ'ল। স্বয়ং দত্তসাহেব—তারক দত্ত, এক হাতে মদের গ্লাস—প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় একটি মেয়ের পিছনে ছুটছেন—টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে। মেয়েটিকে চেনে সুরবালা, থিয়েটারে দেখেছে। এ সেই এককড়ি। শ্যামাঙ্গী কিন্তু সুরূপা। বস্তুত কালো রঙে এমন রূপ কদাচিৎ দেখা যায়। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, নিখুঁত মুখশ্রী ; ঝক্‌ঝকে সাজানো দাঁত—হাসিটিও ভারী মিষ্টি। সবচেয়ে আকর্ষণ হ'ল তার চোখের, আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে কী যেন আছে—সে চাহনি ভোলা শক্ত।

আকর্ষণ আছে যথেষ্টই—বহু লোকই নাকি ইতিমধ্যে তার জন্যে লালায়িত অস্থির হয়ে উঠেছে। তাই বলে তারক দত্ত! মেয়েটি এসেছে একেবারে খোলার ঘরের বস্তি থেকে, ওর মা দু দিন আগেও লোকের বাড়ি বাসনমাজার কাজ করেছে—মেয়েটা একেবারেই লেখাপড়া জানে না—অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত নেই। পার্ট অপরকে দিয়ে পড়িয়ে মুখস্থ করে। সম্প্রতি কী একটা বইতে খুব নাম হয়েছে—যে চরিত্রে সে অভিনয় করেছে তার নাম 'কাঞ্চন'—তাই অনেকেই ওকে কাঞ্চন বলে ডাকে, দত্তসাহেবও 'কাঞ্চী' 'কাঞ্চী' বলে ডাকতে ডাকতেই তাড়া করেছেন। মদ এককড়িও কিছু খেয়েছে—অন্তত তার চোখের ঢুলুঢুলু ভাবে আর স্খলিত গতিতে তাই মনে হ'ল সুরবালার। তবে সে মাতাল হয় নি। বেশ বুঝে হিসেব ক'রেই খেলাচ্ছে দত্ত সাহেবকে, তাঁকে কামাতুর ক'রে তুলেছে। এই মেয়েটির ভাগ্যই ভাল, যে বাবু একে বাঁধা রেখেছেন তিনি বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির দৌহিত্র, ধনী সুশিক্ষিত সুপুরুষ। তাঁকে বাবু পাওয়া এর মতো মেয়ের পূর্ব জন্মের সুকৃতি বলেই মনে করা উচিত—তবু তাঁকেও ঠকিয়ে এই কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছে! হয়ত বাগানবাড়িতে আসার কথা তিনি জানেন—কিন্তু অপর পুরুষের সঙ্গে এই বেলেল্লা-গিরির কথা জানেন না নিশ্চয়।

তিক্ততায় ও গ্লানিতে যেন আকণ্ঠ ভরে গেল সুরবালার। তারক দত্ত অবশ্যই ওকে লক্ষ্য করেন নি, সে অবস্থাও ছিল না তাঁর কিন্তু এককড়ি করেছিল। সে খিল খিল ক'রে হেসেও উঠল ওর দিকে চেয়ে—বিজয়গর্বেরই হাসি কতকটা, তারক দত্তের মতো পাক্কা সাহেব ব্যারিস্টার তার পায়ে পায়ে ঘুরছে—গর্ব করার মতো ঘটনা বৈকি!

সে হাসির শব্দে দত্তসাহেবও ফিরে চাইলেন এদিকে—সম্ভবত এককড়ির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রেই। সেই ঘোর উন্মত্ত অবস্থাতেও কিন্তু তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন, সুরা-জড়তার মধ্যেও তাঁর কণ্ঠে সত্যকারের কুণ্ঠা ফুটে উঠল, 'অ্যাম সো সরি ম্যাডাম'!...

আজ্ঞে, আমি ভারী দুঃখিত—বিলীভ মি!...আ-আপনাকে এখানে দেখব মনে করি নি। ...এই অবস্থায় আপনার সামনে—সো সরি।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলেন তিনি। বিমূঢ়ের মতো একবার এককড়ির দিকে আর একবার সুরবালার দিকে চাইতে লাগলেন।

সুরবালার আর সহ্য হ'ল না। তার তিক্ততা ষোলকলা ছাপিয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে ঐ মেয়েটার নির্লজ্জ হাসি যেন তার সর্বাঙ্গে—বিছের কামড়ের মতোই—একটা বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সে আর কোন দিকে না চেয়ে কিছু না ভেবেই সেখান থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করল—বাগানের পায়ে-চলা পথ ধরে—যে কোন এক দিক লক্ষ্য ক'রে।

সৌভাগ্যক্রমে সে বাইরে যাবার দিকটাই ধরেছিল—ফটকের দিকটা। আর কেউ অত লক্ষ্য করে নি হয়ত, সুরবালা যে বাইরে যাচ্ছে, তাও বোঝে নি—কিন্তু ফটকের দারোয়ান লক্ষ্য করেছিল ওর এই উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেরিয়ে যাওয়াটা। সে এগিয়ে কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'হাপনার গাড়ি লাগবে না দিদিবাবু?...গাড়ি কিছু আসবে বাহারসে—না হাম্মাদের গাড়ি বোলিয়ে দিব?

সুরবালা কোন উত্তর দিল না, তার দিকে চাইলও না ভাল ক'রে—সেই ভাবেই রাস্তায় পড়ে হনহন ক'রে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে—কোথায় যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে পড়বে, ওদের বাড়িটা কোন্ দিকে—কোন হিসেব না ক'রেই।

॥ ২৪ ॥

সেদিন একটা ঘোরতর রকমের বিপদ ঘটতে পারত। সেই ঘোর-ঘোর 'ঝুজ্‌কি' বেলায় জনবিরল পাড়াগাঁয়ের নির্জন পথে এক-গা গহনা পরা অল্পবয়সী রূপসী মেয়ের একা ঐভাবে হেঁটে যাওয়া একেবারেই উচিত হয় নি। উচিত যে হয় নি—তা সুরবালারও জানার কথা। স্বাভাবিক অবস্থায় কথাটা সে ভাবতেই পারত না। কিন্তু তার তখন এত ভেবে-চিন্তে কাজ করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। পেছনে ফেলে-আসা ঐ নরক থেকে যেমন ক'রে হোক দূরে কোথাও চলে যেতে হবে—অনেক, অনেক দূরে, এই তখন ওর একমাত্র চিন্তা।

অবশ্য বেশী দূর যেতে হয় নি। ওদিক থেকে রাজাবাবুর গাড়ি আসছিল। মাইজীকে ঐভাবে একা উদ্‌ভ্রান্তের মতো হন-হন ক'রে হাঁটতে দেখে কোচোয়ান আবদুল ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থামিয়ে নেমে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, 'মাজী' বলে ডেকে ওকে সচেতন করবার চেষ্টা করেছে। সচেতন হয়েওছে সুরবালা। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিল—অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবেই, কোচোয়ানের ডাকে সম্বিৎ ফিরল এখন, একটু লজ্জিতও হ'ল।...কী মনে করল—কী মনে করছে এরা কে জানে। প্রাচুর্যের এই এক অভিশাপ। অবস্থা সচ্ছল হ'লেই দাসী-চাকর আসবে—আর তাদের অহরহ ভয় ক'রে চলতে হবে, তাদের কাছে সম্ভ্রম বজায় রাখতে প্রাণান্ত হবে। তার প্রধান কারণ—এরা এক-একখানি জীবন্ত 'বঙ্গবাসী' কাগজ, নানুদা বলে 'গেজেট'—বিশেষত মনিব-বাড়ির কুৎসা বা কেচ্ছা প্রচার করাটাকে এরা ধর্মাচরণ বলে মনে করে।...

মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল বটে কিন্তু গাড়ি আর বাগানের দিকে এগোতে দিল না সুরবালা। সহিসকে বলল এগিয়ে গিয়ে রাজাবাবুকে ডেকে আনতে। ওবাড়ির চেহারা আর দেখার ইচ্ছে নেই তার। ওর হাওয়াতে পর্যন্ত কলুষ। তাছাড়া কাছাকাছি গেলে কেউ যদি দেখতে পায়—মানে পদস্থ, বাবু বা 'সাহেব'দের কেউ—আবার নামাবার চেষ্টা করে কি টানা-হেঁচড়া করে—সে বড় বিশ্রী হবে। তার চেয়ে প্রায়-অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তায় অশিক্ষিত মুসলমান কোচোয়ানের ভরসায় একা গাড়িতে বসে রইল—সেও ভাল মনে হ'ল তার, ঢের বেশী শ্রেয়। ধনী শিক্ষিত মাতালগুলোর সংস্রবে আর না।

অবশ্য বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না। সহিসকেও শেষ পর্যন্ত যেতে হয় নি। রাজাবাবু তার আগেই খবর পেয়েছিলেন। খবর দিয়েছিল ফটকের সেই দারোয়ানটিই। দারোয়ানের এখানে অনেক দিন কাটল, বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ লোক, এমন বিস্তর মাইফেল সে দেখেছে এখানে। মানুষের মুখ মনে ক'রে রাখার একটা দুর্লভ ক্ষমতাও আছে তার ঈশ্বরদত্ত। সেই কারণেই সে মহারাজার আরও প্রিয়। সকালে যখন রাজাবাবুর সঙ্গে এসে নামে সুরবালা, তখনই লক্ষ্য করেছিল। এখন ঐভাবে 'বাওরা' বা 'দেওয়ানা'র মতো একা হেঁটে চলে যেতে দেখে সে একটা গোলমাল কি রাগারাগি অনুমান করেছে, আর একজনকে ফটক দেখবার ভার দিয়ে ছুটে ভেতরে গিয়ে রাজাবাবুকে খুঁজে বার করেছে, খবর দিয়েছে, 'দিদিবাবু বাহার চলী গয়ী হুজৌর, একেলি, পায়দল পর!'

'দিদিবাবু? মানে আমার সঙ্গে যিনি এসেছিলেন?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন রাজাবাবু।

'জী, সরকার!'

'তুমি চেনো তাকে?...মানে—ঠিক দেখেছ?'

'জী।'

আর দ্বিধা বা দ্বিরুক্তি করেন নি রাজাবাবু। 'কো—কোথায় কোন দিকে গেল—তুমি দেখেছ? চলো চলো দেখি' বলতে বলতেই তার সঙ্গে চলতে শুরু করেছেন দ্রুত—অবশ্য যতটা দ্রুত তাঁর পক্ষে সম্ভব। হাঁটা অভ্যাস নেই একেবারেই, একটু জোরে চলবার চেষ্টা করলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ে বুকে, পা পাথরের মতো ভারী হয়ে ওঠে। তবু প্রাণপণেই জোরে যাবার চেষ্টা করেন। তাও যথেষ্ট জোরে যেতে পারবেন না বুঝে দারোয়ানকেই বলেন এগিয়ে যেতে, 'তুই যা বাবা, একটু দ্যাখ, একটু দাঁড়াতে বল। বল যে বাবু এসে পড়লেন বলে। তুই একটু ঐখানেই থাক বরং—এই ভর সন্ধ্যেবেলা—দ্যাখো দিকি কি কাণ্ড!'

বেশী বলতে হয় নি দারোয়ানকে, সে ইঙ্গিত বুঝে জোরে নয় দৌড়েই এগিয়ে গেছে। গাড়ি দেখতে পেয়ে গাড়ির মধ্যে উঁকি মেরে দেখে সুরবালাই আছে বুঝে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে, সুরবালাকে জানিয়েছে যে, কোন ভয় নেই—'হুজৌর বাহাদুর' এসে পড়লেন বলে।...এবং পুরস্কারস্বরূপ, রাজাবাবুর পিরানের জেব্-এ একবার হাত পুরে যতটা উঠেছে—টাকা নোট খুচরো মিলিয়ে—তার সবটাই ওর প্রসারিত দুই যুক্ত হাতে এসে পৌঁচেছে।...

খুব একটা কঠিন তিরস্কার আশঙ্কা করেছিলেন রাজাবাবু, অপরাধীর মতোই ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠে—পাশে নয়—সামনে বসেছিলেন। কে জানে কেন, পাশে বসতে সাহস হয় নি তাঁর। কিন্তু সুরবালা একটা কথাও বলে নি, তিরস্কার তো করেই নি। বোধ হয় সে ক্ষমতাও ছিল না আর। ওঁর আসবার আগে থেকেই সে ক্লান্তভাবে গাড়ির গদি আঁটা একটা কোণে মাথা দিয়ে চোখ বুজে বসেছিল, সেই ভাবেই বসে রইল। নড়লও না, চোখও চাইল না। দারোয়ানের আশ্বাসবাণী তার কানে পৌঁচেছিল কিনা তাও যেমন

বোঝা যায় নি—এখন রাজাবাবুর আসা বা গাড়িতে ওঠাটা সে টের পেল কিনা তাও তেমনি বোঝা গেল না। কে এল—অপরিচিত কি না কেউ, তাও চোখ মেলে দেখল না।

রাজাবাবুরও সাহস হ'ল না নিজে থেকে কোন কথা বলতে। চুপ ক'রেই বসে গেলেন সারাটা পথ। কেবল বাগানে পৌঁছে গাড়ি থামতে নিচে নেমে অভ্যাসের বশেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভয়ে-ভয়েই দিয়েছিলেন তবু—যদি তাঁর প্রসারিত হাত উপেক্ষা ক'রে সুরবালা নিজেই নেমে আসে তো সইস-কোচোয়ান দাসী-চাকরদের সামনে লজ্জায় পড়তে হবে—'খাক্‌তাই' হ'তে হবে। সুরবালা অবশ্য তেমন কোন নাটকই করল না, অন্য দিনের মতো সহজেই তাঁর হাত ধরে গাড়ি থেকে নামল এবং ঝিয়ের সঙ্গে দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা সেরে—সহজভাবেই ওপরে উঠে গেল।

তবু সহজ হ'তে পারলেন না রাজাবাবুই। অস্বস্তিটা বেড়েই গেল তাঁর, ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠল। ঝড়ের চেয়ে ঝড়ের ভয়টাই বেশী অস্বস্তিকর, বেশী ভয়াবহ। সত্যিকারের ঝড় উঠলে আতঙ্ক কমে যায় অনেকটা। যা প্রত্যক্ষ, যা আসন্ন নয়—উপস্থিত, যার থেকে আর অব্যাহতি নেই কোনমতেই—তা একরকম ক'রে সহ্য হয়ে যায়, বাধ্য হয়েই তার সম্মুখীন হয় মানুষ। অনেক সময় তাই ভয়ের কারণকে এড়িয়ে যাওয়ার থেকে এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা ঢের বেশী স্পৃহণীয় মনে হয়।... রাজাবাবুও অনির্দিষ্টকাল এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলেন না—নিজেই এগিয়ে গেলেন ঝড়ের মোকাবিলা করতে। রাত্রে সুরবালা এসে খাটে বসতে, ওর শিথিল ডান হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে মাপ করো সুরো—আমি, আমি ঠিক জানতুম না, কোন দিনই তো বেশীক্ষণ থাকি নি এসব পার্টিতে—জানলে তোমাকে নিয়ে যেতুম না কিছুতেই।'

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে সুরবালা উত্তর দিল, 'তা জানি।...না গেলে সব দিক দিয়েই ভাল হ'ত। তোমার বন্ধু ওঁরা—ওঁদের অশ্রদ্ধা করা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু বড়ই ঘেন্না হয়ে গেল আজ। মানুষ এত ছোট, ছিঃ! ছেলেবেলায় বস্তিতেই মানুষ হয়েছি, আশপাশে—ভদ্দরলোক যাদের বলা হয় তেমন লোক বেশী ছিল না, যাদের তোমরা ছোটলোক বলো, নষ্ট মেয়েমানুষ বলো, তারাই বেশী থাকত—কিন্তু তারা কেউই এরকম নয়, এত লুভী, এমন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। নিজের স্বভাবের ওপর ইচ্ছের ওপর অনেক বেশী লাগাম আছে তাদের।

রাজাবাবু চুপ ক'রে রইলেন। আর দরকারও নেই তাঁর এ প্রসঙ্গে। তাঁর বুক থেকে পাথরের মতো ভারী বোঝাটা নেমে গেছে, এখন তিনি নিশ্চিন্ত। সুরবালা তাঁকে দায়ী করে নি তাঁকে তিরস্কার করে নি—তাঁর ওপর অভিমান করে নি—এতে যেন এতক্ষণ পরে প্রাণ ফিরে পেলেন তিনি—নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।...

আরও একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর কোলের কাছেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল সুরবালা। তাড়াতাড়ি সস্নেহে তার মাথাটা টেনে কোলে তুলতে গিয়ে তার ভিজে এলো চুলে হাত পড়ে চমকে উঠলেন, 'এই এত রাত্তিরে মাথায় জল ঢেলে এলে নাকি!'

'নাহ'লে আর পারছিলুম না। মাথাটা বড্ড ধরে উঠেছিল। আর—আর এমন গা-ঘিন-ঘিন করছিল, অশুচিবোধ হচ্ছিল নিজেকে—চান না ক'রে ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে হ'ল না।'

তারপর খানিকটা চুপ ক'রে অমনি শুয়ে থেকে হঠাৎ উঠে বসল। বলল, 'গান শুনবে?...দুটো ভগবানের নাম করি—নইলে এ ভাবটা কাটবে না কিছুতেই।...এই ঘেন্নার ভাবটা। অথচ মানুষ নারায়ণ—ঘেন্না করলে অপরাধ হয়।'

খালি গলায় গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গাইতে শুরু করে সে প্রথমটায়—পরে আবিষ্ট হয়ে যেতে গলা আপনিই খানিকটা চড়ে।

"মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি
সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিনি গীম হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ॥

... ...

ঘন আন্ধিয়ার রজনি জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ
বিষধর ভরল দুতর পথ পাঁতর
একেলা চললি তেজি গেহ॥..."

স্থির হয়ে বসে শোনেন রাজাবাবু। সেই গান, তেমনি অপূর্ব, তেমনি মোহময়—যা শুনে এককালে সমস্ত বিবেচনা বোধ, অগ্রপশ্চাৎ হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলেন! শুনতে শুনতে আজও তেমনি তন্ময় মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁরও মনে হ'তে লাগল সারা দিনের অশুচিকর স্মৃতি, তিক্ততা ও গ্লানি অনেকটা কেটে গেল। যে অনুশোচনাটা পীড়া দিচ্ছিল এতক্ষণ, জেনে-শুনে—এতটা না হ'লেও অনেকখানি জানতেন তিনি—সুদ্ধমাত্র নিজের একটা গৌরববোধ চরিতার্থ করতে সুরবালাকে ঐখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, সেটাও যেন আর বিশেষ রইল না। তিনি যেন সেই ভগবদ্-সঙ্গীতের পবিত্র সুরস্রোতে অবগাহন ক'রে নিষ্কলুষ হয়ে উঠলেন।

যাইফেলের জের কিন্তু এইখানেই মিটল না। যে দুঃখস্মৃতিটাকে কোন্ এক-বিস্মৃত-রাত্রে-দেখা দুঃস্বপ্ন মনে ক'রে মনের মধ্যে থেকে ঠেলে বার ক'রে দিতে চাইছিল সুরবালা, চাইছিল ঐ দিনটাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে—সেটা বারবারই তার ক্লেদাক্ত অস্তিত্ব জানিয়ে দিতে লাগল।

রাজাবাবুর ঐ সব মান্যগণ্য বন্ধুদের আরও এক অভিনব পরিচয় পেল সুরবালা।

দুপুরে বা বিকেলে—রাজাবাবু যখন থাকেন না—তখন এক-একদিন নানা সম্ভ্রান্ত চেহারার ঝিয়েরা আসতে লাগল। অবশ্য তারা যে ঝি বা দাসী শ্রেণীর—মেয়েছেলে—গোড়ায় গোড়ায় বুঝতে দেরি লেগেছে সুরবালার। ভাল ভাল ধুতি পরণে, ওপর হাতে ঝকঝকে নতুন অনন্ত—কারও বা গলায় ভারী বিছে হার, কোমরে রুপোর গোট। ঝিয়ের এমন পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে তখনও অত পরিচিত হয় নি সে।...প্রথম দু-একদিন তাদের আগমনের উদ্দেশ্যও বুঝতে পারে নি। অনেক ভেবে, অনেক জেরা ক'রেও সে রহস্যের তল পায় নি। কোথা থেকে ঠিকানা পেল ওর, কেমন করে চিনে চিনে এই বিজনপুরী খুঁজে বার করল, কেনই বা তাদের এই আকিঞ্চন—তা তাদের বর্ণাঢ্য কথার আড়ম্বর ভেদ ক'রে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি সুরবালার পক্ষে। প্রত্যেকেই এক-একজন ধনী ব্যক্তির উল্লেখ করল বটে—মনিব হিসেবে—কিন্তু পরে অন্য কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে 'ঝি' বলতে যা বোঝায়—সংসারের নিত্যদিনের সে কর্মী তারা নয়।

'এই এনু একটু দিদিমণি', বেশ ভব্যি-যুক্ত হয়ে বসে, আলগোছে এক ঘটি জল খেয়ে কথাটা পাড়ে হয়ত, 'তোমার নাম শুনে শুনে তো অস্থির, আমাদের বাবুর মুখে তো অন্য কথা নেই—জপমালা একেবারে, তাঁর মুখেই শোনা অবিশ্যি, কে আর বলবে বলো—তাই একবার দেখতে এনু। বলি দেখেই যাই—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে যাই একবার। বাবু বলে, যেমন রূপ তেমনি গলা, ভগবান যেন আশ মিটিয়ে দিশে পুরিয়ে ঢেলে দিয়েছেন একেবারে—তেনার যা দেবার। এমন নাকি হয় না, দেখা যায় না। সরস্বতী পিতিমের মতো চেহারা আবার সেই সরস্বতী গলাতেও অধিষ্টান করছেন ; আর তেমনি

নাকি মিষ্টি মেজাজ। শুনে শুনে তাই বলি যাই, জন্ম সাথক ক'রে আসি একবার...তা আসা কি আর হয়—এত দূরে। তাও দূর বলেই নয়...বিজন বন চারিদিকে।...হাজার হোক আমরা মেয়েছেলে বৈ তো নয়, যতই যা হাঁকাই-হোঁকাই করি—দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই—এটা তো ঠিক...তাই এই দুপুরবেলা মরি-বাঁচি ক'রে আসা। তাও যেন গা ছমছম করে। তোমার দিদি খুব সাহস মানতে হবে। এইখানে এই নিবান্দা পুরীতে থাকো মুখ বুজে। অশোক বনে সীতের মতো।'

আবার একটু দম নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, তা আসা সাথক হয়েছে। মানতিছি বাপু। চোখ জুড়িয়ে গেল। গান শুনব সে কথা বলতে পারি নি—আস্পদ্দা পেকাশ পায় ওতে—কত দাম তোমাদের গলার তা কি আর জানি নি। বলে শয়ে শয়ে টাকা ঢেলে দিয়েও নিয়ে যেতে পারে না, কত খোসামোদ করে এসে, পায়ে তেল দেয়। তা গান না হোক—গলা শুনে গেনু তাই ঢের। কী মিষ্টি গলা—গলার আওয়াজ তো নয় বাঁশী—সাত্যিই! নিজ কন্নে না শুনলে পেত্যয় যেতুম নি।' ইত্যাদি—

প্রথম দিনে কেউই ভাঙে না এমন ভাবে আসার উদ্দেশ্য। বসে, জলখাবার খায়, গল্প করে ওটা-এটা নানা প্রসঙ্গ ধরে, বিস্তর তোষামোদ করে—রূপ গুণ সর্বোপরি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার—এই বেজনবনে হাসি-মুখে একা পড়ে থাকার জন্যে—তার পর পান খেয়ে ও আঁচলে বেঁধে চলে যায় দুদিকে রসের তরঙ্গ তুলে। আবার হয়ত আসে—দুদিন-চারদিন বাদে। আবারও কিছুক্ষণ ধরে সুরবালার রূপ ও গুণের প্রশংসা করে, আকারে-ইঙ্গিতে ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে (দুঃখটা প্রধানত বাপের বরিসণী বাবুর হাতে পড়ার জন্যেই—তাও সে বাবু যথেষ্ট পয়সাওলা নয়, কলকেতায় বাড়ি ক'রে এখনও রাখতে পারল না—কথাটা ঠিক স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না ক'রেও আশ্চর্য কৌশলে জানিয়ে দেয় তারা, পাকা কৌঁসুলীর মতো)—অবশেষে কাজের কথা পাড়ে।

রাজার রাণী হওয়া যার উচিত, ভগবান যাকে সেই মতো 'ঐশ্বয্যি' দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার কি এই জনমানিষ্যিশূন্য বিজনবনে এইভাবে পড়ে থাকা সাজে? কত তাবড় তাবড় বাবু (বা 'সায়েব' বা রাজা—যে ক্ষেত্রে যেমন) তার অনুগ্রহ পেলে ধন্য কৃতার্থ হয়ে যাবে। দোরে হাতী বাঁধা রাখতে পারে সুরবালা ইচ্ছে করলে—ভগবান সে জিনিস তাকে দিয়েছেন, সে ক্ষমতা। বাড়ি গাড়ি কেন—ওকে 'তুষ্টু' করার জন্যে জমিদারী বিকিয়ে দিতে স্বেচ্ছা-সুখে নীলামে তুলতেও রাজী আছে তারা। সন্দেহ হয়—যাচাই ক'রে দেখুক না সুরবালা। ...কেউ বলে পাঁচ হাজার আগাম সেলামী গুনে দেবে, কেউ বা বলে দশ হাজার। মাইনেও—মাসিক দুশ' থেকে পাঁচশ' পর্যন্ত সব রকম দরই শোনায়। সবচেয়ে বেশী পাওনার প্রস্তাব এল ব্যারিস্টার তারক দত্ত আর হালদার সাহেবের কাছ থেকে। দত্তসাহেব নগদ সেলামী ছাড়াও একটা বাড়ি আগাম লিখে দিতে চান। হালদার সাহেব নগদ আট হাজার টাকা আর সাহেব-বাড়ির হীরের গয়না এক সুট।—এ শুধু প্রথম দিনের জন্যে, সেলামী, সম্মানী—যা বোঝ!

এইবার ব্যাপারটা বুঝল সুরবালা। আরও বুঝল একটা কথা। এরা কেউই ঠিক দাসী পর্যায়ের লোক নয়। অবসরপ্রাপ্ত গণিকা বেশির ভাগই। রূপ-যৌবন চলে গেছে—এখন উপার্জনের নতুন পথ ধরেছে। একেই বোধহয় কুটনীগিরি বলে। মেয়েমানুষের ব্যবসা, মেয়েমানুষের দালালি। এরা এমনি-এমনি এত কাণ্ড ক'রে আসে নি এখানে। সুরবালাকে যারা বিশ-পঁচিশ দিতে চাইছে—কোন্ না তারা এদেরও পাঁচশ' হাজার কবুল করেছে, খরচা বলেও হয়ত দশ-বিশ টাকা দিয়েছে আলাদা।

তাও বুঝতে দেরি হয়েছিল খানিকটা।

প্রথম যে কথাটা পাড়ে, সে প্রস্তাব-কারিণীর কথার বাঁধুনী ভেদ ক'রে, বাক্য ও শব্দের গোলকধাঁধা পেরিয়ে—প্রস্তাবের সহজ সরল অর্থ উদ্ধার করতে বেশ কিছুটা বেগ

পেতে হয়েছিল। তার পরও কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল বিস্ময়ের আঘাতটা সামলে নিতে। বিস্ময় এদের স্পর্ধা দেখে। এমনভাবে এই কদর্য প্রস্তাব তার কাছে এরা তুলতে পারে—তা কখনও কল্পনাও করে নি সে। তারপর—প্রস্তাবের অর্থ এবং সাহসের পরিমাণ পুরোপুরিটা মাথায় যাওয়ার পর একেবারে ফেটে পড়েছিল রাগে। ওর মা মাঝে মাঝে বলে, 'রাগে বেহ্মান্ড জ্বলে যায় বাপু তোদের কথা শুনলে।' কথাটার সম্যক অর্থ আজ বুঝল সুরো। ফলে সে সময়টায় আর যেন কোন জ্ঞান ছিল না, কোন্ কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরুনো উচিত আর কোন্‌টা উচিত নয়—সে হিসেবও নয়। নিতান্ত ঐ নোংরা জীবটার গায়ে হাত দিতে হবে বলেই মেরে বসে নি। তবে হাতে যেটা করতে পারে নি, মুখে করেছে। অকথা-কুকথা কিছু বাকী রাখে নি বলতে।

অনেক বলার পরও রাগ যায় না। যে মেয়েছেলেটি কথা তুলেছিল—সে মুখ কালি ক'রে ভয়ে ভয়ে পা-পা পিছিয়ে যাচ্ছে তখন। কিন্তু সে হুঁশ নেই সুরবালার। সে বলেই চলেছে, 'এত সাহস তোমাদের! এত আস্পদ্দা! আমি বাজারের মেয়েছেলে—তাই ভেবেছ, না? নীলামে চড়িয়ে কিনে নিতে এসেছ! টাকা! টাকা দিয়ে কিনতে চায় তোমার বাবু। কত টাকা আছে তার, কত টাকা দিতে পারে সে। টাকাই যদি চাইব তো আমার অমন কারবার ছাড়লুম কেন? গলা আর গতর বজায় থাকলে বছরে দশ-বিশ হাজার টাকা কামানো তো ছেলেখেলা! তোমার বাবুকে গিয়ে বলো, টাকা নয়—অন্য যোগ্যতা যদি থাকে তো এদিকে যেন হাত বাড়ায়। যার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে তার পায়ের ধুলো নেবারও যুগ্যি নয় ওরা কেউ।...টাকা দেখাতে হবে কেন, মনের মানুষ পেলে যেচে সেধে যাব আমি।'

একটু দম নিয়ে আবার বলে, 'বাবু নিজে এল না কেন কথাটা পাড়তে? সে সাহসে কুললো না বুঝি?...তাহলে খ্যাংরা খাওয়ার সুখটা টের পাইয়ে দিতুম। আমার এই দেহটা দেখে তো এত লালস, এই দেহের মধ্যেই পা দুটোও আছে। সে পায়ের লাথি কেমন মিষ্টি—একটু চেখে দেখত না হয়।...বেহায়া নোচ্চা কোথাকার।...বলি এত কাল তো এই নরক ঘেঁটে গেল তোমার বাবুর, তবু আশ মিটল না! কি আছে এর মধ্যে, কিসের এত নেশা! একই জিনিস, একই রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী—তবু এরই জন্যে বুড়ো বয়সে বন্ধুর সঙ্গে বেইমানি করতেও লজ্জা করে না, মনে বাধে না একটু! বাবু! ভদ্দরলোক! যাদের ছোটলোক বলেন তাঁরা—যারা মুটেগিরি ক'রে খায়—তারাও ঢের বেশী ভদ্দরলোক তোমার ঐ বাবুর চেয়ে।'...

সে মেয়েমানুষটি অবশ্যই এত কথা শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই তখনও, সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বাগান দিয়ে হনহন ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। তবু ওপরের বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলে সুরো, 'খবরদার আর কোনদিন এ ফটক্ পেরোবে না বলে দিলুম। দারোয়ানকে বলা থাকবে, এবার আর মেয়েছেলে বলে রেয়াৎ করবে না—গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। ছিঃ! ছিঃ!...বুড়ো হয়ে মরতে চললে, তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে—এখনও কটা টাকার জন্যে কুটনীগিরি ক'রে বেড়াচ্ছ! কেন, গঙ্গায় কি জল নেই না একগাছা দড়ি জোটে না—গলায় দিয়ে ঝোলবার জন্যে।'

আরও বহুক্ষণ ধরে গজরাতে থাকে সুরবালা, চেষ্টা ক'রেও যেন থামতে পারে না। যে অসহ্য উষ্মা গলা অবধি ঠেলে উঠেছে তা যেন একটা অগ্নিকাণ্ড বাধাতে না পারা পর্যন্ত আর স্বস্তি পাচ্ছে না। ভয়ানক কিছু করতে ইচ্ছে করছে একটা। সেই লোকটা—যে এই নরকের কীটটাকে পাঠিয়েছে—তাকে খুঁজে বার ক'রে আর কিছু না হোক—আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারলে তবু এই মুহূর্তে কিছুটা শান্তি পেত। আসলে এই প্রস্তাবের পিছনে যে ইঙ্গিত আছে—সেইটেই ওকে এত বিচলিত এত উত্তপ্ত করেছে। বাজারের আর পাঁচটা দেহ-পণ্যা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই পর্যায়ে ওকে

দেখছে এরা, হয়ত সবাই আজ তাই দেখছে! দাম দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার জেনেই চড়া দাম হে'কেছে। এর মধ্যে যে দোষণীয় কিছু আছে—তা তাদের ভাবার কথাও নয় হয়ত।...মনের মধ্যে যে বোধটাকে সে এড়িয়ে চলতে চায়—সেই রূঢ় বাস্তব-সচেতনাটাকে যেন জাগিয়ে দিয়ে গেল ঐ মেয়েছেলেটা। মনে করিয়ে দিয়ে গেল যে, সে রাজাবাবুর রক্ষিতা ছাড়া আর কিছু নয়।...

কিছু বলবে না বলেই ঠিক ক'রে রেখেছিল—কিন্তু রাত্রে রাজাবাবু এসে ওর মুখ দেখেই বুঝলেন যে একটা ভয়ানক কিছু ঘটে গিয়েছে। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো থমথম করছে সুরোর মুখখানা। একটু ভয়ে ভয়েই শুধোলেন, 'কিগো, কি হ'ল আবার? মুখ অমন কেন?'

প্রতিজ্ঞা তো ছিলই—সে কোন কথা গোপন করবে না ওঁর কাছে, মিথ্যা বলবে না। এমনিও মিথ্যা আসত না তার বিশেষ। আজও পারল না চেপে রাখতে। খুলেই বলল অপরাহ্ণের ঘটনাটা, বলতে বলতে দু চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে গেল তার। উষ্মা বাষ্পে পরিণত হ'ল। আজও রাজাবাবু সস্নেহে তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে কোঁচার খুঁটে জলটা মুছে নিলেন, তারপর শান্ত-কোমল কণ্ঠে বললেন, 'এই! এর জন্যেই অভিমানিনীর চোখে জল এসে গেল। তা এতে আর এত রাগের কি আছে। এ তো ভাল কথাই, তোমার কত দাম তা তুমিও বুঝতে পারছ—আর দাম যেভাবে বাড়ছে খুশী হবারই তো কথা!'

চকিতে চোখে আগুন জ্বলে উঠল আবার সুরবালার। সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তাহলে তোমার কাছেও এই দাম আমার। টাকাতেই দাম। এতদিনে দাম বুঝছ—নীলামে অনেক ডাক উঠছে বলে?'

'ছিঃ!' ওকে আবার বুকের মধ্যে টেনে নেন রাজাবাবু, 'তা আমি বলি নি। ওটা আমি ঠাট্টা করছিলুম। কিন্তু তোমার এত রাগ করার কি আছে? ওদের কি চিনতে পারো নি সেদিন? ওরা যা জানে, যে দাম দিতে শিখেছে—সেই দামই দিতে চায়। তোমার দাম ওদের বোঝবার কথা নয় সুরো। আমিই কি বুঝতুম—রাধারাণী বুঝিয়ে না দিলে?'

তারপর একটু হেসে বলেন, 'ওদের যে নেশা ধরেছে তা আমি জানি। শিগ্‌গিরই যে নীলাম শুরু হয়ে যাবে এও জানতুম। তুমি যেদিন প্রথম বলেছ শুধু-হাতে তাগাপরা ঝি এসেছিল একজন—সেই দিনই জানি কেন এসেছিল সে, কেন আসবে আবারও। আরও যে আসবে তাও বুঝেছিলুম। আমার কিন্তু রাগ হয় নি, এখনও হচ্ছে না। হাসি পাচ্ছে বরং।...যে জিনিসটার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে ওরা—সে জিনিসটা যে কি, কত দাম তার, তা জানে না। জানলে, চিনতে পারলে একথা তুলত না। ঐ মাগীগুলোকেও পাঠাত না।'

'তুমি জেনে-শুনেও চুপ ক'রে আছ!...এই সব বন্ধু তোমার! লুকিয়ে তোমার মেয়েমানুষ হাত করতে চায়!...হ্যাঁ, ও আর ভটচায্যির পত্তর-আড়ালে দরকার নেই, আমি তোমার বাঁধা মেয়েমানুষ বৈ আর কিছু নই—সে তুমিও বেশ জানো, বাকী সকলেও তা জেনেছে! আমি বোকা বলে নিজেকে একটু অন্য রকম ভাবতুম। অথচ আর কিছুই ভাবার নেই—এ ছাড়া কীই বা পরিচয় আমার। তবু বাঁধা মেয়েমানুষ এক দিক দিয়ে ঘরের বোয়ের মতোই—তাকে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া কি বন্ধুর কাজ?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রাজাবাবু, তারপর খোঁচাটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'বন্ধু ওরা কেউ নয় আমার, পরিচিত এই পর্যন্ত। ব্যবসার সম্পর্কই ওদের সঙ্গে বেশী। মুখের বন্ধুত্ব। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু কেউ একাজ করলেও আশ্চর্য হতুম না। তুমি নিজেকে বোধহয় আয়নায় ভাল ক'রে দ্যাখো নি—দেখলে বুঝতে পারতে। তোমাকে দেখে

লোকে পাগল হবে, সেইটেই স্বাভাবিক। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আর পাগল কোন্ কালে বিবেচনা ক'রে কাজ করে বলো।...তা নয়। দোষ আমারই, কবুল করছি। তোমার আমার যা সম্পর্ক—তা ওদের বোঝার কথা নয়। তোমাকেও চেনা বা বোঝা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। সাধারণ যা তাই ভেবেছে।...আমিও, একটু বাহবা নেবার লোভ সামলাতে পারি নি—হিংসেয় ওরা ছট্‌ফট করবে, হিংসেয় আর লোভে—এই-ই চেয়েছিলুম, একটু মজা দেখব বলে। তখন তোমার কথাটা ভাবি নি, অথচ ভাবা উচিত ছিল। আর কখনও এ ভুল করব না, এইবারটি মাপ করো।'

সুরবালা ওঁর মুখে হাত চাপা দেয়, 'আবার ঐসব নাটুকে কথা!'

তবে তার পর থেকে সুরোর মাথাও আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঐ বিশেষ ধরনের ঝিয়েদের আগমন বন্ধ হ'ল না—বলাই বাহুল্য। প্রথম দিন যে এসেছিল সে ধৃষ্টতার কি হাল হয়েছিল তা অবশ্যই সে ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করে নি—এরা কেউই অপর কারও কাছে নিজেদের কথা বলে না। এদের কারবারে মন্ত্র-গুপ্তি বিশেষ-প্রয়োজন।

দ্বিতীয় দিনে প্রথমেই যার আগমন—সে নামকরা উকীল রসিক ঘোষের লোক। অরও ঐ এক কথা। অনেক বাগাড়ম্বরের মধ্যে থেকে যা বোঝা গেল—সুরো চায় তো তিনি চৌরঙ্গীতে বাড়ি ক'রে দেবেন ওকে। টাকার ভাবনা নেই ঘোষ সাহেবের—মাসে লাখ টাকা রোজগার তাঁর। বিশ্বাস না হয়—বাড়ি কিনতে কি করতে দেরি হয়—যত টাকা বলবে সুরো, আগাম নগদ ধরে দেবেন তিনি। আর গয়না? মুখের কথা খসাবার ওয়াস্তা। লাবচাঁদ মতিচাঁদে গিয়ে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন ঘোষ সাহেব, যত খুশি যা খুশি উঠিয়ে আনুক সুরবালা।

সুরো মুচকি হেসে বললে, 'না, টাকা-কড়ি চাই নে। বাড়ি হলেই হবে। তবে আমার মনের মতো বাড়ি। আমি যে বাড়ি বলব সেইটে কিনে দিতে হবে।'

'এক্ষুনি, এক্ষুনি', দূতী উৎসাহিত হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে, 'তাতে কিছু আটকাবে না। দরকার হয় দু-এক হাজার বেশী দাম দিয়েও কিনে দিতে পারবে। শুধু একবার মুখের কথা খসানো, ব্যাস। তাহ'লেই হবে।...আমি তাহ'লে এই কথাই গিয়ে বলি আমাদের সাহেবকে?'

'বলো। কোন্ বাড়ি চাই সেটাও বলে দিও। বলো যে লাটসাহেবের বাড়িটা ভারী পছন্দ আমার। আর কিছু চাই না, হীরে-জহরৎ কিচ্ছু না। শুধু ঐ বাড়িটা কিনে দিন, তাহ'লেই হবে।'

নিমেষে ম্লান হয়ে যায় মেয়েছেলেটি। আশায় উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল ইতি-মধ্যে, ধীরে ধীরে আবার ব'সে পড়ে। বলে, 'তুমি তামাশা করছ দিদি!'

'মোটেই না, তামাশা করব কেন? এ কি তামাশার ব্যাপার? টাকার কথা যেখানে সেখানে কেউ তামাশা করে?...কী এমন বলেছি যে তোমার তামাশা মনে হ'ল? এত টাকা তোমার সাহেবের—এটুকু খরচ করতে পারবে না? না হয় লাখ টাকা কি দু লাখ টাকাই খরচা হবে। ইংরেজ জাত তো, বেশী টাকা পেলে চাই কি মহারাণীর বাড়িও বেচে দেবে।'

'না বাপু। তোমার রকম সকম ভাল নয়। আমার সন্দ হচ্ছে মসকরাই করছ এতক্ষণ ধরে। এ তোমার রাজী না হওয়ারই কথা।'

'ধরেছ? ধরে ফেলেছ? খুব বুদ্ধি কিন্তু তোমার—তা মানতেই হবে। তবে আমি তামাশা করছি না একটুও। যে কথা সে-ই কাজ আমার। সাহেবকে গিয়ে বলো, যে দিন লাটসাহেবের বাড়িটা কিনে দেবেন—সেই দিনই তাঁর বাঁদীর খাতায় নাম লেখাব!...যাও, এখন মানে মানে সরে পড় দিকি, মিথ্যে বকালে এতক্ষণ ধরে। সাহেবকে গিয়ে বলো যে

পঁচিশ মঙ্গের প্রাণ নিয়ে আমাকে কিনতে আসা তাঁর ঠিক হয় নি, আমার দাম কিছু বেশী। মিছিমিছি বামনের হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়া—এ ধাষ্টামো ছাড়া কিছু নয়।'

সে মেয়েছেলেটি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এল দত্তসাহেবের লোক। সুরো তারও কথা সব ধৈর্য ধরে বসে শুনল, তারপর বলল, 'ওমা. দত্তসাহেব তোমাকে পাঠিয়েছেন? আমি তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি যে। দত্তসাহেবকে আমার বড্ড পছন্দ। তার জন্যে কিছু নয়—তবে আমি এক কথার মানুষ বাপু। সেকালের রাজকন্যেদের স্বয়ম্বরের মতো আমিও এক পণ ক'রে বসে' আছি। সাহেবকে বলো, আর কিছু নয়—ঐ লাটসাহেবের বাড়িখানা যে কিনে দিতে পারবে—আমি তারই চিরকেলে বাঁদী হয়ে থাকব। সাহেবকে গিয়ে বলো —তাঁর যা টাকা—তাঁর কাছে এ কিছুই না, সামান্য জিনিস।'...

পরের দিন এল মেছোবাজারের রাজা কন্দর্পনারায়ণের লোক। টাকা হয়ত অত নেই —দত্তসাহেব কি হালদারসাহেব কি ঘোষসাহেবের মতো, মানে কাঁচা রোজগার তো নেই, জমিদারীর যা আয়—তবে রাজাবাহাদুর পরম সুপুরুষ, বয়সও বেশী নয়—গান-বাজনায় ওস্তাদ। ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেরা পর্যন্ত তাঁর জন্যে পাগল। তিনি কোনও দিন কোন থিয়েটারে যাবেন শুনলে আগেই ফিমেল-সীট ভর্তি হয়ে যায়। আর টাকাও—ওদের মতো না থাক, একেবারে খুব কমও নেই। বাড়ি গয়না কিছুই আটকাবে না দিতে, যা বলবে সুরো তাই দিতে রাজী আছেন তিনি।...তাছাড়া অত বড় বংশের ছেলে, বিস্তর লেখাপড়া জানে, বড়লাটের দরবার থেকে শুরু ক'রে বড় বড় রাজামহারাজার মজলিশে—সর্বত্র ডাক পড়ে। আর তেমনি মিষ্টি ব্যবহার, ঠেকার দেমাক এক রত্তি নেই। একবার তাঁর সঙ্গে কথা কইলেই সুরবালা বুঝবে কী দরের মানুষ তিনি।

সুরবালা মুখ টিপে হেসে বলে, 'কথা না কয়েও জানি আমি। ওঁর কথা কে না জানে বলো। দুটি ক'রে বাঁধা মেয়েমানুষ থাকে ওঁর—তাছাড়া দুচোকোরব্রত—নিত্যি নতুন। থিয়েটারের সখীরা কেউ বাদ নেই, শুনেছি রামবাগান সোনাগাছি সব শেষ হয়ে গেছে—এখন খোলার ঘরের বস্তিতে গিয়ে ওঁর গাড়ি দাঁড়ায়।'

বলতে বলতেই কঠিন হয়ে ওঠে সুরবালার কণ্ঠ, বলে, 'শোন বাছা, তোমাকে একটা গল্প বলি। অনেকদিন আগে আমার এক দাদার কাছে শুনেছি। বহুবার বলেছেন গল্পটা। কে এক নাকি রণজিৎ সিং ছিলেন পাঞ্জাবের রাজা—তাঁর কাছে একটা দামী হীরে ছিল কোহিনুর বলে। অত বড় আর অত দামী হীরে নাকি ভূ-ভারতে আর নেই।...একবার কোম্পানীর কে একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—পাথরখানার দাম কত? রণজিৎ সিং জবাব দিয়েছিলেন—পাঁচ জুতি। মানে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না, গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিতে হবে—জুতো মেরে নিতে পারলে তবে নেওয়া যাবে।...আমার দাম আর একটু বেশী—আমি নোব শও জুতি। না, গায়ের জোর লাগবে না, একটু বেহায়া হলেই হবে। রাজাবাহাদুর প্রথম যেদিন আসবেন—একঘর লোকের সামনে আগে আমি তাঁকে গুনে গুনে একশ ঘা জুতো মারব—তাতে যদি তিনি রাজী থাকেন, আসতে বলো।'

এই দুঃস্পর্ধায় ঝিয়ের মুখও লাল হয়ে ওঠে, ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'তাহ'লে তোমার দাম সেই হীরের চেয়েও বেশী বলো!'

'নিশ্চয়ই। আমার কাছে আমার দাম বেশী হবে বৈকি! আমি তো কাউকে কেনার জন্যে খোশামোদ করছি না। তবে যদি কারও সে শখ হয়—আমার দামই দিতে হবে।'

'এত অহঙ্কার ভাল নয় বাছা, ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে।...একটু হস্বিদীর্ঘি জ্ঞান রেখে কথা বলো, হাজার হোক মান্যিবর ভদ্দরলোক। রূপযৌবন দু দিনের—তার জন্যে এত দম্ভযিা ভাল নয়।'

'হস্বিদীর্ঘি জ্ঞান রেখে বলেছি। মান্যিবর ভদ্দরলোক হয়ে যে পরের মেয়েমানুষ চুপি চুপি ফুসলে হাতাতে চায়—তাকে আবার খাতির কি!...আর অহঙ্কার? হ্যাঁ,

রূপ-যৌবন দুদিনের বলেই তো এই বেলা অহঙ্কার ক'রে নিচ্ছ। যেদিন থাকবে না—সেদিন হাজার মিষ্টি কথা বললেও তোমার ঐ রাজাবাহাদুর ফিরে তাকাবে না। যদ্দিন আছে তেজ দেখাব বৈকি!...নাও, ঢের হয়েছে, সরে পড়ো দিকি এখন!'...

রাজাবাবুর কানে এ সব কথাই ওঠে। সব হয়ত বলে না সুরো, উনি অনুমান ক'রে নেন। আরও আসবে—এমনি কুটনীর দল, এও শেষ নয়—তা তিনি জানেন। কলকাতার ধনী-মহলে সাড়া পড়ে গেছে। উঠেছে ঈর্ষার ঢেউ। প্রৌঢ় রাজাবাবুর সৌভাগ্যে ঈর্ষার সীমা নেই। সকলেই চাইছে সে সৌভাগ্যের আশু অবসান। সকলেরই লোভ ঐ রূপসী তরুণী মেয়েটির ওপর—যে এই বিগতযৌবন লোকটিকে উন্মত্তের মতো ভালবেসে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিজে ঘুচিয়ে দিয়েছে।

সুরবালা সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা নেই রাজাবাবুর, হারাবার ভয় নেই আর তাঁর। তাকে যে অবিরাম বিরক্ত করছে, আরও কী পরিমাণ করবে—দুশ্চিন্তা সেই জন্যে। সাধারণত এসব নোংরা কথায় তিনি থাকতে চান না—এসব প্রসঙ্গ চট ক'রে কেউ পাড়েও না তাঁর সামনে—কিন্তু এবার সুরবালার মুখ চেয়েই নিজে থেকে পাড়তে হ'ল কথাটা। কন্দর্পনারায়ণেরই একটা শৌখীন থিয়েটারের দল আছে—বড় বড় লোকেরা সে দলের সভ্য, প্রচুর টাকা ওঠে ; তাঁরা মাইনে দিয়ে ভাল গাইয়ে আর মেয়েদের পার্ট করার জন্যে সুশ্রী চেহারার মেয়েলি স্বভাবের ছোকরা পোষেন বারো মাস। বেছে বেছে ভাল ছেলেই নেন তাঁরা, ভাল অ্যাক্‌টারও, সে জন্যে দলের খুব নামও ছিল।

নিয়মিত চাঁদা দিলেও রাজাবাবু সে ক্লাবে যেতেন কদাচিৎ। ওসব তাঁর কোন কালেই ভাল লাগে না, বাইরের সম্ভ্রম বা ঠাট বজায় রাখতে চাঁদা দেওয়া। কিন্তু এর মধ্যে এক-দিন সেইখানেই গেলেন গরজ ক'রে। সুরবালাকে বলেই বেরিয়েছিলেন দুপুরে যে—ফিরতে অনেক রাত হবে। এসব ধনী ব্যক্তির সন্ধ্যাই হয় রাত নটার পর, তার আগে কারও দেখা পাবার কোন আশা নেই।

ক্লাব জমে উঠতে একথা-সেকথার পর রাজাবাবু জোর ক'রেই সুরবালার প্রসঙ্গ পাড়লেন। বললেন, সাধারণভাবে দু-তিন-জনের দিকে চেয়ে, 'মহা জ্বালাতনে পড়েছি ভাই। কলকাতা সুদ্ধ কুটনীর দল মনে হচ্ছে চাকরি পেয়ে গেছে এবার, আমার মেয়ে-মানুষটিকে ভাঙ্গাবার চাকরি। অবিশ্যি লাঞ্ছনারও শেষ থাকছে না—যারা যাচ্ছে, মুখের মতো জুতো খেয়ে ফিরে আসছে—কিন্তু মেয়েটা সারা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে বকে আর বক্‌নি দিয়ে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সকলেরই ঐ এক কথা। তাও তো সোজাসুজি কথাটা পাড়ে না কেউ, বিস্তর বাজে কথা কয়ে তবে আসল কথাটা ভাঙ্গে। এত বাজে কথা বসে কে শোনে বলো দিকি! বেচারীর একটু বিশ্রাম হয় না। তাছাড়া, ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে, ভারী তেজী, ভারী সোজা। এসব কথা ওর একেবারেই পছন্দ হয় না—রাগ ক'রে ক'রে শরীর খারাপ হয়ে যায়। বলেও ফেলে যা-তা!'

তারপর একটু থেমে বলেন, হেসে না হোক, হাসির ভঙ্গী ক'রে, 'জানে না তো ওকে, জানলে ও চেষ্টাই কেউ করত না। পয়সার লোভে আমার কাছে ও আসে নি, রূপ যৌবন ঘরবাড়ি—কিছুর জন্যেই না। পয়সা ও নিজেই কামাতে পারত ঢের, ঘরবাড়ি—আর বছর দু বছর এ লাইনে থাকলে একখানা নয়, অনেক কখানাই করতে পারত।...ও আমার ইষ্ট দেবীর আশীর্বাদ, আমার সাধনার ফল। ওকে টাকা দিয়ে কিনতে যাওয়াই তো মুখ্যুমি। কুবেরের ঐশ্বর্য দিলেও ওকে বাঁধতে পারবে না কেউ—ও সাক্ষাৎ রাধারাণীর কোন সখী, কী পাপে ছিটকে এসে মাটিতে পড়েছে—ভগবানের নাম ক'রে আর ভালবেসে প্রায়শ্চিত্ত করছে—সাধারণ মেয়ের হিসেবে ওকে দেখতে গেলেই ভুল হবে।'

কথাগুলো শ্রোতাদের ভাল লাগার কথা নয় ; সকলেই মুখ কালি ক'রে নীরব হয়ে রইলেন। দূতীদের মারফৎ সব কথা কানে না গেলেও—অত কটু কথা অন্নদাতাদের মুখের

ওপর বলতে সাহস হয় নি তাদের—অনেক কথাই শুনেছেন তাঁরা, ধরা দেবার ধন যে নয় তাও বুঝেছেন ভাল ক'রেই—সেই জন্যেই রাজাবাবুর কথাগুলো নিজের দুর্লভ সৌভাগ্যের অহংকার তো বটেই, তাঁদের প্রতি টিটকিরি হিসেবেও গ্রহণ করলেন তাঁরা। মুখ কালি হয়ে উঠল আরও সেই জন্যে।

তবে—যে কারণেই হোক, সুরবালার ওপর হামলাটা বন্ধ হ'ল এবার। সে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কটু কথা ওদের যতই শোনাক, যতই শোধ নিচ্ছে মনে করুক—গ্লানিবোধটা কিছু কম হ'ত না, প্রতিবারই কাঁটার মতো বিঁধত এই সব প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত তথ্যটা।

মাঘের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন নানু এসে হাজির।

'এই ওঠ, তৈরী হয়ে নে। আমার সঙ্গে যেতে হবে এখুনি—'

সুরবালা অবাক। কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়েই থাকে নানুর মুখের দিকে। বহুদিন এদিকে আসে নি সে, আজ এতকাল পরে এসেই এ কি প্রস্তাব? সুরবালা যে বড় একটা কোথাও যায় না—চেনামহলে তো নয়ই—তাও তো জানে নানু।

'হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস কি, ওঠ ওঠ—এমন সুযোগ আর পাবি না, জন্ম সার্থক করার এ সুযোগ। আমি বলে এক-গাদা পয়সা খরচ ক'রে পুরো গাড়ি ভাড়া ক'রে ছুটে এসেছি।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই তো বলো নি এখনো। কোথায় যেতে হবে, কেন কী বিত্তান্ত—কিছুই তো শুনলুম না!'

'অ। কৈফিয়ৎ না দিলে যাবি না বুঝি? এমনি বিশ্বাস ক'রে আমার সঙ্গে যাওয়া যায় না—যেখানে খুশি? এত অবিশ্বাস দাসে তব?'

'তা বাপু একটু ভয় করে বৈকি!' হেসে ফেলে সুরবালা, 'যা মোহন নটবর নাগর তুমি—কন্দর্পকান্তি, যদি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আর ফিরতে ইচ্ছে না হয়? আমার এ মানুষটার কি দুর্দশা হবে?'

'বেঁচে যাবে, ও মানুষটা বেঁচে যাবে, বুঝলি? তোর মতো খাণ্ডারনী মন্দ মেয়ে সামলাতে ওর পেরাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে, খোঁজ নিয়ে দেখগে যা!...নে, ঢের হয়েছে। সাদাসিধে কাপড় পরে নে একখানা। আজ আমাদের থিয়েটারে স্বামীজী আসবেন—জি-সি অনেক ক'রে বলে ব্যবস্থা করেছেন। এ সুযোগ আর পাবি না জীবনে। ওরে, সাক্ষাৎ মহাদেব—সাক্ষাৎ শঙ্কর, জি-সি বলেন। আগুনে তৈরী মানুষটা, দেখলেই মনের সব গ্লানি কেটে যায়, সব পাপ দূর হয়ে যায়। উনি আসবেন শুনেই আমার আগে মনে পড়ল তোর কথা। চ, চ।'

সুরবালা আর দ্বিরুক্তি করে না। নানুর সঙ্গে কোথাও যেতে ভয় নেই তার। রাজাবাবুও কিছু বলবেন না—ওর সঙ্গে গেছে জানলে। তিনিও ভালবাসেন ওকে, সুরোর মুখে ওর কথা বিস্তর শুনেছেন, বলেন, 'ঐ রকম ন্যালাক্ষ্যাপার মতো ঘুরে বেড়ায়—মানুষটা সাচ্চা, সে আমি বুঝে নিয়েছি সেই একদিনেই।'

সুরো তাড়াতাড়ি একখানা শাড়ি পালটে বেরিয়ে এল। গাড়ি এখন নেই, রাজাবাবু ফিরে যেন গাড়ি থিয়েটারে পাঠিয়ে দেন—দারোয়ানকে নির্দেশ দিয়ে নানুর ভাড়াটে গাড়িতেই রওনা হয়ে গেল। থিয়েটার আরম্ভের এখনও দেরি আছে, কিন্তু নানুর আর দেরি করা চলবে না, সেই জন্যেই এত আগে এসেছে সে।

বহুকাল পরে আবার থিয়েটার। আর এ-মুখো কখনও হবে না—প্রতিজ্ঞা ক'রে রেখেছিল, থিয়েটার দেখতেও আসে নি কোনদিন এর মধ্যে, কিন্তু আজকের কথা আলাদা। স্বামীজীর কথা রাজাবাবুর মুখেও শুনেছে সে। চারুদা কত গল্প করেছেন। চারুদার কে আত্মীয় হন নাকি। চারুদাও এই কথাই বলেন, 'সাক্ষাৎ পাবক, আগুন। সামনে এসে

দাঁড়ালেই মনের ময়লা পুড়ে যায়।' বলেন, 'স্বয়ং শিব পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। রামের গুরু শিব, এবার সাধ ক'রে রামের শিষ্য হ'তে জন্মেছেন।' সেই মানুষকে দর্শন করার ভাগ্য কোনদিন হবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। নানুদার কাছে ঋণ বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন।

অভিনয় দেখতেই এসেছিলেন স্বামীজী। খানিকটা দেখার পর দুই অঙ্কের মাঝখানে জি-সি ভেতরে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের ঘরে। সকলে প্রণাম করতে এগিয়ে গেল—সুরোর সে কথা মনেই নেই। সে অবাক হয়ে দেখছেই শুধু ওঁকে। এত রূপ যে মানুষের হয় তা জানত না, কখনও ভাবতে পারে নি। ন্যাড়ামাথা গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর এমন রূপ, কল্পনারও অতীত। তবু রূপই বড় কথা নয়। রূপের সঙ্গে এমন জ্যোতি মিলতেও এর আগে দেখে নি কখনও। আগুন নয়—মনে হ'তে লাগল সুরোর—সাক্ষাৎ সূর্য নেমে এসেছেন মাটিতে।

পিছন থেকে নানুর প্রবল এক চিমটিতে সম্বিৎ ফিরে এল তার। শুনল নানু ফিসফিস ক'রে বলছে, 'দেখছিস কি মুখপুড়ী। যা গিয়ে পায়ে পড়। এমন সুযোগ আর হবে না, জন্ম সার্থক হয়ে যাবে ঐ পায়ের ধুলো পেলে।'

সুরবালা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় এবার।

'হাঁ হাঁ, এসব কি করাচ্ছ জি-সি, মহামায়ার অংশ যে ওঁরা সবাই। ওঁরা পায়ে হাত দেবেন কি, ওঁরাই আমাদের প্রণম্য। ছি ছি, পায়ে হাত দিও না, পায়ে হাত দিও না মা সকল—'

গম্ভীর মেঘমন্দ্র স্বর, অথচ কি মিষ্টি, কি মধুক্ষরা। গানের মতোই কান জুড়িয়ে যায়।......স্বপ্নের মধ্যে যেন মোহাচ্ছন্নের মতো শোনে সুরবালা। একটা ঘোরের মধ্যেই গিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে। সেইভাবেই শোনে কে যেন বলছে পাশ থেকে, 'মেয়েটি এক-কালে থিয়েটার করত, এখন আর করে না। খুব ভাল কীর্তন গায়। শুধু পয়সার জন্যে গায় না, কীর্তন ভালবাসে, ভগবানকে শোনাচ্ছে ভেবে গায়—'

'তা বুঝেছি ওকে দেখেই। মায়ের কৃপা আছে যে তা দেখেই বুঝতে পারছি। ঈশ্বরে মতি রতি দুই-ই আছে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে মা, ভগবানকে পাবে, সন্তান-রূপে তোমার কোলে আসবেন তিনি। তোমার মধ্যে মায়ের ভাব রয়েছে।'

সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে শিউরে ওঠে সুরবালার। মনে হয় এ সবটাই অলৌকিক, জাদুর খেলা।......

এমন ক'রে কি মনের কথা, মনের বাসনা জানা সম্ভব? তবে কি এ সন্ন্যাসী সত্যিই অন্তর্যামী শঙ্কর?

আজ কদিন ধরে সত্যিই মাঝে মাঝে এই কামনাটা দেখা দিচ্ছে মনের মধ্যে—সন্তানের কামনা। মনে হয় একটা ফুটফুটে বাচ্চা যদি থাকত তার তো বেশ হ'ত।

আজ—এই খানিকটা আগেই কেন কে জানে মনে হচ্ছিল, স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে মনে মনে একটা সন্তানই প্রার্থনা করবে। তারপরই নিজেকে শাসন ক'রে নিয়েছিল অবশ্য, তবু ইচ্ছাটা বুঝি থেকেই গিয়েছিল।

আর সেটা ঐ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখ এড়ায় নি।

ওর জন্যে বাড়ি খোঁজ করেছেন রাজাবাবু—বাড়ি কিনে দেবেন বা তৈরী করাবেন এমনি একটা ভাসাভাসা কথা শুনেছিল সুরবালা—কার মুখে কী ভাবে তাও আজ আর মনে নেই—সে বাড়ির কি হ'ল বা কবে হবে—কোনদিন জিজ্ঞাসা করে নি রাজাবাবুকে। সে সম্বন্ধে সত্যিই ওর কোন কৌতূহল ছিল না। রাজাবাবুকে পেয়েছে সে, তাঁকে সুখী করতে পেরেছে. নিজেও সুখী হয়েছে—সেই তো ঢের। নিজের সুখের চেয়েও রাজাবাবুর সুখ বড় কথা। তাঁর সুখেই ওর সুখ। তিনি যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবে। ওর জন্যে যা ভাবার তিনিই ভাববেন।

তাছাড়া এই নির্জনবাস এখন অনেকটা সয়ে গেছে। ভালই লাগে বরং। কলকাতার মেয়ে—জন্মে পর্যন্ত ঘিঞ্জি বসতি আর সংকীর্ণ গলি, এই দেখে আসছে। এত গাছপালা জীবনে কখনও দেখে নি। ফুল তবু কিছু কিছু দেখেছে ফুটে থাকতে, অনেকেই টবে ফুলগাছ আজ্জায়. কিন্তু গাছে ফল ধরে থাকে, গাছেই পাকে—জীবনে এই প্রথম দেখল। আগে ভয়-ভয় করত, করত একটু আবছা হয়ে এলেই—এখন বেশ ভাল লাগে। এরা যেন আপন হয়ে গেছে. অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে—এই গাছপালা, তাদের ফুল ফল. তাদের ছায়া, তাদের ডালে ডালে পাখীর বাসা. পুকুর দুটোর কালো নিস্তরঙ্গ জল। চিন্তা শুধু ছিল মায়ের জন্যেই. সে ব্যবস্থা রাজাবাবু করেছেন. সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছে. আর মাথা ঘামায় না। যখন খুব মন-কেমন করে—মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে, খেয়ে আসে মায়ের হাতে।

হ্যাঁ. সে ব্যবস্থাও নানুই করেছে।

নিজের যেতে সাহস হয় নি। মাসকতক যেতে নানুকেই ধরেছে সে—মায়ের জন্যে বড্ড মন খারাপ লাগছে. যেমন ক'রেই হোক মাকে ঠান্ডা করুক নানু।

নানু তো একপায়ে খাড়া বলতে গেলে। এদের মায়ে-ঝিয়ে বিচ্ছেদটা তারও ভাল লাগছিল না। ভাল লাগছিল না আরও এই জন্যে যে, মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে সুরো যে আদৌ শান্তিতে নেই—তা সে জানে। সে প্রকৃতির নয় সুরো, প্রেমে পাগল হয়েছে সত্যি কথা—তাই বলে বেইমান নয় সে।

অবশ্য মুখে বলেছে, 'তা আমায় বলছিস কেন? মেয়ে মায়ের কাছে যাবে—তার মধ্যে পর-লোক একটা নাক সেঁধোবে কেন? তুই-ই চলে যা না সটান......ওরে মা কি সন্তানের ওপর বেশীদিন রাগ ক'রে থাকতে পারে? না সন্তানের অপরাধই মনে থাকে তার? কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—এ তো বুড়ীকে আমিই শুনিয়ে দিয়েছি—সেই-দিনই। তুই যা, গিয়ে পায়ে পড়. সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই কি তোর জন্যে কম কাঁদছে তুই মনে করিস?'

কিন্তু সুরোর অত সাহস হয় নি। নিদারুণ সঙ্কোচে বেধেছে। সে যা করেছে যা বলেছে—তার নাম ক'রে যা বলা হয়েছে—তারপর একা গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে না সে। মনে করলেই বুকের মধ্যে কেমন করে। অগত্যা নানুই নিয়ে গিয়েছিল। আগের দিন নিজে গিয়ে বুড়ীকে বুঝিয়ে তৈরী ক'রে রেখে এসেছিল খানিকটা। প্রথমটা নিস্তারিণী জ্বলে উঠেছিল খুবই. গালাগালির ঝড় বইয়েছিল যথারীতি—রাজাবাবুর কাছে পয়সা নিচ্ছে ঠিকই, তবু মেয়ের অপরাধ ভুলতে পারে নি, তার বাক্যির ঘা শুকোয় নি এখনও নিস্তারিণীর বুকের মধ্যে। ঐ মেয়ের মুখ দেখবে কে আবার? কখনও না। ...নানুও মানুষ চেনে. সে চুপ ক'রে শুনে গেছে প্রথমটা, মনের জ্বালাটা বেরোবার পথ পেয়ে একটু শান্ত হতে বোঝাতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে তবে উঠেছে।

রাজী হতে হয়েছিল নিস্তারিণীকে। মুখে যাই বলুক, গরজ তারও বড় কম ছিল না। সত্যিই এক বিচিত্র কারণে গণেশের থেকেও সুরো তার প্রিয়। গণেশকে না দেখাটা তার গা-সওয়াও হয়ে গিয়েছে খানিকটা—এতদিন সুরোকে না দেখে তার খুবই কণ্ট হচ্ছিল। বুকের মধ্যেটা নিরন্তর হুহু করত।

সুরো গিয়ে নতমুখে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে নিস্তারিণী বকেছে যত, কেঁদেছে তার চেয়ে বেশী। গালাগালও দিয়েছে। এত দিনের যত জ্বালা যত বেদনা উজাড় ক'রে দিয়েছে কটু বাক্যে—তবে তার মধ্যেই বুকে টেনে নিয়ে ছেলেমানুষের মতো আদর ক'রে চুমো খেয়ে অস্থির ক'রে তুলেছে। তাই কটু কথায় কোন জ্বালা অনুভব করে নি সুরো, বরং কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হ'ল—মায়ের বুকের জ্বালা এতদিন পরে কিছুটা প্রশমিত হবার সুযোগ পেল—বলে এক ধরনের আনন্দই বোধ করেছে।

সেই থেকে মধ্যে মধ্যে দুপুরবেলা একবার ক'রে ঘুরে যায় সুরো, পনেরো বিশদিন অন্তর। দুপুরবেলা আসে—যে সময়টা পাড়ার সকলে ঘুমোয়, অন্তত বাড়ির মেয়েরা —জানলায় কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে সবিদ্রূপ ধিক্কার বর্ষণের সম্ভাবনা থাকে না। কোন কোন দিন—যেদিন মায়ের হাতে খেতে ইচ্ছে হয় আগে থাকতে দারোয়ান মারফৎ বলে পাঠায়। সেদিন একটু আগে আসেও, সাড়ে বারোটা একটার ভেতরে পেঁাছে যায়।......

ওর আসা-যাওয়াটা সহজ গা-সওয়া হয়ে যেতে নিস্তারিণী অবশ্য অনেক প্রশ্ন করেছে; খোঁজখবর নিয়েছে—হাঁদা মেয়েটাকে আগাগোড়াই ঠকাচ্ছে আধবুড়ো মিন্‌সেটা, না—ভবিষ্যতের কিছু ব্যবস্থা ক'রে নিতে পেরেছে সুরো? সে কথাটা আদৌ ভাবে কি একবারও? এদিকের রোজগার তো বন্ধ হয়ে গেল, এখন তো যা কিছু করে এই 'রূপ-যৈবন'—তা সেটা গেলে কি খাবে, কী হাল হবে সে কথাটা একটু ভাবা উচিত তো! বুড়ো যেদিন মরবে কিম্বা ছোবড়া সার ক'রে সরে পড়বে, সেদিন কি দাঁড়াবে অবস্থাটা?

সুরো এ সবের উত্তর দেয় না। এসব কিছু ভাবেও না সে। যা হোক মাথাগোঁজার জায়গা তো একটা হয়েছে—নিচে যা ভাড়া আছে তাতে আর কিছু না হোক টেক্স-খাজনা ছোটখাটো মেরামতের খরচ চলেই যাবে। এর বেশী ভাববার আছেই বা কি? খাক না খাক—পড়ে থাকতে তো পারবে।...আর পেটে খাওয়া? সে এক রকম ক'রে হয়েই যাবে। শাকভাতের আর কত খরচ, শরীর বাঁচানো নিয়ে তো কথা। তাও না জোটে, না হয় উপোস ক'রেই মরবে। তার জন্যে কে কোথায় কবে মরে গেলে তার কি হবে—এখন থেকে আর অত ভাবতে পারে না।

তবে একজন ভেবেছেন দেখা গেল। রাজাবাবু।

হঠাৎই একদিন সুরবালা শুনল যে তার বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে। মনের মতো বাড়ি পান নি বলে জমি কিনে বাড়ি তৈরী করিয়েছেন, তাইতেই কিছু দেরি হয়েছে। অবশ্য সুবিধেও হয়েছে তাতে, ইচ্ছেমতো করিয়ে নিয়েছেন। দুখানা পাশাপাশি বাড়ি। একটায় বাস ক'রে আর একটা ভাড়া দিতে পারবে।

এবার পুরো খবরই পেল। কোথায় বাড়ি, কত বড়, কখানা ঘর—কতটা জমি, সব। অনেক ভেবে কাজ করেছেন রাজাবাবু। পুরনো পাড়া থেকে অনেক দূরে জমি নিয়েছেন, ও পাড়ায় থাকলে নিত্য বিস্তর পরিচিত লোকের টিটকিরি সইতে হবে। দর্জিপাড়ার দিকে এ জায়গাটা, সব রকম বাসিন্দায় মেশামেশি। সব দিক বিবেচনা ক'রেই এখানে জমি কেনা ঠিক করেছিলেন। রাজাবাবু মুখে কিছু বলেন নি কিন্তু সুরো বুঝেছিল—এই পাড়া নির্বাচনের কারণটা। ওর বাড়িটা যেখানে হ'ল তার একদিকে সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকদের বাস, আর একদিকে কস্বর পতিতালয়। সুরোর বাড়িটা ঠিক দুইয়ের মাঝা-মাঝি পড়ল। একেবারে 'খারাপ পাড়ায়' বাড়ি নিলে সুরো আঘাত পেত—তার মন বিদ্রোহ

করত। আবার নিছক ভদ্রপল্লীতে গেলে হয়ত কেউ কেউ—অপমান না করুক—উপেক্ষা করত, নীরব অবজ্ঞায় ধিক্কৃত করত।

বাড়ি দুটোই মাঝারি আকারের—সামান্য একটু ছোট-বড়। সুরোর জন্যে যেটা ঠিক করেছেন, দক্ষিণমুখো—সেটার ওপরে তিনটে নিচে তিনটে ঘর, ওপর-নিচে বাথরুম ইত্যাদি, তেতলায় রান্না-ভাঁড়ার। দারোয়ান শোবার মতো একটা ঘেরা চলন আছে নিচে, তার মালপত্র রাখার জন্যে সিঁড়ির নিচেটায় ঘরের মতো দরজা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশের বাড়িতে ওপর নিচে আটখানা ঘর, ছোট ছোট রান্নার জায়গা অনেকগুলো, ভেবে চিন্তে এক এক ফালি জায়গা বার ক'রে করা হয়েছে—খুচরো ভাড়াটের জন্যে। এ ব্যবস্থা কেন—সে প্রশ্নের উত্তরে একটু আমতা আমতা ক'রেই রাজাবাবু জানিয়েছিলেন, 'ও পাড়ায় খুচরো একখানা ঘরের ভাড়াটে অনেকে এমনি ঘর খোঁজে, তাতে ভাড়াও বেশী পাওয়া যায়। মানে গোটা বাড়িটা ভাড়া দিলে কত আর পাবে—ধরো চল্লিশ টাকা বড় জোর, সে জায়গায় আলাদা আলাদা ভাড়া দিলে নিচের ঘর আট টাকা ওপরের ঘর দশ টাকা ক'রে—বেওজর পাওয়া যাবে।'

সুরোর সুন্দর ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এসেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই. 'ও পাড়ায় একানে ঘর খোঁজে কারা—মেয়েছেলে? মানে আমার লাইনের মেয়েরা?'

'আহা, তা কেন—' অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন রাজাবাবু, ব্যস্ত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'ইচ্ছে হয় ওভাবে দিও, না হয় দিও না। যা তোমার মরজি। ভাড়াটে সব রকমই আছে ওখানে।' তারপর বলেছিলেন, 'তোমার লাইনের বলছ কেন সুরো, তোমার কোন লাইন নেই—তুমি একেবারে আলাদা। ভগবান তোমার ছাঁচে এই একটিই মানুষ গড়েছিলেন, তারপর সে ছাঁচ ভেঙ্গে গেছে। নইলে এতদিন ধরে জমি দেখছি, বাড়ি করাচ্ছি, তুমি একটি দিনও জিজ্ঞেস করো নি, জানতে চাও নি—কী করছি, তোমার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা, তুমি কবে আবার কলকাতায় যেতে পারবে। একটা কথাও তোল নি কোনদিন। আশ্চর্য! সত্যিই বলছি, তোমার মতো মেয়ে আমি কাউকে দেখি নি। মেয়েছেলে যে এমন হয় তা জানতুম না। আমার ঘরের বৌও—আমার অবর্তমানে তাঁর কি ব্যবস্থা হবে, পষ্টাপষ্টি না হলেও আকারে ইঙ্গিতে কথাটা তুলেছেন এক আধবার। অথচ তাঁর নিজের নামে যা কোম্পানির কাগজ আছে, আর সিন্দুকভরা যে পরিমাণ গয়না—তাতে একটা বড় পরিবার পঞ্চাশ বছর বসে খেতে পারে অক্লেশে।'

সুরবালা সামান্য একটু হেসেছিল, কথাটা চাপা দেবার—ওকে ভোলাবার এই ব্যাকুল প্রয়াস দেখে। আশ্চর্য! এখনও এই মিথ্যা অহঙ্কারের মোহটা ঘুচতে চায় না। এখনও ওদের থেকে নিজেকে একটু পৃথক, একটু স্বতন্ত্র ভাবতে ইচ্ছে করে, ভাবতে ভাল লাগে। ভদ্রতার, সম্ভ্রান্ততার, ব্রাহ্মণত্বের একটা স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কারকে আঁকড়ে থাকতে চায় মন। রাজাবাবুর অনেক বিবেচনা, যখনই তার জন্যে কোন কিছুর ব্যবস্থা করেন, তার এই অহঙ্কার এই মিথ্যা বিশ্বাসে না ঘা লাগে—সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। তবু কতটাই বা বাঁচাতে পারেন তিনি, কতদিনই বা বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন? তার চেয়ে সত্যটাকে সোজাসুজি মেনে নেওয়াই তো ভাল। শব্দগুলো কানকে আঘাত করে, মন যন্ত্রণায় কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে কথাগুলো কানে গেলে—তবুও এইটেই এবার থেকে শোনাতে বিশ্বাস করাতে হবে নিজেকে যে, সে রাজাবাবুর রক্ষিতা, বাঁধা মেয়েমানুষ।

বেশ কদিন পরে তাই রাজাবাবু যখন কুণ্ঠিতভাবে ভয়ে ভয়ে আবার প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন, 'তাহলে সরকার মশাইকে বলেই দিই, আলাদা খুচরো ভাড়াটে না বসিয়ে একানে একঘর—একটা ফ্যামিলিই দেখতে—কী বলো? বরং দু'চার দিন বেয়ে চেয়ে দেখতে বলি, যদি একটু বেশী ভাড়া ওঠে—অন্তত পঞ্চাশ? সেই কথাই বলে দিই—'

'না না, কেন?' সুরো একটু বেশীই জোর দিয়েছিল গলায়, বলেছিল, 'যা বলেছিলে

তাই থাক। ভাড়াটে গেরস্তই দিই আর বাজারের মেয়েছেলেই বসাই—আমি যা তা-ই থাকব। আমি তাদের সঙ্গে মিশছিও না, তার কথাও নেই।'

বাড়িই যে শুধু নতুন হ'ল তা নয়, গোটা বাড়িটা আনকোরা নতুন আসবাবে সাজালেন রাজাবাবু। খাট বিছানা আলমারী লোহার সিন্দুক বুককেস, টেবিল চেয়ার সোফা—সমস্ত ফরমাশ দিয়ে তৈরী করানো হ'ল। খাট আলমারি বুককেস এল ল্যাজারাসের বাড়ি থেকে। রাধাবাজার থেকে খাস বিলাতী ঝাড় কেনা হ'ল, বেলজিয়ামের আয়না, ভাল সোনালি ফ্রেমে বাঁধা। ভাল ভাল ছবি কেনা হ'ল—শ্বেতপাথরের পুতুল। ঘড়ি এল হ্যামিলটনের বাড়ি থেকে। বাগানবাড়িতে যখন নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন সুরবালাকে—তখন আলাদা বা নতুন কোন ব্যবস্থা করার সুযোগ পান নি, তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার অবসর মেলে নি। সেই ক্ষোভ বা খামতিটাই এবার সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নিতে চান। কিছুতেই যেন আশ মেটে না তাঁর, সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে সবচেয়ে ভাল জিনিস কিনেও মন ভরে না। মনে হয় এও ঠিক ওর উপযুক্ত হ'ল না, আরও ভাল হ'লে তবে ওকে মানায়। গৃহপ্রবেশের দিন পুজোয় বসার জন্যে কাশী থেকে তাসার বেনারসী আগেই আনিয়ে রেখেছিলেন—সমস্ত জমিটা জরিতে বোনা। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে লাবচাঁদ মতিচাঁদের দোকান থেকে ঐ শাড়ির সঙ্গে মানানসই হীরের গয়না কিনে দিলেন। সুরবালা অনেক প্রতিবাদ করল, রাগারাগি করল, 'তোমার কি হয়েছে কি, মাথায় ভূত চেপেছে নাকি? এত খরচ করছ কিসের জন্যে! বাড়ি হ'ল—আসবাবেরও মানে বুঝি—এখান থেকে এগুলো নিয়ে গেলে এখানের জন্যে আবার নতুন কিনতেই হ'ত—না হয় ওখানেই নতুন হ'ল, কিন্তু এর ওপর আবার এক রাশ গয়না কিসের জন্যে?'

'সবই নতুন হচ্ছে যখন—নতুন গয়না না হলে তার সঙ্গে মানাবে কেন! তা ছাড়া ও তো চাই-ই। এতেই বা কি হবে, আরও ঢের কিনতে হবে এখন।' প্রশান্ত মুখে উত্তর দেন রাজাবাবু।

'কেন?' সুরবালা আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'কিছু তো একটা সংস্থান ক'রে রেখে যেতে হবে। আমার জন্যে অমন রোজগারটা ছাড়লে—সেটার অন্তত কিছু তো পুষিয়ে দিতে হবে আমাকে। হঠাৎ যদি মরে যাই কোনদিন—এইগুলোই তো তখন সম্বল হবে—।'

সজোরে নিজের আঁচলটা রাজাবাবুর মুখে গুঁজে দেয় সুরো, 'ফের ঐসব অলুক্ষুণে কথা! আর যদি কোন দিন ইশারাতেও বলো—এসব গয়না নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব বলে দিচ্ছি। তারপর তোমার সামনে মাথা কুটে মরব।'

হাঁপিয়ে উঠে কাপড়টা মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজাবাবু হেসে বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না। কিন্তু মরতে তো একদিন হবেই—এ তো জানা কথা। সে তুমিও জানো! তবে আর কথাটা উচ্চারণ করতে দোষ কিসের? আচ্ছা, গয়না না হয় এমনিই হ'ল। তোমাকে এসব গয়না পরিয়েই কি আশ মেটে? তোমার যুগ্যি গয়না—তোমাকে যা মানায়—তা ওরা করতেই পারে না।'

যথেষ্ট ঘটা করেন রাজাবাবু গৃহপ্রবেশে। কিন্তু সুরবালার মনটা একটু ভার হয়েই থাকে। তার যারা যথার্থ আপন, দুর্দিনের বন্ধু—সেই শশীবৌদিদের বলা গেল না, তাঁরা আর সম্পর্ক রাখবেন না—বলেই গিয়েছিলেন। দুর্গামাদেরও বলতে সাহস করল না সুরো, যদি 'না' বলেন? আগের পাড়ায় অন্য জানাশুনো কাউকেই বলতে পারল না ভরসা ক'রে। এমন কি ও বাড়ির ভাড়াটে বৌটিও এল না, পেটের অসুখের অজুহাত দিল। 'অজুহাত' যে তা বোঝাই গেল, অথচ কীই বা বলবার আছে। তারা কায়স্থ কিন্তু বিবাহিত স্বামী স্ত্রী।

আপসোস একটা থেকেই যায় বৈকি! একটা সূক্ষ্ম অনুশোচনাও হয়ত—আকারহীন অস্পষ্ট—তবু অস্বীকার করার মতো অস্তিত্বহীন নয়। রাজাবাবু ওর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে নেন, ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যান। এত সমারোহের মধ্যে কোন্ চিন্তা ওকে এমন ক্লিষ্ট করে রেখেছে তা অনুমান করা কঠিন নয় তাঁর কাছে। তবে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করেন না আর, বৃথা সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করেন না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লাগবে সেটা।

অবশ্য মতিদের বলে এসেছিল সুরো নিজে গিয়ে। যা কখনও করে না, মতির ভাষায় 'বামনাই-পনা' বিসর্জন দিয়ে পায়ে ধরে মাপ চেয়ে এসেছিল মতির কাছে, দুটো হাত ধরে বলে এসেছিল আসবার কথা। মতি এখন যেন কেমন অথর্ব হয়ে পড়েছে, বড় একটা গাইতে যায় না কোথাও, পুরনো ঘর থেকে কেউ এসে পীড়াপীড়ি করলে এক-আধ দিন যায় হয়ত—বসে বসে গায়, সেই রকমই বলা থাকে। এখানে অবশ্য এল—কষ্ট হ'লেও। সুরো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ছুটে গিয়ে নিজে নামিয়ে আনল, ধরে ধরে ওপরে তুলল। পুরনো দোয়ার-বাজনদারদেরও আসতে বলেছিল, নিজেদেরও মতিরও—তাদের প্রত্যেককে এক প্রস্থ ক'রে ধুতি-চাদর দিল, তার সঙ্গে নগদ পাঁচটা ক'রে টাকা। এ অবশ্য সবই রাজা-বাবুর ব্যবস্থা। এতেও মনে আসে ওঁর—সুরবালা মনে মনে ভাবে—এ রকম বিবেচনা, সকলের দিকে সমান নজর—এমন আর কারও দেখে নি।...মতির সহিস কোচোয়ানকে পর্যন্ত কাপড় টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মতির জন্যে সুরবালাই ভাল কালা-পাড় দুধেগরদ আনিয়ে রেখেছিল। পাছে মতি ধৃষ্টতা ভাবে বা অহঙ্কার মনে করে, এই ভয়ে সে কথাটা তুলতে পারে নি। শান্তিজল নেবার সময় পাট ভেঙে পায়ের দিকটা ঢেকে দিলে সেটা দিয়ে। মতি অবশ্য খুশী মনেই নিয়ে গেল কাপড়টা, 'আ গেল যা, এনেই ছিলি যখন—আগে বললি নি কেন, পুজোর সময় পরে বসতুম! তোর কাছ থেকে নেব, এতে আর সঙ্কোচ কি, এ তো আমার পাওনা লো! গুরুপ্রণামী!'

এবার নিস্তারিণীও এসে উঠল এখানে, পাকাপাকিভাবে। সুরোই বুঝিয়ে বলল, 'এতগুলো ঘর—সব তো পড়েই থাকবে। একা থাকতে ভয় ভয় করবে। বাড়ির মধ্যে ভাড়াটে দেওয়াও অশান্তি, বরং তুমি এখানে চলে এলে ও বাড়ির ওপরতলাটাও ভাড়া দেওয়া চলবে।'

শেষের যুক্তিটাই মনে লাগল নিস্তারিণীর। সবই যখন মেনে নিয়েছে সে, তখন আর ঠাটটুকু বজায় রেখে লাভ কি। মিছিমিছি দোকর খরচা। বাড়িভাড়াটা লোকসান তো বটেই, একা থাকে বলে একটা দিন-রাতের ঝি রাখতে হয়েছে, সেও একটা অকারণ খরচ। ওদিকে সুরবালাকেও একাধিক ঝি-চাকর রাখতে হবে, এই একই কারণে। সে এখানে চলে এলে চাই কি তা'ও কিছু কামানো যাবে।

পুরনো আসবাব, যেগুলো নিস্তারিণী নিজে ব্যবহার করত, সেইগুলোই কিছু আনা হ'ল—বাকী সব দান ক'রে দিল সুরবালা। নিস্তারিণী বিক্রীর প্রস্তাব করেছিল, সুরো রাজী হয় নি। বলেছে, 'ছিঃ! ব্যবহার করা জিনিস—কটা টাকার জন্যে কি আবার বিক্রী করব, কে কোথায় নিয়ে যাবে, কি ভাবে ব্যবহার করবে—! জানাশুনো লোককে দিলে, কে নিলে জানাই থাকল।' পুরনো দোয়ারদেরই বেশির ভাগ ডেকে দিয়ে দিল সব।

আর পুরনো আসবাবের মধ্যে এল বাগানবাড়ির সেই খাটটা, যাতে প্রথম দিন সুরো আর রাজাবাবু শুয়েছিলেন, এতদিন যাতে শুয়ে আসছেন। সুরো বলল, 'এটা আমি ছেড়ে যাব না, আবার এখানে কোন্‌দিন কাকে এনে তুলবে, আমার কোন্ সতীনকে—তাকে নিয়ে এই খাটে শুয়েই আমোদ স্ফূর্তি করবে—সে আমার সইবে না। ওটাও বাড়িতে থাকবে, পাশের ঘরে পেতে রেখে দোব ; যখন তুমি থাকবে না, দুপুরবেলা কাজে বেরোবে কি কোন দিন বাড়িতেই আটকে যাবে, রাণীকে নিয়ে মজা ক'রে রাত কাটাবে,

সেইদিন কি সেই দুপুরগুলোতে এই খাটে শোব, তোমার গয়ের গন্ধ পাব এই বিছানা থেকে, অন্তত আমার মনে হবে যে, তোমার গায়ের গন্ধ এতে লেগে আছে। তোমার গায়ের কত ঘাম এই তোশকে লেগে শুকিয়ে আছে—ওর ওপর শুলে তবু মনে হবে তুমিই আমাকে ছুঁয়ে আছ।'

রাজাবাবু হেসেছিলেন। সুখে প্রেমে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ ছল-ছল ক'রে এসেছিল। আবেগবিকৃত ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এখনও তোমার সতীনের ভয়! আমার বয়স কত হ'ল সে খেয়াল আছে? তোমার মতো পাগল এত বেশী নেই দুনিয়ায় যে, আমার মতো বুড়োকে ভালবাসবে, তার জন্যে সবকিছু খুইয়ে বসে থাকবে!'

'পাগল নেই, সেয়ানা আছে!' টক্ ক'রে জবাব দিয়েছিল সুরো, 'টাকার জন্যে তোমার ঘর করবে—এমন মেয়ে কম নেই এ কলকাতা শহরে, ইচ্ছে হ'লে দু'পায়ে জড়ো করতে পারবে।...আর তুমি? মুনির মন যখন একবার টলেছে, আর একবার টলাতে কতক্ষণ?'...

একটা কথা খুব সসংকোচে জানিয়েছিল সুরবালা রাজাবাবুকে, 'এ বাড়িতে তো এত ঘর—আমার খুব ইচ্ছে নানুদার জন্যে নিচের একটা ঘর ঠিক ক'রে রাখি, যখন খুশি এসে থাকবে।...তুমি কি বলো—অন্যায় হবে?'

'অন্যায় হবে কেন? বা রে। আর এত কিন্তুই বা হচ্ছে কেন। বাড়ি আমার নয়, তোমার। তোমার ভাইকে তুমি থাকতে দেবে, এতে কার কি বলবার আছে! ও তোমার নিজের ভাইয়েরও বেশী—তা আমি জানি।'

সুরবালা নিশ্চিন্ত হ'ল। চিন্তাটা কেন মাথাতে এসেছিল তা সে জানে না, এ বাড়ি দেখে পর্যন্তই তার এই একটা শখ হয়েছে। একটা ঘর সে নির্দিষ্ট ক'রে রাখবে নানুর জন্যে। সত্যি কথাই বলেছেন রাজাবাবু, সে তার যা করেছে নিজের ভাইও করে না কারও। নিজের ভাই তো খবরই রাখে না, দেয়ও না—কোথায় আছে, কেমন আছে তাই জানায় না। নানুকে দাদা বলা সার্থক হয়েছে তার। উপকার নেওয়ার তো অন্ত নেই, ঋণের বোঝা বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। এই তো ও বাড়ির ভাড়াটে বসানো নিয়েই বোঝা গেল, কতটা তার কথা ভাবে নানু। সে-ই রাজাবাবুর সরকারমশাইকে নিবৃত্ত ক'রে নিজে ভাড়াটের ব্যবস্থা করেছে। থিয়েটারের মেয়ে খুঁজে খুঁজে এনে বসিয়েছে, চেনা মেয়ে, দেখেশুনে ভালমানুষ দেখে দেখে। তার সব থিয়েটারেই যাতায়াত আছে, চেনেও সে সবাইকে। রাজাবাবুকেই কারণটা খুলে বলেছে, এমনি ছুটকো মেয়ে ভাড়া দিলে—যদি দু-তিন মাস কারও 'বাবু' না থাকে, ভাড়া দিতে পারবে না। উল্টে তাকেই হয়ত খাওয়াতে হবে। একটা মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে দেখলে কিছু চুপ ক'রে হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে না। সে সব পেশাদার বাড়িউলীদের পোষায়, তারা দুর্দিনে ধার দেয়—সুদিনে বুকে বাঁশ ডলে চতুর্গুণ আদায় ক'রে নেয়। টাকায় তিন-চার টাকা পর্যন্ত সুদ উশুল হয়। থিয়েটারের মেয়েদের বাঁধা আয় আছে তবু একটা—পনেরো হোক বিশ হোক 'ঠেঙিয়ে বাড্ডে' মাইনেটা পাবেই মাসে মাসে। বাবু না এলেও শুকিয়ে মরবে না একেবারে। তাছাড়া তাদের বাবুর অভাবও হয় না থিয়েটারের দৌলতে। আর—নানু যতদিন আছে—ভাড়াও আদায় দেওয়াতে পারবে সে। দরকার হয় তো থিয়েটারে থেকেই মাইনে আট্‌কাবে।

নিচের একখানা ঘর একানে খাট আল্‌না আয়না দিয়ে সাজিয়ে নানুকে একদিন ডেকে পাঠাল সুরবালা, বলল, 'এখানে আজ শুয়ে বউনি করতে হবে তোমাকে। এই তোমার ঘর রইল, যেদিন খুশি যতদিন খুশি এসে থেকে যেয়ো। অমন ক'রে আর থিয়েটারের সত্তিক জাতের লোকের পায়ের ধুলোর ওপর শুয়ে থাকতে হবে না, হাজার লোকের মাড়ানো শতরঞ্চিতে।'

'ওরে ওটা কি অভাবে শুই? ওটাই স্বভাব আমার। তুই-ই তো ভাল জানিস...তা

হোক, তোর এখানেও শোব মধ্যে মধ্যে এসে। তবু তো একটা ঘর দিলি আমাকে, নিজের মায়ের কোল ছাড়া এই প্রথম একটা আস্তানা জুটল তবু ভাগ্যে।...হতভাগাটার কথা মনে ক'রে একটা ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিস—শোব বৈকি, মাঝে মাঝে এসে ঠিকই শোব। তবে শুই না শুই, এ কথাটা কখনও ভুলব না রে। তোর মাকে জননী বলা সার্থক হ'ল আমার!'

তারপরই স্বভাব-সুলভ ভাঁড়ামিতে ফিরে যায়, 'তা তো হ'ল, ঘর দিচ্ছিস, খাট-বিছানা কিনেছিস, তা খাটে শোবার লোক কৈ? সঙ্গে শোবে কে? সেটা দিতে পারবি? কাঙালকে তো খুব শাকের ক্ষেত দেখাচ্ছিস, তারপর? বসতে পেলেই লোকে শুতে চায়, তা জানিস না?...যদি তোকে বলি এই খাটে এসে আমার পাশে শুতে, পারবি?'

'তুমি বললে স্বচ্ছন্দে শোব নানুদা। জানি তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট হবে না কোনদিন। কারুরই অনিষ্ট করতে পারবে না তুমি!'

'বটে, এতদূর! এটুকু ক্ষমতাও আমার নেই বলতে চাস! এতই অকম্মা আমি? খুব বিশ্বাস তো আমার ওপর!' তারপরই থিয়েটারী সুরে বলে ওঠে, 'দেবি, কে কহিল ক্লীব আমি! হ'তে পারি দীনতম দীন—আজ্ঞার অধীন তব, সামান্য সেবক—তবু অকর্মণ্য এতদূর নহি আমি, রাণী!'

হাসে সুরবালা। হাসি-হাসি মুখেই ওর চোখের দিকে চেয়ে বলে, 'আচ্ছা, একটা কথা ঠিক-ঠিক বলবে নানুদা, আমার সম্বন্ধে তোমার কোনদিন কোন লোভ হয় নি? বলো না সত্যি ক'রে, আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়।'

যেন চমকে ওঠে নানু। নিমেষের জন্যে বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখখানা। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে মনের ঢেউ-ওঠা আলোড়নটা একটু সামলে নিয়ে বলে, 'কে বললে লোভ হয় নি! রক্ত-মাংসের মানুষ তো! তোর দিকে চাইলে পাথরের পুরুষও নড়ে-চড়ে বসবে। লোভ হয়েছে বৈকি। তবে সে লোভ আমি দমন করতে জানি। শিখেছি চেষ্টা ক'রে, ঠেকে। এই যে এত মেয়ের সঙ্গে মিশি, তাদের গায়ে হাত দিই—তাদেরও কারুর ওপর কি কোনদিন লোভ হয় নি? নিশ্চয় হয়েছে। তবে কি জানিস, এটা আমি বুঝেছি ওদিকে চেষ্টা করলে আমার কোন সুবিধে হবে না কোনদিন—ছোঁকছোঁকানি সার। মিথ্যে মনোকষ্ট। আমার যা চেহারা—ভাল কেউ বাসবে না সহজে, বাসলেও হয়ত হাজারে একটা তেমন পাগল মেয়েছেলে থাকতে পারে। তার চেয়ে ছেন্দাটুকু আছে, পাগলা বলে স্নেহ করে সবাই—এই-ই ভাল। বেশী লোভ করতে গিয়ে দুকূল খুইয়ে লাভ কি বল্?'

দুজনাই চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ। নতুন খাটের পালিশকরা কাঠে একটা চড়ুই পাখীর ছায়া নড়ছে—সেইদিকে চেয়ে থাকে দুজনেই। খানিক পরে সুরো আবার বলে, আস্তে আস্তে, 'আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এই টানটা কি ধরনের? অন্যরকমে আমাকে চেয়েছিলে পাওয়া সম্ভব নয় বলে, চুপ ক'রে আছ—সেই টানটাই রয়ে গেছে, না কি বোনের মতোই দ্যাখো সত্যি সত্যি? না অন্য কোন চোখে দ্যাখো?'

'কেন বল্ তো—আজ তোর এই বেয়াড়া কথাবার্তা? মতলব কি তোর? এখনও কি মানুষ বদলাতে ইচ্ছে আছে নাকি, তাই বাজিয়ে দেখছিস?' ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে নানু।

তারপর বলে, 'সত্যি বলব? অন্যরকম যাকে বলছিস—সেভাবে পেলে হয়ত একদিন ধন্য হয়ে যেতুম, জীবন সার্থক হ'ল ভাবতুম। তবে সে চেষ্টা কোনদিন করি নি। তোর কাছে কাছে থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করব, ওখানকার কালি না গায়ে লাগে—তোর যাতে ভাল হয় তাই করব—এইতেই খুশী ছিলুম। কাছে এলে ভাল লাগত, তোরও যাতে ঘেন্না না করে অন্তত, সেইজন্যেই প্রাণপণে তোর উপকার করতে চেষ্টা করেছি। শুধু

যখন মনটা খুব উচাটন হ'ত, সামলাতে পারতুম না কিছুতেই—তখন তোকে এড়িয়ে চলতুম প্রাণপণে। পাঁচ-সাত দিন ডুব দিয়ে বসে থাকতুম—তোর ধারে-কাছে আসতুম না। কিন্তু এখন সে ভাবটা চলে গেছে। এখন সত্যিকারের একটা স্নেহ এসে পড়েছে, ছোটদের ওপর যেমন বড়দের পড়ে তেমনিই। অবিশ্যি আগে শ্রদ্ধা—স্নেহটা পরে এসেছে। তোকে তো বলেছি, আমার বৌ আর তুই—এ-দুজন অন্য সব মেয়ের থেকে আলাদা আমার কাছে। এখন যে স্নেহ—এটা যে কি তা বলতে পারব না, আমিই ঠিক জানি না। কখনও মনে হয় তুই আমার বোন, কখনও মনে হয় মেয়ে—ছোট্ট এতটুকু খুকী মেয়ে। বুকের মধ্যে আগলে রাখি, যাতে সংসারের দুঃখু আঁচ না লাগে, বাৎসল্যের ভাবটাই বড় হয়ে ওঠে তখন—মনের মধ্যে। আবার, হাসবি হয়ত শুনলে—মাঝে মধ্যে তোকে মা বলতেও ইচ্ছে করে। তোর কোলে শুয়ে আদর খেতে ইচ্ছে করে। আবার লালসাটাই যে পুরোপুরি গেছে—তাই কি হলপ ক'রে বলতে পারি?...তাই কি চোখে দেখি তোকে তা আমিও আজ ঠিক ক'রে বলতে পারব না, নিজেও জানি না।'

তারপরেই উঠে দাঁড়ায়, 'আচ্ছা চলি। রাত্তিরে আসব এখন। খুব রাত্তিরে তোরা ঘুমিয়ে পড়লে। দারোয়ানকে বলে রাখিস—তাড়িয়ে না দেয়। তোর ঘরে—তোর দেওয়া বিছানায় শুয়ে যাব।...অনেক বড় বড় কথা বলে গেলুম, না? থিয়েটারের লোক যে, একটু ভাবের ঘরে সুড়সুড়ি লাগালেই য়্যাই বড় বড় লেকচার বেরিয়ে আসে!'

বাড়িরও একটা আয়-পয় আছে, নিস্তারিণী প্রায় বলে কথাটা। তা এ বাড়ির আয়-পয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল সে।

এখানে আসার পর—মাস ছ'সাত পরে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে, কোথা থেকে গণেশ এসে একদিন হাজির হ'ল—খুঁজে খুঁজে।

চিনতে অসুবিধে হয় বৈকি!

এতদিন এত বাউণ্ডুলেগিরির পরও—শেষ যখন দেখেছিল সুরো, তখনও পথের লোক ফিরে চাইত তার এই ভাইয়ের দিকে, হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত। ওদের গর্ববোধ করার মতো চেহারা তখনও ছিল গণেশের। ভাই সম্বন্ধে চিরদিনই মনে মনে গর্বের সীমা ছিল না সুরবালার। যেমন রূপ তেমনি বলিয়ে কইয়ে—দরবার-জেতা ভাই তার।

কিন্তু এখন সে চেহারার চিহ্ন পর্যন্ত যেন খুঁজে পাওয়া গেল না। অমন উজ্জ্বল রঙ, যা এত উপবাস অত্যাচারেও ম্লান হয় নি এতদিন—এখনকার এই কালচে—তামাটে রঙের মধ্যে থেকে তার আভাস পাওয়াও কঠিন। গাল চড়িয়ে গেছে শুধু নয়, ভেতরে বসে গেছে বলে মনে হয়—দাঁত-পড়া বুড়োর মতো, এমন কি রগ দুটোও যেন বসা-বসা লাগে। চোখের কোলে কালি—দৃষ্টিতে সুগভীর ক্লান্তি। কানের ওপরে, রগের দুধারে দু-একগাছা ক'রে চুলে পাকও ধরেছে। এই বয়সেই যেন বুড়িয়ে গেছে একেবারে। সমস্ত শরীরে অবহেলা, অনিয়ম ও অত্যাচারের ছাপ স্পষ্ট। মনে হচ্ছে গণেশের পরিচয়ে আর কোন গাঁজাখোর জেলখানার কয়েদী এসে দাঁড়িয়েছে।

নিস্তারিণীও চিনতে পারেনি প্রথমটায়। অমন রাজপুত্রের মতো ছেলের এই 'দেহান্তর' ঘটেছে—সে কি ক'রে বুঝবে! এর আগের বারও এসেছিল অনেকদিন পরে—কিন্তু সেও রাজা-রাজড়ার ছেলের মতোই এসে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক—চিনতে পারার পর অবশ্য হেসে কেঁদে নেচেকুঁদে পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলল। তখনই থাড়াখাড়া হরিরলোট দেবার ব্যবস্থা করল, আনন্দময়ীতলায় ছুটল পুজো দিতে। সতী-মায়ের স্থানের জন্যেও সওয়া পাঁচ আনা তুলে রাখছিল, কী ভেবে পুরো একটা টাকাই তুলে রাখল। আরও কি কি মানসিক করা ছিল—মনে করতে লাগল কথার ফাঁকে ফাঁকে।

সুরবালা প্রথম দিনটা কিছুই জিজ্ঞাসা করে নি ওকে। চেহারা দেখেই বুঝেছিল যে

ওর এখন সবচেয়ে বেশী দরকার বিশ্রামের আর নিয়মিত কদিন নাওয়া খাওয়ার। দীর্ঘ-কাল সেটাই জোটে নি নিশ্চয়। গণেশও সুয়োর কথা কিছু তোলে নি। তার কারণ সে অনেকটা জেনেই এসেছে ওর কথা। কিরণের বাড়ি হয়ে এসেছে সে, তার মুখেই শুনেছে সব কথা। যা হয়ে গেছে, পুরনো ঘটনা, তা নিয়ে আর আলোচনা ক'রে লাভ কি? তাছাড়া গণেশও যে জীবনযাত্রার মধ্যে থাকে, এই ক'বছর যেভাবে কাটিয়েছে সে, যেসব লোকের মধ্যে—তার এখন এসব সুস্কার কিছু নেই আর। স্ত্রী-পুরুষের সহজ সম্পর্কই স্বাভাবিক লাগে তার কাছে।

ক্রমে ক্রমে সুরবালা সে জীবনের কিছু আভাস পেল। ওর কথাবার্তা থেকেই পেল। কিছু বা জিজ্ঞাসা ক'রে জানল, কিছু বা নিজে থেকেই বলল গণেশ। শুনল অনেক কথাই। গণেশ এর ভিতর আরও বার-তিনেক এদেশে এসেছে—কিন্তু কলকাতায় আসতে পারে নি। দক্ষিণ ভারতে ওদের আসতেই হয়—খেলোয়াড় বেশির ভাগই ঐদিকের লোক—ত্রিবাংকুর-কোচিনের লোক প্রায় সব। তাদের জন্যেই দেশে ফিরতে হয়েছে, তবে ঐখান থেকেই ফিরে গেছে আবার। একবার তো সাজ-সরঞ্জাম সব সিংগাপুরে রেখেই এসে-ছিল। মাসখানেক পরেই ফিরে গেছে আবার। মালের সংগে কিছু কিছু লোক থেকে গিয়েছিল। যাদের বাড়িতে টান কম, তাঁবুতেই যারা জীবনের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে, আশ্রয় আর প্রশ্রয় দুই-ই। তারাই জানোয়ারগুলোর দেখাশুনো করেছে সেই সময়টায়।

আর যা এসেছিল দুবার—মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বেতে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে সেখান থেকেই সরে পড়েছে। এদেশে যা বিক্রী ওদের সার্কাসের—কলকাতায় আসতে সাহসে কুলোয় নি আর। খরচটাও যদি না ওঠে—ফেরা মুশকিল হবে।

গণেশের অবশ্য খুব নাম হয়েছে ম্যাজিক দেখানোর। ওকে এক সাহেব-কোম্পানি বন্দোবস্ত ক'রে হংকং অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গিয়েছিল, জাপানেও যাবার কথা বলেছিল, গণেশ রাজী হয় নি। ইচ্ছে করলে বিলেতেও যেতে পারত—বিলেত আমেরিকায় খেলা দেখাতে পারত—কিন্তু তারা শুধু ওকেই নিয়ে যেতে চায়, বড়জোর সাহায্য করার জন্যে দু-একজন সংগী সহকারী, সার্কাসের দল নিয়ে যেতে রাজী নয় তারা—সেদেশে এরকম নড়বড়ে সার্কাস দেখলে সবাই হাসবে। কিন্তু গণেশ যেতে পারে নি। এতকালের স্বপ্ন ওর—বাঙালীর ছেলে বিলেত আমেরিকায় ম্যাজিক দেখাবে—তবু এমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিতে হয়েছিল!...তার কারণ বড্ড জড়িয়ে পড়েছে সে। স্পষ্টই খুলে বলল দিদিকে। হিমিকে ছেড়ে সে বেশীদিন থাকতে পারে না। হিমিও ছাড়তে চায় না ওকে। কীর্তি যশ প্রচার প্রতিষ্ঠা—সব আকাঙ্ক্ষা আর আশাই বিসর্জন দিয়েছে সে, দিতে হয়েছে—বাঘের-খেলা-দেখানো ঐ কুরূপা মেয়েটির জন্যে।

কলকাতায় যে আসা হয় নি—ক্রমশঃ প্রকাশ পেল—তারও আসল কারণ ঐ হিমিই। তার কেবলই ভয়—এখানে এলেই গণেশের মা জোর ক'রে ধরে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দেবে। ফুটফুটে কচি মেয়ে পেলে যদি গণেশ সেইদিকে টলে, এখানে পা আটকে যায় তার—ওদের দলে আর না ফেরে? হিমি যে দেখতে ভাল নয়—সে জ্ঞান তার নিজেরও আছে, আরও ভয় সেইজন্যেই। গণেশ সুপুরুষ, উপার্জনক্ষম, যেখানে যাবে ক'রে খেতে পারবে একরকম ক'রে—এখানে দিদির পয়সা হয়েছে কিছু সে খবরও পেয়েছে ওরা, পয়সার জোরে সুন্দর মেয়ে পেয়ে যাবে, অনায়াসে। তখনও কি আর হিমির ওপর টান থাকবে?

এবার অবশ্য গণেশ একাই এসেছে।

ওর কথার ভাবে যা বুঝল সুরবালা, একরকম পালিয়েই এসেছে। দল ছেড়ে এসেছে কিনা সেইটেই বুঝতে পারল না ঠিক। সোজা এসে কলকাতায় নেমেছে, কিন্তু তখনই ওদের খোঁজ করে নি। আগে কাশী গেছে, সেখান থেকে গয়া হয়ে অন্য পথে চলে গেছে, কিরণদের দেশে। সেখানে সাত-আট দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরেছে আবার।

খুব শান্তিতে ছিল নাকি কিরণদের ওখানে। সেখান থেকে আসতেই ইচ্ছে করছিল না। খুব সুখী পরিবার। কিরণের বৌটিও খুব ভাল হয়েছে। দেখতেও মন্দ না—সুশ্রীই বলা চলে, স্বভাবটি ভারী ভাল, শান্তশিষ্ট ভদ্র। খুব যত্ন করেছে ক'দিন গণেশকে। কিরণের মা-বাবাও খুব সুখী বৌ পেয়ে। দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে কিরণের—বড়টিই ছেলে।...কিরণের কাছেই সুরবালার বাড়ির ঠিকানা পায়। এ বাড়ির নয়, এ বাড়ির খবর তখনও সে শোনে নি—এর আগের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল, সেখানে গিয়ে ভাড়াটেদের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে এ বাড়িতে এসেছে।

সুরবালা কিরণের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। বৌটি ঠিক কেমন দেখতে হয়েছে; ছেলেমেয়েরা কার মতো দেখতে হ'ল, বাপের মতো আর কারও হাত ছোট হয়েছে কিনা; কিরণ কি করছে এখন—জমিদারীটারী দেখছে মন দিয়ে, না আগের মতো উড়ুউড়ু মন আছে এখনও? সব।...কিরণের কথা বলতে বলতে সুরবালার চোখ ছলছল ক'রে আসে। বড় ভালবাসত তাকে কিরণ, নিজের বোনের মতোই; করেওছে খুব তার জন্যে, ভূতের মতো খেটেছে। প্রথম প্রথম সেই বিজনবাসে খুব কষ্ট হ'ত—কিরণ এসে না পড়লে।...ঐ এক অদ্ভুত ছেলে, চাকরি তো নামে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলতে গেলে। নিজের ভাইয়ের চেয়ে ঢের ভাল—সুরো শেষের দিকে খোঁটা দেয় একটু।

গণেশও ছেড়ে কথা কয় না। সত্যি কথা বলতে কি, এবারে ফিরে পর্যন্ত এই প্রথম কৌতুকের হাসি ফুটতে দেখল গণেশের চোখে মুখে। সে বললে, 'ভাইয়ের চেয়ে ভাল তো হবেই, ভাইয়ে আর ভালবাসার লোকে একটু তফাৎ থাকেই চিরকাল। ভাই তো সে নয় তোর, ভাইয়ের মতো সে দেখেও না তোকে।...ছোঁড়া যে মজেছে। তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস না দিদি? ছোঁড়াটা তোর পীরিতে পাগল হয়ে গেছে যে!'

'যাঃ!' কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে ওঠে সুরবালার, সারা মুখে কে যেন পুরু ক'রে আবীর মাখিয়ে দেয়, সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'কখ্খনো না। সে ছেলেই নয় কিরণ। তুই নিজে যেমন তেমনি জগৎ দেখিস। মুখের আর কোন বাঁধন নেই, না? ঐসব কুচ্ছিত সঙ্গ ক'রে ক'রে একেবারে ছোটলোক হয়ে গেছিস!' রাগ ক'রেই বলে শেষের কথাগুলো।

কিন্তু গণেশ রাগ করে না, হেসে বলে, 'ওরে দ্যাখ, কুচ্ছিত সঙ্গ করি ঠিকই—ছোটলোকদের সঙ্গেই কাটাতে হয় দিনরাত—অশিক্ষিত আর ছোটলোক, নইলে ও কাজ করতে যাবে কেন, দেশ-ভুঁই ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে—স্রেফ মেহনৎ দেখিয়ে একমুঠো খেতে? তবে সেইজন্যই, মানুষ আমি তোদের চেয়ে ঢের বেশী চিনি। অনেক ঘাটের জল খেয়েছি এই বয়সেই—অনেক দেশ, অনেক অনেক মানুষ দেখেছি। মানুষের চোখের পলক পড়া দেখে আমরা বুঝতে পারি তার মনের কথা। যা বলেছি ঠিকই বলেছি। আর এতে হয়েছেই বা কি। যে ভালবাসে সে নিজের গরজেই বাসে।'

'কী হয়েছে তা তুই কি বুঝবি, বামুনের ঘরের গরু! তাকে আমি সত্যিকারের ছোট ভাইয়ের মতো দেখেছি, এখনও তাই জানি, আমার কাছে সে ভাই ছাড়া কিছু নয়।' তারপর একটু থেমে, তখনও উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'সে বলেছে তোকে ঐসব কথা? নিজে মুখে বলেছে?'

'তাই কি আর বলে! বলতেই বা হবে কেন? সবাই তো তোর মতো গাড়ল নয়। তুই যা বললি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—তাতেই তো বুঝে নিতে হয়। ভাই কখনও তা করে না, উল্টে শাঁসালো বোনের কাছে দুয়েই নেয়—আমার মতো।'

হাসে গণেশ। ঈষৎ একটু অপ্রতিভের হাসি। তারপর আবার বলে, 'অবিশ্যি যা বলেছে তাও বড় কম না। বলেছে যে তার শরীরটাই শুধু পড়ে থাকে ওখানে—মনের অর্ধেকটা থাকে নাকি তোর কাছে, থাকবেও চিরকাল।...তোর কথাই ভাবে সে বসে বসে—কী করছিস, কেমন আছিস। কলকাতায় কেউ লোক এলেই তোর খবর নিতে বলে।...বৌ ভাল

—মনের মতো বৌ, তা সেও স্বীকার করে—সে কথা বলতে দুঃখু দুঃখু হাসি হেসে বলে, "কিন্তু বরাতটা ভাল নয় ভাই। যতটা পাওয়া উচিত ছিল তা পেল না। বিয়ে করেছি—কর্তব্য যেটুকু ক'রে যাচ্ছি—ওকে বুঝতেও দিই নি কিছু। ও যে ভাল মেয়ে ভালবাসার মতো মেয়ে তা আমিও জানি; স্বীকার করছি কিন্তু সে ভালবাসা পুরোটা আমি দিতে পারলুম না, কোন দিন পারবও না।"...কেন পারবে না তা আমি আর জিজ্ঞেস করি নি—শুধু শুধু লজ্জা দেওয়া। যতই হোক—আমি তোর ভাই, আমাকে সব কথা বলতে লজ্জা পেত। বলবার দরকারও নেই। আমি সেবারই একটু বুঝে গিয়েছিলুম, এবার তো দেখলুমই।'

সুরবালা যেন ছট্‌ফট করতে থাকে—বিশ্বাসে আর অবিশ্বাসে। লজ্জায় আর অনুশোচনায়। আগে থেকে বুঝে সতর্ক হয় নি—এই অনুশোচনা। কোন জবাবই দিতে পারে না চট্ ক'রে।

গণেশ আবারও বলে, 'ইংরেজীতে একটা কথা আছে—জানিস তো, এধারে মুখ্যুই হই আর বামুনের ঘরের গরুই হই—ওসব দেশ ঘুরে ইংরিজী ফরাসী ওলন্দাজী সব ভাষাতেই কথা কইতে পারি গড়গড় ক'রে, বুঝতেও পারি ওদের কথা;—তা হ্যাঁ যা বলছিলুম, ইংরেজীতে বলে—হেড ওভার হীলস্ প্রেমে পড়া—পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ডুবে যাওয়া যাকে বলে,—কিরণও সেইভাবে তোর প্রেমে ডুবে আছে—হেড ওভার হীলস্।'

চুপ ক'রে থাকে সুরো। অনেক কথাই বুকের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছে। অনেক স্মৃতি, অনেক নির্বুদ্ধিতা কিরণের। এ সন্দেহ যে কখনও দেখা দেয় নি—মনের মধ্যে অস্পষ্ট আকারে—এক-আধবার, এক আধ মুহূর্তের জন্য তা নয়—কিন্তু অতটা আমল দেয় নি সে, অত অবসরও ছিল না তখন। সে তখন নিজেই প্রেমে ডুবে মজে আছে। আজও হয়ত তাই—তবে এখন সে প্রথম দিককার উন্দামতা আর নেই, জোয়ারের জল কূলে কূলে ভরে শান্ত হয়ে গেছে, থিতোবার পালা এখন।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, 'সে যে আমার চেয়ে বয়সে ছোট রে, তোরই বয়িসী হবে হয়ত, কি তোর চেয়েও বছর খানেকের ছোট।'

'তাতে কি হয়েছে। বয়স হিসেব ক'রে কে কবে ভালবাসে। তুই রাজাবাবুতে মজলি কি ক'রে? লোকে বলে তোর বাপের বয়িসী!'

প্রায় অকাট্য যুক্তি। উত্তর দিতে পারে না সুরো। দেবার খুব ইচ্ছেও ছিল না। মনটা চলে গিয়েছিল অনেক দূরে, কিরণের কাছে। হতভাগা ছেলেটা এমন ক'রে নিজের সর্বনাশ ক'রে বসে আছে! বেচারী!

আবার ভাবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আর কখনও কোন কারণে এখানে আসতে দেবে না। আগে বিয়ের পরও মধ্যে মধ্যে আসত, ইদানীং আসে নি অনেককাল—এবার এলে কটু কথা বলে গাল-মন্দ দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। তাতে যদি একদিন ভুলতে পারে।

নিস্তারিণী ছেলেকে এবার যাকে বলে—চোচাপটে ধরে পড়ল। 'এসেছিস যখন একেবারে বিয়ে ক'রে যা।'

চমকে ওঠে গণেশ, 'কী বলছ মা যা তা—আমার আবার বিয়ে কি! বিয়ে যে জন্যে হয় কি কিছু বাকী আছে! ওসব ছেড়ে দাও। ঘরবাসী করার জন্যে বিধাতা পাঠায় নি আমাকে।'

'রেখে বোস দিকি। থাম্। বয়েসকালে ওসব একটু আধটু কে না করে। তাই বলে ঘর-কন্না করবি নি কি। ওসব কোন কথাই শুনব না। এবার আমি বে দিয়ে ছাড়ব।'

'না না, ওসব পাগলামি ক'রো না', রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে ওঠে গণেশ, একটু যেন সন্ত্রস্তও, 'আজ আছি কাল নেই—কোথায় কখন চলে যাই—এই তো কত বছর বাদে ফিরলুম। সে এমন কাজ নয় আর এমন সংগও নয় যে বৌ-ছেলে নিয়ে ঘুরব। মিছিমিছি একটা ভদ্দরলোকের মেয়ে নিয়ে এসে নাজেহাল করা!'

'কেন, যাদের দলে তুই কাজ করিস—সেই বাবু—কি পেফেছার না কি যেন বলে—সে তো শুনলুম বে-করা লোক, তার বৌ-মেয়ে তার সংগে সংগে ঘোরে!'

'সে ঐ একজনই। তার দল, সে মালিক, তার ওসব শোভা পায়। আর কে গেছে বৌ নিয়ে? দলে অন্তত দুশো লোক কাজ করে—তারা সকলেই একা একা থাকে।'

'তেমনি তারা বছর দেড়-বছর অন্তর ফিরেও আসে। সে তো তোর মুখেই শুনলুম। তোকেও তো আসতে হয়েছিল তাদের সংগে। নেহাৎ ঘরে কোন টান নেই বলেই—বুড়ো মা আর একটা দিদি, তার আর টান কি, মা-বোনকে কি কেউ আর আপন ভাবে—তাই কলকাতা ফিরিস না। টান থাকলেই আসবি। বৌ না হয় এখন এইখানেই রইল। তা বলে কখনও ঘরকন্না করবি না, চিরকাল একটা আধদামড়া মাগীকে নিয়ে পড়ে থাকবি—এ আবার কি কথা! মেয়েটা তো ঐ কীর্তি ক'রে বসে রইল—একরকম বাদেছরাদেরই গেল ; তুমিও অমনি ক'রে জীবন কাটাও! পূর্বপুরুষ এক গণ্ডূষ জলও পাবে না। তোর জন্মদাতার বংশটা রেখে যা হয় কর অন্তত!'

তবুও হাল ছাড়ে না গণেশ, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, 'কত বয়স হয়ে গেল তার ঠিক আছে? চেহারারও তো এই হাল দেখছ—আর কদ্দিনই বা বাঁচব! মিছিমিছি একটা মেয়ের সর্বনাশ করি কেন! শুধু শুধু নিমিত্তের ভাগী হওয়া!'

'তুই থাম দিকি! তোর আবার বয়েস কি? কত লোক পঞ্চাশ-ষাট বছরে দোজবরে তেজবরে বিয়ে করছে! তুই এত বুড়ো হয়ে গেলি একেবারে? ওসব বাজে কথা শুনছি না, বিয়ে আমি এবার তোর দোবই।'

গণেশ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখনকার মতো কথাটা চাপা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিস্তারিণী ছাড়ে না। ঘরের দরজা আটকে দাঁড়ায়। বলে, 'একবার ছাড়া পেলেই পালাবে তুমি, আবার হয়ত লম্বা ডুব মারবে। তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি আমাকে কথা দিয়ে—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গেলে যাও, তবে ছাড়ব।'

অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে গণেশ, বলে, 'আচ্ছা, দিব্যি গালছি, এই এখন, আজ অন্তত পালাব না। রাত্তিরে ঠিক ঘুরে আসব। আমায় একটু ভাবতে দাও নিদেন। বিয়ে বললেই বিয়ে—এ কি কচিখোকা আছি এখনও! ভবঘুরে লোক—চাল নেই, চুলো নেই—দেশভুঁই পর্যন্ত নেই বলতে গেলে, কোথায় কখন থাকি তার ঠিক নেই—সারা জীবনটাই বেদের টোল ফেলে থাকা এক রকম—বিয়ে ক'রে বসব কি? এ কি ছেলেখেলা, না তামাশার জিনিস! একা যা খুশি করি—কিছু ভাববার নেই, পুরুষ-মানুষ সাবালক—সে আলাদা

কথা। একটা মেয়েকে জড়ানো—'

আরও অনেক কথাই বলে গণেশ কিন্তু নিস্তারিণী নাছোড়বান্দা। শেষে ছেলের পায়ের কাছে ঢিবঢিব্ ক'রে মাথা খুঁড়তে শুরু করে। ভয় দেখায় যে, না খেয়ে এই দরজা আগলে পড়ে থাকবে তিন দিন—তেরাত্তির করবে। তারপরও ছেলে যদি বিয়ে না করে তো সেও যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে, গঙ্গায় গিয়ে ডুববে ; মা গঙ্গার বুকে এখনও জলের অভাব হয় নি।

বিপন্ন গণেশ সুরোর মুখের দিকে তাকায়।

'দিদি, তুইও কি এই দলে?'

সুরো জোর ক'রে কিছু বলতে পারে না। গণেশকেও না, মাকেও না। অন্য ব্যাপার হ'লে জোর করত, এ ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। গণেশের অবস্থা সে বোঝে কতকটা—কিন্তু মায়ের কথাটাও উড়িয়ে দেবার নয়। সে বিপন্ন কণ্ঠে বলে, 'মায়ের কথাটাও ভেবে দ্যাখ খোকা। আমার দ্বারা তো কোন সাধ-আহ্লাদই পুরল না। তাছাড়া বাবার একটা জল-পিণ্ডির ব্যবস্থাও আছে। সেটাও যদি হয় কিছু—। বৌ না হয় তোর আমার কাছেই থাকবে, আমি বেঁচে থাকতে তার খাওয়া-পরা-থাকার কোন অভাব হবে না। তুই যদি অন্তত মাঝে মাঝে আসিস, দু-একটা ছেলেমেয়ে হয়—তাহলেও মা তবু ভুলে থাকতে পারে। আবার তার সংসারটা বজায় হয়। আর চাই কি, যদি ছেলেমেয়েই হয় কিছু—এদিকে মায়া পড়তে বাধ্য। তখন চেষ্টা করলে এদেশেই রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা হ'তে পারবে। চিরদিনই যে এমনি ক'রে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হয়ে কাটাবি, জীবনটা এমনিভাবে নষ্ট করবি ইচ্ছে ক'রে—তারই বা কি মানে! মায়া সেখানেও যেমন পড়েছে, এখানেও তেমনি পড়তে পারে। এই কি খুব সুখে আছিস তুই খোকা, সত্যি ক'রে বল দিকি নি!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গণেশ বলে, 'জানি না, যা খুশি করো তোমরা। তবে, না করলেই ভাল করতে এ কাজ। আমাকে যে কোনদিন ঘরবাসী গেরস্ত করতে পারবে তা মনে হয় না। মিছিমিছি—আমার জন্যে অনেকেই কষ্ট পেলে, আবার হয়ত ঐ একটা একরত্তি নিষ্পাপ মেয়েকে ধরে আনছ কষ্ট দেবার জন্যে।'

'আমার জন্যে অনেকেই কষ্ট পেলে' গণেশের কথাটার মধ্যে যে কোন বিশেষ অর্থ আছে তা বোঝে নি সুরবালা। কথার কথা বলেই ভেবেছিল। সে অনেকের মধ্যে নিজেরাও আছে মনে করেছিল। সাধারণভাবে ব্যর্থ জীবনের আক্ষেপোক্তি।

কিন্তু অর্থ একটা সত্যিই ছিল।

কথাটা গণেশের মনের এক গোপন বেদনাকোষে জমা হয়ে ছিল, সঞ্চিত হয়ে ছিল অনেকদিন ধরেই ; আজ অনেক দুঃখে, অনেকখানি বিচলিত হবার ফলেই বেরিয়ে এসেছে।

গণেশের ইতিহাস বেশির ভাগই জানে না এরা। জানা সম্ভব নয়। ওর জীবনের বহু নাটকই এদের অজ্ঞাতে অভিনীত হয়েছে। বহু ভালবাসা ওকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল, ভবঘুরে নোংরা বেদেনী থেকে ভেল্‌কিওলা জাদুকরের বৌ পর্যন্ত—কামরূপ কামাখ্যার পাণ্ডার ঘরের ব্রাহ্মণ-কন্যা থেকে আসামের পাহাড়ী অঞ্চলের অবোধ আরণ্য নারী—অনেকেই। তাদের অভিশাপে লিখিত হয়ে আছে সে সব ইতিহাস। মানুষগুলো যাই হোক তাদের ভালবাসায় খাদ ছিল না। ছিল না বলেই তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস অভিশাপে পরিণত হয়েছিল।...

ওর রূপই কাল হয়েছিল, সেই মেয়েদের। রূপ হাসি আর কথা বলার আশ্চর্য শক্তি। আজ আর সে সবের কিছুই অবশিষ্ট নেই হয়ত—দৈহিক সব ঐশ্বর্যের একটা বাঁধা পরমায়ু আছে, তার পরই ক্ষয় শুরু হয়। আগেও হয়, পরমায়ু শেষ হবার আগেও। কারণ এদের আঘাত সহ্য করারও সীমা আছে একটা। ওরও হয়ত কিছু আগেই গেছে, সহ্যসীমা

অতিক্রান্ত করাতেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে সব। তবু একদিন সকলের মন হরণ করার মতো সম্পদ ছিল তার সত্যি-সত্যিই—প্রচুর ছিল।

রূপই কাল হয়েছিল কি হিমি আর তার বোনের বেলাতেও?

রূপ—তার সঙ্গে গুণও হয়ত। তার জাদু দেখানোর আশ্চর্য হাত, তার বুদ্ধি, তার হৃদয়বত্তা—সব জড়িয়েই কাল হয়েছিল দুই বোনের। অন্তত একজনের তো বটেই। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই বোনের একজনকে সরে যেতে হয়েছে, 'সর্বাপেক্ষা সমর্থনই টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত' ইংরেজী ঐ প্রবাদবাক্যকে সফল ক'রে। একজনই সরিয়ে দিয়েছে। অন্তত গণেশের তাই বিশ্বাস। খেলা দেখাতে দেখাতেই প্রাণ দিয়েছে বটে—দলের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস, মন ভেঙে গিয়েছিল বলে অনেকটা ইচ্ছে ক'রে আত্মহত্যার মতো ক'রেই প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু সেটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা না হত্যা—সে বিষয়ে রীতিমতো সন্দেহ আছে গণেশের। আজও আছে।

অন্তত শেষেরটা যে হত্যা—এই সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাটা—সে সম্বন্ধে গণেশ নিশ্চিত। নিশ্চিত জেনেছে বলেই সহ্য করতে পারে নি, ছুটে চলে এসেছে। অনেক দিয়েছে সে—আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ—সমস্ত জীবনটাই নষ্ট করেছে, নষ্ট করতে দিয়েছে ঐ মেয়ে-টাকে—সব খুইয়েই এক নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছে—তবু দেওয়ারও একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবার।

একটা কথা সুরবালা ঠিকই ধরেছিল।

গণেশ পালিয়েই এসেছে এবার। তা নইলে আর হয়ত কোনদিনই এখানে আসা হ'ত না। মা বোন কলকাতা—এসব তো ভুলতেই বসেছিল। সে যেন কতদিনকার কথা, কোন্ বিগত জন্মের। যেন বিপুল কালের ব্যবধান তাদের অস্তিত্বকে স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত করেছিল। কঠিন আঘাতেই সেই সকল-চৈতন্য-আচ্ছন্ন-করা যবনিকাটা সরে গেছে—দিশা-হারা হয়ে বেরিয়ে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে বাড়ির কথা, মা-বোনের কথা। দুরন্ত অবাধ্য ছেলে যেমন বাড়িঘর মা-বাবা সব ভুলে পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় দুষ্টুমি ক'রে বেড়ায়—কিন্তু পড়ে গেলে কি চোট লাগলেই 'মা' বলে কেঁদে উঠে বাড়িতে মার কাছে ফিরে আসে, গণেশও তেমনি ভাবে ছুটে এসেছে। চোখের কোণে যে কালি এবং দৃষ্টিতে যে ক্লান্তি লক্ষ্য ক'রেছিল সুরো—তা শুধুই অনিয়ম অত্যাচারের ফল নয়। আরো বেশী কিছু—অনেক বেশী।

অথচ এ কাউকে বলবারও নয়।

অপরাধিনীর আবেষ্টনী থেকে, মৃত্যু-রূপার সর্বনাশা নাগপাশ থেকে কোনমতে বেরিয়ে এসেছে বটে—কিন্তু পালিয়ে কি থাকতে পারবে?

সর্বনাশিনী এখনই কি ফিরে টানছে না!...সেই অপ্রতিহত অমোঘ টান সে যে নিজের শিরায় শিরায় নাড়ীতে নাড়ীতে এখনই অনুভব করছে! হয়ত সে সাংঘাতিক আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণও করতে হবে একদা। কে জানে!...

নরহন্ত্রীকে শাস্তিই কি দিতে পারবে কোন দিন?

তাও বোধহয় পারবে না।

সম্ভব হ'লেও পারবে না।

আর সেই কারণেই কাউকে কোনদিন বলতে পারবে না—কিসের জন্যে ক'মাসে এমন ক'রে বুড়িয়ে গেছে সে—কেন এমন মড়ার দশা দাঁড়িয়েছে তার। আর কেনই বা এমন ক'রে সব ফেলে পালিয়ে এসেছে এবার—একটা ব্যাগ মাত্র সম্বল ক'রে। কেন মনকে বার বার শাসাচ্ছে যে আর কোনদিন যেন ফেরার নাম না করে সে। আর কোনদিন না।

মার কাছে দিব্যি গেলে, মাকে কথা দিয়ে বেরিয়ে অনেকটা যেন হাল্‌কা বোধ

হ'ল মাথাটা। একটু নিশ্চিন্তও হ'ল। আত্মরক্ষাই তো করতে চাইছে—কে জানে যদি সত্যিই একটা উপায় হয়ে যায় এখানে। যদি সত্যিই মন বসে, এখানকার টান ওখানের চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। তাহলে তো বেঁচে যায় সে।—হয়ত এ ভগবানেরই হাত। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়তো মা এমন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল।...ভালই হয়েছে দিব্যিটা গালিয়ে নিয়েছে। ঘটনাকে তার নিজের পথে নিজের খাতে বইতে দেওয়াই ভাল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গণেশ অন্যদিনের মতো থিয়েটারের দিকে গেল না। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার দিকে চলে এল। সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই তখন। আস্তরণ পড়ার মতো গঙ্গার ওপর একটা ধোঁয়াটে ম্লান সন্ধ্যা নামছে একটু একটু ক'রে। কলকাতার কলুষিত বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

প্রতিজ্ঞা ক'রে এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে যেমন—তেমনি, এতদিন প্রাণপণ চেষ্টায় যে স্মৃতিটা কতক ভুলতে পেরেছিল সেইটেই আবার নতুন ক'রে মনে পড়ছে। এই একটা খোঁচাতেই শুকিয়ে-আসা ঘা দগদগিয়ে উঠেছে আবার।

বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে মনটা। নিজের ওপর বিরক্তিতেই আরও এত অস্থির হয়েছে।

অত্যন্ত দুর্বল সে। চেহারায় যতটা পৌরুষ—মনে যদি তার অর্ধেকও থাকত!

পুরুষের শক্ত হওয়া উচিত, সব বিষয়েই। সেই শক্তটাই হ'তে পারে না সে কিছুতে। তার স্বভাবের এটা মস্ত দোষ, যতটা বেপরোয়া সে নিজের সম্বন্ধে, যতটা উদাসীন—ততটা কেন, তার অর্ধেকও যদি কঠিন হ'তে পারত!

কঠিন হ'তে পারলে কঠোর হ'তে পারলে, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত ও গণ্য করাতে পারলে—আজ আর এই কাণ্ডটা হ'ত না। এই দুর্ঘটনাটা।

দুর্ঘটনা?

দুর্ঘটনা বলেই মনে করা ভাল। নইলে গণেশের আর নিজের কাছেও মুখ দেখাবার উপায় থাকে না।

বেচারী তাম্পি!

কোন দোষ নেই তার। শুধু গণেশকে ভালবাসত, এই তার অপরাধ। এই অপরাধেই প্রাণটা দিল সে।

অথচ গণেশ, এরকম একটা কিছু বিপদ ঘটতে পারে জেনেও সাবধান হয় নি। হ্যাঁ, জানত ও। জানা উচিত ছিল। ঐ স্ত্রীলোকটাকে চিনত ভাল করেই। তা সত্ত্বেও সে সতর্ক হয় নি, সতর্ক করার চেষ্টা করে নি। ঐ ছেলেটার ভালবাসা, তার ভক্তি, তার আপ্রাণ সেবা গ্রহণ করেছে অক্লেশে অনায়াসে—অম্লান বদনে, তার বদলে কিছুই দিতে পারে নি, বিপদে রক্ষা করতে তো পারেই নি।

কোথা থেকে যে এসে জুটল ছেলেটা।

প্যারালাল বারের খেলা দেখাত তাম্পি। অন্য জিমন্যাস্টিক খেলা শিখত সেই সঙ্গে। ষোল-সতেরো বছর বয়স হবে মাত্র—যখন সে প্রথম আসে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। ঐ বয়সেই আসে অবশ্য বেশির ভাগই, আরও অল্পবয়সে আসে বরং। ছেলেবেলা থেকে না শিখলে এসব খেলায় নিপুণ হ'তে পারে না কেউ। আর নিপুণ না হ'লে, হিসেব নির্ভুল না হ'লে সার্কাসে খেলা দেখানো যায় না। এতটুকু, আধ মুহূর্তের ভুল হ'লেও দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তাম্পিও নাকি আট বছর বয়স থেকে এই সব খেলা শিখছে। ওর বাবা খাওয়াতে পারত না বলে ওকে ইচ্ছে ক'রে দিয়ে দিয়েছিল একজনের কাছে—সার্কাসের দলের এমনি এক খেলোয়াড়ের কাছে। তারপর অনেক হাত ও অনেক দল ঘুরে এদের দলে এসে পড়েছে। শুধু প্যারালাল বার নয়—রিংয়ের খেলাও ভাল জানত। উন্নতি করার খুব ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকই সর্বনাশের কারণ হ'ল ছেলেটার!

কোচিনের দিকে কোথায় যেন বাড়ি—প্রায়ই গল্প করত দেশের। পাহাড়ে জায়গা,

ভারী সুন্দর দেশ তার। আর হেটা নিজস্ব গ্রাম কোবালাম্—সেখানে সমুদ্র এসে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে দিনরাত, চারিদিকে ঘন নারকেল বন—স্বর্গের মতো দেশ। কেউ যদি সেখানে শহর বসায়—ভাল ভাল হোটেল করে তো দেশ বিদেশ থেকে লোক আসবে দেখতে আর থাকতে।...

দেশ এত ভালবাসত, দেশের সম্বন্ধে এত গৌরববোধ, তবু দেশে যেতে চাইত না কখনও। বাবা ওকে বিলিয়ে দিয়েছে, মা বাধা দেয় নি—এই অভিমানে দেশে যাবার নামও করত না একবার। এদেশে এলেও দলের সংগে সংগে থাকত, মালপত্র ও পশু-পাখী পাহারা দেবার পালা যাদের—তাদের সংগে সেও থেকে যেত। ইদানীং গণেশের সংগে সংগে থাকত—ছায়ার মতো ঘুরত পিছু পিছু।

ভারী মিষ্টি স্বভাব ছিল ছেলেটার, আর তেমনি ভক্তি করত ওকে। ময়লা, প্রায়-কালো রঙ্, একটু বেঁটে কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার। অল্প বয়স থেকে ব্যায়াম করার ফলে চেহারাটা ছিল যেন পাথর-কোঁদা, নিখুঁত। আর একটু ঢ্যাংগা হ'লে সুপুরুষই বলা চলত।

এ দলে এসে গণেশের ম্যাজিক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন কখনও দেখে নি—এমন হ'তে পারে তাও ভাবে নি। প্রথম দিনের সে বিস্ময় শেষ দিনটি পর্যন্ত কাটে নি তাম্পির, বিস্ময়টা ভক্তিতে পরিণত হয়েছে খানিকটা—এই পর্যন্ত। দেবতার মতোই অমানুষিক ঐশীশক্তিসম্পন্ন মনে করত গণেশকে। এসব কি মানুষ করতে পারে! তাম্পি ক্রীশ্চানের ছেলে, বাইবেল কিছু কিছু জানত ; বলত, 'এ তো মিরাক্ল্। এ ভগবান পারেন আর লর্ড যেশু পারতেন। আপনি তো তাঁদের মতোই।' গণেশ ধমক দিলেও শুনত না। ওর এই ভক্তি নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করত—কিন্তু তাম্পি সে সব গায়ে মাখত না। সে সর্বদা চেষ্টা করত গণেশের কাছাকাছি থাকতে। ওকে দেখলেও যেন তার শান্তি হ'ত, আর যদি কোন কাজে লাগতে পারল—গণেশ যদি কোন ফরমাশ করল তো কথাই নেই, কৃতার্থ হয়ে যেত তাম্পি, মনে করত হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেল।

ওর এই গায়ে-পড়া ভক্তিতে আর পুজো-পুজো ভাবে প্রথমটা খুবই বিরক্তি বোধ হ'ত গণেশের। দলের বাকী সকলে এ নিয়ে ঠাট্টা করত—তাতে তাম্পির কিছু এসে না গেলেও গণেশের বিশ্রী লাগত। কতদিন বকেছে ধমক দিয়েছে—কিন্তু তাম্পির ভক্তি বা বিশ্বাস টলাতে পারে নি। তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে গণেশের ঐশীশক্তি আছে—মানুষ কখনও এমন অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড করতে পারে না। এসব এমন কিছু না—হাতের কায়দা মাত্র—ইত্যাদি বোঝাতে গিয়েও কোন ফল হয় নি, ধারণা পাল্টানো যায় নি তার।

কিছুদিন বাদে ভক্তিটা সয়ে গেছে। অতটা আর অসহ্য থাকে নি।

সয়ে গেছে তার কারণ শুধু ভক্তি নয়—তার সংগে সেবাও ছিল। ব্যক্তিগত সেবা—যেটা এখানে একেবারেই দুর্লভ। সরকারী 'কিচেন' অর্থাৎ একটা রান্নাখাওয়ার ব্যবস্থা আছে এই পর্যন্ত, প্রত্যেককে কিছু দাসদাসী বা পাচক যোগানো সম্ভব নয়। সকলকেই যার যা নিজের নিজের কাজ ক'রে নিতে হয়, যে অপটু তাকে দুর্ভোগ ভুগতে হয়। প্রেয়সী মেলা কঠিন নয় এখানে কিন্তু তারা কেউই গৃহিণী কি সেবিকা নয়। গণেশেরও শয্যাসঙ্গিনীর অভাব ছিল না : শেষের দিকে অবশ্য একটিতেই এসে ঠেকেছিল, ব্যাঘ্ররক্ষিকা বাঘিনীর মতোই সকলকে সরিয়ে দিয়েছে, নিজের বোন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তাকে সুদ্ধ। সেও বাঘের হাতেই প্রাণ দিয়েছে—গণেশের বিশ্বাস সে সময় হিমিই কোন কৌশলে বাঘকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল : যাই হোক, সে হিমির পক্ষেও সম্ভব নয় তার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে নজর রাখা বা ছোটখাটো ফাইফরমাশ খাটা। সে সময়ও তার ছিল না অবশ্য। শুধু খেলা দেখানোই নয়—অতগুলো জানোয়ারের খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনো

করা, অসুখে হ'লে চিকিৎসা পর্যন্ত—অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, তাকেই করতে হ'ত। অতছাড়া নিত্য প্র্যাকটিস করা আছে, একদিনও বাদ দেবার উপায় নেই; নিজের ভুল হবে, জানোয়াররাও ভুলে যাবে।

সুতরাং বলতে গেলে এই প্রথম—ব্যক্তিগত সেবার স্বাদ পেল গণেশ। গরীবের ছেলে, বাড়িতেও এ ধরনের সেবা পায় নি কখনও। তারপর যখন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরেছে তখন তো কথাই নেই। পরিষ্কার বিছানায় শোওয়ার কথা তো মনেই পড়ে না, বিছানা বলতেই কিছু জুটত না বেশির ভাগ দিন। কষ্ট করা সয়ে গিয়েছিল তাই, কষ্ট করা আর যেমন তেমন ক'রে দিন কাটানো। খেলা দেখাবার পোশাকগুলোকে যত্ন করতে হ'ত বাধ্য হয়ে, বাকী কোন কিছুরই ঠিক ছিল না। না পোশাকের, না বিছানার, না অন্য কোন আসবাব-পত্রের। কোন জায়গায় এসে তাঁবু পড়ত যখন সেই যে বিছানা খোলা হ'ত—আবার তাঁবু তোলার সময় ছাড়া তাতে হাত পড়ত না কোনদিন। সে সময়ও গুটিয়ে বাঁধা হ'ত এই পর্যন্ত। দৈবাৎ কোনদিন হিমির চোখ পড়লে—দিনের বেলা ছাড়া তো চোখ পড়ে না ঠিক, তাঁবুর মিটমিটে তেলের আলোয় বিছানার ময়লা ধরা যায় না—চিরকুট ময়লা হয়েছে দেখলে হয়ত টান মেরে খুলে কাচতে পাঠাত কাছাকাছি কোন ধোপার বাড়ি।

এইতেই অভ্যস্ত ছিল গণেশ। এর কোন অসুবিধে আছে টের পায় নি। পরিষ্কার থাকার যে কোন আরাম আছে তাও জানত না। তাম্পি আসতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সে নিয়মিত ওর কাপড়-জামা গুছিয়ে পাট ক'রে তুলে রাখে, ময়লা অন্তর্বাস মোজা নিজে কেচে দেয়, জুতো বুরুশ ক'রে দেয় প্রত্যহ। বিছানা তুলে তাঁবুর বাইরে রোদে দিয়ে পরিপাটী ক'রে পেতে দেয়—রাত্রে বিছানার পাশে সিগারেটের কেস, ছাই-দানী, জলের ডিকেণ্টার গ্লাস সব সাজিয়ে রেখে দেয়। খেলা দেখিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লে তাম্পি নিজের খেলা দেখানোর ফাঁকে—অবসর পেলেই কস্টিউম সুদ্ধ ছুটতে ছুটতে এসে জুতো মোজা খুলে পোশাক ছাড়িয়ে দিয়ে যায়। চুরোট ধরিয়ে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যায়—আর এক ফাঁকে একবার এসে হয়ত কিছু পানীয়ের ব্যবস্থা করে।

প্রথম প্রথম এ ধরনের ব্যক্তিগত সেবায় অস্বস্তি বোধ হ'ত, ক্রমশ একটু একটু ক'রে ভাল লাগতে শুরু হ'ল। শেষে নেশায় পেয়ে বসল, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। বারণ করলেও যে শুনবে না, ধমকে বকুনিতে যাকে নিবৃত্ত করা যাবে না—তাকে এড়াবেই বা কি ক'রে। অবশ্য কোনদিন মারধোর ক'রে দেখে নি। তবে এক আধদিন, দৈবাৎ হাতে পয়সা এলে যখন নেশার ব্যবস্থা হ'ত তখন মদের ঝোঁকে—অন্য নেশা আজকাল আর করে না গণেশ—অসহিষ্ণু হয়ে এক-আধটা লাথি-টাথি হয়ত মেরেছে। বেশ সজোরেই মেরেছে। সেবা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে নয়, সেবার ত্রুটি ধরে বিলম্ব হওয়ার জন্যে। তাম্পির হাসি-মুখ কিন্তু তাতেও মলিন হয় নি, বরং ঠিক পরমুহূর্তে এসে সেই পায়েরই সেবা করতে বসেছে। এমন বোধহয় ক্রীতদাসেও করে না। করে না তার কারণ ক্রীতদাসরা সেবা করে বাধ্য হয়ে—তাম্পি করত প্রাণের দায়ে, নিজের গরজে। এই সেবা করাতেই তার সুখ বলে।

ফলে একটু একটু ক'রে তার বশীভূত হয়ে পড়ল গণেশ। হ'তে বাধ্য। যে-কেউই এ অবস্থায় পড়লে বশীভূত হ'ত। অবশ্য একটা স্বার্থ তাম্পি খুলেই বলেছিল গণেশকে—সে গুরুদেবের কাছে এই জাদুর খেলা শিখতে চায়। তার বড্ড ইচ্ছে ঐ রকম যাদুকর হবে, বা খুশি ক'রে বেড়াবে। অন্য লোকের কাছে স্পষ্টই বলত, গুরুসেবা ক'রে গুরুকে খুশী ক'রে বিদ্যা আদায় করবে সে, প্রাচীনকালের ছাত্র শিষ্যদের মতো।...প্রথমে 'লর্ড' বলে সম্বোধন করত গণেশকে, কেন লর্ড বলত তা কেউ জানে না। গণেশের সন্দেহ সে দেবতা অর্থেই লর্ড বলত, যেমন যীশুকে বলে। তখন কারও নিষেধেই কর্ণপাত করে নি—পরে অবশ্য নিজে থেকেই 'গুরু' বা 'গুরুদেব' বলতে শুরু করেছে।

কিন্তু মতলব যাই থাক, স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই সেবা করছে কবুল করলেও—শেখার

জন্যে তেমন কোন গরজ বা শেখানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে নি কোনদিন, কোন তাগাদাই দেয় নি। গণেশের বিশ্বাস, সে ইচ্ছা থাকলেও সেটা গৌণ ছিল। এক শ্রেণীর ভক্ত আছে, সেবাতেই তাদের সুখ, ইষ্টের মহিমায় ও ঐশ্বর্যে অভিভূত হয়ে থাকতেই তাদের ভাল লাগে—পুজোতেই আনন্দ। তারা নিজেরা সেই দেবতার স্তরে উঠবে কোন-দিন—চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা—তা ভাবতেও পারে না। ইচ্ছাও নেই তত। অনেকটা বৈষ্ণব সাধকদের মতো। ছেলেবেলায় বাবার মুখে শুনেছে কথাটা, বৈষ্ণবরা মোক্ষ চায় না, বার বার জন্ম নিতেই চায়—মানুষ হয়ে জন্মালে কৃষ্ণনাম নিতে পারবে, তাঁকে পুজো সেবা করতে পারবে—এ-ই তাদের সুখ। এই সুখে এই আনন্দেই ডুবে মশগুল হয়ে থাকতে চায়। তাম্পিরও অনেকটা সেই ভাব। এতদিন তার জীবনে একটা বিপুল শূন্যতা ছিল, গণেশকে পেয়ে তাকে ভক্তি করতে সেবা করতে পেয়ে সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়েছে, সুখী হয়েছে সে।

সেবায় খুশী হ'লে সেবক সম্বন্ধেও মানুষ সচেতন হ'তে বাধ্য। গণেশও একটু একটু ক'রে তাম্পি সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। আগে তার এই সর্বদা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা, গায়েপড়া ঘনিষ্ঠতা—খুবই খারাপ লাগত, ক্রমশ সেটা সয়ে গিয়েছিল—এখন শুধু সেবা নয়—সাহচর্যটাও ভাল লাগছে তার। একটি সরল সুকুমার কিশোর মুখের শ্রদ্ধা-তদগত ভাব, দৃষ্টিতে সর্বদা একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার আলো—সেই সঙ্গে ওর সম্বন্ধে চিরন্তন বিরাট বিস্ময় একটা—সব জড়িয়ে ছেলেটাকে ভাল লাগল। আরও কিছুদিন পরে বুঝতে পারল—বেশীক্ষণ তাম্পি কাছে না থাকলে বরং খারাপই লাগে ওর। আগে দুজনের মধ্যে একটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল, গণেশের দিক থেকে কতকটা জোর ক'রে চাপানো সম্পর্কটা—তাই খারাপ লাগত। এখন দুজনে যেন বন্ধু হয়ে উঠল। এমন কি বয়সের এতটা অসাম্যও কোন বাধা সৃষ্টি করল না।...

গণেশ যেন জীবনে নতুন একটা স্বাদ পেল। কিছুদিন ধরেই বড় একঘেয়ে লাগছিল। আগে ছিল উন্নতির স্বপ্ন, দিগ্বিজয়ের আশা—সে আশাতে সব সয়েছে, কোন অসুবিধাকেই অসুবিধা ভাবে নি—দুঃখকে দুঃখ গণ্য করে নি। সে সব এখন গেছে। এখন দাঁড়িয়েছে একটি মাত্র স্ত্রীলোককে অবলম্বন ক'রে এই বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন—আশা ও আনন্দহীন জীবন কাটানো। ফলে একটু যেন হাঁপিয়েই উঠেছিল। অথচ ছেড়ে যাওয়ারও সামর্থ্য বা মনের দৃঢ়তা ছিল না। কতকটা বন্দীর অবস্থা হয়ে পড়েছিল ওর। স্বেচ্ছা-বন্দীও বন্দী, তার বন্ধনের যন্ত্রণাও কম নয়। সেই অবস্থায় দৈবাৎ এই সঙ্গী পেয়ে বেঁচে গেল। তাম্পিরও জগতে কোন বন্ধন ছিল না। এখানে সমবয়সী যারা,—প্রায় সমবয়সী, এখানে ওর বয়সী আর কেউ ছিল না, দু-একটি সাগরেদ ছিল তারা ওর চেয়ে ঢের কমবয়সী ; ছোট ছোট ছেলে সব—তাদের সঙ্গে অপ্রীতি ছিল না কিছু—কিন্তু তাদের প্রতি এমন আকর্ষণও বোধ করত না। গণেশই তার গুরু, বন্ধু, ভাই—একাধারে সব হয়ে উঠেছিল।

বন্ধু হিসেবেই অনেকটা কাছে গেল সে গণেশের। গল্প করবারও একটা লোক হ'ল।। গল্প করতে গেলে ভাল শ্রোতা চাই। গণেশ ওর কাছে শ্রেষ্ঠ শ্রোতা। সে ওর উৎসাহদীপ্ত কাঁচ মুখের দিকে, ওর স্বপ্নেভরা তরুণ চোখের দিকে চেয়ে বসে বসে শুনত ও দেশের কত কি গল্প, ওর বাবা-মায়ের কথা—ওদের দেশ, সমাজ, সংস্কারের নানা কাহিনী ও বিবরণ। পাল্টা প্রশ্নও করত গণেশকে—তার মা-বাবা-দিদির কথা ; কী করে গণেশ প্রথম এক বেদের ভেল্‌কি দেখে এই ইন্দ্রজালের দিকে আকৃষ্ট হ'ল, তারপর এই বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্যে, এই খেলা শেখার জন্যে কষ্ট করেছে, কত দুর্গতি ভোগ করেছে, কত লাঞ্ছনা সয়েছে—সেই সব শুনতে শুনতে ওর দু'চোখ ছলছল ক'রে উঠত, এক-একদিন কেঁদেই ফেলত সত্যিসত্যিই। বলত, 'তবে? তুমি নিজে এই বিদ্যে শেখার

জন্যে এত কষ্ট করেছ, আমি তোমার একটু সেবা করি তাতে অত আপত্তি করো কেন, অবাকই বা হও কেন! কষ্ট না করলে কোন বিদ্যেই শেখা যায় না—এ আমি বেশ বুঝেছি।'

মাঝে মাঝে ওকে বাজিয়ে দেখত গণেশ, 'আচ্ছা—আমি যদি বিয়ে করি—স্ত্রী হয় তা হ'লে? তুই কি করিস?'

'খুব ভাল হয়। আমি একটা মাদার পাই। আর বিয়ে করলে তো বাচ্চা হবে—আমার খুব ভাল লাগবে। তোমার ছেলেকে আমি মানুষ করব, দেখো। তোমাদের কোন ঝঞ্চাট পোয়াতে হবে না।'

আবার কোন দিন গণেশ হয়ত বলত, 'আচ্ছা, আমি যদি এ দল ছেড়ে দিই—দেশে চলে যাই?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।' বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় উত্তর দিত তাম্পি।

'কিন্তু আমি তো তখন বেকার হয়ে পড়ব—আর তুই-ই বা এ কাজকর্ম ছেড়ে যাবি কি ক'রে?

'রেখে দাও তোমার কাজ। তুমি না থাকলে আমি এই দলে থাকব ভেবেছ?...আর আমি সঙ্গে না গেলে তোমাকে দেখবে কে? তুমি তো এই আনাড়ি, নিজের একটা কাজও তোমার দ্বারা হয় না। আমাকে যেতেই হবে। তুমি যেখানে যাও, যা খুশি করো—আমি কাছে থাকলেই হ'ল। আমি তোমার চাকর হয়ে থাকব সঙ্গে সঙ্গে।'

'আরে, চাকর হয়ে থাকবি কি ক'রে? আমি তোকে খাওয়াবো কোথা থেকে? ধর—কাজটাজ যদি কিছু না-ই মেলে, আমি কি খাবো তারই তো ঠিক নেই!'

'সেজন্যে ভেবো না। আমি কারও বাড়ি কি হোটেলে দোকানে যেখানে হোক একটা কাজ-কর্ম জুটিয়ে নেব। গাড়ি চালাতেও জানি, তোমাদের দেশে তো ঘোড়ার গাড়ি চলে, সইসের কাজও কি জুটবে না? বাইরে কাজ করব—তোমার কাছাকাছি কোথাও—ফাঁক পেলেই তোমার কাছে চলে আসব—তোমার টুকটাক কাজ ক'রে দেব!'

গণেশ হাসে। তার ভাল লাগে এই উত্তরগুলো, তাই ক্রমাগত এই দিকেই প্রশ্ন করে যায়। বলে, 'ধর্ যদি আমাকে বোনের বাড়ি গিয়েই উঠতে হয়—মা-দিদি, তারা গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ, তুই ক্রীশ্চান, তোকে তো ঢুকতেই দেবে না বাড়িতে—তখন?'

তাম্পি কোনমতেই দমে না, সে বলে, 'ক্রীশ্চান তুমি বলবে কেন?...আমি না হয় গলার এই ক্রস আর চেনটা খুলেই ফেলব। এমনিতেই তো আমি আধা হিন্দু, তোমাদের দেব-দেবী সব চিনি, প্রণামও করি মধ্যে মধ্যে। আমার যেখানে বাড়ি—সেখানে হিন্দুরাও আমাদের পরবে আমাদের বাড়ি আসে, আমরাও হিন্দুদের পরবে যাই।...সে তুমি কিছু ভেবো না—সে ঠিক হয়ে যাবে সব।'

আত্মবিশ্বাসে আর সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় তার কাঁচা মুখখানা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

॥ ২৭ ॥

এইভাবে যখন দুটি অসমবয়সী বন্ধু—সুখস্বর্গ হয়ত নয়—নিজেদের একটি পৃথক শান্তি-নীড় রচনা করছিল, ওরই মধ্যে দুটি প্রাণী নিয়ে ছোট্ট আলাদা একটা জগৎ—তখন ওদের অজ্ঞাতে—ওদের পিছনে বজ্রবিদ্যুৎভরা একটি মেঘও জমছিল ধীরে ধীরে।

সে-মেঘ হিমির ঈর্ষা।

প্রথমটা হিমি অত কিছু ভাবে নি, কতকটা কৌতুকই অনুভব করেছে। গণেশের গৃহস্থালি মানে তারও গৃহস্থালি কতকটা—কারণ তাঁবুর মধ্যে তার একটা পৃথক নিজস্ব ঘর নির্দিষ্ট থাকলেও—বেশির ভাগ রাত তার কাটে গণেশের ঘরেই। গণেশ যে তার ঘরে যায় না, তা নয়—তবে সে কখনও-সখনও—কদাচিৎ। সুতরাং গণেশের ঘরের—তার শয্যা ও বেশবাসের শ্রী ফেরাতে সে খুশীই হয়েছিল। কিন্তু তার পর এক সময় মনে হ'ল বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হাজার হ'লেও সে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের কী করা উচিত—সেবাযত্ন, ঘরের শ্রী-সৌষ্ঠব রক্ষা, তার একটা ঝাপ্সা রকম ধারণা আছে হিমির। যেটা তার করার কথা, সেটা যদি অপরে ক'রে দেয় তো, বড় বেশী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় তার অকর্মণ্যতা বা অবহেলা। ভয়ও হয়—এতটা আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে —এর পর তার কাছেও দাবী করবে, না পেলে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সেও একটু বকাবকি শুরু করল তাম্পিকে. তবে খুব কঠিন কিছু নয়। কারণ গণেশকে খুশী করতেই—হিমিরও কিছু কিছু ফাইফরমাশ খেটে দিত, তোয়াজ করত।

আরও কিছুদিন যেতে, সেবার এই আরামে শুধু নয়—ধীরে ধীরে সেবকেও অনুরক্ত হয়ে পড়া দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল হিমি। সে উদ্বেগ গণেশ টের পেয়েছিল কিন্তু অতটা আমল দেয় নি। বরং সেও একটা কৌতুকই অনুভব করেছিল মনে মনে। হিমির উদ্বেগ কেন—তাও অজানা ছিল না গণেশের। সম্ভোগের তৃষ্ণা—কিছুদিন পরে কমে আসে মানুষের. তৃষ্ণা থাকলেও তার তীব্রতা থাকে না অন্তত—পুরাতন উপকরণ সম্বন্ধে তো থাকেই না। আকাঙ্ক্ষাই কমে আসে বরং—আবার নতুন কোন উপকরণ, নতুন কোন মানুষ নতুন ইন্ধনে আকাঙ্ক্ষার সে-আগুনকে নতুন ক'রে জ্বালাতে পারে—সে অন্য কথা। কিন্তু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম এমন জিনিস যা মানুষকে চিরদিনের মতো বেঁধে ফেলে। সে আরাম যার কাছ থেকে পায় সে তার বশীভূত হতে বাধ্য।

জীবনের পুঁথির এগুলি প্রথম পাঠ, সাংসারিক জ্ঞানের গোড়ার কথা। হিমিরও এগুলো না জানার কথা নয়। তার এমনও ভয় হতে লাগল যে. এই ছোঁড়াটা যদি সঙ্গে থাকে—গণেশের এই দল ও তার সঙ্গে হিমিকে ত্যাগ ক'রে যেতে খুব একটা আটকাবে না। দেশে যাবার জন্যে কিছুদিন থেকেই ছট্‌ফট করছে গণেশ, তা হিমি বুঝেছিল। এখন যদি দেশে যায়. আর এই ছেলেটা যদি সঙ্গে যায়. তাহলে ওকেই কিছুটা শিখিয়ে-পড়িয়ে সাহায্য করার লোক তৈরী ক'রে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো অসম্ভব হবে না। আর তাহ'লে ঐখানেই একটা বিয়ে-থা ক'রে কিম্বা অন্য কোন মেয়েমানুষ জুটিয়ে থেকে যাবে—আর কোনদিনই হয়ত হিমির কাছে ফিরবে না। হিমির রূপ নেই, সুগৃহিণীর যে-আকর্ষণ বা বন্ধন থাকতে পারত—ওর ক্ষেত্রে তারও কোন কারণ নেই। তবে কিসের লোভে ফিরে আসবে গণেশ! এখন অনেকটা শাসনে রেখে দিয়েছে তাই—হিমির শাসন বা প্রভাব সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা কাটিয়ে ওঠার মতো মনের দৃঢ়তা নেই গণেশের—কিন্তু সে সবই. যতক্ষণ ওর সামনে আছে, চোখের আড়াল হলে সে-প্রভাব কি আর কাজে লাগবে, না সে-সংস্কারের বাঁধনটাই থাকবে? ধীরে ধীরে এই ছেলেটার যেভাবে বশীভূত হয়ে যাচ্ছে. একদিন হয়ত একে অবলম্বন ক'রেই হিমির শাসন-প্রভাব কাটিয়ে উঠবে। না, সাবধান হওয়া দরকার, এ-বিষবৃক্ষকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।...

হিমি প্রথম চেষ্টা করল দলের মালিক প্রোফেসার ঘোষকে বলে তাম্পিকে তাড়াবার। তাম্পির নামে এটা-ওটা চুকলি খেতে লাগল। কিন্তু প্রোফেসার ঘোষও বহু পোড়-খাওয়া, বহু মার-খাওয়া লোক। তিনিও তাম্পির প্রতি গণেশের স্নেহ লক্ষ্য করেছিলেন। গণেশই তাঁর দলের এখন প্রধান আকর্ষণ; সে নির্বোধ তাই, নইলে এ-দল ছেড়ে আলাদা শুধু ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলে বিস্তর পয়সা কামাতে পারত। এখনও পারে। আর

তা যদি করে, এদিকে তাঁর দলের বারোটা বেজে যাবে একেবারে। গণেশকে চটালে এমনি না হোক, রাগের মাথাতেও বেরিয়ে গিয়ে আলাদা দল করা অসম্ভব নয়। অনেক সময় ঠাণ্ডা মাথাতে যা না পারে মানুষ—রাগের মাথায় অনায়াসেই তা ক'রে বসে। ছেলেটাকে তাড়ালে যদি সত্যি সত্যিই গণেশ বেগড়ায়? কী দরকার তাঁর এ-ঝুঁকি নেবার? তিনি হিমিকেই বরং এই অকারণ ঈর্ষার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবারও চেষ্টা করলেন। গণেশ চলে গেলে তাঁর এবং হিমির দুজনেরই সর্বনাশ। এতই বা হিংসে কিসের হিমির—সতীন তো নয়! চাকরের মতোই। চাকর আর মেয়েমানুষে ঢের তফাৎ। ভাল চাকর পেলে—বিশেষ যদি এমন বিনা মাইনের হয়—সব পুরুষই বশীভূত হয়ে পড়ে, তাই বলে কি স্ত্রীর ওপর থেকে ভালবাসা চলে যায় তাতে? না স্ত্রীর প্রতিপত্তি কমে?

কিন্তু এসব উপদেশে হিমি সান্ত্বনা পায় না বিশেষ।

বরং তার শঙ্কা বেড়েই যায়। অনেক দুর্লক্ষণ দেখতে পায় সে। তাতেই আশঙ্কা বেড়ে যায় আরও।

আর সেজন্য বুঝি গণেশই দায়ী। অতটা বুঝতে পারে নি সে। যা বিশুদ্ধ স্নেহ—তার এমন কদর্থ হ'তে পারে ভাবে নি।

রাত্রে তাম্পি বড় তাঁবুতে শুতে যেত। একটা টানা বড় ঘরে কুড়িজনের শোবার ব্যবস্থা, তারই একটাতে তার আস্তানা ছিল। অপরিচ্ছন্ন সামান্য শয্যা, তারও এক পাশে নিজের জামা-কাপড়-লুঙ্গি ঢিপি হয়ে পড়ে থাকত জড়ো করা। গণেশের ঘর ও পোশাক সম্বন্ধে তার পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না—কিন্তু নিজের ব্যাপারে তেমনি অগোছালো ছিল সে। বোধহয়, ওদিকেই অবসরের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটত বলে, সময়ও পেত না। একদিন গণেশ গিয়ে দেখে কিছু তিরস্কারও করেছে। অপ্রতিভ মুখে তাম্পি জবাব দিয়েছে, 'হ্যাঁঃ! নিজের জন্যে আর অত করতে পারি না। থাকিই বা কতটুকু। রাতের চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটানো, তাও তো সবদিন হয়ে ওঠে না! ও একরকম ক'রে কেটেই যায়।'

গণেশ বড় তাঁবুর যে-কামরাটা ব্যবহার করত, তার সামনে চলনমতো একটু জায়গা ছিল, তিনদিক ঘেরা—তবু সেখানে একজনের থাকার মতো একটু স্থান করা যায়। একদিন হিমির কাছে কথাটা পাড়ল গণেশ—ঐখানে তাম্পির থাকার ব্যবস্থা করলে কি হয়? কাছাকাছি থাকে—রাত-বিরাতে ডাকলেই পাওয়া যায়—?

নিমেষে জ্বলে উঠল হিমি, 'কখ্খনও না। ওর সামনে দিয়ে রাত্তিরে তোমার কাছে শুতে আসব, না? কথাটা বললে কি ক'রে? এই এক ফালি ক্যাম্বিসের তো আড়াল, এখানে বসে কথা কইলে সব শোনা যাবে ওখান থেকে; তোমার সঙ্গে দুটো কথাও কইতে পারব না নাকি—এর পর?...তা ঐটুকুই বা বাদ থাকে কেন—তাম্পিকে নিজের বিছানাতেই শোওয়ালে পারো—তা'হলে আর কোন কষ্টই হবে না তার।...আমার আসা যদি বন্ধই হয়ে যায়, তাহলে আর অসুবিধা কি? বাইরেই বা ফাঁকায় কষ্ট ক'রে শুতে যাবে কেন?'

বেগতিক দেখে গণেশ খানিকটা আমতা আমতা ক'রে চুপ ক'রে যায়। মাঝখান থেকে হিমি আরও বিরূপ বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে তাম্পির সম্বন্ধে।

দুপুরবেলাটা গণেশের অবসর থাকে। সকালে এক-আধটু 'প্র্যাকটিশ' করত আগে—এখন আর তা লাগে না। কোন কোন দিন ওদের প্র্যাকটিশের কাছে গিয়ে বসে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু খাওয়ার পর প্রত্যহই নিজের ঘরে এসে বিশ্রাম করে। দলের অন্য সবাই কেউ বা বাইরে যায়—যেখানে যখন থাকে শহর দেখে বেড়ায়, কেউ বা—পুরুষরা বিশেষ ক'রে—কাফিখানায় যায় মেয়েদের খোঁজে—এদিকে অবশ্য বিশেষ আড্ডা বা পতিতা-পল্লীর প্রয়োজন হয় না, এখানের মেয়েরা সার্কাসের লোকের জন্যে পাগল, সমুদ্রের ধারে বা নদীর ধারে

গেলেই অনেকে এসে পাশে বসে, নানাভাবে মনোহরণের চেষ্টা করে। আরও সেই ভয়ে গণেশ বাইরে যায় না বড়-একটা। এখন তাম্পিও খাওয়ার পর গণেশের ঘরে চলে আসে ; কখনও হাওয়া করে, কখনও বা পা টিপতে বসে। পা টেপার সময় গণেশের পা-দুটো নিজের কোলের ওপর বুকের কাছে তুলে নেয়—এটা তার কাছে দুর্লভ সৌভাগ্য বলেই বোধহয় যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে গা-হাত-পা টিপলে অবস্থাটা তাম্পির কাছে কষ্টদায়ক এবং গণেশের কাছে অস্বস্তিকর হয় বলে গণেশই বিছানায় বসার অনুমতি দিয়েছিল তাম্পিকে। তাও, গুরুর সঙ্গে একাসনে বসার ধৃষ্টতা ও অপরাধ হবে বলে সহজে রাজী হয় নি, গণেশই ধমক দিয়ে জোর ক'রে বসিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে আর আপত্তি করে নি বিশেষ।

এর মধ্যে একদিন গণেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল—ইদানীং এই পদসেবার মধ্যেই আরামে ঘুমিয়ে পড়ত সে প্রায় নিত্যই—হঠাৎ পায়ের ওপর একটা কি ভার এবং আড়ষ্টতা অনুভব করে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কি—ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখে, পা টিপতে টিপতে পায়ের ওপরই উপুড় হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তাম্পি। ওখানের গরমে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকার ফলে অজস্র ঘাম হয়েছে—সেই ঘামই গড়িয়ে পড়ায় ঠাণ্ডা জলের মতো মনে হয়েছে গণেশের। ঐ অবস্থায় অতবড় ছেলেটাকে কুঁচকে-কুঁকড়ে ঘুমোতে দেখে কেমন একটা অদ্ভুত মায়া হ'ল গণেশের—সে ওকে টেনে নিজের পাশেই ভাল ক'রে শুইয়ে দিল। তাম্পি অত কিছু বুঝল না, ঘুমের ঘোরেই একবার চোখ মেলে চেয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে নিবিড়ভাবে গণেশকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন অবস্থাটা দেখে ও বুঝে একটু লজ্জিত যে না হ'ল তা নয়—কিন্তু তবু, এতেই বেশ একটু প্রশ্রয় পেয়ে গেল সে। ছেলেমানুষ, যে ভালবাসে—সে এই ধরনের প্রশ্রয় আশা করে, পেলে বিস্মিত হয় না। মানুষের যত বয়স বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, ততই তার সন্দেহ সংশয়ও বাড়ে। সহজে কিছু আশা করতে ভরসা করে না ; কোন কিছুই সহজে পাওয়াটা স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারে না। তাম্পির সে-বয়স হয় নি। সে তার গুরুদেবকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, সুতরাং গুরুদেবও তাকে ভালবাসেন—এইটেই তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক। এর মধ্যে যে কোন বাধা থাকতে পারে, অশোভনতা কিছু, বা সেটা আর কারও কাছে আপত্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে—কি দৃষ্টিকটু, তা তার মাথাতে যায় না। এর পর থেকে তাই দুপুরের এই বিশ্রামের সময়, হাওয়া করতে করতে বা পা টিপতে টিপতে নিজের ঘুম পেলে গণেশের বিছানাতে তার পাশের সংকীর্ণ জায়গাটুকুতে সন্তর্পণে শুয়ে পড়ত। তার পর অবশ্য আর সতর্কতা থাকত না। মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাটাই ঘুমের মধ্যে তার কাজ ক'রে যেত—সে গণেশকে জড়িয়ে ধরে তার গলার খাঁজে নিজের মুখটা গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোত।

ব্যাপারটা কেউ দেখে থাকবে। তাঁবুর ঘর, দরজার ব্যবস্থা নেই। একটা পর্দার ব্যবধান থাকে মাত্র, তাছাড়া এতে গোপনতার কোন কারণ আছে তাও ভাবতে পারে নি গণেশ। সাধারণত যেসব ঘটনা গোপন করে মানুষ—তা-ই কখনও গোপন করার প্রয়োজন বোঝেনি সে। হিমি বা তার দিদি কুশীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাও ঢাকবার চেষ্টা করে নি কোনদিন। এ তো একটা নির্দোষ ব্যাপার। সেইজন্যেই এ নিয়ে মাথাও ঘামায় নি। কিন্তু অপরে ঘামিয়েছে। কোন দরকারে কেউ এসে থাকবে, অথবা নিছকই কৌতূহলবশে—ঐ অবস্থায় ওদের ঘুমোতে দেখে যথাসময়ে গিয়ে হিমিকে লাগিয়ে থাকবে, হয়ত কিছু রঙ চড়িয়েই। গণেশের প্রতি তাম্পির এই অহেতুক ভক্তিতে এবং অর্থমূল্যহীন সেবাতে অনেকেই ঈর্ষা করত গণেশকে—সেই তাম্পির সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষও বোধ করত, তারা এ সুযোগ ছাড়বে কেন?

আগুন ছিলই—তাতে ঘৃতাহুতি পড়ল। কথাটা শুনে হিমি একদিন নিজে দেখতে

এল। হয়ত যেদিন শুনেছিল সেই দিনই—কিম্বা পরের দিন, গণেশ ঠিক জানে না। সম্ভবত বিধাতাই বিরূপ হয়েছিলেন ছেলেটার ওপর, ভাগ্য তো খারাপ বটেই—নইলে মা-বাপ আর কাকে ঐ বয়সে বিলিয়ে দেয়, এমন সুদর্শন স্নেহময় মিষ্টস্বভাবের ছেলেকে?
—হিমি যেদিন সরেজমিনে দেখতে এল, সেইদিনই আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল গণেশ। অসহ্য গরম বোধ হওয়াতে ঘুম ভেঙে সে দেখছে তাম্পি তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে থাকাতেই এত গরম লাগছে। প্রথমটা সরাতে চেষ্টা করেছিল—পারে নি, এমনিতেই সবল সুস্থ শরীর তাম্পির, ঘুমোলে আরও বেশী ভার লাগার কথা; তার ওপর গণেশের একটা হাত ওর মাথার নিচে, তখন উঠে জোর ক'রে সরাবার মতোও অবস্থা নয়; ঘুমের রেশ রয়েছে দস্তুরমতো—তাই সে চেষ্টা না ক'রে পাশ থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে এক হাতেই বাতাস খেতে শুরু করেছিল, আর স্বাভাবিকভাবেই সে-বাতাস যাতে তাম্পির গায়েও লাগে—তাম্পি ঘেমেছে আরও বেশী—সেইভাবেই পাখা চালাচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকেছিল হিমি!

মানুষের ক্রুদ্ধ মুখের অনেক চেহারাই দেখেছে গণেশ, কিন্তু সে-সময়ে হিমির মুখের যে-চেহারাটা দাঁড়িয়েছিল—তা সাধারণ কোন ভাষাতেই বর্ণনা করা যায় না। এমন ক্রূর এবং ভয়ঙ্কর, এমন পৈশাচিক মুখভাব আগে আর কখনও দেখেনি গণেশ। মানুষের মুখের যে এমন রূপান্তর ঘটে তা জানত না। চিরদিনের বেপরোয়া মানুষ সে—হিমির সঙ্গেও নতুন ঘর করছে না—তবু তারও বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল ওর দিকে তাকিয়ে। হিমি কিন্তু তখন আর একটি কথাও কইল না, যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল পর্দাটা আবার ফেলে দিয়ে।

গণেশ তখনই তাম্পিকে উঠিয়ে দিল, বার বার ওর হাত ধরে অনুনয় ক'রে বলল, আর যেন সে গুরুদেবের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা না করে—অন্তত এখন কিছুদিন। ম্যাডাম ফিউরিয়াস হয়ে গেছে, তাম্পি জানে না, সাংঘাতিক মেয়েছেলে ও—তাম্পি যেন বেশ হুঁশিয়ার হয়ে থাকে এখন থেকে। এ সতর্ক-বাণীতেও যথেষ্ট কাজ হবে না আশঙ্কা ক'রে শেষে বলে দিল—বিপদ শুধু তাম্পির একার নয়, বিপদ গণেশেরও হ'তে পাবে, জীবনসংশয় হ'লেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

এই শেষের কথাটাতেই একটু কাজ হয়েছিল। তাম্পির ছেলেমানুষী জিদ জবরদস্তি অনেকটা কমেছিল। সে দুপুরে এ ঘরে থাকাই বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। একবার এসে একটু বাতাস ক'রে কিম্বা গা-হাত-পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে সে চলে যেত নিজের সেই দীন মলিন বিছানাতে বিশ্রাম করতে। তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ বা টিটকিরির অন্ত ছিল না,—তাদের অনেকেই হিমির কথাটা শুনেছিল নিশ্চয়, তার কালিপড়া মুখও লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু তাম্পি তা গায়ে মাখে নি।

ওর জন্যে ওর গুরুদেবের না কোন অনিষ্ট হয় সেইটেই বড় কথা, ওকে কে কি বলল না বলল তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না ওর!...

হিমি অবশ্য খুব-একটা কিছু করেও নি। দিন দুই-তিন গণেশের সঙ্গে কথা কয় নি, তারপর সেধেই এসেছে। ঝগড়া রাগারাগিও করেছে কিছু—তবে গণেশ যতটা ভয় করেছিল ততটা কিছু নয়। সেইটেই গণেশের মস্ত ভুল হয়ে গেল। সে মনে করল তাম্পি ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দিয়েছে জেনেই খুশী হয়েছে হিমি, তার রাগ পড়েছে।...

মেয়েছেলেকে তখনও চিনতে বাকী ছিল গণেশের। কে জানে হয়ত এখনও আছে। হয়ত কখনই চেনা শেষ হয় না পুরুষের, কিছুটা বাকীই থেকে যায়।...

এর পর কী ঘটনায় কেমন ক'রে যে তাম্পির সঙ্গে হিমির ভাব জমে উঠল—সেইটেই ঠিক জানে না সে। সম্ভবত হিমির তরফ থেকেই চেষ্টাটা এসেছে প্রথম; হয়ত

তাম্পির মনেও, ম্যাডামকে হাত করার একটা গোপন দুরাশা ছিল, সুযোগ খুঁজছিল সেও। বেচারী একে ছেলেমানুষ তায় তার প্রকৃতিটাই সরল, ভেবেছিল ম্যাডামকে একটু তোয়াজ করতে পারলেই গুরুদেবের কাছে আবার স্বচ্ছন্দে আসতে পারবে, কাছে কাছে থাকতে পারবে আগের মতো! কে জানে, ম্যাডামেরও অন্য কোন মতলব ছিল কিনা। প্রিয়দর্শন তাম্পি সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা বা লোভ দেখা দিয়েছিল কিনা! সে সম্ভাবনা খুব বেশী নয়—তবে একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। নিজের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছে গণেশ—হিমির অসাধ্য কিছু নেই, অকরণীয়ও না। গণেশকে যে ভাবে হাত করেছিল—সে তো একটা রীতিমতো তপস্যাই। তবে তাম্পির মতো তপস্যা নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনেরই। হিমি তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোন হীন কৌশল কোন ষড়যন্ত্রেই পিছপা নয়। সে-ই তার সাধনার পথ, তপস্যার পথ।

তাম্পি অবশ্য অত-শত জানে না। ম্যাডাম প্রসন্ন হয়েছেন, এইতেই তার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। সে খুশিতে লাট্টুর মতো পাক খেতে লাগল আর ভূতের মতো খাটতে লাগল। হিমির সেবারও কোন ত্রুটি রাখল না। অন্য যে কোন মেয়ে হ'লে সত্যিই প্রসন্ন হ'ত—ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে যেত, কিন্তু হিমি অন্য জাতের মানুষ, বাঘ খেলিয়ে খেলিয়ে বাঘিনীর হিংস্রতাই শুধু নয়—তার ধূর্ততাও পেয়েছে। বহু শিকারী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে গণেশের—ফরাসী ওলন্দাজ ইংরেজ—সকলের মুখেই শুনেছে, বাঘেরা—বিশেষ যারা নরখাদক হয়—অসম্ভব ধূর্ত। শিকার আয়ত্ত করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তারা—তা মানুষের পক্ষেও বোধ করি কল্পনাতীত।

হিমিরও মনের ভাব মুখে প্রকাশ পেল না, বরং সকলেরই মনে হ'ল—তাম্পির মনোযোগে সে তুষ্টই হয়েছে। যদি বা কোন অপরাধ ধরে থাকে তাম্পির—তা মার্জনা করেছে। এমন কি শেষের দিকে গণেশেরও তাই মনে হয়েছিল। এও মনে হয়েছিল—এবার হিমি যা শুরু করেছে—সেইটেই বরং যথার্থ দৃষ্টিকটু। ইদানীং কস্টিউম পরার সময়ও তাম্পিকে কাছে রাখত—নানা ছুতোয়, তাম্পির খেলা দেখাতে যাওয়ার সময় হ'লে নিজে সাজিয়ে দিত তাকে। খেলার ফাঁকে এক-একদিন নিজে ওর হাতে পাউডার মাখিয়ে দিত—ঘামে না রিং পিছলে যায়। তার জন্যে তোয়ালে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত এরিনা থেকে ভেতরে ঢোকার পথে, তাম্পি যাতে ঘাম মুছে নিয়ে হাতে পাউডার লাগিয়ে আবার দ্রুত ফিরে যেতে পারে।...অন্য যে কোন লোক হ'লে এতে ঈর্ষা বোধ করত। গণেশ করে নি তার কারণ হিমির প্রতি তার সেই প্রথম দিককার প্রবল আকর্ষণ আর ছিল না, তাছাড়া তাম্পিকে সে জানত, কোন নীচ কাজ সে করবে না। বিশেষত গণেশের সঙ্গে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করা—অন্তত সে যাকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে—তাম্পির পক্ষে অসম্ভব। সে কেউ করাতে পারবে না তাকে দিয়ে—প্রাণ থাকতে। তেমন ক্ষেত্রে বরং প্রাণই দেবে সে—অতি সহজে। গণেশ যে ওদের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গতা ঘটলে খুব একটা ক্ষুণ্ণ হ'ত তা নয়—বরং হয়ত কৌতুকই বোধ করত একটু। তার অভিজ্ঞতায় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে কিছুতেই বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। তাদের সহজ সম্পর্কেই সে বিশ্বাসী। সে নিজেও একনিষ্ঠ ছিল না, অপরের মধ্যেও সেরকম কোন একনিষ্ঠতা আশা করে না।

কিন্তু তাম্পির ধারণা অন্যরকম। ক্রীশ্চান ধর্মের কোন পুঁথিগত শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ ঘটে নি—তবে ধর্মের কতকগুলো সংস্কার বোধহয় মজ্জাগত হয়ে যায় মানুষের —সেগুলো তাম্পির ছিল পূর্ণ মাত্রায়ই। 'পাপ' সম্বন্ধে তার নিদারুণ ভয় ছিল। পাপ করলে ঈশ্বর রাগ করবেন, লর্ড যেশু রাগ করবেন—এ ধারণা সহস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপেও ভাঙ্গতে পারে নি গণেশ। হয়ত শুধুই ঈর্ষা নয়—এই বিশ্বস্ততাই তার সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। কে জানে এ সন্দেহটা কি ক'রে দেখা দিল গণেশের মনে—হাজার চেষ্টাতেও দূর করতে পারছে না। মনে হচ্ছে যদি তাম্পি সম্পূর্ণরূপে মনোরঞ্জন করতে পারত হিমির—

তাহলে বোধহয় এ ঘটনা ঘটত না!

হঠাৎ একদিন শুনল গণেশ—আম্পি বাঘের খেলা শিখছে 'ম্যাডামে'র কাছে।

খবরটা শুনে বেশ একটু বিচলিত বোধ করল সে। কুশীর মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে ঘটে নি, এখনও গণেশের ধারণা তার মধ্যে হিমির হাত ছিল। অথবা হিমিই সে মৃত্যুর প্রধান হেতু। আবার সেই রকম কিছু হবে না তো?...সে আম্পিকে বুঝিয়ে নানা-রকম ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে গেল কিন্তু তার তখন উৎসাহের সমুদ্রে জোয়ার এসেছে, সে কোন কথাই শুনল না। বলল, 'বুঝছ না গুরুদেব, বাঘের খেলা—বাঘ নাচানো, বাঘ বশ করা—এ তো মরদেরই কাজ। এত বড় বুকের ছাতিটা করেছি কিসের জন্যে?...তা ছাড়া প্রোফেসার সাহেবেরও ইচ্ছা—আর একটা লোক তৈরী হয়ে থাকে। এখন ম্যাডাম একেবারে একা—যদি কোনদিন ম্যাডামের শরীর খারাপ হয়—এ খেলাই দেখানো যাবে না। মালিক বলতেই আরও ম্যাডাম রাজী হয়েছেন, নইলে সি ইজ ভেরি জেলাস, হঠাৎ কাউকে এত বড় বিদ্যে শেখাবেন—তেমন মেয়েই নন।'

তবু গণেশ একটা শেষ চেষ্টা করে, 'তা তুই তো ম্যাজিক শিখতে শুরু করেছিলি, সেটা শেষ হ'ল না, নতুন লাইনে চলে গেলি! তোর কিছু হবে না। ঐ জন্যেই তো আমরা সহজে শেখাতে চাই না, আজ এটা কাল ওটা যারা করে—তাদের দ্বারা এসব বিদ্যে শেখা হয় না। আমি আর তোকে শেখাব না—যা!'

ধপ ক'রে পায়ের কাছে বসে পড়ে গণেশের, পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'রাগ ক'রো না গুরুদেব—তোমার ম্যাজিক তো হাতেই রইল—তুমি আমাকে যখন শেখাবে, যত্ন করেই শেখাবে, মাস্টার তৈরী ক'রে দেবে। ও আমি শিখব ঠিকই। মিরাক্‌ল্‌ করব—আমার অনেক দিনের শখ।...আমি যেদিন তোমার মতো ম্যাজিক শেখাতে পারব— ইস্‌! ভাবতেই যেন মাথার মধ্যে ঘূর্ণি লাগে। তা নয়—এটা কি জানো, ম্যাডামের তো হুইম্‌স্‌—আজ মন হয়েছে কালই হয়ত আর থাকবে না, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে—বলবে শেখাব না তোকে। তাই এটা একটু আগেই কায়দা ক'রে নিচ্ছি। বুঝছ না, এতে ম্যাডামও সন্তুষ্ট থাকবে আমার ওপর। এত যত্ন ক'রে শিখছি দেখে খুব খুশী হয়েছে।...একাধারে তোমাদের যুগল গুরুর বিদ্যে শিখে নিয়ে তোমাদের দুজনকেই হারিয়ে দেব এবার—দ্যাখো না।'

খুশিতে হা-হা ক'রে হেসে ওঠে আম্পি।......

দিন-কতক সত্যিই খুব যত্ন ক'রে শেখাল হিমি। মনে হ'ল সত্যি সত্যিই ওকে শেখাতে চায় সে—সত্যিকারের একটা স্নেহই পড়েছে এতদিনে ছেলেটার ওপর।

আম্পিরও উৎসাহ অধ্যবসায়ের কমতি নেই। সে ভূতের মতো খাটতে পারে—খাটেও। ইতিমধ্যেই শুধু ব্যক্তিগত সেবা নয়—হিমির কাজ-কর্মেরও, বহু দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। তার উৎসাহের সঙ্গে বরং হিমিই পাল্লা দিতে পারে না—ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাসিমুখে অনুযোগ করে, 'পাগলাটা আমাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলতে চায়!' বলে, 'কী ভেবেছিস তুই? এক মাসেই আমার চাকরি খতম ক'রে দিবি?'

আম্পি তার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলে,'পাগল হয়েছ ম্যাডাম! তোমার মতো শিখতে আমি জীবনে পারব না। আসল কথা কি জানো, তোমার ওপর মাদার মেরীর দয়া আছে. নিশ্চয় তাঁর অংশেই জন্ম তোমার—নইলে একটা মেয়ে পাঁচটা বাঘকে এমন ক'রে নাচায়—কে কবে দেখেছে? তাও মেমসাহেব মেয়ে নয়...আমাদের নেটিভ মেয়ে!'...

বায়ু অনুকূল, আকাশ উজ্জ্বল প্রসন্ন। কোথাও কোন দুর্যোগের লক্ষণ নেই—এদের জীবনতরণী নির্বাধায় ভেসে যাবে—স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে—এই-ই ভেবেছিল সবাই।

এমন কি গণেশ সুদ্ধ।

হঠাৎই এই ঘটনাটা ঘটল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত বলে—ঠিক তা-ই।

কি ক'রে যে কি হয়েছিল তা কেউ জানে না।

বাঘের খাঁচার দোর কে খুলল, আর সবচেয়ে বদমাইশ অবাধ্য বাঘটারই খাঁচা—কেউ বলতে পারল না। তাম্পিই বা অত ভোরে সেখানে কি করতে গিয়েছিল তাও কারও জানা নেই। আর জানা যাবেও না কোন দিন। যে বলতে পারত, তার পক্ষে আর সে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হবে না।

একটা আর্ত চিৎকার আর সেই সঙ্গেই বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে সকলে যখন ছুটে গেল—হিমিও গণেশের শয্যাতে ছিল তখন, একথা গণেশ মানতে বাধ্য—তখন দেখল খাঁচার দরজা খোলা, বাঘটা বাইরে তাম্পিকে মাটিতে ফেলে ক্ষত-বিক্ষত করছে। ইতিমধ্যেই কণ্ঠ নীরব হয়ে এসেছে তাম্পির, হয়ত আগে কিছু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন আর কোন সাধ্যই নেই।

তারপর যা করবার সবই করা হ'ল অবশ্য।

প্রোফেসার ঘোষ বাঘটাকে গুলি করতে যাচ্ছিলেন, হিমি বাধা দিল। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেই—শিলপিং গাউন পরা অবস্থাতেই, আশ্চর্য কৌশলে—সেই ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত বাঘটাকে খাঁচায় পুরে ফেলল। তখনও তাম্পির বুকের কাছটা ধুকধুক করছে—তাকে ধরাধরি ক'রে ওখানকার হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হ'ল। ভাল হাসপাতালে গেলে কী হ'ত কে জানে—ওখানে কিছুই করতে পারল না তারা। যেটুকু সামান্য প্রাণলক্ষণ ছিল—ঘণ্টাখানেক পরে তাও আর রইল না, বুকের কাছের সামান্য সেই স্পন্দনটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।...

জানা গেল না কিছুই। যে যার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো অনুমান করল শুধু।

হিমি বলল, প্রোফেসার ঘোষও সে সঙ্গে একমত, অতি উৎসাহী তাম্পি নিশ্চয় ভোরে উঠে একা গিয়েছিল প্র্যাকটিশ করতে। হয়ত ভেতরে ঢুকে খাঁচার দোরটা বন্ধ করার আগেই বাঘটা বেরিয়ে এসেছে—নয়ত বাইরে এনে খোলা জায়গায় বাঘকে খেলাবে এমনি একটা দুঃসাহসিক উচ্চাশা ছিল—তাতেই মারা পড়ল শেষ অবধি। বেছে বেছে সবচেয়ে বজ্জাত বাঘটার সঙ্গেই চালাকি করতে গিয়েছিল—বাঘও তো নয়, বাঘিনী, এই সব মাংসাশী জন্তুর মাদীরাই হয় বেশী সাংঘাতিক—সেই আরও সর্বনাশের কারণ হ'ল ওর। ছেলেমানুষকে—বিশেষত ওর মতো উৎসাহী ছেলেকে—এসব খেলা শেখাবার চেষ্টা করতে নেই, অতঃপর এই শিক্ষাই নিক সকলে।

কিন্তু গণেশের ধারণা অন্য রকম।

তার বিশ্বাস সর্বনাশিনী ভয়ঙ্করী ঐ নারীরই হাত আছে এতে ষোল-আনা। সেই-ই হয়ত গোপনে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকবে। চুপি চুপি বুঝিয়ে থাকবে যে, কাজটা খুব সোজা—অথচ যদি সত্যি সত্যিই বাইরে এনে খেলিয়ে আবার একা একা খাঁচায় পুরতে পারে তো তার বাহাদুরির সীমা থাকবে না ; সবাই ধন্য ধন্য করবে—হিমিও বুঝবে সাগরেদের বাহাদুরি।

কিম্বা শেষ রাত্রে কখন উঠে হিমিই ওর খাঁচার দোর আলগা ক'রে রেখে এসেছিল, শুতে যাবার আগে কোন একটা ছুতো বার ক'রে তাম্পিকে বলে রেখেছিল—ভোরে উঠে বাঘটাকে একবার দেখে আসতে। হয়ত বলেছিল, 'ওর চেহারাটা তত ভাল লাগছে না, হয়ত ভেতরে ভেতরে কোন অসুখ ক'রে থাকবে। শেষ রাত্তিরে উঠে একটু দেখে আসতে পারবি? যদি কোন খেঁচুনি-টেঁচুনির লক্ষণ দেখিস তো তক্ষুনি আমাকে খবর দিবি। আর যদি দেখিস, ঠিক আছে—তাহলে আর কোন হাঙ্গামা করার দরকার নেই।' কে জানে আরও কি বলেছিল, কোন্ অজুহাত দেখিয়েছিল। কী কৌশলে অবোধ সরল

ছেলেটাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল!...

সহস্র সম্ভাবনা মনে আসে গণেশের। সেদিনও এসেছিল। প্রোফেসার ঘোষকে একবার বলেও ছিল—পুলিশে খবর দেবার কথা, পুলিশে খোঁজ করুক—এ দুর্ঘটনা পূর্ব-পরিকল্পিত কিনা। ঘোষই মুখ চেপে ধরেছেন ওর, 'তুমি পাগল হয়েছ চক্কোত্তী! এদেশের পুলিশ কি আমাদের দেশের ইংরেজ পুলিশের মতো! করতে পারবে না কিছুই—শুধু দেদার ঘুষ খাবে আর ব্ল্যাকমেল করবে আমাদের। তাছাড়া এ ধরনের স্ক্যাণ্ডাল একবার রটলে আর এদেশে ক'রে খেতে হবে না আমাদের। দলই কি রাখতে পারব—কথাটা যদি চাউর হয়ে পড়ে?...চেপে যাও। কোন সন্দেহ হয়ে থাকলে চেপে রাখো মনে। যা-ই করো, ছেলেটা তো আর ফিরবে না।'...

না, কিছুই করতে পারে নি গণেশ। বেচারী তাম্পির এই অকালমৃত্যুর কোন প্রতিকার কোন কিনারাই করতে পারে নি। যদি হত্যাই হয়—গণেশই পরোক্ষে এর জন্যে দায়ী, তার প্রতি ভালবাসাই তাম্পির মৃত্যুর কারণ হ'ল।...এই দুঃখ, প্রতিকারহীন অনুশোচনাই তাকে পাগল ক'রে তুলেছিল।

ছেলেটার সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই তাঁবু এই ঘর তার কাছে কঠিন কারাগারের মতোই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে একদিন বেরিয়ে পড়েছে—উদ্ভ্রান্তের মতোই। কেউই জানতে পারে নি। এক রকম পালিয়েই এসেছে, একটি মাত্র ব্যাগ সম্বল ক'রে। সব কিছু পড়ে আছে সেখানে। খেলা দেখানোর সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-আশাক—নিজস্ব বিস্তর জিনিসও। থাক সব। ও সব জিনিসেই তাম্পির হাতের স্পর্শ আছে। ঐ প্রত্যেকটি জিনিসই যেন নিত্য করুণভাবে গণেশের কাছে এই হত্যার প্রতিশোধ প্রার্থনা করে, নীরবে অভিযুক্ত করে ওকে। এদের সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে তাই—লজ্জায় বেদনায়—আর প্রতিকারহীন একটা অনুশোচনায়।

মাদ্রাজে নেমে প্রথম গিয়েছিল কোচিনে, কোবিলাম্ গ্রামে তাম্পির বাবা-মাকে খুঁজে বার করতে। সুবিধে হয় নি কিছু। খুঁজে পায় নি কাউকেই। হয়ত ওখানকার বাস তুলে তারা অন্য কোথাও চলে গেছে—জীবিকার সন্ধানে। তাদের দেখা পেলে তাদের কিছু টাকা দিত—তাম্পির নাম ক'রে। তাম্পির মাইনের টাকা সে গণেশের কাছেই জমা রাখত ইদানীং—সে টাকাটাই বা কি করবে তা এখনও ভেবে পাচ্ছে না।...কোচিন থেকে ফিরে গয়ায় গিয়েছিল একবার। নিজের বাবার পিণ্ড দেবার অধিকার ওর এখনও আছে কিনা তা জানে না—সে চেষ্টাও করে নি—তাম্পির নাম ক'রেই পিণ্ড দিয়ে এসেছে। সে ক্রীশ্চান—কিন্তু নিজের ধর্মে খুব একটা আস্থা ছিল না তার, বরং হিন্দু দেব-দেবীদেরই বেশী মানত—বিশেষ ক'রে কালীমার ওপর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। আর কে জানে কেন—গণেশের মনে হয়েছিল গয়াতে পিণ্ড দিলে তাম্পির আত্মা বেশী সন্তুষ্ট হবে। এতে ক'রে ওর সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্বীকৃত হয়ে গেল—তাতেই খুশী হবে সে।

অবশ্য দেবে ঐ টাকা, এখানকার কোন গীর্জাতে দান ক'রে দেবে সে তাম্পির নামে। কী ছিল সে, রোমান ক্যাথলিক কিনা—তাও জানে না। মনে হয় ক্যাথলিকই ছিল, বা ঐ ধরনের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রোটেস্টান্ট নয় অন্তত। তাই টাকাটা সে ক্যাথলিক গীর্জাতেই দেবে। 'মাস' প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে বলবে তাম্পির নামে। যদি এর কোন মূল্য থাকে, এই 'মাস' দেবার বা গয়ায় পিণ্ড দিয়ে আসার—তাম্পি হয়ত শান্তি পাবে। আহা, তাই যেন হয়—শান্তি যেন পায় সে—যেন শান্ত হয়। যদি বা আত্মা থাকে—গণেশকে যেন সে ভুলতে পারে, ওর কথা ভেবে মৃত্যুর ওপারেও আর যেন দুঃখ না পায়।...

গভীর রাত্রে সেদিন যখন বাড়ি ফিরল গণেশ—তখন সে মন স্থির ক'রে ফেলেছে।

প্রথম প্রথম একটা প্রশ্ন তার বিবেককে পীড়া দিয়েছে। সে বাকি বিয়ে ক'রে ঘরকন্না পাতে —যদি, যদি সত্যিই সুখী হয় কোনদিন, তাহলে সেটা তাম্পির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না তো? তাম্পির আত্মা দুঃখ পাবে না তো তাতে?...কিন্তু নিশীথ রাত্রির শান্ত নিস্তরঙ্গ গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে সে—বরং এই-টেই হবে তাম্পির হত্যার প্রতিশোধ। হিমিকে মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া হবে এইতেই। এত পৈশাচিক আয়োজন যে জন্যে—গণেশকে একান্ত নিজস্ব ক'রে পাওয়ার জন্যেই এত আয়োজন সে বিষয়ে ওর সন্দেহ মাত্র নেই—সেইটেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।...

ওদের দলে আর ফিরে যাবে না এটা নিশ্চিত। ও সব সাজ-সরঞ্জাম অমনিই পড়ে থাক। এখানে আবার নতুন ক'রে কিনে নিতে পারবে সে। দিদির এখন টাকার অভাব নেই, সব খুলে বললে, ওর সম্মতি হয়েছে শুনলে হাসিমুখেই দেবে সে। নতুন ক'রে জীবন শুরু করবে গণেশ। দু-একটি ছোকরা বেছে নিয়ে তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী ক'রে নেবে সাহায্য করার জন্যে। ম্যাজিকের খেলাই দেখাবে শুধু—এখানে এই দেশে—এই ভারতবর্ষের মধ্যেই। আর, যদি কোন দিন ভগবান মুখ তুলে চান তো বিলেত আমেরিকা কি জাপান যাবে—কিম্বা জার্মানী। ওসব দেশে আর না, সার্কাসের দলেও না। নিছাৎ যদি আলাদা খেলা দেখিয়ে অন্ন না হয়—তখন অন্য কোন সার্কাসের দল খুঁজবে। এখানকার দল—যারা এই দেশেই থাকে এমনি জিমন্যাস্টিকের দল হয়েছে কিছু কিছু—শুনছে চারদিকেই—গায়ের জোর দেখিয়ে বেড়ায় তারা, বুকে পাথর ভাঙে, হাতী তোলে—তাদের কারও সঙ্গে জুড়েও ভাল প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।...

অনেক কিছুই ভাঙে-গড়ে মনে মনে। ভবিষ্যতের অনেক ছবি দেখে। আর মনকে বার বার শাসায়, ঐ সাংঘাতিক সর্বনাশী মেয়েছেলেটার সঙ্গে আর নয়—ঢের শিক্ষা হয়েছে।

॥ ২৮ ॥

বিয়ের প্রস্তাবে যখন শেষ অবধি রাজী হয়েছিল গণেশ, আর সুরোও সায় দিয়েছিল—তখন, নিস্তারিণী যে এমন কান্ড করবে—তা দুজনের একজনও ভাবেনি।

নিস্তারিণী যে কথাটা এতকাল মনে ক'রে রেখেছে, তা-ই বা কে জানত!

সে স-ঘর থেকে মেয়ে আনবে, ওদের যা ঘর। মেয়েবেচো ঘর ওদের, তা হোক, তাই বলে লুকিয়ে অপর বামুনের জাতকুল মারতে পারবে না। অন্য ছোট ঘর থেকেও আনবে না। তাতে যা হয় হবে।

এ খবরেও তত বিচলিত বোধ করে নি কেউ। কিন্তু মেয়ে স্থির হ'তে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল গণেশের। বেছে বেছে, চারিদিকে ঘটকী লাগিয়ে যে মেয়ে খুঁজে বার করল, দেখে পছন্দ ক'রে এল—তার বয়স মাত্র নয়। নয়ও বলা উচিত নয়—আট সবে পূর্ণ হয়েছে—দিনকতক হ'ল। মোটা পণ নেবার জন্যেই নয় বলছে তারা।

'তুমি কি পাগল হয়েছ মা!' সুরোই প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়, 'খোকার যে বেটের তিরিশ পেরিয়ে গেছে কোন্ কালে। ওর সঙ্গে আট বছরের খুকী মেয়ের বিয়ে ঠিক

করছ কি!'

'কে জানে বাপ্‌', বিরস কণ্ঠে বলে নিস্তারিণী, 'তোদের মুখেই আজ নতুন সব কথা শুনছি—ন বছরের মেয়ে নাকি খুকী! আমাদের আমলে—হোক পণ-নেওয়া ঘর—মেয়ে পাঁচ-ছ বছরের হ'লে বাপ-মার ঘুম আসত না চোখে। তার চেয়ে বড় মেয়ে কেউ ভরসা ক'রে ঘরে তুলত না। নানারকম সন্দ করত, বলত এতদিন ঘরে পড়ে আছে কেন—নিশ্চয়ই কোন গোল আছে এর ভেতর! তখন ছেলেরও দশ-বারো বছর বয়স হ'তে-না-হ'তে বিয়ে ক'রে ফেলত।'

'পনেরো বছরের ছেলের সংগে আট বছরের মেয়ে মানায়—এ তো ছেলে নয়—এ তো মিন্‌সে।'

'তা মিনসে হ'লে আর কী করছি বলো বাছা! কেউ যদি সময়ে বে না ক'রে তেজবরের বয়সে প্রেথম বে করতে যায়—তার মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে? এমনি দেখগে যাও—বড় বড় বামুনের ঘরেই দশ বছর পেরোবার আগেই সব মেয়ে পার হয়ে যায়—এত বয়স পজ্জন্ত কে বসে থাকে শুনি? আমাদের ঘরে তো আরও, যত বছরের মেয়ে তত শো টাকা পণ দিতে হবে বলে সবাই চার বছর হ'লেই মেয়ে নিয়ে চলে যায়। এই কি সহজে পেয়েছি! অনেক খুঁজে তবে বার করেছে নীলু ঘটক। এর চেয়ে ডাগর মেয়ে কোথাও পাবে না।'

গণেশ শুনে একেবারে বেঁকে দাঁড়াল।

'কী বলছ মা! চুলে পাক ধরে গেল, এখন ঐটুকু একটা মেয়ে বিয়ে করতে যাব? নাতির বয়সে পুতি। বিবি বড় হ'তে হ'তে সাহেব গোরে যাবে যে!...লোকেই বা বলবে কি!'

'কী আবার বলবে! তোর যেমন ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড! তুই এত বয়স অব্দি আইবুড়ো বসে রইলি বলে মেয়েরাও থাকবে?...এই তো ওদিকে সেই হালিশহর থেকে শুরু ক'রে এধারে কালীঘাট পজ্জন্ত ত্রিভুবন তো চষে ফেললুম, এর চেয়ে বড় মেয়ে কোথাও নেই। ...আর এমনই বা কি একটা অনথ ঘটছে তাও তো বুঝি না। একটা বছর পরেই পুনর্বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনব। তাও বোধহয় এক বছর লাগবে না, মেয়ের বাড়ন্তশা গড়ন—তার আগেই সোমত্থ হয়ে যাবে। সোন্দর দেখতে মেয়ে—ছেয়ালো ছেয়ালো গড়ন—আমাদের ঘরে এত সোন্দর মেয়ে তা পাওয়াই যায় না। এই তো আমার গঙ্গাজলের মেয়ে ও পাড়ার—গর্ভে ধরে এগারো ক'রে বে দিলে—আসলে দশ বছরের মেয়ে—বছর ঘুরল না কোলে ছেলে এসে গেল। তুই অত ভাবছিস কেন, সে তো তবু এমন বড়-সড়ও ছিল না।'

'হ্যাঁঃ! আমার তো ঐ ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না। বলি, বৌ আসবে ঘরে—তার সংগে দুটো সুখ-দুঃখের কথাও তো কইতে হবে।—আর সেই জন্যেই তো বৌ—এ তো আমাকে দেখে ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকবে, হয়ত কোনদিন বাবা বলেই ডেকে বসবে!'

'তুই থাম্‌ বাপু! তোর যত রাজ্যের আন্‌নুকোড় অনাছিষ্টি কথা! অমনি বাবা বলে ডাকছে! ওরে, ওরা সব আজকালকার মেয়ে, সেয়ানা কত! তাছাড়া বয়েসটাই বা নেহাৎ কম কি? আমার বে হয়েছিল তখন সবে পাঁচে পা দিয়েছি, ভাল ক'রে কথা বলতে পারি না তখনও—আর তোর জন্মদাতা আঠায়ো-উনিশ বছরের সাজোয়ান ছোকরা—এই গোঁপ-দাড়ি বেরিয়ে গেছে তখন। তা কৈ, আমার তো কখনও বর বলে বুঝতে ভুল হয় নি।'

তবু গণেশ ও সুরো প্রবল আপত্তি তোলে। নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে মাকে। শেষে বিরক্ত হয়ে মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে নিস্তারিণী, বলে, 'বেশ তো—আমি তো এখনও পাকা কথা দিই নি, আশীর্বাদও হয়ে যায় নি। এখনও তো এ মাসের কুড়ি দিন বাকী, ওমাসেও তেসরার আগে বে'র দিন নেই। তোরা দ্যাখ না বেয়ে-চেয়ে, এর চেয়ে বেশী বয়সের মেয়ে পাস কিনা। আমি একে জাঁকড়ে রেখে দিচ্ছি।'

খুঁজলও সুরো অনেক। বেশী পয়সার লোভ দেখিয়ে ঘটকী আর নাপিত লাগাল। কিন্তু কোন সুবিধেই হ'ল না তাতে। একটু বেশী বয়স—এগারো-বারো বছরের মেয়ের যা সন্ধান এল—সব রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, জানা-শোনা ভাল ভাল ঘরের মেয়ে, তারা কেউই কীর্তনউলীর ভাই—তাও এখন নষ্ট হয়ে গেছে যে—আর সে ভাইও বিশ্ববকাটে, সার্কাসের দলে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়—এমন পাত্রে দিতে রাজী নয়। দু-চার ঘর ঘুরে ঘটক-ঘটকীরা স্পষ্টই বলল, 'না দিদি—ও হবে না, শুধু অপমান হ'তে যাওয়া। মা যা খুঁজে বার করেছে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে পাবে না। বরাতজোরে পেয়ে গেছে।...নেহাৎ খুব গরীব, হাজার টাকা পণের লোভ সামলাতে পারে নি তাই রাজী হয়েছে।—আর পেতে পারো—.' সখী নাপতিনী একটু চিপটেন কেটে বললে, 'এই রকম হাফ-গেরস্ত ঘর থেকে। মানে—বাঁধা থাকে যারা—ছেলেপুলে হয়—তারা আজকাল অনেকে খারাপ নাইনে না দিয়ে ছেলে-মেয়েদের বে দিয়ে ঘরবাসী করছে। নিজেদের মধ্যেই দেয় অবিশ্যি। তার মধ্যে খোঁজ করলে এক-আধটা বামুনের মেয়েও মিলতে পারে। মানে বাপ বামুন, বরাবর তার কাছেই ছিল মা, অন্য বাবু ঘরে বসায় নি—এমন খোঁজ করলে পাওয়া যায়।...দ্যাখো, খোঁজ করব তেমন ধারা?'

আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল সুরোর মুখ, সেদিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে নিস্তারিণীই কথা ঘুরিয়ে দেয়, 'না না, ওসব আমাদের ঘরে চলবে না। যদি ভাল গেরস্ত ঘর দেখতে পারো তো দ্যাখো!...আর তাও বলি—তোমার বড্ড বেশী কথা বলা অব্যেস বাপু! তোমার খোঁজে তেমন মেয়ে নেই—এই তো সাফ কথা, একটা কথায় চুকে যায় এ বাত্‌তারা—তার মধ্যে এত ছিষ্টি টানবার দরকার কি বাছা?'

সখী মুখ টিপে একটু হেসে উঠে পড়ে। খরচ বলে আজও একটা সিকি আঁচলে বেঁধেছে—পরেও কিছু আদায়ের আশা রাখে তাই—নইলে এর জবাব সে দিতে পারত। বলতে পারত, 'বামুনের মেয়ে বেনেতে জাত দিয়েছে, সেই মেয়ের ঘরে আছ, তার অন্ন খাচ্ছ—তোমার আবার অত বামনাই কিসের?'

অর্থাৎ নিস্তারিণীরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।

মেয়েটিকে এখানে আনিয়ে সুরোকেও দেখায়। সুরোর মতো ডাকের সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ দেখতে, যৌবনকালে রূপ খুলবে আরও। পছন্দ করার মতো মেয়ে। আপত্তি করার মুখ এমনিও ছিল না—মেয়ে দেখেও আপত্তি করার কোন কারণ খুঁজে পেল না সুরো। সত্যিই বেশ বাড়নশা গড়ন, এখনই পা ভারী, হাত গোলালো হয়ে উঠেছে। গণেশকে আর দেখায় না কেউ, কারণ—সুরো বুঝেছে—গণেশের এসব দিক ভেবে দেখা বা বিবেচনা করার মতো মানসিক গঠন হয়। গৃহস্থালির খুঁটিনাটি—সঘর, বামুনের মেয়ে—এসব ভুলেই গেছে। অবশ্য সে যা চায় তা সে পাবে না—সুরো তাও জানে। অন্তত ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে হ'লে খুশী হয় সে। সে রকম মেয়ে ব্রাহ্মণ কেন কোন ভদ্রঘরেই পাওয়া যাবে না। একবার তো গণেশ বলেই ফেললে, 'তা বিধবাই না হয় দ্যাখো না বাপু একটা, বিধবা বিয়ের তো আইন হয়ে গেছে। ক্রীশ্চান মুসলমান সবাই করছে—এদেশেই তো নিত্য হচ্ছে—তোদের আপত্তি কি?'

'তুই থাম তো! তোর জন্যে বিধবা নিয়ে বসে আছে সব। এই তো এত দেখছিস শুনছিস—কে কোথায় কটা বিধবা বিয়ে করছে? পাবই বা কোথায়?' নিস্তারিণী থাবাড়ি দেয়।

গণেশ আর কিছু বলে না। তার মতও আর জিজ্ঞাসা করে না কেউ। নিস্তারিণীর তরফ থেকে পুরোহিত গিয়ে আশীর্বাদ ক'রে এলেন। সুরবালা বারো ভরির সীতাহার গড়িয়ে রেখেছিল, তাই দিয়েই আশীর্বাদ করা হ'ল। বেশ মোটা টাকা খরচ হয়ে গেল

সুরবালার, কন্যাপক্ষের অবস্থা খারাপ, পণের হাজার টাকা ছাড়াও ঘর-খরচা বলে ধরে দিতে হ'ল কিছু।

অবশ্য ঘর-খরচা এদের জন্যে তেমন কিছুই হ'ল না। বরযাত্রী বলতে বিশেষ কেউ গেলও না। এখানে গণেশের যে সব বন্ধু আগে ছিল—তাদের অনেকের সঙ্গেই এখন আর যোগাযোগ নেই, থাকলেও ভদ্রলোকের বাড়ি বাড়ি বরযাত্রী যাবার নেমন্তন্ন করা যায় না। চিঠি লিখে কিরণকে আনানো হ'ল, কিরণের বাবাও এলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তাঁরা অবশ্য তাঁদের বাড়িতেই উঠলেন। কিরণের সঙ্গে দেখা ঐ বিয়ের দু-তিনটে দিন। সুবো আর কিছুতেই যেন তেমন সহজ হ'তে পারে না আগের মতো। ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করে, আগের মতোই কথা বলতে যায়—ঠিক যেন সে সুর আর বাজে না। কিরণও কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে, দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে বলতে তার অপরিসীম লজ্জা। বৌয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়—অন্তত সুরবালার কাছে। নিস্তারিণীকে নাকি বলেছে—বৌ ভাল দেখতে, স্বভাব ভাল।

তবু বিয়েতে ঘটা কিছু হ'ল। সুরবালা তার পরিচিত অনেক লোককে বলেছিল। শশীবৌদিদেরও বলিয়েছিল মাকে দিয়ে। তাঁরা আসেন নি, ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন যৌতুক দিয়ে। দুর্গামারা এসেছিলেন, ওর বাবার গুরুভাই দুচারজন—নিস্তারিণী যাদের সন্ধান জানত। ম্যারাপ বেঁধে সানাই বসিয়ে বিয়ের মতোই বিয়ে হ'ল—দুশো আড়াই-শো লোকও খেল। এতকাল পরে আনন্দে তৃপ্তিতে নিস্তারিণী যেন পূর্ণ হয়ে উঠল। একটা লোক দশটার মতো খাটতে লাগল।

বিয়ের উত্তেজনা কমতে, নিত্যকিৎ সেরে বৌ বাপের বাড়ি চলে যেতে, গণেশ যেন কেমন মনমরা হয়ে পড়ল। সর্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে—কী যেন ভাবে শুধু। এতদিন লোকের ভীড়ে হৈ চৈ গণ্ডগোলে এক রকম ভাল ছিল, এখন যেন একটা অহেতুক বিষণ্ণতা পেয়ে বসল ওকে। এর একটা সূত্র অবশ্য সহজেই ধরতে পারে সুরো। এর মধ্যে কিরণের বাড়ি ঘুরে দুখানা টেলিগ্রাম এসেছে জাভা থেকে। এসেছে সেই সার্কাসের দল থেকেই নিশ্চয়, সম্ভবত হিমিই করেছে। হয়ত অসুখের ছুতো ক'রে মরণাপন্ন বলে তার পাঠিয়েছে। এর মধ্যে সুরোকে কিছু কিছু বলেছে গণেশ, ইহজীবনে আর হিমির মুখ দেখবে না—একথাও বার বার বলেছে সেই সঙ্গে। তবে সুরো জানে যে ওটা নিতান্তই কথার কথা। আশ্চর্য এক প্রভাব বিস্তার করেছিল হিমি ওর ওপর। তেজস্কর নেশার মতো আচ্ছন্ন করেছিল গণেশকে, যার ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে বুঁদ হয়ে ডুবে ছিল হিমির অপবিত্র প্রভাবের সেই অন্ধকূপে। সে নেশা এত সহজে—এক কথায় কাটা সম্ভব নয়।

সুরো ওর এই মনমরা ভাব দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বুঝল যে এমন নিষ্কর্মা বসে থাকলে আরও ঐসব কথা ভাববে। হিমির চিন্তা পেয়ে বসবে আবার। নেশা আবার প্রবল হয়ে উঠতেও দেরি হবে না। সে তাগাদা দিতে লাগল, 'খেলার সে সব সাজ-পাট কেনার কী হ'ল? এদিকে তো চুকেবুকে গেল—এবার কাজকর্ম শুরু কর্!'

গণেশ প্রকাশ্যেই এদের সামনে বার্ডসাই চুরুট খায়। সে চুরুটটা নিভিয়ে রেখে একটু কেমন যেন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'ভাবছি—আবার অতগুলো টাকা তোর খরচা করাব? বরং ওদেরই লিখে দিই, মালগুলো পার্শেল ক'রে পাঠিয়ে দিক। ওদের আর কীই বা হবে ওসব, আর যে কেউ খেলা দেখাতে যাবে তা তো মনে হয় না। ম্যাজিকের লোক পাওয়া অত সহজ নয়। তাছাড়া—ওসবই আমার নিজস্ব, ওদের কোম্পানীর নয়।'

'না-না', প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে সুরো, 'তোমাকে আর অত সুসার দেখতে হবে না আমার। কিছু লিখতে হবে না ওদের। কোন সম্পর্ক রাখবি না বলেছিলি—ব্যাস্, চুকে

গেছে। আবার কেন! তুই ওসব মতলব ছাড়—কি কি কিনতে হবে কিম্বা তৈরী করাতে হবে ফর্দ কর, কাজ সুরু ক'রে দে। বসে বসে আর মাটি ভাপাতে হবে না।'

সুরোর তাগাদাতেই এক সময় সক্রিয় হয় কিছুটা, কেনা-কাটা শুরু করে। টাকাও নেয় দফায় দফায়। কিন্তু পুরো মনটা যে নেই, সেটা বেশ বুঝতে পারে সুরোবালা। নিস্তারিণী অবশ্য অতশত বোঝে না, অনেকদিন পরে তার মনের গাঙে জোয়ার এসেছে—সে ভবিষ্যৎ নাতি-নাতনীর স্বপ্ন দেখছে। সুরোর যে আর ছেলেপুলে হবে তা মনে হয় না, হ'লেই বা কি—তার 'গুষ্টি' তো সে জল পাবে না। যদি বেটের গণেশের কিছু হয়—কানা-কানী—'পুরুষপুরুষের' সেই ভরসা। সে অন্যমনস্ক গণেশের সামনে পা ছড়িয়ে বসে মালা জপতে জপতে সেই ভবিষ্যৎ 'ভরাভরন্ত' সংসারের উজ্জ্বল ছবি এঁকে যায়।

শেষ পর্যন্ত এক সময় সাজপাট সব যোগাড় হয়ে যায়, এবার একটু নাড়াও দিতে হয় নিজেকে। ঘুরে ঘুরে গুটি দুই ছোকরাও সংগ্রহ করে—ওকে সাহায্য করার জন্যে। আর বসে থাকার কোন অজুহাত নেই। কোথাও একটা খেলা দেখিয়ে শুরু করতে হয় নতুন যাত্রা। সকলেই যথেষ্ট উৎসুক এবং উৎসাহিত, কেবল গণেশেরই মনের সেই অনির্বাণ আগুনটা আর যেন দেখা যায় না! সে যেন এই বয়সেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

শেষে বিপন্ন সুরোর মুখ চেয়ে নানুই এগিয়ে এসে হাল ধরে। বাবুকে বলে ওদের থিয়েটারেই একদিন 'শো' দেবার ব্যবস্থা করে। প্রায় চল্লিশ টাকা খরচ ক'রে সারা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড মারা হয়—'জাদুকর গণেশ চক্রবর্তীর অত্যাশ্চর্য খেলা/তালা-বন্ধ বাক্সর মধ্য হইতে হস্তপদ বন্ধ অবস্থায় অন্তর্ধান/বাতাসে টাকার গাছ পোঁতা—টাকার বৃষ্টি' ইত্যাদি।

খুব একটা বিক্রী হ'ল না প্রথম দিন—কিন্তু যারা দেখল তারা সকলেই সুখ্যাতি করল। এর মধ্যে সুরোরই অনুরোধে রাজাবাবু তাঁর বাগানে একদিন 'মাইফেল' দিলেন—গান-বাজনাটা উপলক্ষ, লক্ষ্য গণেশের ম্যাজিক। সুরো অবশ্য যায় নি—ভাইয়ের খাতিরেও ঐ সব উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যেতে রাজী নয় সে—কিন্তু শুনল, রাজাবাবুই বললেন, নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই ধন্য ধন্য করেছেন গণেশের ম্যাজিক দেখে, দু-একজন ঠিকানাও লিখে নিয়েছেন।

এরপর দু-একটা ডাক আসতে লাগল মধ্যে মধ্যে। হয়ত আরও আসত, হয়ত কারবার জমিয়েই তুলতে পারত—যদি আর একটু উদ্যম বা আগ্রহ প্রকাশ করত গণেশ। তারই উৎসাহের অভাব সবচেয়ে। নিতান্ত একেবারে বাড়িতে এসে বায়না দিয়ে গেলে তবেই একটু নাড়াচাড়া করত—খেলার কথা প্রোগ্রামের কথা ভাবত, সাগরেদদের নিয়ে বসত তালিম দিতে—নইলে কোথাও যেত না, একটু ভাবতও না কীভাবে কি করলে কাজ-কর্ম আসবে, দু পয়সা রোজগার হবে।

নিস্তারিণীর চোখে না পড়লেও—সুরো সবই লক্ষ্য করত। বুঝত যে একেবারেই দায়ঠেলা বেগারঠেলা হয়ে উঠেছে এটা। মনে শান্তি নেই, স্থিরতা নেই একটুকুও। সে-ই অস্থির হয়ে উঠে আবার নানুকে চেপে ধরল, তুমি ওর একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা ক'রে দাও নানুদা, কিম্বা একটা দলের সঙ্গে লাগিয়ে দাও। এত জায়গায় তো ঘুরে বেড়াও, ঘাতঘোত সব জানো—যেখানে হোক ভিড়িয়ে দাও ওকে। নইলে মন গুমরে-গুমরে পাগল হয়ে যাবে যে! কাজ-কর্ম সব ভুলে যাবে—যা শিখেছে।

নানু হাসে। বলে, 'ওরে, সে সেখান থেকে মোক্ষম টানে টানছে যে! কিছুতেই কিছু হবে না, ফিরেই যেতে হবে সেখানে। আর কিছুদিন গেলে মাগীই এসে পড়ছে। আবার সেই জোড়ে না বাঁধা পড়লে শান্তি নেই। যে পাখীর পায়ে দীর্ঘকাল শেকল বাঁধা থাকে—শেকল কেটে গেলেও সে আর উড়তে পারে না। কাজ-কর্ম করবে কি—ওর যে সেই আপিং-খোরের অবস্থা হয়েছে। আপিংটুকু পেটে পড়লে নিয়ম বাঁধা সব কাজ ক'রে যাবে যন্তরের

মতো—আঁপিং না পেলে মজা। ওর আর নিজে থেকে উৎসাহ ক'রে কিছু করা হয়ে উঠবে না কোনদিনই। সেখানে তার কাছে থাকলে তবু কলের মতো যেটুকু করবার ক'রে যাবে —সেই মাস্টার থাকলে। বাড়ীতে থাকলে সেটুকুও পারবে না। ওর জীবনের রসকষ রক্ত পর্যন্ত নিংড়ে নিয়েছে তারা।...আচ্ছা, বলছিস—দেখি একটু খোঁজ-খবর নিয়ে।'

দেখা নয়—ক'রে দিলও একটা ব্যবস্থা। প্রোফেসার কৃষ্ণমূর্তি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, রাজপুতানা ঘুরতে যাবেন—তাঁর গায়ের জোর আর তাঁর দলের ছেলেদের জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখাতে—তিনি গণেশের সঙ্গে জুড়ি বাঁধতে রাজী হলেন। খরচ সব তাঁর—থাকা-খাওয়া গাড়ি ভাড়া—মায় ওর সাগরেদ দুজনের সুদ্ধ, লাভের বখরা টাকায় চার আনা। আধা-আধি করতেও রাজী আছেন তিনি—যদি খরচের অর্ধেক গণেশ দেয়।

বন্দোবস্ত সকলেরই ভাল লাগল। এমন কি গণেশও যেন এতদিন পরে উৎসাহিত বোধ করল কিছুটা। বলল, 'না বাবা, সিকিই সই, লাভ না হ'লে না হয় পেলুম না কিছু। তেমনি ঘর থেকেও তো দিতে হচ্ছে না! যা দিচ্ছে তাই ভাল। ওসব দেশগুলো তো ঘোরা হবে।'

নানুও তাই বলল, 'না না, খরচের ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। এলাহি খরচ ওর, ওর দলেই লোক বেশী, লাভের অর্ধেক নিতে গেলে খরচেরও অর্ধেক দিতে হয়। কী দরকার!'

অনেক দিন ধরে ঘুরল ওরা। প্রায় ছ-সাত মাস। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী হয়ে লাহোর। সেখান থেকে পেশোয়ারও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল গণেশের, ডাকও এসেছিল—কৃষ্ণমূর্তি রাজী হলেন না। তিনি বেঁকে রাজপুতানা হয়ে বরোদা চলে গেলেন, সেখান থেকে গেলেন হায়দ্রাবাদ; সেইটেই দেশ তাঁর, সেখানেই কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করবেন।

গণেশ নিজের দল নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল। লাভের ভাগ যা ওর প্রাপ্য—সবটা দিতে পারেন নি কৃষ্ণমূর্তি, ছশো টাকার মতো বাকী আছে—তা সত্ত্বেও, ফেরার খরচ বাদ দিয়ে হাজার টাকার কিছু বেশিই—এনে বোনের সামনে নামিয়ে দিল, 'এই নে, গুণে-গেঁথে তোল। যা দিয়েছিস তার কিছুই ওঠে নি অবশ্য, তবু কিছু তো উসুল হ'ল!'

সুরো সে টাকা নিল না, ওকেই রাখতে বলে দিল। বলল, 'তোর এখন কত দরকার হবে, ফী হাত আমার কাছে চাইতে লজ্জা করবে, তুই-ই রেখে দে। এরপর আবার যখন থোক কিছু পাবি—দিস।'

নিস্তারিণী গণেশের আসার দিন গুণছিল, এবার সে বৌকে বাড়ি আনার তোড়-জোড় শুরু ক'রে দিল। বৌ নাকি এরই মধ্যে 'সেয়ানা' হয়ে গেছে—আর ওখানে ফেলে রাখার কোন কারণ নেই। ভটচাযিকে ডেকে পাঁজি দেখিয়ে দ্বিরাগমনের সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলল সে।

হয়ত এত তাড়া না করলেই ভাল হ'ত। অন্তত সুরোর তাই মনে হয় আজও। হয়ত আর কিছু খ্যাতি, আর কিছু টাকার মুখ দেখা উচিত ছিল। সাফল্যের নেশাটা সবে মনে রঙ ধরাতে শুরু করেছে তখন—সে নেশা একেবারে পেয়ে বসে নি। বৌ আসার খবরে গণেশ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল আবার, শুকনো মুখে সুরোকে এসে ধরল, 'তুই একটু বারণ কর না দিদি। এখনই তাকে এনে লাভ কি? হয়ত তাকে নিয়ে শুতে বলবে, রোজ রোজ ঘরে পাঠাবে—সে এক মহা অস্বস্তি। আমি ওকে বৌ বলে এখনও ভাবতেই পারছি না যে।'

সুরোও বোঝে কথাটা কিন্তু মাকে বোঝাতে পারে না।

নিস্তারিণীর বিশ্বাস তার আর বেশী দিন আয়ু নেই। তাড়াতাড়ি নাতির মুখ না দেখলে আর দেখাই হবে না। তার আরও ধারণা—নতুন কাঁচামেয়ের 'সোয়াদ' পেলেই সেই

'রায়বাঘিনী' 'ডাইনীকে' ভুলে যাবে। যত শিগ্‌গির সম্ভব দুটি কচি হাতের বাঁধনে তাই ছেলেকে বেঁধে ফেলতে চায় নিস্তারিণী।

'সে তো শুনেছি ওর চেয়ে বয়সে বড়, আধদামড়া মাগী। দেখিস কাঁচা বৌকে পাশে পেলেই তাকে ভুলে যাবে। আর কীই বা এমন খুকী তাই শুনি—পুনর্ষ্বিয়ে হয়ে গেছে—ওরই তো কোলে খোকাখুকী আসার সময় হ'ল।' নিস্তারিণী বলে।

সুরবালা দুজনের মধ্যে পড়ে বিপন্ন হয়ে ওঠে। মার দিকটা বোঝাবার চেষ্টা করে গণেশকে, শেষে বলে, 'আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি, এখন কিছু দিন মার ঘরেই যাতে থাকে সেই ব্যবস্থা ক'রে দোব, তোকে অত ভাবতে হবে না। আর একটু সোমত্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তোর কাছে পাঠাব না। নিয়েই আসুক, বুঝলি—আর না আনা ভাল দেখায় না। তাছাড়া তারা বড় গরিব, দুবেলা পেটভরে ভাত দেবারও ক্ষমতা নেই। সে পাড়া, সে সঙ্গটাও ভাল নয়। এখানে এলে তবু আমাদের হালচাল সহবৎ শিখতে পারবে। পেট পুরে খেতেও পাবে। তাড়াতাড়ি ডাগরও হয়ে উঠবে এখানে এলে।'

অগত্যা গণেশ চুপ ক'রে যায়। বাধ্য হয়ে নিয়ম-কর্মেও যোগ দিতে হয়। কিন্তু সে যে খুশী নয় এ ব্যবস্থায়—সেটা আর কারুর কাছেই বোধহয় ঢাকা থাকে না।

বৌ আসতে মাকে বলে-কয়ে দিনকয়েক মার ঘরেই রাখার ব্যবস্থা করে সুরো। বলে, 'পান-জল দিতে যাবে—কি এটা ওটা, জল-খাবারটা-আসটা—এই পর্যন্ত! পরে খোকার কাপড়-জামাগুলো গুছিয়ে রাখবে, বিছানা-টিছানাগুলো দেখবে। যখন তখন কাছে পাঠাবার দরকার নেই। রাত্তিরে তো নয়ই। তুমি অমন জোর-জোরাবতি ক'রো না, দু দিন দেখুক, চোখের সামনে ঘুরুক, আপনিই টান হবে। মিছিমিছি জোর ক'রে কোন লাভ নেই, বেশী টানাটানি করতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে যাবে হয়ত।'

নিস্তারিণীও কতকটা বোঝে বোধহয়, আর বেশী জোর করে না। বৌ রজনী তার কাছেই শোয়। যেদিন রাজাবাবু আসতে পারেন না কোন কারণে, সেদিন সুরোও কাছে শোওয়ায়। এটা ওটা গল্প করে, কী ভাবে চলতে হবে, কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে—মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে শেখাবার চেষ্টা করে।

রজনী দেখতেই শুধু সুশ্রী নয়—বেশ চালাকচতুর চটপটে। জানেও অনেক, বয়সের তুলনায় হয়ত একটু বেশীই জানে। চালাক মেয়ে বলে চেপে রাখে—আবার ছেলেমানুষ বলে কথার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়েও যায় এক-আধটা কথা। সুরো বোঝে আরও আগে এখানে আনানো উচিত ছিল ওকে।

একদিন হঠাৎ হয়ত বলে বসে রজনী, 'তুমি তো খুব ভাল গান গাও শুনেছি, একদিন শোনাও না!'

'কী ক'রে জানলে আমি গান গাই!' সুরো প্রশ্ন করে।

'ওমা, সে কথা আবার কে না জানে। কলকেতার ডাকসাইটে কেত্তনউলী ছিলে তুমি। ঐ মুখপোড়ার—মানে জামাইবাবু তোমাকে ধরতেই নাকি সব বন্ধ হয়ে গেল। এখেনে টাকার মুখ দেখলে বলেই আর রোজগারে মন রইল না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে! চুপ করো।' মৃদু ধমক দিয়ে ওঠে সুরো, 'ছোট মুখে ওসব বড় কথা বলতে নেই।'

'আচ্ছা, আর বলব না।' রজনী বেশ সপ্রতিভ ভাবেই মেনে নেয় তিরস্কারটা, 'তা হ্যাঁ গা ঠাকুরঝি, আমাকে শেখাবে—কেত্তন? আমি তোমার মতো মোট মোট পয়সা রোজগার করব—?'

'না। ভদ্দরলোকদের বৌরা বাইরে গান গাইতে যায় না। তোমার অভাব কি, কোন্ জিনিসটা পাচ্ছ না?'

'না, তা নয়।' একটু যেন ক্ষুন্নই হয় রজনী, 'তোমাদের সব বড় উল্‌টো চাপ দেওয়া

অব্যেস রাপ্‌! ...তা চুপচুপ আমাকে একদিন একখানা কেত্তন শোনাও না, শোনাবে? ...এমনি, দুজনে যখন একলাটি থাকব?'

'না। গান আমি বাঁধা দিয়েছি ঠাকুরের কাছে। এখন আর গাইতে নেই আমাকে।'

'গান বাঁধা দিয়েছ?...য্যাঃ! এ কি সোনাদানা যে বন্দক দে টাকা নেবে!...তবে হ্যাঁ, অবিশ্যি মার মুখে শুনেছি, ঠাকুরদের কাছে সব বেয়াড়া-বেয়াড়া জিনিস বাঁধা দেয়। সধবা মেয়েরা নাকি মা কালীর কাছে নোয়াসি'দর সুদ্ধ বাঁধা দিয়ে বসে!...আবার, হি, হি, শুনেছি বেশ্যে মাগীরা অনেকে বাবুদের সঙ্গে পরিবার সেজে যায়, কেউ যদি বলে, তা হ্যাঁ গা বাছা, এদিকে তো পাড়ওলা কাপড় পরেছ, গয়নারও তো খুব বাহার দেখতে পাই—তা হাতে নোয়া নেই কেন, কৈ, সিঁথেয়ও তো সি'দুর দেখছি না—তা তারা নাকি বলে, আমরা কালীঘাটে নোয়া-সি'দুর বাঁধা দিয়েছি। ওনার ভারী অসুখ হয়েছিল কিনা—তাই। হি-হি!'

সুরো হতাশ হয়ে পড়ে। বড় বেশী পেকে গেছে এ মেয়ে। মা-ই ঠিক বলেছে। বয়সটাই কম—আর কোনদিকেই কচি নেই এ।

॥ ২৯ ॥

মাস-দুই পরে সুরোই একদিন গণেশকে বলে, 'ওরে যা ভাবছিস তা নয়। এ মেয়ে তোকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। এর আর সোমত্থ হ'তে কিছু বাকি নেই। ঘরে নিয়ে শুতে শুরু কর্‌ এবার, গল্প-সল্প কর্‌। ওরও ভয়টা ভাঙুক—তোর আড়ষ্টতা কাটুক।...খুব কথা বলে, দেখবি ভাল লাগবে তোর।'

তবু গণেশ কাকুতি মিনতি করে! আর কটা দিন যাক অন্তত। একটা মাস, আচ্ছা না হয় আর পনেরোটা দিন নিদেন।

সুরোও বেশী পীড়াপীড়ি করে না। পনেরো দিন এমন বেশী সময় নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ছেলের সুমতি হয়েছে শুনে—অন্তত একটা বাঁধা সময়ের মধ্যে এসেছে শুনে নিস্তারিণীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ছেলে ঘরবাসী হ'লে—ঘরে মন বসেছে বুঝলে, সে তারকেশ্বরে গিয়ে দণ্ড খেটে আসবে।

কিন্তু সেই পনেরোটা দিনই আর কাটল না। মহাকালের ভ্রূকুটি-লীলায় দিনরাতের বিপুল ঘূর্ণাবর্তে কোথায় তলিয়ে গেল খণ্ডকালের সেই টুকরোটা। ভাগ্যের চড়ায় আটকে গেল স্বল্প-মেয়াদের নৌকোখানা—অনির্দিষ্টকাল নয়, চিরকালের মতো। দুর্গ্রহের পঁকে পুঁতে গেল তার আশা-আকাঙ্ক্ষার হাল দাঁড়।

হঠাৎ একদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরল না গণেশ। সাধারণত আটটা সাড়ে আটটাতে ফিরে আসে, বড়জোর নটা। সে জায়গায় সাড়ে দশটাও বেজে গেল যখন—তখন নিস্তারিণী সুরবালা দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে কোন লাভ নেই, কোথায় যায় বেড়াতে, কোন্‌ দিকে—তা কেউ জানে না ; এখানে তেমন বন্ধুবান্ধবও কেউ হয় নি বিশেষ—হয়ে থাকলেও তাদের ঠিকানা জানা নেই। সাগরেদ দুজনের ঠিকানা জানত, এমনিও তারা সকাল নটা নাগাদ এসে ঘুরে যায় একবার ক'রে প্রত্যহই—তাদেরই এদিকে ওদিকে পাঠাল খুঁজতে—কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

বিকেলের দিকে রজনী বিছানা সাফ করতে গিয়ে গণেশের তোশকের নিচে থেকে একখানা চিঠি আবিষ্কার করল—বার্মার মোলমেন শহর থেকে লেখা—লিখেছে হিমি। আঁকাবাঁকা বিশ্রী হাতের লেখা, অর্ধেক শব্দই বাদ পড়েছে, অথবা এমন ভুল যে সে সব বাক্যের মানে করা যায় না। তবু অনেক কষ্টে পাঠ উদ্ধার করল সুরবালা। হিমির শরীর খুব খারাপ, কাজকর্ম কিছুই করতে পারছে না। গণেশ না গেলে আর কাজকর্ম তার দ্বারা হবেও না। সুতরাং সে অবস্থায় সকলের চোখে হেয় আর দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই। গণেশের মনস্কামনাই পূর্ণ হোক—এর পরেও যদি সে না যায় তো হিমি ধরে নেবে—গণেশ তার মৃত্যুই চায়। আর তাহলে ওকে সুখী করতেই অন্তত হিমি আত্মহত্যা করবে। মা কালীর দিব্যি, শ্যামসুন্দরের দিব্যি, তার মরা মায়ের দিব্যি—আর পনেরো দিন দেখে সে মরবে—মরবে—মরবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তার মৃত্যু।

চিঠি বাড়িতে আসে নি, কিরণের ঠিকানা ঘুরেও না। এসেছে পোস্ট-মাস্টারের জিম্মায়। নিশ্চয় ডাকঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসেছে কেউ। কে আর—গণেশ নিজেই গিয়ে নিয়ে এসেছে নিশ্চয়। সম্ভবত এ বন্দোবস্তও তারই, সে-ই এ ঠিকানা দিয়েছিল, নইলে তারা জানবে কেমন ক'রে?...কে জানে আরও কত চিঠি এভাবে এসেছে।

সুরো লোক পাঠিয়ে রাজাবাবুকে খবর দিল।

তিনি খানিক পরে জানালেন, সেই দিনই সকালে রেঙ্গুনের যে জাহাজ ছেড়েছে—উনি খোঁজ নিয়েছেন, জি চক্রবর্তী নামে একজন যাত্রী গেছে সে জাহাজে। জি চক্রবর্তী যে গণেশ চক্রবর্তী—তা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায়।

আরও খবর পাওয়া গেল। ওখান থেকে আনা টাকাটা, আর এই গত দু'তিন মাসে টুকটাক যা রোজগার হয়েছে—সাগরেদদের প্রাপ্য বাদে সবই পোস্টাফিসে জমা রাখত গণেশ, সুরোই বুদ্ধিটা দিয়েছিল, আট দিন আগে সেখান থেকে থোক একটা মোটা টাকা তুলে নিয়েছে—সম্ভবত রাহাখরচা।...

সুরো ছোটবেলায় কোন্ বইতে যেন পড়েছিল—গণেশই চেয়ে-চিন্তে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে এক-আধখানা বই নিয়ে আসত—পুরুভুজ বলে একরকম সামুদ্রিক জীবের কথা। চারুদা বলতেন অবশ্য পুরুভুজ নামটা ভুল, আসলে ও প্রাণীগুলোর আটটি পা, অক্টোপাস বলে সাহেবরা, অষ্টভুজ বলাই উচিত। তা সে যাই হোক—তাদের বাঁধনে একবার পড়লে নাকি মানুষ বা কোন জীব ছাড়া পায় না। তাদের লম্বা লম্বা হাতীর শুঁড়ের মতো পায়ে নাকি অসংখ্য ছ্যাঁদা আছে—সেই সবগুলোই তাদের মুখ বা রসনা। নাগপাশ যাকে বলা হয়েছে রামায়ণে, খুব সম্ভব সেও ঐ অক্টোপাসই—কেন না এর পাগুলোও কতকটা মোটা সাপের মতোই—আর ঐ আটটা পায়ে এমনভাবে বজ্রবন্ধনে জড়ায় যে মানুষ আর নড়তে-চড়তে পারে না। তখন ঐ অসংখ্য মুখ দিয়ে রক্ত চুষতে থাকে প্রাণীটা। দেখতে দেখতে নির্জীব হয়ে পড়ে মানুষ, আর এমনই বিষাক্ত তাদের স্পর্শ—শুধু যে তখন ছাড়া পায় না তাই নয়—ছাড়া পাওয়ার চেষ্টাও করে না। সে ইচ্ছাটাও চলে যায়, সেই বিষের সাংঘাতিক নেশায়।

হিমিও সেই অক্টোপাশের বাঁধনে বেঁধেছে গণেশকে। ছাড়া পাবার উপায় নেই শুধু যে তাই নয়—ইচ্ছাও নেই আর। সর্বনাশের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেই নিশ্চিন্ত হ'তে চায়, মৃত্যুর নেশাই কাম্য বলে মনে করে। আর, মানুষ অক্টোপাস বলেই বোধহয় সে শুঁড় এতদূর পৌঁছেছে সকলের অলক্ষ্যে, অদৃশ্য অথচ অমোঘ টানে বেঁধে নিয়ে গেছে শিকারকে।

চেষ্টা অবশ্য যতদূর যা করা সম্ভব—সবই করল সুরবালা। হিমির সেই চিঠির ওপর নির্ভর ক'রে মোলমেনে টেলিগ্রাম পাঠাল—মা মরো-মরো। কিরণকে জানাল—তার যদি

কোন ঠিকানা জানা থাকে—'তার' পাঠাতে পার অসুখের সংবাদ দিয়ে। রেঙ্গুনে কে রাজাবাবুর লোক আছেন—তাঁকেও লেখা হ'ল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। গণেশ পেঁছিবার আগে থেকেই নাকি সব ঠিক ছিল। দল সুদ্ধ যাত্রা রওনা হয়ে গেছে। সেখানে কোথায় আগে যাবে—তা কেউ জানে না।

নিস্তারিণী কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে উপবাস ক'রে ধন্না দিয়ে সত্যিই মরোমরো হয়ে উঠল। সবচেয়ে শেল হেনে গেল ছেলে ঐ বৌটা ঘরে এনে। বৌটা যে তারাই জোর ক'রে চাপিয়েছিল ছেলের ঘাড়ে সে কথাটা নিস্তারিণী একেবারেই ভুলে গেল। এ তার চির-কালের স্বভাব—সমস্ত দায়িত্বটা এখন অনুপস্থিত ছেলে এবং উপস্থিত মেয়ের ওপর চাপিয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল। সুরোর পক্ষে সেটা মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। ছেলে-মানুষ বৌটার মুখের দিকে যেন চাইতে পারে না লজ্জায়। মা-ই করেছে সব আগাগোড়া—বিয়ের প্রস্তাব থেকে পাত্রী নির্বাচন—তবু তারও দায়িত্ব একটা আছে বৈকি। সে যদি শক্ত হয়ে থাকত, বিয়ের বিপুল খরচ বহন করতে রাজী না হ'ত—তাহলে হয়ত মা এ বিয়ে দিতে পারত না। কিন্তু সে সম্ভব হয় নি ওর পক্ষে। অন্য কারুর পক্ষেই হ'ত না—এ রকম ক্ষেত্রে। একটা বড় আশায় সে নিজে ছাই দিয়েছে—এখন যদি মা একমাত্র ছেলেকে দিয়ে সে-আশা পোরাতে চায়—তাকে বাধা দেবে কী ক'রে? বিশেষ 'টাকা দেব না'—এ কথা উচ্চারণ করাও তার পক্ষে দুঃসহ স্পর্ধা প্রকাশ করা হ'ত, মা কঠিন আঘাত পেত। একবার তেমন আঘাতও দিয়েছে—কিন্তু তার মধ্যে সম্পূর্ণ সুরোর হাত ছিল না। সুরোর পক্ষে সামনাসামনি সে কথা বলা সম্ভব নয়, মা যে তার মুখাপেক্ষী, এস্তাজারি—সেটা আভাসমাত্রেও মাকে জানাতে পারবে না সে।

আরও মাস তিন-চার আশায় আশায় থেকে নিস্তারিণী বুঝল ছেলে আর সহজে ফিরবে না এখন। আর হয়ত কোন দিনই ফিরবে না। এতদিন যে আশা করেছিল সেটাও কতকটা গায়ের জোরে—সে নিজেও জানত মনে মনে যে এ আশার কোন ভিত্তি কোথাও নেই। কিন্তু এখন সেটুকু আত্মপ্রবঞ্চনারও কোন কারণ রইল না। সে সুরোকে বলল, বৌটাকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে সুরো। মিছিমিছি অষ্টপ্রহর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে—বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বালিয়ে রাখা। কী দরকারই বা। ওকে দিয়ে আমার সাধ-আহ্লাদ মিটবে না—আমার সাধ-আহ্লাদ মেটবার নয়, তা ও-ই বা কি করবে, যেমন অদেষ্ট ক'রে এসেছিলুম, তেমনি হবে তো! গেল জন্মে কার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে এসেছি—এ জন্মভোর তার প্রাচিত্তির হচ্ছে।...সে যাকগে—ওকে আর জড়িয়ে রেখে লাভ কি? বরং চার-পাঁচটা ক'রে টাকা মাসে মাসে ফেলে দিস, তাদের যা হাল, মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াবার অবস্থা তাদের নয়।'

সুরো এবার কঠিন হ'ল। বলল, 'কখখনো না। আমরা দাম দিয়ে কিনে এনেছি বলতে গেলে, আমাদের কাজে লাগল না ঠিকই—তাই বলে আবার তাদের ঘাড়ে ফেলে দোব? তাছাড়া ওখানকার সঙ্গটা ভাল নয়, তা আমি বোয়ের সঙ্গে কথা কয়েই বুঝেছি। এই উঠতি বয়েস এখন—ওখানে থাকলে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'হ'লেই বা, আমাদের ক্ষেতিটা কি আর!' নিস্তারিণী মুখটা বিকৃত ক'রে বলে, 'আমাদের যখন ভোগে লাগল না—তখন ভাল রইল কি না রইল—সে মাথাব্যথা কি এত আমার। ও মেয়ে নিয়েই বা কি করব আমরা শুধু শুধু। ওর অদেষ্ট ভাল নয় সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে অমন আগুনের খাপরা বৌ বর ঘরে নেয় না—ভূ-ভারতে এমন কখনও শুনেছিস কোথাও?'

'আজ নেয় নি বলে জীবনে কোন দিন নেবে না—তা তো এরই মধ্যে ঠিক হয়ে যায় নি। এই তো তোমরা খোকাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলে। এল তো—যে ক'রেই হোক, যে কারণেই হোক। এলও, রইলও তো প্রায় বছরখানেক। আবার যে আসবে না—

তাই বা কে বলতে পারে? সে মেয়েমানুষটাও কিছু অমর নয়—খোকারও যা শরীরের অবস্থা, ডাইনীটা যা হাল ক'রে এনেছে, আরও করবে—কদ্দিন আর কাজ করতে পারবে! তারপর? অক্ষম হয়ে পড়লে তো এখানেই আসতে হবে, এলতলা-বেলতলা, সেই বুড়ির ছাঁচতলা।...তখন কে ওকে দেখবে, কে-ই বা তোয়াজ করবে? তখন ঠিক বিয়ে-করা বোয়ের কথা মনে পড়বে। না, থাক এখানেই। রাজাবাবু বলছিলেন একটা বুড়োসুড়ো মাস্টার রেখে ওকে লেখাপড়া শেখাতে। কথাটা মনে লেগেছে আমার। এখন মেয়েদের লেখাপড়ার খুব চল হয়েছে. চাই কি একটু চলনসই গোছের শিখলে ও অন্য মেয়েদের পড়িয়ে খেতে পারবে—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে!...এই বয়স থেকে—সারাটা জীবনই তো এখনও পড়ে—কেন লোকের হাত-তোলায় ভিক্ষের চালে জীবন কাটাবে?'

কথাটা নিস্তারিণীর মনেও লাগে। ছেলে ফিরে আসার কথাটা। আশা কখনই মরে না মানুষের মনে—জ্যৈষ্ঠজষষ্ঠীর মুলের মতোই নিত্য সঞ্জীবিত থাকে মনের তলায়—একটুখানি সম্ভাবনার জল পেলেই তা অঙ্কুরিত হয় আবার। নিস্তারিণীরও হ'ল। তবে সে-কথা বলল না, উদাসীনভাবে শুধু বলল, 'দ্যাখো, যা ভাল বোঝ করো তোমরা। আমি আর ভাবতেও পারি না। সে ছোঁড়া আমার কোমর ভেঙে দিয়ে গেছে চিরকালের মতো। ...ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে ছেলে-মেয়ে পাওয়া আমার—তা দুই থেকেই খুব সুখ হ'ল। এখন মানে মানে নিয়ে নেন আমাকে—তাহলেই বাঁচি। ঘরকন্নার সুখ-ঐশ্বর্য্যি থেকে রেহাই পাই!'

কিন্তু চলনসই গোছের লেখাপড়াটাও রজনী শিখতে পারল না, শেখার চেষ্টাই করল না। এক বছর ধরে মাসিক চার টাকা হিসেবে মাস্টারের মাইনে গোনাই সার হ'ল, ওকে দ্বিতীয় ভাগখানাও শেষ করানো গেল না। এধারে এ বি সি শেখাতেই প্রাণান্ত হয়ে গেল। শিখল যা—সেটা শেখানোতেই ঘোরতর আপত্তি ছিল সুরবালার—আরও কিছু পাকা পাকা কথা। অবাঞ্ছিত জ্ঞানে ঝুনো হয়ে উঠল।

সুরবালার পাশের ভাড়াটে বাড়িতে যাওয়া-আসার জন্যে মধ্যে একটা দরজা ছিল—কিন্তু সে দরজাটা চাবি বন্ধ থাকত বারোমাসই। কদাচিৎ কখনও দরকার পড়তে পারে এই ভেবেই দরজা করা। কোনদিনই সে পথে কেউ যেত না। সুরবালা ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা পছন্দ করত না। মধ্যে মধ্যে তারা আসত কেউ কেউ, নিস্তারিণীকে 'বামুন মা' বলত, মেঝেয় বসে তার সঙ্গে গল্প ক'রে যেত, তার কাছেই আসত আসলে—কিন্তু তারা আসত রাস্তা দিয়ে ঘুরে। সেই অবসরেই রজনীর সঙ্গেও তাদের আলাপ হয়েছে, তবে সে আলাপে তার মন ওঠে নি। শাশুড়ির সামনে মন খুলে কথা বলা যায় না—জীবন সম্বন্ধে নবোদ্ভিন্ন জীবনের কৌতূহল মেটানো যায় না।

রজনীর আর যাই হোক দুষ্টবুদ্ধির অভাব ছিল না। সে-ই খুঁজে খুঁজে মাঝের দোরের চাবিটা আবিষ্কার করেছে। দুপুরে যখন সবাই ঘুমোয়—ঝি-চাকর পর্যন্ত—তখন নিঃশব্দে মাঝের দরজা খুলে চলে যায় ও বাড়ি, এর ঘরে ওর ঘরে বসে গল্প করে—আবার কলে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ি চলে আসে। কলে জল পড়ার আওয়াজ পেলেই ঝি উঠে পড়ে, তারপরই একে-একে সব উঠতে শুরু করে—নিস্তারিণী গিরিধারী সবাই। সুরো আগেই ওঠে—কিন্তু ঘরের বাইরে আসে না। আজকাল তার জন্যে রাজাবাবু বাংলা বই কিনে আনেন কিছু কিছু, সাপ্তাহিক খবরের কাগজও নেন একটা ক'রে—তাই পড়ে শুয়ে শুয়ে।

এইভাবে কতদিন চালিয়ে গেছে রজনী, তা কেউ জানে না। ভাড়াটে মেয়েরা কেউ বলে নি। রজনীই নিষেধ করেছিল, সবাইকে, কাকুতি-মিনতি ক'রে বলেছিল ঠাকুরঝিকে না কেউ বলে দেয়।

'তাহলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না, যা মেজাজ! পয়সার দেমাকে ধরাকে সরা দেখে। হেই দিদি, তোমার হাতে ধরছি, ব'লো নি।'

তারা আরও বলে নি তার কারণ, এর মধ্যে তাদেরও একটা সূক্ষ্ম বিজয়গর্ব ছিল। সুরবালা যে তাদের সঙ্গে 'অকারণেই' একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলত—এটা তাদের পছন্দ হবার কথা নয়। এটা নিতান্তই ওর অহংকার—রূপ ও সৌভাগ্যের দেমাক বলে মনে করত ওরা। সেই সুরবালার আত্মীয় তার চোখে ধুলো দিয়ে ওদের ঘরে বসে গল্প করে, এটা-ওটা খায়—লুকিয়ে পরোটা মাছ-চচ্চড়িও খাইয়ে দেয় ওরা, নেহাৎ 'মনি'র ভয়েই ভাতটা খাওয়াতে সাহস করে না—এতেই যেন অনেকটা প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে যায় ওদের।

অবশ্য সে প্রতিশোধ যে তাদের ওপরেই একদিন ফিরে যাবে তা কেউ ভাবে নি। দুপুরে রজনী যখন ও বাড়ি যেত তখন ওদের বাবুরা কেউই থাকত না—এক চন্ননের বাবু ছাড়া। সে কী সব দালালী-টালালী করত—সন্ধ্যের সময়ই তার বেশী কাজ, গভীর রাত হয়ে যায় প্রায়ই কাজ চোকাতে—দুপুরবেলা তাই ফাঁক পেলে এখানে কাটিয়ে যেত একটু। রাত্রে এদের যেদিন থিয়েটার থাকে সেদিন ফিরতে অনেক রাত হয়—বাবুরাও সেই মতো আসে—তাদের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ, বেশির ভাগকে তো চোখেও দেখেনি কখনও। সুতরাং পুরুষ বলতে বাবু বলতে ঐ চন্ননের ঘরের শ্রীশবাবুকেই দেখত রজনী। শ্রীশবাবুও দেখত তাকে, কাছে বসিয়ে গল্প করত—মজার মজার গল্প শোনাত।

রজনী তখন বারো পূর্ণ হয়ে তেরোয় পা দিয়েছে। কিন্তু এমনিতেই তার একটু বাড়নশা গড়ন বরাবর—এখানে ভাল খাওয়া-দাওয়া তোয়াজে আরও তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিল। যা বয়স—তার থেকে অনেক বড় দেখাত। তেরো বছরের মেয়েকে পনেরো-ষোল মনে হ'ত!

শ্রীশবাবুরও হয়ত তাই মনে হয়েছিল। চোখে ধরেছিল ওর নবীন যৌবন।

ফলে একদা রজনীকে নিয়ে সে পালিয়ে গেল। চন্ননের বাইশ-তেইশ বছর বয়স তখন। দেখতেও রজনী ঢের ভাল তার চেয়ে। শ্রীশবাবুর অবশ্য বয়স হয়েছে—চল্লিশের কাছা-কাছি। কিন্তু রজনীর তখন অত বাছবিচারের অবস্থা নয়। শ্রীশবাবুই তার সামনে সেদিন একমাত্র পুরুষ, সম্ভাব্য অবলম্বন।

চন্নন টের পেয়ে বাড়ি মাথায় করল। ছড়া কেটে গালাগাল দিল রজনীকে, তার চৌদ্দ পুরুষকে—ইঙ্গিতে তার শাশুড়ি-ননদকেও। ভাল হবে না, কারুর ভাল হবে না, ভালর মাথা খেয়ে বসে থাকবে সব—যারা তার এমন সর্বনাশ করলে, ভালবাসার মানুষকে কলিয়ে সলিয়ে নিয়ে গেল।

নিস্তারিণী বলল, 'সেকালেই বলেছিলুম বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে—ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। তখন আমার কথা শুনলে আর আমাদের ওপর এই দায়টা বর্তাত না।...দুর্নামের ভাগী হওয়া শুধু শুধু।...তা নয়, উনি গেলেন তাকে লেখাপড়া শেখাতে—লেখাপড়া শিখে জজ ব্যালেস্টার হয়ে ছালা-ছালা টাকা রোজগার করবে! শিখছে লেখাপড়া! সেই বান্দাই বটে। যার বরাত মন্দ হয় তার বুদ্ধিও মন্দ হ'তে বাধ্য যে। বলে আকরে টানে। ছোটলোকের ঘরের মেয়ে, যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমনি তো হবে!'

সুরবালার মুখেই শুধু কথা সরে না। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে সে।

ঐটুকু মেয়ে তাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিত্য ও-বাড়িতে যেত—তারা কেউ টের পাওয়া তো দূরের কথা, সন্দেহ পর্যন্ত করে নি। আশ্চর্য!...এই বুদ্ধিটা যদি সৎ-পথে যেত! মেয়েটার জন্যে দুঃখই বোধ হতে লাগল তার। এধারে যতই যা পাকা হোক, বয়সে তো একেবারেই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না, কিছুই শেখে নি। ঐটুকু এক ফোঁটা কচি মেয়ে—কোথায় কার পাল্লায় পড়ল, আরও কী নরকে নামবে তা কে

জানে! কী আছে ওর অদৃষ্টে!...

শ্রীশ লোকটাও ভাল নয়। ওকে দেখেছে সুরো। ছোট জাত—কিন্তু সে জন্যে নয়, মায়ের মতো অত 'ঝাম্‌নাই'-এর অহঙ্কার নেই সুরবালার—একেবারেই লেখাপড়া জানে না, ধূর্ত, অর্থপিশাচ, লোভী ধরনের লোক। মেয়েটাকে না বেচে দেয় শেষ পর্যন্ত কারও কাছে!

নিজেদের অপরাধী মনে হয় বৈকি! তারা যদি গণেশের বিয়ে দেবার জন্যে অত তাড়াহুড়ো না করত, আর একটু দেখত তার মনের গতি—তাহলে হয়ত অনর্থক একটা মেয়ের জীবন এমনভাবে 'ছিতিচ্ছন্ন' হয়ে যেত না।

অবশ্য সবই ঐ মেয়েটার অদৃষ্ট। তবু মন মানে কৈ!...

অসহ্য একটা জ্বালা অনুভব করে সে মনে মনে।

হয়ত অহঙ্কারে ঘা পড়ারই জ্বালা এটা। বিশেষত বুদ্ধির অহঙ্কারে ঘা পড়লে মানুষ কিছুতেই স্থির হয়ে মেনে নিতে পারে না। ছিটফিটিয়ে বেড়ায় সেই জ্বালাটা অপর কারো দেহে সঞ্চারিত ক'রে দিতে না পারা পর্যন্ত।

সেই কারণেই এই দুঃখের মধ্যে এই লজ্জার মধ্যে একটা আনন্দও অনুভব করে। প্রতিহিংসার আনন্দ।

বেশ হয়েছে, চন্দনের বাবু পালিয়েছে। ওদের আস্পর্ধার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। ...এখন নাকে কাঁদতে এসেছে, এখন চেঁচিয়ে সাত পাড়া এক করছে! তখন একটু জানাতে কী হয়েছিল? ওদের অজান্তে লুকিয়ে যখন দিনের-পর-দিন মেয়েটা ওদের ঘরে যেত, তখন একবার মুখ ফুটে বলতে পারে নি কেউ! তখন খুব মজা লেগেছিল, ভেবেছিল 'বাড়িউলি'কে কেমন ফাঁকি দিচ্ছি। অপরকে ফাঁকি দিতে গেলে নিজেদেরও ফাঁকে পড়তে হয় বৈকি—মধ্যে মধ্যে।

এর অনেকদিন—বহু বছর পরে আবার রজনীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সুরবালার—একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে দুজনার জীবনে. এসেছে অনেক বিপর্যয়। বিস্তর পরিবর্তন বা ভাগ্য-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কেটেছে ওদের এই দীর্ঘকাল। সুরবালার তো বিশেষ ক'রে—তার জীবনের ধারাই গেছে পাল্‌টে—গতি বলো. লক্ষ্য বলো সমস্তই। বলতে গেলে জন্মান্তর ঘটেছে তার তখন।

জন্মান্তর ঘটেছে রজনীরও।

কী একটা যোগে কাশীতে স্নান করতে এসেছিল সুরবালা। বৃন্দাবন থেকেই এসেছিল। বোধহয় অর্ধোদয় যোগ সেটা। গ্রহণশ্চ কাশী—এটা একটা প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে—সবাই বলে, অন্তত একবারও গ্রহণে কাশীতে স্নান করতে হয়. অবশ্যকরণীয় পুণ্যস্নানের মধ্যেও প্রধান যোগ একটা। তাই কাশীতে এসেছিল গ্রহণের স্নান করতে। সেই সময়েই দেখা।

রজনী তখন বহু হাত ঘুরে, বহু ঘাটের জল খেয়ে ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাশীতে এসে ঠেকেছে। ওখানকার এক বাঙালী জমিদার কালীবাবুর নজরে পড়েছে। পুরনো বনেদী জমিদার, দোল-দুর্গোৎসব হয় তাঁদের বাড়ী—সোনার বিগ্রহ-প্রতিমা বাড়িতে। চালচলন পুরনো রাজা বা নবাবদের মতোই।

সেইভাবেই রেখেছেন তিনি রজনীকে। আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে অকারণেই বিস্তর দাসী-চাকর দিয়ে রাণীর মর্যাদাতেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তখন অবশ্য রজনীর সে রূপ আর নেই, নানা অত্যাচারে অভাবে অনটনে—সে সব বিবরণই শুনল সুরবালা—রঙও পুড়ে গেছে অনেকখানি। তবু এখনও বেশ চোখ টানে—কিছুটা চটক আছে এখনও। সাজ-সজ্জা করলে তো কথাই নেই, রীতিমত রূপসী মনে হয়।

ঘাটেই দেখা স্নান করার সময়। দুজনেরই দুজনকে চিনতে দেরি লেগেছিল। সুরোর অবশ্য চিনতে পারার কথাও নয়, সে ঠিক চিনতে পারেও নি, কোথায় যেন আবছা তার সঙ্গে একটা আদল আছে—সেইটেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল মনে মনে, স্মৃতির অরণ্যে হাতড়ে ফিরছিল। কিন্তু সুরোর চেহারায় খুব একটা পরিবর্তন হয় নি, শুধু দীর্ঘকালের ব্যবধানে ভুলে গিয়েছিল রজনী, সে-ই প্রথম চিনল, 'ঠাকুরঝি না!...ওমা, এ কি বেশ!'

বলতে বলতেই প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিল সে।

তখন সুরোও চিনতে পারল। তাড়াতাড়ি ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেল, 'ওমা, রোজে! আমি চিনতে পারিনি ভাই, সত্যিই। আর চেনার কথাও তো নয়—কতকাল হয়ে গেল, কত বছর, মনে হয় কত যুগের কথা সে সব।'

'তা এ বেশ—হ্যাঁ দিদি? রাজাবাবু—?'

'তিনি তো অনেকদিনই তাঁর গোবিন্দের কাছে চলে গেছেন! সেও বহু কাল হয়ে গেল!'

তার পর কোথায় আছে সুরবালা, কী করছে ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আলাপও হয়েছে, সেই ভীড়ের মধ্যেই। এটা শুধু মেয়েরাই পারে। আশপাশের অসহিষ্ণু ঠেলাঠেলি উপেক্ষা ক'রেও মিনিট পাঁচ-সাত কথা কয়ে নিল ওরা, ওর মধ্যেই।

ঘাট থেকে উঠে ফেরার পথে রজনী জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। আগে হ'লে সুরবালা কিছুতেই রাজী হ'ত না হয়ত—কিন্তু তখন সে অনেকখানি বদলে গেছে। এদের জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল থাকাটা তার পক্ষে তাদের পক্ষে অশোভন—এমন একটা অদ্ভুত শুচিবায়ু আর নেই।

দেখল সে রজনীর ঘরকন্না। ভাল ক'রেই দেখল। এমন জোর ক'রে—প্রায় হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এল কেন—তাও বুঝল। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম নয়,—বেশ স্পষ্ট বিজয়গর্ব ওর। রাজরাণীর মতোই আছে রজনী—সত্যিসত্যিই। দশাশ্বমেধের রাস্তার ওপর মাঝারি বাড়ি, দুটো ঝি, একটা চাকর, একটা রসুইয়ে বামুন, একজন দারোয়ান! এ ছাড়া বাবুর একখানা পাল্‌কি হামেহাল হাজির থাকে ওর বাড়ির সামনে—তার চারজন বাহককেও খেতে দিতে হয়। ফলে প্রতিদিনই যজ্ঞির রান্না রজনীর সংসারে। আর সে রান্না-খাওয়াও খুব সাধারণ মাপের নয়, বেশ রাজকীয় ধরনেরই। দেওয়া থোওয়ার হাতও খুব—গঙ্গার ঘাটেও দেখে এল একটু আগে—ভিক্ষা দেওয়ার পরিমাণ, একটা ঝি ঝুলি ক'রে চালেতে পয়সাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিল, মুঠো মুঠো ক'রে দিয়েছে সবাইকে। এইটুকু পথ হেঁটেই এসেছে—কিন্তু মর্যাদা হিসেবে পাল্‌কিটা ছিল পিছনে পিছনে, নেমে একটা গোটা টাকা ফেলে দিল ওদের—জলখাবার খেতে। হয়ত আরও সুরবালাকে দেখিয়েই দিল, কিন্তু তার মনে হ'ল পরিমাণ বেশী-কম হ'লেও—এরকম পেতে অভ্যস্ত ওরা, নইলে সামান্য একটু বিস্ময়ও প্রকাশ পেত মুখে-চোখে।

সুরবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—এতদিনে বহু অভিজ্ঞতাও হয়েছে, ওর—সে খানিকটা দেখেই বুঝে নিল, বহুদিনের দারিদ্র্যের পর পয়সার মুখ দেখেছে মেয়েটা—দু হাতে টাকা-পয়সা সব উড়িয়ে দিচ্ছে। মেয়ে কাপ্তেন যাকে বলে—তাই হয়ে উঠেছে।

সুরো এক ফাঁকে প্রশ্ন ক'রে নিল, 'এ বাড়িটা তোর—নিজস্ব?'

এক মুহূর্তের জন্য মুখখানা লাল হয়ে উঠল রজনীর, একটু অপ্রতিভের মতোই বলল, 'না—ঠিক, মানে—এটা ওঁর লীজের বাড়ি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সুরো বলল, 'গয়না কি কি করেছিস দেখি!'

আরও একবার বিব্রত বোধ করল রজনী।

'গয়না আর কি? এই যা পরে আছি। খুব একটা নেই—হাতি-ঘোড়া কিছু। আমি চাই না কোনদিনই মুখ ফুটে—উনি যা দেন স্ব-ইচ্ছায়—খেয়ালখুশি মতো।'

বহুদিনের একটা গোপন অপরাধবোধ এখনও কাটে নি সুরোর। তাই সে সব দেখে শুনে অযাচিতভাবেই উপদেশ দিয়েছিল, 'এমন ক'রে সব উড়িয়ে দিস নি রোজ। ভবিষ্যতের সংস্থান কর আগে। কালীবাবুরও তো বয়স কম নয়—রাজাবাবুর সঙ্গে আমার যা তফাৎ ছিল—এ তো তার চেয়েও বেশী দেখছি, উনি চোখ বুজলে আবার কি পথে বসবি শেষে? এই বেলা অন্তত একটা বাড়ি কোথাও করিয়ে নে ওঁকে বলে, আর কিছু কোম্পানীর কাগজ। আমাকে তিনি না চাইতেই ঢের দিয়েছিলেন—তবু এখন মনে হয় যা নষ্ট করেছি তা যদি থাকত আমার কিশোরীমোহনের সেবায় লাগত, মনের মতো ক'রে সেবা করতে পারতুম। তুই আর সে ভুল করিস নি—আখেরের ব্যবস্থাটা ক'রে নে আগে।'

এতখানি জিভ কেটে উত্তর দিয়েছিল রোজে, 'বাপরে, তাই কি মুখ ফুটে বলতে পারি আমি! ভাববে মরণ টাঁকছে আমার।...তবে, মুখে তো বারবারই বলে, তোমাকে আমি বিয়ে করা পরিবার বলেই জানি, পরিবারের মতোই দেখি। তোমাকে যাতে জীবনে কোন অভাব পেতে না হয়—সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দোব।'

'দোব তো বলে—দিয়েছে কি? উইল-টুইল করেছে কিছু?'

'দেবে কি দেবে না—সে ও বুঝবে আর ওর ধম্ম বুঝবে। আমি ওকে বলতে যাব না কোনদিনই। যে অতবড় কথাটা বলতে পারে—আর দেখছই তো কি রাজার হালে রেখেছে—তার কাছে দেনা-পাওনার কথা তুলব? না ঠাকুরঝি, সে আমি পারব না। তবে মানুষ তেমন অবিবেচক কি অধম্মে নয়—এ আমি বেশ বুঝে নিয়েছি।'

আর কিছু বলে নি সুরো, একটু হেসেছিল শুধু মনে মনে। বিষাদের হাসি। বাইরে এসে সঙ্গীকে বলেছিল, 'মা ঠিকই বলত, অদৃষ্ট মন্দ হলে বুদ্ধিও মন্দ হয়। এখন ওকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। বুঝবে একদিন নিজেই—।'

বুঝেও ছিল রোজে। কিন্তু বড় দেরিতে—তখন আর প্রতিকারের পথ ছিল না।

বুঝিয়ে দিয়েছিল সুরোও। প্রায় এক বস্ত্রে, দু আনা মাত্র পয়সা সম্বল ক'রে যেদিন রজনী এসে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন—শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিলেও—কথা শোনাতে ছাড়ে নি সে। এটা তার বয়সের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল—বেশী বয়সেরই দোষ এটা। আগে এসব অনায়াসে ক্ষমা করতে পারত, অথবা অপর পক্ষের লজ্জা, অপমান কি সঙ্কোচের কথা ভেবে অন্তত চুপ ক'রে থাকত—এখন আর পারে না। মনের সে প্রশান্তি, সহিষ্ণুতা বা শোভনতাবোধ বিবেচনা অনেক কমে গেছে। বহু-ব্যবহারে পাথরের সিঁড়ির মসৃণতা নষ্ট হয়ে যেমন রুক্ষ ও বন্ধুর হয়ে ওঠে, তেমনিই হয়ে উঠেছে তার মনের ওপরের আস্তরণ বা পালিশটাও। দু কথা শুনিয়ে দেবার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না। পরিষ্কার বলেছিল সে, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। খুব খুশী হয়েছি শুনে। যেমন আকাট বোকা তুই—তোর উপযুক্তই হয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে এক রকম গেল তোর, কখনও নিজের ভাল বুঝতে শিখলি নি।...এত ঘা খেলি তবু তোর চৈতন্য হ'ল না। আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা, উনি গেছেন স্বগ্গে উঠতে।...বাজারের মেয়েমানুষ—সে লোকটা মুখে একটু মিষ্টি ক'রে বললে বলেই উনি নিজেকে তার পরিবার মনে করলেন!...সত্যিকারের পরিবার যে সে দ্যাখ্ গিয়ে গয়না আর কোম্পানীর কাগজের আণ্ডিলের ওপর বসে আছে, ছেলেরা বৌরা সব হাতজোড় ক'রে—তটস্থ!...বললুম আখেরের কথা ভাব, দিন কিনে নে এই বেলা। তা নয়। দু-তিন হাজার টাকা হ'লে কাশীতে একখানা বাড়ি হয়—তাও তুই একটা বাগাতে পারলি না! হাত্তোর বোকার ঝাড় রে!'

হয়ত সেদিন রোজেও কিছু জবাব দিতে পারত। সে জবাব যে তার ঠোঁটের ডগায় আসে নি তাও মনে হয় না। নিশ্চয় তার ঐ কথাটাই বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে, এমন অনেকেরই পরিবার সাজার শখ হয়, রজনী নতুন নয় এ পথে। এঁটোপাতার স্বগ্গে

যাবার শখ চিরকালই থাকে—নইলে কথাটার সৃষ্টি হ'ত না। কল্পনার প্রাসাদে বসে নিজেকে রাজরাণী ভাবে—চিরকাল সব ঘুঁটেকুড়ুনিই, একদিন না একদিন। যে অহঙ্কারে সেদিন সুরবালা তার ভাড়াটেদের সঙ্গে মিশত না—সেটাও ঐ ভ্রান্ত মর্যাদাবোধেরই ফল।

আরও বলতে পারত যে, ওর এই অবস্থার জন্যে প্রধানত সুরবালা—সুরবালারাই দায়ী। গরীব হ'লেও গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে সে—হয়ত অন্য কোথাও অন্য কোন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'লে জীবন তার স্বাভাবিক খাতেই বইত—সুখে না হোক শান্তিতে—স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করতে পারত। আজ যে এই রকম জোয়ারের মুখে ময়লার মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে জন্যে পরোক্ষে সুরবালাই দায়ী। জেনেশুনে গণেশের বিয়ে দেওয়াই উচিত হয় নি ওদের।

কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারে নি রজনী, কৃপাপ্রার্থিনী, আশ্রয়প্রার্থিনী সে। মনের ক্ষোভ মনে চেপে মাথা হেঁট ক'রে নীরবেই থাকতে হয়েছে তাকে।

সুরো সেদিন আরও বলেছিল, 'এসে পড়েছ, থাকো। তাড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে বেশীদিন টানতে আমি পারব না। আমার নিজের বলতে আর কিছুই নেই, যা কিছু দেখছ—সব কিশোরীমোহনের। টাকা সরকারের হাতে, ছ মাস অন্তর সুদ আসে। যা আসে তাতে কোনমতে ওঁর সেবাটুকুই চলে। বাহুল্যতা কি নবাবী চলে না। আন্ডকুটুম নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার করা তো নয়ই। তাই—ওঁর সেবাই আটকে যায় মধ্যে মধ্যে। তোমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতেই হবে। তবে হ্যাঁ—আজ, কি এখুনি নয়। যা মড়ার দশা হয়ে এসেছ—এ ছিরির চেহারা কারও সামনে বার করা যাবে না। দিন কতক বসে পেসাদ পাও, বেশী ক'রে চেপে খাও, বেশী ক'রে ঘুমাও—গতরে মাস লাগুক—তারপর ওসব ভাবনা ভাবা যাবে।...অবিশ্যি একলা নয়—আমিও যথাসাধ্যি চেষ্টা করব, যতটুকু যা জানি এখেনকার হালচাল—শিখিয়ে দেব। আমার গতরে আর জ্ঞানে যেটুকু হয়—সেটুকু আমি করব। তারপর তোমার কপাল!'

এই সব নিষ্করুণ কথাই সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল রজনীকে। চোখে জল হয়ত আসে নি—চোখের জল বোধহয় আর অবশিষ্টও ছিল না কিছু, কিন্তু মনে তখনও ঘা-লাগার অনুভূতিটা ছিল। তাই তারপর সুরবালা বহু উপকার করলেও, সে কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারে নি।

[শেষ যেবার দেখা হয় সুরোদির সঙ্গে—সেবার শুধু রজনী নয়, তাঁর ভাই গণেশের খবরও পেয়েছিলুম। সে দেশে ফিরেছে। ফিরেছে বাইরের পাট চুকিয়েই। এখানেও এসেছিল খুঁজে খুঁজে—দিদির সঙ্গে দেখাও ক'রে গেছে। সেও একটা ঠাকুরবাড়ি করেছে—শ্যামনগরে না বরানগরে—কী যেন বলেছিল সুরোদি জায়গার নামটা—হিমিকে নিয়েই থাকে সেখানে। স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকে দুজনে, ঠাকুরের সেবা করে।

সুরোদি দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, 'খোকাকে আমি দোষ দিই না। ও-ই ওর আসল বৌ। ভালবাসার কোন বাছবিচার নেই। নিজেকে দিয়ে তো বুঝি...দুঃখ হয় ছুঁড়িটার জন্যেই। ছুঁড়িটারই কপাল মন্দ। কপাল মন্দ হ'লে বুদ্ধিও মন্দ হয়—আমার মা বলতেন, আমিও দেখেছি অনেক। জীবনভোরই দেখছি। দুটো দিন যদি সহ্য ক'রে ধৈর্য ধরে থাকত—কাদায় গুণ ফেলে—তাহলে হয়ত আজ ও-ই ওখানে গিন্নি হয়ে বসতে পারত। পথ-চেয়ে পড়ে আছে জানলে খোকারও বিবেকে একটা ঘা লাগত হয়ত—শেষ পর্যন্ত। মনটা ফিরত। চিঠি লিখে খবরও নিয়েছিল একবার বছর দুই পরে—কিছু টাকা পাঠাতে চেয়েছিল—পালিয়ে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।...বয়সের ঢের ফারাক মানি, তা এ-ই বা কি করছে বল—সেই তো তিনকালগত বুড়োদেরই মন যোগাতে হ'ল চিরকাল।...

গোবিন্দ বলো।...তাঁর ইচ্ছে, ওরই বা কি দোষ দোব, তিনি যে কাকে দিয়ে কি করাবেন —তা তিনিই জানেন।']

॥ ৩০ ॥

একেবারেই কোন প্রস্তুতি ছিল না। এর মধ্যে কোনদিন সুদূর চিন্তাতেও আসে নি কথাটা। এ সম্ভাবনা পর্যন্ত মনে ওঠেনি একবারও। কোন দুঃস্বপ্ন বা কুলক্ষণ দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। একেবারেই অকস্মাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা। কী হ'ল তা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলেন বসুমতী. ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে একটা অন্ধকার গহ্বরে রূপান্তরিত হ'ল তার পায়ের নিচের মাটি। অন্তত সুরবালার তাই মনে হ'ল। খান খান হয়ে ভেঙে গেল তার ইহলোকের স্বর্গ, ধুলো হয়ে ধুলোয় মিশে গেল তার সুখের প্রাসাদ।...

পাবনার দিকে কিছু জমিদারী ছিল রাজাবাবুদের। বিশেষ যেতেন না কখনও। গেলেও দু বছর তিন বছরে একবার। এবার আরও দেরি হয়ে গিয়েছিল। একবার অন্তত না গেলেই নয়—সেই হিসেবেই. প্রায় মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবার। যাওয়ার আগের দিন সুরবালাকে বলে গিয়েছিলেন. দিন-সাতেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন নিশ্চয়। কোন-মতেই দেরি করবেন না। দীর্ঘ দিন উড়িষ্যাতেও যাওয়া হয় নি, সেখানে জমিজমাও কিছু আছে, এ ছাড়া বড় যেটা সেটা হর্তুকীর কারবার। পাবনা থেকে ফিরেই উড়িষ্যা যাবেন—এবং এবার সুরোকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যাজপুর. কটক হয়ে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত যাবেন. সুরোকে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে আনবেন। এখন থেকেই নাকি সেই মতো ব্যবস্থা হয়ে থাকছে. ইতিমধ্যেই লোক চলে গেছে সেখানে, গাড়ি-ঘোড়ার বন্দোবস্ত করতে।

অর্থাৎ শরীর ভালই আছে। এমনিতেও অসুখ বড়-একটা তাঁর হ'তে দেখে নি সুরো। 'শরীর খারাপ' একথা কেউ বিশেষ কখনও শোনে নি তাঁর মুখে। সেদিনও ভাল ছিলেন বেশ, শরীর বেগড়াবার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি নাকি। ট্রেনে খাওয়া-দাওয়া কিছু করেন নি—বাইরে খাওয়া সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর একটা আতঙ্ক ছিল, সঙ্কোচও। সুতরাং সেদিক দিয়েও কোন অসুবিধে ঘটার কারণ ছিল না। একেবারেই হঠাৎ—ঈশ্বরদীতে ট্রেন থেকে নেমে বজরা চড়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন চড়ার ওপরই। সঙ্গে লোক-জন ছিল. ওঁর নিজস্ব খানসামা. সরকারমশাই—ওপার থেকেও আমলার দল এসেছিল ওঁকে নিয়ে যেতে। তারা ছুটোছুটি ক'রে আরও লোকজন জড়ো করল। ডাক্তার বলতে কাছাকাছি যিনি ছিলেন, কম্পাউণ্ডার থেকে ডাক্তার—তাঁকেও ডাকা হল। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'ভারী কঠিন অবস্থা। এখনই কলকেতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। আমি কিছু ভাল বুঝছি না। সন্ন্যাস রোগও হতে পারে—মৃগী হওয়াও আশ্চর্য নয়।'

যারা নিতে এসেছিল তারাই আবার ধরাধরি ক'রে ফিরতি ট্রেনে চাপিয়ে দিল, সঙ্গে উঠলও দু-তিনজন। তাদের যা করণীয় সবই করল, মুখে মাথায় জল দেওয়া, বাতাস করা, গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা—যা যা জানা ছিল আর যে যা বলল, কোনটারই ত্রুটি হ'ল

না। কিন্তু কিছুতেই রাজাবাবুর জ্ঞান ফিরল না। অন্য কোন রোগেরও লক্ষণ বোঝা যায় না ; জ্বরটর নয়, বিকারেরও চিহ্ন নেই—শুধু বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। কেবল পরের দিন, মনে হল নাক দিয়ে সামান্য একটু রক্তের মতো গড়িয়ে পড়েছে, মুখেও অল্প-অল্প গাঁজলা উঠেছে—সেটাও রক্তাক্ত।

বাড়িতে পৌঁছবার পর অবশ্য চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখল না কেউ। কলকাতার যত বড় বড় ডাক্তার ছিলেন তখন—তাঁদের সবাইকেই ডাকা হ'ল। কেবল রসিক দত্তকে পাওয়া গেল না—তিনি নাকি দার্জিলিঙ গেছেন কদিনের জন্যে। সেকথা শুনে অনেক প্রবীণ লোক হতাশাসূচক ঘাড় নাড়লেন। কিম্বদন্তী—যাকে কালে ধরে তাকে আর কিছুতেই আর. এল. দত্তকে দিয়ে দেখানো যায় না, ওঁর ওপর ভগবান প্রসন্ন—বদনাম করতে দেন না। যাঁরা এসেছিলেন অবশ্য তাঁরাও খুব সামান্য নন, যা করবার, তাঁদের শাস্ত্রে যা আছে—সবাই সব ক'রে দেখলেন তবু কিছুতেই কিছু হ'ল না। কলকাতায় ফিরে আসার পর আরও দুদিন অমনি বেহুঁশ পড়ে থেকে সেই অবস্থাতেই মারা গেলেন রাজাবাবু। কাউকে চিনতে পারলেন না, কাউকে কিছু বলে যেতে পারলেন না—স্ত্রী-পুত্রের কাছেও বিদায় নেওয়া হয়ে উঠল না। এই যে শ্যামা পৃথিবী তার রূপে রসে গন্ধে বর্ণে—এতদিন তাঁকে পালন ও পোষণ ক'রে এসেছে, যুগিয়েছে আনন্দ ও সম্ভোগের সহস্র উপকরণ, সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে প্রাণরসে—তার দিকে একবার শেষবারের মতো তাকিয়েও যেতে পারলেন না। চোখই খুললেন না আর। শুধু শেষ মুহূর্তে একবার যেন কথা বলার মতো ক'রে ঠোঁট দুটো নড়েছিল—কিন্তু কোন স্বর বেরোয় নি। ইষ্টের নাম উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছিলেন—কিম্বা কোন প্রিয়জনের নাম—তা কিছুই বোঝা গেল না।...

ডাক্তাররা কেউ বললেন, 'এও এক ধরনের সন্ন্যাস রোগ, মাথায় রক্ত উঠে ভেতরের শির ছিঁড়ে গেছে।'—কেউ বললেন, 'মাথায় বাত উঠেছে, সেও নাকি হয় কারও কারও।' কেউ বা মত প্রকাশ করলেন, 'আসলে হার্টটাই ড্যামেজ্‌ড্‌ হয়ে এসেছিল, উনি অতটা লক্ষ্য করেন নি, আগে থেকে সাবধানও হন নি। তাই এ বিপত্তি।...তবু যদি সঙ্গে সঙ্গে কেসটা হাতে পেতুম—হয়ত কিছু করা যেত। অন্তত ভাল রকম একটা এফোর্ট দিতে পারতুম।'

যে যা-ই বলুন, কিছু তর্কও করলেন চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে—আসল ঘটনা যেটা, সেটা হ'ল—মৃত্যু। কোন কারণ জানা গেল না সঠিক—কিন্তু জানলেও বোধ করি কোন সান্ত্বনা লাভ হ'ত না, মানুষটা ফিরে আসত না আর কিছুতেই। 'ডেথ ডিউ টু ফেলিয়োর অফ হার্ট'—এই সার্টিফিকেট লিখে দিলেন ওঁদের বাড়ির ডাক্তার নীলরতনবাবু। সেইখানেই তাঁদের দায়িত্ব ও চিন্তার শেষ হয়ে গেল। সম্ভবত ভুলেই গেলেন 'কেসটা'—দু-একদিনের মধ্যেই।...

সুরবালা এসব কিছুই জানত না। এত বড় দুর্ঘটনার কোন সংবাদই পায় নি। সে নিশ্চিন্ত ছিল—রাজাবাবু কোন্ এক পাবনা জেলায় কোন্ এক গ্রামে তাঁদের কাছারীবাড়িতে বসে প্রজাদের আর্জি শুনছেন। কোন পরমাত্মীয় বা প্রিয় ব্যক্তি বিদেশে থাকলে সাধারণত যতটা দুশ্চিন্তা হয়—তার চেয়ে বেশী কোন চিন্তা ছিল না। শুধু অধীর আগ্রহে দিন গুনছিল—এক সপ্তাহ বলে গেছেন, তার কদিন আর বাকী রইল। গত দুদিন যে এই কলকাতা শহরেই মাত্র আধ ক্রোশের মধ্যে পড়ে রইলেন মানুষটা—সে খবরও কেউ দিয়ে যায় নি ওকে, লোক-পরম্পরায়ও কোন খবর পায় নি। আগে আগে সরকারমশাই রোজ একবার ক'রে সংবাদ নিয়ে যেতেন, এখন পুরনো চাকর গিরিধারীই বাজারহাট করে, বিশেষ কোন জিনিসের দরকার থাকলে রাজাবাবু কিনিয়ে রাত্রে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন। সরকারমশাই কখনও-সখনও কালে-ভদ্রে আসেন আজকাল। তাই সেদিক দিয়েও খবর পাবার বা নেবার কোন প্রশ্ন ওঠে নি—অথবা সরকারমশাই কেন

আসছেন না বলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠারও কারণ দেখা দেয় নি। সরকারমশাইয়েরও এই দুদিন অন্য কোন কথা মনে ছিল না—একবার দু মিনিটের জন্যেও বিশ্রাম নিতে পারেন নি—বা অন্য কোন কাজ করতে পারেন নি।

তবু তিনিই মনে করলেন। মৃত্যুর পর সৎকারের প্রাথমিক আয়োজনগুলো শেষ হয়ে গেলে—আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, এ'দের আত্মীয়েরা বেশির ভাগই এই আহিরীটোলা শোভাবাজার বৌবাজারে পোস্তায় থাকে, খুব দূরে থাকলেও চুঁচড়োর ওধারে কেউ নয়, তারা সকলেই এই দু-দিনের মধ্যে খবর পেয়ে গেছে—সরকারমশাইয়েরই প্রথম মনে পড়ল সুরবালার কথাটা। বহুদিনের প্রবীণ লোক, রাজাবাবুর সঙ্গে মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ছাড়িয়ে একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, অনেক সময় তিনি অনেক জটিল পরামর্শও করতেন এই সামান্য বেতনের কর্মচারীটির সঙ্গে। তিনি সুরবালাকে দেখেছেনও সেই প্রথম থেকে, বাগানবাড়িতে খবর নিতে যেতে হ'ত তাঁকে।

প্রথম প্রথম বাবুর রক্ষিতার ফরমাশ খাটতে হচ্ছে—এমনি একটা অভিমানবোধ ও বিরূপতা থাকলেও সুরবালার ভদ্র বিনম্র ব্যবহারে সেটা কেটে যেতে দেরি হয় নি। সুরবালা যেমন খাতির করত, গেলে আগে বসাত, পান জল খাবারের ব্যবস্থা করত, এমন আদর-অভ্যর্থনা তিনি কোনদিন রাজাবাবুর অন্তঃপুরে পান নি, ছেলেমেয়েরা সুদ্ধ স্বল্প বেতনের কর্মচারীকে সেইভাবেই দেখত, তার সঙ্গে সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার করা সম্ভব তাও তারা জানত না। সুরবালার আচরণে—সমান অবস্থার মানুষের মতো সহজ অন্তরঙ্গ অথচ সসম্মান ব্যবহারেই সরকারমশাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বিরূপতা বা বিদ্বেষ স্নেহ ও প্রীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি ইদানীং সুরোকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। রাজাবাবুর স্ত্রীকে 'রাণীমা' বলতেন বাধ্য হয়ে—সুরবালাকে 'মা' বলতেন স্বেচ্ছায়, মন থেকে। বলতেন, 'মা, তুমি যে বামুনের মেয়ে আর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে—এ কাউকে বলে দিতে হয় না। আমরা এই কলকাতার কায়েত, বনেদী ঘরের ছেলে, অভাবে পড়ে এখানে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু বনেদীয়ানা দেখলেই চিনতে পারি। আমরা যে কাউকে কাউকে ছোট জাত বলি, নিহাৎ অকারণে বলি না—তাদের ব্যবহারেই সেটা যেন ছাপমারা থাকে। পয়সা যতই হোক সে ছাপটা উঠতে চায় না।' বলতে বলতেই হয়ত সচেতন হয়ে যেতেন। 'তবে হ্যাঁ—দু-একজন কি আর এ হিসেবের বাইরে হয় না, তাও হয়। সে হ'ল গে ভগবানের আশীর্বাদ—গেল জন্মের সুকৃতি। কিম্বা গেল জন্মেরই পাপের ফল, হয়ত বামুনের ঘরের লোক এজন্মে অন্য ঘরে এসে পড়েছে, সে সংস্কারটা যায় নি।'

কাদের কথা বলতে চাইছেন সরকারমশাই, সুরবালা তা বুঝত। মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও তাঁর সামনে চুপ ক'রে থাকত। রাজাবাবুকেও কোন-দিন বলে নি এসব কথা। হাজার হোক তাঁর আত্মীয়—আপনজন, তাঁর স্বজাতির কথা—খুশী হবেন না শুনলে, চটে যাওয়াও বিচিত্র নয় সরকারের ওপর।...

সরকারমশাই-ই উদ্‌ভ্রান্তভাবে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে এসে খবরটা দিলেন। একটা গাড়ি ক'রে আসার কথাও মনে পড়ে নি তাঁর, গায়ে পিরান আছে—সেটাও কোনমতে পরা, চাদর নেই, পায়ে জুতো নেই—পাগলের মতোই সমস্ত পথটা ছুটতে ছুটতে এসেছেন।

নিচে নিস্তারিণী ছিল। সে ওঁকে দেখে কি বুঝল কে জানে সেও চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। সেই কান্নার শব্দেই ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে এল সুরবালা।

'কী—কী হয়েছে সরকারমশাই? কার কি হ'ল!'

'আর কি হ'ল মা, তোমার আমার—আমাদের সবাইকারই সব্বনাশ হয়ে গেল। মা,

মাগো—এ খবর কী ক'রে তোমায় বলব মা, আমার মুখ দিয়ে যে বেরোতে চাইছে না।'

তবু বুঝতে পারে না সুরবালা।

রাজাবাবুর স্ত্রী? কোন ছেলে মেয়ে? জামাই? পুত্রবধূ?

এদের কেউ মারা গেছে? কিম্বা খুব অসুস্থ?

রাজাবাবুর কথাটা একবারও তার মাথায় এল না।

তিনি তো এখনও পাবনায়। তাঁর খবর এরা কেমন ক'রে জানবে! তাঁর তো আসারও সময় হয় নি।

'কী—কী হয়েছে সরকারমশাই! আমি যে—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! ভেঙে না বললে—'

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সুরবালা।

'আমরা যে অনাথ হলুম মা—এখনও কি বুঝতে পারছিস না! তোর যে সব্বনাশ হয়ে গেল। ইন্দ্রপাত ঘটে গেল যে! রাজাবাবু—কেমন ক'রে মুখে উচ্চারণ করব মা!' আবারও হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে ওঠেন তিনি।

'য়্যাঁ!'

একটা আকুল আর্তস্বর, মনে হ'ল কোন মানুষের গলা নয়—যেন কোন ধাতব যন্ত্রের মধ্যে থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ম আওয়াজ বেরিয়ে এল, সে স্বর এই উঠোনে ধরা সম্ভব নয়—মনে হ'ল চারিদিকের দেওয়াল বিদীর্ণ ক'রে কোথায় যেন বেরিয়ে চলে গেল—চতুর্দিকের স্বরমণ্ডলীকে তীক্ষ্ম তীরবিদ্ধ ক'রে—কিছুক্ষণের জন্য নিঃশব্দ নিস্পন্দ ক'রে দিয়ে। এ রকম একটা শব্দ এর আগে কেউ কখনও যেন শোনে নি, যার কানে গেল—যেন অসাড় ক'রে দিল তার শ্রবণশক্তি।

তারপরই হাহাকার ক'রে উঠল সে, 'না না সরকারমশাই, সে কি ক'রে হবে! সে হ'তে পারে না। তিনি যে—তিনি তো পাবনা গেছেন। তাঁর তো ফিরতেই এখনও দেরি। ভুল করছেন আপনি, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী বলতে কী বলছেন। অন্য কার কথা বলছেন, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আপনার!'

হাহাকার ক'রে উঠেছে নিস্তারিণীও। সে বুঝেছে সরকারমশাইয়ের কথা। তারও যথেষ্ট শোকের কারণ ঘটেছে, আঘাতও কম লাগে নি। পূর্বেকার বিদ্বেষ স্নেহে পরিণত হয়েছে বহুদিন। রাজাবাবু তাঁর ভদ্র ব্যবহারে, অকৃত্রিম মনোযোগে ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে জামাইয়ের পদবীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন নিস্তারিণীর মনে—বরং পুত্রস্থানই অধিকার করেছিলেন কতকটা কিন্তু তবু তার অতটা বিমূঢ় বা বিহ্বল অবস্থা হয় নি, এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে পেরেছে সে।

সে হাহাকারে সরকারমশাইয়ের কান্নাও মিলিত হয়। তিনি বলেন, 'ওরে মা রে, ভুল হ'লে যে আমি বাঁচতুম মা। সত্যিসত্যিই কেন ভীমরতি হ'ল না আমার। এ খবর দেবার আগে, এ দেখবার আগে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না। পাবনা যাওয়া হয় নি যে মা বাবুর! পথের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সেই অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনে ওরা—তারপর দুদিন মাত্র; মোটে এই দুটো দিন সময় পাওয়া গিয়েছিল—ডাক্তার বদ্যি, মানুষের যা সাধ্য সবই করা হয়েছে—কিছুতেই কিছু হ'ল না। এই বেলা দশটার সময়—সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই—সব শেষ। ওঃ, বাপ রে! বুক বুঝি ফেটে যায় রে মা—আর যে পারছি না আমি সইতে। আজ চল্লিশ বছর এক জায়গায় কাজ করছি, অন্য কোন কাজ অন্য কোন মনিব জানতে হয় নি। মনিব নয়—বড়ভাই-ই ছিলেন তিনি, যথার্থ বন্ধু। ওঃ, এর আগে আমি যেতে পারলুম না, আমি গিয়ে তিনি থাকলে অনেক লোকের উপকার হ'ত যে মা, এ যে একসঙ্গে সবাই অনাথ হলুম রে!...যাই—যাই আমি—'

এলোমেলো অসংলগ্ন পাগলের মতো ক'রে কথাগুলো বলে হঠাৎই আবার বেরিয়ে

চলে গেলেন সরকারমশাই, যেমন কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এসেছিলেন—তেমনি ভাবেই।...

কিছুই জানা গেল না আর। সে মৃতদেহ কোথায়, কখন বেরোবে শবযাত্রা, কোন্ শ্মশানে যাবে—একবার শেষবারের মতো দেখা সম্ভব কি না—কিছুই না। একেবারে সমস্তক্ষণই অচৈতন্য হয়ে ছিলেন, না একবারও জ্ঞান হয়েছে—কিছু বলতে পেরেছেন কিনা, শেষ মুহূর্তে সুরবালার কথা মনে ছিল কিনা—তাও জানা হ'ল না। অবশ্য এসব প্রশ্ন করার অবস্থাও ছিল না সুরবালার, কেউ নিজে থেকে বললেও মাথায় যেত না তার। সরকারমশাই লক্ষ্য করেন নি অত, নিস্তারিণীও না—সুরবালা সেই যে সিঁড়ির শেষ ধাপটায় ধপ্ ক'রে বসে পড়েছিল, সেইখানে বসে সেই অবস্থাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সরকারমশাইয়ের শেষ কথাগুলোও সম্ভবত তার কানে যায় নি। তিনি যে উদ্‌ভ্রান্তের মতোই কখন চলে গেলেন তাও টের পেল না...।

ঝি-চাকররা বেরিয়ে এসেছিল এই চেঁচামেচিতে। তখন দুপুর শেষ হয়েছে, অপরাহ্ন শুরু হয় নি—এমনি সময়টা ; পাশের বাড়ির ভাড়াটে মেয়েগুলোর দিবানিদ্রা তরল হয়ে এসেছে—তারাও কেউ কেউ ছুটে এসেছিল এই চিৎকার ও কান্নার শব্দ পেয়ে। তার মধ্যে সরস্বতী বলে মেয়েটিই প্রথম লক্ষ্য করল সুরবালার অবস্থাটা, 'অ মাসিমা—দিদি যে মুচ্ছো গেছে গো। অ গিরিধারী, জল আন্ জল আন্। পাখাটা—অ নেত্যর মা, পাখা একখানা আনতে পারছিস না! শিগ্‌গির!'

তখন সকলেই ছুটে এল চারিদিক থেকে। ধরাধরি ক'রে—নানুর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল যে ঘরটা—সেইখানে একটা মাদুরের ওপর শুইয়ে দিলে। মাথায় মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে লাগল দু-তিনজন। চাঁদুর ঘরে স্মেলিং সল্ট থাকে—তার মূর্ছার ব্যায়রাম আছে, সে স্মেলিং সল্টের শিশি আনতে ছুটল। দরকার তার নিজেরও, মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে এই কান্নাকাটিতে।

নিস্তারিণী কিন্তু ভেতরে আসে নি, সে ঠিক সেই ভাবেই বুক চাপড়ে কেঁদে যাচ্ছে। মেয়ের জন্যে তার দুশ্চিন্তা নেই। সে নিজে মেয়েছেলে, জানে যে, যে মেয়ের কপাল পোড়ে তার সয়ও অনেক। এরও সহ্য হবে। শোকে মরবে না। মরে না কেউ। অন্তত সে কাউকে শোকে মরতে দেখে নি আজ পর্যন্ত। নিস্তারিণীর নিজের শোকটা প্রবল। আন্তরিক। রাজাবাবু যে কখন ধীরে ধীরে তার গণেশের স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন তা এতকাল বোঝে নি। আজ প্রথম বুঝল। এরকম ক্ষেত্রে আঘাতের তীব্রতা পুরোপুরি অনুভব করতে সময় লাগে—ক্ষতির পূর্ণ তাৎপর্যও। রাজাবাবু যে সত্যিই মারা গেছেন সেটা সুরোর আগে বুঝতে পারলেও—সে শূন্যতা যে কতখানি, কতটা যে গেল ওদের জীবন থেকে, কতখানি সর্বনাশ হ'ল—সেটা ক্রমশ বুঝছে সে, ধীরে ধীরে—তাই শোকের প্রাবল্য কমছে না, হাহাকার বেড়েই যাচ্ছে বরং।...

সুরবালার জ্ঞান ফিরতে বেশ সময় লাগল।

এরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন হুঁশের লক্ষণ দেখতে পেল না—তখন চিন্তিত হয়ে উঠে গিরিধারীকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাবার কথা আলোচনা করছে—ঠিক সেই সময় চোখের পাতা কাঁপল তার, একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। আরও খানিক পরে চোখ খুলল সে। কিন্তু তবু তখনই কোন কথা মাথায় গেল না, বিহ্বল দৃষ্টি মেলে এদের মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। তারপর একটু একটু ক'রে সেই বিহ্বলতার মধ্যেই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পরে—বোধ করি বাইরের কান্নার শব্দটা যে নিস্তারিণীর সেটা বুঝতে পারার পর—উত্তরও পেল সে জিজ্ঞাসার। সমস্তটাই মনে পড়ে গেল এবার। ধড়মড় ক'রে উঠে বসল সে।

'শোও শোও, ও দিদি—আর একটু শুয়ে থাকো, এখনই উঠতে যেয়ো না।' সরস্বতী

ঝিনঝিঁ কাহুর বলতে যায়। হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে বাকী মেয়েরাও।

কিন্তু সুরবালা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মূর্ছার ঘোর তখনও কাটে নি, পা টলছে—তবু সেই অবস্থায়ই, টাউরি খেতে খেতে, দেওয়াল কপাট গোবরাট—যেটা সামনে পড়ছে সেটাই ধরে সামলে নিতে নিতে, সে একেবারে সদরে এসে পড়ল, সদর থেকে রাস্তায়। তার পর সেইভাবে, একবস্ত্রে ছুটল তার বহুদিন আগেকার পরিচিত পথ ধরে গঙ্গার দিকে। খোঁপাটা খুলে কাঁধে ঝুলছে, দুপুরে জামা খুলে ঘুমিয়েছিল—সে জামা গায়ে দেবার সময় হয় নি, কাপড়খানাও গুছিয়ে পরার অবসর মেলে নি—সেই আলু-থালু অসম্বৃতভাবেই ছুটে চলার মতো ক'রে হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোক অবাক হয়ে চেয়ে থাকছে—কারণ চোখে জল নেই। এ অবস্থায় কেউ কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে—দেখলে তার অর্থ বুঝতে পারে মানুষ। সুরবালার কান্না পাচ্ছে না তখনও। ঘটনাটার পূর্ণ তাৎপর্য তখনও তার মাথাতে যায় নি বোধহয়। আঘাতের যে মাত্রায় মানুষের চোখে জল আসে, তার চেয়ে অনেক বেশী আঘাত লেগেছে তার, আর লেগেছে একেবারে অকস্মাৎ, অতর্কিত ভাবে। তাই কান্নার অবস্থা আসে নি তখনও। কে দেখছে, কোথা যাচ্ছে সে, কী হয়েছে, কেন এভাবে ছুটে যাচ্ছে—তাও জানে না। শুধু যেতে হবে, আর একবার দেখতে হবে—এই জানে। সেই যে মিথ্যে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রেখে গেল, একবার জানতেও দিল না সেই বিদায়ই শেষ বিদায়—সেই প্রতারণার বোঝাপড়া করতে হবে তার সঙ্গে। জীবিত কি মৃত, তা অত জানে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না এখন, সামনে গিয়ে দাঁড়াক আগে—তারপর বুঝবে।

স্পষ্ট এরকম কোনো চিন্তা নেই তার, বুঝি কোন চিন্তাই নেই, সে সাধ্যও নেই—অর্থহীন কতকগুলো ছেলেমানুষী কথা মাথায় উঠছে এই মাত্র—একটা ঘোরের মধ্যে চলেছে, অস্পষ্ট একটা সংকল্প নিয়ে—

মেয়েরা ততক্ষণে চেঁচামেচি ক'রে উঠেছে। সরোজিনী চন্নন চাঁদু—এরাও বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। চাকর গিরিধারীও। সে চেঁচামেচিতে নিস্তারিণীরও কিছুটা সম্বিৎ ফিরেছে, সেও ব্যাপারটা শুনে, 'ওরে ধর ধর—অ মা সরো আটকা মা, ধরে ফেল যেমন ক'রে হোক—দ্যাখো, অলুক্ষুণী আবাগী মেয়ে কী কাণ্ড ক'রে বসে!' বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার মধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে সুরবালা। ও যে এত জোরে হাঁটতে পারে এখনও, এতকাল গাড়ি-পাল্‌কি চড়ার পরও—তা কে জানত!

তবু চন্নন এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরল একবার। কিন্তু এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল সে হাত। মত্ত অসুরের বল যেন তার দেহে।

কোথায় যাচ্ছে তা অবশ্য বুঝতে পারে এরা।

সরোজিনী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'নিমতলায় যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে? কাশী মিত্তিরে যদি নিয়ে যায়? একটু খবর আনিয়ে নিই না—তারপর একটা গাড়ি ডাকিয়ে গেলেই হবে বরং?'

উত্তর দেয় না সুরবালা। কিছুই বলে না। এদের কথা কানে যাচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায় না। তেমনি উন্মত্তের মতো এগিয়েই চলে শুধু। খুব সম্ভব শারীরিক অক্ষমতাতেই আগের সেই ছুটে চলার মতো দ্রুততা নেই—তবু হন-হন ক'রেই চলেছে সে। তার সঙ্গে তাল রাখতে বরং এদের ছুটতে হচ্ছে।

ওরা যখন নিমতলার ঘাটে পেঁছিল তখন রাজাবাবুর শব এসে গেছে। কাজ-করা বড় বোম্বাই খাটে অজস্র ফুল দিয়ে সাজিয়ে এনেছে তাঁকে। সেটা দূর থেকেই দেখা গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা হয়ে উঠল না। অসংখ্য লোক এসেছে শবযাত্রায়—তিন ছেলে, দুই জামাই, তিন-চারটি ভাইপো, মামাতো খুড়তুতো পিসতুতো ভাই-ভাইপোরা

—শালা, শালার ছেলে, ভায়রা-ভাইয়ের দল, তাদের ছেলেরা—এ ছাড়া তাঁর অগণিত কর্মচারী। বস্তুত তারা একটা ব্যূহ রচনা ক'রে রেখেছে চারিদিকে। সে ব্যূহ ভেদ ক'রে ভেতরে যাওয়া অসম্ভব। ওরা যখন ঢুকছে তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে—খাটটা নামানো হচ্ছে,তাই এক পলক দেখতে পেয়েছিল তবু, নইলে তাও দেখা হ'ত না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুরবালা সেইদিকে চেয়ে।

তখনও তার চোখে জল নেই, ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট চেপে বসা—এতটুকু স্পন্দন নেই তাতে। কান্নার কোন লক্ষণই নেই। যেন পাথর হয়ে গেছে সে, কোন এক অজ্ঞাত অভিশাপে।...

শবযাত্রীরাও দেখেছে ওদের। চিনতেও ভুল হয় নি। ঘৃণায় আর বিদ্বেষে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাদের ললাট আর ওষ্ঠাধর। চুপি চুপি কি আলোচনাও করছে। সম্ভবত ওদের স্পর্ধা দেখেই অবাক হয়ে গেছে।...

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল আয়োজন সম্পূর্ণ করতে—চিতা সাজাতে। এই সমস্তক্ষণ এরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সুরবালা আছে বলেই এদেরও থাকতে হয়েছে। নিস্তারিণী আসে নি শেষ পর্যন্ত, আসতে পারে নি। খানিকটা এসে ফিরে গেছে। আছে ভাড়াটে মেয়েরা পাঁচ-ছজন আর গিরিধারী। মেয়েরা দু-একবার হাত ধরে নাড়া দিয়েছে সুরবালার, কথা বলেছে, কাঁদাবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পাষাণে প্রাণের লক্ষণ জাগে নি। সেইভাবে নির্নিমেষ নেত্রে ঐ দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরো। মনে হচ্ছে ঐ যে মানুষগুলো তার দয়িত তার দেবতার চার পাশে প্রাচীর রচনা ক'রে রেখেছে—তাদের দেখতেই পাচ্ছে না সে,—অথবা তাদের দেহগুলো ভেদ ক'রে দৃষ্টি চলে গেছে সেইখানে—সেই লোকটির কাছে, যার দিকে চাইলে যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায় ওর দৃষ্টি স্নিগ্ধ মধুর হয়ে আসে—অথবা এতকাল আসত।...

হরিধ্বনি দিয়ে ঠিক যখন চিতায় তুলছে ওরা শব, সেই সময়—আজ এই প্রথম—যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো প্রাণলক্ষণ দেখা দিল নির্জীব জড় পাষাণ-প্রতিমায়। বোধহয়, মনে হ'ল, উত্তপ্ত আরক্ত লৌহশলাকার মতোই ঐ পবিত্র হরিধ্বনি আজ তার কর্ণমূল ভেদ ক'রে মর্মে গিয়ে লাগল, সেই জ্বালাতেই ছট্‌ফট ক'রে নড়ে উঠল যেন ; তারপর কী ঘটল, কি করছে, কি করতে যাচ্ছে—তা এরা কেউ ভাল ক'রে বোঝবার আগেই সুরো পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই জীবন্ত মানুষের পাষাণ-প্রাচীরে—ঠেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চেষ্টা করল ভেতরে যাবার—চিতার কাছাকাছি গিয়ে পেঁছবার। একবার, আর একটি বার দেখা যে করতেই হবে তাকে, শেষবারের মতো—জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'কেন তুমি এমন ক'রে চলে গেলে, কোন্ অভিমানে, আমি কি করেছিলুম তোমার?'

কিন্তু তারা অনেক লোক। সম্ভবত এই রকম একটা আক্রমণ হ'তে পারে—তাও জানত। নিহাৎ অতর্কিতভাবে গিয়ে পড়েছিল বলেই দু-চারজনকে ঠেলে সরিয়ে একটু-খানি ভেতরে যেতে পেরেছিল, তবে তার মধ্যেই বাকী সকলে সতর্ক হয়ে উঠেছে। কে একজন রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আবার, সেই জীবন্ত প্রাচীরের বাইরে পাঠিয়ে দিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যারা, তারাই বেশী মারমুখো—বেশী কঠোর।

'আস্পদ্দা তো কম নয়!'

'কে ও মাগীটা? পাগলী নাকি?'

'পাগলী কেন হবে—সেয়ান পাগল বোঁচকা আগল। ঐ যে সে-ই মাগীটা, মামাবাবুর ঢেমনি—সেই কেত্তনউলী। দ্যাট ভ্যাম্পায়ার উয়োম্যান!'

'সেই ডাইনী মাগীটা! তাই নাকি? সাহস তো কম নয়! জলজ্যান্ত মানুষটাকে চুষে খেয়ে ফোঁপরা ক'রে দিলে—লোকটা পড়ল আর ম'ল, একটা চিকিৎসা পর্যন্ত করার সময় মিলল না—তবু এখনও মায়া ছাড়তে পারছে না? আবারও কি করতে এসেছে

মাগী!? আরও কি চায়?...মড়াটাকে চিবিয়ে খাবে নাকি?...রাক্কুসী বল!'

'তা বলতে! দেখছিস না ডাকিনী-যোগিনীর দল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।'

নানাবিধ মন্তব্য উঠতে থাকে সেই মানবপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশ থেকে। কে বলছে, কারা—তা কেউই অত জানে না। সেই একটা চরম মুহূর্তে কারুরই কোন উপস্থিতি বিশেষভাবে চিহ্নিত করার সাধ্য নেই, সকলেই একটা আবেগে দুলছে, কার সামনে কোন্ কথা বলতে নেই—সে হিসেবও করছে না কেউ।

কথাগুলো আস্তে বলা হয় নি। দূর থেকেই সরো চমন চাঁদু প্রেকাশী—ওরা শুনছে। কিন্তু সুরবালার কানে এর একটা শব্দও বোধহয় ঢোকে নি। কে ধাক্কা দিচ্ছে, কতটা রূঢ় তাদের আচরণ—সে সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। সে পাগলের মতোই আবার অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল—কোনমতে পাশ কাটিয়ে গলে যাওয়ার। একবার দেখতে দিতে এত আপত্তি এদের কিসের! কৈ, এতদিন তো কেউ টুঁ শব্দও করতে পারে নি। সবাই তো জানত, ওবাড়ি থেকেই কত দিন কত কি জিনিস এসেছে, জমিদারীর ফসল, বাগানের ফলফুলুরি, প্রজাদের দেওয়া ঘি ক্ষীর—ওবাড়ির চাকরই পেঁছে দিয়ে গেছে, তারা সসম্ভ্রমে 'ছোটমা' অথবা 'ছোটা মাইজী' বলেই সম্বোধন করেছে বরাবর—এই মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই এত পরিবর্তন তার ভাগ্যের—এখনও তো বোধহয় মৃত-দেহটা শীতল হয় নি সম্পূর্ণ!

কিন্তু সে যাই হোক, যাওয়া গেল না কিছুতেই। এবার একজন যথেষ্ট জোরেই ধাক্কা দিল—সুরো ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একটা নিবন্ত চিতার গরম ছাইয়ের ওপর, ডান হাতের কনুইয়ের কাছটা ইঁট না কাঠ কিসে লেগে কেটে গেল খানিকটা।

কে একজন যেন বলে উঠল, 'দে না যেতে, চিতাতে গিয়ে উঠুক! দেখি ভালবাসার দৌড়টা!'

'সার্টেনলি নট! জ্যান্তে যা করেছে করেছে—এখন মড়াটাকে অপবিত্র করতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।' আর একজন প্রতিবাদ ক'রে উঠল প্রবলভাবে।

তবুও, সেই অবস্থাতেও উঠে আর একবার চেষ্টা করত হয়ত—কিন্তু ততক্ষণে মেয়েগুলো এসে চেপে ধরেছে চারিদিক থেকে। ওরা পাঁচ-ছজন—সুরো একা। সেও প্রাণপণ ছাড়াবার চেষ্টা করেছে বটে—ওরাও প্রাণপণেই চেপে ধরেছে। সেই কয়েক জোড়া হাতের মধ্যে পড়ে অসহায়ভাবে ছট্‌ফট করতে লাগল সুরো, বেঁকেচুরে ছাড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল অনেক রকমে—সুবিধা করতে পারল না।...

তখনও কে একজন বলছে—এদের কানে গেল, 'পুলিস কোথায় গেল! বার্নিং ঘাটে পুলিস থাকত না এর আগে?...ভদ্রলোকরা একটু শান্তিতে মড়াও পোড়াতে পারবে না—এই খান্‌কী মাগীগুলোর জ্বালায়!'

আর একজন বলে উঠল, 'কাউকে পাঠাও না সেজদা থানায় একবার, নিয়ে আসুক কটা কনস্টেবল।'

এসব অপমান সুরোকে স্পর্শ করল না, তার কারণ তখন ওর কোন বাহ্যজ্ঞান নেই—এদের চোখে জল এসে গেল। প্রেকাশী চিরদিনই একটু ঠোঁটকাটা, সে বেশ একটু চেঁচিয়ে ওদের শুনিয়েই বললে, 'কোথায় যাচ্ছ দিদি, তুমি বামুনের মেয়ে সতীলক্ষ্মী—যার ঘর করেছ তাকে স্বামী জেনেই করেছ—তোমার ওসব ইত্তিক জাতের মড়া কি ছুঁতে আছে! আর কি-ই বা দেখবে, যাকে তুমি জানতে যার সংগে এতকাল ঘর করলে—সে তো আর নেই, ও তো তার খোলশটা। হাসিমুখে চলে গিয়েছিলেন—সেই মুখ মনে আছে, তাই তো ভাল। এ মুখ আর দেখে কাজ নেই। চলো আমরা চান ক'রে চলে যাই। এদের সামনে চোখের জল ফেললেও তোমার অপমান।'

ওরা আর দাঁড়াল না সেখানে। সুরবালাকে একরকম জোর ক'রেই ধরে নিয়ে দূরে

সরে এল। আরও কি কটূ কথা বলবে লোকগুলো তার ঠিক কি! শোকের সময় মৃতের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কলহ-কোঁন্দল করে লাভ নেই।...

দেখা হ'ল না। আর দেখা হ'ল না। একবারটি শেষবারের মতো সেই প্রিয় মুখখানাকে দেখতে দিতেও ওদের এত আপত্তি কেন?...সুরবালার বিবশ বিহ্বল মস্তিষ্কে শুধু এই প্রশ্নটাই বার বার জাগে। সবাই তো জানে তিনি ওকে কত ভালবাসতেন, তাঁকে ওরাও ভক্তি করে, তাঁর জন্যে ওদেরও শোক কম হয় নি হয়ত—তবে তাঁর এত প্রিয় মানুষটাকে একবার কাছে যেতে দিচ্ছে না কেন? তিনি কি খুশী হচ্ছেন এতে—ওঁদের ওপর?

মুখাগ্নি শেষ হ'ল। ধোঁয়া দেখেই বোঝা গেল চিতায় আগুন দেওয়া হয়েছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে দেহটার বোধহয় কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেই স্নিগ্ধ প্রসন্ন চোখ দুটি—যা দেখে একদা প্রেমে পাগল হয়েছিল সুরবালা—তাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। কালো হয়ে ঝলসে গেছে বোধহয় মুখখানা এর মধ্যেই—

আরও একবার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠল সুরবালা কিন্তু এগোতে পারল না। এরাও তার চারপাশে ব্যূহ রচনা ক'রে রেখেছে।

সরস্বতী আস্তে আস্তে বলল, 'দিদি, চলো আমরা চান ক'রে নিই—।'

এই প্রথম কথা বলল সুরো, যেন চমকে উঠল, 'চান? কেন?'

'চান করতে হয় এখানে এলে। তাছাড়া—তোমার তো করাই উচিত।'

'আমার করাই উচিত?' ছেলেমানুষের মতো স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুরবালা, ছেলেমানুষের মতোই বলে, 'চলো তাহলে।'

এত সহজে সে রাজী হবে এখান থেকে সরে যেতে—তা ওরা ভাবে নি। তবু সকলেই একরকম ঘিরে নিয়েই এ ঘাটে এল, স্নানের ঘাটে। সেইভাবেই আস্তে আস্তে জলেও নামল। গিরিধারী ওকে ধরে নি—তবে সেও কাছে-কাছে ছিল, কাছেই রইল।

পর পর ডুব দিল কয়েকটা। বেশ স্বাভাবিকভাবেই দিল, যেমন স্নানের সময় মানুষ দেয়। মনে হ'ল গঙ্গার জলে এবার তার চোখের জলও মিশেছে। একটুখানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এরা। মাথায় জল পড়েছে যখন, চোখের জলও যদি বেরিয়ে থাকে—আর ভয় নেই। এবার ওরাও নিজেদের মতো স্নান সেরে নিল। কেউই প্রস্তুত হয়ে আসে নি, সকলেই প্রায় ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে। কাপড়-চোপড় এদেরও যথেষ্ট নেই, চাদর তো নেই-ই কারও। জলে দাঁড়িয়েই তাই যথাসম্ভব সেই এক বস্ত্রই গুছিয়ে পরে নিতে লাগল। এখনই এই ভিজে কাপড়ে বহু কৌতূহলী বিদ্রূপ চঞ্চল দৃষ্টির সামনে দিয়ে ফিরতে হবে। গাড়ি যদি বা পাওয়া যায়, ওপরে উঠে ঘাটের বাইরে না গেলে তো নয়।...

একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সবাই—তাও বোধহয় দু-এক মিনিটের বেশী নয়—হঠাৎ চাঁদুর নজরে পড়ল ব্যাপারটা, 'ওকি, ওকি—এই দ্যাখো, ও সরোদি, দ্যাখো দ্যাখো পাগলী কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে বুঝি!'

সকলে চমকে চেয়ে দেখল, সুরবালা বহু দূরে এগিয়ে চলে গেছে তাদের থেকে, এখনও এগিয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে জলের মধ্যে, এখনই গলাজল হয়ে গেছে, আর একটু এগোলেই ডুবে যাবে—

ঘোলা জল গঙ্গার—একবার ডুবলে আর দেখা যাবে না কোন্ দিকে গেল। ভাঁটার টান শুরু হয়েছে—এখনই হয়ত কোন্ অতলে টেনে নিয়ে যাবে।

সরোজিনীও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তাই তো, ও গিরিধারী, যা যা বাবা, তুই তো সাঁতার জানিস—যা যা ছুটে গিয়ে ধরগে যা—। আ মলো—সঙের মতো চেয়ে আছিস কি, এখন কি আর অত ভাবতে গেলে চলে গায়ে হাত দিবি কিনা। যা যা, ডুবে গেল যে—!'

সত্যিসত্যিই একটু দ্বিধা ছিল গিরিধারীর মনে। সে সরোজিনীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে কাছে গিয়ে একটা হাতের কনুইয়ের কাছটা ধরে ফেলল সুরবালার।

সুরো এবারও এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু গিরিধারী জোয়ান হিন্দুস্থানী, তাছাড়া সে এই রকম একটা প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুতই ছিল খানিকটা—তার বজ্রমুষ্টি ছাড়াতে পারল না। বরং তার আকর্ষণেই আবার পাড়ের দিকে ফিরে আসতে হ'ল।

বিকেলে তখন মেয়েদের ঘাট জনবিরল, তবু একজন বোধহয় কোন ব্রত-উপবাস উপলক্ষে সেই অবেলায় স্নানে এসেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে গা ওর? ওকে অমন ধরে নে যাচ্ছ কেন?'

'আর হয়েছে!' প্রেকাশী যেতে যেতেই মন্তব্য করল, 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, খুব ফাঁড়া গেছে বাপু। কিছু একটা হ'লে বুড়ির কাছে কি জবাব দিতুম! তার ওপর থানা-পুলিসে টানাটানি শুরু হ'ত। এখন ভালয় ভালয় গিয়ে বাড়ি প'ওছাতে পারলে হয়। গিরিধারী, এবার আমরা দেখছি, তুই গিয়ে একটা গাড়ি ধর দিকি। আমাদের সব কজনকে নিতে হবে কিন্তু, আগে থাকতে বাঁচিয়ে নিবি। তুই বরং কোচবাক্সয় বসে থাক।...পাঁচ আনা ছ আনা—যা নেয় দোবখন।'

ওরা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল নিস্তারিণী ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। প্রেকাশীই এক ধমক দিয়ে উঠল, 'মাসীমা, এই কি এখন তোমার কাঁদবার সময় হ'ল বাপু! কোথায় তুমি বুক বেঁধে মেয়েটাকে সামলাবে, না তুমিই কেঁদে আকুল হচ্ছ। ওকে দেখবে কে—তুমি যদি অত কাতর হয়ে পড়ো? মেয়ে তো পাগল হয়ে গেছে একেবারে। কী ক'রে যে ফিরিয়ে এনেছি তা আমরাই জানি। জ্যান্ত ফিরিয়ে আনার আর কোন আশা ছিল না তোমার মেয়েকে।'

অস্ফুট কণ্ঠে 'ষাট! ষাট!' উচ্চারণ করে নিস্তারিণী উঠে বসে। এইটুকু ভয় দেখানোতেই কাজ হয়। এবার সে সত্যিই সামলে নেয় নিজেকে। আর কেউ নেই বাড়িতে, সে আর এই মেয়ে ছাড়া। আর তো এই ঝি-চাকর ভরসা। আসল ভরসা যার—যার জন্যে এত বড় বাড়িতে কখনও ফাঁকা লাগত না, সে-ই তো চলে গেল। আর কোনদিনই আসবে না সে। এমনিই থমথম করবে শূন্য ফাঁকা বাড়ি। প্রতি মুহূর্তে গিলতে আসবে।

ওরাও অবশ্য যে-যার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে তখনই ফিরে আসে, তখন যারা সঙ্গে যায় নি—খোদন, চারু—তারাও এসে পড়ে। তাদেরই সাহায্যে নিস্তারিণী মাথা গা মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে বসিয়ে দেয়। নিচের ঘরেই বসায়—ওপরে নিস্তারিণীর ঘর বাদে দুটো ঘরই রাজাবাবুর স্মৃতিতে পূর্ণ; তাঁর ছবি তাঁর শখের জিনিস, তাঁর নিত্যব্যবহার্য নানান জিনিসপত্র—তাঁর কাপড় জামা। সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না এখন, সকলেই চুপি চুপি নিস্তারিণীকে বলল। কিন্তু এখানে বসিয়েও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। যেমন বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনিই বসে রইল সুরো—সোজা সামনের দিকে চেয়ে। সে যে কাউকে চিনতে পারছে বা কিছু বুঝতে পারছে—তা তার সেই স্থির নিশ্চল দৃষ্টি দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

চাঁদু চুপি চুপি বলে, 'ওকে যেমন ক'রেই হোক কাঁদাও মাসিমা, নইলে আধাপাগল তো হয়েই গেছে—পুরো হ'তেও আর বাকি থাকবে না।'

'কি ক'রে কাঁদাব তাই বল তোরা। এতেও যদি কান্না না পায় তো আমি বললেই কি কাঁদবে?...তোরাই তো ওপরে নিয়ে যেতে বারণ করলি। ওপরে তবু জামাইয়ের ছবি দেখলে যদি কান্না পেত—শোকটা বুঝত—? কী বলিস?'

'কি জানি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না। শেষে একটা হিতে বিপরীত হবে না তো? ডাক্তার ডাকব নাকি—হ্যাঁরে খোদন?' প্রেকাশী বিমূঢ়ভাবে বাকি সকলের দিকে চায়।...

এই সময় কোথা থেকে খবর পেয়ে নানু এসে পড়ল।

কোন খবরই পায় নি সে, রাজাবাবুর অসুখ বা মৃত্যু—কোন কথাই জানতে পারে নি। সন্ধ্যের সময় যেমন আসে—থিয়েটারে এসে শুনেছে—দুজন গেটকীপার বলাবলি করছিল। তাদের মুখে শুনেও বিশ্বাস হয় নি—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে নিমতলায়। সেখানে তখনও শবযাত্রীরা ভিড় ক'রে বসে, তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে—আবার সেইভাবেই ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। সুরোর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে—এই খবর শোনার পর—তা সে আগেই অনুমান করতে পেরেছে। এতবড় শোকে সান্ত্বনা দেবার একটাও লোক নেই—বুড়ো মা ছাড়া। না জানি কী হচ্ছে কী কাণ্ড করছে মেয়েটা—এই কথাই ভেবেছে শুধু আসতে আসতে।

এখনও—একবার মাত্র ওর দিকে চেয়েই ব্যাপারটা বুঝে নিল নানু।

বুঝল এ স্তম্ভিত অবস্থা না কাটাতে পারলে সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

সে একেবারে সুরোর পাশে বসে পড়ে, কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কি লো, অমন ক'রে বসে কেন? কী হয়েছে কি?...তুই তো সবই জানিস বোন, তুই তো এদের মতো মুখ্যু নোস। সে-লোক কি তোকে ছেড়ে যেতে পারে—না, এ তোদের এক জন্মের সম্পর্ক? তবে অমন কাতর হচ্ছিস কেন? দেহটাই শুধু গেল—আর পাবি না, কিন্তু সে তো তোর তেমনি রইল—যেমন আগেও ছিল।...মনে তো তোদের নিত্য বিহার। এতকাল এতসব কথা শুনে এলি, এত বলে এলি নিজেও—সব ভুল হয়ে গেল এই কাজের সময়? তোর জিনিস তোরই আছে—বরং এবার শুধুই তোর হয়ে গেল—আর কারও সাধ্যি নেই যে তোর কাছ থেকে এখন ছিনিয়ে নেয়।'

তারপর পকেট থেকে দুটো কাগজের মোড়ক বার ক'রে বলে, 'চা খাবি একটু? আমি আজকাল ধরেছি রে, বেশ জিনিস। সায়েবরা খায়। সেইজন্যে ওদের এত ফুর্তি সবতাইতে। এত কাজের আটা।...জননীকে তৈরী করতে বলি—কী বল্? না, ও-বুড়ি পারবে না ঠিক—এসব কিছু জানে না, নেহাৎই ধোঁকা রাঁধতে শিখেছে শুধু—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি, বুড়িকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বুড়িকেও খাওয়াবো আজ। বুড়ির জাত মেরে দেব। নে, ওঠ, চল্ দেখবি কী ক'রে করতে হয়। এরপর ক'রে খাওয়াতে হবে আমি এলে—', মৃদু আকর্ষণ করল সে ওর হাত ধরে!

এইবার সাড় ফিরল সুরবালার।

অকস্মাৎ সকলকে সচকিত ক'রে দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে!

'চা খাবে? সায়েবরা খায়, না? বেশ জিনিস। হি-হি! কে জানে বাবা, কখনও তো শুনি নি। সায়েবরা খায় বলছ? তা ওমা, সায়েবদের জিনিস আমরা খাব কেন?... হা-হা হা-হা।'

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে, হাসির ধমকে বুকে ব্যথা করে বোধহয়—কিন্তু তবু দুহাতে বুক চেপে ধরেও হেসেই যায় সে, তেমনি ভাবে হা-হা ক'রে। হাসতে হাসতেই এক সময়, এই প্রথম আজ, হাসির কষ্টেই সম্ভবত—দু চোখে জল এসে যায়, তবু হাসির বিরতি ঘটে না।

সেই অমানুষিক হাসির বীভৎসতায় স্তম্ভিত ঘরের সাত-আটটি প্রাণী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে বাধা দেবার কি ধরবার কথাও মনে আসে না কারও।

হাসির সেই আকস্মিক ও উন্মত্ত প্রচণ্ডতায় সকলেই কিছুক্ষণের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল, কি করা উচিত কেউই বুঝতে পারে নি। খানিকটা পরে নানুই প্রকৃতিস্থ হ'ল, এগিয়ে এসে সজোরে ওর গালে একটা চড় মেরে বলল, 'থাম, থাম বলছি! নইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব একেবারে।'

এইতেই কিন্তু কাজ হ'ল। অতটা হাসি অবশ্য তখনই সম্পূর্ণ বন্ধ হ'ল না—অত প্রচণ্ড বেগ এক কথায় বন্ধ হওয়া উচিতও নয়, আস্তে আস্তে কমে এল, এক সময় বন্ধও হয়ে গেল। উঠে বসে আঁচলে দু চোখ মুছে কেমন এক রকম ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বললে, 'তুমি—তুমি আমাকে মারলে! গায়ে হাত তুললে আমার!'

'বেশ করেছি। আরও মারব। তুই কথা শুনছিস না কেন?'

সেইভাবেই জবাব দিল সুরো, 'কী কথা?'

'বলছি ওঠ্, কিছু খেতে দে আমায়। চা কর্।'

'উঁহু। সে তো আজ পারব না।' খুব সহজভাবেই বলে সুরো, 'শোন নি আমার কি হয়েছে? উনি চলে গেছেন যে? আমি যে এখন বিধবা।...একটা কথাও না বলে, লুকিয়ে চলে গেলেন! একবার দেখা ক'রে বলেও গেলেন না। ওঁর এই ব্যবহারটা কি উচিত হয়েছে? তুমিই বলো! কী আমি করেছিলুম ওঁর সঙ্গে—যাতে এইভাবে আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন!...আমি কি এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিলুম যে, আমাকে একটা কথা বলে বিদায় নিয়ে যাওয়াও চলল না!'

বলতে বলতে এবার, এই প্রথম হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল সুরবালা। আগেকার হাসির মতোই এ-কান্নাও প্রচণ্ড, বুকফাটা, মর্মন্তুদ। তবু উপস্থিত সকলেই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

নেড়ী বলল, 'আর ভয় নেই নানুদা, কান্না আরম্ভ হয়েছে যখন তখন এবার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে আস্তে আস্তে।'

নানু কিন্তু অত সহজে আশ্বস্ত হ'ল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সুরোর দিকে, তেমনিভাবে সেদিকে চেয়েই ঘাড় নেড়ে বলল, 'উঁহু, কিছুই বুঝতে পারছি না!...এ কান্নাও সহজ লোকের কান্না নয়—হাসি-কান্না দুইই পাগলের বলে মনে হচ্ছে। তবু আর কিছু না হোক, যদি কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে তো বাঁচোয়া। কিন্তু আজকের রাতটা ওকে একা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। এর সঙ্গে জেগে থাকতে হবে দু-চারজন ক'রে—!'

একটু উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এদের দিকে তাকাল নানু। আজ থিয়েটারের দিন নয়, রিহার্সালও নেই বোধ হয়। তবু, বাবু আছে প্রায় প্রত্যেকেরই। তারা কি মানবে? থিয়েটারের দিনগুলো তো তাদের বাজে-খরচে ধরা থাকে—এইসব দিনই তো আসল!

সরোজিনী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর সন্দেহের নিরসন ক'রে দিল। তার রূপ আছে, রূপের দেমাকও আছে কিছু। বাবুর তোয়াক্কা সে করে না বিশেষ। সে-ই সকলের হয়ে বলল, 'ওমা, তা থাকতে হবে বৈ-কি! এমন অবস্থা দিদির—! একা ফেলে রাখব কি! আমরাই পালা ক'রে থাকব। ছুটির বার বলে হয়ত অনেকেই রেঁধে রাখে নি, বিকেলে রান্না করে তো ছুটির দিনে—কারুর আবার—দুজনের রান্না—তা যাদের রান্না করা আছে তারা এখন বসুক এখানে—বাকীরা কাজ সেরে নিক। সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমাদের নিজেদের মধ্যে ঠিক ক'রে নেব।'

'তোদের বাবুরা? আসবে না—?' স্পষ্টই প্রশ্ন করে নানু।

সরোজিনী এবার একটু লজ্জিত হয়, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'বাবুরা আসে আসবে। শুতে ইচ্ছে হয় একাই শুয়ে ঘুমুবে, নয়ত বাড়ি চলে যাবে। তাই বলে আপদে-

বিপদে মানুষকে দেখব না একদিন—এত কি দাসখৎ লিখে দিয়েছি একেবারে!'

নানু খুশী হ'ল। নিশ্চিন্তও হ'ল। বলল, 'আমিও থাকব অবিশ্যি—কিন্তু মেয়েছেলে কেউ না থাকলে—। আর একাও ঠিক ভরসা হয় না। পাগলের মতো হয়ে উঠেছে তো, কখন কি খেয়াল চাপে তার ঠিক কি!...তা এক কাজ কর বরং সরো, আজ আর কারুরই রাঁধার দরকার নেই—আমি সিমলে থেকে হিঙের কচুরী আর সন্দেশ আনিয়ে দিচ্ছি বেশী ক'রে—যাদের রান্না করা নেই—তারা ঐ কচুরীই খাক পেট ভরে। যে দু-একজনের বাবু-সুদ্ধু খাবার কথা তারা বাবুদের জন্যেও তুলে রাখবে এখন। বেশী ক'রেই আনাচ্ছি বরং?'

দেখা গেল নানুর আশঙ্কাই ঠিক। হাসি আর কান্না কোনটাই সহজ মানুষের নয়! সারা রাত ধরেই চলল এমনি ব্যাপার। কখনও হাউ-হাউ ক'রে কাঁদে—কখনও হা-হা ক'রে হাসে আপন মনেই। মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য রাজাবাবুর সংগে ঝগড়া করে। অকথ্য কুকথ্য গালাগাল দেয়—বেইমান নেমকহারাম বলে। আবার পরক্ষণেই মাপ চায়, ছেলে ভুলনোর মতো ভোলায়। 'বাপি-সোনা', 'মান্তু মানা', 'চাঁদের কণা'—এইসব বলে আদর করে। বলে, 'আর বলব না, কখনও বলব না—দ্যাখো এইবারটি!...হাসো, তাহলে বুঝব রাগ করো নি।'

নানু অনেক চেষ্টা করল সহজ ক'রে আনতে। রাজাবাবু যে নেই, আর কোন দিন আসবেন না—এই তথ্যটা মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করল বার-বার। কিন্তু কিছুতেই—মানুষের যা স্বাভাবিক শোক তার চিহ্নও দেখা গেল না। সরোজিনী একটু শরবৎ ক'রে এনে খাওয়াবার চেষ্টা করল, দু-চার চুমুক খেলও ভালমানুষের মতো—কিন্তু তারপরই খানিকটা মুখে নিয়ে কুলকুচি ক'রে ফেলে দিল সরোজিনীরই গায়ে। সরোজিনী গজ্-গজ্ করতে করতে কলঘরে চলে গেল, 'বাবু তো মেয়েদের হরদম মরছে—শোকও তাদের হয়, কিন্তু এমন ছিষ্টিছাড়া আদিখ্যেতার শোক কারুর দেখি নি বাবা, বাপের জন্মে। তাও যদি তেকেলে বুড়ো না হ'ত!...তোর তো এখনও রূপ-যৌবন নষ্ট হয় নি—টসকায় নি একটুখানি কোথাও—অমন বাবু তো দু-পায়ে জড়ো করতে পারবি—এত একেবারে মাথা খারাপ করার মতো কী হ'ল! বিয়ে-করা মাগও লোকের এমনধারা করে না—তাদের তো তবু সকল দোর বন্ধ!' ইত্যাদি—

কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই সুরোর—সে যেন খুব একটা মজা করেছে এই-ভাবে খিল-খিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

এক সময় হয়ত নানুকে বলে, 'তুমি নাকি আজ-কাল খুব ভাল নাচছ? ড্যান্সিং-মাস্টার হয়েছ নাকি? তা কৈ, তোমার নাচ তো দেখালে না একদিন?'

'আর কত দেখাব বল! সেই বিকেল থেকে তুই যা নাচাচ্ছিস—থিয়েটারে কারুর সাধ্যি নেই তেমন নাচাবে!' নানু আবারও হালকা ক'রে আনার চেষ্টা করে অবস্থাটা। সহজ-ভাবে গল্প করে মেয়েদের সংগে, তুচ্ছ তুচ্ছ কথা, থিয়েটারের ঘরের—শহরেরও নানা প্রসংগ। ভেবে ভেবে হাসির গল্প বলে, কতক বা বানিয়েই—কিন্তু সুরোর মনোযোগ সেদিকে আনতে পারে না। নানুকে যখন কথাটা বলেছিল তখনই হয়ত ঐ একবার নানুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল, তারপর আর কোন খেয়ালও নেই।

শেষরাত নাগাদ কে যেন প্রস্তাব করল ডাক্তার ডাকার। নানু বলল, 'এত রাত্তিরে কাকেই বা ডাকতে যাবো। তাছাড়া, এ পাড়ায় কাছাকাছির মধ্যে তেমন তো কোন ডাক্তারও নেই। ভাল ডাক্তার সব সেই হ্যারিসন রোডে—মেডিকেল কলেজ হিন্দু কলেজের কাছা-কাছি। তা তারাই কি আর এত রাত্তিরে আসবে? দেখি আর একটু—না হয় তো সকাল-বেলা কৈলেস বোসকেই খবর দোব। বেশী ফী লাগবে—কিন্তু এ যা অবস্থা, এখন আর

টাকার মায়া করলে চলবে না।'

চাঁদু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, 'এসব ব্যামোয় শুনেছি কবরেজীই ভাল। তা একবার বিজয়রত্ন কবরেজকে খবর দিলে হয় না?...না হয় তো ঝামাপুকুর রাজ-বাড়িতে দাতব্য কবরেজখানা আছে, বিনি পয়সায় হ'লেও তাদের নাকি চিকিচ্ছে ভাল। আমার এক মাসীকে সেবার—'

প্রেকাশী ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলে, 'তুই চুপ কর দিকি!...এসব ব্যামোয়—! ব্যামোটা আবার কি! ও কি সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে নাকি? ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে আনবি নি বলে দিলুম!...আচমকা ধাক্কাটা খেয়েছে তাই অমনি পাগলের মত হয়ে উঠেছে। তাই বলে কি আর অমনি চির-জন্মের জন্যে পাগল হয়ে গেল! আমাদের বাবু বলে, ওসব হিস্টিরিয়া। হঠাৎ কোন ঘা খেলে, শোকে—এমন কি আহ্লাদেও মানুষের নাকি হিস্টিরিয়া হয়—তাতে এমনিধারা হাসে কাঁদে মুচ্ছো যায়। দুদিন যাক—আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।'...

ঠাণ্ডা হয়ে আসেও। ভোরের দিকে, বোধহয় অতিরিক্ত শারীরিক ক্লান্তিতেই, শান্ত হয় একটু। হাসি কান্না দুটোই বন্ধ হয়। চুপ ক'রে নির্জীবের মতো পড়ে থাকে।

নেড়ী চুপিচুপি বলে, 'এইবার একটু গরম দুধ দাও না মাসিমা। এখন হয়ত মুখের সামনে ধরলে খাবে—'

'না, না—এখনই আর ঘাঁটাতে যাস নি। বিরক্ত করতে গেলে আবার হয়ত এখুনি ক্ষেপে উঠবে।' নানু বারণ করে তাড়াতাড়ি, 'আর একটু যাক, একটু থিতোতে দে আঘাতটা। একবেলা না খেলে মানুষ মরে যায় না। বরং শরীরের ক্ষমতা কমলে মাথাও ঠাণ্ডা হবে।'

একটু বেলা হ'তে নিস্তারিণী ওকে ধরে কলঘরে নিয়ে গেল। তাতে আর সরোজিনীতে মিলে চান করিয়ে দিল ভাল ক'রে। শান্তভাবেই চান করল সুরো, নিজেই কাপড় ছাড়ল, চুল মুছে স্থির হয়ে বসল আবার। নিস্তারিণী দুধ গরম ক'রে এনে দিতে খেলেও দু-এক চুমুকই। তাইতেই যেন অনেক শান্তি নিস্তারিণীর—সে আর বেশী খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়িও করল না। তার কেমন ভয় ধরে গেছে, কোন কারণেই আর উত্ত্যক্ত করতে চায় না মেয়েকে।

সরোজিনীরা সারারাত জেগে বসে ছিল—দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি এক মিনিটের জন্যেও। তারাও এবার অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের বাড়ি চলে গেল। সেদিন আবার থিয়েটারের দিন। তার মানে সেদিনও রাতজাগা। সকাল-সকাল স্নান খাওয়া সেরে একটু অন্তত ঘুমিয়ে নিতে না পারলে চলবে না। আগের দিন বাবুরা ফিরে গেছে, আজ তাদের কাছেও ছুটি নিতে পারবে না। তাছাড়া আর এখানে তেমন দরকারও তো নেই। ঠাণ্ডা হয়েছে—মাথায় জল পেটে খাবার পড়েছে—শ্রান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়বে এবার।

নানুও আর মিনিট কতক দেখে বাড়ি গেল। তার দাদারও খুব অসুখ, একটু খবর নেওয়া দরকার। তবে সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে আবার—আশ্বাস দিয়ে গেল।...

নিশ্চিন্ত একটু নিস্তারিণীও হয়েছে। পাগলামিটা বন্ধ হয়েছে, তাদের কথা শুনছে, সব চেয়ে বড় কথা—নিজে থেকেই খেয়েছে কিছু, জোর করতে হয় নি—এবার একটু একটু ক'রে সহজ হয়ে আসবে। শোক থাকবে বৈকি, এতখানি ভালবাসা যেখানে ছিল, ঐ এক বই অন্য কাউকে কখনও জানে নি, অন্য কোন পুরুষের দিকে তাকিয়েও দেখে নি কখনও—সে লোককে কি আর এক কথায় বিদেয় দিতে পারে! ওর রক্তমাংসে মিশে গিয়েছিল যে বলতে গেলে। নিস্তারিণীরই তো যেন বত্রিশ নাড়ীতে টান পড়েছে, সুরবালার যে কি হচ্ছে ভেতরটায় তা কি আর বুঝতে পারছে না? তা নয়, শোক করুক,

বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদুক খানিকটা—সেটা বোঝা যায়। পাগলামি দেখলে যে ভয় করে।

নিস্তারিণী আর একটু দেখে—শুয়ে পড়বে এবার এই আশায়—বিছানাটা টান ক'রে গুঁজে বালিশ সাজিয়ে হাতে ক'রেই ঝেড়ে সাফ ক'রে দিয়ে কলঘরের দিকে চলে গেল। স্নান আছে, আহ্নিক আছে—পোড়া পেট আর দেহটা যতদিন থাকবে—রান্না-খাওয়াও আছে। তার যত না দরকার—উপোস দেওয়া ঢের অভ্যেস আছে তার—ঝি-চাকর আছে ; কাল থেকে ওদেরও খাওয়া হয় নি, ওদের জন্যে অন্তত দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে হবে। তার পর মেয়ে—খাবে কি না কে জানে, চেষ্টা করতে হবে অন্তত খাওয়াবার।

তবু খাওয়ার সময় নেত্যর মাকে বলে গেল—কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু নজর রাখতে।

নেত্যর মার কাজ ছিল। দারোয়ান সীয়াশরণ দেশে গেছে, ঝাড়ামোছাগুলো সে-ই করত—এখন সবগুলোই ওকে করতে হয়। ও-ই বা কতক্ষণ পাহারা দিয়ে বসে থাকে! দু'একবার উঁকি মেরে দেখে ও নিজের কাজে চলে গেল। গিরিধারী বাজারের দিকে গেছে অনেকক্ষণ, সে এসে পড়ল বলে।...

ওপরের ঘর বারান্দা মুছে নেত্যর মা যখন নিচে নামছে দেখল, সুরো আস্তে আস্তে উঠে ওপরে যাচ্ছে। সহজ স্বাভাবিক গতি, যেমন অন্যদিন উঠতে দেখে তেমনই, হয়ত একটু আস্তে উঠছে এই যা, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, যা গেল কাল থেকে মইমাড়ন! দৃষ্টিও ক্লান্ত—কিন্তু সেও স্বাভাবিক। তবু জিজ্ঞাসা করল একবার, 'কোথায় যাচ্ছ দিদি, একটু শুয়ে নাও না।'

'ওপরেই শোব।' সংক্ষেপে উত্তর দিল সুরো।

আরও নিশ্চিন্ত হ'ল নেত্যর মা। মা পুজোয় বসেছে, নইলে তাকে সুখবরটা দিয়ে আসত। সে বালতির জল পাল্টে নিচের ঘর মুছতে শুরু করল।...

রাস্তায় গোলমাল একটা পুজোর মধ্যেই নিস্তারিণীর কানে গিয়েছিল, হৈচৈ হট্টগোল একটা—আর ক্রমশ সেটা যেন বাড়ছেই। কৌতূহলও যে না হয়েছিল তা নয়—তবে সে গোলমালের সঙ্গে এ বাড়ির কোন সম্পর্ক আছে তা বুঝতে পারে নি। চমকে উঠল একেবারে গিরিধারীর আর্তনাদে, 'ওমা মা—সর্বনাশ হইয়ে গেল, শীগ্‌গির আসুন মা—কী করছেন আপনারা, পাগলকে ছেড়ে দিয়ে ঘুম করছেন!'

অসমাপ্ত জপ ফেলে ছুটে বেরিয়ে এল নিস্তারিণী, কলতলায় বাসন ফেলে ছাই-মাখা হাতে ঝিও এল ছুটে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের ঝুড়ি নামিয়ে তরতর ক'রে ওপরে উঠছে গিরিধারী—

'কি হ'ল রে—কী হয়েছে কি? সুরো কোথায় গেল, অ নেত্যর মা, বললুম নজর রাখতে—কি করছিলি তুই? দ্যাখো কি সব্বনাশ বাধিয়ে বসে আছে বুঝি!'

বলতে বলতে গিরিধারীর পিছু পিছু নিস্তারিণীও ছুটে ওপরে উঠল।

কিন্তু গিয়ে যা দেখল, আর যা-ই হোক এ দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। দেখল লোহার সিন্দুক খোলা—সেখান থেকে এক একখানা ক'রে গয়না বার করছে আর ওপাশের ছোট বারান্দা দিয়ে রাস্তায় ফেলছে। হয়ত অনেকক্ষণ ধরেই এই কাণ্ড চলছে, তাই পথে এত লোক জড়ো হয়েছে আর এত হৈহৈ হচ্ছে।

গিরিধারী ছুটে গিয়ে আগে বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে পিঠ দিয়ে চেপে দাঁড়াল। বলল, 'বিস্তর জেবর মাজী, সাত-আটটা তো হামি নিজে দেখল। গিনিভি ফেলিয়েছে—কত তা জানে না। লেড়কা লোক সব কুড়িয়ে লিচ্ছে খুশিসে, হাপনি যান আগে সেইখানে, যা পারেন লিয়ে লেন ফিরিয়ে। হামি দিদিবাবুকে দেখতেছি!'

নিস্তারিণী আর নেত্যর মা দুজনেই ছুটল। গিরিধারী আছে—জোয়ান পুরুষ একটা, ধরে রাখতে পারবে অনায়াসেই—এই ভেবেই ওদিকটা সামলাতে গেল। কিন্তু সুরোর

তখন ঘোর উন্মাদ অবস্থা। সে পাগলের মতো গিয়ে গিরিধারীকে আঁচড়ে খিমচে ঘুঁষি মেরে সেখান থেকে সরাতে চেষ্টা করল। তাও যখন পারল না—ছুটে গিয়ে পাশের জানালা দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের মধ্যেকার একমুঠো গিনি।

'গয়না দিয়ে আমাকে ভোলাতে এসেছিলে! গয়না আর টাকা! ভেবেছ আমি রাস্তার ভিখিরি, খোলার ঘরের বেশ্যা।—টাকা ফেলে দিয়ে চলে যাবে একদিন লাথি মেরে, আর আমি টাকা কুড়িয়ে ঘরে তুলে সে অপমান ভুলে থাকব? এই, এই—তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, জাহান্নমে যাক সব--। তুমি নিপাত যাও, তোমার টাকা নিপাত যাক। এই, এই—।'

লাজলজ্জা মানমর্যাদার কথা ভুলে গিরিধারী সবলে চেপে ধরল ওকে; আপৎকালে —বিশেষ এই রকম সময়ে—এত ভাবতে গেলে চলে না, এটুকু জ্ঞান ওর আছে; কাল সরোজিনী দিদিও বলে দিয়েছে সেই কথাই। সে বজ্রবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া পাগলের পক্ষেও কঠিন—তাই গহনা বা গিনি আর আনতে না পেরে শূন্য মুঠিই ছুঁড়ে মারার ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে লাগল, 'এই, এই!'

গলির মধ্যে এত হট্টগোলের শব্দ পাশের বাড়িতেও পেঁ'ছেছে। প্রথমটা তারাও অত গ্রাহ্য করে নি। বিশেষ প্রায় সকলেই তখন স্নান সেরে রান্নার যোগাড় দেখছে, কেউ উনুনে আঁচ দিয়েছে—কারুর বা উনুন ধরে গেছে। 'সাজা'র ঝি আছে, সে-ই সকলকার উনুন ধরিয়ে দেয়, বাজারও করে সে। কাজেই দেরি হবার কথা নয়। কিন্তু গিরিধারীর চেনা গলা—নিস্তারিণীরও। তাদের ঐ আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ওরাও বেরিয়ে এল এবার। ব্যাপারটা বুঝে নিতেও দেরি হ'ল না। প্রেকাশী আর চন্ননের অলংকারে আসক্তি সর্বজনবিদিত। এই 'হুতোশুনে কাণ্ড' দেখে তাদের বুকের স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম। অন্তত দশ-বারোটা গহনা, হার বালা তাগা মিলিয়ে—ছড়ানো পড়ে আছে তখনও, এছাড়া কটা বেহাত হয়েছে তার ঠিক কি? 'মাসিমা তুমি ওপরে যাও, আমরা দেখছি', বলে যতটা পারল কুড়োতে লেগে গেল। লোকসান তাদের নয়—কিন্তু পরের হ'লেও—বিশেষ অতি-পরিচিত যদি হয় সে পর—এ রকম ক্ষতি সহ্য করা কঠিন, এই ভাবের অপচয়।

গিনিগুলোই নিশ্চয় বেহাত হয়েছে বেশী। দু-একজন পাড়ার চেনা ভদ্রলোক যা পেয়েছিলেন ফিরিয়ে দিলেন। তবে তাঁরাই বললেন, ওদিকের দু-একটা বকাটে ছোট-লোক-গোছের ছোঁড়া, আস্তাবলের ছোকরা চাকর ইত্যাদি—কয়েকটা পেয়েছিল, তারা ইত্যবসরে সরে পড়েছে, সে আর পাওয়ার আশা নেই। তবু মোট তেইশখানা পুরো আর হাফ গিনি মিলিয়ে পেল এরা। গহনা পেল দুগাছা চুড়ি নিয়ে চোদ্দখানা। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক ছড়া জড়োয়া সীতাহার পেয়েছিলেন আর কানের একটা কেরাপাত—তিনি এসে নিস্তারিণীকে ডেকে তার হাতে দিয়ে গেলেন।...

চাঁদু, নেড়ী, চারু—এরা গহনার দিকে না তাকিয়ে ওপরে চলে এসেছিল। তারা সবাই মিলে একখানা শাড়ি দিয়ে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলল, কারণ গিরিধারীর একার পক্ষে সামলানো শক্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। সুরোর তখন অমিত-বিক্রম, তাকে আটকে ধরে রাখতে জিমন্যাস্টিক দেখানো খেলোয়াড়ের মতোই কাঁধের পেশী কপালের শিরা ফুলে উঠেছিল গিরিধারীর, সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছিল।

ওদের অতগুলো মানুষেরও সামলানো অবশ্য খুব সোজা হ'ল না—রীতিমতো পাগলের মতোই ওদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে সুরো, তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘামে তারও সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে—দুই কষের কোণ বেয়ে ফেনা-ফেনা থুথু কাটছে। তবু, শেষ পর্যন্ত গিরিধারীর সাহায্যে কোন-মতে জানলার গরাদের সংগে বেঁধে ফেলল তাকে।

প্রেকাশী আর চন্নন তাদের কোঁচড় থেকে গহনাগুলো বার ক'রে বলল, 'একবার মিলিয়ে নেবে নাকি মাসিমা?' নিস্তারিণী বলল, 'কী আর মেলাবো মা, যা গেছে তা তো

গেছেই, মিলোলেই কি আর ফিরে আসবে?...আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি সব জানিও না—কী কী ছিল ওর। যাক—যা আছে, আছে—রেখে দে অমনি!'

চারি বললে, 'হ্যাঁ, এখন ঐ সব মিলোতে বসছে! তোরাও যেমন! আপনি আগে সিন্দুকে চাবি দিয়ে এ ঘর থেকে চাবিটা সরিয়ে ফেলুন দিকি!' তারপর চোখ টিপে নিচু গলায় নেড়ীকে বললে, 'আসলে এই ফাঁকে একবার গয়নাগুলো দেখে নেওয়ার ইচ্ছে, কী কী আছে, বুঝলি না? এমনি তো আর দিদি দেখাবে না কোনদিন।...তাই বলে এখন কি সেই সময় নাকি?'

বেলা দশটা নাগাদ নানু বাড়ি থেকে ঘুরে এল। সে বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই গিয়েছিল, এখন অবস্থা দেখে অবাক। মেয়েগুলো তখনও শুকনো মুখে ঘিরে বসে, অনেকেরই ধরানো উনুন ছাই হয়ে গেল, রান্নাবান্না কিছুই করা হয় নি। অথচ এই অবস্থায় ফেলে যেতেও পারছে না। সুরো চিরদিন ওদের সঙ্গে একটা ব্যবধান বজায় রেখে এসেছে সত্য কথা, কিন্তু কখনও কারও সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করে নি। তাছাড়া রাজাবাবু ছিলেন অতি অমায়িক লোক। বাড়িতে ক্রিয়াকলাপ খাওয়া-দাওয়া হ'লে সুরোর জন্যেও যেমন ভাল ভাল খাবার পাঠাতেন—এদের জন্যেও কখনও পাঠাতে ভুল হ'ত না। আনাজ-কোনাজ, ফল-ফুলুরি যখনকার যা, এ বাড়ি এলেই সুরো লোক দিয়ে প্রত্যেকের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বরাবর। সবচেয়ে বড় কথা, যথার্থ শোক সবাই বুঝতে পারে, ভাল তাদের মধ্যেও কেউ বাসে নি এমন নয়—ওটা চিনতে ভুল হয় না। ভালবাসার এই ঐকান্তিক প্রকাশে তারাও সত্যিসত্যিই বিচলিত হয়েছে। এখন এই মেয়েটার স্বভাবের দোষ ধরবে কি অহঙ্কারের কথা মনে করবে—এমন পাষাণ এরা কেউ নয়।

নানু এসে ওদের ছুটি দিয়ে দিলে। বললে, 'আমি আছি এখন। আমি আছি, গিরিধারী আছে, এক রকম ক'রে সামলাতে পারব। তোরা যা. ঝ'ড়ো কাকের মতো চেহারা হয়েছে সব—একটু কিছু খেয়ে শুয়ে পড়গে যা। বরং এক কাজ কর—তোদের তো শুনছি উনুন সব নিভে ছাই হয়ে গেছে—এখন আর আলাদা আলাদা রাঁধার চেষ্টা করিস নি, এক জায়গায় একটু ভাতে-ভাত চাপিয়ে দে, সবাই মিলে খা। এবাড়িতে বড় পেতলের বোগনো আছে, নিয়ে যা। সরোজিনীর পয়সা বেশী, সে-ই তোদের খাওয়াক আজ। যা—ওঠ্ এবার।'

ওরা চলে যেতে নানু সুরোর কাছে এসে বসল। ওর মুখ দেখেই বুঝল যে পাগলামির সেই প্রচণ্ড ঘোরটা কেটে গেছে—কিম্বা কমে এসেছে। সে ওর বাঁধন খুলে দিল, কড়া বাঁধনে হাতে রক্ত জমে গিয়েছিল—গিরিধারীর পুরুষ হাতের নির্দয় বাঁধন—জল দিয়ে টেনে টেনে রক্ত চলাচল করিয়ে অনেকটা সুস্থ ক'রে তুলল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে নানু। মাথা ঠাণ্ডা হয়েই এসেছিল। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের বিছানায় শোবার ইচ্ছে হ'তে ওপরে উঠেছে, নয় তো—এমনিই মনে হয়েছে রাজাবাবুর ছবিগুলো একবার দেখবে, তাঁর স্পর্শ লাগা জিনিসগুলোয় হাত বুলিয়ে তাঁর স্পর্শই অনুভব করার চেষ্টা করবে। তখন নিজের মনের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারেনি, আবেগের হিসেবটা ধরতে পারে নি। ওপরে উঠে চারিদিকের এই অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নগুলোর দিকে চোখ পড়তেই—আবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আগুন জ্বলে উঠেছে মাথায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এ জানত নানু, সেই জন্যেই কাল ওপরে উঠতে দেয় নি।

কিন্তু তবু আবার নিচের ঘরে নিয়ে যাওয়াও এখন সমুচিত বোধ করল না। এত স্মৃতি তাঁর চারিদিকে—এসব রাতারাতি সরিয়ে ফেলা কিছু সম্ভব নয়, আর সারা ঘরটাই তো তাঁর স্মৃতি বহন করছে, এই খাট, এই শয্যা—সবই, ঘরখানা কোথায় সরাবে?

—সেক্ষেত্রে সইয়ে নেওয়াই বরং ভাল। এইখানেই থাক, এখানে থেকেও যদি মাথা ঠাণ্ডা হয়—সেইটেই স্থায়ী হবে।

তবে সান্ত্বনা দেওয়া যাকে বলে, সে চেষ্টাও করল না নানু। ওসব মামুলী সান্ত্বনায় কোন কাজ হয় না, বরং মানুষ বিরক্ত হয়। সে এটা-ওটা নানান প্রসঙ্গ তুলে গল্প জমাবার চেষ্টা করল। প্রথম প্রথম কোন কথার উত্তর না দিলেও—খানিক পরে, 'হুঁ' 'হাঁ' ক'রে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে শুরু করল। এক-আধবার দু-একটা কৌতুকের কথায় হাসিরও ভঙ্গী করল। আরও কিছুক্ষণ পরে দু-একটা কথাও কইল। সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বাভাবিক।

নানু এবার নিস্তারিণীকে ডেকে কিছু খাবার দিতে বলল। ঘরে সন্দেশ ছিল, রাজাবাবুরই বন্দোবস্ত করা তিনকড়ি ময়রার সঙ্গে—বাজার-বেলায় গিরিধারী বা ঝি গিয়ে নিয়ে আসে। মাসের শেষে সরকার মশাই হিসেব ক'রে দাম চুকিয়ে দেন। সেই সন্দেশই নিস্তারিণী গোটাকতক একটা রেকাবিতে সাজিয়ে এনে সামনে রাখতে যাচ্ছিল, সুরো যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'না না, ও নয়, ও নয়—নিয়ে যাও নিয়ে যাও—'

চোখের নিমেষে সন্দেশসুদ্ধ রেকাবীটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল নানু। হতভম্ব নিস্তারিণী না বুঝলেও সে বুঝেছে। মিতাহারী রাজাবাবুর এই একটি জিনিসেই প্রীতি ছিল। তিনি রসগোল্লা বা পানতুয়া তত পছন্দ করতেন না, মিষ্টি খেলে সন্দেশই খেতেন। বিশেষ এখানে তো আর কিছু খাওয়ারই সুযোগ হয়ে উঠত না, রাত্রে দৈবাৎ কোন দিন সকাল ক'রে এসে পড়লে রাত্রের খাবার এখানেই খেতেন—নইলে বেশির ভাগ বাড়ি থেকেই খেয়ে আসতেন; ইদানীং বৈষয়িক জটিলতা অনেক বেড়েছিল, তাছাড়া বড় ছেলেকে তালিম দিচ্ছিলেন কাজ-কারবারে—রাত্রি ছাড়া সে সব সুবিধা হয় না, কারণ দু'জনেরই সময়ের অভাব, ফলে নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতে হ'ত—খাওয়ার সময় হয়ে যেত প্রায়ই। সুতরাং এখানে খাওয়ার মধ্যে ঐ সন্দেশটাই ছিল নিত্যনিয়মিত। সকালে মুখ হাত ধুয়ে একটু ফল আর সন্দেশ খেয়ে বেরোতেন এখান থেকে, একেবারে বাইরের কাজ সেরে অফিস হয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরতেন।...সে সন্দেশ আর সুরোর মুখে উঠবে না, ওঠা সম্ভব নয়।

সন্দেশ না খেলেও অন্য একটু খাবার খেল শেষ পর্যন্ত। দুপুরে নানুর সঙ্গে ভাতেও বসল। নিস্তারিণীর জামাইয়ের শোক এখন অন্য চিন্তায় চাপা পড়ে গেছে। সে বেচারী একটু প্রকাশ্যে কাঁদতেও পারছে না। নানু প্রচণ্ড শাসন ক'রে দিয়েছে তাকে, 'খবরদার! যদি মেয়েকে বাঁচাতে চাও—ওর সামনে এসব আদিখ্যেতা একদম করবে না। শোক নয়, দুঃখু নয়—কান্নাকাটি কিচ্ছু নয়। ওসবের ঢের সময় পাবে—জীবনভোরই তো পড়ে রইল—এখন ওসব চাপা থাক। সহজভাবে রান্না খাওয়া করো, যেমন ফি-দিন ক'রে আসছ। মাছটা বরং থাক, মাছ তো রোজ হয়ও না তোমাদের, তফাৎটা অত বুঝতে পারবে না। কথাবার্তাও, তার কথা বাদ দিয়ে যেমন অন্য দিন কও তেমনি কইবে।...পাড়ার লোকের কেচ্ছা শুরু করো দিকি, বলি অনেক তো এস্টকে জমা আছে—তা থেকে ছাড়ো না দু-চারটে।'

স্বভাব তার কোন অবস্থাতেই বুঝি বদলায় না, চোখ মট্‌কে মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে বলে শেষের কথাগুলো।

নিস্তারিণীও তাই ওদের দু'জনকে পাশাপাশি খেতে বসিয়ে এটা ওটা নির্দোষ প্রসঙ্গ তুলে গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কাজটা কঠিন। বারবারই রাজাবাবুর প্রসঙ্গ এসে পড়ার উপক্রম হয়, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক—প্রতিদিনের জীবনে জড়িয়ে আছেন এতকাল ধরে, এ বাড়ির তো তিনিই কর্তা বলতে গেলে—তাঁকে বাদ দিয়ে কী কথা কওয়া যায়! তবু চেষ্টা করল সে প্রাণপণেই।...সুরো বেশী খেতে পারল না, দু-এক গ্রাস মুখে তোলার পরই বমি আসার উপক্রম হচ্ছে দেখে নানুই বলল উঠে আঁচিয়ে আসতে। খেতে বসেছে

সে-ই ওদের ভাগ্য, কী খেল কতটুকু খেল সেটা বড় কথা নয় এখন।...

একটা অবশ্য আলোচনা করার মতো খবর নানুই সংগ্রহ ক'রে এনেছে। খবরের কাগজ থেকে জেনেছে খবরটা। গণেশ তার দল নিয়ে দেশে ফিরেছে। মাদ্রাজে আছে এখন।

নিস্তারিণী সাগ্রহে বলে, 'তা তার ঠিকানা? ঠিকানা দিয়েছে কিছু?...এ সময়টাতেও যদি এসে পড়তে পারত!...তা হ্যাঁরে, কলকাতায় আসবে কিছু লিখেছে খবরে?'

'তা কখনও লেখে! এমনি একটা খবর দিয়েছে—ভারতীয় জাদুগর ভারতে এসেছে—এই পর্যন্ত!'

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর শান্ত হয়েই শুয়ে রইল সুরো, যদিও ঘুমোল না সে এক মিনিটের জন্যেও। শান্ত, প্রায় নিষ্পলক-চোখ মেলে চেয়ে রইল শুধু সামনের দেওয়ালটার দিকে—সে চোখে না আছে দুঃখ না আছে বেদনা—না আছে এক ফোঁটা জল।...সহজ স্বাভাবিকভাবে যদি কাঁদানো যেত একটু। বার বার মাথার কাছে মাথা খোঁড়ে নানু, কোন উপায় যদি ভেবে পাওয়া যায়! একটা কোন উপায়!

তবে সে যা-হয়-একটা-কিছু এলোপাতাড়ি ধরনের চেষ্টাও করে না। সেও চুপ ক'রে বসে থাকে খাটের পাশে, খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। কাগজখানা সে-ই এনেছে, গণেশের খবর দেখে। ইচ্ছে ক'রেই সে কথা কয় না বা গল্প করার চেষ্টা করে না। হয়ত চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারে—বসে বসে গল্প করলে সে সম্ভাবনা থাকবে না।...

সেদিন থিয়েটারের দিন, সন্ধ্যায় যেতেই হবে নানুকে। নতুন বই—তারই বড় পার্ট, না গেলে দাঁড়িয়ে অপমান হবে কর্তারা। ও-বাড়ির মেয়েদেরও কাউকে পাওয়া যাবে না। সে নিস্তারিণী আর নেত্যর মাকে বলে গেল সব কাজ ফেলে ওপরে কাছাকাছি থাকতে, গিরিধারীকে বলে গেল বাইরে কোথাও না যায় যেন। রান্নাবাড়া করার দরকার নেই। সে কাউকে দিয়ে বাজারের খাবার পাঠিয়ে দেবে, নেত্যর মা আর গিরিধারী খেতে পারবে। রাত্রে থিয়েটারের পর এখানেই ফিরবে সে—তাও বলে গেল। তবে সে যার নাম রাত তিনটে।

সন্ধ্যা ও রাত একভাবেই কাটল। ওদের জন্যে লুচি পাঠিয়েছিল নানু থিয়েটারের দারোয়ানকে দিয়ে—রাত্রে তাও দুখানা খাওয়াল নিস্তারিণী। কিন্তু ঘুম পাড়াতে পাড়ল না কিছুতেই। পাশে শুয়ে নিস্তারিণী জেগে রইল সারা রাত—মাঝে মাঝেই চেয়ে দেখতে লাগল—তেমনি অপলক দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে সুরো। না দেখেও বুঝতে পারে—নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসার সামান্য মাত্রও শব্দ পায় না।

'পোড়া চোখ কি জ্বালাও করে না একটু!' মনে মনে বলে নিস্তারিণী, 'এমনিও তো চোখ বুজতে হয় আমাদের—অমন একভাবে চেয়ে থাকলে!'

আগের দিনও সারা রাত জেগে কেটেছে, দুপুরে নানু ছিল বলে তবু দু' চোখ একটু এক করতে পেরেছিল—কিন্তু সে-ই বা কতটুকু! উদ্বেগে দুঃখে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ ক'রে ঘুম ভেঙে গেছে বার বার। তার ওপর আজও এইভাবে ঠায় জেগে কাটানো—কঠিন বৈকি।...নানু আসা পর্যন্ত জানে। বোধ হয় রাত সাড়ে তিনটে হবে তখন—দোরে টোকা দিতে গিরিধারী উঠে দরজা খুলে দিলে। মৃদুকণ্ঠে কী কথা হ'ল, বোধ হয় ওদেরই খবর নিলে—তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর আর নিস্তারিণীরও হুঁশ নেই, ঝি তো আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

একেবারে শেষরাত্রে ঘুমনো, কারুরই ভোরে ঘুম ভাঙার কথা নয়। বেশ সকাল হয়ে যাওয়ার পরও ঘুম ভাঙে নি তাই। অকস্মাৎ কোথায় ঝন্ ঝন্ ক'রে টাকা পড়ার শব্দ

হ'তেই চমকে উঠে বসেছে দুজনেই। পড়ি-মরি ক'রে নানু আর গিরিধারীও ছুটে এসেছে ওপরে। ততক্ষণে বাইরেও একটা শোরগোল পড়ে গেছে, 'ঐ রে, ঐ দ্যাখ্—পাগলী আবার ক্ষেপেছে!'

আজও ঘরে ঢুকেই নানু বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সেই খবরের কাগজখানা। এখানে ফেলে যাওয়া তারই অন্যায় হয়েছে। সে দেখেছিল আগেই—রাজাবাবুর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছে—তাঁর ছবি দিয়ে। ছবিটা যদিচ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—তবে ছবিটা থাকার দরুণই চোখটা টানে ঐদিকে। সুরো যে ভোরবেলা উঠে বসে খবরের কাগজ পড়বে—এটা ভাবতেও পারে নি নানু, তাতেই আরও সাবধান হওয়ার কথা মাথায় আসে নি।

এরা সকলেই ঘুমোচ্ছিল—ফরসা হ'তে সম্ভবত এমনিই কাগজখানা তুলে নিয়েছে সে, আর গোড়াতেই ঐদিকে চোখ গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাগলামি চেগে উঠেছে আবার। সিন্দুকের চাবি নেই কিন্তু আলমারির চাবি বালিশের তলায় থাকে, সেটা সরানোর কথা কারও মনে আসে নি। পাগলের একরকম অচেতন ধূর্ততা থাকে—সেই ধূর্ততাতেই বোধহয় উঠে নিঃশব্দে চাবি খুলেছে আলমারির, ভাল ভাল বেনারসী, ঢাকাই, শান্তি-পুরে শাড়িগুলো বার ক'রে বারান্দায় বেরিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটেছে, পাছে সে শব্দে এদের ঘুম ভাঙে। সে কুঁচনো কাপড় এখনও স্তূপাকার করা পড়ে সেখানে।

তারপর কাপড় নাড়তে নাড়তেই বোধ হয় চোখে পড়েছে থাক-দেওয়া রূপোর টাকা-গুলো এক পাশে, সংসার-খরচের টাকা, যাওয়ার আগে রাজাবাবু রেখে গেছেন বেশী ক'রেই—কী দরকার হয় না হয়। অন্তত দুশো আড়াইশো টাকা। কুড়ি কুড়ি ক'রে থাক দেওয়া। সেই এক একটা থাক তুলছে আর রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। সেই সঙ্গে হাসছে—নিঃশব্দ, ভয়াবহ রকমের ধূর্ত হাসি। হাসির আওয়াজে না এদের ঘুম ভাঙে—সেই জন্যেই বোধ হয় এমন শব্দহীন হাসি। তবে পাগলের ধূর্ততা বলেই অসম্পূর্ণ ও অসতর্ক—টাকাগুলো যে রাস্তায় পড়লে শব্দ উঠবে—সেটা ভাবে নি।

আজও এগিয়ে গিয়ে বেশ জোরে কয়েকটা চড় মারল নানু, বোধ করি গালে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেল। কিন্তু আজ আর সুরো কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না, অনুযোগও করল না—বরং আবারও আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে বিছানায় এসে বসল।

নিস্তারিণী বললে, 'তুই গণেশকে খবর দে নানু। সব খুলে লেখ। ওর নাম আর মাদ্রাজ লিখলে কি চিঠি পৌঁছবে না? শুনেছি তো খুব নামডাক হয়েছে!'

ঘাড় নাড়ল নানু—তখনও হাঁপাচ্ছে—বলল, 'আমি কাল সন্ধ্যেবেলাতেই জরুরী তার পাঠিয়ে দিয়েছি। তাতেই লিখেছি রাজাবাবু ডেড্, সিস্টারস্ কন্ডিশান সিরিয়াস, কাম র‍্যাট ওআন্‌স্—মানে অল্পের মধ্যে সবই লিখে দিয়েছি—তারপর এখন তার ধর্ম্ম। কাল যদি নাও পেয়ে থাকে, আজ সকালেই পাবে বে-ওজর। ওর নাম আর ঘোষের সার্কাস লিখে দিয়েছি—না পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

সেদিনটাও কড়া পাহারায় কাটল। নানুর ইচ্ছে ডাক্তার ডাকে, কিম্বা বদ্যি। নিস্তারিণী ইতস্তত করে। বলে, 'বুঝেছিস না, ডাক্তার বদ্যি ডাকলে ওর মনে হবে সত্যিই ও পাগল হয়ে গেছে। তখন সারানো শক্ত হবে। তাছাড়া ওপাড়ার একটি মেয়ের অমনি হয়েছিল, বদ্যি এসে কী ছাই ছোট-চাঁদরের পাতার রস দিলে মাথায় লাগাতে—সত্যিকারের পাগল তো নয়—মাঝখান থেকে ঠান্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে নিমুনিয়া হয়ে মারা গেল। যারা সত্যিকারের পাগল নয়—তাদের ঐ সব ঠান্ডা ওষুধ দিলে হিতে বিপরীত হয়।'

বিকেলে মতি এল ঝিয়ের কাঁধ ধরে ধরে। এটা ওটা নানা কথা বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। গানের কথা তুলল। এখনও সুরোর কত নাম, মক্কেলরা এসে এখনও ওকে খোঁজে। সেই সব গল্প করল। পুরনো দোয়াররাও এসেছিল কেউ কেউ। তারাও

স্বভাবতই গানের প্রসংগ তুলল। সেই সময়টায় তবু একটু যেন প্রফুল্লচিত্ত দেখাল সুরোকে, গানের কথায় ঈষৎ যেন সচেতনও মনে হ'ল—যদিও কথা সে কারও সংগেই কইল না একটাও।

সন্ধ্যের দিকে ওদের পুরনো দারোয়ান এসে পড়ল। নানু বলে গেল পালা ক'রে পাহারা দিতে। সেদিনও তার থিয়েটার। তবে সেদিন সকাল ক'রে ছুটি, বারোটার মধ্যে সে এসে যাবে। নিস্তারিণীকে বলল রান্নাবান্না করতে—তাতে তবু বাড়িটা স্বাভাবিক মনে হয়—নইলে নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন হানাবাড়ির মতো থমথম করতে থাকে। চাবি সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, হাতের কাছে নষ্ট করার মতো কিছুই নেই—তবু পাগলের খেয়াল তো, যদি পরনের শাড়িটা বেঁধে গলায় দড়িই দেয়!...বার বার হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে গেল নানু—খুব সাবধান, একা কেউ ছেড়ে যাবে না, এক মিনিটও।...

পরের দিন গণেশের কাছ থেকে লম্বা টেলিগ্রাম এল একখানা। প্রোফেসার ঘোষ মারা গেছেন, অংশীদার হিসেবে গণেশই এখন দলের কর্তা। এ অবস্থায় তার আসা সম্ভব নয়, জাহাজ 'বুক' করা হয়ে গেছে, পরের দিনই সুমাত্রা রওনা হচ্ছে ওরা। কিরণকে সে টেলিগ্রাম ক'রে দিল, কিরণ দিদিকে ভালবাসে, সে দেখতে যাবে।

'এমন বিপদ শুনেও একবার আসতে পারল না! দলই তার এত বড় হ'ল!' স্খলিত ভগ্ন কণ্ঠে মন্তব্য করল নিস্তারিণী, 'এই জন্যে লোকে ছেলে ছেলে করে! এই ছেলে! আমি মরছি শুনলেও তো আসবে না!'

নানু বলল, 'জননী, এই জন্যেই বলে আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে বন ভাল। ভেবো না, কিরণ যদি সত্যিই আসে, গণেশের থেকে বেশী কাজ হবে। কিরণের কথাটা আমারই মনে পড়া উচিত ছিল। আগে খবর দিলে এতক্ষণে এসে যেত!'

'কিন্তু সে কি পারবে আসতে? তার বাবা মারা গেছেন, সে-ই এখন সংসারের কর্তা। ছেলেপুলে বাড়িঘর বিষয়আশয়—সে সব ছেড়ে অমনি হুট্ বলতেই আসা কি সহজ কথা!'

'নিশ্চয় আসবে, দেখে নিও। সে তো আত্মীয় নয়—পর। এসব শুনেও সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না।'...

সত্যিই এল কিরণ, পরের দিন সকালবেলাই এসে পৌঁছল।

কিন্তু তাকে দেখে আর এক কাণ্ড ক'রে বসল সুরবালা।

এ দু দিন একরকম চুপচাপই ছিল, কিরণকে দেখে কী এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ'ল তার মনে, অকস্মাৎ ছুটে এসে তাকে আঁচড়ে কামড়ে মেরে ধরে—ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিল, আর তার ফাঁকে ফাঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, 'অমনি এসেছ! খবর পেয়েই ছুটে এসেছ? ভাবছ সে নেই—নিশ্চিন্ত হয়ে তার জিনিসে থাবল মারবে? থাবল মারতে দিচ্ছি এই যে! দেবতার ভোগ শেয়ালের পেটে যাবে ভেবেছ! শয়তান, লুভী! নরকের কীট! শকুনি!...ভাগাড়ে গরু পড়তে দেখেই অমনি ছুটে এসেছ মাংসের লোভে! কখনও না, কিছুতেই না। খুন করব তোমাকে নিজে হাতে, গলা টিপে মেরে ফেলব। কেটে কুঁচি কুঁচি ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব! দেখে নিও। যেমনকে তেমনি!'

এ কদিন গলা চড়ে নি তার একবারও, আজ কিন্তু চিৎকারই করতে লাগল। চেঁচাচ্ছে আর দুদ্দাড় মেরে যাচ্ছে কিরণকে। সীয়াশরণ গিরিধারী নানু—কেউ ছাড়াতে পারে না তাকে—এমনই প্রমত্ত হস্তীর বল তার তখন।

তবু ওরাই বিস্তর ধস্তাধস্তি করে পাগলকে শেষ পর্যন্ত সামলে দূরে সরিয়ে নিল —অবশ্য কিছু কিছু অবাঞ্ছিত বলপ্রয়োগ করতে হ'ল শেষের দিকে। কিন্তু এই উন্মত্ত আক্রমণ কিরণের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট করতে পারে নি। সে বাধা দেয় নি একবারও, আত্মরক্ষার চেষ্টা করে নি, স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে সেই নির্বিচার মারধোর সহ্য করেছে। এমন কি যখন সুরোকে নিয়ে গিয়ে ওরা আজও আবার পিছমোড়া ক'রে খাটের সঙ্গে বাঁধল—তখনও যেটুকু উদ্বেগ ও বেদনা তার চোখে-মুখে প্রকাশ পেল, সে সুরোর জন্যেই। তার যে মুখে গালে গলায় নখের দাগে রক্ত ফুটে উঠেছে, এমন কি জামা ভেদ ক'রেও কোথাও কোথাও দু-এক ফোটা রক্তচিহ্ন দেখা দিয়েছে—সে-সম্বন্ধে যে সে নিজে কিছু-মাত্র সচেতন, তাও মনে হ'ল না।

নানু আর নিস্তারিণী আশা করেছিল এর পর সে আবার শান্ত হয়ে আসবে—যেমন এ কদিন হচ্ছিল। কিন্তু কিরণকে দেখে কী যে হ'ল, আজ আর কিছুতেই শান্ত হ'ল না। চেঁচামেচি আর কিরণকে অকথ্য গালিগালাজ ক'রেই চলল। জোর ক'রে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে হাত চেপে বসল, লাল হয়ে রক্ত জমে গেল—তবু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন শারীরিক কষ্টই যেন আর লাগছে না তাকে। একেবারে পূর্ণ পাগলের অবস্থা। বেগতিক দেখে নানু কৈলাস ডাক্তারকে ডেকে আনল। তিনি এসে দেখে আর সব শুনে মৃদু তিরস্কারই করলেন আগে না ডাকার জন্যে। বললেন, 'বড় দেরি ক'রে ফেলেছ তোমরা! এখন সারানো হয়ত কঠিন হয়ে পড়বে। আগে ছিল সামান্য হিস্টিরিয়া—এখন হয়ত পুরো পাগলামিতেই দাঁড়াবে। হাউএভার এই ঘুমের ওষুধটা দিয়ে যাচ্ছি, যেমন করেই হোক খাইয়ে দাও, অজ্ঞান হয়ে ঘুমুক খানিকটা—তারপর দেখা যাবে। কাল সকালে খবর দিও কেউ।'

কিন্তু ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোও তো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিছুতেই খাবে না, কী যে ভাবছে কে জানে—দুই ঠোঁটে চেপে আছে একেবারে। জোর ক'রে নানু যদি বা সে ঠোঁট খুলল, দাঁত ফাঁক করতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা ক'রে এক সময় গলায় ঢেলে দেওয়া গেল, তবুও পেটে সবটা গেল না। তখন সত্যিই পূর্ণ উন্মাদের অবস্থা। তাদের যেমন অদ্ভুত একটা দুষ্ট বুদ্ধি থাকে—সুরোরও তার অভাব দেখা গেল না। বিচিত্র উপায়ে সে ওষুধের প্রায় অর্ধেকটাই বাইরে ফেলে দিল।

অবশ্য যেটুকু পেটে গিয়েছিল, তাতেই কাজ হ'ল। খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। এর পর আর বেঁধে রাখার প্রয়োজন ছিল না। নানুই বাঁধন খুলে খাটে শুইয়ে দিল, কিরণ হাতের রক্ত জমে-যাওয়া জায়গাটা তেল-হাত ক'রে সযত্নে চুঁচে দিতে লাগল। তার চোখ ছলছল করতে লাগল ওর অবস্থা দেখে।

সে পুরো দিনটাই সুরো ঘুমোল প্রায়। রাত্রের দিকে ঘুম ভাঙলেও আচ্ছন্নর মতো হয়ে রইল। ওঠবার চেষ্টাও করল না বিশেষ।

পরের দিন থেকে চেঁচামেচি গোলমাল আর অতটা না থাকলেও অন্য উপসর্গ তেমনিই রইল, বরং বাড়ল আরও। ডাক্তারকে বলা হ'তে তিনি আবার ঘুমের ওষুধ দিতে বললেন, আরও কী কী সব ওষুধ দিলেন সেই সঙ্গে। কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল দেখা গেল না। যতটুকু ঘুম হয় ততটুকুই শান্তি। ঘুমের পরও বোধ হয় কিছুক্ষণ দুর্বলতা থাকে, সেই সময়টুকু স্থির হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়—আবার যে-কে সেই। কাপড় জামা যা সামনে পাবে ছিঁড়বে কুঁচোবে—আরও সাংঘাতিক, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে। একটা দামী ঘড়ি একদিন আছড়ে ভেঙে ফেলল। গায়ের গহনাগুলোর কথা

এতদিন মনে আসে নি, এবার সেগুলো খুলে নিয়ে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল রাস্তায়।

ওরা সে ঘর থেকে দামী জিনিস সব সরিয়ে ফেলল। আলমারি আর সিন্দুকের চাবি বাড়িতেই রাখল না, কিরণই বলে নানুর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিল। কে জানে—পাগলের কাণ্ড, ঠিক হয়ত কখন্ খুঁজে বার করবে। অন্য ঘরেও—ওর জেগে থাকার সময়গুলোতে চাবি দিয়ে রাখতে লাগল। সে চাবি সীয়াশরণ নিজের কাছে রাখে—যাতে কেড়ে নিতে না পারে। গা থেকেও সমস্ত গহনা খুলে নিল, একেবারে নিরাভরণ বৈধব্যের বেশ ক'রে দিল। কী ভাগ্যি পরনের কাপড়টা ছেঁড়বার চেষ্টা করে নি কোনদিন, ঐখানে একটু হুঁশ-লজ্জা তখনও ছিল।

শেষে যখন নষ্ট করবার মতো কিছুই রইল না হাতের কাছে—তখন আলমারি সিন্দুকের চাবির জন্যে উৎপাত শুরু করল। রাগটা কিরণের ওপরই বেশী, তার কেমন ধারণা হ'ল—এসব গোপন করার বুদ্ধি বা মতলব কিরণেরই, তাই ওর ওপরই হামলা শুরু করল। গালিগালাজ তো বটেই, মারধোর অন্য অত্যাচারেরও শেষ রইল না। একদিন গেঞ্জির ওপর থেকেই কামড়ে বুকে দাঁত বসিয়ে দিল, রক্তারক্তি ব্যাপার। আর একদিন এমন ঠেলে দিল যে পাথরের টেবিলটা কপালে লেগে খানিকটা কেটে গেল।

কিরণের কিন্তু সেজন্যে কোন অনুযোগ নেই। শারীরিক আঘাতগুলো যেন সে অনুভবই করে না—এমনি নির্বিকারভাবে সহ্য করে সব। তার যা কিছু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা সুরোর জন্যেই। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সর্বদা ছায়ার মতো পাশে বসে থাকে, সুরো যেখানে যায় সঙ্গে যায়। তার সব চেয়ে বড় ভয়—এর পর না কোনদিন আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সে সমস্ত সময় সমস্ত জায়গায় তাই কাছে কাছে থাকে—কেবল কলঘরে যাওয়ার সময়টা থাকা সম্ভব বা শোভন নয় বলে নিস্তারিণীকে বলে সঙ্গে যেতে। নিস্তারিণী প্রথম এতটা বোঝে নি—আদিখ্যেতা বলেই মনে হয়েছিল—কিরণ তাকে সম্ভাবনাটা বুঝিয়ে ভয় ধরিয়ে দিল, ওখানে গিয়ে যদি গলায় দড়ি দেয়? সেরকম ভাবটা যে একেবারে নেই তাও নয়। শেষে নিস্তারিণীও বুঝল সে কথা। অগত্যা সব কাজ ফেলে সে প্রাকৃতিক কাজগুলোর সময় সঙ্গে থাকতে লাগল। একটা সুরাহা এই যে—ঐ কাজগুলো হুঁশ ক'রে বাইরে গিয়ে যথাস্থানে ক'রে আসে, স্নান করতে বললে স্নানও করে, খাওয়া—কখনও খানিকটা খায়, কখনও ফেলে চলে আসে, কোন হাঙ্গামা করে না। কদাচ কখনও ছড়িয়ে ফেলে দেয় চারদিকে, এক-আধ দিন নিস্তারিণীকে হাঁড়ি-কুঁড়ি বাড়িয়ে দিতে হয়েছে সেজন্য।

নিস্তারিণীর এসব আর ভাল লাগে না। এক-এক সময় অসহ্য বোধ হয় তার। ভয়ও দেখায়—এদের বা অদৃশ্য অদৃষ্ট দেবতাকে—যেদিকে দু চক্ষু যায় চলে যাবে এবার। গজ গজ করে, 'ছেলে-মেয়ের জন্যে কেঁদে আকুল হয়েছি, এর দোর ওর দোর—এ ঠাকুরের কাছে ও ঠাকুরের কাছে ধন্না দিয়েছি। খুব ছেলে-মেয়ে হয়েছে বাবা! বুড়ো বয়সে ছেলে-মেয়ের সেবা খাবার কথা, সে সাধও খুব মিটেছে—এখন রেহাই পেলে বাঁচি।...খুব সন্তান দিয়েছিলেন মা। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে—এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ! ঠাকুর-দেবতার এসব, বজ্জাতি। বজ্জাতি ছাড়া আর কিছু নয়—আমাদের সঙ্গে গরীব মানুষের সঙ্গে একটু রঙ্গ করা! এখন শেষ রঙ্গটা সেরে ফেলেন তো বাঁচি—ভিক্ষেতে কাজ নেই বাবা, কুত্তা বোলায় লেও।...এখনও মানে মানে যেতে পারলে হয়।' ইত্যাদি—

আশ্চর্য এই যে, মায়েরও ধৈর্যচ্যুতি হয়—কিরণের হয় না। নানু ওকে দেখে আর তাজ্জব বনে যায়। এমন কখনও দেখে নি, ভাবতে পারে নি। কিরণ কে এদের—সবর্ণ পর্যন্ত নয়, পরস্যাপি পর। নানু তবু যতটা আদর-যত্ন পেয়েছে নিস্তারিণীর কাছে, এদের কাছে—ইদানীং রাজাবাবুও কম ভালবাসতেন না,—কিরণ তার সিকির সিকি কেন,

একশো ভাগের এক ভাগও পায় নি। অথচ কেমন অম্লান মুখে সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, এক রাতও ঘুমোয় না—রাত কেন, দিনেও তো ঘুম নেই—শুধু সুরো যখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোয় সেই সময়টা একটু ঝিমিয়ে নেয়—তাও বিছানার পাশে ইজি-চেয়ারটাতে বসে ; শোয় না, পাছে বেশী ঘুমিয়ে পড়ে। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার অন্তর চমকে চমকে জেগে ওঠে, ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে নেয় ঠিক ঘুমোচ্ছে কিনা। অথচ তার নিজের বাড়ি আছে, ঘর আছে—স্ত্রী-পুত্র বিষয়-সম্পত্তি—বিরাট একটা সংসার ফেলে চলে এসেছে এক কথায়। সে সম্বন্ধে তার দায়িত্ব বা চিন্তা যে কম নেই সেটা বোঝা যায় শুধু যখন সুরোর ঘুমের অবসরে বড় বড় চিঠি লেখে—সম্ভবত বৈষয়িক চিঠিই—আমলা-গোমস্তাদের বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে। বাড়িতে ফেরার প্রসঙ্গ পর্যন্ত তোলে না, সেখানে কোন ক্ষতি হচ্ছে—এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে না।

সবচেয়ে মজা এই, এ দায়িত্বটা যেন কিরণেরই—এইভাবেই সকলে নিশ্চিন্ত হয়েছে ওকে পেয়ে। নিস্তারিণীও—এই পরের ছেলের কাছে কৃতজ্ঞতার কোন কারণ আছে বলে মনে করে না—অন্তত তার আচরণে তেমন কোন মনোভাব প্রকাশ পায় না। কিরণ করতে বাধ্য, দেখতে বাধ্য—সেও এইটেই ধরে নিয়েছে। কেবল নানুই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে, তার বিবেকে লাগে। দায়িত্ব তারও কিছু নয়, সেও এদের আত্মীয় হয় না, তবু দীর্ঘকালের প্রীতির সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে এদের সঙ্গে—আত্মীয়তাই দাঁড়িয়ে গেছে বলতে গেলে। সে একটু 'কিন্তু' ভাবেই কথাটা তুলতে যায়, বলে, 'ওখানে তোমার তো খুব ক্ষতি হচ্ছে নিশ্চয়ই—ওঁরাও খুব ভাবছেন—বৌমারা? তোমার মাও তো বেঁচে আছেন?...তুমি না হয় এক-আধ দিন ঘুরে এসো—যে দিনগুলোয় আমার থিয়েটার নেই—সোম মঙ্গল দেখে যেও—আমি না হয় থাকব—?'

'না না, দাদা। সে ঠিক আছে। আমি চিঠিপত্র লিখছি নিয়মিত। আর ক্ষতির কথা—এমন কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। পুরনো কর্মচারী সব বাবার আমলের, বিশ্বাসী, আমাদের ভালও বাসে। যেটুকু চুরি তারা সে আমলে করত—সেটুকু এখনও করে, আমি থাকলেও তাতে আটকায় না। তার বেশী অনিষ্ট কিছু করবে না—এ আমি জানি।'

'মুশকিল!' চিন্তিত মুখে নানু বলে, 'এরও তো কোন সুলক্ষণ দেখছি না। ব্যামো তো কমতির দিকে যাচ্ছে না একটুও। শুধু শুধু কতকগুলো বিষ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে রাখছে—চিকিচ্ছে বলতে তো এই।...শুনেছি কোথায় যেন একটা সরকারী পাগলাগারদ হয়েছে—তা ঠিক সেখানে দিতেও মন সরে না। সেখানে নাকি বড় মার-ধোর করে, তাছাড়া সেখানে গিয়ে কেউ ভাল হয়েছে এমনও শোনা যায় নি। এ তবু এখনও একটু-আধটু হুঁশজ্ঞান আছে, খাচ্ছেও একটু-আধটু—সময়ে কলঘরেও যাচ্ছে—অন্য উন্মাদ পাগলের মতো যেখানে-সেখানে নোংরা করে না, বা দিন-রাত বকছে কি চেঁচাচ্ছে তাও না—তাই কেবলই মনে হয়—ভালই হয়ে আসবে ক্রমশ। আশাটাও ঠিক ছাড়তে পারি না। বোনের মতোই হয়ে গেছে তো আমার—বরং বেশি, একেবারে বদ্ধ পাগলদের মধ্যে ঠেলে দিতে মন সরে না।'

'একটা কথা ভাবছিলুম দাদা। বলব?' খানিকটা চুপ ক'রে থেকে কিরণ শুধোয়।

কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো হয়ে গিয়েছিল—কতকটা যেন নিজের সঙ্গেই কথা কইছিল নানু, কিরণের উপস্থিতিটা সম্বন্ধে যেন ততটা অবহিত ছিল না! একটু চমকেই উঠল, বলল, 'বলো না—আরে, আমার সঙ্গে কথা কইছ, এর আর অত অনুমতির কি আছে?...কোন যুক্তি এসেছে মাথায়?'

'ভাবছিলুম—ওর গুরুদেবকে একবার খবর দিলে হয় না?...যদি আসেন—?'

'গুরুদেব? সুরো দীক্ষা নিয়েছে নাকি? কৈ, জানি না তো!'

নানু আকাশ থেকে পড়ে একেবারে।

'সে আবার কবে নিল? কার কাছে?'

কিরণ অকারণেই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। যেন, সুরো সম্বন্ধে নানু যা জানে না—সেটা জানা ওর পক্ষে খানিকটা অপরাধ। আধো-কুণ্ঠিত আধো-লজ্জিত ভাবে বলে, 'নিয়েছে অনেকদিন, বাগানবাড়িতে থাকতে। কথা হচ্ছিল শুনে গেছি, তারপর তিনি এসেছেন দীক্ষা দিয়েছেন তাও শুনেছি। খুব বড় সাধক—বৃন্দাবনের কাছে কোথায় গোবর্ধন পাহাড় আছে, সেইখানে ঝোপড়া মানে পাতার ঘর বেঁধে থাকেন। রাজাবাবুদের কুলগুরু যাঁরা—তাঁদের ছেলেরা দীক্ষা দেওয়া ছেড়ে চাকরি-বাকরি ধরেছে—সেই জন্যে রাজাবাবু তাঁদের অনুমতি নিয়ে এ'র কাছে দীক্ষা নেন। ইনি আবার নাকি ঐ গুরু-বংশেরই কী রকম জ্ঞাতি হন সম্পর্কে—একটু ডালেপালায় আত্মীয়তাও আছে। গৃহী ছিলেন—ক্রমে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যান, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। ...আমার সামনেই একদিন রাজাবাবু গুরুদেবের কথা গল্প করছিলেন—কত বড় সাধক—সর্বত্যাগী অথচ কী মিষ্টি স্বভাব—শুনতে শুনতে সু—মানে ও বলে দীক্ষার কথা। বলে, আমাকে কী দীক্ষা দেবেন তিনি? তাতে রাজাবাবু বলেন, কেন দেবেন না! ওঁর কোন গোঁড়ামি নেই, উনি মনেপ্রাণে যথার্থ বৈষ্ণব, মুসলমান ক্রীশ্চানকেও উনি দীক্ষা দিতে পারেন—অনায়াসে—তার তুমি!'

কথাটা মনে আছে কিরণের, ভালই মনে আছে।

একটা তুচ্ছ ব্যাপার ঘটেছিল কথাটা নিয়ে—সেটাও কিরণের চোখ এড়ায় নি। বরং সেইজন্যেই মনে আছে। ঝোঁকের মাথায়—গুরুদেবের প্রশংসাচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন রাজাবাবু, কিন্তু ঐ পর্যন্ত বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। সুরোর নিজের পদবী সম্বন্ধে অত্যন্ত দুর্বলতা ছিল। সে যে রাজাবাবুর রক্ষিতা—এ চিন্তাটা ছিল ওর মনে একটা গোপন গভীর ক্ষতের মতো। সেটা কয়েকদিন যাতায়াত ক'রেই বুঝতে পেরেছিল কিরণ। অতিরিক্ত স্পর্শকাতর ছিল সুরো এ বিষয়ে—তাই রাজাবাবু ও প্রসঙ্গটা সাধ্য-মতো এড়িয়ে যেতেন।

সুরো অবশ্য প্রথমটা অত ধরতে পারে নি সেদিন। রাজাবাবু যদি অপ্রতিভভাবে হঠাৎ থেমে না যেতেন তাহলে বোধহয় আদৌ বুঝতে পারতও না। রাজাবাবুর অপ্রতিভ ভাব আর এই মধ্যপথে থেমে যাওয়াতেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। মুখখানা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছিল দেখতে দেখতে—আজও কিরণের সে দৃশ্য মনে আছে।...নেহাৎ বোধ হয়—কিরণ ছিল বলেই কোন বাঁকা মন্তব্য করে নি আর।...

নানু জিজ্ঞাসা করল, 'তা তিনি এলেই কি আর এ পাগলামি সারবে? মানে—তাঁর কোন অলৌকিক শক্তি আছে বলে মনে করো?'

'না না, তা নয়।' কিরণ যেন আরও বিব্রত হয়ে পড়ে, 'সে বিষয়ে অবশ্য আমি কিছু জানিও না।...এমনিতেই—গুরু তো, বিশেষ রাজাবাবুর গুরু, গুরুদেবকে দেবতার মতোই ভক্তি করতেন উনি—তাঁকে দেখেও তত না হোক, তাঁর কথাবার্তায় তাঁর উপদেশে কাজ হতে পারে।'

'তা হ'লে দ্যাখো লিখে। তবে যে রকম সর্বত্যাগী সাধু বলছ—তিনি কি আসবেন লিখলেই?'

'কি জানি, কী ভাবে নেবেন তিনি—লিখে দেখব একবার?'

'দ্যাখো।' বলল বটে নানু—তবে তাঁর আসা বা তাঁর প্রভাবে সুরোর পাগলামি ভাল হওয়া—কোনটাতেই তেমন আস্থা স্থাপন করতে পারল না।

গুরুদেব কিন্তু চিঠি পাওয়া মাত্রই চলে এলেন। এত তাড়াতাড়ি আসবেন কিরণও আশা করতে পারে নি। সে অবশ্য খুবই গুছিয়ে চিঠি লিখেছিল, অবস্থাটা বিস্তারিত

ভাবে জানিয়েছিল। তবু ভয় ছিল অত বড় চিঠিই তিনি পড়বেন কিনা আদৌ।

বৃদ্ধ কৌপীনবন্ত বৈষ্ণব, মোটা-দানা তুলসীর মালা গলায়, সর্বাঙ্গে তিলক। একটা কর্কশ জুই কাপড়ের বহির্বাস, বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি গিয়ে দুই প্রান্তে গিঁট বাঁধা গলার পিছনে।

নিতান্ত সাধারণ চেহারা, সাধারণ বৈরাগী বৈষ্ণবের।

তবু, ঠিক সাধারণ যে নন, তা তাঁর দিকে চেয়েই বুঝতে পারল কিরণ। নানুও। কোথায় যে কী আছে, এই শ্যামবর্ণ খর্বকায় বৈরাগীর মধ্যে—মাথা আপনিই নত হয়ে আসে। নানুর মনে হল—কেন কে জানে, তাঁকে দেখেই একটা আশ্বাস লাভ করল মনে মনে—যদি হয় তো এঁর দ্বারাই কাজ হবে।

হ'লও তাই। গুরুদেব যে আসবেন তা কল্পনাও করে নি সুরো। জানতও না যে তাঁকে চিঠি লেখা হয়েছে, তাঁর কথা বোধহয় এ কদিন মাথাতেও ছিল না। কেউ মনে করিয়েও দেয় নি। আর দেবেই বা কে, নিস্তারিণীও জানত না দীক্ষার ব্যাপারটা। গুরু আসেন না কখনও, এখান থেকে প্রণামী বা কাপড় ইত্যাদি—নিস্তারিণীর যেমন যেত—তাও কখনও যায় নি। রাজাবাবু কি পাঠাতেন, কিছু পাঠাতেন কিনা তা তিনিই জানতেন। নিয়মিত মন্ত্র জপ করতে বসাও কখনও চোখে পড়ে নি নিস্তারিণীর।

তার কারণ এর দীক্ষাও একটু নতুন ধরনের ছিল। দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, যখন মনে পড়ে, তা যে অবস্থাতেই হোক—বসে শুয়ে—এমন কি আপাত-অপবিত্র অবস্থাতেও জপ করা চলবে। কোন বাধা-ধরা নিয়ম তিনি বলে দেন নি। কবার জপ করবে কখন করবে—কিছুই না। আহ্নিক যাকে বলে সে ধরনের কোন বন্ধন আরোপ করেন নি—কোন বিধিনিষেধও না।

'ভগবানের নাম করবে মা—যখন মনে হয় যখন মনে পড়ে তখনই করবে। মধুর নাম, মধুর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। নিয়ম ক'রে কিছু করতে গেলেই অরুচি ধরে যায়—তখন আর প্রেম প্রীতি থাকে না, দায় হয়ে দাঁড়ায়। সেই রজো গোসাঁইয়ের পুতের মাথা খাওয়া হয়। তাতে দরকার নেই। যদি ভুল হয়ে যায়? গেলই বা। তিনি প্রেমময়, দয়াময়, অন্তর্যামী —ভুল হ'লে তিনি যদি তা মার্জনা করতে না পারবেন তো তাঁকে ডাকব কেন?'

'রজো গোসাঁইয়ের পুতের মাথা খাওয়ার' গল্পও করেছিলেন তিনি তার পরে। এক মেছুনী নাকি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন হাটে গিয়েছিল মাছ বেচতে। ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেছে—দু প্রহর অতীত, ঠেকো রোদে বিরাট একটা ছায়া-হীন মাঠ পেরিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে এক দোকানের সামনে ছায়ায় বসে পড়ে জল চেয়েছে দোকানীর কাছে। চেনা দোকান—হাটবারে হাটবারে ফেরার পথে তার দোকানেই জলপান কিনে খায়। অবস্থা দেখে সে তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল এনে হাতে ঢেলে দিতে গেছে, প্রথমটা হাত পেতে নিয়ে মুখ-হাত ধুয়েছেও, কিন্তু তারপর, দুহাতে আঁজলা পেতে জল নিয়ে খেতে গিয়ে মনে পড়েছে তখনও আহ্নিক করা হয় নি। সেই মুখের জল ফেলে দিয়ে বলেছে, 'দাঁড়াও, জল খাবো কি—এখনও রজো গোসাঁইয়ের পুতের মাথা খাওয়া হয় নি যে! আগে সেটা খাই, তারপর তো জল খাবো!' রজো গোসাঁই—মানে রজনী গোস্বামী তার গুরু।

গল্প শেষ ক'রে হেসে বলেছিলেন, 'একটা নিয়ম বেঁধে দিই—আর তুমিও অমনি কোনদিন আমার পুতের মাথা খেতে শুরু করো! না মা, ওতে দরকার নেই। তার চেয়ে যদি তাঁকে স্মরণ না করো—সেও ভাল। তাঁর কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না তাতে।'

সেইজন্যেই আরও বুঝতে পারে নি নিস্তারিণী। স্নান ক'রে উঠে ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বা এমনিই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি সূর্যের দিকে মুখ ক'রে প্রণাম করা ওর দীর্ঘকালের অভ্যাস। প্রায় ছোটবেলা থেকেই। কাকে প্রণাম ক'রে—কার কার

ওপর ভক্তি—এসব কৌতূহলও কখনো বোধ করে নি নিস্তারিণী; তাই জানতেও চায় নি। ইদানীং তো একটা ঠাকুরঘরের মতোই হয়েছিল, সেখানে গিয়ে প্রণাম করত, এ বাড়িতে তো রীতিমতো আলাদা একটা ঘরই আছে। ছেলেবেলার সে প্রণামের সঙ্গে এ প্রণামের কিছু তফাৎ আছে তা ভাবতে পারে নি সে।

গুরুদেব আসাতে কিন্তু আশ্চর্য ফল হ'ল। এতটা যে হবে কিরণও মনে করে নি।

প্রথমটা একটু চিনতে দেরি হয়েছিল সুরোর। কিম্বা বিহ্বল মাথাতে গুরুদেবের উপস্থিতির যোগসূত্রটা ঠিক ধরতে পারে নি—বিস্ময়টা সামলে নিতে, বিশ্বাস করতে দেরি হয়েছিল। তারপর চিনতে এবং বুঝতে পারার পরই ছুটে এসে আছড়ে পড়ল তাঁর পায়ে। আর এই প্রথম—বুকফাটা আকুল কান্নায় যেন ভেঙে পড়ল। দুই পায়ে মুখ গুঁজে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল মড়া-কান্নার মতোই।

'কী দেখতে এলেন বাবা! এলেন তো দুদিন আগে আসতে পারলেন না! হয়ত আপনি এসে দাঁড়ালে বেঁচে যেত সে।...কেন এলেন না বাবা, কেন—কেন তাকে যেতে দিলেন! সে যে বড্ড ভক্তি করত আপনাকে। ইষ্টের মতোই মনে করত। কেন তাকে যেতে দিলেন আপনি! তার আগে আমাকে যেতে দিলেন না কেন। আমি কি নিয়ে থাকব আর বাবা? আমি যে আর পারছি না—বুকটা যে ভেঙে পিষে যাচ্ছে আমার।'

গুরুদেব সর্বত্যাগী হ'লেও বহুদর্শী। তিনি বাধা দিলেন না, ব্যস্ত হয়ে ওকে ওঠাবারও চেষ্টা করলেন না। পায়ের ওপর একটা মেয়েছেলে মুখ ঘষছে আর কাঁদছে—অবস্থাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, তবু সে অস্বস্তি মুখ বুজেই সহ্য করলেন তিনি। তিনি জানেন এইটেই ওর ওষুধ। এই কান্নাটা এরা কাঁদাতে পারে নি বলেই এত বিপত্তি। কিরণ সবই খুলে লিখেছিল।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে তিনি আস্তে আস্তে পা-টা ছাড়িয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে নিস্তারিণী একটা আসন পেতে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এসে, যেখানে মাটিতে পড়ে এখনও কাঁদছে সুরবালা, সেইখানেই বসলেন। ওর মাথায় আলতো একটা হাত রেখে সস্নেহে ডাকলেন, 'মা, মা আমার!'

ততক্ষণে শ্রান্ত এবং শান্ত দুই-ই হয়েছে সুরবালা। মন খুলে কাঁদতে পেরে, মনের সব বেদনা একজনের কাছে উজাড় ক'রে দিতে পেরে অনেকটাই হালকা বোধ করছে সে। এবার সোজা হয়ে বসে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অতটা আবেগ অতটা কান্না এক কথায় বন্ধ হয় না, চোখের জলেও অত সহজে বাঁধ দেওয়া যায় না—তবে বার বার চোখ মুছতে মুছতে চোখের জল একসময় কমে এল। শুধু বুকটা তখনও ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, ফোঁপানিটা বন্ধ হ'ল না।

'মা গো!' আবারও কোমল কণ্ঠে ওকে সম্বোধন করলেন গুরুদেব, 'তুমি তো জানো মা, সে গোবিন্দের জিনিস, তাঁর লীলার জন্যে যে কদিন প্রয়োজন ছিল সেই কদিনই রেখেছিলেন, লীলা শেষ হ'তেই আবার টেনে নিয়েছেন নিজের কাছে। তোমাকে নিয়ে তাঁর লীলার আশা এখনও মেটে নি—তোমাকে এখনও তাই থাকতে হবে হয়ত বহুদিন। তুমি তো অনেক পরে এসেছও মা!'

'কিন্তু আমি—আমি কি ক'রে বাঁচব বাবা, তাঁকে ছেড়ে যে দীর্ঘকাল, সেই প্রথম দিনটির পর থেকেই—কখনও থাকি নি!'

'তাকে ছেড়ে কেন থাকবি মা! সে তো রয়েছে। সে তোর প্রাণের গোবিন্দর মধ্যে লীন হয়ে গেছে। তুইও তো গোবিন্দকে ভালবাসিস মা, সেও বাসত। সেই গোবিন্দ তো আছেন, তাঁকে পেলেই তো তাকেও পাওয়া হ'ল। গোবিন্দকে ডাক—সব ব্যথা দূর হয়ে যাবে, তোর প্রাণের মানুষেরও স্পর্শ, তার উপস্থিতি বুঝতে পারবি।'

'পারব, পারব বাবা? ঠিক বলছেন?'

সাগ্রহে ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে সুরবালা।
'ঠিকই বলছি মা। তিনি এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে। তোর বুক কি এমন শূন্য রাখতে পারেন?'
সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উত্তর দেন সন্ন্যাসী।

মাত্র তিন দিন রইলেন গুরুদেব।
কিন্তু তিন দিনেই আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল সুরোর। একেবারে সহজ হয় গেল সে। স্নান, আহার, পূজা, গুরুসেবা সমস্তই স্বাভাবিক নির্ভুলভাবে ক'রে যেতে লাগল। একটু লজ্জিতও বোধ করতে লাগল বোধহয় তার পূর্ব আচরণের জন্যে। কিছু কিছু মনে আছে তার, কিছু বোধহয় এদের মধ্যেকার কথা থেকেও ধরতে পারে। কিরণের দিকে চেয়ে অপ্রতিভ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, 'তোমাকে কদিন খুব কষ্ট দিয়েছি, না? খুব অত্যাচার করেছি! আমাকে যেন ভূতে পেয়েছিল কদিন। কিন্তু তুমিই বা এমনভাবে পড়ে মার খেলে কেন?...বৌকে বলে এসেছিলে তো? কদিন হ'ল বলো দিকি, আমার কোনই হিসেব নেই আর—সে নিশ্চয় খুব ভাবছে? তুমি এবার ফিরে যাও। তার বড্ড কষ্ট। বাপ রে, স্বামীকে ছেড়ে থাকার যে কী কষ্ট তা তুমি বুঝবে না, আমি বুঝেছি। তুমি যাও।'
চুপ ক'রে শোনে কিরণ, জবাব দেয় না প্রতিবাদও করে না। সুরো যে সত্যিই ভাল হয়েছে, প্রকৃতিস্থ হয়েছে—এটা যেন তার বিশ্বাস হ'তে চায় না।
নানু কিন্তু বলে, 'তুই আর ভাবিস নি কিরণ। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কাল দেখেছি রাজাবাবুর ছবির সামনে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে। সত্যি—বাহাদুর ছেলে তুই, ফুট ডাস্ট গিভ্, ভ্যাগ্যিস্ গুরুদেবের কথাটা মনে রেখেছিলি আর চিঠি দিয়েছিলি! আমি "হ্যাঁ" বলেছিলুম বটে—তবে আমার বিশ্বাস হয় নি যে উনি এসে এমন ভেল্‌কি দেখাতে পারবেন!'
চার দিনের দিন গুরুদেব সুরোকে কাছ বসিয়ে খাওয়ালেন। কদিনই তাঁর প্রসাদ পাচ্ছিল, আজ জোর ক'রে পাশে বসালেন। বললেন, 'নিয়মিত খেয়ো, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রো না। আমার আদেশ এটা। শরীর তো ঠিক তোমার নয় মা, এ তো তাঁর। গোবিন্দর। তাঁর লীলায় লাগবে এখনও, এ তোমার গচ্ছিত ধন। এটা ঠিক রাখা দরকার। তাঁর মন্দির ভেবে যত্ন করবে।'
তার পর বললেন, 'মাছ মাংস আর খেতে ইচ্ছে না হয়—খেয়ো না। যদি তাকে লৌকিক স্বামী বলে মনে ক'রে থাকো—তো সেইভাবেই চলো। তবে সংসারকে জীবনকে অবহেলা করা চলবে না, আবার বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হবে।'
সুরবালার দুই চোখ আবারও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আকুলভাবে বলে, 'কিন্তু কি নিয়ে কাকে নিয়ে বুক বাঁধব বাবা! তাঁর কোন চিহ্ন—যদি একটা ছেলেও থাকত, তবু তাকে নিয়েই বুক বাঁধতুম, তাকে অবলম্বন করেই খাড়া হয়ে দাঁড়াতুম আবার।'
'কিন্তু ছেলের সময় তো এখনও তোমার যায় নি মা।' শান্তকণ্ঠে গুরুদেব বলেন।
দুই চোখে নিমেষের জন্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় সুরোর—এই বিদ্যুৎ দেখে রাজাবাবু সুদ্ধ ভয় পেতেন—তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'ছিঃ!' সে শব্দে নিস্তারিণী কিরণ দুজনেই চমকে ওঠে। ছোট্ট একটি অক্ষর উচ্চারণে এতখানি ঘৃণা প্রকাশ পেতে পারে মানুষের—তা এর আগে ওরা জানত না।
শুধু বিচলিত হন না গুরুদেব। তেমনি শান্তভাবেই বলেন, 'সে ভাবে ছেলে পাওয়ার কথা আমি বলি নি মা। আমি জানি দ্বিতীয় কোন পুরুষকে একান্তভাবে চিন্তা করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি গোবিন্দকে, তোমার ইষ্টকেই সন্তানরূপে পাওয়ার চেষ্টা করো, সাধনা করো!...যদি সত্যিই ঐকান্তিকভাবে চাও, তিনিই তোমার সন্তানের সাধ

প্রূর্ণ করবেন—তোমার কোল জুড়ে বুক জুড়ে থাকবেন। তোমার তো পয়সার খুব আর অভাব নেই মা, তুমি কেন বৃন্দাবনে গিয়ে ঠাকুরবাড়ি ক'রে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করো না, তাঁকে সেবা করো না?...অনেক রকমেই সেবা করা যায়—কান্তারূপে, সখীরূপে, দাসীরূপে—তুমি তাঁকে জননীরূপেই সেবা করো—তিনি সেইভাবেই তোমার সেবা নেবেন—তোমার কাছে ধরা দেবেন। যে যেভাবে তাঁকে চায়—সেইভাবেই পাবে, এ তো তিনিই বলে গেছেন মা।...যদি এখানে ভাল না লাগে তুই ব্রজধামেই যা।'

অকস্মাৎ, এতদিন পরে, কী এক অনির্বচনীয় পুলক সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগায় সুরবালার। মনে পড়ে আর এক সর্বত্যাগী মহাতপস্বীর আশ্বাসবাণী, আশীর্বাদঃ 'ভগবানকে তুই সন্তানরূপে পাবি।' আজ বোঝে—এই প্রথম বুঝতে পারে সে আশীর্বাদের অর্থ।

আবারও চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে। তবে এবার দুঃখে নয়, বিরহে নয়—আশায় আর আনন্দে।

॥ ৩৩ ॥

গুরুদেব চলে যেতে সুরো কিরণকেও জোর ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। বললে, 'তাদের দিকটাও তো ভাবতে হবে, নাবালক ছেলেমেয়ে, সোমত্ত বউ। তাদের জন্যেই বিষয়-সম্পত্তি পাহারা দিতে হবে। তাছাড়া, আমার জন্যেই আরও এখন যাওয়া দরকার। তোমাকে আমার দরকার হবে আবার শিগ্‌গিরই, বেশীদিনই হয়ত ঘর ছেড়ে থাকতে হবে তখন। ...বৃন্দাবন যাবার কথা বলছি গো। নানুদার থিয়েটার আছে, সে তো পারবে না অতদিন গিয়ে থাকতে। আর কে যাবে বলো! তোমাকেই যেতে হবে। সেইজন্যেই বলছি—কটা দিন ঘুরে এসো। ওঁর শ্রাদ্ধটা না চুকলে আমি তো কোথাও যেতে পারব না—যেতে নেইও। বিশেষ তীর্থে বা ঠাকুরবাড়িতে অশৌচ নিয়ে যাওয়া চলে না।...ওরা না মানুক—আমি জানি তিনি আমার কি ছিলেন, আমার এটা অশৌচকাল। আমিও ভুজ্যি করব এখানে—মেয়েগুলোকে, শ্মশানযাত্রী ওরা—ওদের আর ক'টি ব্রাহ্মণও খাওয়াব। তবে তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, সে নানুদাই পারবে সব উয্যুগ সঞ্জোগ ক'রে দিতে। তুমি যাও।'

তবু কিরণের মুখ থেকে সংশয় ও দুশ্চিন্তার ছায়া কাটতে চায় না দেখে হেসে বলে, 'ভয় নেই। আমি বলছি তুমি নির্ভয়ে চলে যাও। আর আমি পাগল হবো না, নষ্টও করব না কিছু। নষ্ট করলে চলবে না যে। এখন যে ঢের দরকার হবে টাকার। আর তো রোজগার নেই, নিজের তো অনেক দিনই গেছে—দেনেওলাও চলে গেল। যা করে ঐ সোনা-গাঁথা পুঁজি। ও থেকে একটি আধলাও নষ্ট করা চলবে না আর।...তুমি যাও, ঘুরে এসো নিশ্চিন্ত হয়ে।'...

কিরণ সম্ভবত যাবার আগে কথাগুলো নিস্তারিণীকে বলে গিয়েছিল। অবশ্য গুরুদেব যখন বলেন তখন তো সে উপস্থিতই ছিল। তবে তখন অত মাথা ঘামায় নি, নিছাৎই কথার কথা—ভোলাবার জন্যেই—এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল। মেয়ে যে সত্যি-

সত্যিই সেই কথা মনে ক'রে রাখবে আর সেই মতো কাজ করবে তা একবারও ভাবে নি।
এখন কিরণের কথায় তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মুশকিল এই যে, ঠিক তখনই ঘাঁটাতেও সাহসে কুলোয় না, বেশী জেদাজেদি করলে উত্ত্যক্ত করলে আবার যদি পাগলা-মিটা মাথাচাগাড় দেয়? একবার ভাবলে একেবারেই ঘাঁটিয়ে কাজ নেই—পাগলের খেয়াল হয়েছে, দুদিন পরে আপনি চলে যাবে, এই কথা কি আর মনে ক'রে বসে থাকবে? বরং কিরণকে একটা আলাদা চিঠি লিখে টিপে দিলেই হবে, দু-চার দিন দেরি ক'রে ফিরতে।

কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত হয়েও থাকতে পারল না শেষ অবধি। গতিক-সতিক ভাল নয়। নানুকে ডেকে কোথায় কি আছে টাকাকড়ি—তার হিসেব করছে। নানুকেও নাকি বলেছে বৃন্দাবন যাবার কথা। নানু সঙ্গে যেতে পারে কিনা মাসখানেকের ছুটি নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। এর পর—আরও এগিয়ে গেলে তখন আর হয়ত প্রতিকারের পথ থাকবে না। যা হয় হেস্তনেস্ত এখনই ক'রে ফেলা দরকার।

নিস্তারিণী মেয়ের কাছে এসে একদিন—যাকে বলে আড় হয়ে পড়ল।

'তুই নাকি বেন্দাবনে ঠাকুরবাড়ি পিতিষ্ঠের মতলব করছিস?'

সুরবালা একটু অবাকই হয়ে গেল, নিস্তারিণীর যে এর মধ্যে কিছু বলবার থাকতে পারে—তা ভাবে নি সে একবারও। বরং মনে হয়েছিল, বুড়ো বয়সে তীর্থবাস করবার সুযোগ পাওয়ায় সে খুশীই হবে। বললে, 'হ্যাঁ—তা কি হয়েছে তাতে?'

'কি হয়েছে? এই বয়সে যোগিনী হবি? কী তোর এমন বয়স হয়েছে শুনি? এখন থেকে ঠাকুর পিতিষ্ঠে ক'রে তাতেই মন দিয়ে থাকতে পারবি?...এই কি তোর ঐসব করবার বয়েস?'

সুরো আরও অবাক হয়ে যায়, 'ওমা, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার আবার বয়স আছে নাকি? আর বয়স কমটাই বা কি হ'ল শুনি? ছেলেপিলে হয় নি তাই—নইলে তো বুড়ী হয়ে যেতুম। তা ছাড়া—আমি দেখেছি বুড়ো হ'লে সংসারের মায়া আরও বেশী হয়, তখনই বরং মানুষ ভগবানের দিকে মন দিতে পারে না। দ্যাখো না, সন্ন্যাসী যারা হয় তারা অল্পবয়স থেকেই বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায়! বুড়ো বয়সে কে কটা সন্ন্যাসী হয়? যারা তখন সংসার ছাড়ে—ঝগড়া ক'রে কি জ্বালাতন হয়ে বেরিয়ে যায়—ভগবানের জন্যে কেউ যায় না।'

'দ্যাখ্, ওসব নেকচার আমার কাছে দিতে আসিস নি। তোর ডবল বয়েস আমার—হয়ত আরও বেশী। ঠাকুর ছেলেখেলার জিনিস নয়। এখনও তোর রূপের ডালি শরীর, যৌবনও কিছু পার হয়ে যায় নি। যদি তোর মন বেশীদিন পুজো-আচ্ছারায় না বসে? কিছু বলা যায় না—আজ ভাবছিস অন্য কোন পুরুষ আর তোর মনে ধরবে না, কিন্তু চিরদিন যে তাই ভাববি, তার কিছু মানে আছে? মন না মতি—বদলাতে কতক্ষণ! অপর কোন পুরুষের দিকে যদি ঝুঁকিস আবার—ঠাকুরের দিকে তেমনি মন থাকবে, না তাঁর সেবা নিয়েই দিন কাটাতে পারবি? না না, ওসব মতলব ছাড়্। আর কিছুদিন দ্যাখ্ বেয়েচেয়ে। তাছাড়া, বেন্দাবন জায়গা ভাল নয়—শুনেছি,' যত সব ন্যাড়ানেড়ির আড্ডা! তারা কেউ গোবর্ধন ধারণের হিসেব রাখে না—রাসলীলেই জানে, তাই করতেই যায়।'

'কিন্তু সেইখানেই তো গুরুদেবের মতো লোক থাকেন—', সুরো বলতে যায়।

বাধা দিয়ে নিস্তারিণী বলে, 'ওঁরা হলেন গে সিদ্ধ-পুরুষ, ওঁরা যেখানে যাবেন সেখানেই ও'দের তপিস্যে হবে। নরকে গেলেও তখন আর নরক থাকবে না সেটা। তবু তো শুনেছি উনি খাস বেন্দাবনে থাকেন না—পাহাড়ে জঙ্গলে থাকেন, দিনের বেলায় বাঘ বেরোয় সেখানে—সাপ কিলবিল করে।...না না, এখনই তাড়াহুড়ো কিছু করিস নি, আমি মা—আমি যত তোকে বুঝি আর কেউ বুঝবে না। আর কটা দিন দ্যাখ্, দু-এক বছর, তার পরও যদি এই মন থাকে—তখন যা হয় করিস।'

এমন আন্তরিকভাবে কথাগুলো বলে নিস্তারিণী—ঠিক উড়িয়েও দিতে পারে না। মার মনে কষ্ট দিতেও ইচ্ছে করে না আর। কে জানে—রাজাবাবুর জন্যে মাকে অমন মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল বলেই আজ তার এই দশা কি না, ভগবান রাজাবাবুকে এমনভাবে কেড়ে নিলেন কি না!...পাপের শাস্তি পরজন্মের জন্যে তোলা থাকে না কিছু —ইহজন্মেই সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হয় মানুষকে—রাজাবাবুই বলতেন।...

সে কেমন একরকম অসহায় করুণভাবে বলে, 'কিন্তু এই দুটো তিনটে বছরই বা আমি কি নিয়ে থাকব বলতে পারো—মন যে হু-হু করে সর্বদা—জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে ভেতরটা—অনবরত।'

'কেন, গান! তোর তো ঈশ্বরদত্ত জিনিসই রয়েছে—তাঁর দেওয়া অবলম্বন! গান শুনে অপরে শোক দুঃখ ভুলে যায়—যে গায় তার তো আরও ভোলবার কথা। তোর নিজস্ব জিনিস এটা, গান ধর্—দেখবি সব ভুলে যাবি। আর এ তো বাইজীর গান খেম্টা গান নয়—এও তো ভগবানের নাম, এক রকম তাঁর পুজোই। মনে কর না, তাঁকে ঐ গান গেয়েই সেবা করছিস। জামাইও আমার তোর গান ভালবাসতেন, ঐ গান শুনেই তো প্রথম টলেন তোর দিকে—তুই আবার গান ধরলে তিনিও খুশী হবেন। স্বগ্‌গ থেকে আশীর্ব্বাদ করবেন।'

'গান?' কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় সুরো।

কথাটা তার একবারও মাথায় আসে নি এর মধ্যে—কিছু কথাও হয় নি তাই এ নিয়ে. 'গান কি আর গাইতে পারব?—এই এতকালের অনভ্যেসের পর! সব তো ভুলেই বসে আছি বলতে গেলে! গলা সুরে বলবে কেন এখন আর!'

'ওসব বাজে কথা। সত্যিকারের যত্ন নিয়ে শেখা তোর, হেলাফেলায় কোনমতে কাজ চালাবার মতো তো শিক্ষে নয়। বলতে গেলে ওতেও তোর একটা সিদ্ধি হয়ে গেছে। ও তোর কখনও ভুল হবে না, দু-একদিন দোয়ার-বাজনদারদের সঙ্গে গটিয়ে নে—দেখবি সব আবার মনে পড়ে যাবে, গলাও দেখবি ঠিক সুরে বলছে। কিচ্ছু ভুলিস নি তুই!'

সুরবালা কেমন যেন দ্বিধায় পড়ে যায়।

গান!

হ্যাঁ, গান তিনি ভালবাসতেন বটে। ওর গান—বিশেষ ক'রে। গান শোনবার জন্যেই এসেছিলেন প্রথম।

কিন্তু সে তো তাঁর নিজের শোনার জন্যে।

যদি এখানের কথা সেখানে পোঁছয়, যদি স্বর্গে থেকে এই মাটির পৃথিবীর খবর পাওয়া সম্ভব হয়—সে গাইছে শুনলে কি সত্যিই তিনি খুশী হবেন? আবার সে পয়সার জন্যে দুনিয়ার লোককে গান শুনিয়ে বেড়াচ্ছে জানলে বেজার হবেন না তো? তাঁর অত প্রিয় এই দেহটা আবার ঐ নানান্ চরিত্রের লোকের সামনে মেলে ধরেছে জানলে—? তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন বটে—সে গাওয়াটা বজায় রাখতে চায় কি না, তবে সে 'না' বলাতে খুশীই হয়েছিলেন, সেটা মনে আছে।

অবশ্য তখন তিনি ছিলেন। তিনি এখন নেই। ওর কি নিয়ে দিন কাটবে, তা কি তিনি ভেবে দেখবেন না? তাতেও কি—ও আবার গান গাওয়া ধরেছে জানলে অপ্রসন্ন হবেন?...না কি, অন্য অবলম্বনের বদলে গানই আশ্রয় করেছে—ভগবানের নাম—জেনে খুশী হবেন?

কিছুই ভেবে পায় না সে। মনও স্থির করতে পারে না। আবারও ছট্‌ফট ক'রে বেড়ায়। মাঝে মাঝে রাজাবাবুর ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'ওগো বলো না গো, আমি কি করব! একটিবার বলে দাও না। তুমি তো কিছুই দিয়ে গেলে না আমাকে—না একটা ছেলেমেয়ে, না একটা কাজ! কিছু তো অবলম্বন চাই একটা! সত্যিও তো

আবার আমি অন্য পুরুষকে ধরতে পারব না। তুমিই বলে দাও, কি নিয়ে থাকব আমি! আগে তো এত কথা কইতে, এই একটা কথা এখন বলতে পারছ না? বেশ তো, স্বপ্নেই না হয় বলে দিও!'...

কে জানে, নিস্তারিণীই গোপনে কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল কিনা, দিন দুই পরে ঝিয়ের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মতি এসে হাজির। মতি আগেও একদিন এসেছিল, প্রত্যহই খবর নেয়, তবে তার যখন-তখন আসা মুশকিল, দুটো লোকে ধরে নামাতে ওঠাতে হয় সিঁড়ি দিয়ে। তাও উঠে এসে একদণ্ড শুধু হাঁপায়।

প্রথম যেদিন আসে সেদিন কথা কয় নি, আজ ছুটে এসে সমাদর ক'রে বসাল সুরো। মতি ওর চেহারা দেখে কেঁদে ফেলল। রুক্ষ চুল, নিরাভরণ দেহ, কালিপড়া মুখ। তার চোখের জল দেখে সুরোরও চোখে জল এসে গেল। সে ছেলেমানুষের মতো মতির কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

দু পক্ষই কিছুটা শান্ত হ'তে এককড়ি দোয়ার কথাটা পাড়ল। সে সঙ্গে এসেছিল হয়ত ইচ্ছে ক'রেই। বলল, 'আমি বলছিলুম কি সুরোদি, (আগে নাম ধরেই ডাকত, পুরোপুরি কীর্তনউলী হ'তে শেষের দিকে দিদি বলতে শুরু করেছিল) দোয়ার বাজনদাররা তো পেরায় বসেই আছি আমরা, মা তো ধরো বায়না নেওয়া ছেড়েই দিয়েছে এদান্তে, কালেভদ্রে যা গাইতে যায়—ঐ পাথুরেঘাটা রাজবাড়ি, কি চোরবাগানের মল্লিকবাড়ি, ঝামাপুকুরের রাজবাড়ি—কীর্ত্তি মিত্তিরদের বাড়ি—এমনি বড় বড় দু-একটা পুরনো বাঁধা ঘর ছাড়া বড় একটা যায় না। আর গাইতে যায়—ঐ কৃষ্ণপ্রেভার গান হয়েছে, তারই রেকট্ না কি ওঠে—একটা নলের মতো জিনিস ঘুরিয়ে তাতে আলপিন ঠেকিয়ে দাও—হরদম গান গেয়ে যাবে: একটু নাকী-নাকী আওয়াজ বেরোয় এই যা, তবে গলাটা বোঝা যায় মোটামুটি। তা গান গাওয়া বলতে তো এই রেকট্ তোলা—সেও কালে-ভদ্রে, নমাসে ছমাসে একদিন—যেদিন গেল সেইদিনই হয়ত একেবারে তিন-চারখানা গান কি সাত-আটখানা গান তুলিয়ে এল—নিশ্চিন্দি।...তাই বলছিলুম কি, আমরা তো বসেই আছি, তোমাকে নতুন ক'রে লোক ডাকতে কি দল তৈরী করতে বেরোতে হবে না—তুমি আবার মুজরো ধরো না কেন—দুচারটে ক'রে? লোক তো হুদো হুদো আসে আমাদের কাছে, মা-ই আবার দরদস্তুর ক'রে তোমার কাছে পাঠাত বায়না দিতে? সব জায়গায় যেতে বলছি না—ইজ্জত খোয়াতে বলব না—বেছে বেছে যদি ভাল ভাল জায়গায় দু-একটা বায়না নাও তো কি হয়?...মনটাও ভাল থাকবে—আর এত কাণ্ড ক'রে বিদ্যেটা শিখেছিলে—সেটাও নষ্ট হবে না—? য়্যাঁ, কী বলো?'

মতি তাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'তুই থাম দিকি? শোকা-তাপা মেয়েটা মরছে নিজের জ্বালায়—তুই এখনই এলি তার কাছে বায়নার কথা তুলতে! এখন যাক কিছুদিন, ঠাণ্ডা হোক একটু—তারপর ভাববে এখন। আর গান তো গাইতেই হবে—আর কি করবে বল্! কী নিয়েই বা থাকবে?'

সুরো ধরা-ধরা গলায় আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'কিন্তু গান কি আর গাইতে পারব মাসী? সব তো ভুলে বসে আছি!'

'ঐ দ্যাখ! তুই গান ভুলবি কি লো! তোর কি সেই শিক্ষে! যেদিন শেষদিন—চিতেয় উঠবি সেদিনও গান ধরলেই দেখবি গলা ঠিক সুরে বলছে, কোথাও বেসুরো বেতালা হচ্ছে না। বয়েসের সঙ্গে গলা বসে যেতে পারে, শেলেষ্মায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাগে অনেক সময়—সে আলাদা কথা। সে সেই বেশী বয়সে হয়। তাও বলতে নেই, গুরুকৃপায় আমার তো এখনও হয় নি। প্রেথম দু-একটা কলি ভাঁজবার সময় মনে হয় একটু অসুবিধে—তার পরই গলা খুলে যায়—চাঁচাছোলা পুর্বেকার স্বর বেরোয়। না কি বলিস রে এককড়ি,

তোরা তো শুনছিস, গলা কি আমার চেপে গেছে—?

'বাঁশী, বাঁশী!' এককড়ি বলে ওঠে, 'কী বলব, মনিব বলে বলছি না, তোমার গলা এখনও বাঁশী। এতটুকু বয়সের মরচে ধরে নি। আর এমনি তো কত হাঁপাও, তান জোলো যখন তখন, মনে হয় না একবারও যে দম কমে এসেছে! সখিরে বলে ধরলেই হ'ল—মনে হয় রাধারাণী দম যুগিয়ে যাচ্ছেন। আর আমাদের কথাই বা ধরবে কেন—আমরা তো না হয় তোমার দৌলতে দুমুঠো পেটে দিচ্ছি, মন যুগিয়ে কথা বলতে বাধ্য—বলি যারা মোটা টাকা নিয়ে এসে এখনও সাধাসাধি করছে গাওয়াবার জন্যে—তারা কি আর তোমার শেলেষ্ম-ধরা গলা শোনার জন্যে করছে! ঐ তো ক্ষণপ্রেভার রেকর্টগুলো বাজছে—নিজেই শোন না কেন!'

পুলকিত মতি সস্নেহে ধমক দিয়ে ওঠে, 'তুই থাম বাপু, আর অত ব্যাখ্যানা করতে হবে না।'

নিস্তারিণী এইবার একটু ফাঁক পেয়ে আসল কথাটা পাড়ে, 'মেয়ের বুদ্ধি শুনেছ দিদি, উনি এই বয়েসে সব ছেড়েছুড়ে যোগিনী সেজে বেন্দাবন যাচ্ছেন ঠাকুর পিতিষ্ঠে করতে! সেইখানে ঠাকুরসেবা আর হরিনাম ক'রে জীবন কাটাবেন!'

এতখানি জিভ কেটে মতি বলে, 'খবরদার! খবরদার! ও কম্ম করিস নি। ইষ্টসেবার অপরাধ বাড়ানো শুধু শুধু। ঠাকুর তো আমারও রয়েছে—ঘরে এনে তোল না—আমি তো বেঁচে যাই তাহ'লে। কত শখ ক'রে সাজিয়েছিলুম ঠাকুরঘর, এই তো আর ওঠবার ক্ষ্যামতা নেই ওপরে—কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখতেও পারি না একবার। ভাড়া-করা মাইনে-করা লোক দিয়ে কি আর ঠাকুরের সেবা হয়? রামোঃ! তারা করবে কেন বল—তাদের কি গরজ?...ভগবানকে ডাকতে হয়, যতক্ষণ নিঃশ্বেসটুকু থাকবে, মনে মনে জপ ক'রে যা, সেই হ'ল গে আসল পুজো।...না না. বাপু সুরো, ওসব মতলব তুই ছাড়। আমি বলছি—এখুনি না, দুদিন চারদিন যাক—জ্বালাটা একটু জুড়োক, তুই বরং গানই ধর। এককড়ি কিন্তু কথাটা মন্দ বলে নি।...ভগবানের নাম করবি—আমি তো তোর গান শুনেছি, তোর তো আর সে দায়ঠেলা দিনগত পাপক্ষ্যায় নয় আমাদের মতো—তুই তো গান শোনাস দেখেছি স্বয়ং গোবিন্দকেই, তন্ময় হয়ে গাস। ঐ তো আসল পুজো লো। ওতে ঠাকুর যত খুশী হবেন, মন্দির ক'রে লোক-দেখানো ফুল-তুলসী দিলে অত হবেন না। আর কথা উঠল তাই বলছি, সেও তো তোর গান শুনেই মজেছিল লো, তুই গাইবার সময় ভাববি ঐ ঠাকুরের পটের মধ্যে দিয়ে সেও শুনছে। সে শুনেছি ভক্ত লোক ছিল, দান-ধ্যান করত—সে মরে বৈকুণ্ঠেই গেছে, গোবিন্দের কাছে। গোবিন্দকে শোনালে তাকেই শোনানো হবে।'

সুরো নির্বাক হয়ে থাকে। এই শেষের যুক্তিটাই তার মনে লাগে। মাও এই কথাই বলেছে কাল। এই গান যদি তার কাছে পৌঁছয়—সে কি বুঝবে না যে পয়সার জন্য নয়, তাকে শোনাবার জন্যেই গান গাইছে সুরো?

কথাটা যত তোলাপাড়া করে মনে মনে, তত এই দিকেই মনটা ঝোঁকে। নিজের নেশা তো আছেই, যশের নেশা বাহবার নেশা বড় কম নয় মানুষের কাছে—তার ওপর নিস্তারিণী আর মতির কথাটাও মনে লাগে একটু একটু।

তবু, হয়ত দ্বিধাটা অত সহজে কাটত না—যদি না মতি একটা বড় চাল চালত!

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবারও প্রায় পনেরো দিন পরে হারানকে দিয়ে বলে পাঠাল মতি, একটা বড় জায়গায় বায়না এসেছে, মতি নিজের নামেই সে বায়না নিয়েছে—তা মতির সঙ্গে কেন চলুক না সুরো? এতদিন গান ছেড়ে দেওয়ার পরে একানে মুজরো ধরতে প্রথমটা হয়ত ভয়-ভয় করবে। মতির সঙ্গে গাইলে তো আর সে ভয় থাকবে না। মতিই মূল গায়েন সেখানে—সুরোর একআধখানা গান গাইলে চলবে, তেমন হয় তো,

যদি দেখে সুরো ঘাবড়ে গেছে—মতিও ওর সঙ্গে গলা মেলাতে পারবে—সামলে নিতে পারবে।

এ প্রস্তাবে আপত্তি করার মতো কিছু খুঁজে পেল না সুরো। যদি গাইতেই হয়—এই-ই উৎকৃষ্ট সুযোগ।...সে বলে পাঠাল—তাই যাবে সে। আগের দিন গিয়ে ওদের সঙ্গে বসে একটু গটিয়ে নেবে। তবে দুখানা একখানার বেশী একানে গান সে গাইতে পারবে না—মাসি না তাকে ব্যাদ্রমে ফেলে তখন, দোয়ারকিই করবে বেশির ভাগ।

গান গাইতে গিয়েও কোন অসুবিধা হ'ল না।

দেখল কিছুই ভোলে নি সে। বেসুরো বেতাল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, চমৎকার মিলে যাচ্ছে। দোয়ার বাজনদার মতি সবাই 'বাহবা বাহবা' করল। মতি এতক্ষণে আসল কথাটা ভাঙল, বলল, 'যতই যা মুখে বলি তোকে, একটুখানি ভয় ছিলই—হয়ত প্রথম প্রথম মেলাতে পারবি না গলা, বাজনা একদিকে যাবে, তোর গলা আর একদিকে যাবে, —বলি গলায় মরচেও তো পড়ে—তা এ তো দেখছি তোর গলা সাধা—সব তৈরী একেবারে। মনে হচ্ছে এতকাল নিত্যি গলা সেধে আসছিস, মাসে চারটে ছ'টা গাওনা করেছিস।'

সুরো খুশী হ'ল। তবে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একটা কথা মনে পড়ায় ফিরে গিয়ে বলল, 'কিন্তু মাসী একটা কথা, আমি কিন্তু এই বেশে যাব—সেজেগুজে গয়না পরে যেতে পারব না। সেটা ভেবে দ্যাখো। তবে হ্যাঁ, ফরসা বাসি-করা কাপড় পরব এটা ঠিক।'

একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল মতি। উদ্বিগ্নও হ'ল। কালো ফিতেপাড় ধুতি পরনে, দুহাতে শুধু দুগাছা বালা। এই বেশে মুজরো করতে যাবে? এই বিধবার বেশে? তারা বলবে কি? ওর পাশে সে-ই বা হীরে-মুক্তোর গয়না পরবে কি করে?

তবু মুখে বলল, 'তোর আর বেশভূষায় কি করবে বল, এখনও এই রূপ। তুই থান পরে গিয়ে দাঁড়ালেও লোকে ধন্যিধন্যি করবে। তবে গলায় একটা হার পরে নিস অন্তত —ন্যাড়া গলা বড্ড খালি খালি দেখায়।'

'আচ্ছা, তা পরব।' সুরো স্বীকার ক'রে চলে আসে।

মতি মুচকি হেসে সাঙ্গোপাঙ্গোদের বলে, 'গান তো ধরুক আগে তার পর সবই করবে, সাজবেও। অমন ঢের ঢের বৈরাগী উদাসিনী দেখলুম এতটা বয়সে।...আবার বাবুও ধরবে—যদি তেমন তেমন কেউ লেগে থাকতে পারে। পয়সার লোভে কারুর কাছে ধরা দেবে না এটা ঠিক, সে মেয়ে নয়, কেউ যদি পয়সার লোভ দেখিয়ে বাগ মানাতে আসে তো সে ঠকবে ; পীরিতপাগলা মেয়ে ও, তেমন তেমন কেউ যদি পীরিত দেখাতে পারে, ছায়ার মতো ঘোরে পায়ে পায়ে—ঠিক ধরা দেবে!'

গাইতে যাবার আগেও বেশ খুশী-খুশী ছিল সুরো। বেরোবার সময় রাজাবাবুর ছবির কাছে গিয়ে বলল, 'তুমিও শুনবে চলো, তোমার সুরো কেমন গায় এখনও। তোমাকেই শোনাতে যাওয়া। অন্য কিছু মনে ক'রো না যেন—যে পয়সার লোভে যাচ্ছি আবার!'

কিন্তু আসরে ঢুকে সে চমকে উঠল। মনে হ'ল যেন একটা শারীরিক আঘাত লাগল বুকে।

প্রথমে কারণটা বুঝতে পারে নি ঠিক, পরে পারল। এদের বাড়ি—বিশেষ উঠোন, অনেকটাই আহিরীটোলার রাজবাড়ির মতো, আসরটা সাজিয়েছেও সেইভাবে। তেমনি ফুলের মালা ঝুলিয়েছে, অবশ্য সে ছিল বেল-জুঁয়ের মালা দিয়ে সাজানো—এরা অন্য কি-সব ফুল দিয়েছে—বেশির ভাগ টগর, দোপাটি, বিলিতী মৌসুমী ফুল। তবু সাজানোটা অনেকখানিই একরকম। মায় সেই কোণে দুখানা খালি চেয়ার সুদ্ধ!...

সুরবালার, কে জানে কেন প্রবল একটা অভিমান বোধ হ'ল। সেই অভিমানেই যেন দুই চোখ জ্বালা ক'রে এক-ঝলক অবাধ্য উষ্ণ জল বেরিয়ে এল। অভিমান কার ওপর তা ঠিক বুঝল না, রাজাবাবুর ওপর, মায়ের ওপর, এই মতির ওপর—না নিজের ভাগ্যের ওপর! হঠাৎ মনে হ'ল এর চেয়ে তার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, এইভাবে আবার টাকার জন্যে গাইতে আসা ঠিক হয় নি!

মতিই গান শুরু করল। সে-ই মূল গায়েন। নিয়মমতো তার সঙ্গে সুরোর প্রথম দোয়ারকি করার কথা। দু-একবার চেষ্টাও করল—সে যখন সঙ্গে গেছে তখন তার কাজ তাকে করতেই হবে—কিন্তু গাইতে গিয়েও যেন ঠিক গাইতে পারল না—গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। মতি ইশারা ইঙ্গিতে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে লাগল। অনুনয়ের ভঙ্গিও করল—যেন সে গাইতে পারছে না, ইচ্ছে ক'রে সুরোর ধরতাইয়ের মুখে ছেড়ে গেল—কিন্তু সুরো সে সুযোগ নিতে পারল না কিছুতেই. অগত্যা আর একজন দোয়ারকেই ধরতে হ'ল সেখানে।

অথচ এখানে এসে ঠিক সঙের মতো বসে থাকা যায় না। বহু কৌতূহলী দৃষ্টি তার ওপর। চিকের মধ্যে মেয়েরা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে পরস্পরকে—তা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে সে। এতকাল পরে গাইতে এসেছে—রাজাবাবুর মেয়েমানুষ. আবার সেই আসরে নামতে হ'ল, রাণীগিরির দেমাক আর রইল না, আবার হয়ত কোন বড়লোক ধরার ফিকিরে বেরিয়েছে গাইতে—এই ধরনের মন্তব্য করছে হয়ত। অন্তত সুরবালার তাই মনে হতে লাগল ; দৃষ্টি বার বার ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে লাগল অপমানে আর একটা অকারণ অভিমানে।

ওর অবস্থাটা মতি বুঝল। সে গান গাইতে গাইতে একটা পদ শেষ ক'রে ওর দিকে ইঙ্গিত ক'রে চুপ ক'রে গেল।

এবার আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারল না। গাইতেই হবে। এক আসর লোক উন্মুখ হয়ে বসে। বাধ্য হয়ে গাইবে বুঝেই মতি এই মতলব করেছে। জোর ক'রে গাওয়াতে হবে, নইলে ঐ সঙ্কোচ, এ দ্বিধা যাবে না।

ধরতেই হ'ল সুরোকে। ঝুলন পালা—যে গানের পর যে গান আসে তা তো ঠিক করাই আছে। সেই বুঝেই ধরল সুরোও। প্রথমটা একটা বেপর্দা হয়ে গিয়েছিল—তবে সে কয়েক লহমার ব্যাপার—তার পরই অভ্যস্ত গলা ঠিক পর্দায় পেঁাছে গেল। মতি নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল এবার। আর দেখতে হবে না।

কিন্তু গোলমাল একটা হয়েই গেল।

প্রথমটা চোখ বুজেই গান ধরেছিল সুরবালা, একটু আত্মবিশ্বাস ফিরতে আস্তে আস্তে চোখ খুলল সে। আর প্রথমেই চোখে পড়ল—বাড়িওলা. এ বাড়ির কর্তা কখন এসে সেই চেয়ার দুটোর একখানায় বসেছেন. পাশে তারক দত্ত, ব্যারিস্টার। কর্তা লোকটি যেমন মোটা তেমনি বিরাট তার মুখখানা—বিরাট আর বীভৎস—ডেলা ডেলা মাংস-পিণ্ড দুটো গাল আর গালের ঝিঁক. বিশ্রী পুরু ঠোঁট। চোখ দুটো প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না এত ছোট কিন্তু তা থেকে যে লালসা ঝরে পড়ছে তার পরিমাণ সামান্য নয়। লোকটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে সুরোর দিকে, মনে হচ্ছে চোখ দিয়েই সর্বাঙ্গ লেহন করছে ওর—ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রতিটি লোভনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

আকণ্ঠ ঘৃণায় মন ভরে উঠল সুরবালার।

ঘৃণা আর ক্রোধ।

সে ঘৃণা নিজের ওপর, ক্রোধ নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে।

এদের গান শোনাতে এসেছে সে! অমন শ্রোতাকে গান শোনাবার পর প্রবৃত্তি হ'ল তার এই বন্য গোলা বর্বরদের আসরে গাইতে আসার! সেই মানুষ আর এই মানুষ! সে

মুখ্যাত, গুণীর সমাদর জানত। তার লালসা কখনও এমন পাশবিক রূপে প্রকাশ পায় নি কোনদিন। আগে সে গুণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তারপর মানুষটার দিকে। মানুষটাকেও ভালবেসেছিল আগে—শুধু দেহটাকে কামনা করে নি, এই ইতরগুলোর মতো।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল সামনে থেকে সব শ্রোতা নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল, আর সেই একাকার-করা শূন্যতার মধ্যে জেগে উঠল একটি মাত্র মুখ—অতি প্রিয়, প্রিয়তম মুখ। মনে হ'ল রাজাবাবু করুণ নেত্রে চেয়ে আছেন তার দিকে। সে দৃষ্টি যেন বলছে, 'কেন এলে, কেন এলে এখানে—এদের মধ্যে! এরা কি কেউ তোমার যোগ্য? তোমার তো আমি এমন অভাব রাখি নি যে একটা পেট চলবে না, কেন তবে এ উঞ্ছবৃত্তি করতে এলে!'

আবারও দু চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে তপ্ত অশ্রুর ধারা নামল। গলার কাছে ঠেলে-ওঠা কান্নায় বিকৃত হয়ে গেল কণ্ঠ—বেসুর শুধু নয়, বেতালা হয়ে গেল গান, তাও পারল না গেয়ে যেতে—শেষ হওয়ার আগেই থেমে যেতে হ'ল ওকে।

মতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ওর দিকে। অবস্থা বুঝে, বেসুরো হ'চ্ছে দেখেই সে নিজে গলা তুলেছিল আবার—এখনও সে-ই কাজ চালিয়ে নিল, গান বন্ধ হ'ল না। লজ্জিত সুরো অধোবদনে এক পাশে বসে রইল। শ্রোতাদের মধ্যে যে গুঞ্জন উঠল—কোথাও বা সহানুভূতি, কোথাও বা ধিক্কার বাজল সে গুঞ্জনে,—তারক দত্তের চোখে যে উৎকণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠল, এসব কিছুই লক্ষ্য করল না সে। তার বন্ধ দৃষ্টির ভেতরে নিবিড় ঘন অন্ধকার—দিশাহীন অন্তহীন ; আর সেই অন্ধকারে তার মনের সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন ক'রে যেন প্রবল শব্দে একটি অক্ষরই শুধু অবিরাম ধ্বনিত হয়ে চলেছে—'ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!'

কিরণ সঙ্গে এসেছিল, মুখ্যত গান শুনতেই। সে চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই এসে আছে। বহুদিন সুরোর গান শোনে নি সে,—তার ইচ্ছা তো ছিলই, নিস্তারিণীও তাকে বলে সঙ্গে পাঠিয়েছিল। মেয়ের এই প্রথম মুজরো এতকাল পরে—কী জানি কি হয়, ভয় পেয়ে যায় বা—সঙ্গে আপনার লোক একজন থাকা ভাল।

সামনেই বসেছিল সে, দোয়ারদের কাছে। মতি গাইতে গাইতেই তাকে ইঙ্গিত করল সুরবালাকে নিয়ে বাড়ি চলে যেতে। তার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়েই আছে, ইশারায় তাও জানিয়ে দিল। যা হবার তা তো হয়েই গেল, এখন মেয়েটাকে না আরও লজ্জায় পড়তে হয়—তাহলে কোনদিনই এর পর আর গাইতে রাজী হবে না। মানুষ সকলকেই চেনে মতি—গান থামালেই সব ভীড় ক'রে এসে দাঁড়াবে, শুরু হবে ছদ্ম সহানুভূতি ও উৎকণ্ঠার আড়ালে সহস্র জবাবদিহি, মজা দেখবার পালা। এখন গানের মধ্যে কেউ চট ক'রে উঠে এসে আলাপ জুড়তে পারবে না—এই একটা সুবিধে।

সুরবালাও বেঁচে গেল।

গাড়িতে যেতে যেতে মনও স্থির ক'রে ফেলল সে। আর নয়—মিথ্যে এসব ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে দরকার নেই। অপরের মুখ চেয়ে চলা তার পোষাবে না। যা করবে নিজের খুশি-মতোই করবে।

কিরণ এ প্রসঙ্গে একটা কথাও বলে নি। সে বলবে না তা সুরো জানত। কিন্তু বাড়িতে এত সহজে অব্যাহতি মিলবে না। অসময়ে আসার খবর পেলেই ছুটে আসবে মা, তার উদ্বেগ স্বাভাবিকও। সেজন্যেও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল সে। মিথ্যে এটা ওটা বলে ভুলিয়ে লাভ নেই, সত্যি কথা বলে এখানেই এ ব্যাপারের যবনিকা টেনে দেওয়া ভাল।...

নিস্তারিণী অবশ্য কোন প্রশ্ন করতে সাহস করে নি, নানা আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে কিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল শুধু। সুরবালা আগু বেড়েই সেই নিরুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল, বলল, 'ও আর আমার দ্বারা হবে না মা। যদি অভ্যেসটা থাকত

বরাবর—সে একরকম। এতকাল রাণীগিরি ক'রে এসে এখন আর কেত্তনউলী সেজে পেলা ভিক্ষে করা—আমার স্বারা আর হয়ে উঠবে না। এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ।'

তার পরও নিস্তারিণী অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে বলল, 'অপমান হয়ে চলে এসেছি, গাইতে পারি নি, বেসুরো-বেতালা হয়ে গিয়ে গান বন্ধ করতে হয়েছে—সবাই ছিছিক্কার করেছে—আর কি শুনতে চাও? গাইবার কথা আর কোনদিন আমাকে বলো না। যদি গাই এর পর—ঠাকুরদের শোনাতে ঘরে বসে গাইব, পয়সা নিয়ে আর নয়। দিব্যি গেলেছি আসতে আসতে।'...

সেই দিনই রাত্রে কিরণকে ডেকে পাঠাল সুরো।

'আমি কাল বৃন্দাবন যাবো। তুমি সঙ্গে যেতে পারবে?'

ঘাড় নাড়ল কিরণ, পারবে।

'কিন্তু আর কেউ যাচ্ছে না। ঝিকে নেব অবিশ্যি,—তবু, তোমার বৌ আত্মীয়-স্বজন মন্দ ভাবতে পারে। ভেবে দ্যাখো।'

কিরণ মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ভেবে দেখা অনেক দিনই হয়ে গেছে. তোমাকে আমি এ অবস্থায় একলা ছাড়তে পারব না।'

'ফিরতে দেরি হ'তে পারে। আমি জায়গা দেখে মন্দির করার ব্যবস্থা না ক'রে ফিরব না। এক মাস দু মাস সময় লাগবে হয়ত, বেশীও লাগতে পারে।'

'তা তো লাগবেই।' শান্তভাবে উত্তর দেয় কিরণ।

'ততে তোমার কোন অসুবিধা হবে না? ওদিকে?'

'না। সেই রকমই ব্যবস্থা ক'রে এসেছি এবার। দীর্ঘদিন হয়ত ফিরতে পারব না—সেই কথাই বলে এসেছি।'

এর পর দুজনেই চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে—যা বলবার বলা শেষ হয়ে গেছে ভেবে—উঠে আসছিল কিরণ, সুরো যেন কেমন মরীয়া-ভাবেই বলল, 'দাঁড়াও. আর একটু বসো। আর একটা কথা আছে।'

কিরণ শান্তভাবেই আবার ফিরে এসে বসল। কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না—আরও কী বলবার আছে জানতে চাইল না. নীরবেই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু কথাটা তখনই পাড়তে পারে না সুরো। রাজ্যের দ্বিধা এসে যেন গলা চেপে ধরে তার। কিরণ তার দিকে চেয়ে ছিল না তাই, নইলে দেখতে পেত—তার কপালে রীতিমতো ঘাম জমে উঠেছে এই অল্পকালের মধ্যেই।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কিরণই শেষ পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয়. 'কী যে বলবে বলছিলে?'

'হ্যাঁ, বলছিলুম কি—.' আর না বললেই নয়. আর অপেক্ষা করানো চলে না কোন মতেই : বহু কষ্টে মনে বল সংগ্রহ করে সুরবালা. 'তুমি যে এত করছ আমার জন্যে. এর বদলে কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু আশা ক'রো না। কথাটা পরিষ্কার হয়ে থাকা ভাল। নইলে হয়ত এরপর বেইমান বলে গাল দেবে আমাকে।'

এবার মুখ তুলল কিরণ। ওর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল. 'তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না!'

ইদানীং 'দিদি' বলা ছেড়ে দিয়েছিল কিরণ, নামও ধরত না, সম্বোধন ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিত।...

তার মানে আরও স্পষ্ট ক'রে কথাটা বলতে হবে।

আরও স্পষ্ট? সুরবালা বিপন্নমুখে চাইল কিরণের দিকে, সে যদি ওর অবস্থা দেখে নিজেই বুঝে নেয় তো যেন বাঁচে ও। কিন্তু কিরণের মুখে না কৌতূহল—না কোন

আনন্দ-বেদনার প্রকাশ। একেবারেই ভাবলেশহীন—কবির ভাষায়। শুধু অপেক্ষাই করছে সে, উত্তরটা শুনবার জন্যে।

অর্থাৎ তাকেই বলতে হবে। একান্ত যা লজ্জার কথা, যে কথা মেয়েদের মুখে আনতে নেই—যেসব প্রসঙ্গ আলোচনা করলে বেহায়া ব্যাপিকা বলা হয় তাদের—সেই কথাই খুলে বলতে হবে সামনাসামনি। অথচ না বললেও নয়, গরজ তারই—বলে নিতেই হবে। এতদিনে বহু পুরুষ দেখল সে—তাদের লোভ আর লালসার কোথাও কোন সীমারেখা টানা নেই। তাছাড়াও এখানে প্রাপ্যের প্রশ্ন আছে। দূর ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি যদি কিছু দাবি করে তো ন্যায্য পাওনাই দাবী করবে। দেনা পাওনার প্রশ্নই দাঁড়াচ্ছে এক্ষেত্রে। সে দেনদার, কতটা তার শোধ করার ক্ষমতা সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—ধার নেওয়ার আগে।

তাই আরও কিছুটা ইতস্তত ক'রে ওষুধ গেলার মতো ক'রেই বলল, একবার বলে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত—এই আশ্বাসেই মরীয়ার মতো বলে গেল, 'দ্যাখো, তোমার মনের ভাব আমি জানি। আগে অত বুঝি নি, খোকাই বলেছে আমাকে। তারপর আমিও মিলিয়ে দেখেছি মনে মনে। তুমি আমাকে ভালোবাসো। বোনের মত নয়—অন্য রকম। সেই জন্যেই এত করছ, এত অত্যেচার সয়েছ। এ জানবার পর আর তোমাকে এ বাড়ি ঢুকতে দেওয়া উচিত ছিল না—তুমি বিয়ে-থা করেছ, ছেলেপুলে হয়েছে, সেখানে তোমার কর্তব্য, দায়িত্বর প্রশ্ন আছে। এখন অন্য স্ত্রীলোকের দিকে মন দেওয়া তোমার অন্যায়, মহাপাপ।...আমি জানি না, আমার কোন জ্ঞান ছিল না, সেই সময়ে—বিপদের দিনে এরা ডেকেছে। তারপর অবশ্য সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার—কিন্তু আমি পারি নি। আমারও বড় দরকার তোমাকে। যে ভালবাসে সে ছাড়া এ ভূতের বোঝা কে বইবে বলো? নানুদা পারত—কিন্তু সে নোনাজলের মাছ—থিয়েটার তার প্রাণ, ওখান থেকে সরালে সে মরে যাবে। তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাই স্বার্থপরের মতোই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—সব জেনেশুনেও। জ্ঞানপাপী আমি। হয়ত আরও অনেকবারই তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে থাকতেও হবে, নইলে এসব কে করবে বলো!'

এই পর্যন্ত বলে থামল সুরবালা। একটানা অনেকখানি বলেছে—তবু এখনও আসল কথাটা বলা হয় নি—বাকী থেকে গেছে। এখনও যেন মুখ থেকে বেরোতে চাইছে না কথাটা।

তবু বলতেই হবে। কিরণও তেমনি নাছোড়বান্দা, সে ওর মুখ থেকেই শুনবে।

সুরো বলল, 'তবে একটা কথা, তুমি কতটা ভালোবাসো তা জানি না, মোদ্দা যদি এই শরীরটার ওপরই লালস বেশী হয় তোমার—এইবেলা সরে পড়ো। তোমার ওপরও আমার একটা টান আছে সত্যি কথা—কালে, একসঙ্গে থাকতে থাকতে সেটা যে অন্য টানে দাঁড়াবে না, তাও বলতে পারি না ; মানুষের মন—কিন্তু যতই যা হোক একটা ব্যাপারে আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি, এ দেহটা আর কাউকে দেব না। এ তাঁর জিনিস, তাঁর প্রিয়, তাঁর প্রসাদী—এ আর কাউকে দেওয়া যাবে না।...তোমার এই সেবা দেখেই আমার ভয় হয়েছিল, হয়ত তুমি দুর্বল ক'রে ফেলবে কোন দিন—তাই সেদিন তাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমার বাবার নামে, ইষ্টের নামে দিব্যি গেলেছি যে, যদি তেমন মতি কোনদিন হয়—গলায় দড়ি দেব, নয়ত জলে ডুবে মরব। আর যদি তুমি কোনদিন জোর করতে আসো—সেই দিনই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ, জোরে পেরে না উঠি—আগে তোমাকে খুন করব, পরে নিজে খুন হব। এই আমার পাকা কথা। এর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না। এইবার ভেবে দ্যাখো—এর পরও আমার সঙ্গে যাবে কিনা।...এ যাওয়া মানে কিন্তু আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন জড়িয়ে যাবে—হয়ত বা চিরদিনের মতোই।

বিনা দরকারে ধরে রাখব না, তবে দরকারও তো অনেক, এখন কিছুদিন অন্তত আমাকে নিয়ে আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে।...এখন বলো—কী করবে!'

উত্তর দিতে একটুও দেরি হ'ল না কিন্তু, তেমনি প্রশান্তমুখেই জবাব দিল কিরণ, 'নতুন ক'রে ভেবে দেখার কিছু নেই। এসব অনেক দিনই ভাবা হয়ে গেছে। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, তোমাকে একাও ছাড়তে পারব না। আজ নয়, তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে বহুদিনই। এখন যে শর্ত করবে তাতেই আমাকে রাজী হতে হবে।'

তবুও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না সুরো, পারে না নিঃসংশয় হ'তে।

'তুমি কোনদিন আমাকে ভোগ করতে চাইবে না, আমার মন ভেজাতে চেষ্টা করবে না? দ্যাখো, পরিষ্কার দিব্যি গেলে বলে যাও—তোমার মরা বাবার নাম করে, ছেলের নাম ক'রে দিব্যি গেলে যাও—।'

'তুমি যাতে খুশী হও, যা বলিয়ে নিলে তোমার শান্তি হয় তাই বলছি—কিন্তু তোমার বড় আমার কেউ নেই—তোমাকে ছুঁয়েই দিব্যি গালছি, কোনদিন তোমার এ দেহ আমি দাবী করব না, ভোগ করতে চাইব না। লোভ হবে না এমন কথা বলতে পারব না—তবে সে লোভ চেপে রাখব, যদি হয়ও।'

'তবু তুমি যাবে আমার সঙ্গে—এর পরেও?'

'সে তো আগেই ঠিক হয়ে গেছে। বলেও তো দিয়েছি।'

'পারবে—চিরদিন এই কষ্ট সহ্য করতে? এই কড়ার মেনে চলতে? সামনে থাকব, কাছে থাকব—হয়ত এক ঘরেও শুতে হবে দরকার হ'লে—তবু আমাকে পাবে না। পারবে তো সহ্য করতে?'

'পারব।' সংক্ষেপে শুধু এই একটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় কিরণ।

হয়ত বা শুতেই চলে যায়।

॥ ৩৪ ॥

বৃন্দাবনে সুরবালার এক গুরুভাই থাকেন। গুরুদেব যাওয়ার সময়ই তাঁর ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন—বঙ্কুবিহারীর মন্দিরের কাছে মণিপাড়ায় তাঁর কুঞ্জ—সেইখানে গিয়েই উঠল ওরা। আধাসন্ন্যাসী লোকটি, আত্মীয়স্বজন বিষয়-সম্পত্তি সব ত্যাগ ক'রে এসেছেন। রঙপুরের কাছে কোথায় বাড়ি—বিয়ে-থা করেন নি, অকৃতদার, তাই বলে ভেখ্‌ও নেন নি। এখানে অনেকেই নাকি ভেখ্ নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু গুরু কিছু বলেন নি বলে উনি সে দিকে যান নি। গৃহস্থ-জীবনে উকীল ছিলেন, বেশ নাকি ভাল উকীলই ছিলেন—কিন্তু বেশী দিন ওকালতি করার ইচ্ছা ছিল না। বরাবরই লক্ষ্য ছিল কোথাও গিয়ে ভগবানের পুজার্চনা নিয়ে দিন কাটাবেন, আর সেইটুকু সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত ওকালতি বা রোজগার করবেন।

তাই-ই করেছেনও, যথেষ্ট টাকা জমতেই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন। পৈতৃক সম্পত্তি

অনেক ছিল। সে সব ভাই-ভাইপোদের লিখেপড়ে দিয়ে চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন—আর কখনও যান নি। তারা আসে মধ্যে মধ্যে—আত্মীয়-স্বজনরা, তখন আদর-যত্নের কোন ত্রুটি করেন না—কিন্তু তারপর, এখান থেকে চলে গেলে আর খোঁজ রাখেন না। চিঠিপত্রও দেন না কাউকে। ওরা দিলেও উত্তর দেন না। বৈষয়িক প্রশ্নের তো কথাই নেই—নিছক কেউ কুশল প্রশ্ন করলে একখানা খালি পোস্টকার্ডে প্রশ্নকর্তার নাম ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দেন। আর কিছুই লেখা থাকে না তাতে—উনি বলেন, 'আমার হাতের লেখা দেখেই তো বুঝবে আমি ভাল আছি। নইলে লিখলুম কেমন ক'রে?'

ভদ্রলোকের নাম আনন্দ ; সস্নেহে 'প্রেমানন্দ বাবা' বলে উল্লেখ করেন গুরুদেব। বলেন, 'বাবা আমার খাঁটি সোনা, অমন বিশুদ্ধ বৈরাগ্য আমি দেখি নি। বললে বিষয়কর্ম যেটুকু দরকার করে—দরকার হ'লে তো করেই—কিন্তু বিষয়ের নেশায় পেয়ে বসে না ওকে, আসক্তি ওর ধারেকাছে কোথাও নেই। ওর ভেখ্ নেবার প্রয়োজন নেই—ওসবের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে ও।'

স্থানীয় ব্রজবাসীরাও ভালবাসে ওঁকে, বলে আনন্দবাবা। ভেখ্ না নিলেও বাঙালী বৈরাগীরা বাবাজী বলে উল্লেখ করে। অবশ্য পাড়াটা পাণ্ডাদেরই পাড়া, আনন্দবাবা বলেন, 'ব্রজবাসীদের শুদ্ধাভক্তি, এদের অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নেই, এরা ঠাকুরকে সোজা-সুজি ভালবাসে। বাঙালীদের বড় আড়ম্বর আর জাঁক—নিন্দে করছি না, কার মধ্যে কী আছে তা কে-ই বা জানে, আমার কিন্তু ব্রজবাসীদের সঙ্গই ভাল লাগে। মদনমোহন যে কেন চোবেনীর বাড়ি লুকিয়ে ছিলেন তা বুঝতে পারি। পাইখানার কাপড় ছাড়ত না ; হাতে মাটি করত না—সেই হাতে সেই কাপড়ে ভোগ রে'ধে বলত, "আও লালা, খা লেও"। পুজো-আরতির বালাই-ই ছিল না—তবু ঠাকুর আমার তার প্রেমেই মশগুল হয়ে ছিলেন। সেইজন্যেই এ পাড়ায় কুঞ্জ স্থাপনা করা।'

কুঞ্জ ঠিকই—ঠাকুরঘরও আছে—তবে তাতে কোন বিগ্রহ নেই। একটি কাঠের সিংহাসনে এক খণ্ড গোবর্ধন শিলা—অর্থাৎ গোবর্ধন পাহাড়ের এক টুকরো পাথর। তাইতে পুজো আরতি ভোগ নিবেদন করা হয়। আনন্দবাবা বলতেন, 'এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেও গোবর্ধন শিলা রাখতে হয়—নইলে ঠাকুর পুজো নেন না। এখানকার এ-ই নিয়ম। ব্রজ-বাসীদেরও ঘরে ঘরে শুধু এই গোবর্ধন শিলা—ওঁকেই তারা খাবার নিবেদন ক'রে প্রসাদ পায় প্রত্যহ। আত্মবৎ সেবা, যা খায় তাই নিবেদন করে।...তা তাই যদি হবে, তাহ'লে আর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে লাভ কি?......বিগ্রহ থাকলেই সাজাতে ইচ্ছে করবে, তাহ'লেই টাকার দরকার—লোভ হবে টাকা কামিয়ে ভাল জিনিস কিনে এনে সাজাই। আড়ম্বর ঝঞ্ঝাটও অনেক বাড়বে। তাছাড়া বিগ্রহের যেসব দুর্দশা দেখি এখানে! আমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ হয়ত সেবায় খুব একটা ত্রুটি ঘটবে না, কোনমতে জলতুলসীটা দিতে পারব অন্তত, তারপর? যখন থাকব না তখন সে বিগ্রহ কে দেখবে? এ তবু জানি—আশেপাশে যেসব ব্রজবাসীরা আছে তারাই কেউ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের শিলার পাশে কি কোন কুলুঙ্গীতে ফেলে রাখবে—দুপাতা তুলসীও পাবে নিয়মিত।'

তারপরই সুরোর মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য ক'রে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'তাই বলে তোমাকে আমি নিরুৎসাহ করছি না বোন, কারণ আমি জানি তোমার বিগ্রহই দরকার। তোমার বাৎসল্যের সাধনা। তুমি চাও তোমার ঠাকুরকে সন্তানরূপে পেতে। তোমার কথা গুরুদেব আমাকে বলেছেন, কবে নাগাদ আসবে, তাও। বলেছিলেন, সংসার একবার শেষ কামড় না দিয়ে ছাড়বে না তো—দুচার দিন আরও দেরি হবে তাই। তবে ও বেটির ওপর ব্রহ্মময়ীর কৃপা আছে—কাটিয়ে বেরিয়ে আসবে ঠিক।'...

আনন্দবাবার ওখানে আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হ'ল না। অবশ্য দেরিও করলেন না

তিনি, অনাবশ্যক অকারণ আদর-আপ্যায়নে। গুরুবাক্যে তাঁর অচল আস্থা,—সুরবালা আসবে নিশ্চিত জেনেই, যে কাজে আসছে সেটাও এগিয়ে রেখেছিলেন। কিরণরা পোঁছবার পরের দিনই বিকেলে ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, 'এ পুরনো শহরে তোমার সুবিধে হবে না বোন—একেবারে বেপোট জায়গা। গোবিন্দ গোপীনাথ গোপেশ্বর—সব জায়গা থেকেই কাছে হয়, অথচ রাস্তার ওপরে এমন একটি জায়গা দেখে রেখেছি। একটা পুরনো বাড়িও আছে একতলা, তার সঙ্গে কাঠা দুই আড়াই জমি—জমিটা একটু লম্বাটে ধরনের। তা হোক—ভেতর দিকে মন্দির ক'রে রাস্তার ওপর বসবাসের মতো একটু আস্তানা করে নিতে পারবে। পুরনো বাড়িও ভাঙবার দরকার নেই, পুজোরী রাখতে হবে, অন্য লোকজনও থাকবে, ভাঁড়ার আছে রান্না আছে। ঠাকুরের জিনিসপত্র—দোল ঝুলনের পোশাক-আশাক-আসবাব রাখারও একটা ঘর চাই—ঐ মহলটা সারিয়ে-সুরিয়ে নিলে সব কাজ চলে যাবে। চাই কি ওর দোতলায় একখানা ঘর ক'রে রাখলে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে দু'-একদিন থাকতেও পারবে!

'মোটে দু' কাঠা আড়াই কাঠা জমি!' সুরবালা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়, 'বাগান-টাগান করতে, পারব না?'

'বাগান করার মতো জমি শহরের মধ্যে আর কোথায় পাবে বোন? ঐ রাধাবাগটাগ—শহরের বাইরে—যেদিকে গোয়ালিয়রের ঠাকুরবাড়ি হয়েছে, যমুনার ধারে—পেতে পারো। কিন্তু তুমি একা সেখানে থাকতে পারবে না, ওখানে দিনের বেলায় বাঘ বেরোয়, তেমনি চোর ডাকাতের ভয়। তাছাড়া মন্দির করছ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছ—সাজাবে গোজাবে, দুচারজন দর্শন করতে আসবে—সে সাধও তো একটা আছে। ওখানে কে দর্শন করতে যাবে? পুজারীই কেউ থাকতে রাজী হবে না হয়ত।...এ একেবারেই খাঁই জায়গা। একদিকে লালাবাবুর মন্দির, ওখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে এখানে এসে পড়বে—ঐটেই যমুনা-পুলিন গোপেশ্বর যাওয়ার সড়ক, সামনেই ব্রহ্মকুণ্ড—গোবিন্দ মন্দির, সাক্ষী-গোপালের পুরনো মন্দির, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি—সব হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে বলতে গেলে। গোপীনাথের ঘেরা রেঠিয়া বাজার—এও এমন কিছু দূরে নয়, ঘরে বসে শেঠীদের মন্দির দেখবে। সোনার তালগাছ শুনেছ তো? তালগাছ অবিশ্যি নয়, আসলে অরুণ স্তম্ভ, দক্ষিণীদের মন্দির তো, ওখানে অরুণ স্তম্ভ একটা থাকবেই। যাই হোক, তিন বড় মন্দির—গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র আর শ্রীরংগজী—থেকে নহবৎ বাজবে, বসে বসে শুনবে।'

এর পর আর জমি দেখার কিছু ছিল না। তবু দেখল ওরা। আনন্দবাবা পাকা লোক। দামদস্তুর ঠিক ক'রে রেখেছেন, মোট চার হাজার টাকা পড়বে, বাড়ি জমি সবসুদ্ধ।

সুরো ঘুরে ঘুরে আশপাশ সব দেখল। ঠিকই বলেছেন আনন্দবাবা, মন্দির করার মতোই জায়গা। দুবেলা হাজার যাত্রী এই পথে যাতায়াত করে মেলার সময়। এমনিও প্রত্যহ বহু যাত্রী যায় এই পথ দিয়ে—তাদের মধ্যে কেউ কি আর ঢুকে দেখবে না তার ঠাকুর? সুরবালা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখল, গোবিন্দ মন্দিরের দিক থেকে কত যাত্রী যাচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির আর গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন করতে।

জায়গাটা পছন্দ করার আরও একটা কারণ ঘটল। পুরনো বাড়িটার সামনে থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে, অতি জরাজীর্ণ মাটির গাঁথুনি বাড়ি—হঠাৎ যেন তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগল আপনা-আপনি। মনে হ'ল কার নিঃশ্বাস এসে লাগল তার গালে। বাগানবাড়িতে থাকার সময় বিকেলে যখন একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজাবাবুকে ভাবত—তিনি পা টিপে টিপে এসে কখন পিছনে দাঁড়াতেন সে টেরও পেত না এক এক দিন—একেবারে গালের কাছে তাঁর মুখটা এলে এইরকম গরম নিঃশ্বাস গালে এসে লাগত, চমকে চেয়ে দেখত তিনি ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন—

ভাবতে ভাবতেই চোখে জল এসে গেল সুরোর। তার মধ্যেই শুনল আনন্দবাবা বলছেন, 'মন্দির করলে এই বাড়ির লাগোয়া—ঠিক এইখানটায় করতে হয়—কী বল ভাই কিরণ—হ্যাঁ? তাহলে ভেতর দিয়ে দরজা রাখলে এ বাড়ি পুরোটা কাজে লাগানো যাবে। রান্না ভাঁড়ার—ঠাকুরের আসবাব ঘর—প্রত্যেকটা থেকেই ভেতর দিয়ে আসা চলবে মন্দিরে। রাস্তার দিকে মন্দির করলে এতদূরে থেকে সব বওয়াবওয়ি—সে বড় অসুবিধে।'

কিরণ বলল, 'কিন্তু রাস্তা থেকে মন্দির দেখা যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। এই সোজা চলন থাকবে, সদর পর্যন্ত। দোর খোলা থাকলে বিগ্রহ অবধি দেখা যাবে। সে সব প্ল্যান আমার করা হয়ে গেছে। কী বলো বোন—তুমি কি বলছ?'

'আপনি বায়না ক'রে ফেলুন দাদা, সম্ভব হ'লে আজই। আর মন্দির? হাঁ, এই-খানেই হবে। ঠাকুরের তাই ইচ্ছা দেখলুম।'

সে ইচ্ছা কীভাবে প্রকাশ পেল—অনধিকারবোধেই পুরুষ দুজন সে প্রশ্ন করলেন না। সুরবালার চোখে জল দুজনের কারুরই নজর এড়ায় নি—যে যার নিজের মতো ব্যাখ্যা ক'রে নিলেন সে অশ্রুর।

একেবারে দুশো-এক টাকা বায়না দিয়ে দলিল তৈরী করতে বলে সুরোরা কলকাতায় ফিরে এল। বাড়ি কে তৈরী করাবে সে প্রশ্নও উঠেছিল, দেখা গেল আনন্দবাবা সে ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন। ওঁর বাড়ি যে করিয়েছিল—ঠিকেদার মিস্ত্রী একজন—সে-ই রাজী হয়েছে করতে বা করাতে। আনন্দবাবাও অবশ্য পুরনো একখানা ঘরসুদ্ধ ঐ জমি কিনেছিলেন তবে সেটা ভেঙে সবই নতুন ক'রে করিয়েছেন। আনন্দবাবা বললেন, 'লোকটা কাজের, কাজ বোঝে—বুঝে নিতেও পারে। হামেহাল দাঁড়িয়ে থেকে লোককে খাটায়, সেই সঙ্গে নিজেও খাটে—ফাঁকি দিতে পারে না কেউ। সেদিকে কোন অসুবিধে হবে না, তবে হিসেবে একটু আধটু—তা ও আমি ধরি না, কলকাতার কনট্র্যাক্টর দিয়ে করাতে গেলে তারা একদফা বলে নেয় আর একদফা না বলে নেয়। তার চেয়ে ঢের কম লোকসান হবে, একে দিলে।'

সেই ব্যবস্থাই পাকা করতে বলে দিল সুরো। তার আর তর সইছে না যেন। কবে মন্দির শেষ হবে, কবে ঠাকুর বসবেন, সে যেন বহুদিনের ব্যাপার।

'ঐ মিস্ত্রিকে কিছু বেশী দোব বললে তাড়াতাড়ি করে না—হ্যাঁ দাদা?' বার বার প্রশ্ন করে সে।

আনন্দবাবাও বার বারই বোঝান, 'এখন থেকেই বেশী দোব বললে থই পাবে না বোন। মনে মনে যখন সব কিছু ভগবানকে উৎসর্গ করেছ—তখন সব টাকাই এখন তাঁর। নষ্ট করবার অধিকার তোমারও নেই।'

'বিগ্রহ কোথায় হবে?' প্রশ্ন করলেন আনন্দবাবা।

জয়পুরী বিগ্রহ এখানে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সে হয়ত সুরবালাদের মনে লাগবে না, মন খুঁৎখুঁৎ করবে—তার চেয়ে আগে কলকাতাতেই দেখুক, নয় তো কাশী। ওঁর আরও একজন গুরুভাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন—সুন্দর মূর্তি, দেখলেই মনে হয় বুকে ক'রে নিয়ে আসি—তিনি যেখান থেকে করিয়েছেন সেখানকার ঠিকানাও দিয়ে দিলেন। কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ হবেন, অষ্টধাতুর রাধা। শ্বেতপাথরেরও হ'তে পারে রাধা—তা সে যেমন সংগতি ও অভিরুচি। বাঁশী, মুকুট, বালা, রাধিকার একটা নথ সোনার। বাঁশীর একটা 'ঠেকো' চাই—ইচ্ছে করলে সোনারও করা যেতে পারে, নয় তো রুপোর। বড়ই চোরের দেশ—আকবর বাদশা বৃন্দাবনের নাম দিয়েছিলেন ফকিরাবাদ—নিঃস্ব ভিক্ষুকের দেশ। কাজেই চোরও বেশী, গৃহস্থর চোখের সামনে নাকি ঘুরে বেড়ায়—সুতরাং বেশী সোনা না রাখাই ভাল।

'বাঁশীর ঠেকোটা কি?' কিরণ প্রশ্ন করে।

হাসেন আনন্দবাবা, 'প্রভুর আমার নবনীত কোমল দেহ, অতক্ষণ অত বড় বাঁশী ধরে থাকলে হাত ব্যথা করতে পারে—ভক্তদের অন্তত তাই মনে হয়—সেইজন্যে ঐ ঠেকোর ব্যবস্থা। অবশ্য সব জায়গায় নেই—তবে করিয়ে রাখা ভাল। এর পর মন খারাপ লাগবে।'

টাকা এখনই অনেক চাই। বাড়ির দলিল লেখানো, রেজেস্ট্রী খরচা, অন্য সব খরচ নিয়ে সাড়ে চার হাজারের ধাক্কা, এ ছাড়া পুরনো বাড়ি মেরামত, সামনের বাড়ি তৈরী, মন্দির—এর জন্যেও বেকসুর ছ'সাত হাজার টাকা লাগবে। তার ওপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার খরচ আছে—যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ভোজন, সেও কম নয়।

তার মানে এখনই দশ হাজার হাতে ক'রে আসতে হবে, আরও চার পাঁচ হাজারের সংস্থান রাখা চাই। আনন্দবাবা বলে দিলেন টাকাটা নগদ না এনে হুণ্ডী করিয়ে আনতে, কার নামে হুণ্ডী হবে তাও বলে দিলেন। হুণ্ডী করা থাকলে আর পথে খোয়া যাবার কি এখানে ডাকাতি হবার ভয় থাকে না।

ট্রেনে ফিরতে ফিরতে কিরণকে প্রশ্ন করে সুরো, 'টাকাটা কিভাবে তুলব বলো তো? পোস্ট-আপিসে যা আছে সামান্য, হাজার তিনেকের বেশী হবে না। কোম্পানীর কাগজ-গুলো ভাঙিয়ে নেব? নগদ বাড়িতে যা আছে—টাকা আর গিনি মিলিয়ে—ওতে হাত না দেওয়াই ভাল। বিপদ-আপদ আছে, মার দরকারে লাগতে পারে—কী বলো?'

কিরণ এ পর্যন্ত ওর বিষয়-আশয়ের কথায় কখনও মাথা গলায় নি। তাই বলে এখন অকারণ সংকোচও করল না। জনহীন ইণ্টার ক্লাসের কামরা—পর কেউ শোনবারও সম্ভাবনা ছিল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই জিজ্ঞাসা করল—কী আছে, কত আছে!

সুরবালাও সব বলল। তিনখানা বাড়ি, গহনা, কোম্পানীর কাগজ—যা যা আছে মোটা-মুটি সব জানাল। এমন কিছু বলবার মতো ঐশ্বর্য নয়—তবে একেবারে অকিঞ্চিৎকরও নয়। ওর নিজের উপার্জনেরও কিছু ছিল, এই ক' বছরে রাজাবাবুও বিস্তর দিয়েছেন। নিজে থেকেই দিয়েছেন। আরও দিতেন—সুরবালাই বার'বার বাধা দিয়েছে, 'এত কেন? এত বাড়াবাড়ির কী আছে!' রাজাবাবু হয়ত জবাবে হেসে বলেছেন, 'কেন—সে কথা বললে তো তুমি আমাকে মারধোর শুরু করবে! বলি, ভবিষ্যতের ভাবনা তো আছে?' 'বেশ তো', সমান তালেই জবাব দিয়েছে সুরো, 'একেবারে তো পথে বসার মতো অবস্থায় নেই; সেদিন যদি আসেই কোনদিন—নুন-ভাতের সংস্থান তো থাকবে। তুমি যদি না থাকো—সুখভোগেই বা আমার কি দরকার?'

খুশী হয়েছেন রাজাবাবু, তৃপ্ত হয়েছেন। কৃতার্থ বোধ করেছেন। সেই সঙ্গে বাধা উপেক্ষা ক'রেও নানা ছুতোয় মধ্যে মধ্যে দিয়েছেন এটা ওটা। নিজের জন্মদিনে, পুজোয়, সরস্বতী পুজোয়,—এমনি নানা উপলক্ষ ধরে নব নব অলংকার ও কোম্পানীর কাগজ উপহার দিয়েছেন। ইদানীং নাকি বাড়িও খুঁজছিলেন আর একটা। ওরা আগে যে বস্তিতে ছিল মতির বাড়ির পিছনে—সেটারও দরদস্তুর করছিলেন। ওকে বলেন নি, নিস্তারিণীর কাছে বলছেন শুনতে পেয়েছে সুরো, পাবনা থেকে ফিরে এসে যা হয় স্থির ক'রে ফেলবেন। বস্তিটা যদি পান তো ঐটেই কিনে—ওদের সেই ঘরটা বাঁচিয়ে রেখে বাকী জমিতে বিরাট অট্টালিকা তুলবেন—রাঙাবাবুদের বাড়ির মতো, মানে মতির বাড়ির জুড়ি। কোন বড়লোককে ভাড়া দিলে চাই কি মাসে চার-পাঁচশো টাকা ভাড়া উঠতে পারে। আর বস্তিটা যদি না-ই পান তো জোড়াগির্জের কাছে একটা বাড়ি দেখেছেন—সেইটেই কিনে নেবেন: এক ইহুদী সাহেবের বাড়ি, একঘর সাহেব ভাড়াটে আছে—ভাড়াটেও খুঁজতে হবে না। শ'আড়াই টাকা ভাড়া দেয়—ভাড়া বেশী নয়, তবে বাঁধা ভাড়া, মাসের তিন তারিখ পেরোতে দেয় না। ইত্যাদি—

সোনার স্বপ্ন সে সব। বাড়িটা হ'ল না বলে দুঃখ নয়—সে জন্যেও স্বপ্নটা সোনার

মনে করে না। তিনি থাকলে তবেই সে বাড়ির মূল্য। তা নয়, এই চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যে সীমাহীন স্নেহ ও সতত-জাগ্রত চিন্তা আছে, সেইটেই সোনা ওর কাছে। ক্ষোভের কারণ সেই মানুষটার অভাব। আজ যে এতটা অসহায় মনে হচ্ছে, সব চিন্তা নিজেকে করতে হচ্ছে,—তার মূলে সেই একটি মানুষেরই অনুপস্থিতি। নিজের জন্যে চিন্তা করার অভ্যাসটা একেবারেই হারিয়ে গেছে যে গত ক' বছরে।...

কিরণ সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'ও গয়নাগুলো সম্বন্ধে তোমার কি খুব মায়া আছে?'

'না, দু-একটা বাদে কোন গয়নার ওপরই মায়া নেই আর। যেগুলো তাঁর খুব প্রিয় ছিল, যেগুলো বার বার আমাকে পরতে বলতেন, বলতেন সেগুলোতে নাকি ভাল দেখায় আমাকে—সেইগুলোর ওপর একটু মায়া আছে। তাছাড়া আর মায়া কিসের! আর তো পরব না ওসব!'

'পরবে না—একেবারে স্থির? এর পর যদি পরার ইচ্ছে হয়?'

'না, হবে না। মা যদ্দিন আছে তদ্দিন এই বালা দুটো থাকবে—নইলে মা কান্নাকাটি করবে চেঁচামেচি করবে—তারপর আর তাও পরব না। লোকে যা ভাবে ভাবুক, আমি জানি আমি বিধবা হয়েছি। বামুনের মেয়ে—আমাদের ঘরে কি বিধবা হ'লে গয়না পরে কেউ?'

'তা হ'লে ঐ গয়নাগুলোই বেচে দাও। কোম্পানীর কাগজ থেকে নিয়মিত সুদ আসে। আর ও যখনই বেচতে যাবে—টাকা পাবে। রাখারও কোন হাঙ্গামা নেই। গয়না থেকে এক পয়সা আয় নেই, অথচ বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে, নিত্য দুশ্চিন্তা। যা রাখবার তা রেখে বাকী বেচে দাও, তোমার এসব খরচ উঠে গিয়েও ঢের টাকা হাতে থাকবে—চাই কি পোস্ট আপিসে রাখতে পারো, কিম্বা আর দু'একখানা কোম্পানীর কাগজ কিনতে পারো।'

'আচ্ছা, আনন্দদাদা যে বললেন, সব সম্পত্তি সরকারের ঘরে জমা করে দিতে, তাদেরই ট্রাস্ট করতে—তুমি কি বলো? সে রকম কি হয়?'

'তা জানি না। হলে সে-ই সবচেয়ে ভাল। মেয়েছেলের নিজের হাতে কিছু না রাখাই ভাল। কে কখন ঠকিয়ে নেবে তার তো ঠিক নেই।'

'কেন, তোমার নামে যদি সব গচ্ছিত ক'রে দিই?'

সুরো কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

'না। আমি রাজী হবো না তাতে। কারুর নামেই গচ্ছিত ক'রে দেওয়া ঠিক নয়। যে যত বিশ্বাসীই হোক, মৃত্যুর তো কোন বাঁধাধরা হিসেব নেই। আর মরবার পর তার ওয়ারিশরা কি করবে তা কে জানে। দেবোত্তর সম্পত্তি—দেবতার নামেই লেখাপড়া ক'রে দাও, সরকারকে ট্রাস্টি করো—তুমি সেবাইত হও—আনন্দদাদা যা বললেন ও-ই সেরা যুক্তি।'

আরও কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধোয় সুরো, 'তোমার কি কিছুতে লোভ নেই? মেয়েমানুষ আর টাকা—এ দুটোর তো বেশির ভাগ পুরুষের লোভ!'

যেন চমকে ওঠে কিরণ, 'কে বললে লোভ নেই? লোভ আছে বলেই তো—।' তার পরই বোধ হয় নিজেকে সামলে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে জোর দেয়, 'টাকার লোভ নেই তা-ই বা বলি কি ক'রে? তবে তোমার ও কটা টাকাতে আর কতটুকু বড়লোক হব বলো? মোটা টাকার প্রলোভনের সামনে কতদিন সাধু থাকতে পারি—সেটার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত নির্লোভ এমন কথা বলতে পারি না।'

বেশ ধীরভাবেই বলে কিরণ—কিন্তু কে জানে কেন সুরো তেমন অবিচলিত থাকতে পারে না, সে প্রাণপণে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে।

গহনা বিক্রীর প্রস্তাবে আর একদফা চেঁচামেচি শুরু করে নিস্তারিণী। একে-ওকে গিয়ে ধরে, ছুটে মতির বাড়ি চলে যায়, নানুকে ডেকে পাঠায়, 'ওকে বুঝিয়ে বল্ তোরা, এখনই ওসব বিক্রী করার কি তাড়া পড়ে গেল!'

তার আর্তি আর আকুলতা দেখে মনে হ'ল গহনাগুলো তারই বুকের পাঁজর এক-একখানা। কিন্তু সুরো তাতে কান দিল না, সে মন স্থির ক'রে ফেলেছে। কিরণের যুক্তি তার মনে লেগেছে। এগুলো শুধুই দায়িত্ব আর দুশ্চিন্তার কারণ। এ থেকে কোন আয় নেই। বরং বেচে নগদ টাকা ক'রে কোথাও আমানত রাখলে লাভ আছে। মাকে সেই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করে সুরো, বলে, 'চুরি গেলে ডাকাতি হ'লে একনিমেষে চলে যাবে সব। এমনিই ঢের জানাজানি হয়ে গেছে। এতদিন অত জানত না—কী গয়না আছে না আছে—সে তবু একরকম ছিল। আমি তো কোনকালেই মাসির মতো অত গয়না পরি নি। কিন্তু এখন এটা চাউর হয়ে গেছে ঠিকই যে, আমার সিন্দুকে গিনি আর গয়না বিস্তর আছে। এই চাকর দারোয়ানরাই যে মেরে ধরে একদিন নিয়ে যাবে না—তা জানছ কি ক'রে?'

কিন্তু যুক্তি কোনোদিনই নিস্তারিণীর মাথায় ঢোকে না, আজও ঢুকল না। সে চোখের জল ফেলে যেতেই লাগল। সুরবালার মাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না আর, অথচ অন্য উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না। টাকা গহনা মার কোন ভোগে আসবে না ঠিকই—তবু একটা অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা, সুরোর জন্যেই আকাঙ্ক্ষা। এর শেষ নেই। খোকা—ওর ভাই গণেশ ওকে একটা গল্প বলেছিল অনেকদিন আগে, সেটাও মাকে শোনাল। সেই অনেকদিন আগে—যীশুখ্রীষ্টেরও জন্মের আগে—কে একজন খুব ধনী রাজা ছিলেন, ক্রীসাস না কি যেন খটোমটো নাম, তাঁর খুব টাকা ছিল। টাকারই নেশা তাঁর, ঐশ্বর্যের নেশা। সবচেয়ে নেশা ছিল হীরে জহরতের, ছলে-বলে-কৌশলে দামী পাথর—হীরা মুক্তা পান্না সংগ্রহ করা ছিল সবচেয়ে শখ। যোগাড় ক'রেও ছিলেন ঢের, আর সেজন্যে তাঁর গর্বেরও শেষ ছিল না। একবার সোলোন বলে এক গ্রীক পণ্ডিতকে ডেকে এনে তিনি নিজের ধনভাণ্ডার দেখিয়ে সগর্বে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি তো বহু দেশ ঘুরেছেন, এত দামী পাথর আর কোথাও দেখেছেন?'

পণ্ডিত উত্তর দিয়েছিলেন, 'মেলাই দেশ যাবার দরকার কি? আমার বাড়ির পাশে এক কুঁড়েঘরে এক বুড়ি থাকে—তার একটা জাঁতা আছে, সে জাঁতার পাথর দুটো আপনার এই হীরে-জহরতের থেকে ঢের দামী। সেই জাঁতা ঘুরিয়ে গম পিষে সে ছটা পেট চালায়, আপনার পাথর দিয়ে এক পয়সা আয় হয় না—বরং পাহারা দিতে বেশ কিছু খরচ আছে। ও পাথর থেকে সম্পদ আসে—এ থেকে বিপদ।'

কথাটা রাজার ভাল লাগে নি, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর কোনদিন সে পণ্ডিতকে সভায় ডাকেন নি। এদিকে ক্রীসাসের এই খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, সেই লোভে আর এক রাজা এঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। টাকা টাকা ক'রে পাগল হয়ে ছিলেন ক্রীসাস, দেশরক্ষা বা সেনাবাহিনী শিক্ষিত করার কোন চেষ্টাই করেন নি—তিনি প্রথম যুদ্ধেই হেরে গিয়ে বন্দী হলেন। সে ভাণ্ডার তো লুঠ হয়ে গেলই, বিজয়ী রাজার বিশ্বাস হ'ল যে, আরও কোথাও কিছু লুকনো আছে—সেই গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাবার জন্যে ক্রীসাসের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগলেন। অথচ সত্যিই আর কোথাও কিছু ছিল না, ক্রীসাস বার বার সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দিব্যি গাললেন। সে রাজার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হ'ল না, তিনি রেগে আগুন হয়ে হুকুম দিলেন ক্রীসাসকে একটা চিতায় চড়িয়ে তাতে আগুন লাগাতে, বললেন, 'একটু একটু ক'রে পুড়তে শুরু করলেই প্রাণের ভয়ে আর যন্ত্রণায় ঠিক বলে দেবে কোথায় কি আছে।'

ক্রীসাসকে যখন চিতায় তোলা হচ্ছে তখন তার মনে পড়ে গেল সোলোনের কথাগুলো—তিনি বেশ চেঁচিয়েই সোলোনের নাম স্মরণ করতে লাগলেন। মরবার সময় লোকে ভগবানকে ডাকে, ক্রীসাস ঈশ্বরের নাম না ক'রে সোলোনকে ডাকছেন কেন—কৌতূহল হ'তে বিজয়ী রাজা চিতায় আগুন লাগাতে নিষেধ ক'রে কারণটা জানতে চাইলেন ক্রীসাসের কাছে। তারপর অবশ্য ক্রীসাসের মুখে সোলোনের কাহিনী শুনে তিনিও সেই অসার এবং বিপজ্জনক ঐশ্বর্যের জন্যে এতগুলো লোকের প্রাণহানি করেছেন—এখনও একটা রাজাকে মারতে যাচ্ছেন বুঝে—লজ্জিত হয়ে ক্রীসাসকে ছেড়ে দিলেন।...

কাহিনী শেষ ক'রে সুরবালা আবারও বোঝাতে চেষ্টা করল, গহনা লোহার সিন্দুকে পড়ে থাকলে এক পয়সা আয় দেয় না। উপরন্তু দুশ্চিন্তা ও বিপদের কারণ হয়। কিন্তু এসব কোন কথাই নিস্তারিণীর মাথায় ঢকল না। যেন মহাসর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে একটা—এবং তার প্রতি এটা কন্যার একটা আক্রোশ—মুখের এই ভাব ক'রে বসে চোখ মুছতে লাগল।

সোনার গহনা বিক্রীর খুব অসুবিধা হ'ল না। মতির সেকরা, রাজাবাবুর সেকরা দুজনকেই জানা ছিল। তারা এসে কাঁটায় ফেলে ওজন ক'রে নিয়ে গেল সব। এত সোনা নিক্তিতে ওজন করতে দিন পুইয়ে যাবে—তাই কাঁটা এনে টাঙ্গাল ওরা। সবই ধরে দিল বলতে গেলে—রাখল শুধু বালা, এক ছড়া হার—আর সেই শশীবৌদির দান সরু হারছড়া ; মায়ের পছন্দের কয়েকগাছা চুড়ি, আর মতির দেওয়া প্রথম বয়সের দু-একখানা গহনা। নিতান্তই ফঙ্গবেনে গহনা সে সব, কিছুই এমন দাম পাবে না—অথচ ওর অন্য মূল্য আছে সুরোর কাছে। টাকার হিসেবে এ জিনিসের দাম করা যায় না।

টাকা কমই পেল অবশ্য। সেকরাদের বিচিত্র হিসেব—রসান ওঠে নি যে সব করকরে নতুন গহনা, তারাই ক'রে দিয়েছে—কোন কোনটা একবারের বেশী গায়েই ওঠে নি—দু'একখানা বোধহয় আদৌ পরা হয় নি ; সে সব ফর্দ এখনও আছে—তবু পান-মরা, গালাই, পোদ্দারি প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র খাতে বাদ দিয়ে ভরিকরা মাত্র চৌদ্দ টাকা দাম দিয়ে গেল ওরা। এমন কি গিনি-হারও—ধারে-ধারে জোড়ার অজুহাতে সব সোনাটার ওপর গালাই আর পান-মরা ধরে নিল।

অথচ উপায়ই বা কি! কিরণ বলল, 'এ ওরা নেবেই। এই ওদের ব্যবসা। পোদ্দারের দোকানে গেলে আরও বেশী নিত।'

'কিন্তু ওরাই তো করেছে! এই তো সেদিনকার কথা সব। এখনও তো রসান ওঠে নি। আর ওরা কি সত্যিই এসব গালাবে ভাবছ?' সুরো করুণ-কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

কিরণের এ ধরনের ব্যাপারে স্থৈর্য ঢের বেশী। সে বলে, 'সে যদি ওরা কাউকে ধরে বেচতে পারে তাহলে আলাদা কথা। তবে তারও মেহনতানা আছে বৈকি। তাছাড়া অত ভাবতে গেলে চলবে কেন, ও ওদের একটা নিয়ম ক'রে নিয়েছে—সকলেই নেবে এ মুনাফা। এ এখন ওদের হক্কের পাওনায় দাঁড়িয়ে গেছে।'...

সোনার গহনা তবু একরকম—জড়োয়াগুলো নিয়েই বিপদ বাধল। কোনটা কার কাছ থেকে কেনা—সুরো জানেও না। নামকরা জহুরী লাবচাঁদ মতিচাঁদের দোকানে গেল কিরণ—তাঁরা অবিশ্বাস্য রকমের কম দাম দিতে চাইলেন।

হয়ত সেই দামেই বেচতে হ'ত শেষ পর্যন্ত—কিন্তু ভগবানই বোধ করি একটা সুরাহা ক'রে দিলেন।

শ্যাম বড়াল—বিখ্যাত য়্যাটর্নী, রাজাবাবুর সম্পর্কে বেয়াই হন—একদিন দেখা করতে এলেন। প্রথমেই বেয়ান বলে সম্বোধন করলেন, জেঁকে বসলেন, পানতামাক চেয়েই নিলেন একরকম। রাজাবাবুর মৃত্যুর সময় তিনি এখানে ছিলেন না—বোম্বেতে গিয়েছিলেন, নইলে এতখানি অবিচার অপমান কিছুতেই হ'তে দিতেন না—বার বার সেইটে জানিয়ে

দিলেন।

'আর কেউ না জানুক আমি তো জানি—তিনি আপনাকে তাঁর স্ত্রী বলেই মনে করতেন। আপনাকে ওরা—ছিঃ ছিঃ!'

বিশাল দেহ ভদ্রলোকের, বিরাট গোঁফ।

পয়সাওলা লোক, নামকরা য়্যাটর্নীও।

এ'র কিছু প্রশংসাও শুনেছে রাজাবাবুর মুখে, মক্কেলদের কাছ থেকে দুয়ে পয়সা নেন বটে তবে দয়ে মজান না। যে মক্কেল পয়সা দেয় ঠিক ঠিক—তার জন্য ষোল আনা খাটেন, কখনও কখনও আঠারো আনাও খেটে দেন। আর নিজের ক্ষতি না ক'রে যদি পরোপকার করা সম্ভব হয় তো করেন, যথাসাধ্য। তবে একটি দোষের কথাও বলে গিয়েছেন রাজাবাবু, সব সময় নাকি অন্তত তিনটি রক্ষিতা না হ'লে চলে না এ'র।

প্রথমটা তাই একটু সন্দেহের চোখেই দেখেছিল সুরবালা। মতলবটা আঁচ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কথাবার্তায় কোথাও সে রকম কোন জাল ফেলার চিহ্ন না দেখে একটু একটু ক'রে নরম হ'ল। 'আপনার কোন দরকার পড়লে অবিশ্যি জানাবেন—কোন সঙ্কোচ করবেন না।' এই আশ্বাসের পর নিজের প্রয়োজনের কথাটা খুলেও বলল।

তা শ্যাম বড়াল করলেনও ঢের। এতটা অপর কেউ পারত না। ঝামাপুকুরের কুমার কন্দর্প মিত্র জহরতের বড় সমঝদার ; কোন পাথরের কত দাম হ'তে পারে, কত হওয়া উচিত—তা তাঁর কাছ থেকে যাচাই ক'রে নিয়ে যায় জহুরীরা, তার জন্যে রীতিমতো ফী দেয়। বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে (সারা রাত জেগে কাটে বলতে গেলে, রাত একটা নাগাদ 'বাইরে' থেকে ফিরে—আহ্নিক-পুজো স্নানাহার করতে করতে রাত চারটে বেজে যায় শুতে) স্নান পুজো জলযোগ সেরে তিনটে নাগাদ আফিসে বসেন, সেই সময় জহুরীরা ভিড় ক'রে আসেন—এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যে কোন দিন পাঁচশ, কোন দিন সাতশ, কোন দিন বা হাজার টাকাও কামিয়ে নিয়ে উঠে যান।

তাঁকেই গিয়ে ধরলেন শ্যামবাবু। তাঁরও কিছুদিন সুরোর দিকে নজর ছিল—সেই কারণেই হোক অথবা শ্যামবাবুর পীড়াপীড়িতেই হোক—তিনি জড়োয়া গহনার পাথর খুলিয়ে পাথরের দামে বেচিয়ে দিলেন, সোনা—জড়োয়া গহনার সবই মরাসোনা—সোনার দামে। তাতে সব জায়গায় এমন কিছু ইতর-বিশেষ হ'ল না, কারণ—শ্যামবাবু বুঝিয়ে দিলেন—জহুরীরা খুচরো খদ্দেরের কাছে কুঁচো পাথরের ন্যূনপক্ষে চারগুণ দাম ধরে : আর তেমনি সেটিংয়ের খরচাও—পাথরের দামের সমান দর ধরে নেয় তারও—সেখানেও চতুর্গুণ লাভ থাকে। তবে হীরেগুলোর বেলায় অনেকখানি লাভ হ'ল, আর অন্য বড় পাথর যা দু-একখানা ছিল—তাতেও।

বেচল না শুধু তিন-চারটে জিনিস। একটা হীরের নেকলেস, তার লকেটের ভেতর কুঁচো হীরে দিয়ে রাজাবাবুর নাম লেখা ছিল—'রাধিকা' ; আর একটা চুনির আংটি, তাতে স্প্রিং টিপলে ভেতরে কৌটোর মতো জায়গা হয়—তাতে রাজাবাবুর কয়েকগাছি মাথার চুল ছিল ; প্রথম যেদিন বাগানবাড়িতে গিয়েছিল সেদিন যে আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিলেন রাজাবাবু সেইটে। এ ছাড়া একটা জড়োয়া টায়রা আর একটা মুক্তোর কণ্ঠি। এ দুটো নাকি রাজাবাবুর বড় প্রিয় ছিল। সুরবালা কিরণকে বলল, 'তাই বলে আমিও রাখব না অবিশ্যি, একটা রইল তোমার মেয়ের জন্যে, আর একটা দোব তোমার বৌমাকে। তাঁর প্রিয় জিনিস—গালাতে কি খুলতে দিতে কষ্ট হয়। তার চেয়ে জানাশুনো কোন স্নেহের পাত্র কেউ পরলেও শান্তি।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'ঐ যে দুটো জিনিস রাখলুম—তাও মনের ভুল বৈ কিছু তো নয়। পরবও না কোনদিন, আর শুধু হাতে হীরের নেকলেস পরলে লোক পাগল বলবে—তা নয়, তোলাই থাকবে, অবিশ্যি যদি চুরি ডাকাতিতে না যায়। ভবিষ্যতে

একদিন কেউ হয়ত পাবে। তোমাকে বংশপরম্পরায় সেবাইত করব ঠাকুরের—যদি তোমার ছেলে গণ্ডগোল না করে, সব দায়িত্ব নেয় ঠিক ঠিক—এও তোমার ছেলেই পাবে। ...না হয় যে পাবে, যার হাতে যাবে—সে যা খুশি করবে। হয়ত কেউ তার মেয়েমানুষকে দেবে, হয়ত বেচে মদ খাবে।...মরুক গে, আমি তো তখন আর দেখতে আসব না!'

বলতে বলতে ঈষৎ ভার হয়েই আসে তার গলা।

শ্যামবাবু আরও ঢের সাহায্য করলেন। বিষয়-সম্পত্তি দেবোত্তর করা, সরকারকে ট্রাস্টি করবার জন্যে লেখালেখি করা—দলিল-দস্তাবেজ তৈরী সবই তিনি করিয়ে দিলেন। বিগ্রহ এখানেই একজনকে দিয়ে তৈরী করানো হয়েছিল, সমস্যা উঠল তার নাম নিয়ে। আনন্দবাবা বলেছিলেন—প্রতিষ্ঠাতার নামের আদ্যক্ষর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামের কোথাও না কোথাও থাকা নাকি বৃন্দাবনের রেওয়াজ, সুতরাং সু অক্ষরটা দিয়ে একটা নাম করতে। সুরবালা বললে, 'না না—ছিঃ!...আমি কী একটা মানুষ—তাই আমার নাম জড়ানো থাকবে ঠাকুরের নামের সঙ্গে! এত আস্পর্দ্দা আমার নেই। ঠাকুর যদি চরণে স্থান দেন তাই ঢের—নাম জড়িয়ে রেখে কি হবে! অন্য কোন নাম দিতে হবে। তা এত তাড়াই বা কি, ধীরে-সুস্থে ভাবলেই হবে।'

শ্যামবাবু বললেন, 'না—নামটা আগে চাই। নইলে দলিল করা যাবে না। বিগ্রহের নামেই সম্পত্তি সব উৎসর্গ করা হচ্ছে তো!'

আরও একটা কথা বললেন তিনি। বাড়িঘরের হাঙ্গামা সরকার বইতে রাজী হবে না। নগদ টাকা আমানত ক'রে দিলে নিতে পারে। বাড়ি বেচে কোম্পানীর কাগজ বেচে আমানত করতে হবে।

সুরবালা বললে, 'তা হবে না। মা থাকতে এ বাড়ি বেচতে পারব না। এখন দেবোত্তর করা থাক তো—তারপর মা যদি আমার আগে যায়—তখন বাড়ি বেচে নগদ টাকা ক'রে নেব।'

কিরণই আর একটা বুদ্ধি দিলে, 'সব জমা দেবার দরকার নেই, কিছু কাগজ নিজে রাখো—যেমন গয়না রাখলে দু-একখানা। সরকারী ব্যবস্থা—কবে কি হবে না হবে—নিজে অমন নিঃস্ব একটা পয়সার আজীর হওয়া ভাল নয়। কিছু নগদ টাকা—পোস্টাপিসের টাকাটা আর তুলো না—দু-চারখানা গিনি আর কখানা কোম্পানীর কাগজ—এ তুমি জীবন-কাল রেখে দাও। নিজস্ব কিছু থাকা ভাল। তোমার তো ছেলেপুলে নেই। মরণ-কালে যে সেবা করবে তাকে দিয়ে যেয়ো, সেই লোভে লোকে সেবা করবে।'

কিন্তু ঠাকুরের নামের সমস্যাটা থেকেই গেল। নাম না হ'লে দলিল হবে না। তাও—এখন দলিল রেজেস্ট্রী হবে না, হওয়া উচিত নয়, অন্তত যতদিন না বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তবে তারও আগে নাম চাই।

সুরবালা একবার কিরণের মুখের দিকে চাইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি না হ'লে এসব কিছুই হ'ত না, গুরুদেবকে ডাকার কথাই তো মনে পড়ত না কারুর। আর এই ছুটোছুটি। তোমার জীবনটাই তো নষ্ট করলুম বলতে গেলে! ঠাকুরই তোমার হয়ে থাকুন। তুমি বেয়াইকে বলে এসো—কিশোরীমোহন নাম হবে ঠাকুরের—শ্রীরাধা-কিশোরীমোহন।'

কিরণের কি অক্ষর আগে ধরে কিশোরীমোহন।

কিরণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, 'না না—কী আশ্চর্য—আমার নাম নিয়ে, যাঃ, তা হয় না। না না, তুমি অন্য নাম কিছু ভাবো। তোমার ঠাকুর তোমার নামে প্রতিষ্ঠা হবে—'

বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে সুরো, 'ভেবেই মনস্থির করেছি। ঠাকুরের নাম নিয়ে কি আর ছেলেখেলা করা যায়? ঐ নাম মনে এসেছে—ঐ নামই থাক। আনন্দবাবা বলেছেন রেওয়াজ—নিয়ম এমন কথা বলেন নি। ওটা আসলে আত্ম-অহমিকা আত্মপ্রচার ছাড়া আর

কিছু নয়।'

কিশোরীমোহনের নামেই সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করা হ'ল। যতদিন বাঁচবে সুরবালা দেবী তাঁর সেবাইত থাকবে। সুরবালার পর কিরণ। কিরণ অথবা তার ছেলে নাতি। তবে যদি ইচ্ছা করে কিরণ বা সুরবালা উইল করে কিরণের বংশধরদের সেবাইতের পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে, অপর কাউকে সে জায়গায় নিযুক্ত করতে পারবে।

দলিলের খসড়া দেখে সই ক'রে দিলে সুরবালা। তারপর কিরণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'তোমার কাছ থেকে হাত পেতে নিয়েই যাচ্ছি—নিয়ে যেতেও হবে। চির-জীবন ধরে ঋণই জমা হয়ে যাবে শুধু। এক ভরসা ঠাকুর রইলেন—তিনিই শোধ করবেন আমার হয়ে। তিনিই তোমাকে শান্তি দেবেন। তাঁর কাছে এই ভিক্ষাই জানাব।'

॥ ৩৫ ॥

এর মধ্যে বার-দুই বৃন্দাবনে যাওয়া-আসা করতে হ'ল। জমি রেজেস্ট্রী, ভিত্তিস্থাপন—তাছাড়াও বাড়ির কাজ চলছে—এক-আধবার যাওয়া দরকার। ঝঞ্ঝাট অনেক। আনন্দবাবার কথামতো টাকা হুণ্ডী করিয়েই নিয়ে গিয়েছিল ওরা—সেখান থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে তিনি তুলে নেবেন। আনন্দবাবাই সব করাচ্ছেন, তবে তাঁর সাফ কথাঃ 'ঠাকুরের কাজ, গুরুর আদেশ, করছিও সব—মোদ্দা চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তম্বির-তদারক করতে পারব না। নিজের আহ্নিকপুজো নিয়মসেবা এগুলো আছে—নিজেই রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দিই—যাহোক কিছু তো করতেই হয়—সব সেরে তবে যাওয়া। হয়ত কিছু কিছু ঠকবে, সব কাজ মনের মতো হবে না। সেজন্যে তৈরী থেকো। এর পর গাল দিও না যেন।'

সুতরাং দাঁড়িয়ে থেকে না করালেও, এক-আধবার এদের না গেলে চলে না।

কিরণকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে সঙ্গে। মধ্যে তবু জোর ক'রে আর একবার ওকে বাড়ি পাঠিয়েছিল সুরবালা—তবে সে নামেই। তিন-চারদিন পরেই চলে এসেছে।

কিরণের ওপর এতখানি নির্ভরতা শ্যামবাবুর পছন্দ নয়। 'ওখানে কি হচ্ছে, কতখানি ঠকছ—একটু নজর রাখা দরকার,' বার বার উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করেন তিনি। প্রয়োজন হ'লে তিনিও যে সঙ্গে গিয়ে তত্ত্বাবধান ক'রে আসতে পারেন আকারে-ইঙ্গিতে তাও জানান। তাঁর অবশ্য কলকাতা ছাড়লেই লোকসান—কিছু না হোক আপিসে গিয়ে বসে থাকলেও কম ক'রে দুশোটা টাকা পকেটে আসে দৈনিক—তবু টাকাটাই তো বড় নয়, কর্তব্য বলে একটা কথা আছে তো? কর্তব্য সব স্বার্থের বড়—মানুষের মনুষ্যত্ব তো ঐখানেই।

কিরণ বলে, 'তা ওঁকেই নিয়ে যাও না। হাজার হোক পাকা মাথা। সত্যিই তো, আমরা কীই বা বুঝি, কি হচ্ছে না হচ্ছে ওঁরা দেখলে বুঝতে পারতেন।'

সুরো হেসে বলে, 'বেশী পাকা মাথায় আমার দরকার নেই। ঝুনো নারকেলের মতো মাথা নিয়ে আমি কি করব? চিবিয়ে খাবার পক্ষে তোমার মতো কাঁচা মাথাই ভাল। দ্যাখো না—প্রতিবাদ করে না—খেলে কৃতার্থ হয়ে যায়। তাছাড়া তুমিও কাঁচা আমিও

কাছা—এ একরকম বনেছে ভাল। ভুল হয়—কেউ কাউকে দায়ী করব না। ঠকি ঠকব, কী আর করা যাবে তার!'

'কিন্তু উনি তো তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, যা দেখা যাচ্ছে, ওঁকে একবার নিয়ে যেতেই বা দোষ কি? তবু—, যদি এখনও কিছু সংশোধনের উপায় থাকে—'

'ভুল হ'লে তো শোধরানোর কথা, ভুল হচ্ছে এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? যাঁর কাজ তিনিই করাবেন। ভুল হয় সেও তিনি বুঝবেন। আর হিতাকাঙ্ক্ষী? হ্যাঁ—যা দেখা যাচ্ছে, ঠিকই বলেছ। দেখাটারই যে এখনও শেষ হয় নি। দ্যাখো, এ-বাজারে নিছক নিঃস্বার্থ-ভাবে পরোপকার করে তোমার মতো—এমন লোক এত সস্তা নয়। তাও—তোমার মধ্যেও একটা স্বার্থ আছে—মোটা কিছু না—খুবই সূক্ষ্ম—তবু আছে। ঐ অকারণ পরোপকারটাই আমার ভাল লাগে না, বোধ হয় হয়ত আমার পাপমন—মতলব ছাড়া বুঝি না, আর মতলবটা বুঝতে পারলে তবু একটু নিশ্চিন্ত হই। জীবনভোর অনেক দেখলুম কিরণবাবু, বুঝলে! বিশেষ বড়লোক, দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। আমার চারুদার মতো গরীবদুঃখী হ'লে তবু বুঝতুম!'

এই শেষের বার বৃন্দাবন থেকে ফিরে শ্যামবাবুর আর দেখা পাওয়া গেল না। অবশ্য খুব একটা কাজ ছিলও না। যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার আগে হবেও না। ওদিকে যেমন ঘন ঘন আসছিলেন, কাজ না থাকলেও—তাতে এই অনুপস্থিতিটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়। বিশেষ এর মধ্যে, ওঁর কাছে যা কিছু কাগজপত্র পড়েছিল—দলিল, ট্যাক্সের বিল ইত্যাদি—লোক দিয়ে একদিন সব পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি সব বুঝিয়ে দিয়ে রসিদে সই করিয়ে নিয়ে যখন উঠছে, সুরবালা প্রশ্ন করল, 'শ্যামবাবুর কি শরীর খারাপ? না কি, কাজের খুব চাপ পড়েছে?'

'কৈ, না তো!' লোকটি বেশ একটু অবাক হয়ে যায়, 'ভালই তো আছেন। কাজেরও তো এমন কিছু বেশী চাপ নেই, যেমন সাধারণত থাকে তেমনিই।...কেন, কিছু বলতে হবে? আসতে বলব একবার?'

'না না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।' সুরো ব্যস্ত হয়ে বলে।

কথাপ্রসঙ্গে মায়ের কাছেও কথাটা তোলে একবার। এমনিই উঠে পড়ে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোলা নয়। এবার ফিরে পর্যন্ত একদিনও আসেন নি শ্যামবাবু—এই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

নিস্তারিণী হঠাৎ দুম ক'রে বলে বসল, 'সে তো আসতেই চায়। তুমি বললেই আসে! বারো মাস ভূতের ব্যাগার দিতে আর কত আসবে বলো শুধু শুধু?'

'তার মানে?' একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই প্রশ্ন করল সুরবালা। মার কথার ভঙ্গী ও গলার আওয়াজ কোনটাই ভাল মনে হ'ল না। অন্য কোন বক্তব্যের পূর্বাভাস বলেই মনে হ'ল। সে মুহূর্ত-কয়েক মার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা ক'রে পুনশ্চ পূর্ব প্রশ্নের জের টানে, 'এর ভেতর আমি না থাকতে কিছু বলে গেছেন নাকি —তোমার কাছে? বেগার দিতে চান না—মানে টাকাকড়ি চান কিছু? ফী?...তা কৈ, বলো নি তো এ ক'দিন একবারও।'

নিস্তারিণী যেন একটু বেজার মুখেই বলে, 'বলব কি বলো, তোমার যা মেজাজ, হয়ত বাপ বলতে গেলেও শালা বলে বসবে।...টাকা চাইবে কেন—টাকা দিতেই চায় উল্টে। তোমাকে বলতে সাহস হয় নি—আমাকে এসে ধরেছে—তোমরা যখন ছিলে না। বলে, আপনি বুঝিয়ে বলুন মাসীমা, আমি ওর ধম্মকম্মে কিছু বাধা দোব না—ঠাকুর পিতিষ্ঠে যা করতে চায় করুক—বরং বলে তো আমি টাকা দিয়ে খুব বড় ক'রে পাথরের মন্দির করিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া বেন্দাবনে থাকতে চায় উত্তম কথা, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবে—তাতেও বাধা দোব না। মাঝে মাঝে, এখানে যখন থাকবে, যদি আমাকে একটা—মানে

আসতে দেয়, তাহলেই আমি খুশী। মাসে সব খরচখরচা ছাড়াও দুশো টাকা ক'রে দোব, নিজের গাড়ি ক'রে দোব, আপনি গঙ্গা নাইতে যাবেন—আগাম আলাদা পাঁচ হাজার টাকা দোব এছাড়াও।'

এইখানে পেঁাছে গলাটা নামায় নিস্তারিণী, কিরণ তখন নিচে, 'বলে, যদি তার স্মৃতি নিয়েই থাকত, তাহলে এ-কথা বলবার সাহস হ'ত না আমার—তবে, ঐ তো, এখনও ছমাস যায় নি, ঐ একটা ছোঁড়াকে নিয়ে তো সেই ঢলাঢলিই করছে—যা বলেছে তাই বলছি বাছা, আমাকে দোষ দিও না—তা আমি তো তবু তার আপ্তবন্ধুর মধ্যে,...এই সব।'

বলতে বলতেই মেয়ের কঠিন মুখভাবের দিকে চোখ পড়ায় ব্যস্তভাবে বলে, 'আমি অবিশ্যি তাকে বলেই দিয়েছি—এসব কথা আমি কখনও ওকে বলিও নি, বললেও শোনবার মেয়ে সে নয়। সে যা ভাল বোঝে, তাই করে চিরকাল।...আর এভাবে আমি মেয়েকে মানুষও করিনি। সেও যে রাজী হবে বলে মনে হয় না। তা সে নাছোড়বান্দা একেবারে—হেঙ্গাহিঙ্গী—হাতে-পায়ে ধরতে আসে, বলে, একবার বলে দেখুন আপনি —কী বলে!'

ততক্ষণে সুরবালার কঠিন মুখ কঠিনতর হয়ে উঠেছে। এ ভয়ঙ্কর মুখের সামনে দাঁড়াতে নিস্তারিণীর ভয়ই করে আজকাল। সুরবালা বললে, 'সে লোকটা এইসব বলে গেল আর তুমি চুপ ক'রে শুনলে, আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে সেই কথা আমার কাছে বলতে এসেছ!...কেন, যখন বললে কথাগুলো—তার পায়ের জুতো নিয়ে তার মুখে মারতে পারলে না!'

'তা কেন মারতে যাব বাছা!' এবার নিস্তারিণীরও কিছু জ্বালা প্রকাশ পায়, 'তোমার এত হিতেকাঙ্ক্ষী সুরীৎ, এত আসা-যাওয়া ভাব—এত তম্বির তদারক করছে তোমার কাজের—গয়নার ছালা উজোড় ক'রে বার ক'রে দিলে তার হাতে, এত বিশ্বেস— আমি মাঝখান থেকে তার চোখের বিষ হতে যাই কেন! তোমার ওপরও তো ভরসা নেই বাছা, আমি তাকে অপমান করি আর তুমি তাকে ঘরে এনে খাটে বসিয়ে পুজো করো! তখন আমার মুখখানি কোথায় থাকবে?...সে যা বলেছে তাই বলছি। তাকেও বলি নি যে, তোমার হয়ে চেষ্টা করব—তোমাকেও বলছি না যে, তার কথা শোন। জুতো মারতে হয় —ইষ্টদেবতা করতে হয়—তুমিই করো। সে তো আমার দ্যাখ্‌তা লোক নয়—তোমারই লোক।...আর এমন কিছু খারাপ কথাও তো সে বলে নি, তোমার কাজ বজায় দিয়ে, তোমার মর্জি খেয়াল যুগিয়েই চলতে চায় সে, এতগুলো টাকা দিয়েও চোর হয়ে থাকতে চায়। নিহাৎ চোখে পড়েছে বলেই—'

'হ্যাঁ। সত্যি! মহৎ লোক! এমন কথা কে বলে! তা তোমারও তাহলে তাই বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে, আমি বাজারের মেয়েমানুষ! একটা বাবু করেছি যখন, আর একটাতে আপত্তি কি—এই তো?—যদি দু'পয়সা আসে।...ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে কি করছি—ওর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছি আমি? কী করতে দেখলে তাই শুনি!'

ক্রমশ মেজাজের উষ্ণতা আর কণ্ঠস্বরের উষ্ণতা চড়তে থাকে সুরবালার, 'টাকাই যদি দরকার বুঝতুম—গান ছাড়ব কেন? আর ঘরে বসে খানকীগিরি ক'রেই যদি টাকা রোজগার করতে হয়, তাহলেই বা শ্যাম বড়াল কেন? তারক দত্ত কতবার লোক পাঠিয়েছে, জানো? তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আসবে—বললে এক লাখ টাকা গুণে দিয়ে যাবে। আরও ঢের আছে। ওর মতো ডাকসাইটে লোচ্চাকে দশ হাজার টাকার জন্যে ঘরে বসাব কেন? গলায় দড়ি জুটবে না তার আগে একগাছা?'

তার পর মায়ের আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'কথাটা তোমারও খুব মন্দ লাগে নি মা, তা বেশ বুঝতে পারছি। এত টাকার আহিঙ্কে তোমার কেন বলো তো?... ঠাকুর ঠাকুর ক'রে সব উড়িয়ে দিচ্ছি—কিছু থাকবে না, এরপর কী খাবে—এই চিন্তা

তোমার?...বেশ তো, তুমি কতদিন আর বাঁচবে, বাঁচতে পারো—তোমার কত টাকা লাগতে পারে বাকী জীবনটায়—তুমি একটা আন্দাজ ধরো দিকি, বেশী ক'রেই ধরো—ষাট তো পেরিয়ে গেছে, প'য়ষট্টি-ছেষট্টি হবে—না হ'লেও ধরো আর তিরিশ বছরই বাঁচলে। এই তিরিশ বছরে তোমার কত লাগতে পারে বলো—আমি আলাদা ক'রে তোমার নামে পোস্টাপিসে জমা ক'রে দিয়ে এদিকে খরচ করব। তাহলেই হ'ল তো?'

আর যা-ই হোক, এতখানি কঠিন কথার জন্যে নিস্তারিণী প্রস্তুত ছিল না। প্রথমটা রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছিল—ক্রমে বিবর্ণ সাদা হয়ে গেল তার মুখখানা। ঠোঁট-দুটো কী যেন উত্তরের জন্যে বারকয়েক নড়ল শুধু কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না শেষ পর্যন্ত। এতই দুঃসহ আঘাত যে চোখে জলও এল না, স্থির দৃষ্টি, যেন—মনে হ'ল পাথর হয়ে গেছে চোখদুটো।

সুরো কথাগুলো বলে ফেলেই চোখ নামিয়েছিল। আবারও পরোক্ষে সেই খোর-পোশেরই খোঁটা দেওয়া হ'ল। মাথা নামিয়েছিল বলেই নিস্তারিণীর মুখের চেহারাটা দেখতে পেল না—নইলে আজ ভয় পেয়ে যেত সে।

নিস্তারিণী কিন্তু ভয়ানক একটা কিছু করল না। চেঁচামেচি শাপশাপান্ত কিছুই না। সেবারের মতো মূর্ছাও গেল না। অনেকক্ষণ পরে শুধু কেমন এক রকমের চাপা বিকৃত গলায় বলল, 'আমার টাকার জন্যেই আমি তোমাকে ঠাকুর পিতিষ্ঠে করতে বাধা দিচ্ছি? আমার টাকার লোভ! তাই তোমাকে বাবু ধরতে বলছি! আমার জন্যেই যথা-সর্বস্ব বেচে-কিনে সেখানে নিয়ে যেতে পারছ না?...আরও তিরিশ বছর হয়ত বাঁচব তাই তোমার দুর্ভাবনা?...না, অত বাঁচব না—এই তোকে বলে দিচ্ছি, তুই নিশ্চিন্ত হ'। ...তুই বাড়ির খদ্দের দ্যাখ, বেচাকেনা যা করবার ক'রে ফ্যাল—তার মধ্যেই তোকে ছুটি দিয়ে দোব। যদি আমি সেই এক লোক ছাড়া আর কারো দিকে দুষ্যভাবে না চেয়ে থাকি—মা সতীরাণী আমাকে এই লাঞ্ছনার ভাত আর খাওয়াবেন না—টেনে নেবেন এইবার। নাহলে বুঝব চন্দ্রসুয্যি মিথ্যে, দিনরাত মিথ্যে, ভগবান মিথ্যে!'

এতকালের মধ্যে আর এমন বেদনাহত কণ্ঠ শোনে নি সুরো। চোখ তুলে মার মুখের দিকে চেয়ে আরও ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে কাছে এসে মায়ের পায়ে হাত রেখে বলল, 'মাপ করো মা—শোকে-তাপে আমার মাথার ঠিক নেই—তুমি আমাকে তাই বলে শাস্তি দিও না। তোমার মনে সে-বার কষ্ট দিয়েই আমার এই হাল হ'ল। তুমি এবার আর অপরাধ ধরো না।'

নিস্তারিণী বাধা দিল না, ব্যস্ত হল না, ধরে তোলবারও চেষ্টা করল না—শুধু তেমনিভাবেই বলল, 'তোমার অপরাধ কি মা, অপরাধ আমার। নইলে যাকে পেটে ধরে-ছিলুম—সে-ই কোনদিন আমার দিকে ফিরে তাকাল না, উদ্দিশ করল না—মুঠো-মুঠো টাকা রোজগার করে শুনেছি—কোনদিন এক পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ো বলে পাঠাল না। তুমি তো তবু মাথায় ক'রে রেখেছ—ব্রত-পাব্বন দান-ধ্যান—কোন সাধই মেটাতে বাকী রাখো নি। আসলে আর-জন্মের পাপ অনেক জমা ছিল তাই এমন বাড়া-ভাতে ছাই পড়ল—ছেলে থেকেও ছেলে দিয়ে কোন সাধ-আহ্লাদ মিটল না। বৌ হ'ল, সেটাও বাদেছরাদে গেল।...মলে ছেলের আগুনটা পর্যন্ত পাব না। অথচ সে-লোক জানত কখনও কারও অনিষ্ট করেনি—হরে-হম্মে নেয় নি কারও একটা পয়সা। ভগবানকে না ডেকে কোনদিন বিছানা থেকে উঠত না—ভগবানকে না ডেকে কোনদিন শুতে যেত না। তার পরিবার আমি, আমাকে এসব কথা শুনতেই বা হবে কেন! তুই যদি না পথ দেখাতিস, তারা কি এসব কথা বলতে সাহস করত? তাদের কী এত আস্পদ্দা যে আমি বামুনের বিধবা—আমার সামনে এইসব কথা তোলে, আমাকে দিয়ে এইসব কথা বলায়!'

এতটা বলে, বোধহয় ক্লান্তিতেই চুপ করতে হয় একবার। গলাও বুজে বুজে আসছে

—অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে। সেজন্যেও থামতে হয় হয়ত—খানিকটা সামলে নিতে।

একটু পরে আবার বলে, 'না, রাগ নয়—অনেকদিন হ'ল মা। মনে হচ্ছে পাপেরও এবার শেষ হয়ে আসছে, প্রাচিত্তিরের আর বাকী নেই। এ-ভাত হয়ত আর বেশী দিন খেতে হবে না।...কাঁদিস নি, আমি তাই বলে আত্মঘাতী হবো না, কি উপোস ক'রেও থাকব না—নাটুকেপনা কিছু করব না, ক্ষ্যাদ্রমে ফেলব না তোকে। তবে তুই নিশ্চিন্ত থাক, আর বেশী দিন তোকে ভোগাব না। তোর পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে যাব শিগ্‌গিরই।'

শ্যাম বড়াল উত্তর নিতে আসেন নি। সম্ভবত উত্তরটা আঁচ করেছিলেন। উত্তর কিছু পাঠাতেও দেয় নি কিরণ। সুরো প্রস্তাব করেছিল, একটা পরিপাটী প্যাকেট ক'রে ওর একটা পুরনো জুতো পাঠিয়ে দেবে বড়ালের আপিসে। কিরণ নিষেধ করল। বলল, 'ছিঃ। যতই হোক—কিছু উপকার তোমার সে করেছে। রাজাবাবুর আত্মীয়, বন্ধুলোক। এতটা অপমান করা তোমার সাজে না। তাছাড়া—সত্যি কথাই, ভেবে দ্যাখো, সে যা জানে, যে-জগতে সে বিচরণ করে সেইভাবেই সে কথাটা বলেছে। তোমার সব খেয়াল বজায় দিয়ে —দয়ার দান কিনতে চেয়েছে মোটা দামে। আমার সঙ্গে সম্পর্কও—তুমি আর আমি ছাড়া সবাই কি ওর চোখ দিয়েই দেখবে না? হয়ত তোমার মাও তাই ভাবছেন, তবে আর শ্যামবাবুর দোষ কি। তুমি এখন ভগবানে মন দিয়েছ—তাঁর সেবা করতে যাচ্ছ—মনে এত রাগ রেখো না। তরোরিব সহিষ্ণুনা তৃণাদপি সুনীচেন—শুনলে না সেদিন আনন্দবাবা বললেন, তবে হরিসেবার অধিকার জন্মায়।...তুমি লোককে আঘাত দেবে কেন, বরং সইতে চেষ্টা করবে—সেই তো ভাল।'

শুনেছিল ওর নিষেধ সুরবালা। কোন উত্তর পাঠায় নি আর।...

বৃন্দাবনের বাড়ি তৈরী হয়ে গেল। বিগ্রহও তৈরী, প্রতিষ্ঠার দিন গুরুদেব দেখে দিয়েছেন—অক্ষয় তৃতীয়া। পুণ্যদিন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার যোগও আছে। বৃন্দাবনে সেদিন খুব উৎসবেরও দিন, সেইদিন বঙ্কুবিহারীর চরণ দর্শন হয়—বছরে এই একদিন ওঁকে দর্শন করলে বদরীনারায়ণকে দর্শন করা হয়। ছাতু আর ঘোল খেয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ায় ব্রজবাসীরা। সেদিন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ খাওয়ানোও পুণ্যের কথা।

সুরবালা মাকে ধরে পড়ল, 'এবার তুমি চলো মা। সেখানে সব করবে কে, তুমি না গেলে?'

নিস্তারিণী বললে, 'না।'

'না কেন! তোমার রাগ এখনও যায় নি?'

'তুই পাগলই আছিস এখনও!' কেমন এক ধরনের হাসি হাসে নিস্তারিণী, 'তোর ওপর রাগ কবে করতে দেখলি? করলেই বা ক'ঘণ্টা থাকে? রাগ যদি করা সম্ভব হ'ত, তাহলে আর তোর ভাত খেতুম না। বামুনের মেয়ে পথে আঁচল পেতে ভিক্ষে করলেও একটা পেট চলে যেত—তাতে কোন লজ্জাও ছিল না। তা নয়—রাগটাগ বাজে কথা— তবে আমি বুঝতে পারছি ভেতরে ভেতরে দিন শেষ হয়ে আসছে আমার—সেইজন্যেই আর কোথাও যাব না।'

'এও তোমার রাগের কথা হ'ল মা!' সুরো কাছে এসে পুরনো দিনের মতো কোলে মুখটা গুঁজে দেয়, বলে, 'না মা, তোমাকে যেতেই হবে। ওসব ওজর শুনব না। যদি শেষ হয়েই আসছে বুঝতে পেরে থাকো—তাহলেই বা আপত্তি কিসের, অতবড় তীর্থ, তীর্থে মৃত্যু হবে, রজ পাবে—সেই তো ভাল!'

'তীথ্যি মাথায় থাক, এমনি তীথ্যি ক'রে আসতুম সে একরকম কথা। তবে শেষ তীথ্যি আমার এখানেই। উনি যে শ্মশানে, যে চিতেয় গেছেন, সেই চিতেতেই যেন যেতে পারি

—এই এখন একমাত্র সাধ আমার। যদি পারিস তো হাড় ক'খানা নিমতলায় দিস—অমনেই আমাকে তীর্থ করানোর ফল হবে তোর।'

'তুমি অমন কথা বলছ কেন মাগো? রাগের মাথায় কী বলে ফেলেছি—সত্যি সত্যিই সেই অপরাধে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ?' সুরো মুখ তুলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে।

জোর ক'রে ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিস্তারিণী বলে—ঈষৎ একটু ম্লান হাসির সঙ্গে, 'সেই অপরাধে ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি কেন বলছিস পাগলী, আমার যাবার সময় হয় নি? তোর গুষ্টি কতদিন আগে গেছে বল দিকি? এ-জন্মটা ঐ অতদিনের বয়সে-বড় বরের সঙ্গে কাটাতে হ'ল—আবার আসছে জন্মেও তাই করব বলতে চাস? সেই ভাবনাটাই বড্ড হয়েছে—' বলতে বলতে মুখের হাসি আরও আয়ত হয়। প্রসন্ন মুখেই বলে, 'সত্যিই তোর কথা মনে রাখি নি, বিশ্বাস কর। তুই সৎ কাজে মন দিয়েছিস, পুণ্য কাজে—আমারই দোষ হয়েছিল, বাধা দিতে যাওয়া। তোর সুখ কিসে হয় সেইটেই ভাবছিলুম—। তবে আমারও বোঝা উচিত ছিল, গোচ্ছার টাকা পেলেই সুখ হয় না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, 'সত্যি সত্যিই—তোরা যখন কোলে এলি, কাঁই বা আয়, উনি হপ্তায় একদিন একটু পরোটা খাবেন বলে গোনাগুষ্টির পরোটা ভেজেছি। ডাল বেটে ধোঁকা করেছি। তবু, সেইসব দিনই আমার সুখে কেটেছে, শান্তিতে কেটেছে। না, তুই যা করছিস তাই কর মা, তুই সুখী হ, শান্তি পা—আমি আশীর্বাদ করছি, তুই শান্তিই পা—আর কিছু চাই না আমি।'

'আসলে কি জানিস—', আর একটু থেমে, অকারণেই গলাটা একটু নামিয়ে কেমন যেন কিন্তু-কিন্তু ভাবে বলে, 'ঠিক টাকার জন্যেই যে পাগল হয়ে উঠেছিলুম তাও না। তোর একটা ছেলে হ'ল না, মেয়ে হ'ল না—না সোয়ামী, না শ্বশুরবাড়ি, আমি চোখ বুজলে একেবারে একা হয়ে যাবি সংসারে—সামনে অসুমর জীবন পড়ে—এইসব যখন ভাবি, তখনই মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন কেবল মনে হয়—এখনও তো সময় যায় নি ছেলেপুলে হবার। যদি আর কারও ঘর করে—বে তো আর হবার নয়, এখন এমনিই ঘর করা—হয়ত একটা কিছু কানাকানী হতেও পারে, এই আশাতেই—। নইলে কি ঐসব কথা সত্যিই আমি মুখ ফুটে তোর কাছে বলতে পারি—না কানে শুনি।...অনেক আশা ছিল রে, সতীমায়ের দান তুই, সন্ন্যাসী বলেছিল ভগবতীর অংশে তোর জন্ম—তোর এমন হবে—। যাকগে, আর ওসব কথা ভাবব না মা, তুইও আর মিথ্যে পেছনপানে তাকাস নি—এ-কূল তো গেছেই, ঐ কূলই যাতে গড়ে ওঠে তাই কর। ভগবানকেই আশ্রয় কর—যদি তিনি তোর জীবনে আনন্দ আর অবলম্বন দিতে পারেন।'

বলতে বলতে আর আত্মসংযম করতে পারে না নিস্তারিণী, ঝরঝর ক'রে দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার। সুরবালা ইতিমধ্যে কোলের ওপর থেকে মুখটা সরিয়ে এনে মায়ের পায়ের ওপর চেপে ধরেছিল, সে বাধা দিল না, টানাটানি করল না, শুধু নীরবে সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে লাগল—ছেলেবেলার মতো। মেয়েরও যে চোখ শুকনো নেই তা বুঝতে পারল গরম চোখের জল পায়ে গড়িয়ে পড়তে—কিন্তু সেজন্যেও অযথা ব্যস্ত হ'ল না।

অনেকক্ষণ পরে গাঢ়কণ্ঠে সুরবালা ডাকল, 'মা!'

'কী মা?'

'এই শেষ আব্দারটি আমার রাখো মা, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি কথা দিচ্ছি, মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে আর একদিনও ধরে রাখব না। আমি নিজে সঙ্গে ক'রে ফিরে আসব।'

'তুই বললে আমি যাব—যেতেই হবে। কিন্তু না-ই বা টানা-হেঁচড়া করলি আর। শরীর ভেঙে আসছে—যদি সেখানে গিয়ে শয্যাধরা হয়ে পড়ি—মিছিমিছি আনন্দের মধ্যে

একটা অশান্তি—ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া। তার চেয়ে কাজ শেষ হ'লেই চলে আসিস—আমি বলছি তোর কোন ব্যাঘাত হবে না।'

'কিন্তু মন তো এখানেই পড়ে থাকবে মা, বিশেষ এসব কথা শোনার পর—সে তো আরও অশান্তি, কেবলই ভয় হবে—যদি তোমার একটা কিছু হয়ে পড়ে। তাহলে না হয় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা বন্ধই থাক—কিছুদিন পরে হবে বরং।'

'না না, বাপ রে!' নিস্তারিণী ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কি ছেলেখেলা! মন করেছিস—তোর গুরু দিন দেখে দিয়েছেন—এখন আর বন্ধ রাখা যায় না। তুই চলে যা—। ভয় নেই। তোর হাতের জল না খেয়ে আমি মরব না। তবে—আসল কথাটা তো তোকে বললুমই। তুই এই বয়সে সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে দিয়ে যোগিনী হলি—মরণের জন্যে তৈরী হ'তে শুরু করলি এই বয়স থেকে—ঠাকুর পিতিষ্ঠে মন্দির পিতিষ্ঠে মানেই পরকালের জন্যে তৈরী হওয়া—সে আমার বুক ভেঙে যাবে মা! ও জিনিস আর চোখে না-ই দেখলুম। তোর ছেলেমেয়ে হয় নি—তুই বুঝবি না. দেবতা বল ধম্ম বল—সন্তানের ওপর কেউ না। ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন—হয়ত যা করছিস ভালই করছিস, তবু একটা অবলম্বন আশ্রয় হয়ে রইল দেখে গেলুম—কিন্তু আমাকে আর তার মধ্যে টেনে না-ই নিয়ে গেলি!'

॥ ৩৬ ॥

এরপর আর সুরবালা জোর করে নি। করা উচিত হবে না—সে বুঝেছিল। মার মনে এমন প্রতিক্রিয়া হবে জানলে এখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা মুখেই আনত না—আর কিছু-দিন অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন আর পিছনো যায় না। সম্মতি জানিয়ে ওঁদের চিঠি লেখা হয়ে গেছে, আনন্দবাবা হয়ত এর মধ্যেই কতক উদ্যোগ-আয়োজন শুরু ক'রে দিয়েছেন। সম্ভবত লোকজনও বলা হয়ে গেছে—গুরুদেব ঐ-দিন আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন—এখন বন্ধ করা মানে বহু হাঙ্গামা। আনন্দবাবার নিজের কোন স্বার্থ নেই—এসবে থাকতে চানও না, তাঁর সাধন-ভজনে বিঘ্ন হয়, নিছক সুরবালার পীড়াপীড়িতেই এতটা খাটছেন। বিশেষ গুরুদেব—আজকাল শহরে-লোকালয়ে আসতেই চান না, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও ঘোরতর আপত্তি তাঁর—সুরবালার মুখ চেয়ে নিজে থেকেই আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন এতদূর এগিয়ে প্রতিষ্ঠার তারিখ পিছোলে ওঁরা হয়ত বিরক্ত হবেন, ভবিষ্যতে আর কোন সহযোগিতা করবেন না।

তাই অত্যন্ত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং একটা অপরাধবোধ নিয়েই এত বড় একটা শুভকাজে যাত্রা করতে হ'ল। এতদিনের সাধ, এই এক বছর প্রায় নিশিদিনের স্বপ্ন—স্বার্থক হতে চলেছে, যা ছিল সুদূর কল্পনা তাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে ; এই এক বছরের টানাপোড়েন ছুটোছুটির শেষ হ'ল এবার—সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান—তবু মনে এতটুকু আনন্দ অনুভব করতে পারলে না। মা তার জীবনে অনেকখানি, মা তার জন্যে অনেক করেছে ;—সেই মা, শুধু মরণকাল আসন্ন বলেই নয়—মা তার এই কাজে কতখানি কষ্ট পেলেন ভেবেই খারাপ লাগছে তার। তারা যখন উৎসবে ব্যস্ত থাকবে—তখন এখানে

একা এই শূন্য বাড়িতে সেই উৎসব কল্পনা ক'রে হয়ত তাঁর চোখে জল পড়বে—হয়ত হাহাকার করবেন মনে মনে—তার পরেও কি ওর কাজ সফল হবে—ঠাকুর কি তার পুজো প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারবেন?...

খুবই অসহায় আর অবসন্ন বোধ করতে লাগল সুরবালা যাওয়ার সময়। তবু এর মধ্যে—আর কে-ই বা আছে তার—নানুকে ডেকে পাঠিয়ে তার মত জিজ্ঞাসা করেছিল। নানু সব শুনে চুপ ক'রে ছিল অনেকক্ষণ। সেও নিস্তারিণীকে ভালবাসে। দোষেগুণে মানুষটা, তবু গুণই বেশী, তাছাড়া ওর মনের ভাবটাও সে জানে—এই মেয়ে যে ওর কতখানি, গর্ভেধরা সন্তানেরও বেশী—তা নানুই বরং ভাল জানে। তারও চোখ ছলছল করতে লাগল সব শুনে। তবু বললে, 'না, ও তুই চলেই যা। আগে তো মার কথা শুনিস নি, জননীর তো কোন কালেই মত ছিল না—এখন এতদূর এগিয়ে আর এসব ভেবে লাভ কি! এও তোর ঠাকুরেরই পরীক্ষা—মায়া মমতা ঘৃণা লজ্জা ভয় সব বিসর্জন দিয়েই তাঁকে পেতে হয়।...যদি করতেই হয়, আর করবি বলেই তো এত কান্ড করলি—অনর্থক পিছিয়ে লাভ নেই। বুড়ির কথা শুনে মনে হচ্ছে মরবেই এবার। সে তখন আরও হাঙ্গামা, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার আগে ওকথা ভাবাই যাবে না। তখন আবার শোকের মধ্যে আরও মনে হবে—এই জন্যেই মা এত তাড়াতাড়ি ম'ল, আত্মহত্যের মতো ক'রে—সে একটা উলটো অনুতাপ। না, শ্রেয় কাজে দেরি করে লাভ নেই। তুই চলে যা, আমি এ কদিন বরং—কথা দিচ্ছি, এখানেই থাকব। রাতটা সকালটা তো দেখাশুনা করতে পারব—তেমন বুঝলেই টেলিগ্রাম ক'রে দেবো। তুই দুগ্‌গা বলে রওনা হয়ে যা—'

যাওয়ার সময় সুরো মাকে প্রণাম করতে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল। নিস্তারিণীও সেই ছেলেবেলার মতো বুকে চেপে ধরে—জোর ক'রে মুখটা তুলে চুমো খেয়ে বলল, 'দূর পাগলি, কাঁদছিস্ কেন? শুভকাজে যাচ্ছিস—ভাল মনে যা। পেছনে টান রাখিস নি। মা কি আর কারো চিরদিন থাকে—না থাকলেই চিরকাল তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায়? মন যখন ঠিক ক'রে ফেলেছিস, ভাল কাজ করছি বলে মনে জেনেছিস তখন আর মিছে মনখারাপ করিস নি। দোনোমনোও করিস নি। নিশ্চিন্তি হয়ে চলে যা, আমি বলছি, সব ভালোভাবে হয়ে যাবে!'

'ফিরে এসে তোমাকে দেখতে পাবো তো মা?' যেন কোনমতে প্রশ্নটা ক'রে ফেলে সুরো।

নিস্তারিণী হাসে, 'এই দ্যাখো—মরণকালে তোর জল না খেয়ে যাবো? ছেলে তো একটা খবরও পাবে না, অশৌচ পালা তো দূরের কথা। তাকে খবরও দিস নি কিছু। তোর জলই আমার ভাল। তুই-ই শ্রাদ্ধ করবি এই বলে গেলুম, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। যাই হোক—সেসব এখন ভাবার দরকার নেই, দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড় দিকি, সেখানের কথা ভাব—আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

দরজা পর্যন্ত এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল নিস্তারিণী, মেয়ের মাথায় হাত রেখে ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় দিল।

বৃন্দাবনে গিয়ে অবশ্য আর খুব একটা মন-খারাপের অবসর রইল না। এখানে এত বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন ক'রে রেখেছেন এঁরা—তা সুরো কল্পনাও করে নি। দুজন ঋত্বিক এসেছেন—যজ্ঞ করবেন বলে। পুজো-পাঠ অভিষেকের জন্যে আর দুজন। যে পূজারী নিত্যসেবা করবে ভোগ রাঁধবে—সে তো আছেই। এছাড়া গীতাপাঠ-ভগবৎ-পাঠের জন্যে পৃথক লোক। কাজ শেষ হ'লে একশো আটটি ব্রজবাসী ভোজন হবে—সে আয়োজন আলাদা। সুরোর ঐটুকু বাড়িতে জায়গা হবে না বলে আনন্দবাবা সামনের একটা বাড়িতে রান্নাখাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন কলকাতার

মতো এত বিবিধ বিচিত্র নয়। পুরী, একটা তরকারী, চাটনি, খাস্তার কচুরি ও লাড্ডু। বোঁদের লাড্ডু—চিনিকচ্‌কচে, এই নাকি এদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। পনেরো সের বেসন পনের সের ঘি আর দেড়মন চিনি ধরা হয়েছে লাড্ডুর জন্যে।

অন্য অনেক মিষ্টির কথা তুলেছিল সুরবালা—এই চিনির ডেলা খাওয়াতে ঠিক ওর মন সরছিল না—কিন্তু আনন্দবাবা নিষেধ করলেন। বললেন, 'এ লাড্ডু না খাওয়ালে ওদের মন উঠবে না।' এই বলে তিনি একটি গল্প করলেন, বাংলাদেশের কে রাণী সম্প্রতি এসে বাংলাদেশ থেকে ভাল সন্দেশ রসগোল্লা, এখানকার রাবড়ি পেঁড়া এইসব মিষ্টি করিয়েছিলেন, পুরীর সঙ্গে তিনচার রকম রসনাতৃপ্তিকর ব্যঞ্জনেরও আয়োজন ছিল। খেলও সকলে আনন্দ ক'রে, আশীর্বাদও করল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে নিজেদের মধ্যে সব বলাবলি করতে লাগল—'ছোট্ট রাজত্ব, তার রাণী—কীই বা ক্ষমতা, যাই হোক, যা খাইয়েছে বেশ খাইয়েছে। যথাশক্তি তথাভক্তি—শ্রদ্ধা ক'রে যা আয়োজন করেছে তাই আমাদের ঢের। জয়পুরের মহারাজার মতো পয়সা ওরা কোথায় পাবে বলো!' ঐ ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিনকতক আগেই জয়পুরের মহারাজা ব্রজবাসীদের ডেকে একটি ক'রে থালার মতো খাস্তার কচুরি, আর এক-এক সের ওজনের একটি ক'রে ঐ চিনি-কচকচে লাড্ডু. তার সঙ্গে এক টাকা ক'রে দক্ষিণা দিয়েছিলেন!

আনন্দবাবা হেসে বললেন, 'আর সে খাস্তার কচুরি কি জানো তো, দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলে লৌট্‌কে এসে—মানে ঘুরে এসে তোমার কোলে পড়বে তবু কোথাও এতটুকু ভাঙবে না—সেই হ'ল খাস্তার কচুরি।'

'সর্বনাশ! সেই কচুরিই এখানে হচ্ছে নাকি?'

'আলবৎ! নইলে এরা খুশী হবে কেন! আসলে এদের খাওয়ানোই তো তোমার উদ্দেশ্য, নিজেদের জন্যে তো করছ না? তবে, খেতে খুব খারাপও না. যদি দাঁতে জোর থাকে আর চোয়ালে চিবিয়ে দেখো, খেতে ভালই লাগবে।'

সুতরাং সেইরকমই ব্যবস্থা হ'ল—অতিরিক্ত হিসেবে সুরবালা একরকম জোর ক'রেই রাবড়ির ব্যবস্থা করল। তিন আনা সের উৎকৃষ্ট রাবড়ি—এও যদি ব্রাহ্মণরা না খেলেন তো কি হ'ল!

আরও বোধহয় একটা গোপন কথা এর মধ্যে ছিল। রাজাবাবু নিজে মিষ্টির মধ্যে রাবড়ি আর সন্দেশটা পছন্দ করতেন বেশী। সন্দেশ তো আনানো গেল না—রাবড়িটা অন্তত থাক!

হয়ত সেটা আনন্দবাবাও বুঝলেন, তিনি আর বাধা দিলেন না।

ব্রাহ্মণভোজন দেখে তৃপ্তিই হ'ল সুরবালার। এক একজন ব্রজবাসী একসের দেড়সের ক'রে রাবড়ি এবং পঞ্চাশ-ষাটটা ক'রে বড় বড় লাড্ডু খেলেন. দু'একজন আরও বেশি। মিষ্টিই আগে খেলেন—পরে কচুরি ও পুরী। সেগুলো অবশ্য কেউই বেশি খেলেন না। বেগুন কুমড়ো আলু ও টক্—সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রায় তাবৎ মশলা দিয়ে তরকারী হয়েছিল, খুবই মুখরোচক—কিন্তু সুরবালার মন খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। সাধারণ বাঙ্গালীর খাওয়ায় যেমন মাছের কালিয়া, নিরামিষে তেমনি ছানার ডালনা কি ধোঁকার ডালনা করতে হয়—এ-ই সে জানে, এই রকমই দেখে আসছে সে বরাবর, মানুষকে নিমন্ত্রণ ক'রে এইরকম ঘ্যাঁট খাওয়ানো তার অভিজ্ঞতায় নেই! সব খাওয়ারই একটা আদি অন্ত থাকে—এ কী রকম খাওয়া!...

ঠাকুর প্রতিষ্ঠার উৎসব চুকে যেতেই সুরবালা রওনা দিল। একাই ফিরল সে এবার. সঙ্গে দারোয়ান গিয়েছিল এখান থেকে—তাকে সঙ্গে নিয়ে। কিরণকে রেখে এল। নতুন পুজারী নতুন দাসী—নিত্যসেবাটা নিয়মিতভাবে সুশৃঙ্খলে হচ্ছে, এটা না দেখে দুজনেরই

চলে যাওয়া উচিত নয়। আনন্দবাবাও তাই বললেন। বললেন, 'আমার এবার ছুটি। আর আমি আসতে পারব না, আসবও না। যা করবার এখন থেকে তোমরাই করবে—আমাকে আর টানাটানি ক'রো না।'

খুবই ন্যায্য কথা। অনেক করেছেন তিনি সত্যিই। এই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিপুল ঝামেলা বহন করেছেন। আর তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। তবু, এসব বুঝেও কিরণ একটু ইতস্তত করতে লাগল, 'সেখানে যদি মাসিমার সত্যিই একটা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে?'

সুরো বলল, 'হয়—নানুদা আছে। অন্তত আট-দশটা দিন দ্যাখো। সত্যিই তো—একেবারে নতুন লোক, কিছুই জানে না—আমরাও কিছু জানি না ওদের—কার মনে কি আছে তার ঠিক কি! কদিন একটু সড়গড় হয়ে গেলে বরং আমাদের পাণ্ডাকে একটু খবর নিতে বলে চলে যেয়ো।'

কিরণ আর কথা কইল না। কিন্তু তার যে একটা বিপুল দুশ্চিন্তা মনে বোঝার মতো চেপে বসে রইল—বিদায়কালে মথুরা স্টেশনে তার মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারল সুরো।

কিরণের ইচ্ছে ছিল হাতরাস পর্যন্ত গিয়ে বড় লাইনের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে, সুরবালা কিছুতেই রাজী হ'ল না।

এ কদিন মন্দির প্রতিষ্ঠার উত্তেজনায় মার কথা অত মনে পড়ে নি। ট্রেনে চাপার সংগে সংগেই রাজ্যের দুর্ভাবনা মাথার মধ্যে এসে জুটল। যত ভাবে—তত যেন কান্না পেয়ে যায়। মাকে গিয়ে দেখতে পাবে তো? যদি—যদি না পায়?...মা নেই, পৃথিবীতে সে একা—ভরসার মধ্যে দুটি অনাত্মীয় লোক, পরস্যাপি পর, কিরণ আর নানু—দীর্ঘজীবন এখনও হয়ত সামনে পড়ে; তাও কিরণের মনে শেষ পর্যন্ত কী আছে তা-ই বা কে জানে—কথাটা ভাবতেই যেন বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে, নিজেকে একান্ত নিঃসংগ ও অসহায় বোধ হয়।

যত কাছে আসে, তত চিন্তা বাড়ে। হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে যেতে মনে হ'ল তারই বোধহয় বুকের এই ওঠা-নামাটা বন্ধ হয়ে যাবে এবার—কী যেন বলে ডাক্তাররা, হার্টফেল করা—তা-ই বোধহয় হবে।...বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল, হাত-পা অবশ হয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে হ'ল গাড়ি থেকে বোধহয় নিজেই আর নামতে পারবে না।

কিন্তু বাড়ির সামনে গাড়ি গিয়ে থামতেই প্রথম নজরে পড়ল মাকে। গাড়ির শব্দ পেয়ে হাসি-হাসি মুখে ছুটে এসেছে।

কিন্তু তবু—আনন্দ যতটা হ'ল ততটা আশ্বস্ত বোধ করতে পারল না। হাসিমুখ ঠিকই, মেয়ের জন্যেই উৎকণ্ঠা সে মুখে, তবু তার অপরিসীম শুষ্কতা ও বিবর্ণতা ঢাকা পড়ে নি। শরীর যে ভালো নেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখল, পা দুটো কাঁপছে থরথর ক'রে—কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?...ওমা, এ যে জ্বর!'

'হ'ল তো! এই গাড়ির কাপড়ে ছুঁয়ে বসে রইলি তো! দ্যাখো, আবার কাপড় ছাড়তে হবে এখন!'

'হ্যাঁ, কাপড় ছাড়তে হবে না হাতী, তীর্থ থেকে আসছি—আমাকে ছুঁলে এখন পুণ্যি। কবে থেকে জ্বর হয়েছে—ডাক্তার ডেকেছিল নানুদা?'

'সে কি আর অনুষ্ঠানের ত্রুটি আছে! পরশু জ্বর এসেছে, পরশুই কোথা থেকে এক ডাক্তার ধরে এনে হাজির!'

'তা ডাক্তার কি বললে?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে সুরো।

'কী আর বলবে! ম্যালেরিয়া জ্বর। গোচ্ছার কি মিকচার আর পুরিয়া দিয়ে গেল! ও আমি খাবও না, তার কথাও নেই।'

'সে কি! অসুখ হয়েছে, ওষুধ না খেলে চলবে কেন।...বা রে!'

সে কথার উত্তর দিল না নিস্তারিণী. আসলে তার বোধহয় বেশী কথা বলার শক্তিও ছিল না। সে আর দাঁড়াতেও পারল না, আস্তে আস্তে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। গাড়ির কাপড়ের ছোঁয়া লেগেছে—সে কথাটাও খেয়াল রইল না।

শুয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল নিস্তারিণী। খানিক পরে, আবার যখন চোখ খুলতে পারল, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, তা কিরণ আসে নি? কিরণ?'

'না মা।'

'ওমা, কেন রে?...তাকে যে আমার বড্ড দরকার। তাকে রেখে এলি কেন?'

'সেখানে যে সব এখনও অগোছালো হয়ে পড়ে, নতুন লোক নতুন ব্যবস্থা, একজনও না থাকলে চলবে কেন? নিত্যসেবার ব্যাপার—ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঊনকোটি চৌষট্টি রকমের ফ্যাচাং—কটা দিন না দেখে কি দুজনেই আসা চলে?'

নিস্তারিণী যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে, 'তাই তো! তা কবে আসবে সে?'

'আট-দশদিন বাদেই এসে পড়বে।' সুরো উত্তর দেয়, তার পরই খট্‌কা লাগে একটা, 'কেন বলো তো? তাকে তোমার কী এত দরকার?'

সে কথার স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না. 'আট-দশ দিন! অতদিন কি যুঝতে পারব?' অস্ফুট. ক্লান্ত কণ্ঠে কথা কটা বলে আবার চোখ বোজে নিস্তারিণী।

খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখে তখন আর বকায় না—বরং যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না তার আদৌ। কী সব বলছে মা? সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর. তাতেই বা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল কেন?

নানু সে সময়টা ছিল না, একটু পরেই এসে পড়ল ; সঙ্গে একটি আধাবয়সী মেয়েছেলে। ওকে দেখে বললে, 'এসেছিস? ভাল হয়েছে।...একে নিয়ে এলুম. জননীর কাছে নিয়ত একজনের থাকা দরকার। তুই কবে আসবি তা তো জানতুম না। আর তুই-ই বা একলা কি করবি! তুই যদি দিনের বেলা দেখিস—এ মেয়ে রাত্তিরটা দেখতে পারবে। আমার জানাশোনা—লোক ভাল। ওর ওপর ভরসা করতে পারিস. রুগী ফেলে রেখে ঘুমোবে না—'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি নানুদা? ডাক্তার নাকি বলেছে ম্যালেরিয়া জ্বর—তবে এমন নেতিয়ে পড়ল কেন?'

'জননী এবার চলল—আর কি! তোকে গুডবাই করার জন্যেই কোনমতে টিকে আছে। বেটির এখন ভাবনা—নিমতলায় কোথায় ওর কত্তা পুড়েছিল—সেই শয়ের ঠিক ওপরে না হোক. আন্দাজে যেন অন্তত তার কাছাকাছি পোড়ানো হয়। কিরণ এসেছে তো? আমিও ছিলুম সে সময়ে—তবু আমার ওপর পুরো ভরসাটা হচ্ছে না. দুজনে মিলে যদি মনে করতে পারি ঠিক জায়গাটা—!'

সুরবালা আর পারল না সামলে থাকতে. প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

'কিন্তু—কেন. কেন নানুদা? বলছে যে সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর—তাতেই এমন হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'ম্যালেরিয়া তো বলছে—এধারে নাড়ি ধরে ডাক্তারের যে নাড়ি ছেড়ে যাবার দাখিল। আমি কি হাল ছাড়ছি—ডাক্তারই যে ছেড়ে দিয়েছে। বলছে. আর একটুও বোঝবার ক্ষমতা নেই আস্তে আস্তে তেল ফুরিয়ে যাওয়া পিদিমের মতো নিভে আসছে এবার।...নে, এখনই অত কান্নাকাটি করার মতো কিছু হয় নি. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আর

যদি শেষ সময়ই এসে থাকে, কান্নাকাটি না ক'রে সেবা কর, আর যাতে কোন অনুশোচনা না থাকে।...ওঠ্‌ দিকি, চোখ মোছ,—কাপড়চোপড় ছাড়, চান কর। জলটল খেয়ে মার কাছে গিয়ে বোস। কি বলবার আছে, কি খেতেটেতে চায়—খোঁজ কর। এ তো ভালই হচ্ছে রে, তোর বন্ধন কাটছে। আর বেশি বেঁচেই বা ওর কি লাভ হ'ত বল, আর তো কোন সাধ-আহ্লাদ মেটার আশা রইল না। সে ছোঁড়াটাও যদি ফিরত—এখনও হয়ত তার ঘরকন্না পাতার সময় যায় নি। সে মাগীকে নিয়েও যদি এসে থাকত—তাহলেও বোধহয় জননী আর আপত্তি করত না। একটা নাতি দেখার বড্ড শখ ছিল বুড়ির!'

প্রতিটি কথাই বুকে কেটে কেটে বসে। কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটের মতোই দুঃসহ মনে হয়, জ্বালা করে বুকের কাছটায়। তবু প্রতিবাদও করতে পারে না। কথাগুলো মর্মান্তিক সত্য, একটা কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই।...

নানুর কথাই শোনে সুরবালা। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে শক্ত ক'রে নেয়। যাওয়ার সময় যদি এসেই থাকে—এ সময়টুকু আর নষ্ট করা ঠিক নয়। বিপুল ঋণ তার মায়ের কাছে--সাধারণ অন্য মেয়ের থেকে অনেক বেশি। সে ঋণ শোধ হ'ল না, হবেও না, তবু এই বিদায়ের সময়টা সেবা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যতটা সম্ভব মধুর ক'রে দেওয়া যায় তা সে দেবে। অনেক আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে মায়ের, অনেক কল্পনার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়েছে—সে বেদনা নিয়েই যেতে হবে তাকে—তার ওপর এই যাত্রাকালটায় কোন তিক্ততা নিয়ে না যেতে হয়।...

সে স্নান ক'রে একটু শরবৎ খেয়ে মার কাছে এসে বসে। যে নতুন মেয়েছেলেটি এসেছে, কদমের মা, তার কাছ থেকে পাখাটা নিয়ে তাকে মুখ হাত ধুয়ে স্নান ক'রে আসতে বলল। মা কথা কইতে পারছে না, চোখ বুজে ইঙ্গিতে মাথাটা দেখিয়ে হাতটা নাড়ছে—বাতাস করার ভঙ্গীতে। অর্থাৎ মাথায় বাতাস করতে বলছে। হেঁট হয়ে দেখল সুরবালা, বোধহয় জ্বরটা ছাড়ছে, গা পাথরের মতো ঠান্ডা, গলায় কপালে অল্প অল্প ঘাম।...

খানিক পরে চোখ খুলল নিস্তারিণী, সম্ভবত উঠে নিচে যাওয়া আর এত কথা বলার ক্লান্তিতেই এমন চোখ বুজে নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল। এখন আস্তে আস্তে একটু অবসন্ন কণ্ঠেই বলল, 'তুই কিরণকে একটা জরুরী তার পাঠিয়ে দে সুরো, আট-দশদিন দেরি করা চলবে না।'

'তোমার ঐ এক বাজে চিন্তা। মিছিমিছি আমাকে ভয় দেখানো শুধু। এই তো জ্বর ছেড়ে গেছে, গা ঠান্ডা, ঘাম দিচ্ছে—' মায়ের কপালে নিজের গালটা চেপে ধরে জবাব দিল সুরো।

নিস্তারিণী হাসল একটু। তেমনি ক্লান্তভাবেই বলল, 'এবার আর তোর মাকে উঠোধানে পত্তি করতে হবে না—ভয় নেই। গা ঠান্ডা শুধু জ্বর ছাড়ার নয়—নাড়িও ছাড়ছে এবার। সেদিন ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝেছি। তাছাড়া নিজেও বুঝতে পারছি, এমন হাক্লান্ত হয়ে জীবনে পড়ি নি, এই তো সামান্য একটু জ্বর, তাতে এমন হাত-পা ছাড়বে কি!...এবার আর মাকে ভুলতে পারবি না খুকী। তবে তাতে ভয় পাবারই বা আছে কি! মরতে তো হবেই একদিন। মা কি আর কারুর চিরকাল থাকে! বয়সও তো হয়ে গেল ঢের—আর কি!'

বলতে বলতেই চোখ বোজে আবার। সেই সময় গিরিধারী কি কাজে সেদিকে এসেছিল, তাকে ডেকে চুপি চুপি বলে দেয় সুরো—নানুবাবুকে বলে ডাক্তারকে একটু খবর দিতে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় মার শরীর ভাল নয়।

সেইটুকু সামান্য কথাও নিস্তারিণীর কানে যায়। বলে, 'কেন ও সব হাঙ্গামা করছিস মা। মিথ্যে মিথ্যে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা! ডাক্তারের বাবা এলেও আমাকে আর সারাতে

পারবে না। রোগে ধরলে সারে—এবার এ যমে ধরেছে। ও-ই তো একগাদা ওষুধ পড়ে আছে। আবার এসে হয়ত কতকগুলো ওষুধ দেবে—শুধু শুধু পয়সা অপচয় করা।'

তারও খানিক পরে আবার চোখ খোলে। বলে, 'একটা কথা রলব মা? আর হয়ত সময় পাব না। এখনই কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।...বলেই ফেলি। তোর যদি অসুবিধে হয়—আমি বলছি বলেই করতে যাস নি। বলছিলুম, তোর এসব বেচে-কিনে—এই দুখানা বাড়ি বেচে যদি তোর ঠাকুরসেবার মতো টাকা উঠে যায়—মানে সেই টাকার সুদে চলে যাবে মনে করিস—আগের ঐ ছোট বাড়িটা না-ই বেচলি? ঐ আমার জীবনে প্রথম নিজেদের বাড়িতে আসা, বড্ড আনন্দ হয়েছিল রে। আমি বলি কি, ওপরের একটা ঘর রেখে বাকীটা যেমন ভাড়া দেওয়া আছে তেমনি থাক।...কখনও-সখনও তোরই যদি কলকাতায় আসার দরকার হয়—কোথায় উঠবি তার তো ঠিক নেই। এমন কোন আপনার লোকও নেই—যার কাছে এসে উঠতে পারিস।...হয়ত শেষ পর্যন্ত হোটেলে এসে উঠতে হবে। এ একখানা ঘর থাকলে—নিজের মতো এসে থাকতে পারবি।...আর, আর কি জানিস, সে ছোঁড়াটার কথাও ভাবি—যদি কখনও নিরাশ্রয় হয়ে এসে পড়ে—তবু একটা মাথা-গোঁজার জায়গা থাকবে। সে আমাকে ভুলে গেছে—আমি তো তাকে পেটে ধরেছি, আমি ভুলি কি ক'রে!'

সুরবালা ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, 'তাই হবে মা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, খোকা যদি তেমনভাবেই ফেরে, শুধু আশ্রয় নয়—ও বাড়ি তাকেই লিখে দেব।'

এতক্ষণ এতগুলো কথা বলার ক্লান্তিতে আবার ঝিমিয়ে পড়েছিল নিস্তারিণী. খানিকক্ষণ সময় লাগল সেটা কাটিয়ে উঠতে। তারপর বলে উঠল, 'না না। তুই আগে হিসেব ক'রে দেখিস! তোর ঠাকুরসেবার ক্ষেতি ক'রে করতে বলছি না কিছু।...যদি কুলোয় তবে।...তাই করিস, আর...যদি সে না ফেরে কিম্বা তার দরকারে না লাগে, তোরও যদি কাজ চলে যায়—বিশ-পঁচিশ বছর দেখে বাড়িটা বরং নানুর ছেলেকে দিয়ে যাস। ঐ তো বাউণ্ডুলে ভবঘুরে—বৌ-ছেলেকে কখনও দেখল না, কিছু সঞ্চয়ও করল না। বাপ মা বেঁচে আছে তাই ভায়েরা দেখছে—এরপর কি আর দেখবে? ছেলেটা নাকি লেখাপড়ায় ভাল, পাস্ ক'রে কলেজে পড়ছে।...দেখিস, যা ভাল বুঝিস করিস।...আমি বলছি বলে করিস নি, তোকে কোন বন্ধনে রেখে যেতে চাই না।'

আবারও চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুরো আঁচল দিয়ে গলা আর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অনেক কথা বলেছ মা, এখন থাক। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি। বরং এইবার একটু খাও কিছু। শুনলুম তো বার্লি আর ছানার জল দিতে বলেছে ডাক্তার—একটু দুধ-বার্লিই খাও না। পেট তো ফাঁপ নেই, জ্বরও ছেড়েছে, মিছিমিছি টাঙিয়ে থেকে লাভ কি?'

নিস্তারিণী ইঙ্গিতে নিরস্ত করে। কথা বলতে আরও কিছুক্ষণ দেরি হয় তার: বলে. 'দাঁড়া, কথাগুলো সেরে নিই সব। এখনই কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—বেবভুল হয়ে পড়ছে সব—তা ছাড়া জিভও এড়িয়ে আসছে। এর পর বোধহয় বাক্যিই হরে যাবে একেবারে।'

তারপর কোনমতে একটা হাত তুলে সুরোর হাতের ওপর রেখে বলে, 'তুই যা দিতিস আমাকে, তা থেকে অনেকগুলো টাকা জমিয়েছি। আমার পুরনো প্যাঁড়াটার মধ্যে পুঁটলি করা আছে—আটশো টাকার মতো হবে। ঐটেই ছেরাদ্দে খরচ করিস। খোকার জন্যে রাখতে হবে না। সে তো এখন রোজগার করছে শুনেছি। আর যদি কখনও দরকার হয়—তুই তাকে ফেলবি না তা জানি।...আর যদি পারিস—যাওয়া-আসার পথে গয়াটা সেরে ফেলিস আমার। আমাদের দুজনেরই। তুই তো এই সন্ন্যাসী হয়ে গেলি বলতে

গেলে—সে তো দুয়ের বার নৈরেকার—কে আর বছর বছর বছুরকী করবে? সে তোকে নিজের মেয়ে বলেই জানত, আমি তো চিরদিনই তাই মনে করি—তুই না মনে করালে আমার মনেই পড়ত না যে তোকে পেটে ধরি নি। তুই যা ক'রে থাকিস—তোর পিণ্ডিই আমায় ভাল।'

ক্রমশ গলা আরও ঝিমিয়ে আসে। তবু যেন প্রাণপণ চেষ্টাতেই কথাগুলো সেরে নিতে চায় নিস্তারিণী। বলে, 'আর মতিকে দেখিস। ওর পয়সা খাবার লোক বেস্তর—দেখবার কেউ নেই। তুইও তো বাক্যিদত্ত আছিস। যেখানেই থাকিস, মরণাপন্ন শুনলে এসে সেবা করিস। ওর দৌলতেই তোর সব—রাজাবাবুকেও পেতিস না, অত যত্ন ক'রে গান শিখিয়ে আলাদা পসার ক'রে না দিলে। তোকে ভালও বাসে খুব।'

আর কথা বলতে পারে না। হয়ত অনেক বেশীই বলে ফেলেছে। চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে থাকে আর ইশারা করে মাথায় হাওয়া করতে।

সুরোর কথাতে নানু একজন বড় ডাক্তার ডেকে আনে। তিনি এসে দেখে মুখ বিকৃত করেন, বলেন, 'হার্টের অবস্থা খুব খারাপ—কিছুই আর নেই। পুরনো হাড় বলেই তাই—নইলে এ অবস্থায় বোঝবার কথা নয়।...ওষুধ দিয়ে আর লাভ নেই কিছু। খাওয়া? যা খাওয়াতে পারেন খাওয়ান। দুধ গঙ্গাজলই দিন। তাও কি পেটে যাবে?'

সুরো ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কিন্তু রোগটা কি ডাক্তারবাবু?...সামান্য জ্বর হয়েছিল—এ পাড়ার ডাক্তারবাবু তো বললেন ম্যালেরিয়া—তবে?'

'রোগটা কিছু নয় মা এ ক্ষেত্রে। ও—বলতে পারেন চিত্রগুপ্তের ছুতো। হার্টটা অনেকদিন ধরেই ড্যামেজ্‌ড্ হয়ে এসেছিল—অত কেউ লক্ষ্য করেন নি, উনিও বোঝেন নি বোধহয়। তাছাড়া রোগী একদম ফাইট করতে পারছে না যে! মনে হচ্ছে যেন বাঁচবার ইচ্ছেও নেই ওঁর।'...

বাকী দিন এবং সারারাত একভাবে কাটল। দেহ পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে—অথচ প্রচুর ঘাম হচ্ছে। এক মিনিট মাথায় বাতাস করা বন্ধ হ'লেই—সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও—যেন ছট্‌ফট ক'রে উঠছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কষ্ট হচ্ছে। এক-আধ চামচ দুধ জোর ক'রে খাওয়াল নানু—কিন্তু শেষের দিকে তাও খেতে চাইল না, খাওয়াতে গেলেই ভুরু কোঁচকায়, ঠোঁট টিপে থাকার চেষ্টা করে।...

পরের দিন দুপুরের দিকে হঠাৎ একটু ভাল বোধ হ'ল। চোখ খুলে চাইল। নানু কোথায় জিজ্ঞাসা করল। তিন-চার চামচ দুধও খেল। নানু এক কবিরাজকে ডেকে এনেছিল, তিনি মকরধ্বজ দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন মধু দিয়ে মেড়ে জিভে লাগিয়ে দিল সুরো, তাতেও আপত্তি করল না। তারপর বলল, 'কিরণকে তার করেছিলি খুকী?'

কতকাল পরে মা তাকে খুকী বলছে।

হঠাৎ ওর বাল্যের নামটাই বা মার মনে পড়ছে কেন বার বার?

কান্নায়-ধরে-আসা গলা সহজ করার চেষ্টা ক'রে সে বলে, 'হ্যাঁ মা, তখনই করেছি।'

'হ্যাঁ রে, তাকে বড় দরকার। নানু যদি ঠিক মনে করতে না পারে? পাঁচ ঝঞ্চাটে থাকে সব্বক্ষণ। কিরণের খুব মাথা ঠাণ্ডা—মনেও থাকে খুব। তার ঠিক স্মরণ আছে—ওঁকে কোথায় শুইয়েছিল—তোর গুষ্টিকে।'

বিকেলের দিকে আরও একবার যেন চেতনা ফিরে এল নিস্তারিণীর। ইঙ্গিতে সুরোকে কাছে ডাকল। সুরো মুখের কাছে কান নিয়ে আসতে চুপি চুপি বলল, 'সেই গানটা মনে আছে তোর? সেই যে তোর ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে শুক্কুরবার ক'রে আমাদের ওখানে সব আসত—? তারা গাইত—"এ ভাবের মানুষ কোথা থেকে এল—তার নাইক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে হরি বলো।" মনে থাকে তো গা না রে একবার। উনি খুব

ভালবাসতেন, তোর গুষ্টি। আহা, কত তখন মন্দ বলেছি—'

মনে আছে সুরবালার। সেও কতদিন বাবার সংগে গেয়েছে। বাবা ভাল গাইতে পারতেন না, তবু সুরের আদলটা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিল সে।

সে অদম্য মনের জোরে দাঁতে দাঁত চেপেই—অশ্রুবিকৃত কণ্ঠকে সহজ ক'রে আনার চেষ্টা করল। শুধু গান ভাল লাগার প্রশ্ন নয়, এ মায়ের এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত—তা সে বুঝেছে। এ গান গাইতেই হবে তাকে।...

শুনতে শুনতে কী যেন এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে প্রসন্ন হয়ে উঠল নিস্তারিণীর মুখ। গান শেষ হ'তে প্রায় অবশ শিথিল হাতখানা তুলে সুরোর মাথায় দেবার চেষ্টা করছে দেখে নানুই তাড়াতাড়ি সুরোর মাথা নামিয়ে এনে হাতখানা দিয়ে দিল তার ওপরে।

অতি সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটল নিস্তারিণীর মুখে। ঠোঁটটাও মৃদু নড়ল কয়েকবার। হয়ত আশীর্বাদই করল সে মেয়েকে। কিম্বা মেয়ে ও নানু দুজনকেই।...

সেই যে চোখ বুজল নিস্তারিণী আর খুলল না। চোখও খুলল না, কথাও বলল না। গলার কাছে কাঁপনটা দেখে মনে হ'ল—যাকে অন্তিম শ্বাস বলে—তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু আর কোন কষ্ট বোঝা গেল না। সেই অবস্থাতেই আরও একটা দিন পড়ে থেকে, কিরণ এসে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক আগেই এখানকার সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। যেন কিরণ ঠিক সময় এসে পড়বে এইটে বুঝেই—নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৩৭ ॥

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। যুবতী সুরবালা প্রৌঢ়া হয়েছে। সে প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্যে এসে পৌঁচেছে একদা। নিস্তারিণী, মতি, রাজাবাবু, নানু—কলকাতার জীবন—যেসব এখন স্মৃতি-রোমন্থনের বস্তু। সে যেন কতকালের কথা, কোন্ পূর্বজন্মের। আজকাল যেন ভাল ক'রে মনে পড়ে না, গোলমাল হয়ে যায় সব তিথি তারিখ।

ইতিমধ্যে সুরবালার জীবন পাল্‌টেছে, জীবনধারা পাল্‌টেছে, বাসস্থান পাল্‌টেছে—সেই সংগে জীবন সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীও। একই জায়গায় একই ছকে বাঁধা জীবন যাপন করতে করতে সেদিনের সুরবালা কখন বিদায় নিয়েছে, তা বৃথা সুরবালা বুঝতেও পারে না। সে যে একটু স্বার্থপর, একটু অবিবেচক এমন কি একটু কৃপণও হয়ে পড়েছে, তাও খবর রাখে না সে।...প্রথম জীবনের সেসব স্বপ্ন, সে সাধনা, আদর্শ ও আবেগ সুদূর স্মৃতির মেঘলা দিগন্তে মিলিয়ে গেছে বলেই নিজের তাতে অবাক লাগে না—নইলে হয়ত চমকে উঠত, হয়ত দুঃখিত হ'ত।

কলকাতার সংগে সম্পর্ক ঘুচে গেছে দীর্ঘকাল। নতুন দুটো বাড়ি বিক্রী ক'রে দিয়ে টাকা জমা ক'রে দিয়েছে সরকারের কাছে। সে টাকা ছাড়াও আরও দিয়েছে অবশ্য। সুদ কম—আরও কম, কিছু বেশী সুদে যেসব জায়গায় টাকা খাটানো যায়—সেসব জায়গায় জমা রাখতে সাহস হয় নি সুরবালার। কিরণও বারণ করেছে। সরকারকে ট্রাস্টী করবার

জেদও তার। তা নইলে আইনের ফাঁকিতে পরবর্তী সেবাইৎরা মূলধন তুলে নিয়ে উড়িয়ে দেবে হয়ত। ঠাকুর কিছুই করতে পারবে না। আর ঠাকুরের এত গরজই বা কি?

পুরনো—ওর নিজের রোজগারের টাকায় কেনা বাড়িটা বিক্রী করে নি। তবে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাও করে নি। এখানের বড় বন্ধন ছিল মা—মা তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে যখন—অভিমান ক'রেই হয়ত, কতকটা ইচ্ছে ক'রেই—তখন আর এখানে কোন পিছুটান রাখতে রাজী হয় নি সে। শ্যামবাবু নয়, কিরণের পরিচিত আর এক অ্যাটর্নীকে দিয়ে পাকা দানপত্র ক'রে দিয়েছে নানুর ছেলের নামে। শুধু একটি শর্ত আছে—সুরবালা যতদিন বাঁচবে—একখানা ঘর ভোগ-দখল করতে পারবে। দানপত্রে সে শর্তের উল্লেখ নেই, শর্তাধীন দানপত্র নাকি অনেক সময় গ্রাহ্য হয় না—নানু তার তখনও নাবালক ছেলের হয়ে পাল্টা একটা অঙ্গীকারনামা রেজেস্ট্রী ক'রে দিয়েছে। গণেশের জন্যে এ কাজ ফেলে রেখে লাভ নেই, সুরবালা ভাল ক'রেই ভেবে দেখেছিল সেদিন। কোন্ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে এখানে বিষয়ের বন্ধন রেখে যেতে পারবে না। যদি সত্যিই কোন দিন গণেশ তেমন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে—তার কাছেই যেতে পারবে। সে যতদিন আছে, ভাইকে একমুঠো তার কিশোরীমোহনের প্রসাদ দিতে পারবে। তাছাড়া যে ঘরে তার দখল রইল —তেমন দরকার পড়লে সে ঘরে তার ভাইও থাকতে পারবে। তবে গণেশ আর আসবে না—সুরবালা জানে। এলেও সেই স্ত্রীলোকটাকে নিয়ে যদি কোন দিন এখানে বাসা বাঁধবার সামর্থ্য হয় তবেই আসবে। কিম্বা সে যদি মরে যায়—দিশেহারা অবলম্বনহারা হয়ে হয়ত কোন দিন ভগ্নদেহে ফিরে আসতে পারে—সে ক্ষেত্রে তো বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

না, মধ্যে অল্প কয়েকটা দিন ছাড়া সে ঘর ব্যবহার করার দরকার হয় নি সুরোর। গণেশ দেশে ফিরেছিল ঠিকই—তবে নিরাশ্রয় হয়ে ফেরে নি। সেখানেও সুরবালার অনুমানই অভ্রান্ত হয়েছে—সার্কাসের মালিকানা মায় সাজ-সরঞ্জাম বিক্রী ক'রে মোটা টাকা নিয়েই দেশে ফিরেছে। একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে থেকে বরানগর না শ্যামনগর কোথায় একটা জমি কিনে সেও একটা ঠাকুরবাড়ি করেছে। হিমিকে নিয়েই বাস করে সেখানে। বৃন্দাবনে গিয়ে দিদির সঙ্গে দেখাও ক'রে এসেছে—কিন্তু সেও মোটা প্রণামী দিয়ে বড়মানুষিই দেখিয়ে এসেছে—প্রার্থী হয় নি। ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠার সময়ে দিদিকে আসতে লিখেছিল—সুরবালা আসে নি। এদিকে আসার আর তার প্রয়োজন নেই—ইচ্ছেও নেই। তীর্থ করতে বার-কতক হাওড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে—কিন্তু তবু কলকাতায় থাকার ইচ্ছে হয় নি। বন্ধন বলতে, মায়া বলতে যা কিছু নানুর ওপরই—সে যতদিন বেঁচে ছিল, এদিকে এলে আগে চিঠি দিত; নানু এসে হাওড়া স্টেশনে দেখা করত। অবশ্য অনেকবার চেষ্টা করেছে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে—সে নাকি শেষের দিকে ঘরবাসীই হয়েছিল—কিন্তু তাও যায় নি সুরবালা। কলকাতা তার জীবনের স্বর্গ, জীবনের স্বপ্নলোক—সে স্মৃতিতেই থাক, আর তাকে দেখে দরকার নেই।

তার এই বাড়ি লিখে দেওয়াতে নানু ঘোর আপত্তি করেছিল, আড় হয়ে পড়েছিল বলতে গেলে বাধা দিতে—কিন্তু সুরবালা ওর আপত্তিতে কান দেয় নি। বলেছিল, 'তোমার জননী আমার মায়ের হুকুম! আমি কি করব বলো! মায়ের কাছে আমার কত ঋণ তা তো তুমি জানো নানুদা, তোমার কাছে তো কথাই নেই—এত স্নেহ মা-বাবা ছাড়া কারও কাছ থেকে পাই নি,—এই এক ঢিলে যদি দুই পাখী মরে, সেই চেষ্টা আর কি! বুঝছ না?...অবশ্য এটা ঠাট্টা ক'রে বলছি, এতে তোমার কি মায়ের ঋণ শোধ হ'ল ভাবব—এমন বেইমান আমি নই—এত বেআদবিও নেই আমার—তবু, সামান্য সুদ কিছু শোধ ক'রে যাই না?...টাকা নয়—মায়ের হুকুম তামিলই সেই সুদ!'

তারপর বলে, 'সত্যি কথা বলতে কি, ও বাড়ি মায়ের জন্যেই কেনা আরও। ওটা

মায়েরই বাড়ি ধরো। তাঁর বাড়ি, তিনি তোমাকে দিচ্ছেন—তুমিও তাঁকে মা-জননী বলতে—তবে আর এত কিন্তু হচ্ছ কেন?'

অগত্যা নানুকে রাজী হতে হয়েছিল। তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেছিল, 'তুই বেশ গুছিয়ে বলতে পারিস মাইরি! লেখাপড়া শিখে ব্যারিস্টার কি কৌঁসুলী হলে তারক পালিতের অন্ন হ'ত না। কেমন সব জলবৎ তরলং ক'রে ছেড়ে দিস।...হুঁ, তাহলে বুড়ির মনে এই ছিল শেষ পর্যন্ত? বেটি কি পাজী দেখেছ!...এমন জানলে মরবার সময় কুটডাস্ট একটু বেশী ক'রে নিয়ে নিতুম!...যাঃ, জননীর স্নেহের দান মাথায় ক'রেই নিলুম। লোকে বলবে এই লোভেই পড়ে থাকত—এই তো? মরুকগে, বলে বললই বা!...

নানুও আর নেই। তার ছেলে এখন ঐ বাড়িতেই বাস করে। বিয়ে-থা করেছে। কোথায় যেন কী একটা ভাল চাকরিও করে। সেও অনেকবার লিখেছে পিসীমাকে এসে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে তার সংসারে—সুরবালার মন সরে নি। বরং সে নানুর লিখে দেওয়া সেই অঙ্গীকার-নামা আর ঐ ঘরের চাবি নানুর ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে। লিখেও দিয়েছে পরিষ্কার যে তার জীবদ্দশাতেও ও ঘরের ওপর কোন দাবী-দাওয়া রইল না আর।

তবে একবার এসেছিল অবশ্য। কদিন ছিলও ঐ ঘরে।

সেই প্রথম আর সে-ই শেষ।

সেও অবশ্য গোড়ার দিকেই। মা মরবার বছর-দুই পরেই।

মতির অসুখের খবর পেয়েই এসেছিল ঋণ শোধ করতে। বাগ্‌দত্ত ছিল সে—একবার নয় বার বার প্রতিজ্ঞা করেছিল যে—মরণকালে সে মতিকে দেখবে, সেবা করবে। সেকথা সে ভোলে নি। মায়েরও শেষ আদেশ—'মতিকে দেখিস।' গুরুঋণ মাতৃঋণ—তা ছাড়াও কিছু ছিল—স্নেহের ঋণ। যা-ই করুক মতি, মতি যে তাকে ভালবাসে তা সুরোও জানত।

খবর দিয়েছিল অবশ্য নানুই। মতির খবর দেবার অবস্থা ছিল না। যারা তার আশে-পাশে ছিল—আত্মীয়-স্বজন—তারা তো দেবেই না। তাদের ভয় শেষকালে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে যদি বিষয়সম্পত্তি সব লিখিয়ে নেয়! মতি নাকি বলেছিল অনেকবার যে, 'তাকে একটা খবর দে, সুরো আমার ধাত জানে—সে যেমন সেবা করবে, তেমন কেউ পারবে না। সে পয়সার লোভে বসে নেই রে—পয়সার লোভ থাকলে আমার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করতে পারত।'

কিন্তু এসব ছেঁদো কথায় তারা—মানে বোনপো-বোনঝির দল—বিশ্বাস করে নি। রক্তের তেজ থাকতে অমন অনেকেরই টাকা-পয়সায় অনাসক্তি থাকে—বয়স বাড়লেই বুঝতে পারে ও জিনিসের কদর। এককালে পয়সার লোভ ছিল না বলে এখনও থাকবে না—একথা তারা মানতে রাজী নয়। বিশেষ মতির সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল, যে একবার পয়সা নেড়েছে ঘেঁটেছে—এর মর্ম জানে—এতখানি সম্পত্তি দেখলে তার লোভ হ'তে বাধ্য।

নানুর চিঠি পেয়েই সুরবালা ছুটে এসেছিল অবশ্য। দ্বিধা করে নি দেরি করে নি। সেই সময়েই নানুর বাড়ির 'অর্থাৎ তার প্রাক্তন বাড়ির ঘরখানা কাজে এসেছিল। সেই-খানেই মালপত্র নামিয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে গিয়েছিল মতিকে দেখতে। তারপর অবশ্য আর ফেলে আসতে পারে নি।

সেবারের বাতের মতোও নয়—আরও খারাপ অবস্থা। ছেঁড়া চিরকুট-ময়লা বিছানায় পড়ে আছে, সেই অবস্থাতেই অসাড়ে প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলো হয়ে যাচ্ছে, তা সাফ করার কোন লোক নেই—গায়ে শুকিয়ে থাকছে মল। সরকারী আইনে নাকি মতির সম্পত্তি কারও পাবার কথা নয়, উইল ক'রে না গেলে সরকারেই চলে যাবে সব। কী সে আইন মতি জানে না—সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভবত ওর বোনঝিরাই বলেছে ওকে। ফলে মতি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল ক'রে দিয়েছে বোনঝিদের আর বোনপোদের। সেই অধিকারে তারা

এসে চেপে-চুপে বসেছে। তাদের অবস্থাও খারাপ নয়, মতির বোনেরও দুখানা বাড়ি কলকাতায়, বিস্তর গয়না আর কোম্পানীর কাগজ। তবে সে মতির বিষয়ের কাছে নয়। মতির যে এত আছে—তা আত্মীয়রাও জানত না। প্রথম প্রথম দূর সম্পর্কের যারা এই শহরেই থাকে—তারাও যাতায়াত শুরু করেছিল কিন্তু উইল করা হয়ে গেছে শুনে আর কেউ আসে না। যারা এসে গেড়ে বসেছে, তাদের হৈ-হল্লা আমোদ স্ফূর্তির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরঘর তালাবন্ধ, পুজারীকে মাইনে দেয় নি—সে আর আসে না। পাড়ার যারা কিছু কিছু সাহায্য পেত, আসা-যাওয়া খোঁজ-খবর করত, তাড়া খেয়ে তারাও আসা বন্ধ করেছে। ফলে মতি এখন নিজের ঐশ্বর্যের অন্ধকূপে বন্দী।

বাড়িতে বিস্তর নগদ টাকা ছিল—অবিশ্বাস্য রকমের মোটা অঙ্ক তার—তা নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম প্রথম একটা সন্দেহ অবিশ্বাস মনকষাকষি দেখা দিলেও পরে মিটিয়ে নিয়েছে ভাগাভাগি ক'রে। প্রত্যেকেই এত পেয়েছে যে, কেউ কারও চেয়ে কম পেয়েছে কিনা তাও অত হিসেব করা প্রয়োজন বোধ করে নি। মদ-মাংস খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোড় চলেছে বাড়িতে, সর্বদাই যেন উৎসব লেগে আছে—শুধু যার এই সমস্ত, সে-ই পড়ে আছে ময়লা মেখে, দীন-ভিখারীর অধম শয্যায়!...অন্তিম শয়নেই শুয়েছে এবার, তা দেখেই বুঝতে পারল সুরো—এযাত্রা আর ওঠার আশা নেই। রোগ নয়—যমেই ধরেছে। অবশ্য বয়সও হয়েছে ঢের, আশির কাছাকাছি হ'ল কিম্বা আরও বেশী। আর বেঁচেও লাভ নেই, যাওয়াই ভাল। ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে মানুষ ভোগ করার জন্যেই। ভোগের সহস্র উপাদান যখন চারিদিকে সাজানো থাকে অথচ ভগবান সেই সম্ভোগের শক্তিটা কেড়ে নেন—তখন বেঁচে থাকাটা অকারণ শুধু নয়—দুঃসহ হয়ে ওঠে। বড় করুণ সে অবস্থাটা। বড় বিড়ম্বনাময়।

তবু, যে মানুষটা চিরকাল শরীরে খেটে পয়সা রোজগার ক'রে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করল, বুড়ো বয়স অবধি যে অবসর নেয় নি আরাম করে নি—তার এই শেষ সময়টায় একটু আরাম, একটু শান্তির ব্যবস্থা করা যায় না? এ কুবেরের ভাণ্ডারে কতটুকু কমতি হ'ত তাতে?

সুরবালাকে দেখে পুরনো ঝি-রাঁধুনীর দল সজল চোখে এসে ঘিরে ধরল। তাদের মুখ থেকেই সে শুনল ব্যাপারটা। বাকীটা নিজের চোখেই সে দেখল। মার্বেল পাথরের মেঝে বিবর্ণ হয়ে গেছে মতির ঘরে। বিছানাটা থেকে—এবং মতির গা থেকেও—এমন দুর্গন্ধ আসছে যে, দরজার বাইরে দাঁড়ালেই গা-বমি ক'রে ওঠে। বিছানাটা কতকাল বদলানো হয় নি তা কে জানে, তোশক এমন কি নিচের গদি পর্যন্ত প্রাকৃতিক কারণে বার বার ভিজে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে, তার তুলোগুলো সুদ্ধ খারাপ হয়ে গেছে। আর তেমনি মতিরও দুর্দশা, ইদানীং শাড়ি ছেড়ে থান ধুতি পরত মতি—তাও একখানা পরনে নেই, সম্ভবত পেট ভাঙবার অজুহাতেই...একটা ছেঁড়া অয়েল ক্লথের ওপর পড়ে আছে সে, ওপরে খানিকটা ন্যাকড়া চাপা।

সুরোকে দেখে চিঁচিঁ ক'রে উঠল মতি, 'এসেছিস মা, দ্যাখ দ্যাখ, আমার দুদ্দশাটা। কত বলি ওদের, বলি যে তোদের কিছু করতে হবে না—শুধু দয়া ক'রে তাকে খবরটা দে, ব্যাগত্তা করছি তোদের কাছে। সে তিন সত্যি ক'রে গেছে, বাক্যিদত্ত আমার কাছে—মরবার কালে দেখবে। তা সে খবরটাও কেউ দেয় না। এক পয়সার পোস্টকার্ড লেখবারও লোক নেই একটা। গিরির সঙ্গে বুঝি নানুর ছেলের দেখা হয়েছিল, তোর বাড়িতেই নাকি চেনা ওদের—গিরির মুখে শুনে বলেছে, আমি তাকে খবর দিচ্চি। মাসির জন্যেই তার কলকাতার বাসা রাখা—এমন অবস্থা শুনলে সে সব ফেলে ছুটে আসবে।...আহা, ছেলেটার ভাল হোক জয়-জয়কার হোক, গতর ভাল থাক—রাজ্যেশ্বর ব্যাটা হোক—তবু তো তোকে খবরটা দিলে। সে-ই দিয়েছে নিশ্চয়—নইলে তুই বা কার কাছে খবরটা পাবি।'

বেশী কথাও বলতে পারে না, দুর্বল শরীর—একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকে, হাঁ ক'রে এদিক-ওদিক তাকায় এক ফোঁটা জলের জন্যে। ঝিয়েরা বুঝতেও পারে না। সুরোই ছুটে গিয়ে এক ঢোক জল দেয় মুখে। তাও একটা গেলাস পর্যন্ত নেই। একটা খোলা পেতলের ঘটিতে ক'রে খানিকটা জল রাখা আছে মাথার শিয়রে।

'দেখলি, দেখলি—দ্যাখ। ওরা বুঝতেও পারে না। আরও ঐ ডাইনীগুলোর ভয়ে নিজেদের আখেরের চিন্তায় কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে।...তাই তো বলি একশোবার ঐ শকুনগুলোকে যে—খবর দে, সে তোদের পয়সার পিত্যিশী হয়ে বসে নেই। দরকার হয় সে নিজেই খরচ ক'রে আমার সেবা করবে—তেমন মেয়ে নয় সে। তার তেজ চিরকাল—পয়সার লোভে লাথি মেরে চলেছে সে জীবনভোর। নইলে আজ তার পয়সা খায় কে। এমন ডবল সম্পত্তি সে করতে পারত, কলকাতার মাথা মাথা লোক টাকার আণ্ডিল এনে সেধেছে।...আর এই সম্পত্তিই তো সে নিতে পারত। সে যদি আমার কাছে এসে থাকত তাহলে কি তোদের পুঁছতুম নাকি। সে আমার পেটের মেয়ের বাড়া।...তোকেও সেইকালে বলেছিলুম সুরো—তুই আমার মেয়ের মতো থাক, এই অতুল ঐশ্বয্যি তোরই হ'ত। একটা কেন দশটা ঠাকুরবাড়ি কর না! তা শুনলি না তো!'

সুরো এ সব কথার উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করল না, কাজে লেগে গেল। বামুনদিকে বললে দু হাঁড়ি জল গরম করতে, গিরিকে বলল দারোয়ানকে নিয়ে ডাক্তারি তুলো আর পাউডার আনাতে, ফর্সা কাপড় বিছানার চাদর ওয়াড় সব বার ক'রে আনতে।

গিরি কথাটা শুনেও কিন্তু নড়ল না, বিপন্ন মুখে একবার মতির দিকে আর একবার সুরোর দিকে চাইতে লাগল।

'কী হ'লো—কথা শুনতে পাও নি? হাঁ ক'রে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কি, এত-দিনের মনিব তোমাদের! তা বেশ তো অবস্থায় ফেলে রেখেছ—পথের ভিখিরীও এর চেয়ে ভাল থাকে। অন্য ভিখিরীরা তাদের দ্যাখে অসুখে-বিসুখে। এ তারও অধম। তা এখন আর কিছু না পারো, শরীরটাই নাড়ো!'

'কী করব দিদিমণি', এতক্ষণে গিরি মুখ খোলে, 'যা বলছ সব লেহ্য কথা মানছি। এমন দুর্দশায় ফেলে রাখা মানুষের কাজ নয়। কিন্তুক কি করব—চাবি তো সব আঁচলে বেঁধে বসে আছে তেনারা, চাইতে গেলে তেড়ে আসে, মুখখামাটি দেয়। বলে, ঘাটের মড়া, ও তো আজ নয় কাল যাবেই—ওর জন্যে অনথক পয়সা খরচ ক'রে কি হবে?'

'সবটা তো ওদের দোষ নয় গিরি, তোমরা পুরনো লোক, সাফ-সুতরো ক'রেও তো রাখতে পারতে। যাক গে—ঐ ওপরে কারা আছে, বলো গে আমার নাম ক'রে যে আলমারির চাবি দিতে—নয়ত নিজেরা কেউ এসে চাদর কাপড় ওয়াড় সব বার ক'রে দিতে।'

পরোয়ানা আর আদালতের পেয়াদা নিয়ে নায়েবরা যেভাবে প্রজা উচ্ছেদ করতে যায়—কতকটা সেই ভাবেই গিরি চলে গেল ডিক্রি জারি করতে।...

সুরবালার আগমনসংবাদ বোধ হয় এর মধ্যেই সেখানে পেঁচছে থাকবে। তাই গিরিকে দিয়ে জবাব পাঠাতে সাহস হ'ল না—জন-দুই মানুষ নিজেরাই নেমে এল। তার একজন পুরুষ, বছর চল্লিশ বয়স হবে—দুই চোখ লাল, পাও ঈষৎ বেএক্তিয়ার—সম্ভবত নেশা করেছে : আর একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক, গহনা ও শাড়ির বাহারে চিনতেও পারল—মতির বোনঝি। সর্বদাই এক-গা গয়না পরে থাকা তার একটা রোগ।

কথা কইল মেয়েছেলেটিই। বলল, 'কে গা বাছা তুমি, এসে হুকুম পাঠাচ্ছ ঝি-চাকরকে দিয়ে! বলি সহবৎ জানো না? আমরা হলুম গে এনার আপ্তজন, আপনার লোক—ওয়ারিশ। কী করতে হবে না হবে আমরা জানি না—তুমি এসে লম্বা লম্বা কথা বলে আমাদের শেখাবে! আস্পদ্দা তো কম নয়। এধারে তো ফোঁটা-তেলকের খুব ঘটা দেখছি—মড়ার গন্ধ পেয়ে শকুনের মতো ছুটে এসেছ কেন?'

নিশ্চয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল সুরো। এতদিনে আরও চিনেছে সে জগৎটাকে। বৃন্দাবনে গিয়েও অনেক কিছু শিখেছে। সে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে জবাব দিল, 'আমি শকুন হয়ে ছুটে আসি নি, শকুন তাড়াতে এসেছি। মড়া তো এখনও হয় নি—প্রাণটা এখনও ধুক ধুক করছে।...আমি কে তা তোমরা বেশ জানো, আমি তোমাকে চিনতে পারছি, তোমারও না চেনবার কথা নয়। এ বাড়িতেও আমাকে নতুন দেখছ না। ওয়ারিশের অধিকার মরবার পরে, তার আগে না। এখন থেকে মালিক হয়ে বসার কোন হক নেই তোমাদের।...শোন, এই একটা মুমূর্ষু রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেজিয়া চাই নে—তবে এও জেনে রেখো, এখনও আমি একটা খবর পাঠালে এই কলকাতা শহরের দশ-বারোটা বাঘা বাঘা উকীল ব্যারিস্টার য়্যাটর্নী ছুটে আসবে। ইচ্ছে করলে পুলিস ডেকে তোমাদের উৎখাত শুধু নয়—ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে—ঐ উইল পাল্টে এখনও যথাসর্বস্ব নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারি। সে প্রবৃত্তি আমার নেই—থাকলে এক পয়সাও তোমরা পেতে না। তোমরাই ভোগ দখল করো, উড়িয়ে দাও মদ খেয়ে, ভালবাসার লোকদের ডেকে বিলিয়ে দাও—তোমার তো সে ব্যায়রামও আছে শুনেছি—সে মরুক গে, যা খুশি করো। তবে যার জিনিস, কষ্ট ক'রে রোজগার করা, তার সেবা হবে না চিকিচ্ছে হবে না—এতটা আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই। আলমারির চাবি দাও, কোথায় কি থাকে তা আমি জানি, দরকার-মতো বার ক'রে নেব। আর বড় ডাক্তার ডাকব, তার ফীও তোমাদের দিতে হবে, ওষুধের দামও। নইলে সিন্দুকের চাবিও ছেড়ে দিতে হবে—যেটা তোমাদের অভিরুচি!'

শুধু মতির বোনঝিই নয়—ওর যে তথাকথিত বরটি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল—সেও যেন একটু চমকে উঠল। সত্য কথা জোর দিয়ে বললে—তা সে যে-ই বলুক না কেন—লোকে সমীহ করে একটু। ভয়ও পায়। খুব ঝানু বদমাইশ ছাড়া তার ওপর গলা চড়াতে সাহস করে না। এরা ততটা ঝানু নয় কেউই। মেয়েটা পয়সার ঘরে জন্মেছে, পুরুষটা রক্ষিতার পয়সায় নেশা-ভাঙ করে।

বোনঝি—ডালিম বুঝি ওর নাম—রীতিমতো থতমত খেয়ে আমতা আমতা ক'রে বলে, 'আমরা কি আর কিছু করছি না! ডাক্তার এলে-দিয়ে গেছে তাই—।...বলে, বাঁচবে না এ যাত্তারায়। বেথা চেষ্টা।...তা পেত্যয় না হয়, ডাকো না যাকে খুশি। ষোলটা টাকা—তার বেশি তো নয়, তাতে কেউ মরে যাবে না।'

এই বলে চাবির রিং থেকে আলমারির চাবিটা বেছে খুলে নিয়ে ঠং ক'রে ফেলে দেয়, তারপর গজগজ করতে করতে বরের কনুই ধরে টেনে নিয়ে যায়, 'লোকে কথায় বলে মার চেয়ে ব্যেথিনী তারে বলে ডান!...আমাদের চেয়ে উনি আপনার লোক হলেন। তেজ দ্যাখো না, সর্বস্ব খুইয়ে বোষ্টমী সেজেছে, তবু অংখার যায় না। অমনি কলকাতা সুদ্দু উকীল ব্যালেস্টার ছুটে আসছে ওর রূপযৌবনের লোভে।...এত যদি টান তো ছেড়ে গিয়েছিলি কেন? কৈ, কোনদিন তো দেখলুম না একখানা পোস্টকাট লিখে উদ্দিশ নিতে। আজ একেবারে মুখের সামনে এসে তাই সোয়াগ উথলে উঠল। ঢং দেখে আর বাঁচি নে। বলে না—মা না বিয়োল, বিয়োল মাসী—ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপিতিবেশী! এ হয়েছে তাই!'

সুরবালা এ সবে কান দেয় না। ততক্ষণে গরম জল এসে গেছে। কাপড় ভিজিয়ে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে গা থেকে ময়লা ছাড়ায় সে। কতদিন ধরে শুকিয়ে আছে, সহজে যায় না। তবু ধৈর্য ধরে বসে বসে পরিষ্কার করে। বিছানা পাল্টায়, ভাল কাপড় বার ক'রে পরায়। ধরে বসিয়ে গায়ে ভাল ক'রে পাউডার মাখিয়ে দেয়। তারপর নিজে ঘরের মেঝে ভাল ক'রে ঘষে ঘষে মুছে সাফ ক'রে আর একবার স্নান ক'রে আসে।

খবর পেয়ে নানুও এসেছিল দেখা করতে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, গিরি গিয়ে ডেকে

আনল। সুরোর এখন জোর বেড়েছে। সেই সঙ্গে সাহসও। নানুকে দিয়েই ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। রাজাবাবুকে দেখতেন নীলরতনবাবু, ইন্দুবাবু—নাম দুটো মনে ছিল ; ওঁরা নাকি ভালো ডাক্তার। নানুকে বলল ঐ দুজনের যাকে হোক ডাকতে। আরও বলল, 'তুমি একটু অমনি সঙ্গে থেকে ওষুধ-পত্তরেরও ব্যবস্থা ক'রো—এখানে কাকে বলব, কে আনবে না আনবে! দরকার হয়, টাকাও তোমাকেই দিতে হবে এখন—আমার সঙ্গে অবশ্য আছে, যদি পারো প্যাঁটরা খুলে নিতে তো—'

চিঁ-চিঁ ক'রেই মতি বাধা দেয়। বলে, 'ওরে, না না। তার দরকার হবে না। শোন্, ওরা জানে না—ঐ শ্যাল-কুকুরগুলো—ঠাকুরের সিংহাসনের তলায় একটা চোরা দেরাজ আছে, তার চাবি থাকে আমার গুরুদেবের ছবির পেছনে আটকানো। সেই দেরাজে কিছু টাকা আছে, একশো টাকার নোট, আর গিনি, তুই তো পুজো করতে যাবি—বার ক'রে নিস। আমি ওদের কারুকে বলি নি, তোর পিত্যেশেই ছিলুম। ঐ থেকে এখন খরচ কর। যা থাকে—বিশেষ গিনি কখানা—আমি মরবার পর তোর ঠাকুরের পেন্নামী বলে নিয়ে যাস।'

'থাক মাসী, তোমার চিকিচ্ছে তো আগে হোক। পরের কথা পরে।'

বড় ডাক্তার এসেও কোন আশা দিতে পারেন না। বিশেষ রোগ কিছু নয়—বয়সটাই আসল অসুখ। গ্রহণী আছে অবশ্য—যাকে 'গিরিনী অস্বস্তি' বলে—তা সে আর এ বয়সে সারা সম্ভবও নয়। পুরোনো শরীর বলেই টিকে আছে এখনও, তবে আর বেশী দিন নয়। এমনি টুকটাক রোগিণীকে সান্ত্বনা দেবার মতো ওষুধ দেওয়া যেতে পারে—খুব একটা কাজ কিছু হবে না তাতে। এখন একটু তাকুতে আর তোয়াজে রাখা—এই। যা খেতেটেতে চায়—একটু আধটু দেওয়াই ভাল, কারণ এখানের খাওয়া শেষ হয়ে আসছে এবার।

ডাক্তার নানুকেই বলে গিয়েছিলেন, নানু সুরোকে বলল। চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের জল চাপতে পারে না সুরো। বরং যত চেষ্টা করে সামলাবার, তত আরও বেশী জল এসে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে মুখচোখ ভাল ক'রে মুছে চোখে জল দিয়ে গেলেও—ওর মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারে মতি, বলে, 'কোন আশা নেই আর—বলে গেল তো? সে আমি জানি। তুই ঢাকবার চেষ্টা করলে কি হবে। আমি নিজেই যে বুঝতে পারছি। অনেকদিন যমরাজাকে ফাঁকি দিয়ে চালাচ্ছি, এবার টুঁটি টিপে ধরেছে আর কি। এবার আর চালাকি চলছে না। আর বয়েসটাই কি কম হ'ল। বাঁচার আর দরকারও নেই। এমন পরের মুখচাওয়া অথব্ব অক্ষ্যাম হয়ে পড়ে থাকার চাইতে সহমানে সরে পড়াই ভাল...যাই হোক, তবু তুই চোখের জল ফেলেছিস—এতেই আমার তৃপ্তি রে। তবু একজনও আমার জন্যে চোখের জল ফেলল—চোখে দেখে গেলুম—এই দেখেই খানিকটা শান্তি। পেটে ধরি নি অবিশ্যি, কিন্তু ধরলেও তারা কী অবতার হ'ত কে জানে! এখন তুই থাকতে যেতে পারি তবেই তো, যদি বেশী দিন গোড় পেতে থাকি—তাহলে তো সেটুকুও হবে না। তুই বা আর কতকাল থাকবি! ঠাকুর-সেবা ফেলে—।'

'না মাসী, আমি থাকব। তোমার শেষ সময়ে আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাবো না—যদি নিজে প্রাণে বেঁচে থাকি অবিশ্যি—তুমি দেখে নিও। আমার ঠাকুরও তা বুঝবেন। তোমার মধ্যে দিয়েই তিনি সেবা নেবেন।'

'আঃ!' আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে মতির, 'এইটুকুই শান্তি। অনেকদিন হরিনাম করেছি—পয়সার জন্যেই হোক আর যা-ই হোক, তারই এইটুকু ফল দিলেন ভগবান!'

দু'তিন দিন পরে একদিন হঠাৎ ইশারা ক'রে আরও কাছে ডাকল মতি। কানের

কাছে মুখ আনতে চুপিচুপি বলল, 'একটা ভাল উকীল কাউকে ডাক না, উইলটা পালটে তোর নামে ক'রে দিয়ে যাই?'

'না মাসী, ছিঃ! সবাই ভাববে ঐ জন্যেই মরণকালে ছুটে এসেছি। শেষে তুমিও হয়ত তাই ভাববে। না, ওতে আমার দরকার নেই। তোমার দৌলতেই আমার যা কিছু—তোমার সেবা করব—এ তো আমারই পুণ্যি। এর মধ্যে আর টাকা-পয়সা জড়িও না। আর গোচ্ছার টাকা নিয়ে আমিই বা কি করব। আমারই বা কে আছে।'

'কেন, তোর ঠাকুর আছেন! সে তবু একটা সৎ কাজে লাগবে। আমি বেঁচে থাকতেই ঠাকুরঘরে তালা পড়েছে—মারা গেলে কি হবে তা তো বুঝতেই পারছি।'

'ঠাকুরের সেবা একরকম ক'রে চলেই যাবে আমার। বেশী টাকার ব্যবস্থা না থাকাই ভাল। বৃন্দাবনেও তো এই দু-তিন বছর কাটল, দেখলুমও ঢের। যেখানে বেশী টাকা সেখানেই বেশী নোংরামি, হ্যাংলামি। টাকার গন্ধ পেলেই বাজে লোক ছুটে আসবে, ঠাকুরের নামে থাকলেই কি ঠাকুর পাবে মনে করো? সেও সেবাইৎরা ফুর্তি ক'রে ওড়াবে। আমি যে কদিন আছি—সেই কদিনই ঠাকুরের সেবা। তারপর—তবু, যদি বেশী মধু না থাকে, যারা আসবে সেবা করতে ঠাকুরের জন্যেই আসবে। নইলে ঐ—গো-ভাগাড়ে মড়া ফেলার অবস্থা সর্বক্ষেত্রেই।'

চুপ ক'রে যায় মতি। মনে শান্তি পায় না। এক এক সময় বলে, 'এর চেয়ে যদি কোন হাসপাতালে দিয়ে যেতুম রে—তারা আমাকে দেখত। এ কী ভূতভোজনে গেল, আমার এত কষ্টের টাকা!'

'মাসী, টাকার কথা তো জীবনভোর চিন্তা করলে, এখন আর কেন! যে খুশি নিক গে, যা-খুশি হোক গে। এখন ভগবানের কথা ভাবো—তোমার গোবিন্দের কথা।'

'তা বটে!' চুপ ক'রে যায় অগত্যা। তবে কথাটা যে মনঃপূত হয় না—তাও বুঝতে পারে সুরো।

একদিন বলে, 'সুরো, একখানা গান শোনাবি মা, কেত্তন? কতকাল যে নিজে গাই নি—কি গান শুনি নি। বোনটা গাইত সে মরে গেল। যদি মেয়ে দুটোকে গান শিখিয়ে যেত—তবু বংশের ধারাটা থাকত। নিজে রোজগার করলে টাকার দামও বুঝতে পারত।'

সেই টাকা! ঘুরে ফিরে মন একই জায়গায় এসে আটকে যায়।

হাসে সুরবালা মনে মনে—কিন্তু কিছু বলে না।

জিজ্ঞাসা করে, 'দোয়ার বাজনদারদের কি খবর দোব—যদি কেউ খালি থাকে—? রীতিমতো গান শুনবে—না এমনি?'

'না না—ওর বাপ্‌রে, সে মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করবে। এমনি গা তুই, পাশে বসে। আর শোন, মনে হচ্ছে আর চার-পাঁচ দিনের বেশী নেই—মনটার মধ্যে কে যেন বলছে তাই—যদি শেষের দিকে বুলি হরে যায়, কথা না কইতে পারি, একেবারেই শেষ সময়ে—তুই যদি পারিস একখানা গানই শোনাস। এই আমি বলে দিয়ে গেলুম। শুধু শুধু নাম শোনাতে যাস নি, ও তারক-বেহ্ম না কি বলে—ও আমার বিচ্ছিরি লাগে। এতকাল গান গেয়ে এলুম, রাজ্যের লোককে শোনালুম—গান শুনতে শুনতেই যেন যেতে পারি। ...কানে ঠিক পৌঁছবে। আমার মড়াটাও নড়ে উঠবে কেত্তনের আওয়াজ পেলে। আর যদি পারিস—সেই সময় বরং দোয়ার বাজনদারদের খবর দিস, তারা যেন গান গাইতে গাইতে নিয়ে যায়।...ভাগ্যিস তাদের যা দেবার হাতে তুলে দিয়ে দিয়েছিলুম, শক্ত থাকতে থাকতেই—নইলে এ চামারগুলো এক পয়সা দিত না।'

সব সাধই সুরো পুরিয়েছিল ওর।

সেদিন পাশে বসে গান গেয়েছিল। 'মান' পালায় মতির নাম ছিল সব চেয়ে বেশী, বসে বসে দু-তিনটে সেই পদ গেয়েছিল—যেগুলো বেশী প্রিয় মাসীর। মৃত্যুর দিনও,

বলল থেকে সাতিকমবাস শুরু হয়েছে—প্রসে খসে গান শুনিয়েছে। মাথুরের পালার গান। শ্রাদ্ধবাসরে গাইতে পারবে না, এরা কীরকম আয়োজন করবে তা কে জানে—আর করলেও সুরো আবার দোয়ার বাজনদার নিয়ে রীতিমত পেশাদার গান গাইবে না, এটাও ঠিক, পারবেও না গাইতে। এ বাড়িতেও আর ঢুকবে না। এক দোর দিয়ে মড়া বেরোবে অন্য দোর দিয়ে সেও বেরিয়ে যাবে।

এতেই তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্ত ছিল না।

'এসব আবার কি অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড। বোষ্টমীর কি সব উল্টো। এ সময় কোথায় তারক-বেহ্ম নাম শোনাবে, না এই সময় চইচে ক'রে কেত্তন গাইতে বসল!...গানবাজনা-ফূর্তির কি এই সময় নাকি! যার বেপরীত হয় তার কি সব বেপরীত!...'

তারা অবশ্য তাদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে নি। মুখে গঙ্গাজলও দিয়েছিল, কানের কাছে চিৎকার ক'রে তারকব্রহ্ম নামও শুনিয়েছিল। কিন্তু সুরো জানে যে যদি তখনও কোন চৈতন্য থেকে থাকে মাসির তো সে ওর গানই শুনেছে—সে 'নাম' নয়।......

মৃত্যুর পর গরদের কাপড় পরিয়ে তিলকসেবা ক'রে; তুলসী পাতা জপের মালা দিয়ে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে সদ্য-কেনা পালঙ্কে তুলে দিয়েছিল সুরো। মতিরই টাকা অবশ্য, সেই ঠাকুরঘরের চোরা-দেরাজে রাখা টাকা। এ টাকা সে রেখে যাবে না এক পয়সাও—এদের জন্যে। যে কখানা গিনি অবশিষ্ট ছিল দোয়ার-বাজনদারদের হাতে দিয়ে বলে দিলে, 'তোমরা একদিন কোন ঠাকুরবাড়িতে মোচ্ছব দিও মাসির নামে, বরানগরের দিকে কি খড়দয়—যেখানে ভাল ব্যবস্থা হয়—বাকী যা থাকবে, সমান ভাগ ক'রে নিও। ভাল ক'রে গান গাইতে গাইতে নিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে পুড়িয়ে বাড়ি ফিরো,—এদের বিশ্বাস নেই। আর তোমরাই তো মাসীর আসল সন্তান—তোমরা শবে জল ঢাললে তার আত্মা জুড়োবে।'

সেও সঙ্গে ছিল অবশ্য। এই প্রথম সে হেঁটে গেল নিমতলা পর্যন্ত। হাঁটা অভ্যাস হয়েছে বৃন্দাবনে গিয়ে, তবু সে পিছিয়েই পড়েছিল—গিবি ছিল তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা, রাজাবাবু, মা—বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই নিমতলা ঘাটের সঙ্গে। শেষ প্রিয় ব্যক্তিটিকেও পৌঁছে দিয়ে গেল। মায়ের মতোই ছিল মতি, তাকে শেষ যাত্রায় রওনা ক'রে দিয়ে কর্তব্যেরও ইতি টেনে দিল—অন্তত এখানকার মতো। এখানে আর না। এই শহরে শেষ আসা তার।

পরের দিনই বৃন্দাবনে চলে যাবে। নানুকে বলে রেখেছে, সে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।

॥ ৩৮ ॥

কলকাতা থেকে কর্তব্যের শেষ বন্ধন কেটে চলে এল সুরবালা চিরদিনের মতো। ওখানকার দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে এল। ঋণ সব শোধ হ'ল না—হবার নয়, তবু যতটা সম্ভব উশুল দিয়ে এল, ওর ভাষায় 'সুদটা' জমা ক'রে দিলে। অপারগ হিসাবেই মহাজনের খাতায় তিনশূন্য পড়ল হয়ত—তবু এ-জন্মের মতো একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল এটা ঠিক।

কিন্তু ঋণ আর কর্তব্য কি শুধু কলকাতাতেই ?

আরও একটি ঋণ কি দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে জমা হচ্ছে না এখানেও ? বেড়েই যাচ্ছে না ক্রমাগত ? তার কি চুক্তি হবে কোনদিন ? কিছুও কি শোধ করতে পারবে ? নিদেন সুদ ?

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই ঘাড় নাড়ে সুরবালা।

সে শোধ হবার নয়। এই বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই তাকে একদিন কলকাতার মতো এই পৃথিবী থেকেও বিদায় নিতে হবে। আর সে বোঝা যে খুব হাল্‌কাও নয়—তা সুরবালার চেয়ে কেউ বেশী জানে না।

দিনে-দিনে মাসে-মাসে বৎসরে-বৎসরে সুরবালার রূপান্তর ঘটেছে। সে পরিবর্তনের দৈনন্দিন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ না থাকলেও, অনেকদিন পর পর নিজের দিকে চেয়ে, নিজের মনের চেহারাটা দেখতে পেয়ে, নিজের কথাবার্তার আচরণে চমকে উঠেছে বৈকি। সবটা না হ'লেও সে পরিবর্তনের খানিকটাকে স্বীকারও ক'রে নিতে হয়েছে। রূপ-যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, লোভহীনতা, আদর্শবাদও কোথায় মিলিয়ে গেছে। বেশী লেখাপড়া না জানলেও চারুদা রাজাবাবু—আরও পাঁচটা ভদ্র শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এসে, বিস্তর বই পড়ে পড়ে যে বিদগ্ধ সংস্কৃত মনটি গড়ে উঠেছিল, তারও আর চিহ্ন নেই কোথাও। এই পুরাতন তীর্থে জমে-ওঠা যুগ-যুগান্তের মালিন্য আর গ্রাম্যতা তার ছাপ ফেলেছে ওর মনে, ওর প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়। যে অর্থ সে দু'পায়ে ঠেলে চলে এসেছিল একদিন, সেই অর্থ সম্বন্ধেই আজ ওর লোলুপতার শেষ নেই। আজ যেন জীবনকে সে নতুন ক'রে আঁকড়ে ধরতে চায়, চায় সে জীবন থেকে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আদায় ক'রে নিতে, সুখ ও বিলাস-সম্ভোগ করতে।

কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে ভাবে সুরবালা—এই তিল-তিল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, এই সুদীর্ঘ একঘেয়ে জীবন, এই তুচ্ছ তুচ্ছ দুঃখ আর সুখের সংঘাত, এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবনসংগ্রাম—ওর মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্তন আনলেও কৈ কিরণকে তো স্পর্শ করতে পারে নি। সে তো তেমনিই আছে। তেমনিই সর্ব অবস্থায় অবিচল, মিতভাষী, তেমনিই অতন্দ্র, তেমনিই আজ্ঞাবহ—ওর সুখ-দুঃখ ওর খেয়াল-খুশির মুখাপেক্ষী।

অথচ কিরণও কম জ্বলে নি। বরং সে-ই জ্বলেছে। সুরবালা তো তার জ্বালা শেষ ক'রে দিয়েই এখানে এসেছে বলতে গেলে—নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বেগ জীবনযাপন করতে, কিন্তু কিরণের তো দহনের সেই শুরু, সূত্রপাত। সে জ্বালার কিছুটা বুঝতে পারে বৈকি সুরবালা। হয়ত প্রথমটা অত বোঝে নি, বুঝলে উপায় ছিল না বলেই বোঝে নি, বুঝতে চায় নি। নিজের প্রয়োজনটাই শুধু চিন্তা করেছে। স্বার্থপর আজ হয় নি সে, আজ যে স্বার্থপরতাটা চোখে পড়ছে, সেটা নিতান্তই তুচ্ছ, সামান্য—স্বার্থপর তখনও ছিল সুরবালা, ঘোর স্বার্থপর।

কিন্তু কিরণও তো প্রতিবাদ করে নি। নিঃশব্দে জ্বলেছে। তিলে তিলে পলে পলে। তুষের আগুনের [illegible] দীর্ঘায়িত সে দহনের ক্রিয়া। তেমনিই যন্ত্রণাদায়ক, তেমনিই মর্মান্তিক, নিষ্ঠুর[illegible] নিজেই পুড়েছে কিরণ—স্বেচ্ছায়, বিনা কাতরোক্তিতে। পুড়ছে সেটা পাশের লোককে কখনও জানতে দেয় নি। একটু একটু ক'রে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একদা—সে-ছাইও কারুর চোখে পড়ে নি। যে দিনরাত পাশে পাশে ছিল, প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গিনী যে—সে-ও টের পায় নি পাশের মানুষটা কেমন ক'রে জ্বলেপুড়ে ভস্মাবশেষে পরিণত হয়েছে।...

বুঝেছে হয়ত অনেকদিন পরে। কিন্তু তখন আর প্রতিকারের পথ ছিল না। তখন আর কোনমতেই সেই ভস্মমুষ্টির মধ্যে থেকে মানুষটাকে ফিরে পাওয়া যায় না, বাঁচিয়ে

তোলা যায় না। তার দহন আর দাহনের পালা শেষ হয়ে গেছে কবে, ছাই হয়ে যাওয়া অঙ্গারের মতো আকারটা শুধু আছে, অবয়বটা নেই।

হয়ত সুরবালা এতটা ভাবে নি। এতদিন যে এইভাবে একটা মানুষ নিঃশব্দে জ্বলতে পারে, সে ধারণাও ছিল না তার। প্রথম যখন ওকে অবলম্বন করে, তখন—তখনকার প্রয়োজনটাই মনে ছিল, সেইটেই তখন প্রকট। এই লোকটার কথা চিন্তা করলে তার কাজ চলে না। তখন ভেবেছিল দুদিন পরে সে-ই ছেড়ে দেবে, নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে ফিরে গিয়ে আবার পরিচিত অভ্যস্ত জীবনের খেই ধরতে পারবে। সে-ই ওর স্বক্ষেত্র। কোন মানুষ বিনাস্বার্থে আমরণ এমনভাবে পড়ে থাকতে পারে না। হয় জোর ক'রে সে তার প্রাপ্য আদায় করে—নয়তো সরে যায়। অন্যত্র যায় নিজের প্রয়োজন মেটাতে। কে জানে, মুখে যা-ই বলুক, হয়ত সে প্রাপ্য জোর ক'রেই আদায় করবে, এই কল্পমানব একদিন রক্তমাংসের অস্তিত্বে পুনরুজ্জীবিত হবে—এইটেই ভেবে রেখেছিল, আশঙ্কাও হয়ত নয়, আশাই করেছিল সুরবালা। হয়ত সেরকম ঘটনা ঘটলে বাধাও দিত না সে।... সাধারণ মানুষের মাপেই সে কিরণকেও দেখেছিল। কিরণ যে এতখানি অসাধারণ, অনন্য, তা সে ভাবে নি।

সুরবালার অন্যায়?

তা হয়ত হবে। সুরবালাও বহুদিন পরে তা মেনে নিয়েছে। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অপরাধী বিবেক অপরিসীম কুণ্ঠার সঙ্গে ধিক্কার দিয়েছে ওকে। কিন্তু সুরবালা যে মানুষ—সে তো কিরণের মতো যন্ত্র নয়। তাই এ দূর প্রবাসে নির্বান্ধব জীবনযাত্রার মধ্যে একমাত্র সঙ্গীকে—বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য একটিমাত্র অবলম্বনকে ছাড়তে পারে নি। এই প্রায়-নিভে-যাওয়া বিগতযৌবন জীবনেও যে ভক্ত নিজের সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্তা—ইহকাল-পরকাল বর্তমান-ভবিষ্যৎ—অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজো দিয়ে গেছে, নিঃশব্দে সঁপে দিয়েছে সমস্ত বাসনা-কামনা, সুখসম্ভোগ সম্ভাবনা—সে-ভক্তের সেই পূজার ডালি, সেই আত্মবলিদান প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি।

কোন মানুষই বুঝি পারে না। যে পারে সে মানুষ নয়।

কিরণ যা করেছে—মানুষ নয় বলেই করতে পেরেছে।

সুরবালা এতকাল পরেও, এই যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও যেন চিনতে পারল না মানুষটাকে। সত্যিই কি ওর মধ্যে মানুষ কেউ নেই? প্রাণ অনুভূতি হৃদয়—সাধারণ মানুষের যা-যা থাকে—আবেগ বাসনা সম্ভোগেচ্ছা, এমন কি যেটা সব চেয়ে সাধারণ, ঈর্ষা ও উষ্মা—কিছুই কি নেই? থাকলে এমন পারে কি ক'রে মানুষ? এমন কি ক'রে হয়?

ভালবাসা?

সুরবালার তো ধারণা, সে-ও রাজাবাবুকে ভালবেসেছিল, উন্মত্তের মতো, অকারণেই ভালবেসেছিল, সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়ে।

কিন্তু সেও কি এ ভালবাসার কাছে একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় না?

কে জানে, কিছুই বুঝতে পারে না সুরবালা।

কিরণ সেই থেকেই বৃন্দাবনে থেকে গেছে। নিস্তারিণীর মৃত্যুর সময় একবার কলকাতায় এসেছিল সেই, সে-সময়ও দেশে থাকা হয় নি, শ্রাদ্ধশান্তি চোকার পর একবার—সুরবালারই অনুরোধে—দুদিনের জন্যে গিয়েছিল মাত্র। শোকার্ত সুরবালাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে ছিল না, খুব পীড়াপীড়িতেই গিয়েছিল। গোনা দুটি দিনের বেশী থাকে নি। মতির মৃত্যুর সময় সুরবালাই সঙ্গে আনে নি ওকে, কোথায় থাকবে, কি-না—ওরই অসুবিধা হবে বলে। মতির বাড়িতে অসহযোগ ও অপমানেরও একটা ভয় ছিল—সে নোংরামির মধ্যে কিরণকে টেনে আনতে মন চায় নি।

তারপর যা কয়েকবার এদিকে এসেছে, সুরবালার সঙ্গে—তীর্থ করতে। দেশের দিকে যায় নি। দু'-একবার তাও আসে নি—সুরবালা পরিচিত অন্য লোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। বিশেষ যেদিকে দেরি হবার কথা, যেমন রামেশ্বরের দিকে, কি কেদার-বদরী—সে-সব যাত্রায় ওকে সঙ্গে নেয় নি—অতদিন দু'জনেরই অনুপস্থিত থাকা ঠিক হবে না বলে।

বিষয়সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র—যেসব আকর্ষণ মানুষের কাছে সর্বাধিক—কিছুই টানতে পারে নি কিরণকে। এক-আধবার অবশ্য যেতে হয়েছে, বৈষয়িক প্রয়োজনে, যেসব কাজ নিজে উপস্থিত না থাকলে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়, সেইসব কাজে গিয়েছিল, কিন্তু কাজ সারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে। ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়েছে কতকটা অনাথ পিতৃহীনের মতোই—কর্মচারীদের ভরসায়। স্ত্রী সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, মাছও খেয়েছে, এই-মাত্র। সধবার আর কোন সাধ-আহ্লাদ, গৌরব-আনন্দ বলতে কিছু ছিল না তার। 'স্বামী নেয় না—এক কেত্তনউলীর খপ্পরে পড়ে তার সঙ্গেই বাস করছে, ফিরেও তাকায় না'—এ-কথা তো আত্মীয়মহলে অবশ্যই প্রচার হয়েছে। সকলেই কৃপা-দৃষ্টিতে দেখে—আত্মীয়াকুটুম্বিনীরা। সেজন্যে কোথাও যায় না বিভা, কোন কর্মবাড়িতে তো নয়ই—এমন কি কোন শোকের বাড়িতেও নয়। মেয়েরা মেয়েদের চেনে, শ্রাদ্ধবাসরই হোক, আর সদ্য-মৃতের শোকাচ্ছন্নতার মধ্যেই হোক, কৌতূহলই তাদের প্রবল, সহানুভূতির ছলে শত প্রশ্ন ও সহস্র বক্তব্য তাকে বিঁধবে। সেই ভয়েই কোথাও যায় না আরও। এমন কি নিজের ভাইঝির বিয়েতেও যায় নি—ভাজকে লিখে পাঠিয়েছে যে, "আমার মন্দ বরাতের ছায়াও না কাহারও জীবনে লাগে, আমার নিঃশ্বাস পর্যন্ত না কোন মেয়েকে স্পর্শ করে। আমি তাহাকে এইখান হইতেই আশীর্বাদ করিতেছি, এ পোড়ারমুখ আর তাহার দেখিয়া কাজ নাই।"...

এই এতকালের মধ্যে মাত্র দুবার কিরণ দেশে গিয়ে থেকেছে কয়েকদিন ক'রে।

প্রথম গিয়েছিল মেয়ের বিয়েতে, কুড়ি-পঁচিশ দিন থাকতে হয়েছিল প্রায়। তাও পাত্র দেখা, সম্বন্ধ ঠিক করা—ওর পুরনো নায়েবই করেছে। খোঁজ-খবর নেওয়া, দেনা-পাওনা ঠিক করা—অর্থাৎ বিবাহ স্থির করার কাজটা করেছেন ওর জাঠতুতো বড় ভাই। কিরণ গিয়েছে একেবারে আশীর্বাদের আগে। তারপর অবশ্য আর পালাতে পারে নি। বিয়ের বাজার, নিমন্ত্রণ—সবের মধ্যেই থাকতে হয়েছে। বিয়ের পরও, আটদিনের মাথায় জোড়ে ফেরা, সুবচনী-সত্যনারায়ণ প্রভৃতি মিটিয়ে তবে আসতে পেরেছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও কোন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে নি কিরণ। যা করতে হবে তা বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিরক্তিতে করেছে। আত্মীয়স্বজনের সরব এবং স্ত্রীর নীরব বা স্বল্প-রব অনুযোগ স্মিতহাস্যে নিরুত্তরে শুনে গেছে। উত্তর দেয় নি, দোষ খণ্ডনেরও চেষ্টা করে নি। স্ত্রীর কাছে এর আগেই ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে গেছে, নতুন ক'রে উত্তর দেবার প্রয়োজনও হয় নি।

বিভার কাছে অবশ্য কোনদিনই গোপন করে নি কিছু ; নিজের দোষ ঢাকবার কি লাঘব করবার—কিম্বা কতকটা দায়িত্ব বিভার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে নি। অনেকদিন আগে, সেই প্রথমবার বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ই—দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল একটা। লিখেছিল—"তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কোন মুখ নাই। তোমারও ক্ষমা করার কোন কারণ দেখি না। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে তাহা প্রাপ্য বলিয়াই মাথা পাতিয়া লইব। মোহ বলো, নেশা বলো—যা বলিবে বলো, আমি কিন্তু জানি ইহাই আমার ভাগ্যলিপি। এ আকর্ষণে বাধা দিবার শক্তি নাই, এ বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। এখন তো নয়ই, কোন কালেই যে আমাকে ফিরিয়া পাইবে—এ আশা করিও না। দুর্ভাগ্য তোমার তো বটেই—আমারও কম নয়। তোমার মতো স্ত্রী লাভ বহু ভাগ্যের কথা, সেই স্ত্রীকে জানিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া হারানো—ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে। আমি জ্ঞানপাপী,

আমার তরফে কোন কৈফিয়ৎই নাই। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো,—যাহাতে সত্বর আমার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে বৈধব্যের দুঃখ পাইবে সত্য, কিন্তু নিরন্তর লজ্জা ও অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি ঘটিবে।"

সেই প্রথম আর সেই শেষ। এরপর বহু চিঠি লিখেছিল বিভা, বহু চেষ্টা করেছিল 'নেশা কাটাবার', 'বন্ধন ছিন্ন করার'—সেসব চিঠির এই অভিযোগ অনুযোগ অংশগুলোর কোন জবাব পায় নি কখনও। সামনাসামনি সাক্ষাতের সময়ও কখনও কোন কথা বলে নি কিরণ। চুপ ক'রেই থেকেছে সমস্তক্ষণ। পাষাণপ্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মাথাই ফেটেছে, প্রাচীরে দাগ লাগে নি।...

আর একবার গিয়েছিল ছেলের বিয়েতে।

কিরণের অনুরোধেই, সুরেন বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নায়েবমশাই তার জন্যে পাত্রী দেখে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেলেন। কাছাকাছির মধ্যেই, আর এক জমিদারের মেয়ে। শ্বশুর বহুদর্শী বিচক্ষণ—কিন্তু ধূর্ত বা নীচ নন, অর্থলোলুপও নন। তাকে নিজের বাবার আমল থেকেই জানত কিরণ—কিরণের চেয়ে বয়সে বড়, দাদা বলে এসেছে বরাবর। তাঁরই মেয়ে, মেয়েও পছন্দসই, সামান্য একটু বাংলা লেখাপড়াও জানে—বাড়িতে যতটা শেখা সম্ভব। এ সম্বন্ধ ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মনে করেছে কিরণ। সেই সময় এসে—আরও একটি কাজ সেরে গেছে সে, দানপত্র ক'রে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। স্ত্রীকে দিয়েছে কোম্পানীর কাগজ আর নগদ টাকা যা কিছু ছিল—যদি ভবিষ্যতে ছেলে কোনদিন অনাদর করে,—যাতে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে সে। ছেলে প্রথমটায় এত দায়িত্ব নিতে রাজী হয় নি, যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছিল। কিরণ ছেলের হাতে ধরে মিনতি ক'রে রাজী করিয়েছে। পুরনো কর্মচারীরাও স্বীকার করেছে যে, এই ব্যবস্থাই ভাল, একটা সই করানোর জন্যে এক-এক সময় দরকারী কাজ আটকে যায়, বহু ক্ষতিও হয় অনেক সময়। বাবুমশাই ফিরবেন না যখন স্থির, তখন আর মিছিমিছি ওঁকে জড়িয়ে রেখে লাভ নেই।..

অদ্ভুত সম্পর্ক ওদের, এক-এক সময় সুরবালারই হাসি পেয়ে যায়।

এক ঘরে, পাশাপাশি থাকে দুই শয্যার মধ্যে দু হাতের মতো ব্যবধান। তাও থাকে না এক-এক সময়। অসুখ-বিসুখ করলে একটা বিছানা এগিয়ে আসে আর একটার কাছে। তেমন বাড়াবাড়ি হ'লে এক শয্যাতেও শুতে বাধা নেই। কারও কাছেই কারও লজ্জা নেই। সুরবালার তো নেই-ই। অল্প বয়সে কখনও বিশেষ অসুখ করে নি বলে সামান্য অসুখেই কাতর হয়ে পড়ে সে। সে-সময় তাকে শৌচকর্ম থেকে স্নান পর্যন্ত সবই করিয়ে দিতে হয়। কিরণকেই করতে হয় সে-সব। ঝিয়ের সেবা পছন্দ হয় না সুরোর, তার নাকি গা-ঘিনঘিন করে। তাছাড়া তার ঠিক কি প্রয়োজন কখন—তা কিরণকে বলতে হয় না, সে নিজেই বুঝে করে। মাইনের লোকের কাছে থেকে এতটা আশা করা যায় না।

অর্থাৎ নিবিড় আত্মিকযোগ—দুজনের সঙ্গে দুজনের। একাত্ম বললেও বেশী বলা হয় না। সুরবালা একদিনও পারে না কিরণকে ছেড়ে থাকতে, নানান অসুবিধা বোধ করে। চোখে যেন অন্ধকার দেখে। নির্ভর করতে করতে অভ্যাসটা স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়েছে। 'ওগো কিরণবাবু-উ, বলি শুনছ, একবার ইদিকে এসো। ঐ দ্যাখো কি সব বলছে মিস্তিরী।' কিম্বা, 'এই যে গোয়ালা এসেছে, কী সব হিসেবের কথা বলছে, বুঝে নাও বাপু!' এই ধরনের কথা দিনরাতই বলতে হয়। ফরমাস বললে ভুল বলা হবে, নির্ভরতাই।

কিন্তু তবু সে-আত্মার যোগ দৈহিক যোগে পৌঁছয় নি একদিনও। দেহের কোন স্থানেই হাত দিতে বাধা নেই, দিতে হয়েছেও বার বার, তবু সে-স্পর্শ কখনও কামাতুর হয়ে ওঠে নি। সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করে নি কিরণ একদিনও—এক মুহূর্তের জন্যেও।

করলেও সুরবালা হয়ত বরদাস্ত করত না। কিন্তু ও-তরফ থেকে আভাসে ইঙ্গিতেও কোনদিন সে-ঈপ্সা প্রকাশ না পাওয়াতে এক বিচিত্র কারণে যেন ঈষৎ ক্ষুন্নই হয়েছে। প্রত্যাখ্যান করার দৃঢ়তা দেখানোর সুযোগ না পাওয়ার জন্যেই বোধ হয়। কে জানে।

হয়ত বা আরও গূঢ় কোন কারণ ছিল মনের অবচেতনে—যা অনুধ্যান করতেও সাহস হয় নি সুরবালার।

সুরেনের বিয়ের বছর চার-পাঁচ পরে সুরবালা এক সময় কিরণকে ধরে পড়ল, 'বিভাকে নিয়ে এসো এখানে।...আর কিছু না হোক, এত বড় একটা তীর্থে আসবে না একবার?'

প্রস্তাবটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, কিরণের অবিচল স্থৈর্যও নড়ে উঠল একবার, অবাক হয়ে সুরবালার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তার মানে? হঠাৎ?'

কিরণের সপ্রশ্ন স্থির দৃষ্টির ওপর চোখ রাখতে পারল না সুরো, মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'না, হঠাৎ ঠিক নয়। কথাটা ভাবছি অনেকদিন থেকেই। তার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই।...গতজন্মে কার কি কেড়ে নিয়েছিলুম, তাই এ জন্মে যাড়াভাতে ছাই পড়ল। আবার এ জন্মে যা ক'রে গেলুম—যদি জন্মাতে হয়, কেঁদে কেঁদে দিন যাবে। মেয়েছেলের স্বামী কেড়ে নেওয়ার মতো পাপ হয় না। অথচ—রাধারাণী জানেন, ঠিক কেড়ে নিতে চাই নি আমি, পাকেচক্রে হয়ে গেল তাই—।'

ঈষৎ একটু হাসির রেখা কি দেখা গেল কিরণের দুই ঠোঁটের খাঁজে?...গেলেও অত লক্ষ্য করল না সুরবালা।

কিরণ বলল, 'কিন্তু সে স্বামী আজ আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না, বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে।'

'না না, যাঃ! তা কেন! মানুষটাকে কাছে পেলেও তো একটু শান্তি হয় বেচারীর! ..তা ছাড়া চোখে দেখে যেত যে—যা ভাবছে, যা ভেবেছে এতকাল—তা নয়।'

'তা আর হয় না। সে তুমি আমি কেউই বোঝাতে পারব না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই—শুধু কাছে পাওয়াতে কারুরই মন ওঠে না। সে বরং আরও অসহ্য বোধ হয়।'...

কিন্তু সুরো এসব যুক্তি শুনতে চায় না। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে। এত ক'রে কোনদিনই কিরণকে কিছু বলতে হয় নি, ওর ইচ্ছাই কিরণের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু এই একটা ব্যাপারে কিছুতেই রাজী করানো যায় না তাকে। সে বলে, 'তুমি বোঝ না, আরও অশান্তি হবে, তার জ্বালার ওপর জ্বালা বাড়বে। তার ওপর অনেক অবিচার করেছি—আবার তাকে আরও বেশী ক'রে দেখাতে এখানে টেনে আনতে চাই না।'

উল্টো বোঝে সুরবালা—সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মতোই, রাগ ক'রে বলে, 'কে তোমাকে অবিচার করতে বলেছিল! অকে দুঃখ্যতেই বা গেলে কেন! আমি তো তোমাকে বার বার বলেছি—তার কাছে, তাদের কাছে ফিরে যেতে—। তুমিই তো কান দাও নি সে কথায়। তখন তো একেবারে ভালবাসায় জ্ঞান হারিয়েছিলে। এখন আমায় দুষছ কেন?'

এ কথার উত্তর হয় না। কিরণ সে চেষ্টাও করল না। যেমন চিরদিন চুপ ক'রে থাকে, সেদিনও তেমনি রইল। বললে অনেক কথাই বলা যেতে পারত, কিন্তু সুরবালা তা বুঝবে না, বিশ্বাসও করতে পারবে না। অতীত ঘটনার অপ্রীতিকর তথ্য মানুষ ভুলে যায়। যার ক্ষতি হয় সে মনে রাখে—যার ভুলবারই শান্তি, সে মনে রাখবে কেন? তাই অনর্থক তর্কের সৃষ্টি ক'রে—এই এতকাল পরে অশান্তি বাড়াতে চায় না কিরণ।...

শেষ পর্যন্ত সুরবালাই একখানা চিঠি লেখে সুরেনকে। সে অতি অবশ্য যেন মাকে নিয়ে একবার বৃন্দাবন ঘুরে যায়। এত বড় তীর্থ—মাকে করিয়ে নিয়ে যাওয়া তার উচিত। কোন অসুবিধাই হবে না, এখানে কাছাকাছি আর যেসব দেখবার জায়গা আছে, মথুরা

গোকুল কাম্যবন দাওজী—সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে সুরবালা। এর মধ্যে যেন কোন 'দুষ্য' কি মন্দ উদ্দেশ্য আছে না ভাবে তার মা।...চিঠির শেষে, স্বামীর কাছে স্ত্রীর যে জোর ক'রেই আসা উচিত—আকারে ইঙ্গিতে তাও জানিয়ে দেয়।

চিঠি লেখার কথা কিরণ টের পেয়েছিল। বাধা দেয়নি—বৃথা জেনেই দেয় নি—কিন্তু অস্বস্তি বোধ করেছিল। আসবে তো নাই-ই, মিছিমিছি আরও খানিকটা বিরূপতার সৃষ্টি হবে সেখানে, আরও খানিকটা জ্বালা।

কিন্তু উত্তর এল অপ্রত্যাশিত। এতটা বোধ হয় সুরোও আশা করে নি। সুরেন বেশ বিনীত ও ভদ্রভাষাতেই জবাব দিয়েছে, তার এ সময় কোনমতেই আসার উপায় নেই। তবে মার খুব ইচ্ছা আছে, মথুরা বৃন্দাবন ঘোরার—বাবা যদি কোনরকমে একটু সময় ক'রে এসে নিয়ে যেতে পারেন তো মায়ের সে সাধ পূর্ণ হ'তে পারে। বাবার সম্মতি পেলে সে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দেবে রাহাখরচ বাবদ।

যথাসর্বস্বই তাদের লিখে দিয়ে এসেছিল কিরণ, কিছুই নিয়ে আসে নি। তবে সেটা তাদের বিশ্বাস করার কথা নয়। বরং তাদের এইটেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বেশ খানিকটা মোটা টাকাই সরিয়ে রেখেছে সে সুরবালার জন্যে, অথবা তাকে দিয়েই দিয়েছে। তবু কর্তব্য হিসেবেই সুরেন প্রতি বছর পুজোর সময় দুশো টাকা ক'রে পাঠায়—'বস্ত্রাদি বাবদ যৎসামান্য পাঠাইলাম, দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন।'—কুপনে লেখা থাকে। যদিও সে বিলক্ষণ জানে যে কেউ এদিকে এলে কিরণের জন্যে ভাল ফরাসডাঙ্গার ধুতি পাঠাতে তার মায়ের ভুল হয় না কখনও। জামা কাপড় সম্বন্ধে বরাবরই কিরণের শৌখিনতা আছে একটু—সেটা বিভা আজও ভোলে নি।...

এর পর আর কিরণের উপায় রইল না কোন—দেশে যাওয়া ছাড়া। তার তখনও যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু সুরবালা কোন কথাই শুনল না, মহা অশান্তি শুরু ক'রে দিল।

'তুমি কী গো! কিছুই তো করলে না—বিয়ে-করা বৌ তো তোমার' এখন এই তীর্থ করার ইচ্ছেটাও তার পোরাবে না! এত সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও—?'

এ কথার উত্তরেও অনেক কথা বলা চলত। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলার জন্যে কিরণই ষোল আনা দায়ী কিনা—এ প্রশ্নও তোলা যেতে পারত—কিন্তু বৃথা জেনেই কিরণ সে চেষ্টা করল না, একটু হাসল শুধু। নিরুপায় মানুষ যখন ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তখন যে হাসি হাসে—সেই হাসি।

অবশ্য বিভার ইচ্ছাটা যে ঠিক ষোল আনা তীর্থ করার নয়—সুরবালাও তা বুঝেছিল। অনেক দিনের অনেক কৌতূহল তার, বহু বিনিদ্র রজনীর অমীমাংসিত সংশয়-কল্পনাই তাকে টেনে আনছে এই অপমানের জায়গাতে। অপরাধিনীরই মাথা হেঁট ক'রে যাওয়ার কথা, অথবা সরে যাওয়ার কথা—সে জায়গায় সে-ই আসতে রাজী হয়েছে এতখানি মাথা নিচু ক'রে—শুধু সম্পর্কটা সে নিজের চোখে দেখে যেতে চায় বলেই। হয়ত তাতে জ্বালা বাড়বে আরও, তবু একতরফা কল্পনায় আর ছটফট করতে হবে না—দিবারাত্র অনুমানের বিষে জ্বলতে হবে না—এই একটা সান্ত্বনা।

সুরবালাও সেইভাবে তৈরী হ'ল। নিজের জিনিসপত্র বিছানা হরিনামের মালা গুরুদেবের ছবি আগেই সরিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, রাজাবাবুর ছবিটাও ঝেড়ে মুছে গুরুদেবের ছবির পাশে সাজিয়ে রেখেছিল। বিভা আসতে বড় ঘরখানায়—কিরণের বিছানার পাশে—নিজে হাতে পরিপাটি ক'রে বিভার বিছানা পেতে দিলে, তার কাপড়-জামা ওঘরের আলনায় সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে। ঝিকে বললে, ওপরের কলঘরেই বিভারও চানের জল দিতে। ঝি-পজাবিণীদের আগেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিল—কি কথা বলতে হবে বা হবে না, কী ভাবে বলতে হবে। কিরণবাবু ওর ব্যক্তিগত সেবা যেগুলো করেন—

সেগুলো কেন এই কদিন আর তাঁর ওপরই বরাত দিয়ে বসে না থাকে, তারাই যেন ক'রে দেয় একটু হুঁশ ক'রে—বার বার সতর্ক ক'রে দিলে তাদের।

অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন-আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হ'ল না। অকারণে ক্ষমা চেয়ে নাটক করার কোন চেষ্টাও করল না সুরবালা। এসব প্রসঙ্গই তুলল না। ওর তরফ থেকে কোন বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ যখন নেই—তখন মিছিমিছি নিজেকে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে কোন লাভ নেই—গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

বৃন্দাবনে যা যা দ্রষ্টব্য আছে—সুরবালা নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখাল। পান্ডাকে সঙ্গে দিয়ে এক্কা-টাঙ্গার ব্যবস্থা ক'রে রাধাকুন্ড শ্যামকুন্ড গোবর্ধন গোকুল মথুরা ছাড়াও কাম্যবন, ভান্ডীরবন প্রভৃতি দেখতে পাঠাল। দাওজী দর্শন করিয়ে আনার কথাও বলে দিল ব্রজবাসীকে। তারপর ওদিকের পালা শেষ ক'রে ফিরে এলে কিরণকে চেপে ধরল, 'কদিন একটু বিশ্রাম করুক—তুমি এই যাত্রাতেই পুষ্করটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এসো—পুষ্কর আর অমনি সেই সঙ্গে জয়পুরে আসল গোবিন্দজী দর্শন করিয়ে দাও।'

কিরণ একবার একটু ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। বিভার অবস্থা সে জানে, বুঝেছেও—শুধু সুরবালাকে কী ক'রে বোঝাবে সেইটেই ভেবে পাচ্ছে না।

তখনকার মতো চুপ ক'রে রইল বিভাও। কিন্তু কিরণ কি একটা কাজে অন্যত্র চলে যেতে সে বলল, 'পুষ্কর যাবো না বলতে নেই—কিন্তু এ যাত্রা থাক ভাই। আমি বাড়ি যাবো। তুমি যা হয় ক'রে সেই ব্যবস্থাই একটা করে দাও—আজকালের মধ্যে। উনি—ওঁর সময় না হয়, কাউকে দিয়ে বড় লাইনের গাড়িতে চাপিয়ে দাও, সেখানে খোকাকে তার ক'রে দিলে সে-ই এসে নামিয়ে নেবে।'

'সে কি!' চমকে উঠল সুরবালা। প্রথম প্রথম অনেক আশঙ্কাই ছিল, কিন্তু—মনে যা-ই থাক—এই কদিনে কোন বিরূপতারই চিহ্ন দেখা যায় নি বিভার কথাবার্তায় বা ব্যবহারে। তাই একটু নিশ্চিন্তই হয়েছিল শেষের দিকে—অবস্থাটা ও মেনে নিয়েছে ভেবে।

সে তাই আবারও একটু যেন বিহ্বলভাবেই বলল, 'সে কি! এরই মধ্যে কি! এতদূরের পথে এলে—দু'একটা মাস থেকে যাবে না!...এরই মধ্যে বাড়ি যাবার এত তাড়া কেন?'

বিভা বলল, 'না ভাই, নাতি ফেলে এসেছি, মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে রয়েছে। বৌমা আবারও অন্তঃসত্ত্বা, বাড়িতে তো কেউ নেই আর, দুজনেই ছেলেমানুষ, আমার আর বেশীদিন বাইরে থাকা উচিতও নয়।'

কারণটা বুঝতে পারে না সুরবালা কিছুতেই। এর মধ্যে এমন কি ঘটল? সে নিজের আচরণের হিসাবটাই মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে আগে—এই গত কদিনের, কিন্তু সেখানেও কিছু খুঁজে পায় না। সে তার জ্ঞানমতো যথেষ্টই সতর্ক আছে। বিদ্বেষ ও বিরূপতার মূল কারণটা যা থাকার তা তো আছেই, তার ওপর নতুন ক'রে কোন বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হ'তে পারে—এমন ঘটনার কথা তো মনে পড়ছে না। কিরণকে সে আটকে রেখেছে বা কিরণ তার প্রেমে বন্দী—এ ধরনের কোন বিশ্বাস যাতে গড়ে উঠতে না পারে—সেই চেষ্টাই তো করেছে সে প্রাণপণে।...

সে পীড়াপীড়ি করে খুব বিভাকে—আর কিছুদিন থাকার জন্যে, কিরণকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'তুমি একটু বলো, তুমি না বললে থাকবে কেন?' অনুযোগ করে, 'তুমি নিশ্চয় এমন ভাব দেখিয়েছ যে ওর থাকাটা তোমার পছন্দ নয়—তাই চলে যেতে চাইছে।'

কিরণ তার নিজস্ব বিচিত্র হাসি হেসে শুধু বলে, 'ও থাকবে না আমি জানি। থাকা সম্ভব নয়। তুমি যে কেন সেটা বুঝছ না—সেইটেই আমার বুদ্ধির অগোচর। এত বোঝ আর এইটে বোঝ না?'

তবু জেদ করে সুরবালা, 'ও যদি তাই ধরে বসে থাকত, তাহলে আসবেই বা কেন। ...না না, তুমি একটু বলো, তাহলেই থাকবে। এতকাল পরে তোমার সঙ্গে এল—তোমার কাছে, দুটো মাসও থাকবে না? আর কি এমন সুযোগ হবে?'

আবারও হাসে কিরণ, ক্লিষ্ট হাসি। কথা কয় না।...

সুরবালার অনুরোধে ও মিনতিতে আরও ছ'সাতটা দিন থাকে বিভা কিন্তু তার বেশী কিছুতেই থাকতে রাজী হয় না। জোর ক'রে ধরে রাখার মতো কোন কারণও নেই, ঝুলন বা দোল বা অন্নকূট—সামনে এমন কোন পালপার্বণও নেই—যে সে উপলক্ষে আটকে রাখে। অগত্যা ওর যাওয়ার ব্যবস্থাই ক'রে দিতে হয়। কিরণেরই যাওয়া উচিত সঙ্গে, সে-ই এনেছে সে-ই পৌঁছে দেবে, সে রকম কথাও ছিল—কিন্তু কে জানে কেন, বিভা সেদিক দিয়ে যায় না, কেবল বলে, 'আমাকে বড় লাইনের গাড়িতে কেউ তুলে দিয়ে এলেই হবে। মেয়ে-গাড়িতে তুলে দেবে, ভয় কি? বেশ চলে যাব এখন—!'

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাও করতে হয় না।

পাশের একটি কুঞ্জ থেকে কয়েকজন কলকাতা যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গেও তিন-চারজন মহিলা আছেন—সুরবালা বলে সেই সঙ্গেই পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিল।

যাওয়ার দিন সকালে সুরবালা আর থাকতে পারল না, এক কাণ্ড ক'রে বসল। সকালের লাড়ুভোগ সরিয়ে পূজারী রান্না করতে চলে গেছে, ঝিও ভেতরে ব্যস্ত, কিরণ গেছে বাজারে—মন্দিরের বাইরের সংকীর্ণ দালান বা বারান্দায় ওরা দুটি প্রাণী। সুরবালা তার আহ্নিক পুজোর সরঞ্জাম এনে বসেছে, বিভার আহ্নিক সবে শেষ হয়েছে—সেই সময়টায়। সুরবালা খপ্ ক'রে ওর একটা হাত ধরে বললে, 'আমি যা-ই হই, ঠাকুরের সামনে, ঠাকুরের মন্দিরে বসে, হাতে এখনও জপের মালা—মিথ্যে বলতে পারবে না। ঠিক ক'রে বলো দিকি, কেন এমনভাবে দাঁড়ি-ছেঁড়া হয়ে চলে যাচ্ছ? ছেলের বৌ পোয়াতি, তা জেনেই তো এসেছিলে। আমার সংস্পর্শই যদি অসহ্য—তাহলে এলেই বা কেন! আর তাও, মানুষটা এখানে আটকে আছে সত্যি কথা—কিন্তু আমার সঙ্গে আজ অব্দি কোন দুষ্য সম্পর্ক হয় নি—এই আমার বিগ্রহের সামনে বসে বলছি।...তুমি সতীলক্ষ্মী, তোমাকেও ছুঁয়ে আছি, গলায় জপের মালা।...আর তুমি নিজেও তো দেখে গেলে। তুমিও কি কিছু বুঝতে পারো না?'

'পেরেছি বৈকি। পেরেছি বলেই তো চলে যাচ্ছি, থাকতে পারছি না।' ধীর শান্তভাবে বলে বিভা, 'ঠাকুরদালান না হ'লেও বা হাতে জপের মালা না থাকলেও মিথ্যে বলতুম না। কথাগুলো আমারও শুনিয়ে যাওয়া দরকার। আমার সব্বনাশ করেছ সেটা আমি এতদিনে মেনে নিয়েছিলুম, মেনে নিয়েছিলুম বলেই এখানে আসতে রাজী হয়েছি। দেখতে চেয়েছিলুম যে আমার কি নেই যা তোমার আছে—যা আমি দিতে পারি নি বলে আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার কাছে পড়ে আছেন।...এসে এই দেখব জানলে কখনই আসতুম না। ওঁর যে সব্বনাশ করেছ তার ক্ষমা নেই আমার কাছে। আমাকে দগ্ধেছ—সে সয়েছি, মেয়েদের অনেক সয় কিন্তু ওঁর এই দশখানি সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে নিয়ে সুখে আছেন শান্তিতে আছেন জানলেও আমার কষ্ট হ'ত—তবু তার মধ্যে একটা সান্ত্বনা পেতুম, এত অসহ্য হ'ত না। এ তুমি কি করলে! এমন মানুষটাকে জন্তু ক'রে ছেড়ে দিলে!'

বলতে বলতে বোধ করি বহুদিনের প্রায়-বিস্মৃত ক্ষতগুলোই রক্তক্ষরা হয়ে উঠল আবার। প্রতিকারহীন অবিচারের সহস্র অনুযোগ মাথা কুটতে লাগল আত্মসম্মানবোধের কঠিন প্রাচীরে। আবেগে, নৈরাশ্যে, প্রত্যাখ্যাত স্বামী-প্রেমের বেদনায় গলা বুজে এল বিভার। তবু অমানুষিক চেষ্টায় আত্মসংবরণই করল আবার, কণ্ঠস্বর শ্রুতিগম্য ক'রে তুলল অল্পক্ষণের মধ্যেই, 'কেন এমন ক'রে ধরে রাখলে তাহলে, আমার কাছ থেকে

কেড়ে নিলে! আজ আর ওঁর জ্বলবারও হয়ত শক্তি নেই আর—কিন্তু কী জ্বালায় জ্বলেছেন সেটা তুমি না বুঝলেও, আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝোছ। ছিঃ ছিঃ! কী ক'রেছিল মানুষটা তোমার যে—তুমি এত বড় সর্বনাশ করলে! আমি যে ওঁর দিকে চাইতে পর্যন্ত পারছি না! চাকর ক'রে রেখেছ—বিনামাইনের চাকর—তাতেও কিছু বলতুম না যদি বুঝতুম যে তার বদলে, নিজের জীবনের বদলে—তোমাকে সে অন্তত পেয়েছে!'

তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না ভাই, সত্যি কথা শুনতে চেয়েছিলে, সত্যি কথাই বললুম ; আমার যে অনিষ্ট করেছ তা আমি হয়ত মাপ ক'রে দেতুম —কিন্তু ওঁকে যে কষ্টটা দিলে. অত বড় মহাপ্রাণ মানুষটাকে শেষ ক'রে দিলে—না পেলে নিজে, না পেতে দিলে অপরকে—এর ক্ষমা নেই, অন্তত আমার কাছে।...বাবা! এই যে কদিন আছি, প্রতিটি মুহূর্ত বিছের কামড়ের জ্বালা সহ্য ক'রে আছি। অহরহ বুকের মধ্যেটায় যে কি হচ্ছে তা তুমি বুঝবে না, তুমি পাষাণ, সেটুকু বোধশক্তি থাকলে ঐ মানুষকে নিয়ে তুমি এ খেলা খেলতে পারতে না!'

অসাড় শিথিল হাতখানা আপনিই খসে পড়ে বিভার হাত থেকে। সুগৌর, তখনও-সুন্দর মুখে কে যেন নিবিড় কালি লেপে দেয়। আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে নেয় সুরবালা, নিতে বাধ্য হয়।...

আসলে একটা বড় হিসেবেই ভুল হয়ে গেছে তার। সে চিরদিনই সংসারের বাইরে বাইরে থেকেছে—বাবা মা আর তাকে নিয়ে যে সংসার তা আর পাঁচটা গৃহস্থবাড়ির মতো নয়, তা থেকে ঠিক সংসারের ধারণা করা যায় না। বাকী জীবনও তো কাটল একেবারে সংসারের বাইরেই। মেয়েদের, বিশেষ গৃহস্থঘরের বিবাহিতা মেয়েদের চোখে কত সহজে কত জিনিস ধরা পড়ে—সেই ধারণাটাই সে করতে পারে নি।

আর সেই একই কারণে বিভার চিন্তার সূত্রটা খুঁজে পায় নি, মনের গতিটা ধরতে পারে নি ; কার্যকারণের হিসেবটাও মেলাতে পারে নি তাই।

এইখানেই এ কাহিনীর শেষ। এই পর্যন্তই বলেছিলেন সুরোদি। এর পরে আর বলবার মতো কিছু ছিল না। অন্তত তখন ছিল না। আর একবার অল্পসময়ের জন্যে ছাড়া দেখাও হয় নি তাঁর সঙ্গে। তার পরে কি হয়েছে জানি না। লিখলে সবটাই বানিয়ে লিখতে হয়। কী লাভই বা সে চেষ্টা ক'রে? ওঁদের জীবনেরও তো বলতে গেলে ঐখানেই শেষ। ওর পরে আর কীই বা ঘটা সম্ভব ওঁদের জীবনে—যা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হ'তে পারে? সে জীবনে ঘটনা বলতে কিছু নেই, প্রতিদিনকার এক ছাঁচে ঢালা জীবনযাত্রা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের অনুবর্তন। কোথাও কোন বৈচিত্র্য নেই, পরিবর্তন নেই—তেমন কোন আশাও নেই। চমকপ্রদ কিছু বলবার মতো আর কিছুই ঘটবে না ওঁদের জীবনে। ...এক মৃত্যু; দুজনের একজন আগে যাবেন, তা সেও তো অতি সাধারণ, অবশ্যম্ভাবী। বলবার মতো তাতেই বা কি থাকতে পারে।

না, কাহিনী বলতে আর কিছু নেই।

তবে সুরোদি এই প্রসঙ্গে আরও গোটাকতক কথা বলেছিলেন—যাকে 'অফ দ্য রেকর্ডস' বলে—জনান্তিকে বলার মতোই। কিরণবাবু তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলেই বলবার সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু প্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়াতে সেগুলোও এখানে লিখছি।

কিরণবাবুর কথাই বেশী অবশ্য। আসলে নিজের আচরণের একটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে বোধ হয় অনেকদিন ধরেই ছট্‌ফট করেছিলেন, এতদিন শোনবার লোক ছিল না—মানে শুনতে চাইবার লোক। সেদিন এই প্রসঙ্গ ওঠায় আমাকে বলে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

বিভার কথা বলছিলেন। সেইদিনই শেষ হ'ল তাঁর কাহিনী। অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। বিভার কথাও তার আগে বলা শেষ হয়ে গেছে—তার নিজের বলা ঐ কথাগুলো সুদ্ধ। বলতে বলতে লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে—আর বোধ হয় কিরণবাবুর জন্যে দুঃখে—গলা বুজে এসেছিল তাঁর। কিন্তু এই পরের কথাগুলো যখন বলেন আমাকে, তখন সামলে নিয়েছেন অনেকটা। সামলে নিয়েছেন বলেই বোধ হয় বলতে পারলেন। বুদ্ধিমতী মহিলা—বুঝেছিলেন যে এ প্রশ্ন আমার মনেও উঠবে, উঠেছে হয়ত তখনই—ভবিষ্যৎ কালেও, যদি সত্যিই এ কাহিনী লেখা হয়, আরও অনেকের মনেই উঠবে। সেই জন্যেই আরও বলেছিলেন।

'সেদিন যে বিভাকে কোন উত্তর দিতে পারি নি—তার মানে এ নয় যে, আমার কিছু বলবার ছিল না। সত্যি-সত্যিই আমি একটা পাষাণীর মতোই আচরণ করেছি, নিজের দিকটাই শুধু দেখেছি, ওর দিকটা নয়।...কিন্তু, কথাটা যে ঠিক তা নয়, আমাকে কতকটা নিরুপায় হয়েই ও কাজ করতে হয়েছিল—সে কথা বিভাকে বলে সেদিন কোন লাভ হ'ত না. সে বুঝত না।...কেউই বুঝত না হয়ত। শুধু ও বোঝে,—আমাদের কিরণবাবু। হয়ত তুই বুঝতে পারিস—বইটই লিখতে শুরু করেছিস, মানুষের মনের কথা তো তোদের বোঝবার কথা।...তবে এ এমনই একটা জিনিস—আমিই বোঝাতে পারব কিনা সন্দেহ। স্বার্থপর তো বটেই, সবটা জড়িয়ে দেখলেও—স্বার্থপরের মতোই কাজটা হয়েছে—কিন্তু লোকে যতটা ভাবে ততটা নয়।'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে জপ করলেন সুরোদি, তারপর বললেন, 'ঠিক ধরে

রাখব বলেও ওকে ধরে রাখিনি। চিরদিন রাখব তো নাই-ই, বেশীদিনও রাখব না, এই কথাই মনে ছিল। কিন্তু আজ নয় কাল—কাল নয় পরশু, এই করতে করতে—মানে ঠিক এক দিন এক দিন কি, তা নয়, তোকে বলছি কথার কথা—এই শিগ্‌গিরই ছাড়ব, এই ক'টা মাস বাদে—এমনিই ভেবেছি। আবার সেই ক'টা মাস পরেও ভেবেছি আর দুটো মাস পরে ঠিক পাঠিয়ে দেব—এমনি ক'রেই মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে গেছে। ছাড়া আর হয়ে ওঠে নি। আসলে এখানে এসে একেবারে আতান্তরে পড়েছিলুম। গুরু-বাক্য অমান্য ক'রে এসেছিলুম, মার নিষেধ শুনি নি, তখনও যৌবন ছিল তো—অল্প বয়সের অহংকারে মনে করেছিলুম—খুব থাকতে পারব একলা, ঠাকুর তো রইলেনই, ওঁর সেবা করব ওঁকে নিয়েই থাকব—উনিই দেখবেন। বিশেষ তীর্থস্থান, সাধনভজনের জায়গা—ভয়টা কি?

'কথাটা কি—কলকাতাতেই চিরদিন মানুষ, কটা লোকই বা দেখেছি, কীই বা চিনি জগৎটাকে! এখানে এসে মানুষের যে চেহারা দেখলুম—তাতেই ভয় হয়ে গেল বড্ড রে! না না, চোর ডাকাতের কথা বলছি না, সে ভয় তো ছিলই, আজও আছে—সে আর কিরণ-বাবু থেকেই বা কি করতে পারত—এ অন্য ভয়। তীর্থস্থান আমার মাথায় থাকুন, ব্রজ-ধামের নিন্দে করছি না, ব্রজবাসীদেরও না—এখানকার মানুষ যারা, যাদের সঙ্গে লীলা করতে আমার গোবিন্দ এসেছিলেন—তারা লোক খারাপ নয়, তাদের জন্যেই বলতে গেলে টিকে ছিলুম সেদিন—টিকে থাকতে পেরেছিলুম।...তবে ঐ মোহান্তরা, ওঁদের ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!'

বলেই সামলে নিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'অবিশ্যি সবাই নয়, জপের মালা হাতে—তিনকালও নয়, সাড়ে তিনকাল গিয়ে আধকাল ঠেকেছে—মিছে কথা বলব কেন, সাধু-সন্তুও আছেন বৈকি, মোহান্তদের মধ্যেও কি সবাই খারাপ, তাও না—আর, কি জানিস—বলাও শক্ত, রাধামাধব গোস্বামীকে দেখেছি, খুব নামডাক, একলাখী গোসাঁই নাম তাঁর—এক লাখের ওপর নাকি শিষ্য—কিন্তু তাঁকেও দেখেছি রাত নটার পর আলো হাতে লাঠি হাতে চাকররা তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক শেঠানী শিষ্যার কাছে, সেইখানেই নাকি নিত্য সেবা নিতে যেতেন তিনি। এখনও নাকি যান নিয়মিত। এখন বোধ হয় নব্বুই বছর বয়স হ'ল, আমি যখন থেকে দেখছি তখনও তাঁর বয়স কম না—কিন্তু কি করবেন, শিষ্যার গুরুসেবা করায় সাধ, দীর্ঘদিন ধরে যাচ্ছেন, আগে যেতেন শোকাতাপা সদ্য-বিধবা শেঠানীকে উপদেশ দিতে, সান্ত্বনা দিতে, আগলাতে—অল্প বয়স অনেক পয়সা সে শেঠানীর—এখন যাচ্ছেন অব্যেসে।...তার মধ্যে যে অসৎ কিছু ছিল সেদিনও—তাই বা বলি কি ক'রে, সে বয়স কি সেদিনই তাঁর ছিল?...তবে কতকগুলি মোহান্ত—নমস্কার তাঁদের। সেদিন তোর ঐ লেখাটায় দেখছিলুম না, কী একটা ইংরিজী কথা তুলে দিয়েছিস,—ইংরিজি বুঝি নি তবে তার বাংলা যেটা ক'রে দিয়েছিস ভারি ভাল লেগেছিল সেটা—যে গির্জের যত কাছে আসে, ততই ভগবান থেকে দূরে সরে যায়। খুব খাঁটি কথা।'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মালা ঘোরাবার পর বললেন, 'মার নিষেধ, মাসীর নিষেধ তখন ভাল লাগে নি, দর্পভরে চলে এসেছিলুম ; ভগবানকে নিয়ে থাকব, তাঁর সেবা করব, তাঁকে সন্তানরূপে পাব—এই চিন্তাই মনে ছিল। এখানে এসে কী সব দেখলুম, মন্দিরে মন্দিরে কেচ্ছা, কুঞ্জে কুঞ্জে বেলেল্লাগিরি—কান পাতা যায় না এমন সব কীর্তি! এই বারান্দায় বসে বসেই কত কি দেখেছি। জয় রাধে, কিশোরীমোহন তো সবই জানেন, রাগ করবেন না। ক'টি বড় বড় মোহান্ত সেবাইৎ ছিলেন, নামকরা গুরুও সব এক-একজন—যা পেছনে লেগেছিলেন আমার—সে অবস্থা আজ তোকে বোঝাতে পারব না। তুই ভুল বুঝিস নি ভাই—আবারও বলছি, অনেক সাধুও দেখেছি এখানে, যথার্থ সাধক—সর্বত্যাগী বৈরাগী : এখানে এক—লোকে ঠাট্টা ক'রে বলে বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এয়েছি

বৃন্দাবন—তা তেমনি এক-এক কালের ডাকসাইটে মেয়েমানুষকেও দেখেছি। বারো মাস কুটকুটে খাটো লুই পরে থাকেন, লক্ষ নাম জপ না ক'রে মুখে জল দেন না—সামনে কেউ একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেই কেঁদে ভাসিয়ে দেন। আর তা-ই বা কেন, আমার গুরুদেবও তো এখানেই থাকতেন, অনঙ্গদাদাকেও দেখেছি। এক বাউল আসত মাধুকরী করতে, তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি—তার পায়ের ধুলো পড়লে নরক স্বর্গ হয়ে যাবে এক নিমেষে, এমন সহজ শুদ্ধাভক্তি তাঁর—আবার এদেরও দেখলুম—এই বড় বড় নামকরা গোসাঁইদের। কামিনী আর কাঞ্চন—যে দুটির ওপর আসক্তি বাইরে রেখে ব্রজে আসার কথা—সেই দুটিতেই এঁদের সমান টান, বিষয় আর মেয়েছেলে—এই দুইয়ের জন্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা, মার লাঠালাঠি, খুনোখুনি পর্যন্ত—কী না চলত এখানে। আমার পেছনেও লাগল—একজন নয়—এমনি চার-পাঁচজন। এধারে তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, কিন্তু আমার ব্যাপারে সব যেন এক-কাট্ঠা হয়ে গেল।'

বলতে বলতে—বোধ করি পুরনো দিনের সেই দুঃস্বপ্ন-দেখা দিনগুলো মনে পড়েই শিউরে উঠলেন সুরোদি, আলোর সেই অস্পষ্ট আভাসেও সেটা টের পেলুম।

একটু থেমে দিদি আবার বললেন, 'সে যে কী দিন কেটেছে, তোকে বোঝাতে পারব না। এক-এক সময় মনে হয়েছে আর বুঝি পারলুম না। গুম্ খুন করবে ব'লে ভয় দেখিয়েছিল একজন, বলেছিল চিহ্ন পর্যন্ত পাবে না কেউ—এমনিভাবেই সরিয়ে দেবে। ওদের নাকি সব মাটির নিচে গারদখানার মতো ঘর থাকত, বেশী ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে সেইখানে নিয়ে গিয়ে চাকরবাকর লেঠেল-বরকন্দাজ দিয়ে বেইজ্জৎ করাত। আমাকেও সেই সব ভয় দেখিয়েছে।...গুণের তো ঘাটও নেই, আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি ভিড়ের মধ্যে থেকেই অল্পবয়সী বৌ-ঝি উধাও হয়ে যেতে—দ্যাখ দ্যাখ—আর দ্যাখ! তা যা বলছিলুম, বিপদ কি আর এক রকমের। আমার পুজুরী ছেলে—তখন শোভারাম আসে নি, এ বেশ চৌকস—সে আর ঝি তো ভয়ে কাজ ছেড়ে চলে যায়, তাদের সুদ্ধ নানা রকম ভয় দেখাত—এমন দিন গেছে শুধু অন্ন ঘি ছিটিয়ে নিবেদন করা হয়েছে, বলি এই খাও ঠাকুর, যেমন তোমার ব্যবস্থা তেমনি খেতে হবে। রাত্রে শুধু একটু ভুরা চিনি—আর কিছু জোটে নি। ওরা ভরসা ক'রে বাজারে বেরোতে পারত না—আমি কিরণবাবুকে যেতে দিতুম না। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা দিন-রাত।

'অবস্থা শুনে আমার ব্রজবাসী পাণ্ডা যোগাযোগ করলেন। তিনিই হাটবাজার পৌঁছে দিতে লাগলেন—তা তাঁর ওপরও কী টাঁইশ।...শেষে ব্রজবাসী ঠাকুরই গিয়ে অনঙ্গদাদাকে খবর দিতে—তিনি ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, দু-তিনটি গোয়ালা এসে শুতে লাগল কুঞ্জের এই উঠোনে, তারা নাকি নামকরা লেঠেল সব, তাদের নামে সকলে ভয় পায়। অনঙ্গদাদা বললেন এ নিয়ে থানা-পুলিস ক'রেও কোন লাভ হবে না। এখানে কেন মথুরায় গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবকে জানালেও হবে না, সব নাকি হাতের মুঠোয় এদের। অনেক থানাদার নাকি মাস মাস মাইনে খাবার মতো টাকা নেয় এদের কাছ থেকে। তাছাড়া, এ তো সব শাসানি, এর আর নালিশ-মোকদ্দমা কি, সাক্ষীসাবুদই বা কোথায়, উড়ো কথা বই তো নয়, কেউ তো এক কলম লিখেও শাসায় নি।...তাও, ঐ লেঠেলগুলো শুয়ে থাকত—তা সত্ত্বেও এক-একদিন রাতদুপুরে সদর দরজায় দমাদম লাথি পড়ত, একদিন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল। পাড়ার লোক সব ভয়ে কাঁটা—জনপ্রাণীও বেরোত না কেউ, ভয়ে।'

বলতে বলতে হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন সুরোদি,—সম্ভবত ক্লান্তিতেই। কিম্বা মনের মধ্যে হাতড়ে সেদিনকার হারিয়ে-যাওয়া কথাগুলোর খেই ধরবার চেষ্টা করছেন। একটু পরেই মালাটাকে কপালে ঠেকিয়ে থলির মধ্যে পুরে বললেন, 'শুধু কি ভয় দেখানো। লোভও কি কম দেখিয়েছে ওরা? কেউ বলে দু হাজার দোব, কেউ বলে পাঁচ হাজার।

...সোনায় গয়নায় গা মুড়ে দেবে, হীরে জহরতে অরুচি ধরিয়ে দেবে—এই সব চার ফেলত। দূতগুলিও ছিল সব তেমনি—ঘুঁটেউলী ঘুঁটে দিতে এসেছে, কাঠউলী কাঠের বোঝা নিয়ে—ফুলউলী ফুল দেয়—এ ছাড়া তো কাউকে ঢুকতে দিতুম না—তারাই এসে কথায় কথায়, এটা-ওটা কথার ফাঁকে ফাঁকে বলে যেত ইশারা-ইঙ্গিতে।...আমি হাসতুম মনে মনে। টাকাতেই যদি ভুলব তো এ ফকীরাবাদে মরতে এলুম কেন! সেখানে আমার কি অভাব ছিল টাকার? তা সে যাই হোক,—আরও সেই জন্যেই কিরণবাবুকে ছাড়তে পারি নি। বুঝেছি অন্যায়, বুঝেছি খুব অবিচার করা হচ্ছে, সতীলক্ষ্মীর চোখের জলের দেনা আসছে-জন্মে দশগুণ চোখের জলে শোধ করতে হবে—তবু পারি নি। যখনই মনে হয়েছে আমি একা, কেউ নেই—এ শত্রুপুরীর মধ্যে আমি একটা মেয়েছেলে শুধু—পূজুরী বলো, ঐ আহীরগুলো বলো, সবই তো নতুন, অচেনা, কার মনে কী আছে তা কে জানে—তখনই যেন হাত-পা ভেঙে এসেছে, বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেছে। তখনই মনকে বুঝিয়েছি য়্যাদ্দিনই যখন গেল তখন আর কটা দিন যাক না—দু মাস চার মাস যাক আরও—তখন জোর ক'রেই পাঠিয়ে দেব।'

তারপর একটু মুচকি হেসে বলেছেন, 'মুখে যতই বলি ভগবান ভরসা, বলার সময়ই কিন্তু মনে মনে একটা মানুষকে উপলক্ষ ঠিক ক'রে রাখি। মানুষের মধ্যেই ভগবান—আমাদের শাস্ত্রেও তাই বলে, সেইজন্যেই ভগবান লীলা করতে মানুষের রূপ ধরেন—আমাদেরও গুরু ধরতে হয়।...আমার বাবা আবার যেখানকার সেবক ছিলেন—ঐ তো বললুম তোকে ঘোষপাড়া—কাঁচড়াপাড়ার কাছে, গঙ্গার ধারে—যাস না একবার,—সেখানে গুরু গোবিন্দ এক ধরা হয়। ওঁরা বলেন 'মানুষ'। মানুষ মানে গুরু, মানুষ মানে ভগবান। চণ্ডীদাসের পদে আছে সবার উপরে মানুষ সত্য...সে ঐ মানুষই, ওঁরা বলেন কর্তা। যে কর্তা, সে-ই মানুষ, সে-ই ভগবান।...তাই আমিও এই মানুষটাকে ছাড়তে পারি নি, শুধু ভগবানের ভরসায়। ভগবান দেখবেন—এই বিশ্বাসই থাকা উচিত, থাকেও কারও কারও—কিন্তু আমি পারি নি রাখতে।...তারপর—এমনি ক'রে যখন বছরের পর বছর কেটেছে, পাঁচ-ছ বছর হয়ে গেছে, তখন আর ছাড়া সম্ভব ছিল না। হাতে এখনও মালা রয়েছে—মিছে কথা বলতে পারব না—তখন কিরণবাবুর সঙ্গ আমার অব্যেস হয়ে গেছে, স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—তখন আর ওকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।'......

আর একটু থেমে, কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা গলায় বলেছিলেন, 'আসল অন্যায় ঐখানটাতেই হয়েছে। বিভা বলেছিল মহাপ্রাণ মানুষ—ঠিকই, তবু মনে হয় কিরণবাবু আরও বড়। কত যে বড় তা বিভাও বোঝে নি। আজ, তোকে সব কথাই যখন বলতে বসেছি এও গোপন করব না—আজ আমার আপসোসের শেষ থাকে না যখন কথাগুলো ভাবতে বসি। অত বড় একটা লোকের জীবন মাটি ক'রে দিলুম, সেই সঙ্গে নিজেও মাটি হলুম। না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে।

'আসল কথা কি জানিস—অহঙ্কার। ইহজীবনটা অহঙ্কারেই মাটি হয়ে গেলুম। দর্পহারী কিশোরীমোহন পদে পদে সে অহঙ্কার ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছেন—তবু শিক্ষা হয় নি। বামুনাইয়ের অহঙ্কার ছিল, রাজাবাবুকে দিয়ে সেটা ভাঙলেন ; গলার অহঙ্কার ছিল,—এক ঢিলে দুই পাখী মেরে তাও ভেঙে দিলেন ; এই তো বেঁচে রয়েছি, এমন কিছু অক্ষ্যাম হয়েও পড়ি নি, অথচ আজ আর—আমি যে এককালে গাইয়ে ছিলুম—সেকথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না—গুন গুন ক'রে গাইতুম তাও ছেড়ে দিয়েছি—গাইতে গেলে গলায় তিন রকম আওয়াজ বেরোয় এক এক সময়—নিজেরই কানে লাগে।

'শেষে এই সতীগিরি—সেই অহঙ্কারেই অত বড় দিব্যিটা গালা, ওকে দিয়েও গালানো। অথচ আজ—এই নিত্যি দুবেলা ভগবানের কাছে জানাচ্ছি যে, মুক্তি নয় আবার জন্মই দিও কিন্তু বৈষ্ণবরা যে কারণে জন্ম চায় সে কারণে আমি চাই না। আমি চাই

এ জন্মের দেনা আসছে জন্মে যাতে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে যেতে পারি, ইহজন্মে ওর যে ক্ষতি করলুম, যে দুঃখ দিলুম—সামনের জন্মে যেন প্রাণভরে ভালবেসে, ওর সেবা ক'রে এই ক্ষতি পূরণ করতে পারি! না, রাজাবাবু নয়—তাঁকে ঢের দিয়েছি, ইহজন্মের যা কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস সব তাঁকে দিয়েছি—রূপ যৌবন ভালবাসা—আমার এত সাধের, এত সাধনার জিনিস—আমার গান—সব দিয়েছি। আবার কেন? না, রাজাবাবু আর নয়—সামনের জীবনে শুধু এ থাকবে—এই কিরণবাবু। শুনাব—ঐ রাজাবাবুর ছবিটা আমি যমুনায় দিতে চেয়েছিলুম ; কিরণবাবু দিতে দেয় নি, বলেছে, না, ওঁর জন্যে যখন এতই করলে—তখন একেবারে শেষ ক'রে দিও—চিতেয় নিয়ে উঠো। তা আমিও বুঝেছি, বলেছি, মন্দ নয়, যেটুকু বাকী আছে, শেষ হয় তাহ'লেই।...

'অহঙ্কার বৈকি! এই অহঙ্কারেই মাকে আঘাত দিয়েছি, মাসীকে আঘাত দিয়েছি। অথচ কোনটাই তো রাখতে পারি নি।...ঠাকুরকেই কি পেলুম? কৈ, সে বিশ্বাস—সে ভালবাসা কৈ? তাঁকে তো কৈ আজও সন্তানরূপে ভাবতে পারি না, কান্তরূপেও না। যখন সে ভাবে চিন্তা করি, কিরণকে দেখি। এখনও রাস্তা দিয়ে ফুটফুটে ছেলে যেতে দেখলে হাহাকার ক'রে ওঠে মন।...পয়সার লোভ—তাই বা গেছে কোথায়? মিছিমিছি কতকগুলো লোক-দেখানো ভড়ং করেছি শুধু। পয়সা ঠেলে চলে এসেছি—বাহবা কুড়োবার লোভে। এখনও তো সব যক্ষির মতো আগলে রাখি—কি ক'রে একটা আধলা বাঁচাব তার চিন্তা করি।...শুনবি মজা? সেই যে গয়না দুটো রেখেছিলুম—কিরণবাবুর ছেলে আর মেয়েকে দোব বলে—সে দুটোও প্রাণ ধরে দিতে পারি নি তাদের বিয়ের সময়। সেই যে প্রথমে এসেই লুকিয়ে রেখেছিলুম—চোর-ডাকাতের ভয়ে, এই ঘরের দেওয়ালের মধ্যে চোরা বাক্সয়—এখনও আছে। এই তোকে বলতে বলতে মনে পড়ল—ভুল? দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না বলেই ভুল, নইলে এত কথা মনে থাকে, ওটাই বা ভুলব কেন?...এবার সুরেনকে একবার আসতে লিখব অতি অবিশ্যি ক'রে—এলে বুঝিয়ে দোব। নইলে হয়ত ঐখানেই পড়ে থাকবে, কেউ জানতেও পারবে না।'

একটু যেন দম নেবার জন্যেই থামলেন একবার। কিন্তু পরে যখন কথার খেই ধরলেন আবার, গলাটা খুব স্নিগ্ধ শোনাল, 'ঐ একটা সান্ত্বনা ভগবান দিয়েছেন আমায়। সুরেন খুব ভাল হয়েছে। এক-আধবার এসেওছে, যখন চিঠি লেখে বড়মা বলে সম্বোধন করে, এই একটা নিশ্চিন্তি মনে হয় এখন—যতদিন সুরেন থাকবে আমার কিশোরীমোহনের সেবা বন্ধ হবে না।'

বলতে বলতেই আবার সেই আগেকার আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গীতে ফিরে যান, 'কিন্তু তার জন্যেই কি খুব একটা মাথাব্যথা আছে? ঠাকুরের জন্যে? মিছে কথা। সেও "আমি"। আমি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছি, সেই সেবা না বন্ধ হয়। এত যদি প্রেম তো ঠাকুরকে পেলুম না কেন—তিনি সব ভুলিয়ে আমার মন ভরিয়ে এলেন না কেন? আসলে সব মিথ্যে—চিরদিন একটা-না-একটা মিথ্যে অহমিকার পেছনেই দৌড়লুম। কিছুই পেলুম না, পাবার কথাও না। গর্তের ব্যাঙ নিজেকে হাতী বলে ভেবে এলুম চিরকাল, ভগবানকে হাসালুম, লোক হাসালুম।...যদি সত্যিই আমাকে নিয়ে বই লিখিস কোনদিন—এ কথাগুলো বুঝিয়ে দিস। আমার মতো আর কোন বোকা যাতে এমনি মিথ্যে মরীচিকার পেছনে, ফাঁকো অহমিকার পেছনে ঘুরে নিজের সর্বনাশ না করে, তার চেয়ে বড় কথা—অপরের সর্বনাশ না ক'রে বসে।...কী সর্বনাশটাই না করলুম বল দিকি!...দু-দুটো প্রাণ নষ্ট হ'ল—ওদের সংসারটাই তো ভেঙ্গে দিলুম বলতে গেলে। বাপ থাকতে ছেলেমেয়ে দুটো অনাথের মতো মানুষ হ'ল...ছেলে যে মাপ করেছে আমাকে, বিভাও যে এখনও আমার খোঁজ নেয়—এ তো তাদের মহত্ত্ব।...রাধে রাধে!...নেঃ, তোকে উজাড় ক'রে দিলুম মনের সব কথা। ভালই হ'ল, বোঝা নেমে গেল। ক্রেস্তানদের শাস্তর বলে শুনেছি, কারও কাছে

নিজের পাপের কথা শোনালে সে পাপ স্খালন হয়—অন্তত সে কাজটা তো হয়ে রইল।'

সুরোদির এ শেষ কথাটা অবশ্য রাখা যায় নি। ঐ কথাগুলো—তাঁর জীবনের এই সার-সত্য-উপলব্ধি—বলতে গেলে তাঁর জীবনদর্শন, আমি এ উপন্যাসের মধ্যে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারি নি। পারতুম, যদি এ বই আরও টানা যেত—যদি সুরোদির মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত। কিন্তু সে জীবনী হ'লে অনায়াসে হ'তে পারত— উপন্যাস আর টানা যায় না। তার মাল-মশলা ফুরিয়ে গেছে।

উপন্যাসের মধ্যে দেওয়া গেল না বলেই কথাগুলো—ঠিক যেমন দিদি বলেছিলেন— সেইভাবে এখানে তুলে দিলুম। আর কিছু না হোক, কিরণবাবু আর সুরোদি সম্বন্ধে যে কৌতূহলটা উপন্যাসে সম্পূর্ণ মেটে নি— সেটা এ থেকে মিটতে পারে।

॥ উপসংহার ॥

এর অনেক বছর বাদে—এই উপন্যাস লেখা শুরু হওয়ারও বেশ কিছুদিন পরে—গত ১৯৬৬ সালের মে মাসে, এক সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে একবার বৃন্দাবন গিয়েছিলুম। তখন আর সুরোদির বেঁচে থাকার কথা নয়, নেই তাও জানি, এমন কি সুরেন বেঁচে আছে কিনা তা-ই সন্দেহ—তবু একবার কুঞ্জটা ঘুরে আসার আগ্রহ দমন করতে পারি নি।

কিসের কৌতূহল, ঠিক কি দেখতে চাই—কি দেখার আশা রাখি—কিছুই জানি না। অত ভেবেও দেখি নি। আগে থাকতেও ভাবা ছিল না কিছু। শুধু বৃন্দাবনে পৌঁছবার পর থেকেই কে যেন অদম্য বলে ঠেলতে লাগল আমাকে—কী যেন অদৃশ্য অথচ অমোঘ আকর্ষণ। শুধুই কি কৌতূহল, না তার সঙ্গে কিছু ভাবপ্রবণতা, কিছুটা বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি—কিছুটা নস্ট্যালজিয়া ?...

অবশ্য একটা কথা নিজের মনেই বুঝেছিলুম, বৃন্দাবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—সে স্মৃতির বৃন্দাবনকে আমি আর খুঁজে পাব না। রাস্তাঘাট, সে রাস্তাঘাটে যারা চলা-ফেরা করছে—তারা কেউই বা কিছুই সেদিনের নয়। সেদিনের বোধ করি কোন চিহ্নই নেই কোথাও, মন্দিরের ইমারৎগুলো ছাড়া। ইমারৎ আর বিগ্রহ—বদলানো সম্ভব নয় বলেই বদলায় নি।

সে যাই হোক, প্রথম দিনই একটা সুযোগ মিলে গেল। সাহিত্যিক বন্ধু—যাঁরা এক জায়গায় উঠেছিলুম—তাঁরা স্থির করলেন সেই দিনই বিকেলে মোটামুটি দর্শনগুলো সেরে ফেলবেন। আর যেহেতু তাঁদের মধ্যে আমিই যা বার-কতক বৃন্দাবনে গিয়েছি—সেই হেতু আমার ওপরই ভার পড়ল দর্শনের, ভ্রমণসূচী তৈরী করার, রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গে দরদস্তুর করার এবং কতকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ারও।

রিক্‌শার ব্যবস্থা পরে, হাতের কাছে যেগুলো সেগুলো হেঁটেই সেরে ফেলব, এই স্থির ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। ঠিক হ'ল—গোবিন্দজী, রঙ্গজী, ব্রহ্মকুণ্ড, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ লালাবাবুর মন্দির এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি ও সাক্ষীগোপালের পরিত্যক্ত মন্দির (এবার গিয়ে দেখলুম প্রায় সমভূমি হয়ে গেছে ভেঙে—অমন সুন্দর মন্দিরটি)—যা কাছাকাছির মধ্যে একটা চক্রে পাই—দর্শন ক'রে ঐখান থেকে রিক্‌শা করব—রাধারমণ, মদনমোহন, গোপীনাথ, বঙ্কুবিহারী, রাধাবল্লভ, শাহজীর মন্দির, নিধুবন, নিকুঞ্জবন প্রভৃতি সেরে নেব। অবশ্য বেরোতে বেরোতে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছিল, সবগুলো আর হয়ে ওঠে নি সেদিন—তবে বেশির ভাগই হয়েছিল। হয় নি বোধ হয় নিকুঞ্জবন শুধু।

এই হেঁটে যাওয়ার প্রস্তাবের মধ্যে আমার একটু মতলব ছিল। গোবিন্দজী দর্শন ক'রে শেঠীদের মন্দির অর্থাৎ শ্রীরঙ্গজীকে দর্শন ক'রে পাশের পরিচিত গলি ধরলুম আমি, যেটা ব্রহ্মকুণ্ডের পাশ দিয়ে গিয়ে সেই বিশেষ রাস্তাটিতে পড়েছে। পড়েছে একেবারে সুরোদির কুঞ্জের প্রায় সামনা-সামনি। সেইখানে এসে বন্ধুদের খুলেই বললুম, 'আমার এখানে একটি দর্শন আছে, আপনারা তাতে ইণ্টারেস্টেড হবেন না—অখ্যাত সামান্য মন্দির, তবে আমার একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি জড়ানো আছে বলেই আমি যেতে চাই। আপনারা ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপেশ্বর দর্শন ক'রে আসুন—আমি এইখানেই আছি।'

পথ ভুল হবার কোন কারণ নেই, কারণ সেখান থেকে কয়েক পা গেলেই লালাবাবুর

মন্দির, মন্দিরের পিছনটা এখান থেকে সোজা নাক-বরাবর। তার পাশ দিয়ে গোপেশ্বরের রাস্তা। ওঁদের আটকে রাখতে চাইলাম না এই জন্যে যে, অকারণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লে অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন—নানা রকম প্রশ্নও বর্ষিত হ'ত—'এখানে কি, কিসের এত আগ্রহ' ইত্যাদি। নিজের মতো ক'রে দেখার সময় পেতুম না, কতক্ষণ আর ওঁদের দাঁড় করিয়েই বা রাখা যায়! তাছাড়া সময়াভাবের জন্যে তাগাদা দিচ্ছি—আমিই যদি খামকা এক জায়গায় দেরি করি—ওঁরা কি ভাববেন?...এ তবু ওঁদের ঐ দু জায়গায় দর্শন সেরে ফিরে আসার মধ্যে অনেকটা সময় পাব।

বন্ধুরা এগিয়ে গেলে আমি কুঞ্জের সামনে এসে দাঁড়ালুম। ঐ তো ওপরের সেই বারান্দা, যেখানে আমাদের নৈশ আসর বসত। সেই দিকেই আগে নজর পড়া স্বাভাবিক। দেখলুম ওপরের দুটো ঘরেই দোরজানলা বন্ধ, বাইরে সেই পাখীর খাঁচাটা টাঙানো থাকত যাতে—সেই লোহার মুখ-বাঁকানো শিকটা এখনও ঝুলছে। তবে বারান্দাতে স্থান বিশেষ নেই বললেই হয়—বস্তা ক'রে ক'রে কি সব স্তূপাকার রয়েছে—সম্ভবত ঘুঁটে কিম্বা ছোবড়া—ঐ জাতীয় কোন জিনিস। গুলও হ'তে পারে—তবে বস্তাগুলো তত কালো নয়, কয়লাজাত কোন বস্তু হ'লে তার চিহ্ন থাকতো। হয় কোন গদি-ছেঁড়া বা গদির জন্যে আনা ছোবড়া—কিম্বা ঘুঁটেই। নিচের ঘরেরও রাস্তার দিকের একটা জানলার ওপরে একটা পাল্লা আধখোলা—আর সব বন্ধ। সদর দরজাও বন্ধ। হয়ত বর্তমান গৃহ-স্বামী বা পূজারীরা ঘুমোচ্ছে তখনও—ওদেশে শেষা-বৈশাখের অপরাহ্ণ-বেলা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ঘুমের সময় একেবারে যায় নি।

ফিরেই আসছিলুম, কি মনে হ'তে গিয়ে বিল্লীটা ঘোরালুম। বিল্লী খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, ঠেলা দিতে কপাটও খুলল। অর্থাৎ খিল দেওয়া নেই, তার মানে ঠাকুর এবং তাঁর সেবকরা উঠে পড়েছেন।

সেই সরু পথ, সামনে উঠোন পেরিয়ে মন্দির, তার সামনে সংকীর্ণ রক, তার ওপরে সেই ফুলকাটা পাথরের খিলেন। তুলসীমঞ্চটিও তেমনি আছে, নেই শুধু হলদে চিনে-কলকের গাছটা। বোধ হয় মরেই গেছে, কম দিন তো হ'ল না। বাঁদিকে সেই কুয়াতলাটা —যেখানে প্রথম দেখা হয় সুরোদির সঙ্গে। সেই কপিকলে গলানো দড়ি, তাতে লোহার ডোল বাঁধা তেমনি, কপিকলের কাঠ দুটোর নিচে পড়ে আছে। আর পড়ে আছে একটা পেতলের ভারী এদেশী লোটা—কুয়াতলার চারদিকের পাথরের নিচু বেষ্টনীর গায়ে ঠেকে কাত হয়ে। লোটা, ডোল, দড়ি—সবই শুকনো, কুয়াতলাও। হয়ত বহুক্ষণ কারও জল তোলার দরকার হয় নি।

কিন্তু মানুষ কোথায়?

কুঞ্জবাসীরা?

এদিক ওদিক চেয়ে ভয়ে ভয়ে একটু এগোলুম। বাঁহাতি নিচের ঘরটার দরজায় তালা দেওয়া—যে ঘরে রোজে থাকত, এদিকেও একটা জানলার একখানা পাল্লা খোলা—কিন্তু গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে সাহস হ'ল না। কেউ কোথাও নেই, একা ঢুকেছি—তার ওপর উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলে কেউ যদি চোর বলে ধরে! আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শুনেছি উকীল, সেই যা একটু ভরসা—কিন্তু সে তো পরের কথা, আগেই তো মারধোর হয়ে যাবে একচোট, সন্দেহ-মাত্রেণ!

একবার একটু গলাখাঁকারি দিলুম। 'পূজারীজী' বলে ডাকলুম একবার। প্রথমটা আস্তে ডেকেছিলুম, পরে আরও বার-দুই বেশ জোরেই ডাকলুম—কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না। সেই নিদাঘ অপরাহ্ণের তপ্ত আবহাওয়ায় খাঁ খাঁ করতে লাগল নিস্তব্ধ জনহীন কুঞ্জটা।...

অতঃপর ফিরে যাওয়াই উচিত, কিন্তু ভেতরে ঢুকে কুঞ্জস্বামীকে দর্শন না ক'রে

ফিরতেও মন চাইল না। সুরোদির অত আদরের, এত সাধের কিশোরীমোহন। আমারও টান খুব কম নয়—বহুদিন আরতির ঘড়ি বাজিয়েছি এইখানে দাঁড়িয়ে—কর্মহীন দিনের প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা কেটেছে শোভরামের নিপুণ হাতের সেবা দেখে।

ঠাকুর উঠেছেন এতক্ষণে, ঝারাও সরানো হয়েছে নিশ্চয়, কে জানে বৈকালী হয়ে গেছে কিনা। ঠাকুর যে উঠেছেন তার প্রমাণ ভেতরের কাঠের কপাট খোলা—বাইরে শিকের কপাট টানা শুধু, যেমন এখানকার নিয়ম। লোকজন যখন কেউ থাকে না—বিশেষ এই বিকেলের দিকে—শিকবসানো দরজাটাই দেওয়া থাকে, যার গরজ সে শিকের ফাঁক দিয়ে দেখে যায়।

আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। জুতো আগেই খুলেছি—ওদিকে। দালানেও উঠলুম সসঙ্কোচে। আর একবার ডাকলুম 'পুজারীজী' বলে—কোন ফল হ'ল না। তখন শিকের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারলুম। ঠাকুরঘরে একটা প্রদীপও নেই, সামান্য যা আলো বাইরে থেকে শিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা আমার বপুতেই অনেকখানি ঢেকে গেছে আবার ; তবু তাতেই—শিকের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখ সয়ে যেতে দর্শনও হ'ল। সেই কিশোরীমোহন, সেই চূড়া, সেই বাঁশী। বাঁশীর সেই ঠেকো। সামনে নিচের ধাপে গোপাল এবং কয়েকটা পট, সুরোদির গুরুদেবের ছবি—যেমন তখনও ছিল। তবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে আগে অষ্টধাতুর রাধারাণী ছিলেন—এখন দেখলুম শ্বেত পাথরের। কে জানে, সে মূর্তি চুরি গেছে কিম্বা ভেঙে গেছে কিনা। অথবা আমারই ভুল, বরাবরই হয়তো পাথরের ছিল।...

দর্শন শেষ ক'রে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। সবই ঠিক আছে—কেবল মানুষই নেই। ভেতরে রান্নামহলে যাবার যে দরজাটা সেটায় একটা শেকল তোলা মাত্র—চাবি-তালা কিছু নেই। অথচ ঐ মহলেই যাবতীয় বাসনপত্র, ভাঁড়ার প্রভৃতিও ঐখানেই থাকার কথা। ওখান দিয়ে মন্দিরেও আসা যায়, ঠাকুরের গহনাপত্রও অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে কেউ এসে। কে জানে, হয়ত সেদিকের দোরে তালা দেওয়া আছে একটা।...ঠাকুরদালান থেকে বারমহলের ওপরের ঘরটাও যতদূর দেখা গেল—বন্ধ। তালা দেওয়া কিনা এখান থেকে দেখা গেল না।

ঠাকুর আছেন, কুঞ্জও আছে—কিন্তু সেবাইৎ পুজারী কোথায় গেল?

সম্ভবত পুজারীই একজন আছে, সে অন্য কোন কুঞ্জে গেছে সেখানকার কুঞ্জস্বামীর ঘুম ভাঙাতে। এই এক জায়গার মাইনেতে বোধ হয় তার চলে না। হয়ত সেবাইৎ পক্ষের কেউই নেই এখানে। মূল্যবানও কিছু নেই। তাই চাবি দেওয়ার কথাটা পুজারীর মনে পড়ে নি। কিন্তু এই তো লোটাটা পড়ে আছে, ডোলটাও। ঠাকুরঘরে ঠাকুরের মুকুট বাঁশী, রাধারাণীর হাতের বালা—হয়ত ভেতর মহলে এমনি অবহেলায় কিছু বাসনও পড়ে আছে। তবে কি আজকাল ব্রজধামে চুরি ডাকাতি হয় না, রাতারাতি সবাই সাধু হয়ে গেছে?...

কিন্তু সে যাই হোক, আমার বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হ'ল না। পুজারী বা আর কেউ যদি এসে পড়ে—ঠিক চোর ভাববে। বানরের ভয়ে সদরে আবার বিল্লী লাগিয়ে এসেছি। বন্ধ বাড়ির মধ্যে একটা অপরিচিত লোক—কী মতলবে এসেছে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

তবু, যেতে গিয়েও একবার তাকিয়ে দেখলুম। এই বাঁধানো উঠোন, ঠাকুরদালান—সুরোদি পরিহাস ক'রে যাকে নাটমন্দির বলতেন, আসলে যা আড়াই হাত চওড়া রক ছাড়া কিছু নয়—ঝকঝক করত পরিষ্কার, নিত্য দুবেলা ধোওয়া-মোছা হ'ত। ঠাকুরঘরেও—যা নজরে পড়ল—তথৈবচ অবস্থা। বেশ যতদূর সম্ভব মলিন, বিবর্ণ : রুপোর মুকুট পালিশের অভাবে কলঙ্কিত, একটা নিয়মরক্ষার মতো প্রদীপও জ্বলছে না, ঝারার তো

কোন চিহ্নও দেখলুম না। ঝারা বসালে বৈকালীও দিতে হয়—সেই জন্যেই সম্ভবত দুটোই বাদ গেছে। শিকের খাঁচার মধ্যে নিরুপায় নিঃসঙ্গ কিশোরীমোহন অসহায় অবস্থায় সামনের ফাঁকা বাড়িটার দিকে চেয়ে বসে আছেন—সম্ভবত কবে কে দয়া ক'রে এই বিগ্রহ জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঠাকুরসেবার এই অভিনয়ের পালা শেষ ক'রে দেবে, তাঁরও অব্যাহতি মিলবে—এই প্রতীক্ষায়!...

ছায়াছবির মতো ভেসে ভেসে গেল দৃশ্যগুলো।

এখানে, দালানের বাঁ পাশে, পুঁথির বোঝা জপের মালা প্রভৃতি নামিয়ে ঈষৎ ধূর্ত চোখ মেলে সুরোদি বসে চা খাচ্ছেন। ধাক্কা দেওয়া সিমলের ধুতির চুনোট-করা কোঁচার প্রান্তটা কোমরে গুঁজে কিরণবাবু নিঃশব্দে এসে চা দিয়ে যাচ্ছেন, দিনে পাঁচবার আরতির ঘড়ি বাজছে—সুরোদি নিজে বাজাচ্ছেন, রাতে কিরণবাবু উপুড় হয়ে পড়ে টেবিল-ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোতে খাতা লিখছেন, আপিংয়ের মৌতাতে ঈষৎ-ঢুলু-ঢুলু চোখে বারান্দায় বসে মালা জপছেন দিদি, সেই মালিশের গন্ধ—

কিন্তু সে সবই স্বপ্ন-কথা।

বহুদিনের বহু যুগের কথা।

তারা কেউই নেই আর। তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, তাদের বাসনা কামনা, তাদের প্রেম আবেগ অহঙ্কার জেদ—তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা—সবসুদ্ধ কোথায়, জীবন পরিণামের কোন্ সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। এই ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পেছনে যে মর্মান্তিক ব্যথা ছিল আর ঐকান্তিক আশা—তারও এতটুকু ইতিহাস লেখা নেই কোথাও। যে সেবাইৎ আছেন তাঁরও এত মাথা ঘামানো সম্ভব নয়—আজকের ব্যয়বাহুল্যের দিনে সেদিনের বাঁধা নগণ্য আয়ে ঠাকুরের সেবাই হয়ত ভালভাবে চলে না—তাঁর অর্থাৎ সে সেবাইতের ভরণপোষণ আরাম তো দূরের কথা। সেদিনের জমিদারীও আর নেই যে তাঁর বাড়ি থেকে এনে আরও কিছু টাকা ঢালবেন। সুতরাং ঠাকুরকে তাঁর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

হায় সুরোদি! সেদিন যদি জানতে, যদি আজকের এই পরিণাম দেখতে পেতে!...

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিবাস্বপ্ন দেখার আর সময় নেই। চোর বলে ধরা পড়বার ভয় তো আছেই—ওধারেও ওঁরা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুরে এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করলুম। কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে একটু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলুম, 'বাড়িতে কেউ নেই?'

এইবার অদ্ভুত একটা ব্যাপার হ'ল। এতক্ষণ ওদিকে ডাকাডাকি করেছি কোন প্রতিধ্বনি শুনি নি—এখন বোধ হয় কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক দেবার ফলেই—পাথর-বাঁধানো গভীর পাতকুয়ার অতল থেকে একটা প্রতিধ্বনি উঠল—'নেই, নেই, নেই!'

এই শূন্য জনহীন কুঞ্জে সেই প্রায়-অপ্রাকৃত প্রতিধ্বনি—কেমন যেন গা শিউরে উঠল।

আর কে জানে কেন—এই বুড়ো বয়সেও দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে গেল। চোখের জলেই এ বাড়িতে প্রথম আসা, চোখের জলেই শেষ!...

দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়লুম আবার।

ভাগ্যিস, তখনও বন্ধুরা ওদিক থেকে ফেরেন নি, যমুনা-পুলিনের দিকে গিয়ে পড়েছেন বোধ হয়। নইলে কি মনে করতেন!

—শেষ—

তবু মনে রেখো

বারাণসী প্রবাসী

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য

সুহৃদবরেষু

না, গল্প বা উপন্যাস এটা নয়। আদৌ কোন গল্প হ'ল কিনা তাও জানি না। হ'লে—সে গল্প বিধাতারই রচনা, আমার নয়।

আমি বলছি অনেকদিন—ধরুন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

আমরা তখন কাশীতেই থাকি। বছর আটেক-নয় বয়স আমার। হঠাৎ মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রান্না করা কি আগুন-তাতে যাওয়াই নিষেধ হয়ে গেল।

আমাদের কোন অসুবিধা হ'ল না বিশেষ। নামকরা হোটেল 'পার্বতী আশ্রম'-এ মাথাপিছু মাসিক ছ'টাকা হিসেবে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। পার্বতী ঠাকুর হোটেল চালাতেন, নিজেই রান্না করতেন অনেক সময়। দশাশ্বমেধ রোডের ওপর হোটেল। সেখানে এখন অন্য হোটেল হয়েছে।

সে যাই হোক বিপদ বাধল মাকে নিয়ে, বিধবা মানুষ—কার কাছে খাবেন?

রাঁধুনী রেখে রান্না করানো হবে, সে সঙ্গতি তখন ছিল না।

বেশ কয়েক দিন আধা-উপোসে কাটাবার পর একটা সুরাহা হ'ল।

আমাদের পাশের বাড়ির নিচের একটা ঘরে ভাড়া থাকতেন গোসাঁইগিন্নী, ও-পাড়ার বৃদ্ধাদের তিনিই ছিলেন বলতে গেলে অভিভাবিকা, কারণ তাঁদের দুই ননদ-ভাজের পুরো বারোটি টাকা মাসোহারা আসত। তখন তিন টাকাতে বহু বিধবা কাশীতে মাস চালাতেন। তাঁদের মধ্যে গোসাঁইগিন্নী ধনী বলে গণ্য হবেন, এ তো স্বাভাবিক।

তিনিই খবরটা দিলেন।

পাঁড়ে-হাউলীতে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে, বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন, নারায়ণ আছেন—নিত্য ভোগ হয়—সেই প্রসাদই পাওয়া যাবে। তবে তাদের খাঁইটা একটু বেশী, একবেলা খাওয়ার জন্যেই মাসে চার টাকা চায়।

যেখানে ছ'টাকায় দুবেলা মাছ-মাংস নানা-ব্যঞ্জন খাওয়া হয়—সেখানে একবেলা নিরামিষ খাওয়ার জন্যে চার টাকা অবশ্যই বেশী। কিন্তু তখন আর উপায়ও ছিল না। মা অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন।

গোসাঁইগিন্নী বললেন, 'তিন টাকা হলেই ঠিক হ'ত, তবে কি জানো মা, টাকাটা অপাত্রে পড়বে না। বড্ড অভাব ওদের, এর ওপরেই ভরসা—সংসার চালানো, ঠাকুর-সেবা সব।...ঠাকুরসেবার কড়ারেই বাড়িটা পেয়েছিল মটরার বাবা, তা সেবা তো কত—করবে কোত্থেকে, জীবনে তো কোনদিন কিছু করল না। গাঁজা খেয়ে আর সিদ্ধি খেয়েই কাটিয়ে দিলে। ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি, বাপের ধারা আঠারো আনা পেয়েছে। নেশায় পঞ্চরঙ—কোনটা বাকী নেই। বড়টার আবার বে' দিয়েছে সাত-তাড়াতাড়ি—পোড়ার দশা. ওর চেয়ে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়াও ভালো ছিল...মাঝখান থেকে মাগীটারই কষ্ট। এমনি আরও দু-তিন জনকে ভাত যোগায়—তাইতে কোনমতে কটা পেট চলে। তাই কি সব দিন জোটে, নেশার পয়সা না জুটলে গুণধররা এসে মাকে ঢিবঢিবিয়ে দিয়ে—যা থাকে দু-এক পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে যায়—গাঁজা-চরস খেতে।'

এর পর সে বাড়িতে খেতে যাওয়া কেন—পা দিতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমরাও তখন নিরুপায়। না হলে মাকে উপোস করে থাকতে হবে। অসুবিধে ঢের—জায়গাটাও আমরা যেখানে থাকতুম লক্ষ্মীকুণ্ড থেকে বহুদূর, এক মাইলেরও বেশী। এখনকার মতো তখন সাইকেল-রিক্সা ছিল না—আর দেড়-দু মাইল পথের জন্য এক্কা করার কথা তখন কেউ ভাবতেও পারত না। সুতরাং হেঁটেই যেতে হবে।

তবু তাতেই রাজী হলেন মা।

আর, একা যাওয়া তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—ঠিক হ'ল আমিই সঙ্গে যাব। তখনও আমি ইস্কুলে ভর্তি হই নি। বাড়িতেই পড়ি। নিজে হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার মাকে নিয়ে ওখানে যাব—এই রকম ব্যবস্থা রইল।

আজ আর আমার বাড়িটা ভালো মনে নেই। শুধু মনে আছে, পাঁড়ে-হাউলীর সংকীর্ণ গলিটা যেখানে সঙ্কীর্ণতর হয়েছে সেইখানে কোথাও ছিল।

হয়ত আজও আছে—কে জানে। বাড়িতে ঢুকতেই চলনের বাঁহাতি ঠাকুরঘর, সেখানে প্রকাণ্ড একটা শিবলিঙ্গ আর তার পাশে একটা কাঠের আধভাঙ্গা সিংহাসনে একটি শালগ্রাম শিলা ও একটি গোপাল মূর্তি।

পরে শুনেছি—রুপোরই সিংহাসন ছিল—মটরার বাবা বেচে খেয়েছে।

বাড়িটা বেশ বড়, একটু উঠোনও আছে। দোতলা বাড়ি, নিচের তলা—যেমন বাঙ্গালী-টোলার বাড়ি হ'ত—এখনও আছে—তেমনিই। অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে। গরমের দিনে দুপুরে আরামদায়ক—অন্য সময় বাসের অযোগ্য।

তবু মটরার মা ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকেন। ওপরের তিনটি ঘরের একটায় মটরার দাদা থাকে বৌকে নিয়ে—আর একটা ঘরে ভাড়া থাকেন এক ভদ্রমহিলা। দুবেলা খাওয়া ও ঘরভাড়া ধরে মোট আট টাকা দেন। আর একটা ঘরে ভাড়াটে আছেন, তিনিও বিধবা—তবে তিনি নিজে রেঁধে খান ওপরের চিলেকোঠায়. শুনেছি—তিন টাকা ভাড়া দেন। কিন্তু আলাদা খেলেও বহু খেজমতই মটরার মাকে খাটতে হয় তাঁর, উনুন ধরিয়ে, না ধরলে বাতাস করে—সেই উনুন ছাদে পেঁাছে দিয়ে আসতে হয়।

এই ক'টি টাকাই মোট আয়।

অবশ্য হ্যাঁ—আরও একটা ছিল. পাশে কে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন, খুব বৃদ্ধ. তাঁরও খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই। তিনিও একবেলা খেতেন—তবে তাঁর ভাত পেঁাছে দিয়ে আসতে হ'ত রোজ। তিনিও মাসে চার টাকা দিতেন, পরে যা শুনেছিলুম।

এ বাড়িতেও লোক কম নয়। তিন ভাই, দুই বোন, একটা বৌ এবং মটরার মা।

এই ক'টা টাকাতেই সকলের খরচ চালাতে হ'ত।

কদাচিৎ কোন পুজো-আশ্রার দিনে দু-এক পয়সার পুজো পড়ত—কী এক-আধখানা কাপড়। বাড়তি আয় বলতে ঐটুকু। সে কিছুই নয়—কাজেই খাওয়ার আয়োজন ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ডাল, আলুভাতে আর একটা যাহোক তরকারি এবং একটা টক্।

যখন যে আনাজ সস্তা—সেই আনাজই বেশী ব্যবহার করতেন মটরার মা, তাও বাইরের যারা অতিথি. এখন যাদের 'পেয়িং গেস্ট' বলা হয়—তাদেরই পাতে সেটা পড়ত। নিজেদের ঐ ডাল আর আলুভাতে যা করে।

রাতের জন্যেও নাকি সেই ডালই ঢালা থাকত, আর রুটি—দুবেলা উনুন জ্বালার খরচা পোষাত না।

ঐ বাড়ি, ঐ খাওয়া—অত দূর—মা যে বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারবেন—তা মনে হয়নি।

কিন্তু উপচারের দৈন্য মটরার মা-র অন্তরের ঐশ্বর্যে ঢেকে গিয়েছিল।

অমন নিপাট ভালমানুষ, অমন যেন-সকলের-কাছে-অপরাধী—আমি আর দেখি নি। যত্ন করতেন বললে কিছু বলা হয় না, অতিথিদের যেন পুজো করতেন।

তাঁর সেই আন্তরিকতাতেই মা মায়ায় পড়ে গেলেন। দৈনিক প্রায় তিন মাইল হেঁটে যাওয়া-আসার কষ্টও আর তেমন অসহ্য মনে হ'ল না।

অসহ্য আমারও বোধ হয় নি। কথা ছিল আমি প্রথম প্রথম কয়েকদিন সঙ্গে গিয়ে মা-কে একটু 'সড়গড়' করে দেব, কিন্তু সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আমি যেতেই

লাগলুম।

এমনিতেই কাশীর ঐ ভ্যাপ্‌সা গন্ধওলা বাড়ি আর রৌদ্রবিরল গলি আমার ভাল লাগত।

আমরা বাঙালীটোলার বাইরে থাকতুম বলেই বোধহয় ভাল লাগত।

বিশেষ এই গলিগুলো—অন্ধকার জনবিরল অথচ পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্ন শব্দটা ইচ্ছে ক'রেই বললুম, কারণ সত্যিই তখন গলিগুলো এখনকার মতো অত নোংরা ছিল না। এখন যেমন চলাই যায় না—ঐটুকু পথ তাও আজকাল জঞ্জালে আবর্জনায় ভরে থাকে—তখন তা ছিল না।

কাশী বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, যে কাশীকে সুনীতি চাটুজ্যে মশাই ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন—সে কাশী আর নেই।

এখন যাদের জ্ঞান হচ্ছে তারা সে কাশীর কথা গল্প-উপন্যাসে পড়বে—কিন্তু ধারণা করতে পারবে না।

কাশীর এখন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, বড় বড় চওড়া চওড়া রাস্তা, নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে, ধীরে ধীরে অন্য যে কোন বড় শহরেরই রূপ নিচ্ছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের তো বটেই, আমাদেরও—কাশী এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—মনে আসে সত্য-কল্পনা-কিম্বদন্তীতে গড়া একটি আধ্যাত্মিক রূপ।

আর কোন তীর্থের নামেই এমনটা হয় না। কাশী সিদ্ধ-সাধক-শূন্য হবে না কোন-দিন, একথা জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনেছি।

চোখে দেখেছি বাঙালীটোলার গলিতে গলিতে—গণেশ মহল্লায়, অগস্ত্যকুণ্ডুতে, মান সরোবরে, ত্রিপুরাভৈরবীতে—অন্ধকার জরাজীর্ণ সব বাড়ি, তার মধ্যে এক এক দিকপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

ভাঙ্গা পুরনো মঠ-বাড়িতে বড় বড় নামকরা সন্ন্যাসী ; ছত্রে ছত্রে কত বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণের আহারের ব্যবস্থা ; মন্দিরে মন্দিরে সানাই-নহবৎ-শাঁখ-ঘণ্টা-ঘড়ির অপূর্ব ঐকতান ; সামান্য মাসিক তিন টাকা কি পাঁচ টাকা আয়ে নিরাশ্রয় বিধবাদের আত্মসম্মান বজায় রেখে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা ; দেখেছি রাত চারটে থেকে গঙ্গাস্নান-দর্শনের ভিড়, তিন-চারটি ক'রে তণ্ডুলের কণা ভিক্ষা পেতে পেতে ভিখারীর সামনে প্রয়োজনের ঢের বেশী খাদ্য জমে উঠতে ; শুনেছি এক্কা-ওলা, টাঙ্গা-ওলার মুখেও অপরিচিত পথিকদের প্রতি প্রীতি-স্নিগ্ধ সম্ভাষণ—'এ গুরু', 'এ রাজা' 'এ দাদা'—প্রভৃতি।

তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।

তবু, কাশীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু আছে ঐ গলিগুলোতেই।

তবে বেশী দিন আর থাকবে না। কেদার পর্যন্ত তো রিক্সা যাচ্ছেই, শোনা যাচ্ছে বিশ্বনাথের গলি ভেঙ্গে চওড়া রাস্তা বার করা হবে, বিদেশী টুরিস্টদের গাড়ি যাবার সুবিধে করতে।

উত্তর-প্রদেশের সাত্ত্বিক সরকারের জয় হোক!

আকর্ষণ আরও কিছু ছিল অবশ্য। সেটা মানবিক।

মটরার মার তিনটি ছেলেই অবতার বিশেষ। ছোটটার বয়স তখন বোধহয় বছর ষোল-সতেরো—দেখতে খুবই ভাল ছিল—কিন্তু সে আবার এক মাত্রা ওপরে। তার তখনই আর সিদ্ধি বা গাঁজা-চরসে সানাত না। বোতলও চলত মধ্যে মধ্যে। কে তাকে যোগাত এ সব খরচ, তা কেউ জানত না। জনশ্রুতি—মদনপুরায় এক মুসলমান দোকানদারের সঙ্গে খুব ভাব ছিল, তার কাছ থেকেই কিছু কিছু পেত। তবে তার এক পয়সাও মা পেতেন না—

তা বলাই বাহুল্য।

ছেলে তিনটিই বড়, তারপর দুটি মেয়ে—খেন্তি ও মেন্তি।

মেয়ে দুটি মার মতো স্বভাব পেয়েছিল, অমনি ঠাণ্ডা, অমনি সদা-বিনত ও বাধ্য।

মা বলতেন—'নেটিপেটি'।

ভূতের মতো খাটত মেয়ে দুটো মায়ের সংগে—মার সংগেই দাদাদের চড়টা-চাপড়টাও ভাগ্যে জুটত।

পেটভরে খেতেও পেত না বোধহয় বেচারীরা, কাপড় বলতে যৎপরোনাস্তি মোটা ও সস্তা দামের মিলের শাড়ি। দুখানার বেশি তিনখানা ছিল না কারও। বারো আনা চোদ্দ আনায় যা মিলত তখন, তাও দৈবাৎ দুখানাই ভিজে গেলে গামছা পরে থাকতে হ'ত। তবু এসব কাপড় ওদের নিজস্ব রোজগার। কুমারী-পুজোর পাওনা।

এদের মধ্যে খেন্তিই বড়—বোধহয় বছর দশ-এগারোর হবে, মেন্তি সম্ভবত আমার একবয়িসী।

ফুটফুটে মেয়ে, মটরার মার রঙ দুঃখে অভাবে-অনশনে পুড়ে গিয়েছিল, তবে ছেলে-মেয়েরা সবাই ফরসা, মেন্তি তো বিশেষ করে—দুধে-আলতা রঙ একেবারে। মা বলতেন—'বসরাই গোলাপ'।

মেন্তির সংগেই আমার ভাবটা বেশি হয়ে গিয়েছিল।

তার কারণ ওর দাদারা বিশেষ বাড়ি থাকত না, থাকলেও এমন গুণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা আর ভাবভঙ্গি তাদের যে, কাছে ঘেঁষা যেত না, মুখের দিকে চাইলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যেত। খেন্তি মার সংগে সংগে থাকত বেশির ভাগ—রান্নার পরও বসে সারা দুপুর-বিকেল মার সংগেই কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী করত। এক দোকানদার কাগজ দিয়ে যেত আবার ঠোঙ্গা বুঝে গুনে নিয়ে পয়সা দিয়ে যেত, সুতরাং খেন্তির পাত্তাই পাওয়া যেত না। মেন্তিকে খুব ভারী কোন কাজ দেওয়া যেত না বলেই তার একটু অবসর ছিল—আমার সংগে গল্প করার।

শান্ত সুশ্রী মেয়েটি, হাসি-হাসি মুখ—গল্প বলার জন্যে তাগিদ করত, তাও ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি।

মেন্তির কথাটা মনে পড়লেই সেই ছবিটা আগে মনে আসে।...

মাস-ছয়েক বোধহয় ওখানে খেয়েছিলেন মা।

তারপর, ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রেই হাঁড়ি-হেঁসেল ধরলেন আবার।

আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, তাছাড়া মার পক্ষেও বারো মাস অতদূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়—বর্ষায় তো ঠায় ভিজে ভিজে যাওয়া। তখন মহিলারা বিশেষ ছাতি ব্যবহার করতেন না। ঘরে রান্নার ব্যবস্থা না হলে চলে না।

তবে তাতে ক'রে মেন্তিদের সংগে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয় নি। গোসাঁই-গিন্নীর কি রকম আত্মীয় হতেন ওঁরা। তাই খবর পাওয়া যেত মধ্যে মধ্যে।...

বছর দুই পরে হঠাৎ শোনা গেল—খেন্তির বিয়ে।

'সে কি!' মা চমকে উঠলেন, 'ওমা, খরচ কে দেবে? আর এই তো ওর সবে তেরো বছর বয়স!'

'তা হোক।' গোসাঁইগিন্নী বললেন, 'তেরো বছরে আমার কোলে ছেলে এসে গেছে। তাছাড়া, একটা যোগাযোগ হয়ে গেল—কোনমতে পার হয়ে যায় সে-ই ভাল। নইলে কে উয্যুগী হয়ে দাঁড়িয়ে ওর বে দেবে তাই শুনি? ঐ গাঁজাগুলিখোর পিচেশ ভাইগুলো?'

'তা খরচ?' মা পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন।

'তারা এক পয়সাও নিচ্ছে না। আর নেবে কি—তেজবরে বর!...প্রথম পক্ষের একটা মেয়ে ছিল—গেল মাসেই তার বে দিয়ে দিয়েছে—বোধহয় নিজে আর-একটা বৌ কাড়বে

বলেছি—দ্বিতীয় পক্ষেরও দুটো বাচ্চা আছে, তাই বলে বয়েস বেশি নয়, চল্লিশ হবে—কি আর দু-এক বছর বড়জোর। রেলে কাজ করে, এলাহাবাদ আতরসুইয়াতে নিজেদের বাড়ি—সে-সব আমি খোঁজ নিয়েছি। লোকটা ভাল। গয়নাপত্তর সব সে-ই দেবে, আশীর্বাদের দিনই দিতে চেয়েছিল, আমিই বলেছি, খবরদার, চোখের সামনে সোনা দেখলে গুণ্ডাগুলো কি আর এক কুচিও রাখবে! ঐ সম্প্রদানের সময়ই পরিয়ে দেবে একেবারে।'

'তা ঘর-খরচ? দানসামিগ্‌গির?'

মা তবু যেন বিশ্বাস করতে চান না কথাটা।

'সে হয়েই যাবে একরকম করে, ভিক্ষেদুঃখ্যু করে, মেগেপেতে। কন্যেদায় কি আর ঐ জন্যে আটকে থাকে?...দু-এক টাকা ক'রে দিচ্ছে সবাই—তোর কাছেও আসবে এখন, ভয় নেই!'

হাসলেন গোসাঁই দিদিমা।

তেরো বছরের মেয়ে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বর, তাও তিনটে ছেলেমেয়ে সুদ্ধ।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শুধু।

উপায় যে কিছু নেই এছাড়া—তা তিনিও বুঝছেন। গোসাঁইগিন্নী আরও একটা কথাতে সব মুখ মেরে দিলেন, 'আর কিছু না হোক, ছুঁড়িটা দুবেলা পেটভরে খেতে পাবে তো অন্তত—দস্যি দাদাদের অষ্টপ্রহর ঐ হুমকি আর দুম্দাড় মার থেকেও বাঁচবে। সেও কম নয়।'

সত্যিই মেগেপেতে একরকম ক'রে বিয়েটা হয়ে গেল।

আমরাও গিয়েছিলাম। বেশ বর—সৌম্য শান্ত ভদ্রলোক, দু-এক গাছা চুলে পাক ধরেছে, তবে বুড়ো নয়। খেন্তি বেঁচে গেল সত্যি-সত্যিই। অনেকদিন পরে একবার ওদের আতরসুইয়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম খুঁজে খুঁজে—দেখেছিলাম ভালই আছে খেন্তি। খুব একটা সচ্ছল অবস্থা নয়, তবু শান্তিতে আছে। ওরও দুটো ছেলে হয়েছে, সতীনপোরাও খুব বশ, নিজের নয়—তা বোঝা যায় না।

খেন্তির বিয়ের বছর দুই পরেই আমরা কলকাতা চলে এলাম, কাশীর সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল অনেকখানি।

তবে চিঠিপত্র আসাযাওয়া ছিল, তাইতেই একসময় খবর পেলাম মেন্তিরও খুব ভাল বিয়ে হয়ে গেছে।

একেবারেই দৈবাৎ, গঙ্গার ঘাটে ওকে দেখে বরের মা নাকি বাড়ি বয়ে এসে সম্বন্ধ করেছেন। এক পয়সা তো নেনই নি—উল্‌টে এদের ঘরখরচাও নাকি তাঁরা দিয়েছেন।

বৃন্দাবনে ভৃঙ্গারবটের গোসাঁইবাড়ি বিয়ে হয়েছে, হীরের মুকুট পরিয়ে বৌকে নিয়ে গেছে তারা। মথুরা থেকে নাকি হাতীঘোড়ার রেশেলা করে বর-বৌ বাড়ি ফিরেছে।

খবরটা শুনে আশ্চর্য হই নি আমরা।

অমন সুন্দরী মেয়ে—যে দেখবে তারই পছন্দ হবে।

চোখ নাক মুখ হয়ত অত কাটা-কাটা নয়, তবে সবই মানানসই, রং-এর তো কথাই নেই, গড়নও বেশ সুডৌল।

আর সবচেয়ে যা চোখে লাগে, সে ওর শান্ত বিনম্র ভাব। তার সঙ্গে মুখের হাসি-হাসি ভাবটি।

মা খুবই আনন্দ করলেন খবর পেয়ে। বললেন, 'দিদিকে ভগবান অসুমর দুঃখ দিয়েছেন—তবু, মেয়ে দুটোর যে ভাল হিল্লে হ'ল—এইটেই একটু মুখ তুলে চাওয়া বুঝতে হবে। আহা, এমন মানুষটার কী দুঃখু, সত্যি!...ভগবান একদিক ভাঙেন একদিক গড়েন—জামাই দুটো ভাল হ'ল সেইটেই সুরাহা। বুড়ো বয়সে মেয়েরাই দেখবে।'...

এর বছর দুই পরে বৃন্দাবনে গেলাম। মার অতটা মনে ছিল না, আমিই তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম, 'এইখানেই কোথায় মেন্তির বিয়ে হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। ভৃঙ্গারবটের গোসাঁইবাড়ি বলে শুনেছি—'

ব্রজবাসী বা পান্ডাকে বলতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মা, ও তো এক প্রধান দর্শন। আমি এমনিই নিয়ে যেতাম। যমুনার ধারে—ভারী ভাল জায়গাটা।'

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলে ব্রজবাসী সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন ভৃঙ্গারবটে। যমুনার ধারে বেশ বড় বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি আর গোসাঁইদের বসতবাড়ি লাগোয়া।

আমরা যখন গেলাম তখন মন্দির একেবারে জনহীন, কোন পূজারী কি দর্শনার্থী —কেউ নেই। মা দর্শন ক'রে নাটমন্দির থেকে উঠানে নেমে একটু বিমূঢ়ভাবেই এদিক ওদিক চাইছেন—কাকে ধরে খোঁজখবর করবেন ভাবছেন—কোথা থেকে ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে এসে মেন্তি একেবারে মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল, 'ওগো মাসিমা গো, এদ্দিন পরে আমাকে মনে পড়ল তোমার! সব্বাই—মা সুদ্ধ আমাকে ভুলে গেছে, কেউ খবর নেয় না—। কেন, আমি কী করেছি!'

'ওরে থাম্ থাম্, চুপ কর্। কাঁদছিস কেন, এই দ্যাখো পাগল—' মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই কোথা থেকে সেই রঙ্গমঞ্চে আর একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটে-ছিল আমরা কেউ টের পাই নি।

মধ্যবয়সী একটি স্ত্রীলোক, গৌর বর্ণ, বয়সকালে হয়ত রূপসীই ছিলেন—নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠী, দামী থান-ধুতি পরনে—হাতে কুঁড়োজালিতে মালা—জপ না হলেও ঘুরে যাচ্ছে।

কখন এসেছেন, মেন্তির সঙ্গেই কি না, কেউ দেখি নি। কিন্তু যিনি এসেছেন তিনি নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতে জানেন। একেবারে যখন তাঁর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেজে উঠল, তখনই চমকে চেয়ে দেখলুম।

'বলি আপনারা—আপনি এর কে হন জানতে পারি কি?' প্রশ্নটা মার দিকেই ফিরে।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠস্বর, বড় বেশী শান্ত। শান্ত না বলে বরং শাণিত বলাই উচিত।

আমরা সবাই চমকে উঠলেও আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলুম মেন্তির।

নিমেষে যেন শিটিয়ে কাঠ হয়ে উঠল সে। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, দেখার কোন অসুবিধে নেই—সমস্ত মুখখানাও সেই সঙ্গে বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেল।

এমন অবস্থা সবটা জড়িয়ে যে—মনে হ'ল এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে সে।

আর সেই সময়ই আমার চোখে পড়ল তার একান্ত দীন বেশ।

হীরের টায়রা মাথায় হাতীতে চড়ে যে বৌ এ-বাড়ি এসেছে—তার এ বেশভূষা একে-বারেই বে-মানান। সাধারণ একখানা আধময়লা মিলের শাড়ি পরনে, হাতের শাঁখার সঙ্গে একগাছি ক'রে চুড়ি। এ ছাড়া সম্পূর্ণ নিরাভরণ, গলায় এক ছড়া হার পর্যন্ত নেই! চেহারাও—এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম—বেশ খারাপ হয়ে গেছে। রোগা তো হয়েছেই, অমন দুধে-আলতা রঙ, তারও সে জেল্লা নেই আর।

অর্থাৎ এখানে সে সুখেও নেই, স্বচ্ছন্দেও নেই।

মার এত সব লক্ষ্য করার অবসরও মিলল না, তিনি এই আকস্মিক প্রশ্ন ও প্রশ্নের ধরনে থতমত খেয়ে গিয়ে জবাব দিলেন, 'আমি—এই সম্পর্কে ওর মাসী হই।'

'ভাল। মাসী মানে তো গুরুজন, গুরুজন নিজেদের মেয়েকে সৎশিক্ষা দেবেন এইটেই তো আমরা আশা করব। বাপের বাড়িতে কোন শিক্ষাই পায় নি—তাই এমন করে ছুটে বেরিয়ে এসে কথা বলে ও, কিন্তু আপনি কোন্ আক্কেলে সেটার প্রশ্রয় দিলেন? যতই হোক, এটা বারমহল, অন্য মহাজনের যেমন ব্যবসার গদী হয়, এটাও আমাদের তাই।

বলি আমাদেরও তো এটা এক রকমের কারবার ছাড়া কিছু নয়, ঠাকুরকে ভাঙিয়ে খাওয়া আমাদের—এখানে নানা রঙের লোক আসছে-যাচ্ছে, কত জাতের কত রীত-চরিত্রের লোক—এটা কি কুলের বৌয়ের সঙ্গে দেখা করার মতো জায়গা?'

এই প্রথম দেখলুম মা একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। বেশ একটু সময় লাগল আক্রমণের বেগটা সামলে নিতে।

তার পর বললেন, 'কিন্তু আমি তো ঠিক এখানে দেখা করব বলে আসি নি, ভেতরেই যেতুম খোঁজ করতে—ও এসে পড়ল বলেই—তাও তো বোধহয় এক মিনিটও হয় নি।'

'আধ মিনিটই বা হবে কেন মা, আপনি ওর কথার জবাবই বা দেবেন কেন। ও না হয় অলবড্ডে ধাঙ্গড়ী, বাপের বাড়িতে কোন শিক্ষা-দীক্ষাই পায় নি, বড় বংশের মান-ইজ্জৎ বোঝার কথা নয় ওর—কিন্তু আপনার তো জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, আপনার কি তখনই উচিত ছিল না—একটিও কথা না বলে ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া কিম্বা নিজেই বেরিয়ে চলে যাওয়া?...আপনি ওর কী রকম মাসী হন তা জানি না, তবে যদি ওর মার সঙ্গে কোনদিন দেখা হয় তো বলবেন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে আসা ঠিক হয় নি, এ-বাড়িতে ওঁদের মতো ঘরের মেয়ে দেওয়া অন্যায় হয়েছে।'

এর মধ্যেই পা-পা করে মেন্তি ভেতরে চলে গেছে। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম পা দুটো ওর ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে একটি কথাও বলার সাহস হ'ল না ওর—এমন কি যাওয়ার সময় আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখারও না।

এতক্ষণে কিন্তু মা নিজেকে সামলে নিয়েছেন।

তাঁর রগের দু পাশের শিরা দুটো ফুলে ওঠা দেখে বুঝলুম ভেতরে ভেতরে তাঁর রাগ চড়ছে। তিনি বললেন, 'দেবার কথা কেন তুলছেন, শুনেছি তো আপনারাই উপ-যাচক হয়ে এনেছেন।'

'অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। মানছি তা। তবে একটা অন্যায় তো আর একটা অন্যায়ের কৈফিয়ৎ হতে পারে না মা। আমার মা বুড়ো মানুষ, বুড়ো হলে মতিভ্রম হয়—দেখে পছন্দ হয়েছে তো গলে গেছেন একেবারে। তাছাড়া শুনেছেন নাকি বড় বংশ, ওর মা নাকি গোসাঁই ঘরেরই মেয়ে, কোন সহবৎ-শিক্ষাই যে মেয়েকে দেয় নি তা মার পক্ষে ভাবার কথাও নয়। এমন যে ডাহা ময়লায় হাত পড়েছে, নেশাখোরদের বাড়ির আবর বেতরবিয়ৎ মেয়ে, কোন রকমের শিক্ষাই পায় নি সেটা তো আমরা বিয়ের পর জানলুম। আমাদের এমনভাবে ধোঁকা দেওয়াও উচিত হয় নি আপনার বোনের।'

'তা আপনি ওর কে হন জানতে পারি কি?' মাও বেশ যেন শাণিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন।

'আমি ওর বড় ননদ হই, বরের বড় দিদি।'

'তা হলে তো ওর মা আপনারও গুরুজন হন। তাঁর সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করছেন—তাতেও তো খুব শিক্ষা কি সহবৎ প্রকাশ পাচ্ছে না।'

এবার মুখোশটা একেবারেই খসে পড়ল, মহিলা বিষাক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ছোটলোকে আর ভদ্দরলোকে কুটুম্বিতে হয় না। অমনতর লোককে আত্মীয় কুটুম বলে স্বীকার করলে আমাদের আত্মীয়-মহলে কি শিষ্য-সেবকদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?......যাক, এসেছেন, দাঁড়ান এইখানে—প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যান।'

এই বলে বাতাসে ঈষৎ আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে তিনি সেই পাশের দ্বারপথেই ভেতরে চলে গেলেন।

বলা বাহুল্য, আমরা আর ওঁর প্রসাদের জন্যে দাঁড়াই নি। উদ্দিষ্ট বিগ্রহকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

মার দুই চোখ তখন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। এইটুকু দুধের মেয়ে—এই ছোঁড়াদের হাতে কত নির্যাতনই না সইছে, ভেবে তাঁর চোখের জল আর বাধা মানছিল না। মনে হ'ল এ-যাত্রা এই তীর্থ-ভ্রমণটাই তাঁর বিষাক্ত হয়ে গেল।

এর পর বহুদিন আর ওদের কোন খবর পাই নি।

অনেক ক'বছর পরে আবার কাশীতে এসে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ই মনে পড়ল মেন্তি বেচারীর কথাটা।......খবর নেওয়াও শক্ত, গোসাঁইগিন্নী যদিচ তখনও বেঁচে আছেন শুনলুম, তবে সে আগের বাড়িতে আর থাকেন না। ননদ মারা যেতে কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন।

তবু বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র ক'রে খুঁজে বার করলুম একদিন।

অনেক বয়স হয়েছে, তালগোল পাকিয়ে গেছেন একেবারে, বহুক্ষণ ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থেকে তবে চিনতে পারলেন। মেন্তির কথা জিজ্ঞাসা করতেই কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'ওরে তার দুর্দশার কথা আর বলিস নি—কি কপাল ক'রে যে এসেছিল মেয়েটা—এমন বরাত যেন অতিবড় শত্তুরও না ক'রে আসে। খুব বে দিয়েছিল মা মাগী. শ্বশুরবাড়ি তো নয়—জবাই হবার জন্যে সাক্ষাৎ কসাইদের বাড়ি দিয়েছিল।......এর চেয়ে গায়ে তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারাও ভাল ছিল। বরটা গাড়ল, আধা পাগলের মতো. শাশুড়ী মাগী মেয়েদের ভয়ে কাঁটা—ঐ রহলা-দহলা দুই বিধবা বোনই সংসারের আসল গিন্নী। সোন্দর বৌ আসতে দেখেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছল, ভেবেছিল এবার ভাই বোধহয় বৌয়ের বশ হয়ে পড়বে। তাই সেই প্রেথম থেকেই আদাজল খেয়ে লেগে-ছিল। সেই যা বে'র ক'দিন, তার পর থেকে কোনদিন একটা গয়না কি একখানা ভাল কাপড় পরতে দেয় নি। ঝিয়ের মতো রেখেছিল। পেটভরে নাকি খেতে পজ্জন্ত দিত না! তাই যে রাত্তিরটা একটু শান্তিতে কাটবে—তারই কি জো আছে—বরের সঙ্গে শোওয়ার হুকুম ছিল না। বড় ননদের সঙ্গে শুতে হ'ত। কী সমাচার, না ছেলেমানুষ বৌ, এখন পোয়াতি হলে বাচ্ছা রুগ্‌ণ হবে! আরও জো পেয়ে গিয়েছিল—বাপের বাড়ির তো কোন জোর ছেল না, তত্ত্বতাবাস কি একদিন খোঁজখবরও কেউ করত না। ওরা বুঝে নিয়েছিল যে কোন চুলোয় কেউ নেই, দু পায়ে থ্যাঁতলাব, তা-ই সহ্য করবে।'

বলতে বলতে হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন গোসাঁইগিন্নী। খানিক চুপ ক'রে থেকে দম নিয়ে আবার বললেন, 'ওরা একটা ছুতো খুঁজছিলই, ওরই অদেষ্টে সে ছুতো ঘরে গিয়ে পঁউছাল। তোরা নাকি একদিন দেখা করতে গিয়েছিলি বিন্দাবনে.—সে-ই উত্তম সুযোগ মিলল। তোর সঙ্গে বদনাম তুলে দিলে, বললে কিনা ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে খুব ভাব ছেল, বে'র আগেই ওর সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। তাই দিনরাত এমনধারা মনমরা হয়ে থাকে, ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বেস ছাড়ে, বরের সঙ্গে শুতে চায় না। যতই আমরা বারণ করি—ডব্‌কা মেয়ে—পেছটান না থাকলে ঠিক বরের সঙ্গে ভাব ক'রে নিত। বলি আমরা তো আর দিনরাত পাহারা দিই না। গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে পিইয়ে আসে। আসলে ওর মন পড়ে আছে ঐ রসালো নাগরের কাছে।' মাসী না ছাই. বামুন শুদ্দুর তফাত লোক কথায় বলে, বামুনের আবার কায়েৎ মাসী কি?......বোঝ্ কথা, নিজেরা বজ্জর আঁটনে বেঁধে রেখেছে—দোষ হ'ল বোয়ের। ঐ একরত্তি মেয়ে, আর ইদিকে দুই দজ্জাল ননদ, তার সাধ্যি কি ওদের চোখ এড়িয়ে বরের কাছে যায়!'

আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি. 'কিন্তু আমরা যে এক বয়সী দিদিমা!'

'সে কি আমি জানি নি? আসলে ওটা তো ছুতো বৈ কিছু নয়। সেই কথামালায় পড়িস নি. দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না? তোর শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে ছাওয়ালো গড়ন তো, বলে ওর কম্‌সে কম উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হবে।—তা শোন্, মেয়েটার

দুর্গতি, সেই বদনাম তুলে ভাইটাকে বোঝালে এ নষ্ট মেয়েমানুষ ঘরে থাকলে ঠাকুরের কোপ লাগবে—কোন শিষ্য-সেবক আর থাকবে না। তাকে অমনি বোকা বুঝিয়ে দারোয়ান ঝি সঙ্গে দিয়ে এক কাপড়ে মেয়েটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।...মা মাগী তো ঐ হাবাগোবা, আর কীই বা করবে, পয়সা তো নেই যে নালিশ মকদ্দমা করবে কি গিয়ে ঝগড়া করবে। দুই মায়ে ঝিয়ে চোখের জলে ভাত মেখে খেতে লাগল,—যাকে বলে!'

একটানা বলতে পারেন না গোসাঁই দিদিমা, হাঁপ ধরে। তবু বিশ্রামও নিতে পারেন না বেশীক্ষণ। কথাগুলো যেন অনেকদিন ধরে জমে ছিল বুকের মধ্যে। বার করে না দিতে পারলে ছুটিও নেই, শান্তিও নেই।

তাই এক মুহূর্ত থেমেই আবার বলেন, 'তাতেই কি দুর্গতির শেষ হ'ল? ওদিকে তো খোয়ারের একশেষ। ইদিকে ঐ গুণধর মাতাল ছোট দাদাটা, মটরা—বোনটা দিব্যি দেখতে হয়েছে দেখে—দালাল লাগিয়ে এক তান্ত্রিক সাধুর কাছে বেচে দিলে। একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল কাপড় কিনে দেবে বলে—আর পাত্তা নেই। মা কান্নাকাটি করলে তেড়ে আসে, বলে দুখানা ক'রে কেটে ফেলব, তোর মেয়ে বেরিয়ে গেছে—আমি কি করব! ...কী হয়েছে কেউ কি টের পেতুম? নিহাৎ ছোটর হাতে অনেক পয়সা এসেছে—দুহাতে খরচ করছে, খুব নপ্‌চপানি—দেদার মদমাংস চলছে দেখে বড় দুজনার খুব হিংসে হ'ল, একদিন খুব ঝগড়াঝাঁটি দাঙ্গা—তাতেই অমানুষিক মারের চোটে প্রকাশ পেল কথাটা।...তা তখন আর চারা কি, কোথায় সে সাধু থাকে কি বিত্তান্ত কেউ জানে না, আর কার কি গরজই বা—ও মেয়ে ঘরে ফিরিয়ে এনেই বা কি করবে? তার কি আর কিছু আদায় আছে? বলে উত্তর-সাধিকা—আসলে নষ্ট করা ছাড়া তো কিছু নয়! আর বোনের জন্যে ওদের দুখদরদেরও সীমে নেই, ওদের তো ঘুম হচ্ছে না একেবারে। ত্যাখন পয়সার গন্ধ পেয়েছিল তাই অত দরদ। মটরাটা নাকি অনেক পয়সা খেয়েছিল, এমন তো পাওয়া যায় না। বামুনের সধবা মেয়ে অথচ সোয়ামীর সঙ্গে সম্পর্ক হয় নি—এ যে তান্ত্রিকদের কাছে দুর্লভ জিনিস একেবারে। ওদের কী সব তপিস্যে আছে, তাইতে লাগে।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন গোসাঁই দিদিমা। অনেক বকেছেন, আর তাঁর সাধ্যও নেই, এইতেই হাপরের মতো হাঁপাচ্ছেন বসে।

কিন্তু আমার আর তখন ধৈর্য মানছে না, আমি বললুম, 'তারপর? আর কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি?'

'কে খোঁজ করবে বল? ও মেয়েকে দিয়ে তো আর কোন কাজ হবে না, শুধু শুধু গলায় পাথর ঝোলাতে যাবে কে? আগুনের খাপরা মেয়ে—আগলাতেই প্রাণান্ত। আর মা মাগী বেঁচে থাকলেও তবু কথা ছিল, তার মায়ের প্রাণ—হাঁকড়-মাকড় করত।'

'ও, মাসিমা মারা গেছেন?'

'বেঁচেছেন বল! হাড় জুড়িয়েছে। কিছু তো ছেল না'দেহে, কোনমতে ধাধসে কাজ ক'রে যেত। তার ওপর এই আঘাতটাতে একেবারে শেষ ক'রে দিলে। ছোট মেয়ে, কোলের সন্তান।...কে জানে ইচ্ছে ক'রে কি না, কিম্বা কেউ ধাক্কাই দিয়েছে, কিম্বা মাথাই ঘুরে গেছে—একটা সূর্য্যি-গেরনের দিন নাইতে গেল গঙ্গায়—আর ফিরল না। ডুবেছে কি না—কেউ লক্ষ্যও করে নি অত, ভিড়ে কে কার খবর রাখছে বল! পরের দিন মড়াটা গিয়ে পঞ্চ-গঙ্গার কাছে আটকে ছিল—পুলিস তুলে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সনাক্ত করাল।... বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! শুধু শুধু বেঁচে থেকে আরও খানিক বিড়ম্বনা ভোগ করা বৈ তো নয়! এই তো আমাকেই দ্যাখ না—'

এইবার নিজের ঊনপঞ্চাশ রকমের রোগের ফিরিস্তি দিতে বসলেন তিনি। কোনমতে

আরও মিনিট দশেক বসে হুঁ হাঁ দিয়ে 'আবার আসব' বলে উঠে পড়লুম।

সে যাত্রা আর হয় নি। আরও বছরখানেক পরে গিয়ে খুঁজে বার করেছিলুম মেন্তিকে। বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল অবশ্য। মেজ ভাই ভোঁদাকে এক বোতল আধাবিলিতি মদের দাম কবলাতে সে নাম-ঠিকানা বলেছিল, তবে সে ঠিকানায় পাওয়া যায় নি। অনেকদিন আগেই নাকি তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। কেউ বললে, আদি কেশবের দিকে, কেউ বললে গৈবির কাছে। শুধু একজন বললে, বিন্ধ্যাচলে অষ্টভুজার পাহাড়ের কোলে ঘর বেঁধে থাকেন সে সন্ন্যাসী। খুব উঁচুদরের সাধু, রাতকে দিন করতে পারেন ইচ্ছে করলে। তাঁর ভৈরবী মাও খুব বড় সাধিকা, দুর্গা-প্রতিমার মতো চেহারা, তেমনি শক্তি। সাক্ষাৎ অষ্টভুজাই। ইত্যাদি—

ঐ ঠিকানাতেই পাওয়া গেল।

তখন এত বাস্-এর সুবিধে ছিল না, মির্জাপুর থেকে এক্কা ক'রে যাওয়া, পেঁাছে খুঁজে বার করতে করতে সন্ধ্যে উৎরে গেল।...একটা সামান্য ঝোপ্‌ড়ার মতো ঘর, পাতা-লতা দিয়ে তৈরী, ওপরে বোধহয় ঘাসেরই চালা। দরজা বন্ধ ছিল, তবে পাতার ফাঁক দিয়ে আলো আসতে দেখে ভরসা ক'রে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলুম।...একটু ভয়ই করছিল, কী রকম তান্ত্রিক সাধু কে জানে, হয়ত ত্রিশূল কি খাঁড়া নিয়ে তেড়ে আসবে।

কিন্তু দরজা খুলে আলো হাতে যে বেরিয়ে এল, সে সাধু নয়—সাধিকা, ভৈরবী স্বয়ং। সে মেন্তিই।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। সেদিনের সে শীর্ণ ত্রস্তা মেয়েটি আজ পূর্ণ-যৌবনা, দীপ্তিময়ী। সেদিন যাকে কোনমতে সুশ্রী বলা চলত, আজ সে রূপসী। তবে সাধারণ অর্থে নয়, সেই লোকটিই ঠিক বলেছিল, সত্যিসত্যিই এ রূপ দেবী-প্রতিমার মতো। তার মুখেচোখে এমনই একটি শান্ত সমাহিত ভাব যে দেখলে শ্রদ্ধাই জাগে, লালসা নয়।

তার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যেটাও দেখে নিয়েছি এক নজর, সেখানেও আলো জ্বলছে, বেশ জোর—একটি বড় প্রদীপে। তার সামনে একটা বাঘছালের ওপর সেই বাঘের মাথাই উপাধান ক'রে শুয়ে আছেন দীর্ঘদেহ একটি পুরুষ।

বাঙালী নয় খুব সম্ভব, কারণ এমন বলিষ্ঠ দেহ বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁরও উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। বড় বড় দাড়ি গোঁফ, একমাথা ঝাঁকড়া চুল—কাঁচা-পাকায় মেশা, তবে পাকার ভাগই বেশী। প্রশস্ত লোমশ বুকে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের আঙ্গুলে টানা প্রলেপ, তার মধ্যে একটি সিঁদুরের ফোঁটা। ভয়ঙ্কর আদৌ নন। বেশ একটু শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয় তাঁর দিকে তাকালে। মুখে ঈষৎ কৌতুকমাখা প্রসন্ন হাসি—মনে হ'ল তিনি আমার প্রত্যাশাই করছিলেন, আর তার জন্যে কোন বিরূপতা নেই মনে, বরং অভ্যর্থনা করতেই প্রস্তুত।...

কত কি বলার ছিল, কত কথা বলব বলে মনে মনে তৈরী হয়ে এসেছিলুম—কিছুই বলা হ'ল না। শুধু, কেমন একটু থতমত খেয়ে নামটাই উচ্চারণ করলুম, 'মেন্তি!'

একটু হাসল সে। প্রসন্ন মধুর হাসি। বলল, 'এস, ভেতরে এস। উনি এই একটু আগেই বলছিলেন যে, তোমার সেই বন্ধু আসছেন। চায়ের জল চড়াতে বলছিলেন।'

আরও যেন গোলমাল হয়ে গেল মাথার মধ্যেটায়। আত্মীয়তা করতে আসি নি, এ ধরনের অভ্যর্থনার জন্যেও না। বরং বিপরীত মনোভাব নিয়েই এসেছি। তাই কতকটা আম্‌তা আম্‌তা ক'রেই বললুম, 'আমি—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি মেন্তি।'

মেন্তি কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না, প্রবল প্রতিবাদও করল না। শুধু তেমনি শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, 'কোথায়?'

'আ—আমাদের বাড়ি। আমার মায়ের কাছে থাকবে—।'

'তার পর? কী করবে আমাকে নিয়ে?'

'তুমি—মানে তুমি যাতে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারো—'

আবারও হাসল সে। এবার বেশ শব্দ ক'রেই। মনে হ'ল যেন সে এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে পরিহাসই করছে।

'সেটা কি ভাবে হবে বলতে পারো ভূতু? আমায় বিয়ে দিতে পারবে আবার?...তুমি বিয়ে করবে? পারবে? সে সাহস আছে? মা রাজী হবেন? আলাদা সংসার পাততে পারবে আমাকে নিয়ে? আর কিভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপন করব বলো? এক চাকরি-বাকরি করা—আর নয় তো বিয়ে, তা তেমন লেখাপড়া জানি না যে চাকরি করতে পারব। এখন লেখাপড়া শিখে পাস ক'রে চাকরি করতে গেলে অন্তত সাত আট বছর লাগবে। এই সময়টা খাব কি, থাকব কোথায়? তোমার বাড়ি থাকলে—যে মিথ্যে দুর্নামে আমাকে তাড়িয়েছিল তারা, সেই দুর্নামটাই সকলে বিশ্বাস করবে। আর যাই হোক সেটা আমি সইতে পারব না।'

এসব যুক্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসি নি। কোন রকম বিরোধিতার জন্যেও না। কল্পনা করেছিলুম—আমাকে দেখে মুক্তি পেল এই কথাই ভাববে, তখনই চলে আসতে চাইবে। বাধা যদি কেউ দেয় তো সে ঐ সাধুটাই দেবে। কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল সব। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলতে গেলুম, 'তাই বলে এই অসম্মানের মধ্যে জীবনটা কাটবে?...না না, আমার জন্যেই তোমার এই লাঞ্ছনা, তুমি চলো—আমি যেমন ক'রে হোক চালাব!'

'যে মেয়ের বাপভাই অমানুষ, যাকে স্বামী নেয় না—তার তো বেঁচে থাকাটাই অসম্মান—তাকে তুমি সম্মান ফিরিয়ে দেবে কেমন ক'রে? আর লাঞ্ছনা কে বললে তোমাকে?...এখনও অনেক জিনিস তোমার জানতে বাকী আছে ভূতু!...তবে সে সব কথা তোমাকে বোঝাতেও পারব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখো, আমি ভালোই আছি। সুখে না হোক, ভোগ-বিলাসে না হোক—শান্তিতে আছি। পরম শান্তি।...না, আমার জন্যে দুঃখু করো না, উদ্ধার করারও চেষ্টা ক'রো না। বছর কতক আগে যদি আসতে তো শোভা পেত।...তখন—ইনি না দয়া করলে হয়ত সত্যিই বাজারে নাম লেখাতে হ'ত। ভায়েরাই রোজগার করাত।...এই একটা সুকৃতি ছিল, এ'র আশ্রয় পেয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও, আমার জন্যে ভেবো না।'

কেমন একটা রাগ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে অসহ একটা বিদ্বেষও ঐ লোকটা সম্বন্ধে, যে সেই থেকে নিঃশব্দে শুয়ে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বললুম, 'আমি পুলিস নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাব! কেউ আটকাতে পারবে না। ব্যাটা ভণ্ড—তোমাকে ভয় দেখিয়ে এসব শিখিয়ে রেখেছে!'

এবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মেন্তি, 'ওমা, তুমি আমাকে পুলিস ডেকে নিয়ে যাবে কোন্ অধিকারে? তুমি কোন্ অভিভাবক আমার?...আর উনি যদি ভণ্ডই হবেন তো এদ্দিন পরে তুমি আসছ খুঁজে খুঁজে—সেটা টের পাবেন কেমন ক'রে যে—শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবেন?...ওসব পাগলামি ছাড়ো—ঘরে এসে বসো। চা খাও, চাই কি রাত্রের খাওয়াটাও সেরে যাও—কোথায় কি জুটবে তার ঠিক নেই। দ্যাখো, আমি নিজে রেঁধে খাওয়াব—!'

আর আমি দাঁড়ালুম না। এমন হার-মানা বোধহয় আর কখনও মানি নি, এমন অপদস্থ-বোধও করি নি।

এক্কায় চাপতে চাপতে শুনলুম—ভেতর থেকে মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে লোকটি বলছে,

'ওঁকে আর টানাটানি ক'রো না তারা, এতটা উনি সইতে পারবেন না একদিনেই—'

এর বহুদিন পরে আর একবার দেখেছিলাম মেন্তি বা তারা ভৈরবীকে।

সেও কি একটা যোগের দিন, অহল্যাবাঈ ঘাটে নাইতে নামছি, সে স্নান ক'রে গঙ্গা-জলের ঘটি হাতে চলে গেল। তেমনি স্থির সৌদামিনীর মতো রূপ, তেমনি আত্মসমাহিত ভাব। পরনে লাল কাপড়, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঘাটের দুপাশে অসংখ্য লোক, পাণ্ডারা পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে।

যেতে যেতে আমার চোখে চোখ পড়ল একবার। মনে হ'ল—আমার অনুমান—কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ওর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর, কিন্তু সে ঠিক কয়েক মুহূর্তই, আমাকে চিনতে পারল কিনা তা তার আচরণে বা দৃষ্টিতে প্রকাশ পেল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি শান্ত ধীরভাবেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেল।

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১॥

এতক্ষণ যা বললুম—এ গল্পটা না বললেও হয়ত চলত।

আসল যে গল্প, যার গল্প বলতে বসেছি—তার সঙ্গে ও কাহিনীর খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। অন্তত বাইরের স্থূল সম্পর্ক।

দুই কাহিনীর যোগসূত্র অন্য। পৃষ্ঠপট কাল—একই। পাত্র-পাত্রীও কেউ কেউ। এরা আমারই দেখা লোক, আমারই আত্মীয় বা আত্মীয়তুল্য। আমার জীবনে আজও এরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

যে সময়ের কথা বলছি—সে সময়ে এই শ্রেণীর মানুষগুলো একই রকম ছিল, একই ধরনের আচার-আচরণ ছিল তাদের।

যোগসূত্রটা সেইখানেই।

পৃষ্ঠপট আমার বাল্যের দেখা কাশী। অবশ্য সবটাই দেখা নয়, কিছুটা শোনাও। তবে সে দুইয়ে এক হয়ে গেছে স্মৃতিতে, কোনটা দেখা আর কোনটা শোনা—বেছে নেওয়ার উপায় নেই।

আপনাদের বয়স কত হয়েছে জানি না—ভয় নেই, বয়স জিজ্ঞেস ক'রে বিব্রত করব না, আমার বক্তব্য অন্য—মানে ১৯১০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে যাঁরা কাশী গেছেন তাঁরা আমার রমেশ ঠাকুর্দাকে অবশ্য দেখেছেন। না দেখে উপায় নেই। কারণ কাশী যাবেন অথচ দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবেন না, কিম্বা—বিশ্বনাথ দর্শন তো যেমন তেমন, বিশ্বনাথের গলিতে কাপড়, বাসন, খেলনার জন্যে ঘুরবেন না, দিনে দেখে তৃপ্তি হয় না তাই রাত্রেও একবার আরতি দেখার নাম ক'রে ঐ গলিতে ছুটবেন না—এ তো আর সম্ভব নয়।

সুতরাং ঐ সময় যাঁরা গেছেন, তাঁদের চোখে পড়েছে ঠিকই—আমার রমেশ ঠাকুর্দার অপরূপ মূর্তিটি!

তবে লক্ষ্য করেছেন কিনা সে কথা আলাদা।

কারণ ওঁর রাজত্ব—রাজত্বই বলুন আর চৌহদ্দিই বলুন, ইংরেজী থেকে বাংলা করলে বলতে হয় ওঁর চরে বেড়াবার জায়গা—ঐ পাড়াটাই।

সে সময়কার দশাশ্বমেধের রাস্তা চিন্তা করুন। ঘাটে যেতে ডান দিকে একটা মস্ত ফটকের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা, এককালে হয়ত কারও হাতীশাল ছিল কিম্বা আস্তাবল—ফটকের ঠিক উলটো দিকের দেওয়াল জুড়ে বহুদূর বিস্তৃত এক বিশাল বটগাছ, তার নিচে স্তূপাকার কয়লা।

ওটা পাইনদের কয়লার দোকান ছিল। ভবানীদা ঐ পড়ো জমিটুকু ভাড়া নিয়েছিলেন, না এমনিই ভোগদখল করতেন তা বলতে পারব না, কেননা দোকান যে খুব একটা রৈ-রৈ করে চলত তা নয়। মালও বেশী কিনতে পারতেন না ভবানীদা, এক ওয়াগন ক'রে কয়লা আসত, সেটা ফুরোলে আবার এক ওয়াগন। তাও মধ্যে মধ্যে একেবারেই ক'দিন থাকত না, খদ্দেররা শুকনো মুখে আনাগোনা করত।

এই দোকানেই মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেতে খাতা লিখতেন আমাদের রমেশ ঠাকুর্দা, রমেশ মুখুজ্যে মশাই।

মানে খাতা লেখবারই কথা—তবে তা ছাড়াও ঐ পাঁচ টাকা দরমাহাতে অনেক কাজ করতে হ'ত।

ফটকের সামান্য আচ্ছাদনের নিচে তক্তপোশ পেতে তাতে একটা জরাজীর্ণ মাদুর

বিছিয়ে কাঠের একটা ক্যাশবাক্সর ওপর খাতা খুলে বসে থাকতেন রমেশ ঠাকুর্দা।

খাতা মেলা থাকত, হাতে কলমও ধরা থাকত কিন্তু খাতা কতদূর লেখা হ'ত তা বলা কঠিন, কারণ আমি যখনই দেখেছি হয় খাতার ওপর ঢুলে পড়ে ঝিমোচ্ছেন, নয়ত উচ্চকণ্ঠে খদ্দেরদের সঙ্গে তদারক করছেন।

কার কত বাকী আছে, কত দিনের বকেয়া ; এমন করলে পাইনের পোকে কারবার গুটিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চলে যেতে হবে নাগা সাম্যসী হয়ে ; পাঁচ আনা মণ কয়লা বেচে কত লাভ হয় যে এত ধার ফেলতে পারে দোকানদার? কয়লা খারাপ? হ'তেই পারে না। এই কয়লা এ টইরণে সবাই ব্যবহার করছে, কই কেউ তো কোনদিন, 'কন্‌পেলেন' করে নি! আসলে উনুন জ্বালাতে জানে না বাড়ির মেয়েরা, ভাবে গোচ্ছার ঘুঁটে দিলেই বনবন ক'রে উনুন ধরে যাবে। কই নিয়ে চলুন তো রমেশ মুখুজ্যেকে সে উনুন সাজিয়ে
বনবন ক'রে উনুন ধরে যাবে। কই নিয়ে চলুন তো রমেশ মুখুজ্যেকে, সে উনুন সাজিয়ে
স্রেফ নিচে একটি লম্প জ্বালিয়ে দিন, এক পয়সার লম্প, বাঁই বাঁই ক'রে আগুন উঠে যাবে। বলে, 'নাচতে জানে না নাবডিংরে, উঠোনটাকে বলে হে'টেন ঠিকরে'।...তা তো নয় বাবা, পয়সার তাগাদা করলেই কয়লা খারাপ হয়ে যায়।...হুঁ হুঁ বাবা, ঢের বয়েস হ'ল রমেশ মুখুজ্যের। দেখলও ঢের। পয়সার তাগাদা না করো—এই কয়লাই এক নম্বর ঝরিয়া হয়ে যাবে—টাকা চাও—চুনারের পাথর।

বেশী কথা বলা স্বভাব ছিল রমেশ ঠাকুর্দার।

বয়সেরই ধর্ম, তবু মনে হয় অন্য বুড়োদের থেকেও একটু বেশী বকতেন উনি।

একটা উপলক্ষ পেলেই হয়, বকতে বকতে দুই কষে ফেনা জমে যাবে, হাঁপিয়ে পড়বেন—তবু বকুনি থামবে না। কথাও কইতেন সর্বদা চেঁচিয়ে—যেন ধমক দিয়ে দিয়ে। ওঁকে ঠাকুর্দা বলার পিছনেও এই অভ্যাসের ইতিহাস। প্রথম যেদিন ওঁকে পিছন থেকে ডেকেছি 'কাকাবাবু' বলে—কী বলব ভেবে না পেয়েই কথাটা বেরিয়ে গেছে—প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠেছেন, তেড়ে মারতে আসেন এই ভাব, 'কাকাবাবু কে রে ছোঁড়া? এইটুকু পুঁচকে ছেলে—কত বয়েস হ'ত তোর বাবার বেঁচে থাকলে তাই শুনি? আমি তোর ঠাকুর্দার বয়িসী লোক, আমাকে কাকাবাবু বলা? ঠাট্টা করা হচ্ছে, না? কেন, আমি কি খোকা সেজে থাকি বয়েস ভাঁড়িয়ে? জ্যাঠামশাইও তো বলতে পারতিস নিদেন?'

বলা বাহুল্য, তখন বয়স কম, রাগ হয়ে গিয়েছিল খুব। তাই জ্যাঠামশাই না বলে সেদিন থেকে 'ঠাকুর্দা' বলেই ডাকি।

আসলে ঠিক ঠাকুর্দার বয়িসী নন, ওটা বাড়িয়ে বলা। উনি কিন্তু তাতে আদৌ অপ্রসন্ন নন, বরং নাতি সম্পর্ক পাতানোয় রসিকতা করার সুযোগ হওয়াতে ভারী খুশী।

মানুষটা ঐ ধরনের ছিলেন, চেঁচিয়ে গল্প করছেন কিম্বা কাউকে ধমকাচ্ছেন, হঠাৎ তার মধ্যেই গলাটা নামিয়ে সেই কুৎকুতে চোখের একটা টিপে—একটু আদিরসাত্মক ইঙ্গিত কিম্বা দু'একটা খিস্তি না করতে পারলে ওঁর কথা বলে জুৎ হ'ত না।

এখনও বোধহয় ঠিক ধরতে পারছেন না। চেহারার বর্ণনাটা পেলে হয়ত মিলিয়ে নেবার সুবিধে হবে।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী পড়েছেন (আগে হ'লে এ প্রশ্নই উঠত না, অক্ষর-পরিচয় আছে অথচ দুর্গেশনন্দিনী পড়ে নি—এমন লোক বিরল ছিল। এখন ক্লাসিক বই পড়াটা ফ্যাসনের বাইরে হয়ে গেছে) তাঁরা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে স্মরণ করুন। বিদ্যাদিগ্‌গজের শ্রীচরণ দুটির সেই অমর বর্ণনা—'অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন'!...আমার মনে হয় আমাদের রমেশ ঠাকুর্দাকে দেখেই বঙ্কিমবাবু ঐ

বর্ণনাটি দিয়েছিলেন।

রোগা, কালো, একটু কোলকুঁজো—কালো মানে কয়লার দোকানেই ঠিক মানায় এমন কালো, মসীবর্ণ যাকে বলে—ছোট ছোট দুটি চোখ, বিস্ফারিত ক'রে চাইলেও রাত্রি-বেলা যা ঠাওর হয় না এতই ছোট, সহসা দেখলে চোখের জায়গায় দুটো ফুটো আছে শুধু মনে হয়। একমাত্র যা বলবার তা হচ্ছে খুব বেঁটে নয়, তালগাছের মতো ঢ্যাঙাও নয়, মাপিকসই দৈর্ঘ্য। চুল পাকা ধবধবে, তবে দাঁত—আমি শেষ যখন দেখেছি ওঁকে ১৯৩২।৩৩ হবে—তখন বোধহয় আশি পেরিয়ে গেছে ওঁর, উনি যা বলতেন অবশ্য সেই হিসেবে—তখনও বেশির ভাগ দাঁত অটুট।

দাঁত উঁচু যাকে বলে তা ছিল না, তবে বেশ বড় বড়, কোদালে দাঁত, বড় আর সাদা, হঠাৎ হেসে উঠলে অত কালো মুখে অতখানি সাদা—কেমন যেন ভয়াবহ বোধ হ'ত। এক কথায় গ্রহাচার্যরা যাকে শনির জাতক বলেন—হুবহু সেই চেহারা।

এ ছাড়াও কিছু ছিল বর্ণনা দেবার মতো—বঙ্কিমবাবুও যা লক্ষ্য করেন নি।

দুই কষে ফেকোপড়া ঈষৎ সাদা দাগ। কথা বলার সময় থুথু বা ফেনা জমত, বোধহয় তাতেই হেজে স্থায়ী ঘায়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।...তার ওপর চোখের কোলে ক্রমাগত সুতোর মতো পিঁচুটি জমত, সে সম্বন্ধে বেশ অবহিতও ছিলেন। লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতেই সুকৌশলে আঙুলের ডগা দিয়ে সেই সুতোটি লম্বাভাবে টেনে বার করতেন। এ দৃশ্যে যে দর্শকদের মনে ঘৃণা হওয়া সম্ভব, এসব যে একটু আড়ালে সারতে হয়—এ জ্ঞানই ছিল না তাঁর।

এইবার মনে পড়ছে একটু একটু ক'রে? বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছেন?

এধারে কিন্তু যতই বদ-অভ্যাস থাক্, ধুতি উড়ুনি (জামা পরতেন কদাচিৎ, কোথাও কোন বিশেষ জায়গায় যেতে হলে তবেই—শীতকালের জন্যে একটা রেলকর্মচারীর গরম কোট ছিল, পুরনো বাজার থেকে কেনা, খালিগায়েই সেটা চড়াতেন) এবং পৈতে —সর্বদা ধপধপ করত।

ধুতি উড়ুনি ফরসা থাকত—তার জন্যে ওঁকে অবশ্য কোন মেহনৎ করতে হ'ত না। আমার সতীদিদির গতর বজায় থাক্, তিনি দু'তিন দিন অন্তরই ক্ষারে কেচে কর্তার ধুতি চাদর, নিজের পরনের শাড়ি এবং বিছানা ধপধপে ক'রে রাখতেন।

সতীদিদি—রমেশ ঠাকুর্দার সম্পর্কে সতীঠাকুমা বলাই উচিত, কিন্তু অত সুন্দর মানুষটাকে ঠাকুমা বলতে কেমন যেন লাগত, ঠাকুমা শব্দটার সঙ্গে বার্ধক্যের অবস্থাটা অঙ্গাঙ্গী জড়িত আমাদের মনে. আমরা সতীদিদি বা সতীদিই বলতুম, মা অবশ্য 'মা' বলেই ডাকতেন, তাঁর অত-শত ছিল না;—ছিলেন ঠাকুর্দা মশাইয়ের বিপরীত একেবারে।

সুগৌর বর্ণ—হয়ত দুধে-আলতা যাকে বলে তা নয়—কিন্তু গৌরী তাতে সন্দেহ নেই। 'গোরোচনা গোরী' যাকে বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন, হলদের ওপর চড়া, হরতেলের রঙ, দুর্গা প্রতিমায় যে রঙ দেয় কুমোররা। বড় টানা-টানা দুটি চোখ, সপ্তমীর চাঁদের মতো মানানসই কপাল। ক্ষুর দিয়ে কামানোর মতো সরু সুন্দর দুটি ভুরু—[আবারও বৈষ্ণব কবির বর্ণনা মনে পড়ছে—'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামানো', বিখ্যাত কীর্তনিয়া রামকমল এই লাইনটি তিনবার তিন রকমে উচ্চারণ ক'রে আখর দেবার কাজ সারতেন,— 'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামানো'. 'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামান', 'জোড়া ভুরু যেন কামেরই কামআনো'!] এছাড়া কবির কল্পনার সঙ্গে মেলানো আল্‌তামাখা দুটি ঠোঁট, তার ফাঁকে মুক্তোর মতো শুভ্র সুন্দর দাঁত। গঠনও তেমনি—রোগাও না মোটাও না. সব দিক দিয়েই মাপিকসই; গোলালো গোলালো হাত-পা।

একেবারে সেই স্যান্ডারসনের রূপকথার গল্প—'বিউটি য়্যান্ড দ্য বীস্ট!' তারই প্রত্যক্ষ উদাহরণ এই স্বামী-স্ত্রী।

কিন্তু তবু, এমন সুখী দম্পতি, পরস্পরের প্রতি এমন গভীর প্রেম, এমন পূর্ণ নির্ভরশীলতা—খুব কম দেখেছি আমি।

আজও, জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এর জুড়ি আদৌ দেখেছি কিনা সন্দেহ।

অথচ সতীদি ঠাকুর্দার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। আর সেটা দেখলেই বোঝা যেত। আমরা যখন দেখেছি ঠাকুর্দা বুড়োই, কিন্তু সতীদি তখনও যেন যৌবন অতিক্রম করেন নি, এমন স্বাস্থ্য। এত পরিশ্রম করতেন৷ তবু চামড়ায় কোথাও কোঁচ পড়ে নি, হাতের শিরা ওঠে নি। হাতের মুঠো খুললে মনে হ'ত দুহাতে আলতা মেখেছেন কিছু-ক্ষণ আগে। 'বাইশ বছরের ছোট আমার চেয়ে'—ঠাকুর্দা নিজেই বলতেন, 'নাতির বয়সে পুতি যাকে বলে।...আমাদের যখন বে হয় তখন আমার ছত্রিশ, ওর চোদ্দ। ভাগ্যিস ছেলেমেয়ে হয় নি, নইলে ওকে মা আমাকে দাদু বলত।'

বিয়েটা দ্বিতীয়পক্ষে না তৃতীয়পক্ষের—কেউ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন ঠাকুর্দা। বলতেন, 'দ্বিতীয়পক্ষ? কী পেয়েছিস আমাকে? এই চেহারায় বার বার বর সাজব? প্রেথম পক্ষই করবার সাহস হয় নি,—নিতান্ত ইনি নিজের নামের সংগে মেলাতে বুড়োর 'লব্'-এ পড়লেন তাই!...আর বলিস কেন, এ'চোড়ে-পাকা মেয়ে, বাপের বয়সী ব্রেষকাঠ একটা লোককে কায়দা ক'রে বে করলেন। ভাবলেন উনি বুঝি খুব টেক্কা মারলেন।...মর এখন, যেমন বোকা তেমনি ভোগ। বলিছিলুম, রোস, ভাল বে দিচ্ছি তোর। তা নয় জীবনভোর খেটে খেটে গতরপাত, না কোনদিন একটি গয়না অঙ্গে উঠল, না একখানা ভাল শাড়ি—এই গুণের ভাতার পেয়েছেন।...তাও বলে কি জানিস? বলে, নিত্যি বিশ্বনাথকে ডাকি, যেন আমার কোলে তুমি যাও!...বোঝো ব্যাপার! হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে—কোথায় ভগবানকে ডাকবে যেন সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে যেতে পারি—তা নয়। ওঁর ভয় উনি মরার পর আমি যদি আবার এমনি ছুক্‌রি দেখে আর একটা বে করি!'

বলে আবারও হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন।

এর বেশী কিছু জানা যেত না।

প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে যেতেন।

এই—ওঁর ভাষায় 'লব্'—প্রেমে পড়ার ইতিহাসটা অনেকেই জানতে চেয়েছে, কিন্তু তার অবসর হয় নি। ভেতর থেকে তেড়ে উঠেছেন সতীদি, 'ও কি হচ্ছে কী? বুড়ো না হ'তেই ভীমরতি! বলি, আমি কি তোমার জ্বালায় মাথামুড় খুঁড়ে মরব?'

'আচ্ছা, আচ্ছা। এই চুপ করলুম' বলে থেমে যেতেন একটু, তার পর গলাটা নামিয়ে শ্রোতাদের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলতেন, 'এখনও নাকি আমি বুড়ো হই নি—ভীম-রতির বয়স হয় নি। এতেই বোঝ লব্‌টা কী পরিমাণ প্রেগাঢ়! সতী নাম রাখা ওর বাপ-মার সাথক্—কী বলিস? য়্যাঁ?'

॥ ২ ॥

ওঁরা কোথায় থাকতেন? বলছি। সেই সূত্রেই তো আলাপ।

পাড়াটা বলব না, কারণ এখনও কেউ কেউ বেঁচে আছেন—ও-বাড়ির, ও-পাড়ার। তখনকার যারা নাটকের কুশীলব তাদের ছেলেমেয়েরা স্ত্রীরা তো বটেই। তবে খুবই পরিচিত রাস্তা, গোধুলিয়ার কাছেই।

বাঙালীর বাড়ি। মধ্যে বাগান, চারদিক ঘিরে চকমেলানোর ভঙ্গীতে টানা বাড়ি। মাঝে মাঝে পার্টিশান। এইভাবে মোট ছখানা বাড়ি গনতিতে। চারদিক ভুল বলেছি, একদিকে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল, বাগানের দিকে তার পিছনটা। সব বাড়িই তিনতলা, তলায় তলায় ভাড়াটে, আধুনিককালের ফ্ল্যাটের মতো। সেইভাবেই তৈরী। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ করলেই—একানে, আলাদা।

দোতলা তেতলায় ঐ হিসেবে ভাড়া, এক এক ফ্ল্যাটে এক এক ঘর ভাড়াটে—কিন্তু একতলায় নয়। রাস্তার দিকে যে দুটো বাড়ি, তার একতলার ঘর, দোকানঘরের হিসেবে করা, তখন দোকান হয় নি—মেথর কসাই টিকেওলা প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ভাড়াটে কয়েক ঘর ছিল। তারা কোথাকার কল-পাইখানা ব্যবহার করত তা জানি না, তবে বাড়ির ভেতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

বাকী যা ভেতরের ঘর—সে ভালো ভাড়াটে পাবার মতো নয়। একতলার ঘর কাশীর বাড়িতে—গরমের দিন ছাড়া ব্যবহার করা যায় না।

অবশ্য এ বাড়িগুলো ঠিক বাঙালীটোলার বাড়ির মতো নয়—মধ্যে বাগানটা থাকায় অত স্যাঁৎসেঁতে অসূর্যম্পশ্যা হ'তে পারে নি—তবুও একদিকেই দরজা জানলা—তিনদিক চাপা বলে বাস করা বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল।

তাই, যাদের কষ্ট ক'রে থাকা ছাড়া উপায় নেই—খোপে খোপে পায়রার মতো, সেই বুড়ীরাই ভাড়া থাকত।

কাশীর বিখ্যাত সেই হতভাগ্য স্বজনপরিত্যক্ত বুড়ীর দল—এক একখানি জীবন্ত সচল উপন্যাস—এখন যে 'রেস' নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে!

এক চিল্‌তে ক'রে খুপরি ঘরে থাকত, সামনের রকটুকুতে রান্না করত, বাসন মাজত, জল রাখত—কখনও কখনও স্নানও সারত। সেই রকেই কেউ কেউ কাকের ভয়ে চট ঝুলিয়ে নিয়েছিল। যার তাও জোটেনি, তোলা উনুন ধরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ ঘরেরই এক পাশে রান্না করত। রান্না অবশ্য একবেলা, তাও মাসে অন্তত সাত-আটদিন বাদ। তবু আয়োজন সবই রাখতে হ'ত। ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই হয়ত একটা কেরোসিনের টিন কি কাঠের বাক্সতে কয়লা, চুপড়িতে ঘুঁটে রাখতে হত—হাঁড়িতে হাঁড়িতে চাল, ডাল, আটা, গুড়।

তবু এ-বাড়ির ঘর ভাল এবং বাঙালীটোলার মধ্যে নয় বলে ভাড়া একটু বেশীই ছিল, মাসিক আট আনার কমে কোন ঘর ছিল না।

সুতরাং এখানে যারা বাস করত তাদের আয়ও ভাল। মাসিক তিন টাকা আয়ে যাদের সংসার চালাতে হ'ত—তখনকার দিনেও তাদের বাঙালীটোলার অন্ধকূপ নিচের ঘর ছাড়া গতি ছিল না। এ-বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কারুর মাসে ছয় কারুর বা আট টাকা মাসোহারা আসত। গোসাঁইগিন্নী আর তারা দিদিমা পুরো দশ টাকারও বেশি পেতেন। তাঁদের ঘরও ভাল ছিল। এক টাকা ক'রে ভাড়া দিতেন তাঁরা।

এরই একখানাতে—গোসাঁইগিন্নীর পাশের ঘরে থাকতেন রমেশ ঠাকুর্দারা।

ভাড়া দিতে হ'ত না, এমনিই থাকতেন। তার কারণ, বর্তমানে যিনি বাড়িওলা—এঁর একবার খুব মায়ের অনুগ্রহ হয়েছিল। খুব বাড়াবাড়ি, এত বীভৎস ঘা যে বাপ-মাও ঘরে ঢুকতে পারতেন না। গা কাঁপত তাঁদের, মাথা ঘুরে যেত।

সেই সময় ঠাকুর্দা লোকমুখে শুনে উপযাচক হয়ে এসে খুব সেবা করেন। মান-পাতা যোগাড় ক'রে তাতে মাখন মাখিয়ে শুইয়ে রাখা, দিনরাত মশারির মধ্যে ধুনো দিয়ে শুকোবার ব্যবস্থা করা, ঘড়ি ধরে পথ্য খাওয়ানো,—খাওয়ার অবস্থা ছিল না, ফোঁটা ফোঁটা ক'রে এক ঘণ্টা ধরে দুধ খাওয়াতে হ'ত—সব একা করেছেন। বাড়িওলার একমাত্র ছেলে, তাঁরা প্রচুর পুরস্কার দিতে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দা নেন নি।

সে কথা বর্তমান বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু ভোলেন নি। তিনি সসম্মানে একটা গোটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে ওঁদের এনে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও রাজী হন নি রমেশ ঠাকুর্দা। বলেছিলেন, 'এখন তো ঝোঁকের মাথায় কাজটা করবে ভায়া—শেষে আপসোসের সীমা থাকবে না। তখন তাড়াতেও পারবে না, আমাদের ওপর বিষদৃষ্টি পড়বে। ও কাজে আমি নেই, আমি যেমন মানুষ, যে ঘরে থাকার যুগ্যি—ঐ নিচের তলার একখানা ঘর যদি দাও, তবেই আসব—নইলে এখান থেকেই রাম রাম!'

তাই দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাবু। অবশ্য ওরই মধ্যে যেটা একটু বড়—সেইটেই দিয়েছিলেন।

সেই থেকেই এখানে আছেন ঠাকুর্দা। বাগানটার জন্যেই ঘরটা বড় প্রিয় ছিল তাঁর, পাড়াগাঁয়ের মানুষ, একটু গাছপালা না দেখলে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠত। বাগান তো ভারী, দু-তিন ঝাড় কাঁচকলা, গোটাকতক পেয়ারা গাছ, একটা ডালিম আর একটা একপেটে টগর। তবু ঐটুকুই ওঁর প্রাণ ছিল। নিজে-হাতে তদ্বির করতেন, নিঃস্বার্থভাবে। তবে, দীর্ঘকাল ওখানে কাটালেও, বেচারা শেষ নিঃশ্বাসটা ওখানে ফেলতে পারেন নি।

কিন্তু সে কথায় পরে আসব।

ঐ ব্যারাকবাড়িরই রাস্তার দিকে যে দুটো অংশ—তারই একটার তিনতলায় থাকতুম আমরা।

রান্না-ভাঁড়ার ছিল চারতলায়, সেখানে জল যেত না। নিচে থেকে জল বইতে হ'ত। ভাড়াও অনেক বেশী, মানে কাশীর হিসেবে, বারো টাকা। তবু, বাড়িটা ভাল ছিল বলেই—তখনকার দিনে কাশী শহরে অত ফাঁকা বাড়ি দুর্লভ—অনেক অসুবিধা সহ্য ক'রেও থাকতুম আমরা।

আমাদের তিনতলার বারান্দা ছিল খুব প্রশস্ত, বারো ফুট চওড়া হবে বোধহয়। তারই এক কোণে রাস্তার দিকে মার তুলসীগাছের টব থাকত।

তিনতলার বারান্দা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে, দোতলার বারান্দাটা—কী কারণে জানি না দু-ভাগে ভাগ করা ছিল। রাস্তার দিকের অংশটা তিনটে ধাপ ভেঙে ওপরে উঠতে হ'ত, ফলে নিচের ঘরগুলোয় অত আলো-বাতাস যেত না।

যাক—যা বলছিলাম, মার ঐ তুলসীগাছ উপলক্ষ ক'রেই ঠাকুর্দার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। আর, এই ঘটনাটা ওঁর স্বভাবেরও একটা পরিচয় বটে।

তখনও আলাপের কোন সূত্র পাওয়া যায় নি, অর্থাৎ কোন যোগাযোগ ঘটে নি।

আমরা ওঁদের দেখি ওপরের জানলা থেকে, বুড়ো ভোরে উঠে অবিরাম খকখক করে কাশেন আর ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে তামাক টেনে যান। সতীদি ওঁরও আগে ওঠেন, খুটখাট ঘরদোরের কাজ করেন, মধ্যে মধ্যে কর্তাকে তামাক সেজে দেন আর পাশের বারান্দায় গোসাঁইগিন্নীর একটা পোষা চন্দনা ঝোলানো থাকত তাকে চাপাগলায় পড়ান, 'পড়ো বাবা আত্মারাম, পড়ো। বলো, হরে-কৃষ্ণ, হরে-কৃষ্ণ। বলো বাবা বলো।' চাপাগলায় কারণ—ঠিক মাথার ওপরেই প্রয়াগবাবুরা থাকতেন। তাঁরা বেলায় ঘুম থেকে ওঠেন—চেঁচিয়ে পাখী পড়ালে তাঁরা বিরক্ত হবেন।

এই পর্যন্ত।

উনি বা ওঁরা যে আমাদের লক্ষ্য করেছেন—বা আমাদের অস্তিত্ব আদৌ অবগত আছেন—তাও জানি না।

হঠাৎ একদিন আমাদের সিঁড়িতে চটাস চটাস চটির শব্দ। ঠনঠনের চটি পায়ে দিতেন ঠাকুর্দা। ওঁর ঐ বিশেষ জুতো সম্বন্ধে আসক্তি জেনে কেউ-না-কেউ এনেই দিত কলকাতা গেলে। তখন আঠারো আনার চটি বুকে-হাঁটু দিয়ে পুরো দুটি বছর চলত!

যাই হোক অত তখনও জানি না, আমাদের সিঁড়িতে কে উঠতে পারে ভেবে পেলুম

না! আমাদের এখানে তিনতলায় কস্মিনকালে কেউ ওঠে না, আমরা নতুন লোক—এখানে আমাদের পরিচিত বলতে যা দু-একজন—তারা সকলেই দূরে দূরে থাকে—একজন পাঁড়ে-হাউলী, একজন চোখাম্বা। এত সকালে তারা কেনই বা আসবে? কিছুই ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে, আমি মার মুখের দিকে—মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

একটু পরেই খট খট ক'রে কড়া নড়ে উঠল। আমাদেরই দরজার কড়া। একটু ভয়ে ভয়েই দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখি—রমেশ ঠাকুর্দা। তখন 'নিচের ঐ বুড়োটা' বলে উল্লেখ করতুম ওঁকে।

উনি কিন্তু আমাদের দিকে চেয়েও দেখলেন না, বা এই আকস্মিক আগমনের জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়াও প্রয়োজন মনে করলেন না।

'সর্‌ সর্‌' বলে আমাকে এক রকম ঠেলেই সরিয়ে—দরজার বাইরে চটিটা ছেড়ে, গট্‌ গট্‌ ক'রে চলে গেলেন লম্বা বারান্দা পেরিয়ে একেবারে পুব-দক্ষিণ কোণে—তুলসীগাছটার কাছে। তারপর উবু হয়ে বসে আঙুলে পৈতে জড়িয়ে কী একটা মন্ত্র পড়ে নিয়ে—হয়ত প্রণাম-মন্ত্রই হবে—তুলসীর মঞ্জরীগুলো ভাঙতে লাগলেন। একমনে, নিবিষ্ট হয়ে।

আমাদের গাছ, এতে যে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে বা আমাদের অনুমতি নেওয়া বা অন্ততঃ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যে দরকার—তাও ওঁর মাথায় এল না।

একেবারে সব মঞ্জরীগুলো ছেঁড়া হ'লে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই কুৎকুতে চোখে পিট পিট করে তাকিয়ে একটা প্রায়-হুঙ্কার ছাড়লেন, 'হ্যাঁ......! গাছ পুঁতলেই হয় না, তুলসীগাছ পুঁতলুম আর একটু ক'রে জল দিলুম, ব্যস্‌ হয়ে গেল, ডিউটি শেষ! অত মঞ্জরী হয়েছে—গাছ বাঁচে কখনও? মরে যাবে যে! আমি তাই রাস্তা থেকে দেখি, ভাবি, এই আজ ছিঁড়বে—কাল ছিঁড়বে—দেখি কিছুই কেউ করে না। বুঝলুম কথাটা মাথাতেই ঢোকে নি, কল্‌কাতার ভূত তো, গাছের মর্ম্ম কিছু জানে না, ও আমাকেই করতেই হবে।'

এই বলে হে-হে ক'রে হাসলেন খানিকটা। তারপর আমার মাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমার উনুনে আঁচ পড়েছে—বৌমা?'

মা নতমুখে জবাব দিলেন, 'না, এই তো বাসিপাট সারা হ'ল। এইবার দেব।'

'কী সর্বনাশ! এখনও আঁচ দাও নি, সাতটা বেজে গেল! কখন আঁচ উঠবে আর কখন রান্না করবে!...ছেলেরা ইস্কুলে খেয়ে যাবে তো!...উনুন ধরানো কি চাট্টিখানি কথা, ভারী শক্ত কাজ।...ঐটেই তো আসল। উনুন যদি ধরে গেল, গনগনে আঁচ উঠল, রান্না করতে কতক্ষণ?...যাও, যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও!'

আবার তিনি চটি পায়ে গলিয়ে চটাস্‌ চটাস্‌ শব্দ ক'রে নেমে গেলেন, কলকাতার লোকেদের গ্রাম্যতা আর অজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনমনেই মন্তব্য করতে করতে।

পরে জেনেছিলাম—উনি আমাদের সতীদিদির সংসারে ঐ একটি কাজ ক'রে দিতেন, সকালে কাজে বেরোবার আগে উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যেতেন।

উনুন সাজিয়ে নিচে থেকে একটি লম্প বা ডিবে জেবলে দিতেন, একটু অপেক্ষা ক'রে ঘুঁটে ধরে উঠেছে বুঝলে সেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

সেই সময়টা সতীদির বাসিপাট সেরে স্নান করতে যাবার সময়। একটি মাত্র কল, নিচের এতগুলি ভাড়াটের জন্যে—ওদের বাদ দিয়েও জনাছয়েক, আর বুড়োমানুষদের কলতলায় একটু বেশীক্ষণই লাগে—সুতরাং ইচ্ছামাত্র স্নান সেরে চলে আসা যেত না। গোসাঁইদিদির ভাষায় 'টর্ন' আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হ'ত।

আগে কলতলাটা খোলা জায়গায় ছিল, বালতি ক'রে জল বয়ে এনে নিজেদের রকে চটের আড়ালে চান সারতে হ'ত, কতকটা সতীদির জন্যেই এখন দুপাশে আর মাথায়

করগেটের টিন দিয়ে একটু আড়ালমতো হয়েছে, বাথরুমের নামান্তর। ঠাকুর্দা প্রত্যহ বারোটা নাগাদ তাঁর কয়লার ক্যাশ বন্ধ ক'রে ফটকে তালা লাগিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরতেন—কলঘর লাগত না।

তা' ঐ একটি কাজ করতেন বলেই ঠাকুর্দার ধারণা ছিল—সংসারের কঠিনতম কাজ হল উনুনে আঁচ দেওয়া।

॥ ৩ ॥

বাড়িভাড়া লাগত না ঠিকই—তবু পাঁচ টাকায় দুজন লোকের তখনও চলত না। শুধু খাওয়াটা হয়ত চলে যেতে পারত, সব খরচ জড়িয়ে চলা সম্ভব নয়—তা যত সস্তাগণ্ডাই হোক।

অথচ সঙ্গতিও আর ছিল না।

ঠাকুর্দামশাই আমাদের নাকি কখনই কিছু করেন নি, যাকে কিছু 'করা' বলে—চাকরি-বাকরি কি ব্যবসা-পত্র।

তার কারণ—যাতে এ বাজারে ক'রে খাওয়া যায়—উনি সেই ইংরেজী লেখা-পড়া কিছুই জানতেন না। জানার ইচ্ছে ছিল, সুযোগ হয় নি।

চব্বিশ পরগণার রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে কোন্ এক পল্লীগ্রামে বাড়ি, পুরুত-বামুনের ছেলে উনি।

গ্রাম্য পুরোহিত, উপার্জন কম, অনেক ছেলেমেয়ে। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়ে পাস করাবেন, সে সঙ্গতিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তখন পাঠশালা ছিল গ্রামে গ্রামে। পাঠশালায় পড়ার পর বাবা টোলে দিয়েছিলেন হরিনাভিতে—সংস্কৃত পড়তে।

সে পড়া ভাল লাগে নি, লাগে নি বোধহয় বাবার উদ্দেশ্য বুঝেই আরও। বাবা সংস্কৃতটাও কোন উপাধি পাবার জন্যে পড়তে দেন নি। অল্প কাজ-চলা-গোছ শেখার পর যজমানী করবে ছেলে—এইটেই চেয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা টোলে পড়তে পড়তেই ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন পাড়া-গাঁয়ে ইংরেজী শেখাবার লোক বিশেষ ছিল না। মাস্টারদের কাছে পড়তে গেলে মাইনে লাগে—পাড়ার ছোট ছেলেদের ধরে শেখা সুতরাং অক্ষর পরিচয় আর 'আই গো' 'ইউ গো' 'হি গোজ'—এর বেশী এগোয় নি।

পরে নাকি এখানে এসে একখানা 'রাজভাষা' বই কিনে অনেক ইংরেজী শব্দ শিখেছেন, তবে তাকে ইংরেজী শেখা বলা যায় না কিছুতেই।

কাশীতে এসে বেশ কিছুদিন টিউশ্যানি ক'রে চালিয়েছিলেন।

তখন এখানে বাঙালীর ছেলের বাংলা পড়বার ইস্কুল ছিল না বিশেষ। অনেকেই তাই প্রাইভেটে পড়াতেন।

রমেশ ঠাকুর্দা বাংলা আর সংস্কৃতও একটু—মোটামুটি কাজ চলা গোছের জানতেন বলে কোন অসুবিধে হয় নি। এক টাকা আট আনা মাইনের টিউশ্যানি, এ-ই বেশির ভাগ। একসঙ্গে দুভাইকে পড়িয়েছেন মাসিক বারো আনায়—এ টিউশ্যানিও করেছেন।

তাতেই তখনকার দিনে বেশ আয় হ'ত—মাসে ছ'-সাত টাকা হেসেখেলে। গোপাল মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বিনা-ভাড়ায়, আর এক বামুনবাড়িতে মাসে তিন টাকা দিয়ে দুবেলা খাওয়া চলত। পরে বিয়ে করার পর ঘর ভাড়া ক'রে সংসার পাততে হয়েছে—তেমনি তখন একটু বেশী খেটে মাসে দশ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন।

তবে কখনই কিছু জমান নি, গুধুড়ি বাজার ঘুরে পুরনো বই কেনার বাতিক ছিল। অবশ্য সে আর কতই বা—দু পয়সা চার পয়সা—আর ছিল কিছু গোপন দানধর্ম।

সতীদি ঠাট্টা ক'রে বলতেন,—'মেগে পাই বিলিয়ে খাই', তরে কোনদিন বাধাও দেন নি। স্বামীর কোন কাজেই কোনদিন বাধা দেন নি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তাঁর বিবাহক্ষণের প্রথম প্রণয়-বিহ্বলতা সারা জীবনে কাটে নি।

কিন্তু তার পর—দিন পাল্টে গেল।

ওঁরও বয়স হয়ে গেল, বাংলা পড়াবার মতো ইস্কুলও হয়ে গেল একাধিক।

প্রাইমারী বা পাঠশালা তো পাড়ায় পাড়ায়।

'ঐ চিন্তামণি যখন সরকারী চাকরি ছেড়ে এসে য়্যাংলোবেঙ্গলী ইস্কুল করব বললে—আমিও তখন ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পথে পথে ভিক্ষে করেছি। নিজের ভাত-ভিক্ষে যাবে বলে জাতের ক্ষেতি করব—সে শিক্ষা আমার নয়।'

হেসেই বলতেন ঠাকুর্দা, শুধু হাসিটা ঈষৎ করুণ লাগত।

আরও মুশকিল হ'ল উনি ইংরেজী পড়াতে পারেন না, ইস্কুলে দিলে একসঙ্গে সবই হয়। ওঁকে মাইনে দিয়ে রাখবে কেন বাপ-মারা? একটি একটি ক'রে ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে একটিও রইল না আর। তখন—যাকে বলে 'চোখে অন্ধকার দেখা' তাই দেখলেন।

এই আয় কমবার মুখেই, টিউশ্যানি কমতে কমতে যখন মাসিক চার-পাঁচ টাকা আয়ে পেঁাচেছে—বোধহয় লোকমুখে বিপন্ন শুনেই—লক্ষ্মীবাবু এখানে ঘর দিয়ে এনে রেখেছিলেন। তবে তাতেই বা কি হয়? শেষে এমন অবস্থা হ'ল—মুখুজ্যেমশাই এক ছত্তরে গিয়ে খেতে শুরু করলেন, সতীদি দিনের পর দিন একমুঠো ক'রে চিঁড়ে খেয়ে কাটাতে লাগলেন।

তারপরই কী একটা যোগাযোগে পাইনদের দোকানে এই কাজটা পেয়ে গিছলেন।

ওঁকে এখানে ততদিনে অনেকেই চিনেছিল। গরিব লোক, কিন্তু কারও সাহায্য-প্রার্থী কি ভিক্ষার্থী নয়, বরং পরোপকারী, সৎ ব্রাহ্মণ—এই জন্যেই সকলে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। ভবানীদাও জানতেন ওঁকে, তাঁরও লোকের দরকার একজন—কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁদের কাছে কাজ নেবেন কিনা, সন্দেহ ছিল। ঠিক ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসাও করতে পারেন নি। ঠাকুর্দা যা মুখফোঁড় লোক, হয়ত মুখের ওপরই বলে বসবেন, 'তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় দেখি! তুমি চাও বামুনের ছেলেকে চাকর রাখতে!...না হয় গরিবই হয়েছি, তাই বলে পথে পথে ভিক্ষে তো শুরু করি নি এখনও!...আর বামুনের ছেলে ভিক্ষে করলেও তো দোষ হয় না, তাই বলে বেনের কাছে চাকরি! বলি এখনও তো চন্দ্র সুয্যি উঠছে, না উঠছে না?...যদ্দিন তা উঠবে ভগবানের রাজত্বে বামুন বামুনই থাকবে।'

এই ভয়েই অনেকদিন চুপ ক'রে ছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে ভয় অমূলক। ভবানীদা একদিন নন্দ লাহিড়ীকে কথাটা বলেছিলেন—নন্দ লাহিড়ীও অনেক ইতস্ততঃ ক'রে—বেশ একটু ভয়ে ভয়েই পেড়েছিলেন এ প্রস্তাবটা।

রমেশ ঠাকুর্দা কিন্তু আদৌ চটে ওঠেন নি। বলেছিলেন, 'ও মা, তা করব না কেন? কাজটা পেলে তো বেঁচে যাই ভাই! এতে আবার এত "কিন্তু" হবার কি আছে?...দ্যাখ্ নন্দ—পষ্ট কথা বলছি, আজ যে আমার অভাব বলে তা নয়, বামুনের ছেলে গঙ্গার ধারে বসে ভিক্ষে ক'রে খেলেও বামুনই থাকব, কেউ বামুন বই শুদ্দুর বলবে না—তা নয়, এ জাতের ভণ্ডামিতে আমার অরুচি ধরে গেছে অনেকদিন।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলেছিলেন, 'অনেক বামুন দেখেছি, অনেক দেখছি—তাদের কাছে চাকরি করা তো দূরের কথা তারা সিধে কি বিদেয় দিতে এলেও নোব না। তাদের কাছে ভবানী লাখো গুণে সোনা। ব্যবসা করতে বসে দুটো মিছে কথা বলে কি ওজনে ঠকায়—আমি জানি না, কথার কথা বলছি—সে আলাদা কথা, সে তবু বুঝি। মিছে কথা কে না বলে, দেহধারণ করলে বলতেই হবে, যুধিষ্ঠিরকে বলতে হয় নি?

কেষ্ট বড়াই করেছিল কুমুদকেস্তরে অন্তর ধরব না, তাও ধরতে হয়েছে। কিন্তু মাথায় টিকি, গলায় পৈতে, অমুকের হাতে খাব না, অমুকের বাড়ি পা দোব না, অথচ এক একটি অর্থপিশাচ সব, কেউ গয়না বন্ধক রেখেও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিচ্ছে, কেউ বা জ্ঞাতিদের কেমন ক'রে বঞ্চিত করবে—সন্ধ্যে করতে বসেও সেই মতলব ভাঁজছে! নয়ত গরিব যজমানকে কি ক'রে দুটো ফাঁকিবাজী কথা বলে দে'ড়েমুষে আদায় করবে—এই চিন্তা অষ্টপ্রহর। আর না হ'লে ঘরে বসে বিধবা ভাজের পেট খসাচ্ছে।...হাত্তোর বামুন। কলির বামুন আবার বামুন কি রে? কলিতে বামুন শুদ্দুরের দাসত্ব করবে—এ তো শাস্তরের বিধান!'

সেই থেকেই ওখানে চাকরি করছেন ঠাকুর্দা।

ভবানীদা তো বেঁচে গেছেন বললেই হয়। কারণ এটা সবাই জানে, না খেয়ে মরে গেলেও রমেশ মুখুজ্যে এক পয়সা ভাঙবে না, কি কোন তঞ্চকতা করবে না।

ভবানীদা উনি আসবার পর দোকানে সবই ছেড়ে দিয়েছেন একরকম, এক আধবার আসেন, খোঁজখবর নেন, মাল কেনার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন, টাকাটা হিসেব বুঝে গুনে নিয়ে চলে যান। ভবানীদার ব্যবসার দিকে ঝোঁকটাই কমে আসছিল, পরে ঠাকুর্দার যখন আর মোটেই খাটবার অবস্থা রইল না—তখন দোকানই তুলে দিলেন। শুনেছি তারপর সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন ভবানীদা।

সে যা-ই হোক—ভবানীদারও এমন অবস্থা নয় যে ওর থেকে বেশী মাইনে দেন। একটা চাকর রাখতে হয়েছিল, এটা ওটা খুচরো খরচও তো আছে। বিক্রী তো ঐ, দু'-ওয়াগন কয়লাও এক মাসে কাটত না। কিন্তু ঠাকুর্দারও অন্য কাজ খোঁজবার কি করবার অবস্থা নয়।

তবে চলে কিসে?

এই প্রশ্নটাই আমাদের মনে বার বার দেখা দিত।

সে উত্তরটা দিয়েছিলেন আমার মা—কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে দেখবার পর।

সতীদিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, 'যোগেযাগে চলে যায় মা, বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে পড়ে আছি, তিনিই চালিয়ে দেন। নইলে বাবার নাম যে মিথ্যে হয়ে যাবে, তাঁকে লজ্জায় পড়তে হবে।'

মাও তাই বলতেন, 'সত্যিই যোগেযাগে চালায় বামনী। কি ক'রে যে চালায় তা ও-ই জানে। বুড়োর কপাল ভাল তাই অমন বৌ পেয়েছে। শুধু রূপ নয়—রূপ তো অনেকেরই আছে, আগুনের মতো রূপ দেখেছি, যেখানে যায় আগুন ধরায়—এমন গুণ কোথায় পাবে? সর্বংসহা একেবারে, ধরিত্রীর মতো। ঐ তো ছুঁরির বর, তার জন্যে কী সহ্যই না করছে!'

আমরাও তারপরে দেখেছিলুম লক্ষ্য ক'রে—মার কথামতো।

কী না করেন ভদ্রমহিলা!

তখন ছোটখাটো যজ্ঞিতে হালুইকর ডাকত না কেউ—কাশীতে বিশেষ পাওয়াও যেত না। 'হাল্‌ওয়াই'—অর্থাৎ ওদেশী কচুরি লাড্ডু করবার কারিগর মিলত, কিন্তু বাঙালী যজ্ঞির লোক বিশেষ ছিল না।

সুতরাং কারও বাড়ি যজ্ঞি হ'লে মেয়েরাই মিলেমিশে কাজটা তুলে দিতেন ; অবশ্য ছোটখাটো যজ্ঞি, ত্রিশ-চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন বড়জোর, তার বেশী হলে লোক ডাকতেই হ'ত। হিন্দুস্থানী হালুইকরই ডাকা হ'ত—কারণ কাশীতে তখন খুব বেশী যজ্ঞিতে মাছ মাংস হ'ত না। বিয়ে কি অন্নপ্রাশনেই মাছ হ'ত যা—তাও অল্প লোকের ব্যাপার হ'লে মেয়েরাই সেরে নিতেন।

এইসব ক্রিয়াকর্মের বাড়িতে সতীদি গিয়ে বুক দিয়ে পড়তেন, বলারও অপেক্ষা

করতেন না।

ছোটখাটো ভোজের ব্যাপার যেখানে—সেখানে সব রান্না একাই তুলে দিতেন প্রায়, যেখানে দু-আড়াইশ'র ব্যাপার সেখানেও কুটনো কোটা যোগাড় দেওয়ার প্রশ্ন আছে, ওঁর কাজের অভাব হ'ত না। অন্নপূর্ণা পুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো—এ সবেতে ভোগ রাঁধার ভার পড়ত তাঁর ওপর। নিরম্বু উপোসী থেকে অত শুদ্ধাচারে আর কে করবে?

তবে একটি শর্ত ছিল ওঁর। উনি না খেয়ে সারাদিন খাটতে রাজী ছিলেন, খাটতেনও তাই, খেলে খাটতে পারা যায় না—এই কারণ দেখিয়ে বড়জোর একটু শরবৎ কি একটু দই খেয়ে নিতেন একবার, ভোগ রাঁধার কাজ থাকলে তো চুকেই গেল—কিন্তু বেলা বারোটার সময় বুড়োর খাবারটি ঘরে পেঁাছে যাওয়া চাই।

পরিষ্কারই বলতেন, 'উনি আমাদের' কিম্বা 'তোমাদের মুখুজ্যেমশাই' ক্ষিদে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। বারোটা বাজলেই ছটফট করেন, একেবারে ছেলেমানুষের বেহদ্দ হয়ে যান।...ঐটি আমার চাই ভাই—ঠাকুরদেবতা যা বলো সব মাথায় আছেন, মাথাতেই থাকুন—আমার সকলের ওপর উনি। ওঁর এই দুপুরের খাবারটি পেঁাছে দিয়ে আসব, তারপর বলো—সারা দিনরাত পড়ে আছি তোমার এখানে। রাতের খাওয়ার জন্যে অত তাড়া নেই, ঘরে চিঁড়ে আছে মুড়ি আছে—আমার দেরি হয় সে ঠিক জলে ভিজিয়ে একগাল খেয়ে নেবেখন্। দুপুরে কারও কথা শুনবে না!'

আর সে খাবারও—অপরকে দিয়ে পাঠানো চলত না।

মুখুজ্যেমশাই যার-তার হাতে খেতে পারতেন না। স্ত্রীর রান্না ছাড়া তো পছন্দই হ'ত না—সেই জন্যেই আরও, যজ্ঞিবাড়িতে গিয়ে সতীদি রান্নার দিকেই এগিয়ে যেতেন বেশির ভাগ—ঠাকুর্দা কুৎকুতে চোখ একটা টিপে বলতেন, 'যজ্ঞির ভাত, কলার পাত, মায়ের হাত—লোকে কথায় বলে, ঐ শেষের শব্দটা একটু বদলে নিয়েছি, মাগের হাত ক'রে নিয়েছি' বলে হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন—তাও যদি না হয়, তিনি সামনে ধরে দিলেই খুশী। কে কিভাবে দেবে, কি কাপড়ে আনবে, প্রত্যঙ্গ-বিশেষ চুলকোতে চুলকোতেই হয়ত সেই হাতে ধরবে, কিম্বা ঘাম পড়বে বা থুথু—এইসব বাছবিছার ছিল খুব বেশী।

সেই কারণেই যত কাজ থাক্—নিতান্ত দূরের পথ হ'লে হয়ে উঠত না, ভেলুপুরা কি কেদারঘাট থেকে তো আর আসা যায় না—তবে এই কাছাকাছি রামাপুরা কি লাক্সা কি খোদাইচৌকী কি সূর্যকুণ্ড হ'লে ঠিক বুকে ক'রে এনে পেঁাছে দিয়ে যেতেন এক ফাঁকে। তাতে ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে হয় কি স্নান করতে হয়—কোন আপত্তি নেই।

দূরের পাড়ি হ'লে রাত তিনটেয় উঠে তোলা জলে বাসিপাট সেরে যা হোক একটু ভাতেভাত রেঁধে রেখে যেতেন, মাথার দিব্যি দিয়ে বলে যেতেন খাওয়ার আগে একটু 'ছিপারী' জেবলে যেন গরম ক'রে নেন একবার।

কিন্তু এই এত কাণ্ড ক'রে ছুটে যাওয়া—শুধু একবেলা কি দু'বেলা ঠাকুর্দাকে ভালমন্দ লুচি-সন্দেশ-রাবড়ি খাওয়ানোর জন্যেই নয়।

এতে অন্যদিক থেকেও কিছু আমদানি হ'ত।

হয়ত আনাজ-কোনাজ অনেক এসে পড়েছে, দেখা গেল যজ্ঞি শেষ হবার পরও স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে আলু কি কপি কি মটরশুঁটি। স্বভাবতঃই গৃহিণীরা বলতেন, 'কিছু নিয়ে যাও না দিদি (কিম্বা মাসীমা কি বামুন মেয়ে—যেখানে যে সম্পর্ক), এখানে পচবে বৈ তো নয়।'

দিদি দু'একবার 'না না' ক'রে নিয়েও আসতেন। অল্প কিছু গামছায় বেঁধে আনলেও দুজনের সংসারে সাতদিন চলে যেত, তাছাড়া পোড়া ঘি (তখন সৌভাগ্যবশতঃ বনস্পতি বাস্তুদেবতা হয়ে ওঠে নি) হয়ত অনেক বেঁচেছে, মাথাটাথা চুলকে গিন্নী

বলে ফেললেন শেষ পর্যন্ত, 'বলতে তো পারি না দিদি, এতটা পোড়া ঘি, অপরাধ নেবেন না, আপনার মতো দেখেন বলেই বলছি—নিয়ে যাবেন একটু? মুখুজ্যেমশাইকে দু'খানা লুচি ভেজে দিতেন?'

এইভাবেই তেল, মশলা, মায় ফোড়ন পর্যন্ত আসত—বাড়ি-বিশেষ বা স্থান-বিশেষে।

বাড়ি-বিশেষে এই জন্যে বলছি, তেমন তেমন হিসেবী বাড়িতে বেশী কিছুই বাঁচে না, কমই পড়ে শেষের দিকে। আর স্থান-বিশেষ অর্থাৎ—স্বল্প-পরিচিত লোকের বাড়ি, যেখানে অন্য কোন পরিচিত লোকের সুবাদে গেছেন—সেখানে নিতে বললেও দিদি নিতেন না, মিষ্টি কথায় নিরস্ত ক'রে চলে আসতেন।

তবে পাওনা এ-ই সব নয়।

এত যে মানুষটা এসে খাটলেন দুদিন তিনদিন ধরে,—যেখানে যেমন দরকার—মুখের রক্ত তুলে বলতে গেলে, তাকে শুধু উদ্বৃত্ত জিনিস কিছু দিলেই কর্তব্যের শেষ হয় না।

নগদ টাকা অবশ্যই সতীদি নিতেন না—মানে পারিশ্রমিক হিসেবে হাতে হাতে—কিন্তু বিবেচক যে হয় সে দেওয়ারও অনেক উপায় জানে।

সেটা হঠাৎ-বড়মানুষীর ঔদ্ধত্য বা আত্ম-বড়মানুষীর দিন ছিল না। আমি আমার সুখের জন্যে বিলাসের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছি, এক টাকা কাউকে দিতে হ'লেও পকেট থেকে নোটের গাদা হাজার দেড় হাজার টাকা বার করছি, কিন্তু পাণ্ডা এলে তাকে তেড়ে মারতে আসছি, মুটেকে দু'পয়সা কম দেবার জন্যে লম্বা বক্তৃতা করছি—এখন এই লোকই বেশী। এরা দান করে—যদি বা করে—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। সে দান নিরুপায় লোকেরও নিতে মাথা কাটা যায়।

তখনকার দিনে লোকে দানও করত অতি সন্তর্পণে, বিনয়ের সঙ্গে। এর ব্যতিক্রমও হয়ত ছিল, তবে আমি ছেলেবেলায় যে কাশী দেখেছি—সেই কাশীর কথাই বলছি।

কাজকর্ম চুকে গেলে হয় বাড়ির কোন ছেলেকে দিয়ে (অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কোন ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়ে) অথবা কোন ব্রাহ্মণের মেয়েকে দিয়ে একটি বড় ক'রে সিধা পাঠানো হ'ত, তার সঙ্গে সন্দেশ আলতা সিঁদুর—নতুন কাপড়। ফলে বিস্তর শাড়িকাপড় জমে যেত সতীদির। মুখুজ্যেমশাই বাড়িতে শাড়ি পরেই কাটাতেন, তা ছাড়াও অনেক সময় সতীদি দশাশ্বমেধের কোন চেনা দোকানে, কি এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে কাউকে দিয়ে তার বদলে ধুতি নিতেন।

এই সিধার সঙ্গে সিকি-আধুলি বা কোন কোন জায়গায়—তবে সে খুব কমই—টাকাও আসত দক্ষিণা। সিধাতেও, সাধারণ সিধার মতো আধ সের চাল আধ পো ডাল না দিয়ে লোকে বেশী ক'রেই দিত, ধামা বা ঝুড়ি ক'রে—চাল ডাল ঘি তেল সৈন্ধব লবণ, মশলা আনাজ—দশ-বারো দিন পর্যন্ত চলে যেত দুজনের অনেক ক্ষেত্রে।

এ ছাড়াও ছিল।

এইভাবে একজনের মারফৎ আর একজনের পরিচিত হয়ে হয়ে পরিচয়ের পরিধিও বেড়ে গিয়েছিল।

কাশীতে সেকালে সধবা-কুমারী-পুজো করার রেওয়াজ খুব বেশী ছিল। পুজোর সময় তো বটেই—তীর্থ করতে এলেও নতুন মহিলা যাত্রীরা এসব করতেন।

অন্নপূর্ণার রাজত্বে এসে সধবা-পুজোয় খুব মাহাত্ম্য। সধবা বামুনের মেয়েকে অন্ন-বস্ত্র দান করলে আর কখনও ও দুটির অভাব থাকবে না—এই বিশ্বাস ছিল। সে প্রয়োজনেও পরিচিত কেউ কাছাকাছি থাকলেই অথবা জানতে পারলেই সতীদিকে ডেকে আনতেন। নিজস্ব গুরুপত্নী কি পুরোহিত-পত্নী থাকলে আলাদা কথা—তবে নতুন যাত্রীদের পুরোহিত আর কোথায়—থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ওঁকেই পছন্দ করতেন যাত্রীরা।

জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, মধুর স্বভাব আর সর্বোপরি এই আশ্চর্য সতীত্ব—ঐ স্বামীকে কেউ অমন ভালবাসতে ভক্তি করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না, কাশীর মতো দারিদ্র জায়গাতেও হাজার হাজার টাকার প্রলোভন এসেছে ওঁর যৌবনকালে—সব জড়িয়ে সতীদি একটা কিম্বদন্তীর মতো হয়ে গিছলেন। যদি কোন সধবাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করতেই হয়—তাঁকেই করতে চাইবে মানুষ, এ তো স্বাভাবিক।

সেও শাড়ি, সন্দেশ, দক্ষিণা। যাঁরা জানতেন ওঁদের অবস্থা, তাঁরা ইচ্ছে ক'রেই—এই ছুতোয় কিছু সাহায্য করবেন বলেই—একটা সিধাও দিতেন ঐ সঙ্গে—যাঁর যা সামর্থ্য।

এইটেই ছিল সতীদির যোগেযাগে চালানো।

॥ ৪ ॥

স্বল্পপরিচিত লোকদের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যেত—স্ত্রী এত কাণ্ড ক'রে সংসার চালান : ঠাকুর্দা কিছু রোজগার করার, স্ত্রীকে একটু রেহাই দেবার চেষ্টা করেন না কেন?

এটার সোজাসুজি উত্তর অবশ্য কোনদিনই পাই নি ঠিক। উত্তর পেয়েছি অন্য পরোক্ষ প্রশ্ন ক'রে।

ঠাকুর্দা আর কী কাজই বা করতে পারেন?

এর সোজা জবাব—কেন, যজমানি?

সত্যি, কাশীতে এত বাঙালী, ক্রিয়াকলাপও তো লেগেই আছে।

আর চালাচ্ছেও তো অনেকে।

বড় বড় পণ্ডিত যাঁরা, মহামহোপাধ্যায়—তাঁরা এসব কাজ করেন না, নিজেদের বাড়ির পুজোও করেন না অনেকে! বড়জোর বিদায় নিতে যান। তেমনি তাঁদের অবস্থাও ভাল নয়। প্রভাস পণ্ডিত মশাইকে আমরাই তো দেখেছি, অত বড় পণ্ডিত গুণী লোক—সামান্য চাকরি ক'রে দিনাতিপাত করেন, গৃহিণীর মুখনাড়া খান।

কিন্তু যজমানি করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই কাশীতে দু'তিনখানা বাড়ি করেছেন, তাঁদের বাড়ির সিন্দুক খুললে কত মণ বাসন বেরোবে তার ঠিক নেই। আমাদের পুরোহিত মশাইকেই তো দেখছি।

সুতরাং ঠাকুর্দা সম্বন্ধে সেই প্রশ্নটাই স্বাভাবিক।

বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু এমন বুড়ো হন নি যে যজমানি করা চলে না। চাকরি করছেন পরের—আর লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজোয় দুটো ফুল ফেলে আসতে পারেন না? শরীর খারাপ হয়, বড় বড় পুজো—দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো না হয় না-ই করলেন—ষষ্ঠীপুজো, মনসাপুজো, লক্ষ্মীপুজো করলেও তো ওঁদের সংসার বেশ চলে যায়। সতীদিকে এমন উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না।

'এই তো সরস্বতী পুজোয় ছেলেরা পুরুত পায় না। ছুটোছুটি করে একটা পুরুতের জন্যে—হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে নাড়ি চুঁইয়ে'—আমার মা-ই গজগজ করতেন, 'পৌষমাস, ভাদ্রমাস, চৈত্রমাসে—ঘন্দপুজোর বেলাতেও তো দেখি অমনি পুরুতের আকাল। ভদ্রলোক এগুলোও তো করতে পারেন। সারা মাস সাড়ে ছটা থেকে এগারোটা আর তিনটে থেকে ছটা—কয়লার দোকানে হাজরে দিয়ে বুঝি পাঁচ টাকা না ছ'টাকা পান—একটা লক্ষ্মীপুজোর দিনেই তো ও কটা টাকার ঢের বেশী উশুল হয়ে যাবে।'

অনেকদিন পরে এ প্রশ্নটা করেছিলুম রমেশ ঠাকুর্দাকে।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের বেশ ক'বছর পরে।

একটা 'হ্যা——।' বলে ইংরেজীতে যাকে বলে 'নন্ কমিট্যাল' শব্দ ক'রে—অনেক-ক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন ঠাকুর্দা।

ঐটে ছিল ওঁর একটা মুদ্রাদোষ। 'হ্যা' বলে শব্দটা উচ্চারণ ক'রে শেষের স্বরটা অনেকক্ষণ ধরে টানতেন। কোন প্রসঙ্গের আগে বা পরে অকারণেই ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দটি ব্যবহার করা অভ্যাস ছিল। ওটা স্বীকৃতিবাচক বা সম্মতি-সূচক 'হ্যাঁ' শব্দ নয়—ওটা ওঁর কাছে অনেকখানি বক্তব্যের সার।

বহু চিন্তা, বহু দ্বন্দ্ব, বহু সমস্যার দ্যোতক।

অনেক না-বলা কথার ইঙ্গিত। মানে ওঁর কাছে।

সেদিনও ঐ শব্দটা উচ্চারণ ক'রে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন, —পৃথিবীর-বোধ-হয়-ক্ষুদ্রতম চোখ দুটি পিট্‌পিট্ করতে করতে।

তারপর বললেন, 'তোর মতো আরও অনেকে এ-কথাটা জিজ্ঞেস করেছে নাতি, উত্তর দিতে পারি নি। দিলে বুঝত না। হুতো মনে করত, বাজে ছুতো। তুইও যে সব বুঝবি তা নয়—তবে বলছি এই জন্যে যে, তুই তোর ঠান্‌দিকে খুব ভালবাসিস, তা আমি লক্ষ্য করেছি। আসলে তার জন্যে তোর কষ্ট হয় বলেই জিজ্ঞেস করছিস। সেইজন্যেই তোকে বলছি, কথাটা শোনা থাক্। এ আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া রইল—তোদের সকলের হয়ে তোর কাছে।...বুঝবি কি না বুঝবি, অত ভাবতে গেলে চলবে না। এখন না বুঝিস পরে বুঝবি। নয়ত আর কেউ বুঝবে।...তবে তুই যা এঁচোড়ে-পাকা দেখি—এই বয়সে গাদা গাদা নবেল-নাটক শেষ করছিস, তুই বুঝলেও বুঝতে পারিস!'

এই ব'লে একটু থামলেন, খক খক ক'রে কাশলেন কিছুক্ষণ ধরে। চোখের পিঁচুটি মুছলেন, তারপর তেমনি পিটপিটে চোখ আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বলতে শুরু করলেন।

তবে চোখ আমার মুখের ওপর থাকলেও মনটা সেখানে ছিল না এটা বুঝতে পারলুম। কোথায় কোন্ সুদূরে চলে গিয়েছিল, এ কৈফিয়ৎ উনি আমাকে দিচ্ছিলেন না, সমস্ত পরিচিত মানুষকেই দিচ্ছেন, এখনই বললেন—কিন্তু তাই কি, মনে হ'ল এ উনি নিজেকেও দিচ্ছেন, নিজের বিবেককে। আর সঙ্গে সঙ্গে করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

'দ্যাখ—পুরুত বামুনের ঘরেই জন্মেছিলুম। আমার বাবাও যজমানি করতেন। পাড়া-গাঁ জায়গা, শুনতেই হরিনাভি-রাজপুর—পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখন কি হয়েছে জানি না, আমার ছেলেবেলায় খুবই ভগ্নদশা অবস্থা ছিল, বন-জঙ্গলে ভরা। যাদের ক্ষ্যামতা আছে তারা সবাই কলকাতায় বাস করত—কস্মিনকালে কেউ দেশে যেত না। বরং আরও দক্ষিণে, বারুইপুর কি তারও দক্ষিণে অনেক বড় বড় লোক থাকত শুনেছি। আমাদের ওখানে তো জ্ঞান হয়ে অব্দি দেখছি বড় বড় পুরনো বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, নয়ত বট অশথ গাছ গজাচ্ছে। কেউ আর আসেও না, মেরামতও করে না। হয়ত কোন শরিকের অবস্থা খারাপ, তার শহরে যাবার উপায় নেই—তারাই ভাঙ্গা বাড়ির যেটুকু বাসযুগ্যি আছে, ভোগদখল করছে। নয়ত আমাদের মতো দীন-দরিদ্র লোক,—আধপাকা আধকাঁচা বাড়িতে মাথা গুঁজে আছে। আমাদের বাড়ির দ্যাল ছিল পাকা, পাকা মানে ইটের—মাটির গাঁথুনি—মেঝেটা অবিশ্যি শানের, চুন দিয়ে পেটা, তখন এত বিলিতি মাটির চল হয়নি—চাল গোলপাতার!

'তা ঐ যা বলছিলুম, তবু ঐ দেশেও আমার বাবা যজমানি ক'রেই—ক'রে-খেতেন। এক আধ বিঘে জমি ছিল, নামে-মাত্তর, বছরে তিন মাসের খোরাকও হ'ত না। যা কিছু ভরম্ভর ঐ ক'ঘর যজমানের ওপরই।

'হ্যাঁ, বাবা অবিশ্যি খাটতেনও—লক্ষ্মীপুজো, মনসাপুজো কি সরস্বতী পুজোর

দেখেছি—দুরদুরান্তেও যাচ্ছেন ; ভোর থেকে উঠে শালগ্রাম মাথায় ধ'রে পাঁই পাঁই ক'রে ছুটছেন আলের ওপর দিয়ে ; গ্রীষ্মকালে রাত চারটেয় উঠে বাড়ির পুজো সেরেই বেরিয়ে পড়তেন, শীতে সেটা বড়জোর পাঁচটা হ'ত, বেরোতেন অন্ধকার থাকতেই—ইংরিজী মতে বেস্পতিবার ধ'রে আমাদের পুজোটা হ'ত আর কি—দূর পাল্লায় আগে বেরিয়ে যেতেন, পৌঁছতে পৌঁছতে সকালটা হয়ে যায় যাতে। তাদের হুমকি দেওয়া থাকত, "রাত থাকতে থাকতে গোছগাছ ক'রে রাখবে, এসে না দাঁড়াতে হয়। যদি ফিরে যাই—যার নাম বেলা চারটে—ইটি মনে রেখো।"

'মনে তারা রাখত। প্রাণের দায়ে মনে রাখত। সত্যিই ওঁর সব বাড়ির পুজো সেরে ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে-চারটে গড়িয়ে যেত। শীতকালে দেখেছি এক একদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে ফিরতে।

'তেমনি ওতেই সংসারও চলত। আমরা একপাল ভাই বোন, বিধবা জ্যাঠাইমা, জাঠতুতো একটা আধ-পাগলা ভাই, এক বরে-খেদানো পিসী—বাবার মামাতো বোন : এতগুলি লোকের ডালভাত খেয়ে মোটা-কাপড় প'রে দিন কেটেই যেত একরকম ক'রে।

'বোনদের বে-ও দিয়েছেন বাবা ওর মধ্যেই। দুটো তো দেখেই এসেছি, পরেরগুলোও কোন না দিয়েছিলেন। আর সে বে-ও বড় চাট্টিখানি কথা নয়, চেহারা তো আমাকে দেখেই মালুম পাচ্ছ—কেমন সব কন্দর্পকান্তি—এই রকমই ছাঁচ ধরো—উনিশ-বিশ।

'ঐটেই হ'ল কিন্তু কাল। এর ভেতরের দিক, মানে এই পুজোর অন্দরমহলের দিক—থ্যাটারে তোরা যাকে গ্রিণরুম বলিস, সেটা আমার আগেই দেখা হয়ে গেল, পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে। জ্ঞান হওয়ারও আগে বলতে গেলে—মানে উরির মধ্যেই তো মানুষ। কত যে ফাঁকি তা অবশ্য তখনও জানি না। শুধু জানি যে বাবা পুজোয় বেরোবার আগে সেই শেষ রাত্তিরেই এক গাল চিঁড়ে কি এক গাল পান্তাভাত খেয়ে নিতেন, দুর্গাপুজোতে জগদ্ধাত্রী পুজোতেও, সারা রাতের পুজো হলে তো কথাই নেই—যেমন ধরো কার্তিক পুজো—সে তো দিব্যি ক'রে মাছ ভাত সাঁটতেন। বলতেন, "রাতের পুজো, রাতে না খেলেই হ'ল। দিনের পুজো সব আগের দিন রাত্তিরে খেয়ে যদি হয়—এটা হবে না কেন?" তিনি যে দিনের পুজোতেও দিনেই খেতেন—সেটা তখন মনে থাকত না।

'তারপর কথাবাত্তারাও তেমনি। ফিরে এসে নৈবিদ্যির পুঁটুলি খুলে যে গালাগাল দিতেন রে ভাই—কি বলব।...কে মোটা চাল দিয়েছে, কে ক্ষুদের মতো ভাঙ্গা চাল, কে কম দিয়েছে, কে ধুতির বদলে গামছা দিয়েছে, কে গুণচটের মতো কাপড় দিয়েছে—এই নিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতেন যজমানদের, মানে সে মুখ খারাপ ক'রে একেবারে। শাপশাপান্তও করতেন অনেক সময়। "সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে, নিব্বংশ হবে সব। দেবতা-বামুনকে ফাঁকি দিয়ে যে পয়সা জমাচ্ছেন সে পয়সা ওষুধে ডাক্তারে বেরিয়ে যাবে, শ্মশানঘাটে খরচ হবে। ভোগ করবার লোক থাকবে না, যক দিয়ে যেতে হবে"—এমনি ধারা।

'খুব খারাপ লাগত ভাই, সত্যি বলছি।

'কেন লাগত তা জানি না। ঐ বাড়িতেই তো আমরা এতগুলো প্রাণী ছিলুম—কই, আর কারও তো লাগত না! বরং দাঁত বার ক'রে হাসত আমার ভাইবোনেরা।

'বোধহয় আমাকে সংসারে পাঠাবার সময় সাধারণ বিধাতার হাতজোড়া ছিল, ভিন্ন বিধাতার ওপর ভার পড়েছিল আমাকে গড়বার। আমার মনে হ'ত, আহা, ওরা ওদের অবস্থামতো সব দিয়েছে, আর এই বারোমেসে পুজোতে কে এত ছিষ্টি খরচা করে। এ নিয়ে এত বলবার কি আছে? এত যদি ঠকেছি মনে করেন, আগে থাকতে বন্দোবস্ত ক'রে নেন না কেন, এত পেলে যাব—নইলে যাব না?

'তবু কি জানিস, বাবা যেমন বিদ্যে নিয়ে পুরুতগিরি করতেন, পাঠশালে পড়া শেষ হবার পরই যদি আমাকে ঐ জোয়ালে জুড়ে দিতেন,—দুটো অং বং চং, নিজে যা জানতেন তাই শিখিয়ে—আমি হয়ত অত কিছু ভাবতুম না। বাবার মতোই দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যেতুম! পাঠশালার পড়া শেষ করতেই ঢের বয়স হয়ে গিয়েছিল, তার অনেক আগে পৈতে হয়ে গেছে।

'বাবা গেলেন অন্য পথে। তাঁর মনে মনে একটা ভয় ছিল, একটা দুঃখুও বলতে পারো—তিনি লেখাপড়া জানতেন না ব'লে ভরসা ক'রে কোন বড় জায়গায় ভাল জায়গায় যজমানি করতে যেতে পারতেন না। পাছে কেউ ভুল ধরে ফেলে, কোন মন্তরের মানে জিজ্ঞেস করে। সে সময়টা ইংরেজী-জানা বাবুদের খুব একটা বাহাদুরি ছিল, পুরুত বামুনদের অপদস্থ করা। তাছাড়া এদান্তে যজমানরাও একটু-আধটু লেখাপড়া শিখছিল বলে বাবা মনে করলেন একেবারে ফাঁকিবাজীর ওপর আর চলবে না, পেটে একটু কিছু থাকা দরকার।...

'একটা ছড়া খুব চলত আমাদের আমলে। অধিক বিদ্যে কানে ফুঁ, অল্প বিদ্যে শাঁখে ফুঁ, আর ন চ বিদ্যে উনুনে ফুঁ—বামুনের এই তিন কম্ম। মানে যে লেখাপড়া জানে সে গুরুগিরি করবে, কানে মন্তর দেবে ; যে তার চেয়ে কম জানে সে যজমানি করবে, আর যে কিছুই জানে না সে রান্না করবে, রাঁধুনী বামুন হবে। তা সে আর ছিল না, ন চ বিদ্যেই শাঁকে ফুঁ চলছিল। বাবার মনে হ'ল যে এভাবে আর চলবে না, একটু অন্ততঃ মন্তরের উচ্চারণগুলো রপ্ত হওয়া দরকার। সেই জন্যেই—হরিনাভিতে এক সসেমিরে গোছের টোল ছিল, আধমরা, নিহাৎ সামান্য কিছু সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল ব'লেই চলত—সেইখানে ভর্তি ক'রে দিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে ক্রোশখানেকের মতো পথ, বেলা দুপুর নাগাদ খেয়ে-দেয়ে রওনা দিতুম, বাড়ি ফিরতে যার নাম রাত আটটা।

'তা হোক—তখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স—দু'ক্রোশ পথ হাঁটা আমার কাছে কিছুই নয়। আমার মনটা ভেঙেগ গেল অন্য কারণে! তখন ইংরিজী পড়ার রেওয়াজ হয়ে গেছে, আমার পাঠশালার সাথী যারা তারা সকলেই ইংরেজী ইস্কুলে ভর্তি হ'ল—আমার মনে হ'ল আমি এ কি শিখতে যাচ্ছি!

'সংস্কৃত তখন আর টোলে কেউ শেখে না—ইংরেজী ইস্কুল যেটুকু শেখায় তাতেই কাজ চলে যায়—নিহাৎ আমাদের মতো যাদের অন্য কোন গতি নেই, এমনি দু'-চারটি ছাত্র নিয়ে টোল চলে। একেবারে কোন ছাত্র না থাকলে 'গ্র্যাণ্ট' বন্ধ হয়ে যাবে—তাই অধ্যাপক মশাই-ই একরকম খুঁজেপেতে ছাত্র ধরে আনতেন।

'তবু, কী আর করা যায়, এই ভেবেই পড়তে লাগলুম। কাব্য আর ব্যাকরণ, বাবা বলেছিলেন পড়তে। পড়ব কি—পণ্ডিত মশাই আজ অমুক জায়গায় বিদেয় নিতে যাবেন, অমুক গ্রামে দীক্ষা দিতে যাবেন, অমুকের পৈতেতে আচার্যির কাজ করবেন, অমুকের বে—তাঁর লেগেই থাকত একটা না একটা। পড়ার দিনের থেকে অনধ্যায়ের দিন তিনগুণ। তিনিই বা কি করবেন, তাঁকেও খুব দোষ দিই না—আমরা কেউই মাইনে দিতুম না, সরকারী বৃত্তিটুকু ভরসা। সেও ঐ নামে মাত্তরই। তাতে তো আর দিন চলে না—তাই গুরুগিরি পুরুতগিরি অধ্যাপকীগিরি সবই ক'রতে হ'ত। আগেকার আমলে শুনেছি টোলেই ছাত্ররা খেতে পেত থাকত—সে দিন আর ছিল না। সেই জন্যে যে পড়াটা দু'বছরে হবার কথা—সেটা তিন বছরেও শেষ হ'ত না।

'এধারে আমার বাবা অধৈর্য হয়ে উঠলেন। আদ্য পরীক্ষা দেব বলে তৈরী হচ্ছি, বাবা বললেন, "আর পরীক্ষার দরকার নেই, টোল ছেড়ে দে। আমার যেটুকু দরকার হয়ে গেছে, এতেই কাজ চলবে। এখন আমার কাছে ক্রিয়াকর্মের প্যাঁচগুলো শিখে নে—তাতেই হবে, আমাদের দশকর্মের কাজ, ওর বেশী লাগবে না"।

'এতদিন ভাই বাবার কথা অন্ধভাবে মেনে এসেছি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও। কিন্তু এবার আর পারলুম না।

'আসলে অন্ধ ছিলুম বলেই এতকাল মেনেছি, অত অসুবিধে হয় নি। বাবাই একটু-খানি চোখ ফুটিয়ে দিতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলেন।

'লেখাপড়া যাকে বলে তা কিছুই শিখি নি, তবু একটু যা মাথায় গিছল তাতেই বুঝেছি দশকর্ম অত সহজ নয়। পণ্ডিত মশাই নিজেও ওসব ক্রিয়া তত জানতেন না, তবে তাঁর বাড়িতে পুঁথি ছিল ঢের। তিনি প্রায়ই একটি ছড়া কাটতেন—আমার বাবাকে উদ্দেশ ক'রেই, পরে বুঝেছিলুম—"চণ্ডী মুণ্ডি কুশণ্ডি পার্বণ—এই চার নিয়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণ"। বলতেন, পাকা পুরোহিত হ'তে গেলে এই চার কাজ শেখা দরকার। চণ্ডী অর্থাৎ কালীপুজো ; কালীপুজোয় যত ন্যাস মুদ্রা জানা দরকার হয়—এত দুর্গাপুজোতেও লাগে না। মুণ্ডি মানে মণ্ডল তৈরী করা—এখানে দুর্গাপুজোতে তো দেখেছিস—আমাদের গণেশ মহল্লার সতীশ ভট্‌চায পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে সর্বতোভদ্র মণ্ডল তৈরী করে—ঐ লোকটা জানে দশকর্ম, সব পুঁথি মুখস্থ—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কুশুণ্ডি মানে কুশণ্ডিকা যে করাতে জানে—ভাল ক'রে—তার যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা মোটামুটি জানা হয়ে যায় ; আর পার্বণ মানে পার্বণ শ্রাদ্ধ। পার্বণ শ্রাদ্ধ যে নিখুঁতভাবে করাবে—তার কাছে সপিণ্ড-করণ খেলার সামিল।

'ওঁর এই কথাগুলো শুনতুম, আর বাড়ি এসে বাবার যা দু'একখানা পুঁথি ছিল সেইগুলো, কিম্বা, অনধ্যায়ের দিনগুলোয়—অত দূর হেঁটে গিয়েছি একটু তো জিরুতে হবে—পণ্ডিত মশাইয়েরই ক্রিয়াকর্ম বারিধি, নিত্যপূজা পদ্ধতি, দুর্গাপুজোর তিন-চার মতের পুঁথি—উল্‌টে দেখতুম।

'তাতে যা বুঝেছিলুম—মন্ত্রের মানে, ক্রিয়ার মানে, ন্যাস মুদ্রার মানে—বুঝেছি তো ছাই, হয়ত তিন আনা বুঝেছি, তেরো আনাই বুঝি নি—তান্ত্রিক ক্রিয়া তো কিছুই বুঝি নি—তবু একটা যা ঝাপসা ঝাপসা ধারণা হয়ে গিয়েছিল তাতেই বুঝেছিলুম—বাবা কিছুই জানেন না আর যজমানদের কী ফাঁকিই দেন! তারা সরল বিশ্বাসে ওঁর ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে—উনি একেবারেই ঠকিয়ে চলে আসেন। তাতেও পাওনা কম হ'লে অত রাগ, অত শাপমন্যি!

'আরও কি বুঝলুম জানিস—দোষ কোন পক্ষেই কম নয়। ছোটবেলাতেই—মানে পৈতের পর আর কি, বাবা কদিন সঙ্গে ক'রে ঘুরেছিলেন। সেই সময়ই দেখেছিলুম, যজমানরাও—একটু লেখাপড়া শিখেছে কি শেখে নি, হয়ত ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত ইংরেজীর দৌড়—তারা কী ঘেন্নার চোখেই না দেখে পুরুতকে। মেয়েরা একরকম, তারাই পুজোর যোগাড় করে, ছেদ্দাভক্তিও তাদের আছে, পুরুষরা—বিশেষ বামুন কায়েতের ঘরের পুরুষরা—বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও অধম ভাবে পুরুত জাতটাকে।

'আমিই ভুল বলছি, কুকুর বেড়াল তো শখ ক'রে পোষে লোকে, ভালবাসে, আদর করে ; এদের চোর জোচ্চোর বলেই জানে—পুরুতদের। ডাকতেও হয়—সমাজ আছে, দশবিধ সংস্কারে না ডাকলে চলে না। বে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, পৈতে—এগুলো তো চাই, পুরুতের যেটুকু কাজ সেটুকু নিদেন লোকদেখানো না হ'লে আসল যেটা—খ্যাটের ব্যাপার সেটা তো হয় না, তাই ডাকতেও হয়, কিন্তু কেবলই মনে করে ব্যাটারা ঠকিয়ে নিচ্ছে।

'তাছাড়া, গরীব-দুঃখী মুখ্যু-সুখ্যু লোক যারা—তারা সাধ্যমতো দেয়। যারা বাবু-ভাই, নিজেদের লেখাপড়া জানা লোক মনে করে—তারা সাধ্যমতো কম দিতে চেণ্টা করে। বে'তে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, বিদ্ধিশ্রাদ্ধর ফর্দ করতে বসো দিকি, সেখানে যত পারবে কারণকষ্যি করবে। ছ'পয়সা সেরের চাল, তাও যদি আধসের দিয়ে পারে তো তাই দেয়। তেমনি পুরুতরাও হয়ে গেছে ছ্যাঁচড়া—তারাও চায় যত রকমে পারে প্যাঁচ

দিয়ে—এটা ওটা ভাঁওতা দিয়ে বেশী আদায় করতে।...এই টানাটানিটাই আমার খুব খারাপ লাগত। লাগত বলি কেন, এখনও লাগে। দেখছি তো চারদিকেই—'

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন ঠাকুর্দা। আগে ভাবলুম দম নিতেই বুঝি থামলেন—কিন্তু একটু পরে মনে হ'ল তা নয়, উনি যেন মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেছেন। এখানে দেহটা থাকলেও মনটা চলে গেছে সুদূর অতীতে।

আরও খানিকটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললুম, 'তারপর?'

'তারপর?...তারপর আর কি, ঐ নিয়েই খিটিমিটি বাধল। বিষম অশান্তি, বাবা গোড়ায় চেঁচামেচি করলেন, তারপর গালাগাল, কাকুতি-মিনতিও করলেন শেষে। মাকে দিয়ে বলালেন, জ্যাঠাইমাকে দিয়ে—তাঁরা কান্নাকাটি করলেন। মা—একদিকে ছেলে এক-দিকে স্বামী—দোটানায় পড়ে একদিন ঢিব্ ঢিব্ ক'রে আমার সামনে মাথা খুঁড়লেন। জ্যাঠাইমা বোঝালেন, "তুমি বড় ছেলে, এতবড় সংসারের দায়িত্ব একদিন তোমার ঘাড়েই পড়বে, তুমি এমন অবুঝ হ'লে চলবে কেন? মানুষে জীবিকার জন্যে কত কি হীন কাজ পর্যন্ত করছে—দেখছ তো চারদিকে—এ তো তবু সম্মানের কাজ। বেশ তো, তুমি যা জানো সাধ্যমতো জ্ঞানমতো সেইভাবেই করবে, ফাঁকি দেবে কেন? তাতে দু'ঘর কম টানতে পারো তাই টানবে। এখুনি তো তোমায় এত খাটতে হচ্ছে না, এখনও তো মাথার ওপর ঠাকুরপো রয়েছেন। আর ছ্যাঁচড়াবিত্তি না পোষায়, তাও ক'রো না। যে যা দেয় তাই নিয়ে চলে আসবে—একটু কিছু তো দিতেই হবে—যে যতই কম দিক তাই নেবে"।...

'ভাল কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমি জানতুম—এ কাজে ঢুকলে অত সহজে পার পাবো না। যার যা—একদিন ঠিক অমনিই ছ্যাঁচড়াবৃত্তি ক'রতে হবে, একদিন অমনিই ফাঁকি দিতে হবে। আজ বাবা আছেন ঠিকই, যখন থাকবেন না, এই নারদের সংসার চালাতে হবে—তখন আমাকেও একবেলায় কুড়ি ঘর বজায় দিতে হবে, তখন ঐ কোন-মতে ফুল ফেলা ছাড়া আমারও গতি থাকবে না, মনে মনে বলতে হবে, ঠাকুর সবই তো বুঝছ, আমার আর সময় নেই। "আমি ঠাকুর হাব্‌লা গোব্‌লা, ভোগ খাও ঠাকুর খাব্‌লা খাব্‌লা"—সেই রকম আর কি।...

'পুজো, জানিস নাতি, অনেক রকমেই করা যায়, দশ দিকপালের আলাদা আলাদা নাম ক'রে ক'রেও করা যায়, গণেশাদি পঞ্চদেবতাও তাই—আবার একটা ফুলের পাপড়ি দিয়ে "ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্য নমো, গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমো," বলেও সারা যায়। মরশুমের দিন তাও হয়ে ওঠে না, 'ওঁ' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে, দুটো হাততালি দিয়ে কটা ফুল ছিটিয়ে দিলেই হ'ল। কে দেখতে যাচ্ছে, কে পরীক্ষা নিচ্ছে?

'মোদ্দা কথা—ওঁরা যত বলেন আমার তত জেদ চেপে যায়। শেষে একদিন পরিষ্কার বলে দিলুম বাবাকে যে, "আপনার নাম ক'রেই দিব্যি গালছি, যজমানি কাজ জীবনে করব না—খেতে পাই ভাল, না পাই ভাল"।'

আবারও থামলেন। মনে হ'ল গলাটা ধরে এল যেন। চোখ দেখা যায় না ভাল ক'রে তবু মনে হ'ল সে দুটোও ছলছল করছে। হয়ত অনুশোচনা, হয়ত অকৃতজ্ঞতাবোধের লজ্জা।

আরও খানিক পরে, আবারও মৃদুকণ্ঠে মনে করিয়ে দিলুম, 'তারপর?'

'হ্যা——।' ক'রে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'তারপর এই। সেই জন্যেই যজমানি আর করতে পারি না। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ে ধরে মাপ চেয়ে কথা ফিরিয়ে নিতুম। সে পথ আর নেই।...তা ছাড়াও দিব্যি অত মানি না, তবে এ নিয়ে অনেক দুঃখ দিয়েছি তাঁকে—তাঁদের, অনেক বেইমানি করেছি, এখন বৌকে সুখে রাখার জন্যে সে কাজ করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। তার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব সেও ভাল, নইলে—মা গঙ্গার তো জল শুকোয় নি, বুড়োবুড়ী গিয়ে গা-ঢালা দোব।'

এই বলে একেবারেই চুপ করলেন। পাছে আমি আরও প্রশ্ন করি, আরও খোঁচাই—উঠে চলেই গেলেন সেখান থেকে।

॥ ৫ ॥

এইরকমই মানুষ ছিলেন রমেশ ঠাকুর্দা।

সেকেলে বুড়ো মানুষ, লেখাপড়া কম জানতেন, পাড়াগাঁয়ের লোক—কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল একেবারে আমাদের কালের। তাঁর কালের সঙ্গে তিনি কিছুতে খাপ খাওয়াতে পারতেন না তাই। সব জিনিসটাই তিনি নিজের মতো ক'রে ভাবতেন—নিজের মনে সত্যমিথ্যা দোষগুণ ভালমন্দ যাচাই ক'রে নিতেন। সাধারণ নীতিদুর্নীতি, পাপপুণ্য সম্বন্ধেও তাঁর মতামত ছিল বেয়াড়া—কারও সঙ্গেই মিলত না।

একবার মনে আছে—আমাদের বাড়িতে কোন ঘটনা নয়—বোধহয় প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বার-ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন, তারই ফর্দ হচ্ছিল। আমার মনে আছে, কারণ আমি সেখানে ছিলুম, ব্রাহ্মণের তালিকা করার সময় রমেশ ঠাকুর্দা ফট্ ক'রে নগেন মল্লিকের নামটা ক'রে বসলেন।

বেশ মনে পড়ে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হয়ে গেল—স্রেফ্ বিস্ময়ে। কারও মুখে একটা কথা সরল না।

এমন লোকের নাম যে করা যায়, কোন পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে এমন লোককে ডেকে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যায়—এ কোন সুস্থ সচেতন-মস্তিষ্ক লোক ভাবতেও পারে না।

এমন কি, সেই বয়সেই, আমিও জানতুম ভদ্রলোকের কেলেঙ্কারির ইতিহাস। নগেন মল্লিককে প্রায় সবাই চেনে, মানে এখানের বাসিন্দারা সকলে। বিশ্বনাথের গলি ছাড়িয়ে গঙ্গার দিকে যেতে—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিবমন্দিরের পরেই যে একসার দোকান, তারই একটা ওঁর ছিল, "কারবাইড্/গ্যাসের মশলা/এইখানে পাওয়া যায়" দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে আলকাতরায় লেখা—যাঁরা সে সময় কাশীতে গেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন—মনেও আছে নিশ্চয়। ভদ্রলোক নাকি তাঁর এক বিধবা মাসীকে নিয়ে—আপন মাসী—এখানে এসে বাস করছেন স্বামী-স্ত্রীর মতো। ছেলেমেয়েও অনেকগুলি হয়েছে। এমনি খুবই ভদ্রলোক, শুধু কারবাইডে চলে না বলে কাঠকয়লা, কিছু কিছু লোহার জিনিস, বালতি প্রভৃতিও রাখেন আজকাল। তাঁর চরিত্র যেমনই হোক, তাঁর স্বভাব কি তাঁর সততা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোন খারাপ ইঙ্গিতটি পর্যন্ত করতে পারে নি। তবু—একে তো বে-আইনী সম্পর্ক—তার ওপর আপন মাসী!

লক্ষ্মীবাবুও সেখানে ছিলেন—বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু, প্রয়াগবাবু ওঁর কী রকম দূর সম্পর্কে মামা হন—তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙ্গালেন, 'ও নামটা কি ক'রে করলেন কাকা! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

আর একজন কে—মনে নেই ঠিক—বলে উঠলেন, 'তা ওঁর কি আর ভীমরতির বয়স হয় নি? ষাট তো পেরিয়ে গেছে কবেই। নেহাৎ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন তাই—'

প্রয়াগবাবুর মা তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেলেন, 'না না, ও তামাশা করছে। তোরা অমন করছিস কেন?'

ঠাকুর্দা যেন বোমার মতো ফেটে পড়লেন এবার।

'হ্যা——। বলি, ভীরমতিটা কে দেখছে আমার তাই শুনি! নগের নাম করতে সব চমকে উঠলে যে একেবারে! খুব সব সাধুপুরুষ আমরা—না? কেউ কখনও কিছু করি নি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানি না—সবাই এক একটি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! রথ তো নেই, টাঙ্গা কি এক্কায় চড়লে চাকা চার আঙ্গুল উঠে থাকবে মাটি থেকে, মনে

শিবদুতে আর বিষ্টু দুতে মারামারি লেগে যাবে—এ বলবে কৈলেসে নে যাই, ও বলবে গোলকে !'

তারপর, তেমনি পিটপিটে চোখে ভ্রূকুটি ক'রে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, 'কেন, নগে কি বামুনের ছেলে নয়, না কি পৈতে ফেলে দিয়েছে, না তিনসন্ধ্যে গায়ত্রী করে না? না কি অজাত-কুজাত বিয়ে করেছে? মানলুম, বে-করা নয় এমন মেয়েছেলের সঙ্গে ঘর করে। তা এই যে লম্বা ফর্দ হচ্ছে বামুনদের, বড় বড় টিকি-আলা সব ব্রাহ্মণ—এরা কি সবাই চরিত্রবান নিষ্কলঙ্ক পুরুষ? ভাল ক'রে খবর নিয়ে তবে তোমরা ফর্দ করছ তো?'

হ্যা হ্যা ক'রে একটা তিক্ত হাসি হেসে নিয়ে আবারও বললেন, 'মাসী স্বীকার করছি। ন বছরে বে হয়েছিল, দশ বছরে বিধবা হয়েছে। বে'র ঐ আট দিন ছাড়া বরের মুখ দেখে নি, বে যখন হয়েছে তখন কিছুই জানে না—বর-কনের ব্যাপার, কোন যৌবন লক্ষণ প্রেকাশ পায় নি।...নিদুষি মেয়েটাকে বাপের বাড়িতে ভূতের মতো খাটাচ্ছিল, বলতে গেলে একটা কিষেণের কাজ করাচ্ছিল একফোঁটা মেয়েকে দিয়ে। এ তো শোনা কথা নয়, বনপলাশপুরের ও ভটচায্যি গুষ্টিকে আমি খুব ভাল ক'রে জানি—ধানের পাট থেকে, গরু থেকে, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা ক্ষার কাচা—সব ঐ মেয়ে। নেহাৎ একাদশীতে উপোসটা করাত না, মা বেঁচে—একটু ক'রে দুধ খেতে দিত!...কী সমাচার—না কাজ-কম্মের মধ্যে না থাকলে বেচাল শিখবে, স্বভাব-চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে। অথচ ওর চোখের সামনেই ওর বাবা শিষ্যির বিধবা বোনের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসত।'

বোধহয় দম নেবার জন্যেই থামতে হ'ল একটু, কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তই। আর কেউ কথা বলার সুযোগ পেল না সে অবসরে। উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন, 'সেই মেয়েটাকে নগে যদি উদ্ধার ক'রে এনে এখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটায়—দোষটা কি? একটা মন্তর পড়িয়ে নিলেই তো হ'ত—কিম্বা খাতায় লিখে বে করলে তো ট্যাঁ-ফো করতে পারতে না তোমরা? সেইটেই ওদের ভুল হয়েছে।...যখন এখানে আসে—নগের তখন সাতাশ বছর বয়েস, বে'ও করে নি কিছুই না, মেয়েটার আঠারো। কী বয়েস ওদের?...তোমরাও তো নগেকে দেখছ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বাদ নেই, স্নান পুজো—কাউকে ঠকায় না, কোন কলহ-বিবাদে যায় না, কেউ বলতে পারবে না নগেন মল্লিক কারও একটা আধলা হরেহম্মে নিয়েছে!'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যাদের জিনিস, যারা এসে এই কাশী শহরে রটিয়ে দে গেল কেচ্ছাটা—সেই মল্লিক গুষ্টি এসে এখন ওদের বাড়িতেই উঠছে, ভট্‌চায্যি গুষ্টিও। এক পয়সা খরচা নেই, তোফা মচ্ছি মাংস খেতে পায় দুবেলা, জামাই আদর—মায় রাবড়ি রসগোল্লা পর্যন্ত, পাল-গুষ্টি এসে ওঠে এক এক সময়। ওরাও তেমনি বোকচন্দর, আত্মীয়স্বজন কেউ এলে কিতাত্থ হয়ে যায় একেবারে! হ্যা— —!'

লক্ষ্মীবাবু বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'তাহলে তো কোনদিন আপনি কেদারঘাটের তপন ভট্‌চার্যিরও নাম করবেন!'

'করবই তো! আলবাৎ করব। আমার যদি বামুন ভোজন কি বিদেয় দেবার অবস্থা হ'ত—আমি আগে ওদের ডাকতুম...কেন, তপন ভটচার্যি কি অন্যায়টা করেছে তাই শুনি? ...না খুড়ি, তুমিই বলো। তুমিও ব্রাহ্মণের বিধবা, নিষ্টেবান ঘরের মেয়ে, তোমার কাছেই আমি বিচের চাই।'...

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে এক ধরনের নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'তপন ভট্‌-চার্যির জ্যাঠতুতো দাদা ঘোর মাতাল, মদ মেয়েমানুষ জুয়ো—কোন গুণ বাদ নেই। আর বৌটো,—তাকে এরা সবাই দেখেছে, লক্ষ্মীপ্রীতিমের মতো, শান্ত ধীর নম্রস্বভাব —দেখতে তো অপরূপ সুন্দরী।...অমন বৌ—তা একদিনের জন্যে সুখ পায় নি। মদের

ঘোরে এসে ধরত, এক এক দিন আধমরা ক'রে ছাড়ত।...চোরের মার মেরেছে এইটুকু মেয়েটাকে। কী অপরাধ—না বর ভাড়া খাটাতে চাইত, মেয়েটা রাজী হ'ত না। বলেছিল, "নিজের ধম্ম ক্ষুইয়ে যদি স্বামীকে খাওয়াতে হয় সে খাওয়াব—যদি কোনদিন অক্ষ্যাম হয়ে পড়ো, যেমন ক'রেই হোক চালাব—কিন্তু তোমার মদের আর জুয়ার খরচ যোগাতে নিজের এহকাল পরকাল নষ্ট করব না। তাতে যা করতে হয় করো"।...

'পাশাপাশি বাড়ি, তপন সবই দেখত, ডাক্তারী পড়ছে ও তখন, ফোর্থ ইয়ার, খুব ভাল ছেলে ছিল, পাস করলে আজ ওর পসার খায় কে!...শেষে যেদিন জোর ক'রে মুচড়ে হাতটা ভেংগে দিলে বৌটার—সেদিন আর থাকতে পারল না, এক ঘুষিতে দাদার নাক ফাটিয়ে দিয়ে বৌটাকে নিজের বাড়িতে এনে তুলল। ও কিছু অলেহ্য করতে চায় নি প্রেথমটায়—কিন্তু, ওর বাড়িতে তো কেউ ছিল না, মা মরে গেছে, বাপ বিদেশে, একটা চাকর আর ছোট দুটো ভাই। এই নিয়ে তুমুল ঘোঁট শুরু হয়ে গেল আপ্তকুটুম মহলে, কী সমাচার, না বৌদি ওর সংগে বেরিয়ে এসেছে, ও তাকে নষ্ট করেছে। শুনতে শুনতে শেষে ধিৎকার ধরে গিয়ে বৌদিকে নিয়ে কাশী চলে এল—নিজের আখের, পৈতৃক সম্পত্তির মায়া ত্যাগ ক'রে। বরটা হুমকি দিতে কাশীতে এয়েছিল, তপন কোতোয়ালীতে গিয়ে ডায়েরী ক'রে এসে আর একটি ঘুষি মারতেই ফিরে চলে গেছে—আর আসে নি।

'তা এই তো বিত্তান্ত। তপনকে তোমরা দেখেছ সবাই। ছোট্ট মুদীর দোকান ক'রে খায়, কারও সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না। বৌটাকে প্রাইভেটে পড়িয়ে দুটো পাস করিয়েছে, তা ইল্‌লিগল্‌ কনেকশ্যন তোমাদের মতে তো—তাই চাকরি পেলে না। বাড়িতে বসে বিনা-মাইনেয় পাড়ার মেয়েদের পড়ায়—অমন পনেরোটা মেয়ে এসে জোটে, সব খাসা খাসা বামুনের ঘরের মেয়ে তারা। তাতে দোষ নেই, তার দোকানে ধারে খেয়ে টাকা ফাঁকি দেওয়ায় দোষ নেই—বামুন ভোজনের নেমন্তন্ন করলেই যত দোষ?...হা আমার কপাল রে!'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ঠাকুর্দা। ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে অনেকক্ষণই, এখন প্রবলবেগে থুথু ছেটকাচ্ছে—সে এক বীভৎস মূর্তি! ওঁর এ চেহারা চেনে সবাই, থামাবার চেষ্টা বৃথা—তবু প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বলতে গেলেন, ঠাকুর্দা সে অবসরই দিলেন না।

বললেন, 'তোমাদের ও পরম নিষ্ঠেবন্ত বামুনও ঢের দেখেছি, ব্রাহ্মণ-কুলচূড়ামণি, শাস্ত্রবাক্য ছাড়া কথা নেই, কথা কইতে গেলে—বিশেষ মুখ্যু মানুষদের সংগে—আদ্ধেক কথা সংস্কৃতয় বলেন, পরগোত্তরে খান না, খুব শুদ্ধাচার, সকালে উঠে পাঁজি খুলে বলে দেন কোন্ দিন কি রান্না হবে—ইদিকে দ্যাখো ঘরে ঘরে ব্যভিচার, বুড়ো বয়েস পজ্জন্ত কলির কেষ্ট সেজে বসে আছেন এক একজন—বিধবা ভাজ, ভাদ্দর বৌ, ভাইপো-বৌ, সধবা নাতনী—কেউ বাদ যায় না। এঁরাও শাস্তরবেত্তা বামুন, তাঁরাও এক একটি খড়দর মা-গোসাঁই, এসে তোমাদের যজ্ঞিতে কাঠি দিলে তোমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার একেবারে, ঐ বামুন এসে অং বং চং আউড়ে বিদেয় নিয়ে গেলে তোমরা কিতাখ।...এই তো?...তা খাওয়াও, ঐ সব বামুনকেই খাওয়াও।'

'তা এই কি সব?' লক্ষ্মীবাবু যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন।

ওঁর ঐ মূর্তি দেখে সকলেই যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন।

'তা কেন হবে! নেই কি, ভাল বামুনও আছে। বড় বড় সত্যিকারের পণ্ডিত—কাশীতে যেমন—এমন আর কোথায়? তবে তারা কেউ একপাত নুচি খেতে তোমার বাড়িতে ছুটে আসবে না। এক অধ্যাপক বিদেয় ছাড়া—তারা কেউ বাড়ি থেকে নড়ে না। তাও—অধিষ্ঠান নেওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করে তাই—নইলে একখানা সরা আর দুটো সন্দেশের লোভ তাদের নেই...যাক গে, এসব বলে মুখ নষ্ট, আমার সংগে বাবা তোমাদের মিলবে

না, তোমাদের মতো ফর্দ তোমরা করো।...হ্যা—আমার একপাত জুটলেই হ'ল। হে, হে, হে!'

নিজেই আব্হাওয়াটা হালকা ক'রে দেন রমেশ ঠাকুর্দা।

এইবার প্রয়াগবাবুর মা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার ফুরসৎ পান। বলেন, 'তা বাবা, সবই মানছি। কথাগুলো তোমার একটাও মিথ্যে নয়। তবে আমাদের তো সমাজ মেনে চলতে হয়। তোমার ঐ নগে আর তপনকে যদি আমি নেমন্তন্ন করি—আমার কোন আপত্য নেই, সত্যিই তো, যাদের বলব সকলকারই কি চরিত্তিরের হিসেব রাখছি?—তা তো আর নয়—ওরাই না হয় ধরা পড়ে চোর সেজেছে, বলে ধরা পড়েছে জয় মিত্তির উল্টো দিকে কাগজ ধরে—তা নয়, বলি তখন অন্য বামুনরা যদি বলে আমরা খাব না ওদের সঙ্গে—তখন কি করব? আয়োজনটাই তো মাটি। আর নেমন্তন্ন ক'রে এনে কিছু বলা যায় না—তুমি ঘরের মধ্যে এককোণে বসে চুপচুপ খেয়ে নাও, কেউ না টের পায়। ...বলা যাবে কি?'

'হ্যা——!' বলে শব্দটা টেনে উঠে পড়েন রমেশ ঠাকুর্দা, 'না, সে ঠিক। না, না, তোমার মতো ফর্দ তুমি করো খুড়ি—আমার ও পাগলের কথায় কান দিতে হবে না। তাছাড়া আমার না হয় হম্বি-দীঘ্যি জ্ঞান নেই, তাদের তো আছে, তাদের ডাকলেও তারা আসবে না। নাও বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণ, ফর্দ করো তোমরা—আমি চলি। হ্যা——!'

॥ ৬ ॥

দেশ থেকে কেন বেরিয়েছিলেন সেটা জানা হলেও কি ক'রে বেরিয়েছিলেন, এত দেশ থাকতে কাশীতেই বা কেন এলেন—সে কথাটা জানা হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। আমরাও নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, ইস্কুল আছে, বাজার আছে, দুধ আনা আছে—ওঁরও সকাল বিকেল চাকরি। কোনদিন একটু ফাঁক পেলে কি দরকার থাকলে—মা ইদানীং ব্রত পার্বণে, অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতে ফলমিষ্টি নিতে কি শিবরাত্রির পারণ করাতে ওঁকেই ডাকতেন—তবে আসতেন, সেও সকালের চাকরি শেষ ক'রে, স্নান সেরে আসতেন একেবারে। বড় জোর এইসব দিনগুলোতে সে পর্বটা একটু সকালে সারা হ'ত এই পর্যন্ত। ভবানীদাকে বলে তাঁকে বসিয়ে উনি চলে আসতেন।

কেবল শিবরাত্রির পরের দিন ভোরবেলাই এসে হাজির হতেন। কারণ তিনিও—অত ক্ষিদেকাতুরে মানুষও—নিরম্বু উপোস ক'রে থাকতেন ঐ দিনটায়। সে জন্যেও বটে, মার কথা ভেবেও বটে—স্নান গায়ত্রী সেরে চলে আসতেন সক্কালবেলাই। অবশ্য, সেদিন সকালে দোকান বন্ধও থাকত বরাবর। এ ছাড়া কোনদিন হয়ত এমনিও মার খবর নিতে আসতেন—বিকেলে দোকানে বেরোবার আগে, 'কী করছ, অ মেয়ে। বলি আজ একটু খবর নে যাই, কাজ তো বারোমাসই আছে—বলে, না কাজ না কামাই, হ্যা——।'

কিন্তু সেও তো আমাদের ইস্কুলে থাকবার সময়, কদাচিৎ কোন ছুটিটুটির বা হাফ হলিডের দিন ওঁর মর্জির সঙ্গে মিললে তবেই দেখা হ'ত। তাও তখন আড্ডা জমাবার মতো সময় থাকত না।

হঠাৎই একদিন সুযোগটা মিলে গেল।

অন্নপূর্ণা পুজো সেদিন, সুরেশ মুখুজ্জের শাশুড়ীর মানসিক ছিল কাশীতে এসে অন্নপূর্ণা পুজা করবেন। ঘটার পুজো, অনেক লোক খাবে—হালুইকর বামুন আনিয়েছেন সুরেশবাবু কলকাতা থেকে—কিন্তু ভোগ রাঁধার কাজ তাদের দিয়ে হবে না, শাশুড়ীর পছন্দ নয়—ওঁদের বাড়িতেও তেমন কেউ নেই, অগত্যা আমাদের সতীদি ভরসা।

সতীদিরও তাতে কোন আপত্তি নেই। খুব সকালে যেতে হবে, তাও যাবেন। ভোর-

না! আমাদের এখানে তিনতলায় কস্মিনকালে কেউ ওঠে না, আমরা নতুন লোক—এখানে আমাদের পরিচিত বলতে বা দু-একজন—তারা সকলেই দূরে দূরে থাকে—একজন পাঁড়ে-হাউলী, একজন চৌথাম্বা। এত সকালে তারা কেনই বা আসবে? কিছুই ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে, আমি মার মুখের দিকে—মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

একটু পরেই খট খট ক'রে কড়া নড়ে উঠল। আমাদেরই দরজার কড়া। একটু ভয়ে ভয়েই দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখি—রমেশ ঠাকুর্দা। তখন 'নিচের ঐ বুড়োটা' বলে উল্লেখ করতুম ওঁকে।

উনি কিন্তু আমাদের দিকে চেয়েও দেখলেন না, বা এই আকস্মিক আগমনের জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়াও প্রয়োজন মনে করলেন না।

'সর্ সর্' বলে আমাকে এক রকম ঠেলেই সরিয়ে—দরজার বাইরে চটিটা ছেড়ে, গট্ গট্ ক'রে চলে গেলেন লম্বা বারান্দা পেরিয়ে একেবারে পূব-দক্ষিণ কোণে—তুলসীগাছটার কাছে। তারপর উবু হয়ে বসে আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে কী একটা মন্ত্র পড়ে নিয়ে—হয়ত প্রণাম-মন্ত্রই হবে—তুলসীর মঞ্জরীগুলো ভাঙ্গতে লাগলেন। এক-মনে, নিবিষ্ট হয়ে।

আমাদের গাছ, এতে যে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে বা আমাদের অনুমতি নেওয়া বা অন্ততঃ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যে দরকার—তাও ওঁর মাথায় এল না।

একেবারে সব মঞ্জরীগুলো ছেঁড়া হ'লে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই কুৎকুতে চোখে পিট পিট করে তাকিয়ে একটা প্রায়-হুঙ্কার ছাড়লেন, 'হ্যাঁ......! গাছ পুঁতলেই হয় না, তুলসীগাছ পুঁতলুম আর একটু ক'রে জল দিলুম, ব্যস্ হয়ে গেল, ডিউটি শেষ! অত মঞ্জরী হয়েছে—গাছ বাঁচে কখনও? মরে যাবে যে! আমি তাই রাস্তা থেকে দেখি, ভাবি, এই আজ ছিঁড়বে—কাল ছিঁড়বে—দেখি কিছুই কেউ করে না। বুঝলুম কথাটা মাথাতেই ঢোকে নি, কল্‌কাতার ভূত তো, গাছের মর্ম্ম কিছু জানে না, ও আমাকেই করতেই হবে।'

এই বলে হে-হে ক'রে হাসলেন খানিকটা। তারপর আমার মাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমার উনুনে আঁচ পড়েছে—বৌমা?'

মা নতমুখে জবাব দিলেন, 'না, এই তো বাসিপাট সারা হ'ল। এইবার দেব।'

'কী সর্বনাশ! এখনও আঁচ দাও নি, সাতটা বেজে গেল! কখন আঁচ উঠবে আর কখন রান্না করবে!...ছেলেরা ইস্কুলে খেয়ে যাবে তো!...উনুন ধরানো কি চাট্টিখানি কথা, ভারী শক্ত কাজ।...ঐটেই তো আসল। উনুন যদি ধরে গেল, গনগনে আঁচ উঠল, রান্না করতে কতক্ষণ?...যাও, যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও!'

আবার তিনি চটি পায়ে গলিয়ে চটাস্ চটাস্ শব্দ ক'রে নেমে গেলেন, কলকাতার লোকেদের গ্রাম্যতা আর অজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনমনেই মন্তব্য করতে করতে।

পরে জেনেছিলাম—উনি আমাদের সতীদিদির সংসারে ঐ একটি কাজ ক'রে দিতেন, সকালে কাজে বেরোবার আগে উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যেতেন।

উনুন সাজিয়ে নিচে থেকে একটি লম্প বা ডিবে জেলে দিতেন, একটু অপেক্ষা ক'রে ঘুঁটে ধরে উঠেছে বুঝলে সেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

সেই সময়টা সতীদির বাসিপাট সেরে স্নান করতে যাবার সময়। একটি মাত্র কল, নিচের এতগুলি ভাড়াটের জন্যে—ওদের বাদ দিয়েও জনাছয়েক, আর বুড়োমানুষদের কলতলায় একটু বেশীক্ষণই লাগে—সুতরাং ইচ্ছামাত্র স্নান সেরে চলে আসা যেত না। গোসাঁইদিদির ভাষায় 'টর্ন' আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হ'ত।

আগে কলতলাটা খোলা জায়গায় ছিল, বালতি ক'রে জল বয়ে এনে নিজেদের রকে চটের আড়ালে চান সারতে হ'ত, কতকটা সতীদির জন্যেই এখন দুপাশে আর মাথায়

করগেটের টিন দিয়ে একটু আড়ালমতো হয়েছে, বাথরুমের নামান্তর। ঠাকুর্দা প্রত্যহ বারোটা নাগাদ তাঁর কয়লার ক্যাশ বন্ধ ক'রে ফটকে তালা লাগিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরতেন—কলঘর লাগত না।

তা' ঐ একটি কাজ করতেন বলেই ঠাকুর্দার ধারণা ছিল—সংসারের কঠিনতম কাজ হল উনুনে আঁচ দেওয়া।

॥ ৩ ॥

বাড়িভাড়া লাগত না ঠিকই—তবু পাঁচ টাকায় দুজন লোকের তখনও চলত না। শুধু খাওয়াটা হয়ত চলে যেতে পারত, সব খরচ জড়িয়ে চলা সম্ভব নয়—তা যত সস্তাগণ্ডাই হোক।

অথচ সঙ্গতিও আর ছিল না।

ঠাকুর্দামশাই আমাদের নাকি কখনই কিছু করেন নি, যাকে কিছু 'করা' বলে—চাকরি-বাকরি কি ব্যবসা-পত্র।

তার কারণ—যাতে এ বাজারে ক'রে খাওয়া যায়—উনি সেই ইংরেজী লেখা-পড়া কিছুই জানতেন না। জানার ইচ্ছে ছিল, সুযোগ হয় নি।

চব্বিশ পরগণার রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে কোন্ এক পল্লীগ্রামে বাড়ি, পুরুত-বামুনের ছেলে উনি।

গ্রাম্য পুরোহিত, উপার্জন কম, অনেক ছেলেমেয়ে। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়ে পাস করাবেন, সে সঙ্গতিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তখন পাঠশালা ছিল গ্রামে গ্রামে। পাঠশালায় পড়ার পর বাবা টোলে দিয়েছিলেন হরিনাভিতে—সংস্কৃত পড়তে।

সে পড়া ভাল লাগে নি, লাগে নি বোধহয় বাবার উদ্দেশ্য বুঝেই আরও। বাবা সংস্কৃতটাও কোন উপাধি পাবার জন্যে পড়তে দেন নি। অল্প কাজ-চলা-গোছ শেখার পর যজমানী করবে ছেলে—এইটেই চেয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা টোলে পড়তে পড়তেই ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন পাড়া-গাঁয়ে ইংরেজী শেখাবার লোক বিশেষ ছিল না। মাস্টারদের কাছে পড়তে গেলে মাইনে লাগে—পাড়ার ছোট ছেলেদের ধরে শেখা সুতরাং অক্ষর পরিচয় আর 'আই গো' 'ইউ গো' 'হি গোজ'—এর বেশী এগোয় নি।

পরে নাকি এখানে এসে একখানা 'রাজভাষা' বই কিনে অনেক ইংরেজী শব্দ শিখেছেন, তবে তাকে ইংরেজী শেখা বলা যায় না কিছুতেই।

কাশীতে এসে বেশ কিছুদিন টিউশ্যানি ক'রে চালিয়েছিলেন।

তখন এখানে বাঙালীর ছেলের বাংলা পড়বার ইস্কুল ছিল না বিশেষ। অনেকেই তাই প্রাইভেটে পড়াতেন।

রমেশ ঠাকুর্দা বাংলা আর সংস্কৃতও একটু—মোটামুটি কাজ চলা গোছের জানতেন বলে কোন অসুবিধে হয় নি। এক টাকা আট আনা মাইনের টিউশ্যানি, এ-ই বেশির ভাগ। একসঙ্গে দুভাইকে পড়িয়েছেন মাসিক বারো আনায়—এ টিউশ্যানিও করেছেন।

তাতেই তখনকার দিনে বেশ আয় হ'ত—মাসে ছ'-সাত টাকা হেসেখেলে। গোপাল মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বিনা-ভাড়ায়, আর এক বামুনবাড়িতে মাসে তিন টাকা দিয়ে দুবেলা খাওয়া চলত। পরে বিয়ে করার পর ঘর ভাড়া ক'রে সংসার পাততে হয়েছে—তেমনি তখন একটু বেশী খেটে মাসে দশ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন।

তবে কখনই কিছু জমান নি, গুধুড়ি বাজার ঘুরে পুরনো বই কেনার বাতিক ছিল। অবশ্য সে আর কতই বা—দু পয়সা চার পয়সা—আর ছিল কিছু গোপন দানধর্ম।

সতীদি ঠাট্টা ক'রে বলতেন,—'মেগে পাই বিলিয়ে খাই', তবে কোনদিন বাধাও দেন নি। স্বামীর কোন কাজেই কোনদিন বাধা দেন নি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তাঁর বিবাহক্ষণের প্রথম প্রণয়-বিহ্বলতা সারা জীবনে কাটে নি।

কিন্তু তার পর—দিন পাল্টে গেল।

ওঁরও বয়স হয়ে গেল, বাংলা পড়াবার মতো ইস্কুলও হয়ে গেল একাধিক।

প্রাইমারী বা পাঠশালা তো পাড়ায় পাড়ায়।

'ঐ চিন্তামণি যখন সরকারী চাকরি ছেড়ে এসে য়্যাংলোবেঙ্গলী ইস্কুল করব বললে—আমিও তখন ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পথে পথে ভিক্ষে করেছি। নিজের ভাত-ভিক্ষে যাবে বলে জাতের ক্ষেতি করব—সে শিক্ষা আমার নয়।'

হেসেই বলতেন ঠাকুর্দা, শুধু হাসিটা ঈষৎ করুণ লাগত।

আরও মুশকিল হ'ল উনি ইংরেজী পড়াতে পারেন না, ইস্কুলে দিলে একসঙ্গে সবই হয়। ওঁকে মাইনে দিয়ে রাখবে কেন বাপ-মারা? একটি একটি ক'রে ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে একটিও রইল না আর। তখন—যাকে বলে 'চোখে অন্ধকার দেখা' তাই দেখলেন।

এই আয় কমবার মুখেই, টিউশ্যানি কমতে কমতে যখন মাসিক চার-পাঁচ টাকা আয়ে পেঁাচেছে—বোধহয় লোকমুখে বিপন্ন শুনেই—লক্ষ্মীবাবু এখানে ঘর দিয়ে এনে রেখে-ছিলেন। তবে তাতেই বা কি হয়? শেষে এমন অবস্থা হ'ল—মুখুজ্যেমশাই এক ছত্তরে গিয়ে খেতে শুরু করলেন, সতীদি দিনের পর দিন একমুঠো ক'রে চিঁড়ে খেয়ে কাটাতে লাগলেন।

তারপরই কী একটা যোগাযোগে পাইনদের দোকানে এই কাজটা পেয়ে গিছলেন।

ওঁকে এখানে ততদিনে অনেকেই চিনেছিল। গরিব লোক, কিন্তু কারও সাহায্য-প্রার্থী কি ভিক্ষার্থী নয়, বরং পরোপকারী, সৎ ব্রাহ্মণ—এই জন্যেই সকলে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। ভবানীদাও জানতেন ওঁকে, তাঁরও লোকের দরকার একজন—কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁদের কাছে কাজ নেবেন কিনা, সন্দেহ ছিল। ঠিক ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসাও করতে পারেন নি। ঠাকুর্দা যা মুখফোঁড় লোক, হয়ত মুখের ওপরই বলে বসবেন, 'তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় দেখি! তুমি চাও বামুনের ছেলেকে চাকর রাখতে!...না হয় গরিবই হয়েছি, তাই বলে পথে পথে ভিক্ষে তো শুরু করি নি এখনও!...আর বামুনের ছেলে ভিক্ষে করলেও তো দোষ হয় না, তাই বলে বেনের কাছে চাকরি! বলি এখনও তো চন্দ্র সুয্যি উঠছে, না উঠছে না?...যদ্দিন তা উঠবে ভগবানের রাজত্বে বামুন বামুনই থাকবে।'

এই ভয়েই অনেকদিন চুপ ক'রে ছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে ভয় অমূলক। ভবানীদা একদিন নন্দ লাহিড়ীকে কথাটা বলেছিলেন—নন্দ লাহিড়ীও অনেক ইতস্ততঃ ক'রে—বেশ একটু ভয়ে ভয়েই পেড়েছিলেন এ প্রস্তাবটা।

রমেশ ঠাকুর্দা কিন্তু আদৌ চটে ওঠেন নি। বলেছিলেন, 'ও মা, তা করব না কেন? কাজটা পেলে তো বেঁচে যাই ভাই! এতে আবার এত 'কিন্তু' হবার কি আছে?...দ্যাখ্ নন্দ—পষ্ট কথা বলছি, আজ যে আমার অভাব বলে তা নয়, বামুনের ছেলে গঙ্গার ধারে বসে ভিক্ষে ক'রে খেলেও বামুনই থাকব, কেউ বামুন বই শুদ্দুর বলবে না—তা নয়, এ জাতের ভণ্ডামিতে আমার অরুচি ধরে গেছে অনেকদিন।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলেছিলেন, 'অনেক বামুন দেখেছি, অনেক দেখছি—তাদের কাছে চাকরি করা তো দূরের কথা তারা সিধে কি বিদেয় দিতে এলেও নোব না। তাদের কাছে ভবানী লাখো গুণে সোনা। ব্যবসা করতে বসে দুটো মিছে কথা বলে কি ওজনে ঠকায়—আমি জানি না, কথার কথা বলছি—সে আলাদা কথা, সে তবু বুঝি। মিছে কথা কে না বলে, দেহধারণ করলে বলতেই হবে, যুধিষ্ঠিরকে বলতে হয় নি?

কেণ্ট বড়াই করেছিল কুরুক্ষেত্তুরে অস্তর ধরব না, তাও ধরতে হয়েছে। কিন্তু মাথায় টিকি, গলায় পৈতে, অমুকের হাতে খাব না, অমুকের বাড়ি পা ধোব না, অথচ এক একটি অর্থপিশাচ সব. কেউ গয়না বন্ধক রেখেও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিচ্ছে, কেউ বা জ্ঞাতিদের কেমন ক'রে বঞ্চিত করবে—সন্দ্যে করতে বসেও সেই মতলব ভাঁজছে! নয়ত গরিব যজমানকে কি ক'রে দুটো ফাঁকিবাজী কথা বলে দে'ড়েমুষে আদায় করবে—এই চিন্তা অষ্টপ্রহর। আর না হ'লে ঘরে বসে বিধবা ভাজের পেট খসাচ্ছে।...হাত্তোর বামুন। কলির বামুন আবার বামুন কি রে? কলিতে বামুন শুদ্দুরের দাসত্ব করবে—এ তো শাস্তরের বিধান!'

সেই থেকেই ওখানে চাকরি করছেন ঠাকুর্দা।

ভবানীদা তো বেঁচে গেছেন বললেই হয়। কারণ এটা সবাই জানে, না খেয়ে মরে গেলেও রমেশ মুখুজ্যে এক পয়সা ভাঙবে না. কি কোন তঞ্চকতা করবে না।

ভবানীদা উনি আসবার পর দোকানে সবই ছেড়ে দিয়েছেন একরকম. এক আধবার আসেন, খোঁজখবর নেন, মাল কেনার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন, টাকাটা হিসেব বুঝে গুনে নিয়ে চলে যান। ভবানীদার ব্যবসার দিকে ঝোঁকটাই কমে আসছিল, পরে ঠাকুর্দার যখন আর মোটেই খাটবার অবস্থা রইল না—তখন দোকানই তুলে দিলেন। শুনেছি তারপর সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন ভবানীদা।

সে যা-ই হোক—ভবানীদারও এমন অবস্থা নয় যে ওর থেকে বেশী মাইনে দেন। একটা চাকর রাখতে হয়েছিল, এটা ওটা খুচরো খরচও তো আছে। বিক্রী তো ঐ. দু'-ওয়াগন কয়লাও এক মাসে কাটত না। কিন্তু ঠাকুর্দারও অন্য কাজ খোঁজবার কি করবার অবস্থা নয়।

তবে চলে কিসে?

এই প্রশ্নটাই আমাদের মনে বার বার দেখা দিত।

সে উত্তরটা দিয়েছিলেন আমার মা—কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে দেখবার পর।

সতীদিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, 'যোগেযাগে চলে যায় মা. বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে পড়ে আছি. তিনিই চালিয়ে দেন। নইলে বাবার নাম যে মিথ্যে হয়ে যাবে, তাঁকে লজ্জায় পড়তে হবে।'

মাও তাই বলতেন, 'সত্যিই যোগেযাগে চালায় বামনী। কি ক'রে যে চালায় তা ও-ই জানে। বুড়োর কপাল ভাল তাই অমন বৌ পেয়েছে! শুধু রূপ নয়—রূপ তো অনেকেরই আছে. আগুনের মতো রূপ দেখেছি. যেখানে যায় আগুন ধরায়—এমন গুণ কোথায় পাবে? সর্বংসহা একেবারে, ধরিত্রীর মতো। ঐ তো ছুঁরির বর. তার জন্যে কী সহ্যই না করছে!'

আমরাও তারপরে দেখেছিলুম লক্ষ্য ক'রে—মার কথামতো।

কী না করেন ভদ্রমহিলা!

তখন ছোটখাটো যজ্ঞিতে হালুইকর ডাকত না কেউ—কাশীতে বিশেষ পাওয়াও যেত না। 'হাল্‌ওয়াই'—অর্থাৎ ওদেশী কচুরি লাড্ডু করবার কারিগর মিলত, কিন্তু বাঙালী যজ্ঞির লোক বিশেষ ছিল না।

সুতরাং কারও বাড়ি যজ্ঞি হ'লে মেয়েরাই মিলেমিশে কাজটা তুলে দিতেন ; অবশ্য ছোটখাটো যজ্ঞি. ত্রিশ-চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন বড়জোর, তার বেশী হলে লোক ডাকতেই হ'ত। হিন্দুস্থানী হালুইকরই ডাকা হ'ত—কারণ কাশীতে তখন খুব বেশী যজ্ঞিতে মাছ মাংস হ'ত না। বিয়ে কি অন্নপ্রাশনেই মাছ হ'ত যা—তাও অল্প লোকের ব্যাপার হ'লে মেয়েরাই সেরে নিতেন।

এইসব ক্রিয়াকর্মের বাড়িতে সতীদি গিয়ে বুক দিয়ে পড়তেন, বলারও অপেক্ষা

করতেন না।

ছোটখাটো ভোজের ব্যাপার যেখানে—সেখানে সব রান্না একাই তুলে দিতেন প্রায়, যেখানে দু-আড়াইশ'র ব্যাপার সেখানেও কুটনো কোটা যোগাড় দেওয়ার প্রশন আছে, ওঁর কাজের অভাব হ'ত না। অন্নপূর্ণা পুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো—এ সবেতে ভোগ রাঁধার ভার পড়ত তাঁর ওপর। নিরম্বু উপোসী থেকে অত শুদ্ধাচারে আর কে করবে?

তবে একটি শর্ত ছিল ওঁর। উনি না খেয়ে সারাদিন খাটতে রাজী ছিলেন, খাটতেনও তাই, খেলে খাটতে পারা যায় না—এই কারণ দেখিয়ে বড়জোর একটু শরবৎ কি একটু দই খেয়ে নিতেন একবার, ভোগ রাঁধার কাজ থাকলে তো চুকেই গেল—কিন্তু বেলা বারোটার সময় বুড়োর খাবারটি ঘরে পেঁাছে যাওয়া চাই।

পরিষ্কারই বলতেন, 'উনি আমাদের' কিম্বা 'তোমাদের মুখুজ্যেমশাই' ক্ষিদে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। বারোটা বাজলেই ছটফট করেন, একেবারে ছেলেমানুষের বেহদ্দ হয়ে যান।...ঐটি আমার চাই ভাই—ঠাকুরদেবতা যা বলো সব মাথায় আছেন, মাথাতেই থাকুন—আমার সকলের ওপর উনি। ওঁর এই দুপুরের খাবারটি পেঁাছে দিয়ে আসব, তারপর বলো—সারা দিনরাত পড়ে আছি তোমার এখানে। রাতের খাওয়ার জন্যে অত তাড়া নেই, ঘরে চিঁড়ে আছে মুড়ি আছে—আমার দেরি হয় সে ঠিক জলে ভিজিয়ে একগাল খেয়ে নেবেখন্। দুপুরে কারও কথা শুনবে না!'

আর সে খাবারও—অপরকে দিয়ে পাঠানো চলত না।

মুখুজ্যেমশাই যার-তার হাতে খেতে পারতেন না। স্ত্রীর রান্না ছাড়া তো পছন্দই হ'ত না—সেই জন্যেই আরও, যজ্ঞিবাড়িতে গিয়ে সতীদি রান্নার দিকেই এগিয়ে যেতেন বেশির ভাগ—ঠাকুর্দা কুৎকুতে চোখ একটা টিপে বলতেন, 'যজ্ঞির ভাত, কলার পাত, মায়ের হাত —লোকে কথায় বলে, ঐ শেষের শব্দটা একটু বদলে নিয়েছি, মাগের হাত ক'রে নিয়েছি' বলে হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন—তাও যদি না হয়, তিনি সামনে ধরে দিলেই খুশী। কে কিভাবে দেবে, কি কাপড়ে আনবে, প্রত্যঙ্গ-বিশেষ চুলকোতে চুলকোতেই হয়ত সেই হাতে ধরবে, কিম্বা ঘাম পড়বে বা থুথু—এইসব বাছবিছার ছিল খুব বেশী।

সেই কারণেই যত কাজ থাক্—নিতান্ত দূরের পথ হ'লে হয়ে উঠত না, ভেলুপুরা কি কেদারঘাট থেকে তো আর আসা যায় না—তবে এই কাছাকাছি রামাপুরা কি লাক্সা কি খোদাইচৌকী কি সূর্যকুণ্ড হ'লে ঠিক বুকে ক'রে এনে পেঁাছে দিয়ে যেতেন এক ফাঁকে। তাতে ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে হয় কি স্নান করতে হয়—কোন আপত্তি নেই।

দূরের পাড়ি হ'লে রাত তিনটেয় উঠে তোলা জলে বাসিপাট সেরে যা হোক একটু ভাতেভাত রেঁধে রেখে যেতেন, মাথার দিব্যি দিয়ে বলে যেতেন খাওয়ার আগে একটু 'ছিপারী' জেবলে যেন গরম ক'রে নেন একবার।

কিন্তু এই এত কাণ্ড ক'রে ছুটে যাওয়া—শুধু একবেলা কি দু'বেলা ঠাকুর্দাকে ভালমন্দ লুচি-সন্দেশ-রাবড়ি খাওয়ানোর জন্যেই নয়।

এতে অন্যদিক থেকেও কিছু আমদানি হ'ত।

হয়ত আনাজ-কোনাজ অনেক এসে পড়েছে, দেখা গেল যজ্ঞি শেষ হবার পরও স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে আলু কি কপি কি মটরশুঁটি। স্বভাবতঃই গৃহিণীরা বলতেন, 'কিছু নিয়ে যাও না দিদি (কিম্বা মাসীমা কি বামুন মেয়ে—যেখানে যে সম্পর্ক), এখানে পচবে বৈ তো নয়।'

দিদি দু'একবার 'না না' ক'রে নিয়েও আসতেন। অল্প কিছু গামছায় বেঁধে আনলেও দুজনের সংসারে সাতদিন চলে যেত, তাছাড়া পোড়া ঘি (তখন সৌভাগ্যবশতঃ বনস্পতি বাস্তুদেবতা হয়ে ওঠে নি) হয়ত অনেক বেঁচেছে, মাথাটাথা চুলকে গিন্নী

বলে ফেললেন শেষ পর্যন্ত, 'বলতে তো পারি না দিদি, এতটা পোড়া ঘি, অপরাধ নেবেন না, আপনার মতো দেখেন বলেই বলছি—নিয়ে যাবেন একটু? মুখুজ্যেমশাইকে দু'খানা লুচি ভেজে দিতেন?'

এইভাবেই তেল, মশলা, মায় ফোড়ন পর্যন্ত আসত—বাড়ি-বিশেষ বা স্থান-বিশেষে।

বাড়ি-বিশেষে এই জন্যে বলছি, তেমন তেমন হিসেবী বাড়িতে বেশী কিছুই বাঁচে না, কমই পড়ে শেষের দিকে। আর স্থান-বিশেষ অর্থাৎ—স্বল্প-পরিচিত লোকের বাড়ি, যেখানে অন্য কোন পরিচিত লোকের সুবাদে গেছেন—সেখানে নিতে বললেও দিদি নিতেন না, মিষ্টি কথায় নিরস্ত ক'রে চলে আসতেন।

তবে পাওনা এ-ই সব নয়।

এত যে মানুষটা এসে খাটলেন দুদিন তিনদিন ধরে—যেখানে যেমন দরকার—মুখের রক্ত তুলে বলতে গেলে, তাকে শুধু উদ্বৃত্ত জিনিস কিছু দিলেই কর্তব্যের শেষ হয় না।

নগদ টাকা অবশ্যই সতীদি নিতেন না—মানে পারিশ্রমিক হিসেবে হাতে হাতে—কিন্তু বিবেচক যে হয় সে দেওয়ারও অনেক উপায় জানে।

সেটা হঠাৎ-বড়মানুষীর ঔদ্ধত্য বা আত্ম-বড়মানুষীর দিন ছিল না। আমি আমার সুখের জন্যে বিলাসের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছি, এক টাকা কাউকে দিতে হ'লেও পকেট থেকে নোটের গাদা হাজার দেড় হাজার টাকা বার করছি, কিন্তু পান্ডা এলে তাকে তেড়ে মারতে আসছি, মুটেকে দুপয়সা কম দেবার জন্যে লম্বা বক্তৃতা করছি —এখন এই লোকই বেশী। এরা দান করে—যদি বা করে—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। সে দান নিরুপায় লোকেরও নিতে মাথা কাটা যায়।

তখনকার দিনে লোকে দানও করত অতি সন্তর্পণে, বিনয়ের সঙ্গে। এর ব্যতিক্রমও হয়ত ছিল, তবে আমি ছেলেবেলায় যে কাশী দেখেছি—সেই কাশীর কথাই বলছি।

কাজকর্ম চুকে গেলে হয় বাড়ির কোন ছেলেকে দিয়ে (অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কোন ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়ে) অথবা কোন ব্রাহ্মণের মেয়েকে দিয়ে একটি বড় ক'রে সিধা পাঠানো হ'ত, তার সঙ্গে সন্দেশ আলতা সিঁদুর—নতুন কাপড়। ফলে বিস্তর শাড়িকাপড় জমে যেত সতীদির। মুখুজ্যেমশাই বাড়িতে শাড়ি পরেই কাটাতেন, তা ছাড়াও অনেক সময় সতীদি দশাশ্বমেধের কোন চেনা দোকানে, কি এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে কাউকে দিয়ে তার বদলে ধুতি নিতেন।

এই সিধার সঙ্গে সিকি-আধুলি বা কোন কোন জায়গায়—তবে সে খুব কমই—টাকাও আসত দক্ষিণা। সিধাতেও, সাধারণ সিধার মতো আধ সের চাল আধ পো ডাল না দিয়ে লোকে বেশী ক'রেই দিত, ধামা বা ঝুড়ি ক'রে—চাল ডাল ঘি তেল সৈন্ধব লবণ, মশলা আনাজ—দশ-বারো দিন পর্যন্ত চলে যেত দুজনের অনেক ক্ষেত্রে।

এ ছাড়াও ছিল।

এইভাবে একজনের মারফৎ আর একজনের পরিচিত হয়ে হয়ে পরিচয়ের পরিধিও বেড়ে গিয়েছিল।

কাশীতে সেকালে সধবা-কুমারী-পুজো করার রেওয়াজ খুব বেশী ছিল। পুজোর সময় তো বটেই—তীর্থ করতে এলেও নতুন মহিলা যাত্রীরা এসব করতেন।

অন্নপূর্ণার রাজত্বে এসে সধবা-পুজোয় খুব মাহাত্ম্য। সধবা বামুনের মেয়েকে অন্ন-বস্ত্র দান করলে আর কখনও ও দুটির অভাব থাকবে না—এই বিশ্বাস ছিল। সে প্রয়োজনেও পরিচিত কেউ কাছাকাছি থাকলেই অথবা জানতে পারলেই সতীদিকে ডেকে আনতেন। নিজস্ব গুরুপত্নী কি পুরোহিত-পত্নী থাকলে আলাদা কথা—তবে নতুন যাত্রীদের পুরোহিত আর কোথায়—থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ওঁকেই পছন্দ করতেন যাত্রীরা।

জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, মধুর স্বভাব আর সর্বোপরি এই আশ্চর্য সতীত্ব—ঐ স্বামীকে কেউ অমন ভালবাসতে ভক্তি করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না, কাশীর মতো দরিদ্র জায়গাতেও হাজার হাজার টাকার প্রলোভন এসেছে ওঁর যৌবনকালে—সব জড়িয়ে সতীদি একটা কিম্বদন্তীর মতো হয়ে গিছলেন। যদি কোন সধবাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করতেই হয়—তাঁকেই করতে চাইবে মানুষ, এ তো স্বাভাবিক।

সেও শাড়ি, সন্দেশ, দক্ষিণা। যাঁরা জানতেন ওঁদের অবস্থা, তাঁরা ইচ্ছে ক'রেই—এই ছুতোয় কিছু সাহায্য করবেন বলেই—একটা সিধাও দিতেন ঐ সঙ্গে—যাঁর যা সামর্থ্য।

এইটেই ছিল সতীদির যোগেযাগে চালানো।

॥ ৪ ॥

স্বল্পপরিচিত লোকদের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যেত—স্ত্রী এত কাণ্ড ক'রে সংসার চালান ; ঠাকুর্দা কিছু রোজগার করার, স্ত্রীকে একটু রেহাই দেবার চেষ্টা করেন না কেন?

এটার সোজাসুজি উত্তর অবশ্য কোনদিনই পাই নি ঠিক। উত্তর পেয়েছি অন্য পরোক্ষ প্রশ্ন ক'রে।

ঠাকুর্দা আর কী কাজই বা করতে পারেন?

এর সোজা জবাব—কেন, যজমানি?

সত্যি, কাশীতে এত বাঙালী, ক্রিয়াকলাপও তো লেগেই আছে।

আর চালাচ্ছেও তো অনেকে।

বড় বড় পণ্ডিত যাঁরা, মহামহোপাধ্যায়—তাঁরা এসব কাজ করেন না, নিজেদের বাড়ির পুজোও করেন না অনেকে! বড়জোর বিদায় নিতে যান। তেমনি তাঁদের অবস্থাও ভাল নয়। প্রভাস পণ্ডিত মশাইকে আমরাই তো দেখেছি, অত বড় পণ্ডিত গুণী লোক—সামান্য চাকরি ক'রে দিনাতিপাত করেন, গৃহিণীর মুখনাড়া খান।

কিন্তু যজমানি করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই কাশীতে দু'তিনখানা বাড়ি করেছেন, তাঁদের বাড়ির সিন্দুক খুললে কত মণ বাসন বেরোবে তার ঠিক নেই। আমাদের পুরোহিত মশাইকেই তো দেখছি।

সুতরাং ঠাকুর্দা সম্বন্ধে সেই প্রশ্নটাই স্বাভাবিক।

বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু এমন বুড়ো হন নি যে যজমানি করা চলে না। চাকরি করছেন পরের—আর লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজোয় দুটো ফুল ফেলে আসতে পারেন না? শরীর খারাপ হয়, বড় বড় পুজো—দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো না হয় না-ই করলেন—ষষ্ঠীপুজো, মনসাপুজো, লক্ষ্মীপুজো করলেও তো ওঁদের সংসার বেশ চলে যায়। সতীদিকে এমন উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না।

'এই তো সরস্বতী পুজোয় ছেলেরা পুরুত পায় না। ছুটোছুটি করে একটা পুরুতের জন্যে—হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে নাড়ি চুঁইয়ে'—আমার মা-ই গজগজ করতেন, 'পৌষমাস, ভাদ্রমাস, চৈত্রমাসে—ষন্দপুজোর বেলাতেও তো দেখি অমনি পুরুতের আকাল। ভদ্রলোক এগুলোও তো করতে পারেন। সারা মাস সাড়ে ছটা থেকে এগারোটা আর তিনটে থেকে ছটা—কয়লার দোকানে হাজরে দিয়ে বুঝি পাঁচ টাকা না ছ'টাকা পান—একটা লক্ষ্মীপুজোর দিনেই তো ও কটা টাকার ঢের বেশী উশুল হয়ে যাবে।'

অনেকদিন পরে এ প্রশ্নটা করেছিলুম রমেশ ঠাকুর্দাকে।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের বেশ ক'বছর পরে।

একটা 'হ্যা——।' বলে ইংরেজীতে যাকে বলে 'নন্ কমিটাল' শব্দ ক'রে—অনেক-ক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন ঠাকুর্দা।

ঐটে ছিল ওঁর একটা মুদ্রাদোষ। 'হ্যা' বলে শব্দটা উচ্চারণ ক'রে শেষের স্বরটা অনেকক্ষণ ধরে টানতেন। কোন প্রসঙ্গের আগে বা পরে অকারণেই ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দটি ব্যবহার করা অভ্যাস ছিল। ওটা স্বীকৃতিবাচক বা সম্মতি-সূচক 'হ্যাঁ' শব্দ নয়—ওটা ওঁর কাছে অনেকখানি বক্তব্যের সার।

বহু চিন্তা, বহু দ্বন্দ্ব, বহু সমস্যার দ্যোতক।

অনেক না-বলা কথার ইঙ্গিত। মানে ওঁর কাছে।

সেদিনও ঐ শব্দটা উচ্চারণ ক'রে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন,—পৃথিবীর-বোধ-হয়-ক্ষুদ্রতম চোখ দুটি পিট্‌পিট্ করতে করতে।

তারপর বললেন, 'তোর মতো আরও অনেকে এ-কথাটা জিজ্ঞেস করেছে নাতি, উত্তর দিতে পারি নি। দিলে বুঝত না। হয়তো মনে করত, বাজে হুতো। তুইও যে সব বুঝবি তা নয়—তবে বলছি এই জন্যে যে, তুই তোর ঠান্‌দিকে খুব ভালবাসিস, তা আমি লক্ষ্য করেছি। আসলে তার জন্যে তোর কষ্ট হয় বলেই জিজ্ঞেস করছিস। সেইজন্যেই তোকে বলছি, কথাটা শোনা থাক্। এ আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া রইল—তোদের সকলের হয়ে তোর কাছে।...বুঝবি কি না বুঝবি, অত ভাবতে গেলে চলবে না। এখন না বুঝিস পরে বুঝবি। নয়ত আর কেউ বুঝবে।...তবে তুই যা এঁচোড়ে-পাকা দেখি—এই বয়সে গাদা গাদা নবেল-নাটক শেষ করছিস, তুই বুঝলেও বুঝতে পারিস!'

এই ব'লে একটু থামলেন, খক খক ক'রে কাশলেন কিছুক্ষণ ধরে। চোখের পিচুটি মুছলেন, তারপর তেমনি পিটপিটে চোখ আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বলতে শুরু করলেন।

তবে চোখ আমার মুখের ওপর থাকলেও মনটা সেখানে ছিল না এটা বুঝতে পারলুম। কোথায় কোন্ সুদূরে চলে গিয়েছিল, এ কৈফিয়ৎ উনি আমাকে দিচ্ছিলেন না, সমস্ত পরিচিত মানুষকেই দিচ্ছেন, এখনই বললেন—কিন্তু তাই কি, মনে হ'ল এ উনি নিজেকেও দিচ্ছেন, নিজের বিবেককে। আর সঙ্গে সঙ্গে করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

'দ্যাখ—পুরুত বামুনের ঘরেই জন্মেছিলুম। আমার বাবাও যজমানি করতেন। পাড়া-গাঁ জায়গা, শুনতেই হরিনাভি-রাজপুর—পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখন কি হয়েছে জানি না, আমার ছেলেবেলায় খুবই ভগ্নদশা অবস্থা ছিল, বন-জঙ্গলে ভরা। যাদের ক্ষ্যামতা আছে তারা সবাই কলকাতায় বাস করত—কস্মিনকালে কেউ দেশে যেত না। বরং আরও দক্ষিণে, বারুইপুর কি তারও দক্ষিণে অনেক বড় বড় লোক থাকত শুনেছি। আমাদের ওখানে তো জ্ঞান হয়ে অবধি দেখছি বড় বড় পুরনো বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, নয়ত বট অশথ গাছ গজাচ্ছে। কেউ আর আসেও না, মেরামতও করে না। হয়ত কোন শরিকের অবস্থা খারাপ, তার শহরে যাবার উপায় নেই—তারাই ভাঙ্গা বাড়ির যেটুকু বাসযুগ্যি আছে, ভোগদখল করছে। নয়ত আমাদের মতো দীন-দরিদ্র লোক,—আধপাকা আধকাঁচা বাড়িতে মাথা গুঁজে আছে। আমাদের বাড়ির দ্যাল ছিল পাকা, পাকা মানে ইটের—মাটির গাঁথুনি—মেঝেটা অবিশ্যি শানের, চুন দিয়ে পেটা, তখন এত বিলিতি মাটির চল হয়নি—চাল গোলপাতার!

'তা ঐ যা বলছিলুম, তবু ঐ দেশেও আমার বাবা যজমানি ক'রেই—ক'রে-খেতেন। এক আধ বিঘে জমি ছিল, নামে-মাত্তর, বছরে তিন মাসের খোরাকও হ'ত না। যা কিছু ভরম্ভর ঐ ক'ঘর যজমানের ওপরই।

'হ্যাঁ, বাবা অবিশ্যি খাটতেনও—লক্ষ্মীপুজো, মনসাপুজো কি সরস্বতী পুজোয়

দেখেছি—দূরদূরান্তেও যাচ্ছেন ; ভোর থেকে উঠে শালগ্রাম মাথায় ধ'রে পাঁই পাঁই ক'রে ছুটছেন আলের ওপর দিয়ে ; গ্রীষ্মকালে রাত চারটেয় উঠে বাড়ির পুজো সেরেই বেরিয়ে পড়তেন, শীতে সেটা বড়জোর পাঁচটা হ'ত, বেরোতেন অন্ধকার থাকতেই—ইংরিজী মতে বেস্পতিবার ধ'রে আমাদের পুজোটা হ'ত আর কি—দূর পাল্লায় আগে বেরিয়ে যেতেন, পোঁছতে পোঁছতে সকালটা হয়ে যায় যাতে। তাদের হুমকি দেওয়া থাকত, "রাত থাকতে থাকতে গোছগাছ ক'রে রাখবে, এসে না দাঁড়াতে হয়। যদি ফিরে যাই—যার নাম বেলা চারটে—ইটি মনে রেখো।"

'মনে তারা রাখত। প্রাণের দায়ে মনে রাখত। সত্যিই ওঁর সব বাড়ির পুজো সেরে ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে-চারটে গড়িয়ে যেত। শীতকালে দেখেছি এক একদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে ফিরতে।

'তেমনি ওতেই সংসারও চলত। আমরা একপাল ভাই বোন, বিধবা জ্যাঠাইমা, জাঠ-তুতো একটা আধ-পাগলা ভাই, এক বরে-খেদানো পিসী—বাবার মামাতো বোন : এত-গুলি লোকের ডালভাত খেয়ে মোটা-কাপড় প'রে দিন কেটেই যেত একরকম ক'রে।

'বোনদের বে-ও দিয়েছেন বাবা ওর মধ্যেই। দুটো তো দেখেই এসেছি, পরেরগুলোও কোন না দিয়েছিলেন। আর সে বে-ও বড় চাট্টিখানি কথা নয়, চেহারা তো আমাকে দেখেই মালুম পাচ্ছ—কেমন সব কন্দর্পকান্তি—এই রকমই ছাঁচ ধরো—উনিশ-বিশ।

'ঐটেই হ'ল কিন্তু কাল। এর ভেতরের দিক, মানে এই পুজোর অন্দরমহলের দিক—থ্যাটারে তোরা যাকে গিরিণরুম বলিস, সেটা আমার আগেই দেখা হয়ে গেল, পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে। জ্ঞান হওয়ারও আগে বলতে গেলে—মানে উরির মধ্যেই তো মানুষ। কত যে ফাঁকি তা অবশ্য তখনও জানি না। শুধু জানি যে বাবা পুজোয় বেরোবার আগে সেই শেষ রাত্তিরেই এক গাল চিঁড়ে কি এক গাল পান্তাভাত খেয়ে নিতেন, দুর্গা-পুজোতে জগদ্ধাত্রী পুজোতেও, সারা রাতের পুজো হলে তো কথাই নেই—যেমন ধরো কার্তিক পুজো—সে তো দিব্যি ক'রে মাছ ভাত সাঁটতেন। বলতেন, "রাতের পুজো, রাতে না খেলেই হ'ল। দিনের পুজো সব আগের দিন রাত্তিরে খেয়ে যদি হয়—এটা হবে না কেন?" তিনি যে দিনের পুজোতেও দিনেই খেতেন—সেটা তখন মনে থাকত না।

'তারপর কথাবাত্তারাও তেমনি। ফিরে এসে নৈবিদ্যির পুঁটুলি খুলে যে গালাগাল দিতেন রে ভাই—কি বলব।...কে মোটা চাল দিয়েছে, কে ক্ষুদের মতো ভাঙ্গা চাল, কে কম দিয়েছে, কে ধুতির বদলে গামছা দিয়েছে, কে গুণচটের মতো কাপড় দিয়েছে—এই নিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতেন যজমানদের, মানে সে মুখ খারাপ ক'রে একেবারে। শাপ-শাপান্তও করতেন অনেক সময়। "সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে, নিব্বংশ হবে সব। দেবতা-বামুনকে ফাঁকি দিয়ে যে পয়সা জমাচ্ছেন সে পয়সা ওষুধে ডাক্তারে বেরিয়ে যাবে, শ্মশানঘাটে খরচ হবে। ভোগ করবার লোক থাকবে না, যক দিয়ে যেতে হবে"—এমনি ধারা।

'খুব খারাপ লাগত ভাই, সত্যি বলছি।

'কেন লাগত তা জানি না। ঐ বাড়িতেই তো আমরা এতগুলো প্রাণী ছিলুম—কই, আর কারও তো লাগত না! বরং দাঁত বার ক'রে হাসত আমার ভাইবোনেরা।

'বোধহয় আমাকে সংসারে পাঠাবার সময় সাধারণ বিধাতার হাতজোড়া ছিল, ভিন্ন বিধাতার ওপর ভার পড়েছিল আমাকে গড়বার। আমার মনে হ'ত, আহা, ওরা ওদের অবস্থামতো সব দিয়েছে, আর এই বারোমেসে পুজোতে কে এত ছিষ্টি খরচা করে। এ নিয়ে এত বলবার কি আছে? এত যদি ঠকেছি মনে করেন, আগে থাকতে বন্দোবস্ত ক'রে নেন না কেন, এত পেলে যাব—নইলে যাব না?

'তবু কি জানিস, বাবা যেমন বিদ্যে নিয়ে পুরুতগিরি করতেন, পাঠশালে পড়া শেষ হবার পরই যদি আমাকে ঐ জোয়ালে জুড়ে দিতেন,—দুটো অং বং চং, নিজে যা জানতেন তাই শিখিয়ে—আমি হয়ত অত কিছু ভাবতুম না। বাবার মতোই দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যেতুম! পাঠশালার পড়া শেষ করতেই ঢের বয়স হয়ে গিয়েছিল, তার অনেক আগে পৈতে হয়ে গেছে।

'বাবা গেলেন অন্য পথে। তাঁর মনে মনে একটা ভয় ছিল, একটা দুঃখুও বলতে পারো—তিনি লেখাপড়া জানতেন না ব'লে ভরসা ক'রে কোন বড় জায়গায় ভাল জায়গায় যজমানি করতে যেতে পারতেন না। পাছে কেউ ভুল ধরে ফেলে, কোন মন্তরের মানে জিজ্ঞেস করে। সে সময়টা ইংরেজী-জানা বাবুদের খুব একটা বাহাদুরি ছিল, পুরুত বামুনদের অপদস্থ করা। তাছাড়া এদান্তে যজমানরাও একটু-আধটু লেখাপড়া শিখছিল বলে বাবা মনে করলেন একেবারে ফাঁকিবাজীর ওপর আর চলবে না, পেটে একটু কিছু থাকা দরকার।...

'একটা ছড়া খুব চলত আমাদের আমলে। অধিক বিদ্যে কানে ফুঃ, অল্প বিদ্যে শাঁখে ফুঃ, আর ন চ বিদ্যে উনুনে ফুঃ—বামুনের এই তিন কম্ম। মানে যে লেখাপড়া জানে সে গুরুগিরি করবে, কানে মন্তর দেবে ; যে তার চেয়ে কম জানে সে যজমানি করবে, আর যে কিছুই জানে না সে রান্না করবে, রাঁধুনী বামুন হবে। তা সে আর ছিল না, ন চ বিদ্যেই শাঁকে ফুঃ চলছিল। বাবার মনে হ'ল যে এভাবে আর চলবে না, একটু অন্ততঃ মন্তরের উচ্চারণগুলো রপ্ত হওয়া দরকার। সেই জন্যেই—হরিনাভিতে এক সসেমিরে গোছের টোল ছিল, আধমরা, নিহাৎ সামান্য কিছু সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল ব'লেই চলত—সেইখানে ভর্তি ক'রে দিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে ক্রোশখানেকের মতো পথ, বেলা দুপুর নাগাদ খেয়ে-দেয়ে রওনা দিতুম, বাড়ি ফিরতে যার নাম রাত আটটা।

'তা হোক—তখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স—দু'ক্রোশ পথ হাঁটা আমার কাছে কিছুই নয়। আমার মনটা ভেঙ্গে গেল অন্য কারণে! তখন ইংরিজী পড়ার রেওয়াজ হয়ে গেছে, আমার পাঠশালার সাথী যারা তারা সকলেই ইংরেজী ইস্কুলে ভর্তি হ'ল—আমার মনে হ'ল আমি এ কি শিখতে যাচ্ছি!

'সংস্কৃত তখন আর টোলে কেউ শেখে না—ইংরেজী ইস্কুল যেটুকু শেখায় তাতেই কাজ চলে যায়—নিহাৎ আমাদের মতো যাদের অন্য কোন গতি নেই, এমনি দু'-চারটি ছাত্র নিয়ে টোল চলে। একেবারে কোন ছাত্র না থাকলে 'গ্র্যাণ্ট' বন্ধ হয়ে যাবে—তাই অধ্যাপক মশাই-ই একরকম খুঁজেপেতে ছাত্র ধরে আনতেন।

'তবু, কী আর করা যায়, এই ভেবেই পড়তে লাগলুম। কাব্য আর ব্যাকরণ, বাবা বলেছিলেন পড়তে। পড়ব কি—পণ্ডিত মশাই আজ অমুক জায়গায় বিদেয় নিতে যাবেন, অমুক গ্রামে দীক্ষা দিতে যাবেন, অমুকের পৈতেতে আচার্যির কাজ করবেন, অমুকের বে—তাঁর লেগেই থাকত একটা না একটা। পড়ার দিনের থেকে অনধ্যায়ের দিন তিনগুণ। তিনিই বা কি করবেন, তাঁকেও খুব দোষ দিই না—আমরা কেউই মাইনে দিতুম না, সরকারী বৃত্তিটুকু ভরসা। সেও ঐ নামে মাত্তরই। তাতে তো আর দিন চলে না—তাই গুরুগিরি পুরুতগিরি অধ্যাপকীগিরি সবই ক'রতে হ'ত। আগেকার আমলে শুনেছি টোলেই ছাত্ররা খেতে পেত থাকত—সে দিন আর ছিল না। সেই জন্যে যে পড়াটা দু'বছরে হবার কথা—সেটা তিন বছরেও শেষ হ'ত না।

'এধারে আমার বাবা অধৈর্য হয়ে উঠলেন। আদ্য পরীক্ষা দেব বলে তৈরী হচ্ছি, বাবা বললেন, "আর পরীক্ষার দরকার নেই, টোল ছেড়ে দে। আমার যেটুকু দরকার হয়ে গেছে, এতেই কাজ চলবে। এখন আমার কাছে ক্রিয়াকর্মের প্যাঁচগুলো শিখে নে—তাতেই হবে, আমাদের দশকর্মের কাজ, ওর বেশী লাগবে না"।

'এতদিন ভাই বাবার কথা অন্ধভাবে মেনে এসেছি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও। কিন্তু এবার আর পারলুম না।

'আসলে অন্ধ ছিলুম বলেই এতকাল মেনেছি, অত অসুবিধে হয় নি। বাবাই একটুখানি চোখ ফুটিয়ে দিতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলেন।

'লেখাপড়া যাকে বলে তা কিছুই শিখি নি, তবু একটু যা মাথায় গিছল তাতেই বুঝেছি দশকর্ম অত সহজ নয়। পণ্ডিত মশাই নিজেও ওসব ক্রিয়া তত জানতেন না, তবে তাঁর বাড়িতে পুঁথি ছিল ঢের। তিনি প্রায়ই একটি ছড়া কাটতেন—আমার বাবাকে উদ্দেশ ক'রেই, পরে বুঝেছিলুম—"চণ্ডী মুণ্ডি কুশণ্ডি পার্বণ—এই চার নিয়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণ"। বলতেন, পাকা পুরোহিত হ'তে গেলে এই চার কাজ শেখা দরকার। চণ্ডী অর্থাৎ কালীপুজো ; কালীপুজোয় যত ন্যাস মুদ্রা জানা দরকার হয়—এত দুর্গাপুজোতেও লাগে না। মুণ্ডি মানে মণ্ডল তৈরী করা—এখানে দুর্গাপুজোতে তো দেখেছিস—আমাদের গণেশ মহল্লার সতীশ ভট্চায পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে সর্বতোভদ্র মণ্ডল তৈরী করে—ঐ লোকটা জানে দশকর্ম, সব পুঁথি মুখস্থ—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কুশণ্ডি মানে কুশণ্ডিকা যে করাতে জানে—ভাল ক'রে—তার যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা মোটামুটি জানা হয়ে যায় ; আর পার্বণ মানে পার্বণ শ্রাদ্ধ। পার্বণ শ্রাদ্ধ যে নিখুঁতভাবে করাবে—তার কাছে সপিণ্ডকরণ খেলার সামিল।

'ওঁর এই কথাগুলো শুনতুম, আর বাড়ি এসে বাবার যা দু'একখানা পুঁথি ছিল সেইগুলো, কিম্বা, অনধ্যায়ের দিনগুলোয়—অত দূর হেঁটে গিয়েছি একটু তো জিরুতে হবে—পণ্ডিত মশাইয়েরই ক্রিয়াকর্ম বারিধি, নিত্যপূজা পদ্ধতি, দুর্গাপুজোর তিন-চার মতের পুঁথি—উল্টে দেখতুম।

'তাতে যা বুঝেছিলুম—মন্ত্রের মানে, ক্রিয়ার মানে, ন্যাস মুদ্রার মানে—বুঝেছি তো ছাই, হয়ত তিন আনা বুঝেছি, তেরো আনাই বুঝি নি—তান্ত্রিক ক্রিয়া তো কিছুই বুঝি নি—তবু একটা যা ঝাপসা ঝাপসা ধারণা হয়ে গিয়েছিল তাতেই বুঝেছিলুম—বাবা কিছুই জানেন না আর যজমানদের কী ফাঁকিই দেন! তারা সরল বিশ্বাসে ওঁর ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে—উনি একেবারেই ঠকিয়ে চলে আসেন। তাতেও পাওনা কম হ'লে অত রাগ, অত শাপমন্যি!

'আরও কি বুঝলুম জানিস—দোষ কোন পক্ষেই কম নয়। ছোটবেলাতেই—মানে পৈতের পর আর কি, বাবা কদিন সঙ্গে ক'রে ঘুরেছিলেন। সেই সময়ই দেখেছিলুম, যজমানরাও—একটু লেখাপড়া শিখেছে কি শেখে নি, হয়ত ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত ইংরেজীর দৌড়—তারা কী ঘেন্নার চোখেই না দেখে পুরুতকে। মেয়েরা একরকম, তারাই পুজোর যোগাড় করে, ছেন্দাভক্তিও তাদের আছে, পুরুষরা—বিশেষ বামুন কায়েতের ঘরের পুরুষরা—বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও অধম ভাবে পুরুত জাতটাকে।

'আমিই ভুল বলছি, কুকুর বেড়াল তো শখ ক'রে পোষে লোকে, ভালবাসে, আদর করে ; এদের চোর জোচ্চোর বলেই জানে—পুরুতদের। ডাকতেও হয়—সমাজ আছে, দশবিধ সংস্কারে না ডাকলে চলে না। বে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, পৈতে—এগুলো তো চাই, পুরুতের যেটুকু কাজ সেটুকু নিদেন লোকদেখানো না হ'লে আসল যেটা—খ্যাঁটের ব্যাপার সেটা তো হয় না, তাই ডাকতেও হয়, কিন্তু কেবলই মনে করে ব্যাটারা ঠকিয়ে নিচ্ছে।

'তাছাড়া, গরীব-দুঃখী মুখ্যু-সুখ্যু লোক যারা—তারা সাধ্যমতো দেয়। যারা বাবু-ভাই, নিজেদের লেখাপড়া জানা লোক মনে করে—তারা সাধ্যমতো কম দিতে চেষ্টা করে। বে'তে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, বিদ্ধিশ্রাদ্ধর ফর্দ করতে বসো দিকি, সেখানে যত পারবে কারণকষ্যি করবে। ছ'পয়সা সেরের চাল, তাও যদি আধসের দিয়ে পারে তো তাই দেয়। তেমনি পুরুতরাও হয়ে গেছে ছ্যাঁচড়া—তারাও চায় যত রকমে পারে প্যাঁচ

দিয়ে—এটা ওটা ভাঁওতা দিয়ে বেশী আদায় করতে।...এই টানাটানিটাই আমার খুব খারাপ লাগত। লাগত বলি কেন, এখনও লাগে। দেখছি তো চারদিকেই—'

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন ঠাকুর্দা। আগে ভাবলুম দম নিতেই বুঝি থামলেন—কিন্তু একটু পরে মনে হ'ল তা নয়, উনি যেন মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেছেন। এখানে দেহটা থাকলেও মনটা চলে গেছে সুদূর অতীতে।

আরও খানিকটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললুম, 'তারপর?'

'তারপর?...তারপর আর কি, ঐ নিয়েই খিটিমিটি বাধল। বিষম অশান্তি, বাবা গোড়ায় চেঁচামেচি করলেন, তারপর গালাগাল, কাকুতি-মিনতিও করলেন শেষে। মাকে দিয়ে বলালেন, জ্যাঠাইমাকে দিয়ে—তাঁরা কান্নাকাটি করলেন। মা—একদিকে ছেলে এক-দিকে স্বামী—দোটানায় পড়ে একদিন ঢিব্ ঢিব্ ক'রে আমার সামনে মাথা খুঁড়লেন। জ্যাঠাইমা বোঝালেন, "তুমি বড় ছেলে, এতবড় সংসারের দায়িত্ব একদিন তোমার ঘাড়েই পড়বে, তুমি এমন অবুঝ হ'লে চলবে কেন? মানুষে জীবিকার জন্যে কত কি হীন কাজ পর্যন্ত করছে—দেখছ তো চারদিকে—এ তো তবু সম্মানের কাজ। বেশ তো, তুমি যা জানো সাধ্যমতো জ্ঞানমতো সেইভাবেই করবে, ফাঁকি দেবে কেন? তাতে দু'ঘর কম টানতে পারো তাই টানবে। এখুনি তো তোমায় এত খাটতে হচ্ছে না, এখনও তো মাথার ওপর ঠাকুরপো রয়েছেন। আর ছ্যাঁচড়াবিত্তি না পোষায়, তাও ক'রো না। যে যা দেয় তাই নিয়ে চলে আসবে—একটু কিছু তো দিতেই হবে—যে যতই কম দিক তাই নেবে"।...

'ভাল কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমি জানতুম—এ কাজে ঢুকলে অত সহজে পার পাবো না। যার যা—একদিন ঠিক অমনিই ছ্যাঁচড়াবৃত্তি ক'রতে হবে, একদিন অমনিই ফাঁকি দিতে হবে। আজ বাবা আছেন ঠিকই, যখন থাকবেন না, এই নারদের সংসার চালাতে হবে—তখন আমাকেও একবেলায় কুড়ি ঘর বজায় দিতে হবে, তখন ঐ কোন-মতে ফুল ফেলা ছাড়া আমারও গতি থাকবে না, মনে মনে বলতে হবে, ঠাকুর সবই তো বুঝছ, আমার আর সময় নেই। "আমি ঠাকুর হাব্‌লা গোব্‌লা, ভোগ খাও ঠাকুর খাব্‌লা খাব্‌লা"—সেই রকম আর কি।...

'পুজো, জানিস নাতি, অনেক রকমেই করা যায়, দশ দিকপালের আলাদা আলাদা নাম ক'রে ক'রেও করা যায়, গণেশাদি পঞ্চদেবতাও তাই—আবার একটা ফুলের পাপড়ি দিয়ে "ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্য নমো, গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমো," বলেও সারা যায়। মরশুমের দিন তাও হয়ে ওঠে না, 'ওঁ' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে, দুটো হাততালি দিয়ে কটা ফুল ছিটিয়ে দিলেই হ'ল। কে দেখতে যাচ্ছে, কে পরীক্ষা নিচ্ছে?

'মোদ্দা কথা—ওঁরা যত বলেন আমার তত জেদ চেপে যায়। শেষে একদিন পরিষ্কার বলে দিলুম বাবাকে যে, "আপনার নাম ক'রেই দিব্যি গালছি, যজমানি কাজ জীবনে করব না—খেতে পাই ভাল, না পাই ভাল"।'

আবারও থামলেন। মনে হ'ল গলাটা ধরে এল যেন। চোখ দেখা যায় না ভাল ক'রে তবু মনে হ'ল সে দুটোও ছলছল করছে। হয়ত অনুশোচনা, হয়ত অকৃতজ্ঞতাবোধের লজ্জা।

আরও খানিক পরে, আবারও মৃদুকণ্ঠে মনে করিয়ে দিলুম, 'তারপর?'

'হ্যা——।' ক'রে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'তারপর এই। সেই জন্যেই যজমানি আর করতে পারি না। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ে ধরে মাপ চেয়ে কথা ফিরিয়ে নিতুম। সে পথ আর নেই।...তা ছাড়াও দিব্যি অত মানি না, তবে এ নিয়ে অনেক দুঃখ দিয়েছি তাঁকে—তাঁদের, অনেক বেইমানি করেছি, এখন বৌকে সুখে রাখার জন্যে সে কাজ করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। তার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব সেও ভাল, নইলে—মা গঙ্গার তো জল শুকোয় নি, বুড়োবুড়ী গিয়ে গা-ঢালা দোব।'

এই বলে একেবারেই চুপ করলেন। পাছে আমি আরও প্রশ্ন করি, আরও খোঁচাই—উঠে চলেই গেলেন সেখান থেকে।

॥ ৫ ॥

এইরকমই মানুষ ছিলেন রমেশ ঠাকুর্দা।

সেকেলে বুড়ো মানুষ, লেখাপড়া কম জানতেন, পাড়াগাঁয়ের লোক—কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল একেবারে আমাদের কালের। তাঁর কালের সঙ্গে তিনি কিছুতে খাপ খাওয়াতে পারতেন না তাই। সব জিনিসটাই তিনি নিজের মতো ক'রে ভাবতেন—নিজের মনে সত্যমিথ্যা দোষগুণ ভালমন্দ যাচাই ক'রে নিতেন। সাধারণ নীতিদুর্নীতি, পাপপুণ্য সম্বন্ধেও তাঁর মতামত ছিল বেয়াড়া—কারও সঙ্গেই মিলত না।

একবার মনে আছে—আমাদের বাড়িতে কোন ঘটনা নয়—বোধহয় প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বার-ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন, তারই ফর্দ হচ্ছিল। আমার মনে আছে, কারণ আমি সেখানে ছিলুম, ব্রাহ্মণের তালিকা করার সময় রমেশ ঠাকুর্দা ফট্ ক'রে নগেন মল্লিকের নামটা ক'রে বসলেন।

বেশ মনে পড়ে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হয়ে গেল—স্রেফ্ বিস্ময়ে। কারও মুখে একটা কথা সরল না।

এমন লোকের নাম যে করা যায়, কোন পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে এমন লোককে ডেকে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যায়—এ কোন সুস্থ সচেতন-মস্তিষ্ক লোক ভাবতেও পারে না।

এমন কি, সেই বয়সেই, আমিও জানতুম ভদ্রলোকের কেলেঙ্কারির ইতিহাস। নগেন মল্লিককে প্রায় সবাই চেনে, মানে এখানের বাসিন্দারা সকলে। বিশ্বনাথের গলি ছাড়িয়ে গঙ্গার দিকে যেতে—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিবমন্দিরের পরেই যে একসার দোকান, তারই একটা ওঁর ছিল, "কারবাইড্/গ্যাসের মশলা/এইখানে পাওয়া যায়" দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে আলকাতরায় লেখা—যাঁরা সে সময় কাশীতে গেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন—মনেও আছে নিশ্চয়। ভদ্রলোক নাকি তাঁর এক বিধবা মাসীকে নিয়ে—আপন মাসী—এখানে এসে বাস করছেন স্বামী-স্ত্রীর মতো। ছেলেমেয়েও অনেকগুলি হয়েছে। এমনি খুবই ভদ্রলোক, শুধু কারবাইডে চলে না বলে কাঠকয়লা, কিছু কিছু লোহার জিনিস, বালতি প্রভৃতিও রাখেন আজকাল। তাঁর চরিত্র যেমনই হোক, তাঁর স্বভাব কি তাঁর সততা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোন খারাপ ইঙ্গিতটি পর্যন্ত করতে পারে নি। তবু—একে তো বে-আইনী সম্পর্ক—তার ওপর আপন মাসী!

লক্ষ্মীবাবুও সেখানে ছিলেন—বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু, প্রয়াগবাবু ওঁর কী রকম দূর সম্পর্কে মামা হন—তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙ্গালেন, 'ও নামটা কি ক'রে করলেন কাকা! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

আর একজন কে—মনে নেই ঠিক—বলে উঠলেন, 'তা ওঁর কি আর ভীমরতির বয়স হয় নি? ষাট তো পেরিয়ে গেছে কবেই। নেহাৎ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন তাই—'

প্রয়াগবাবুর মা তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেলেন, 'না না, ও তামাশা করছে। তোরা অমন করছিস কেন?'

ঠাকুর্দা যেন বোমার মতো ফেটে পড়লেন এবার।

'হ্যা——। বলি, ভীরমতিটা কে দেখছে আমার তাই শুনি! নগের নাম করতে সব চমকে উঠলে যে একেবারে! খুব সব সাধুপুরুষ আমরা—না? কেউ কখনও কিচ্ছু করি নি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানি না—সবাই এক একটি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! রথ তো নেই, টাঙ্গা কি এক্কায় চড়লে চাকা চার আঙ্গুলে উঠে থাকবে মাটি থেকে, মনে

শিবদত্ত আর কিস্টু দত্তে মারামারি লেগে যাবে—এ বলবে কৈজেসে নে যাই, ও বলবে গোলকে !'

তারপর, তেমনি পিটপিটে চোখে ভ্রূকুটি ক'রে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, 'কেন, নগে কি বামুনের ছেলে নয়, না কি পৈতে ফেলে দিয়েছে, না তিনসন্ধ্যে গায়ত্রী করে না? না কি অজাত-কুজাত বিয়ে করেছে? মানলুম, বে-করা নয় এমন মেয়েছেলের সঙ্গে ঘর করে। তা এই যে লম্বা ফর্দ হচ্ছে বামুনদের, বড় বড় টিকি-আলা সব ব্রাহ্মণ—এরা কি সবাই চরিত্রবান নিষ্কলঙ্ক পুরুষ? ভাল ক'রে খবর নিয়ে তবে তোমরা ফর্দ করছ তো?'

হ্যা হ্যা ক'রে একটা তিক্ত হাসি হেসে নিয়ে আবারও বললেন, 'মাসী স্বীকার করছি। ন বছরে বে হয়েছিল, দশ বছরে বিধবা হয়েছে। বে'র ঐ আট দিন ছাড়া বরের মুখ দেখে নি, বে যখন হয়েছে তখন কিছুই জানে না—বর-কনের ব্যাপার, কোন যৌবন লক্ষণ প্রেকাশ পায় নি।...নিদ্দুষি মেয়েটাকে বাপের বাড়িতে ভূতের মতো খাটাচ্ছিল, বলতে গেলে একটা কিষেণের কাজ করাচ্ছিল একফোঁটা মেয়েকে দিয়ে। এ তো শোনা কথা নয়, বনপলাশপুরের ও ভটচায্যি গুষ্টিকে আমি খুব ভাল ক'রে জানি—ধানের পাট থেকে, গরু থেকে, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা ক্ষার কাচা—সব ঐ মেয়ে। নেহাৎ একাদশীতে উপোসটা করাত না, মা বে'চে—একটু ক'রে দুধ খেতে দিত!...কী সমাচার—না কাজ-কম্মের মধ্যে না থাকলে বেচাল শিখবে, স্বভাব-চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে। অথচ ওর চোখের সামনেই ওর বাবা শিষ্যির বিধবা বোনের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসত।'

বোধহয় দম নেবার জন্যেই থামতে হ'ল একটু, কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তই। আর কেউ কথা বলার সুযোগ পেল না সে অবসরে। উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন, 'সেই মেয়েটাকে নগে যদি উদ্ধার ক'রে এনে এখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটায়—দোষটা কি? একটা মন্তর পড়িয়ে নিলেই তো হ'ত—কিম্বা খাতায় লিখে বে করলে তো ট্যাঁ-ফো করতে পারতে না তোমরা? সেইটেই ওদের ভুল হয়েছে।...যখন এখানে আসে—নগের তখন সাতাশ বছর বয়েস, বে'ও করে নি কিছুই না, মেয়েটার আঠারো। কী বয়েস ওদের?...তোমরাও তো নগেকে দেখছ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বাদ নেই, স্নান পুজো—কাউকে ঠকায় না, কোন কলহ-বিবাদে যায় না, কেউ বলতে পারবে না নগেন মল্লিক কারও একটা আধলা হরেহম্মে নিয়েছে!'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যাদের জিনিস, যারা এসে এই কাশী শহরে রটিয়ে দে গেল কেচ্ছাটা—সেই মল্লিক গুষ্টি এসে এখন ওদের বাড়িতেই উঠছে, ভট্‌চায্যি গুষ্টিও। এক পয়সা খরচা নেই, তোফা মচ্ছি মাংস খেতে পায় দুবেলা, জামাই আদর—মায় রাবড়ি রসগোল্লা পর্যন্ত, পাল-গুষ্টি এসে ওঠে এক এক সময়। ওরাও তেমনি বোকচন্দর, আত্মীয়স্বজন কেউ এলে কিতাত্থ হয়ে যায় একেবারে! হ্যা— —!'

লক্ষ্মীবাবু বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'তাহলে তো কোনদিন আপনি কেদারঘাটের তপন ভট্‌চার্যিরও নাম করবেন!'

'করবই তো! আলবাৎ করব। আমার যদি বামুন ভোজন কি বিদেয় দেবার অবস্থা হ'ত—আমি আগে ওদের ডাকতুম...কেন, তপন ভটচার্যি কি অন্যায়টা করেছে তাই শুনি? ...না খুড়ি, তুমিই বলো। তুমিও ব্রাহ্মণের বিধবা, নিষ্টেবান ঘরের মেয়ে, তোমার কাছেই আমি বিচের চাই।'...

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে এক ধরনের নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'তপন ভট্‌-চার্যির জ্যাঠতুতো দাদা ঘোর মাতাল, মদ মেয়েমানুষ জুয়ো—কোন গুণ বাদ নেই। আর বৌটো—তাকে এরা সবাই দেখেছে, লক্ষ্মীপ্রীতিমের মতো, শান্ত ধীর নম্রস্বভাব—দেখতে তো অপরূপ সুন্দরী।...অমন বৌ—তা একদিনের জন্যে সুখ পায় নি। মদের

ঘোরে এসে ধরত, এক এক দিন আধমরা ক'রে ছাড়ত।...চোরের মার মেরেছে এটুকু মেয়েটাকে। কী অপরাধ—না বর ভাড়া খাটাতে চাইত, মেয়েটা রাজী হ'ত না। বলেছিল, "নিজের ধম্ম ক্ষইয়ে যদি স্বামীকে খাওয়াতে হয় সে খাওয়াব—যদি কোনদিন অক্ষ্যাম হয়ে পড়ো, যেমন ক'রেই হোক চালাব—কিন্তু তোমার মদের আর জুয়ার খরচ যোগাতে নিজের এহকাল পরকাল নষ্ট করব না। তাতে যা করতে হয় করো"।...

'পাশাপাশি বাড়ি, তপন সবই দেখত, ডাক্তারী পড়ছে ও তখন, ফোর্থ ইয়ার, খুব ভাল ছেলে ছিল, পাস করলে আজ ওর পসার খায় কে!...শেষে যেদিন জোর ক'রে মুচড়ে হাতটা ভেঙে দিলে বৌটার—সেদিন আর থাকতে পারল না, এক ঘুষিতে দাদার নাক ফাটিয়ে দিয়ে বৌটাকে নিজের বাড়িতে এনে তুলল। ও কিছু অলেহ্য করতে চায় নি প্রেথমটায়—কিন্তু, ওর বাড়িতে তো কেউ ছিল না, মা মরে গেছে, বাপ বিদেশে, একটা চাকর আর ছোট দুটো ভাই। এই নিয়ে তুমুল ঘোঁট শুরু হয়ে গেল আপ্তকুটুম মহলে, কী সমাচার, না বৌদি ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, ও তাকে নষ্ট করেছে। শুনতে শুনতে শেষে ধিৎকার ধরে গিয়ে বৌদিকে নিয়ে কাশী চলে এল—নিজের আথের, পৈতৃক সম্পত্তির মায়া ত্যাগ ক'রে। বরটা হুমকি দিতে কাশীতে এয়েছিল, তপন কোতোয়ালীতে গিয়ে ডায়েরী ক'রে এসে আর একটি ঘুষি মারতেই ফিরে চলে গেছে—আর আসে নি।

'তা এই তো বিত্তান্ত। তপনকে তোমরা দেখেছ সবাই। ছোট্ট মুদীর দোকান ক'রে খায়, কারও সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না। বৌটাকে প্রাইভেটে পড়িয়ে দুটো পাস করিয়েছে, তা ইল্‌লিগল্‌ কনেকশ্যন তোমাদের মতে তো—তাই চাকরি পেলে না। বাড়িতে বসে বিনা-মাইনেয় পাড়ার মেয়েদের পড়ায়—অমন পনেরোটা মেয়ে এসে জোটে, সব খাসা খাসা বামুনের ঘরের মেয়ে তারা। তাতে দোষ নেই, তার দোকানে ধারে খেয়ে টাকা ফাঁকি দেওয়ায় দোষ নেই—বামুন ভোজনের নেমন্তন্ন করলেই যত দোষ?...হা আমার কপাল রে!'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ঠাকুর্দা। ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে অনেকক্ষণই, এখন প্রবলবেগে থুথু ছেটকাচ্ছে—সে এক বীভৎস মূর্তি! ওঁর এ চেহারা চেনে সবাই, থামাবার চেষ্টা বৃথা—তবু প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বলতে গেলেন, ঠাকুর্দা সে অবসরই দিলেন না।

বললেন, 'তোমাদের ও পরম নিষ্ঠেবন্ত বামুনও ঢের দেখেছি, ব্রাহ্মণ-কুলচূড়ামণি, শাস্ত্রবাক্য ছাড়া কথা নেই, কথা কইতে গেলে—বিশেষ মুখ্যু মানুষদের সঙ্গে—আদ্ধেক কথা সংস্কৃতয় বলেন, পরগোত্তরে খান না, খুব শুদ্ধাচার, সকালে উঠে পাঁজি খুলে বলে দেন কোন্‌ দিন কি রান্না হবে—ইদিকে দ্যাখো ঘরে ঘরে ব্যভিচার, বুড়ো বয়েস পজ্জন্ত কলির কেষ্ট সেজে বসে আছেন এক একজন—বিধবা ভাজ, ভাদ্দর বৌ, ভাইপো-বৌ, সধবা নাতনী—কেউ বাদ যায় না। এ'রাও শাস্তরবেত্তা বামুন, তাঁরাও এক একটি খড়দর মা-গোসাঁই, এসে তোমাদের যজ্ঞিতে কাঠি দিলে তোমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার একেবারে, ঐ বামুন এসে অং বং চং আউড়ে বিদেয় নিয়ে গেলে তোমরা কিতাথ।...এই তো?...তা খাওয়াও, ঐ সব বামুনকেই খাওয়াও।'

'তা এই কি সব?' লক্ষ্মীবাবু যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন।

ওঁর ঐ মূর্তি দেখে সকলেই যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন।

'তা কেন হবে! নেই কি, ভাল বামুনও আছে। বড় বড় সত্যিকারের পণ্ডিত—কাশীতে যেমন—এমন আর কোথায়? তবে তারা কেউ একপাত নুচি খেতে তোমার বাড়িতে ছুটে আসবে না। এক অধ্যাপক বিদেয় ছাড়া—তারা কেউ বাড়ি থেকে নড়ে না। তাও—অধিষ্ঠান নেওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করে তাই—নইলে একখানা সরা আর দুটো সন্দেশের লোভ তাদের নেই...যাক গে, এসব বলে মুখ নষ্ট, আমার সঙ্গে বাবা তোমাদের মিলবে

না, তোমাদের মতো ফর্দ তোমরা করো।...হ্যা—আমার একপাত জুটলেই হ'ল। হে, হে, হে!'

নিজেই আবহাওয়াটা হালকা ক'রে দেন রমেশ ঠাকুর্দা।

এইবার প্রয়াগবাবুর মা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার ফুরসৎ পান। বলেন, 'তা বাবা, সবই মানছি। কথাগুলো তোমার একটাও মিথ্যে নয়। তবে আমাদের তো সমাজ মেনে চলতে হয়। তোমার ঐ নগে আর তপনকে যদি আমি নেমন্তন্ন করি—আমার কোন আপত্য নেই, সত্যিই তো, যাদের বলব সকলকারই কি চরিত্তিরের হিসেব রাখছি?—তা তো আর নয়—ওরাই না হয় ধরা পড়ে চোর সেজেছে, বলে ধরা পড়েছে জয় মিস্তির উলটো দিকে কাগজ ধরে—তা নয়, বলি তখন অন্য বামুনরা যদি বলে আমরা খাব না ওদের সঙ্গে—তখন কি করব? আয়োজনটাই তো মাটি। আর নেমন্তন্ন ক'রে এনে কিছু বলা যায় না—তুমি ঘরের মধ্যে এককোণে বসে চুপচুপ খেয়ে নাও, কেউ না টের পায়।...বলা যাবে কি?'

'হ্যা——!' বলে শব্দটা টেনে উঠে পড়েন রমেশ ঠাকুর্দা, 'না, সে ঠিক। না, না. তোমার মতো ফর্দ তুমি করো খুড়ি—আমার ও পাগলের কথায় কান দিতে হবে না। তাছাড়া আমার না হয় হ্রস্ব-দীর্ঘ্য জ্ঞান নেই, তাদের তো আছে. তাদের ডাকলেও তারা আসবে না। নাও বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণ, ফর্দ করো তোমরা—আমি চলি। হ্যা——!'

॥ ৬ ॥

দেশ থেকে কেন বেরিয়েছিলেন সেটা জানা হলেও কি ক'রে বেরিয়েছিলেন, এত দেশ থাকতে কাশীতেই বা কেন এলেন—সে কথাটা জানা হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। আমরাও নানা কাজে ব্যস্ত থাকি. ইস্কুল আছে, বাজার আছে, দুধ আনা আছে—ওঁরও সকাল বিকেল চাকরি। কোনদিন একটু ফাঁক পেলে কি দরকার থাকলে—মা ইদানীং ব্রত পার্বণে. অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতে ফলমিষ্টি নিতে কি শিবরাত্রির পারণ করাতে ওঁকেই ডাকতেন—তবে আসতেন. সেও সকালের চাকরি শেষ ক'রে, স্নান সেরে আসতেন একেবারে। বড় জোর এইসব দিনগুলোতে সে পর্বটা একটু সকালে সারা হ'ত এই পর্যন্ত। ভবানীদাকে বলে তাঁকে বসিয়ে উনি চলে আসতেন।

কেবল শিবরাত্রির পরের দিন ভোরবেলাই এসে হাজির হতেন। কারণ তিনিও—অত ক্ষিদেকাতুরে মানুষও—নিরম্বু উপোস ক'রে থাকতেন ঐ দিনটায়। সে জন্যেও বটে, মার কথা ভেবেও বটে—স্নান গায়ত্রী সেরে চলে আসতেন সকালবেলাই। অবশ্য, সেদিন সকালে দোকান বন্ধও থাকত বরাবর। এ ছাড়া কোনদিন হয়ত এমনিও মার খবর নিতে আসতেন—বিকেলে দোকানে বেরোবার আগে, 'কী করছ, অ মেয়ে। বলি আজ একটু খবর নে যাই. কাজ তো বারোমাসই আছে—বলে, না কাজ না কামাই, হ্যা——!'

কিন্তু সেও তো আমাদের ইস্কুলে থাকবার সময়, কদাচিৎ কোন ছুটিটুটির বা হাফ হলিডের দিন ওঁর মর্জির সঙ্গে মিললে তবেই দেখা হ'ত। তাও তখন আড্ডা জমাবার মতো সময় থাকত না।

হঠাৎই একদিন সুযোগটা মিলে গেল।

অন্নপূর্ণা পুজো সেদিন, সুরেশ মুখুজ্জের শাশুড়ীর মানসিক ছিল কাশীতে এসে অন্নপূর্ণা পুজো করবেন। ঘটার পুজো. অনেক লোক খাবে—হালুইকর বামুন আনিয়েছেন সুরেশবাবু কলকাতা থেকে—কিন্তু ভোগ রাঁধার কাজ তাদের দিয়ে হবে না, শাশুড়ীর পছন্দ নয়—ওঁদের বাড়িতেও তেমন কেউ নেই, অগত্যা আমাদের সতীদি ভরসা।

সতীদিরও তাতে কোন আপত্তি নেই। খুব সকালে যেতে হবে, তাও যাবেন। ভোর-

ব্যাটাকে—বুড়ী যে গাড়ি ভাড়া বলে দু'টাকা দিয়েছিল সে দু'টাকা, আমার নিজের তবিল থেকে যে টাকাটা দেবার কথা ছিল সেটাও—মোট তিনটে টাকাই দিয়ে দিলুম। সাধু তো মহা খুশী, আমার মতো পুণ্যাত্মা সত্যবাদী লোক সে আর নাকি দেখে নি—খুব আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল।

'আমি ফিরে এসে রামরতিয়াকে বেশ চিন্তিত মুখেই বল্লুম, "যা বলেছে মহাত্মাজী তা কি তোমার মাজী পারবে? বলেছে যদি বাঁচতে চাও কোন তীর্থে গিয়ে বাস করতে—আর হাজার বার রামনাম জপ করতে, তীর্থে গেলে যমদূতরা ছেড়ে দেবে, রামনামে পাতক কাটবে"।

'আমি ফিরেছি শুনে ডাক্তারবাবুও ডেকে পাঠালেন—"কী ব্যাপার এসব রমেশ?" খুব ভারী আওয়াজ, কিন্তু মুখ দেখলুম তখনও সাদা, কপালে ঘাম। বললুম, নির্ভয়েই বললুম—আমি তো জানি আজই চাকরি ছেড়ে দেব, আমার আর ভয়টা কী?—"মায়ের অসুখ, উনি বলেছিলেন—তাই ঐ সাধুকে ধরে এনেছিলুম, খুব ভারী সাধু—যাকে যা বলেন তাই হয়, বহুলোকের রোগ সারিয়ে দিয়েছেন—তাই মা গাড়ি-ভাড়া দিলেন—আসতে কি চায়—অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ধরে এনেছিলুম। তা—ঐ তো শুনলেন, উনি তো রেগে আগুন হয়ে চলে গেলেন, গাড়ি-ভাড়া অব্দি নিতে চান না"।...

'এই বলে—সাধু যা বলে গেছে সব খুলে বল্লুম। মায় শেষ প্রেসক্রিপশ্যানটা সুদ্ধ। সাহেবের তখন ঘাড় গলা দিয়ে সেই ঠান্ডার দিনেও দরদর ক'রে ঘাম গড়াচ্ছে। বেচারীর অবস্থা দেখে মায়া হ'ল। বল্লুম, "একটা কথা বলব ডাক্তার সাহেব? যদি অপরাধ না নেন তো বলি—যা হয়ে গেছে তা হয়েছে—আজই দিদির কাছে চলে যান, সেখানে গিয়ে ক'দিন থাকুন"।

'ভেবেছিলুম—এই রকম আস্পদ্দার জন্যে কড়া ধমক খাব একটা, কিন্তু তখন অতবড় ডাক্তারটা ছেলেমানুষ হয়ে গেছে একেবারে, সে দিক দিয়েই গেল না, শুধু বল্লে, "তুমি কি বলছ রমেশ, তুমি জান না সে কি ক'রে গেছে। এরপর তাকে ঘরে আনলে, কি সেখানে গিয়ে থাকলে লোকে কি বলবে"?

'আমি আর থাকতে পারলুম না—বুঝলি, বলে ফেললুম, "বাবু, আমি সব জানি, চাকরবাকরদের কি আর কোন কথা জানতে বাকী থাকে? না কি এই শহরেরই কোন বাঙালীর জানতে বাকী আছে মনে করেন। এখন যা বলে তখন তার চেয়ে আর বেশী কি বলবে?......আপনি বড় ডাক্তার—মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে বাড়িতে ডাকবে। বরং ভুলটা শুধ্রে নিলে—দিনকতক পরে ভুলেই যাবে ব্যাপারটা।...তখন বরং বুক ফুলিয়ে চলতে পারবেন এই শহরে"।

'ভেবেছিলুম নিদেন এবার একটা ধমক খাব—কিন্তু দেখলুম—যে ধমক দিতে পারত সে আর নেই। এতটুকু হয়ে গেছে মানুষটা—। চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল চেয়ারের ওপর কাঠ হয়ে। মনে হ'ল যেন কেমন চুপ্সে গেছে ফুটো বেলুনের মতো।

'আমি সেইদিনই ডাঁট দেখিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সবাই খুব ধর-পাকড় করলে—বুড়ী, রামরতিয়া, বলিরাম, মায় খোদ ডাক্তার সায়েব পর্যন্ত।...আমি বল্লুম, "না, এত অনাচারের বাড়িতে আমি আর থাকব না, বামুনের ছেলে না জেনে যা করেছি, করেছি—আর নয়।" বলিরামকে বল্লুম, "ভাই, তুমি বলেছিলে—কিন্তু আমি অতটা বিশ্বাস করি নি—এখন মহাত্মার কাছে শুনে বিশ্বাস হ'ল। মাপ করো—আমি মছলীখোর বাহ্মন ঠিকই—তবু এ পাপের ভাত আর না"।

'তারপরও ক'দিন লক্ষ্মৌ ছিলুম, চার-পাঁচদিন, শুনেছি, সাহেব সেই দিনই সুন্দর-বাগে বৌয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন—আর এ বাড়ি আসেন নি। তারপরও খবর পেয়েছি—মাগী অনেক কান্নাকাটি ক'রেও জামাইয়ের মন গলাতে পারে নি আর। তখন রাম-

রতিয়াকে নিয়ে পৈরাগে চলে এসেছে। কাশীতে আসতে সাহস করে নি, বেস্তর চেনা লোক, আপ্ত-কুটুম!......ওর হাতেও ঢের টাকা ছিল, জামাইও শুনেছি মাসোহারা দিত। তবে বেশীদিন নাকি বাঁচেও নি—ওদের অব্যাহতি দিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।'

এই বলে দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে, নিঃশব্দে খুব খানিকটা হেসে নিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। কৃতিত্ব ও কৌতুকের হাসি।

॥ ৯ ॥

উনিশশো বাইশ সালে আমরা কাশী থেকে কলকাতায় চলে এলুম—বলতে গেলে চাটি-বাটি তুলে। রমেশ ঠাকুর্দার সঙ্গেও সেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। প্রথম প্রথম দু-একখানা চিঠি আসা-যাওয়া করেছে—তার পর উভয়পক্ষেই উৎসাহ গেছে কমে। রমেশ ঠাকুর্দার যা অবস্থা, এক পয়সার পোস্টকার্ড দেওয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। চিঠি লেখার তেমন অভ্যাসও ছিল না তাঁর—তাই আমরা চিঠি দিলেও তার জবাব পেতে তিনমাস লাগত। ফলে আমাদের চিঠি দেওয়াও কমে গেল। অন্য দু-চারজন পরিচিত লোকদের চিঠিতে যা জানা যেত ওঁদের খবর। কিন্তু সে চিঠিও কমে এল ক্রমে। প্রথম প্রথম যে বিচ্ছেদ অসহ বলে মনে হয়—কিছুদিন পরে আর তার কথা মনেও থাকে না।

ঠাকুর্দার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল একেবারে উনিশশো বত্রিশ সালে। তখন আমি অকালে কলেজ ছেড়ে কিছু কিছু রোজগারের চেষ্টায় জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চেষ্টা করছি তার কোন একটা নিরাপদ কূলে চিরদিনের মতো ভাগ্যের নৌকোটা ভেড়ানো যায় কিনা।

সত্যিই অনেক ঘাটের জল খেয়েছি সেই বয়সেই। অর্থাৎ অনেক কিছুই করেছি—সামান্য দুটো চারটে টাকার জন্যে। সেই রকমই একটা ঠিকে কাজে কাশী গিছলুম সেবার। শুধু কাশী কেন—সারা উত্তর প্রদেশই ঘোরার কাজ—তখন অবশ্য সংযুক্ত প্রদেশ বলত, ইংরেজীতে ইউ. পি. (এখনও তাই বলে)। এক প্রকাশকের পাঠ্য বই নিয়ে স্কুলে ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ঘুরতে হবে—পাঠ্য করার চেষ্টায়। একমাসের মতো কাজ।

সেটা বৈখাশ মাস তখন। ওদেশে গরমের মুখেই সেসন শেষ হয়। গরমের ছুটির পর নতুন ক্লাসের শুরু। ঐ কাজ নেওয়ার মূলে আসল টানটা ছিল বাল্যের বহু স্মৃতি-জড়িত কাশীর এবং সে কাশীর মধ্যে আবার ঠাকুর্দার টানটাই বেশী। কৌতূহলই. টান বলা হয়ত ভুল হবে—কেমন আছেন তিনি, ঠিক সেই রকমই কি? আদৌ আছেন কিনা তাই বা কে জানে!

গিয়ে দেখলাম—আছেন, তবে সে মানুষ আর নেই। ভেঙ্গে পড়েছেন একেবারে। আর একদমই খাটতে পারেন না। সারা জীবন দেহটাকে অবহেলা ক'রে এসেছেন. দেহ তার শোধ তুলছে এবার। বয়সও অবশ্য ঢের—ঠাকুর্দা নিজেই বলেন প'চাত্তর-ছিয়াত্তর। সেই সঙ্গে এও বলেন যে আরও বেশী হতে পারে। বয়সের নির্ভুল হিসেব তাঁর নেই। বাবা জানতেন, তা বাবার সঙ্গে তো দীর্ঘকাল—পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—জন্মদিন বা মাস বছর কিছুই জানার উপায় নেই।

সেই বাড়িতেই আছেন, লক্ষ্মীবাবুর সেই ঘরে। কোথায়ই বা যাবেন। চাকরিবাকরি আর করতে পারেন না. সে কয়লার দোকানও উঠে গেছে। উনি ছেড়ে দিতে ভবানীদাও দোকান তুলে দিয়ে উত্তর কাশীতে চলে গেছেন, সন্ন্যাস নেবার মতলবে।

এবার দেখলাম সতীদিই সোজাসুজি সংসারের ভার নিয়েছেন। কোথায় একটা ঠিকে রান্নার কাজ করেন. সকাল ছটায় চলে যান, নটা সাড়ে নটায় ফেরেন। আবার বিকেলে পাঁচটায় যেতে হয়—ফিরতে রাত আটটা সাড়ে আটটা। শুকো দশ টাকা মাইনে। এতে

ক'রে ওঁর অন্য বাড়তি কাজ অনেক কমিয়ে দিতে হয়েছে—যজ্ঞিবাড়ির বা পুজোআর্চার কাজ। কিন্তু উপায়ও নেই। অনিশ্চিতের ওপর ভরসা ক'রে বসে থাকা যায় না—একটা বাঁধা আয় দরকার। আগে তবু—যত কম মাইনেই হোক—ঠাকুর্দার চাকরি একটা ঠেকো ছিল—একটা ভরসা। এখন আর এ ধরনের কাজ নেওয়া ছাড়া উপায় কি? তবু তো এটা পেয়েছেন। বেশির ভাগই দিনরাতের লোক চায়। যেখানে কাজ করছেন তাদের লোক কম, স্বামী আর স্ত্রী, খাওয়ারও তেমন কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

ঝঞ্ঝাট দেখলুম সতীদির বাড়িতেই বেশী। কাজ আগের থেকে অনেক বেড়েছে। ওখান থেকে ফিরে রান্না করতে হয়, বাসনমাজা থেকে শুরু ক'রে ঘরের যাবতীয় কাজ তো আছেই—তার ওপর চেপেছে স্বামীর পরিচর্যা। ঠাকুর্দা ইদানীং একটু যেন অথর্বই হয়ে পড়েছেন। ভোরে উঠে কোমরে তেল মালিশ ক'রে দিলে তবে বিছানা ছাড়তে পারেন। সতীদি শীতের দিনে সকাল বেলাই বাগানে গামছা চাপা দিয়ে এক বালতি জল রেখে যান। সেটা রোদে গরম হয়ে থাকে। কে বলেছে রৌদ্রপক্ক জলে স্নান করলে শরীরে বল হয়—তাই এ ব্যবস্থা। বাইরে থেকে এসে উনুনে আঁচ দিয়েই বুড়োকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে নিজে কাপড় কেচে বা স্নান ক'রে নেন—যেদিন যেমন।

এই স্নানটার পর বৃদ্ধ অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। খুটখাট একটু ঘুরেও আসেন কোন কোন দিন, এর কাছে ওর কাছে। বাজার যেতে হয় না—চাকরি সেরে আসার পথেই যা হোক একটু আনাজ কিনে আনেন সতীদি দু'এক পয়সার। দৈবাৎ কোনদিন সিধে পেলে তো কথাই নেই, তাতেই দু'তিনদিন চলে, তবে সেটা আজকাল দৈবাৎই হয়ে উঠেছে। উনি বাঁধা পড়েছেন, যুগের হাওয়াও পালটেছে।...

কাশীর টানটা বেশী ছিল বলেই ওটা শেষের জন্যে রেখে দিয়েছিলুম। ধরে ছিলুম আগ্রা থেকে, ওদিকের শহরগুলো সারতে সারতে কাশী পৌঁছলুম। এখানে চার-পাঁচ-দিন বিশ্রাম নিলে ক্ষতি নেই। কাজের কথা যা, কোম্পানীকে লিখে দিয়েছি—আমার কর্তব্য শেষ।

এঁদের বর্তমান অবস্থার কথা কাশীতে পৌঁছে অনেকের মুখেই শুনেছিলুম। তাই দুদিনই দেখা করতে গেছি একটু বেলা ক'রে—নটা নাগাদ। বসে গল্প ক'রে এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরেছি। দ্বিতীয় দিন সতীদি জোর ক'রেই একগাল ভাত খাইয়ে দিলেন। ওঁর হাতের অমৃততুল্য রান্না—না-ও বলতে পারলুম না। মাসখানেক ধরে হোটেলে খাচ্ছি, ওঁর টক দেওয়া মটর ডাল, বেগুন ভাজা আর পোস্তচচ্চড়ি খেয়ে মুখটা ছাড়ল।

সেদিন আসবার সময় সতীদি চুপি চুপি একটা অনুরোধ করেছিলেন, 'যদি এর মধ্যে সময় পাস ভাই—বিকেলে এক-আধদিন আসিস্ একটু। আমি পাঁচটায় বেরিয়ে যাই—সারা সন্ধ্যেটা বুড়ো একা বসে হাপু গেলে। এত পড়ার শখ—তা চোখে তো ভাল দেখতে পায় না আজকাল, দুপুর ছাড়া ছাপার হরফ পড়তে পারে না। আমি বেরোতেও দিই না—চোখে কম দেখে, তাছাড়া বিকেলের দিকটায় কেমন যেন জবুথবু হয়ে পড়ে—একা বেরিয়ে কোথায় এক্কা চাপা পড়বে কি টাঙ্গায় ফেলে দেবে, আজকাল আবার রিক্সা হচ্ছে—বড় ভয় করে।...শরীরটা ওর একেবারে ভেঙ্গেছে। তাও এই গরমের দিনে দেখছিস, তবু একটু মানুষের মতো—শীতে যেন জন্তু হয়ে যায় একেবারে। এ ঘরটাও হয়েছে তেমনি তিনদিক বন্ধ, এক এই পুবদিক খোলা, সকালে যা একটু রোদ আসে—কিন্তু সে তো এই দালানটুকু। ঘরে তো যায় না একফোঁটাও। দুপুরবেলা ঐ বাগানে গিয়ে বসে থাকে—আমি আবার ঘরে তুলে দিয়ে কাজে যাই—!'

বলতে বলতেই গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল সতীদির।

'তাই তো নিত্যি মা অন্নপূর্ণাকে জানাই, বুড়ো যেন আমার কোলে যায়। নিজের

বৈধব্য কামনা কেউ করে না, কোন হিন্দুর মেয়ে করে না অন্তত—কিন্তু আমি করি। আমি জানি আমার দিন একরকম ক'রে কেটেই যাবে—আমি গেলে বুড়োর হাড়ির হাল। ঐ অথব্ব মানুষ, পয়সার জোর নেই, মেজাজও ভালো নয়, খারাপ রান্না একটু মুখে রোচে না—কে দেখবে ওকে?...তোরা বল্ একটু, বাবা বিশ্বনাথকে জানা—আমার এই প্রার্থনাটুকু যেন শোনেন।'

তাঁর কথামতোই একদিন সন্ধ্যের একটু আগে গিয়ে পড়লুম। ছটা বেজে গেছে তখন, সতীদি কাজে চলে গেছেন অনেকক্ষণ। বৃদ্ধ বাইরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সেই জলচৌকিটার ওপর বসে, পাশে লম্প হুঁকো আর সাজানো চার-পাঁচটা কল্‌কে। বুঝলুম সতীদিই সব গুছিয়ে রেখে গেছেন—না উঠে খুঁজতে হয়। বোধহয় এই চৌকিটাও পেতে নিজে সযত্নে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

ঠাকুর্দা আমাকে দেখে মহাখুশী। বললেন, 'হ্যা——। বললে বিশ্বাস করবি নি, বসে বসে তোর কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম যদি এসে পড়তিস তো ভাল হ'ত। বোস্ ভাই বোস্—কোথায়ই বা বস্‌বি—দ্যাখ ঐ ওদিকে একটা টুল আছে বোধহয়, খুঁজে পাস কিনা—'

'থাক থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। টুল তো এই সামনেই রয়েছে। বসছি আমি।'

ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধ নিজেই উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি জোর ক'রে আবার বসিয়ে দিলুম। তারপর একথা সেকথা—খুচরো আলাপ হ'ল কিছু। আমি কতদিন আর থাকব কাশীতে, ভালরকম একটা চাকরি-বাকরির কতদূর, দাদাদের বিয়ের কোন কথা হচ্ছে কিনা—এই সব।

সাধ্যমতো সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি আমার কথাটা তুললুম, ক'দিন ধরেই মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা প্রবল হয়ে আছে। আগেও দেখে গেছি—তবু সার্থকনামা সতীদির এখনকার স্বামী-সেবার বোধ করি কোন তুলনা নেই কোথাও। পুরাণের সতীও এই স্বামীর এমন সেবা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। শিবের মতো স্বামীর জন্যে দেহত্যাগ করা কি অপর্ণা হয়ে তপস্যা করার অর্থ বোঝা যায়—রমেশ ঠাকুর্দার কি আছে? না রূপ, না গুণ, না বিদ্যা—না আর্থিক সঙ্গতি।

সেই কথাটাই তুললুম সরাসরি। বললুম, 'আচ্ছা ঠাকুর্দা, সতীদির এত প্রেম কিসের? কী দেখে এত মজে ছিলেন যে, এখনও সেই প্রথম প্রেমের নেশা কাটে নি—এখনও তাতেই মশগুল হয়ে আছেন!'

প্রশ্নটা ভারি ভাল লাগল ঠাকুর্দার। ঐ মুখচোখও আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুব খানিকটা হাসলেন দন্তহীন মুখে হ্যা—হ্যা—হ্যা ক'রে। তারপর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'হুঁ—হুঁ বাবা, এর অথ আছে। অমনি কি হয়। অথ আছে!'

'সেই অর্থটা কি তাই তো জানতে চাইছি।'

'প্রেম কি এমনি হয় রে। মেয়েরা পীরিতে পড়ে পুরুষ দেখে। অর্জুনের পেছনে অতগুলো মেয়ে ঘুরেছিল কেন? দেখতে তো কালো ভূত ছিল। অাঁখিশ্যি হ্যাঁ, মন্দাটে মেয়েছেলে যারা—তারা একটু মেয়েলি ধরনের বেটাছেলে পছন্দ করে। তবে সে আর ক'টা?'

'তা আপনার ঠাকুর্দার খুব পৌরুষ ছিল বলে তো মনে হয় না। আপনিই তো বলেন শরীর আপনার কখনও তেমন ভাল ছিল না—কতকটা চিররুগ্ন। আর চেহারা তো এই —তালপাতার সেপাই!'

'হুঁ—হুঁ—তবু ও বৌ আমার বীর্যশুল্কেই জিতে নেওয়া। হয় না হয় তোর ঠানদিকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখিস!'

'বীর্যশুল্কে জেতা? আপনার? সে আবার কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'হুঁ-হুঁ' 'হুঁ-হুঁ' ক'রে কৌতুকের হাসি হাসেন ঠাকুর্দা। মনে হয় অনেক দিন পরে ভারি রস পেয়েছেন মনে মনে। কোন দূর মধুর স্মৃতি সেই অতীতের বর্ণময় ইতিহাস বয়ে এনেছে আমার প্রশ্নে। আনন্দের দখিণা বাতাস বইয়েছে।

'ঐ তো বাবা, ভাবছ বুড়োটা চিরকালই এমনি ছিল। হুঁ-হুঁ! হুঁ-হুঁ!'

দুলে দুলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসেন রমেশ ঠাকুর্দা।

আমি টুলটা কাছে টেনে এনে—যাকে বলে দৈহিক অর্থেই—চেপে ধরি ওঁকে। দুই হাত ধরে বলি, 'ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুন ঠাকুর্দা, দোহাই আপনার—দুটি পায়ে পড়ি!'

'এই দ্যাখো, পাগল কোথাকার। এর জন্য আবার এত ব্যগত্তা করারই বা কি আছে। বলব না কেন—বলতে কোন বাধা তো নেই, কোন অসৎ কাজ তো করি নি। আর কে-ই বা জানতে চাইছে এ কথা, এর দামই বা কি। এক পথের ভিখিরী বুড়ো মুখ্যু বামুন আর তার এক পাগল বামনীর গল্প—এই তো!'

তারপর ওরই মধ্যে একটু সোজা হয়ে বসে একবার গলা-খ্যাঁকারি দিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন ঠাকুর্দা তাঁর কাহিনী।

॥ ১০ ॥

'মটরাকে তো জানিস। পাঁড়ে-হাউলীর মটরা?...তুইই তো বলছিলি না সেদিন তার কথা? বিয়োলো বোনটাকে ক'টা টাকার জন্যে সাধুর কাছে বেচে দিয়েছিল—সাধুটা ভাল তাই মেয়েটা বেঁচে গেল, খান্‌কী খাতায় নাম লেখাতে হ'ল না।...মটরাটা ছিল পুরুষ বেশ্যা, আগে মদনপুরার এক অল্পবয়িসী মহাজনের কাছে যাতায়াত করত—সে ছোকরার দেদার পয়সা, বাপের মস্ত কারবার বেনারসী শাড়ির, খুব পয়সা যোগাত। তারপর সে অন্য ছেলে একটাকে ধরলে, তাতেই মটরার অত হাত-খাঁকতি, পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াত, নেশার পয়সায় টান পড়লে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না।

'যাক গে, যা বলছিলুম, মটরাকে কে প্রেথম বকায় জানিস? তুলসে গুণ্ডা। যখন খুব ছোট, একরত্তি ছেলে—তখনই ওর বারোটা বাজিয়ে দেয় একেবারে। পঞ্চরঙের নেশায় পাকা ক'রে ছেড়ে দেয়। তুলসেও বামুনের ঘরের ছেলে, কিন্তু সে বেটা ছিল মহা বদ। অমন সাংঘাতিক লোক, অত অল্প বয়সে অত বদ আমি আর দুটি দেখি নি। মেয়েছেলের কারবারই ছিল ওর প্রেধান আয়ের রাস্তা। বিশ্বনাথের শিঙ্গারের দিন কি শিবরাত্রির দিন, মানে রাত্তিরে যেদিন ভিড় হবে—সেই সব দিনে দেদার মেয়ে চুরি করত ও, ঐটেই ছিল যাকে তোরা বলিস এস্‌পেসালিটি।

'অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বেটার, তা মানতেই হবে। ঐ তো দেখেছিস বিশ্বনাথের গলি—সরু গলিতে অমন হাজারো লোক—তারই মধ্যে, অতগুলো লোকের চোখের সামনে দিয়ে, চোখের নিমেষে উধাও ক'রে নিত। দ্যাখ দ্যাখ—আর দ্যাখ! আশপাশে যেসব বাড়ি আছে, মন্দিরের দরজা—পিছু নিয়ে এসে ঠিক মওকা পেলেই ঢুকিয়ে দিত। দলের লোকরা ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে খাড়া থাকত, প্রত্যেককে মোটা মোটা টাকা দিয়ে হাত ক'রে রাখত—পুজুরী পাণ্ডা থেকে শুরু ক'রে চাকর দারোয়ান, যেখানে যেমন।

'এই সব মেয়েছেলে নিয়ে বেশির ভাগ সাধু-মোহান্তদের সাপ্লাই করত তুলসে। নতুন ঘোড়াকে ব্রেক করায় জানিস? মানে প্রেথমটা তো বুনো থাকে—বাগ মানতে চায় না, লাগামের ইশারা বোঝে না। সেই সব শিখিয়ে পড়িয়ে বাগ মানিয়ে নেওয়াকে বলে ব্রেক করা। তুলসেও অমনি দিনকতক কাছে রেখে ব্রেক ক'রে বাইরে বেচত। বড় বড় মোহন্তরা সব, গেরুয়া পরে থাকেন, বিয়ে করতে নেই, মেয়েমানুষের বাড়ি যাবেন সে উপায়ও নেই—জানাজানি হয়ে যাবে; ধর, কেউ গেরুয়া পরে ডাল্‌কামণ্ডীতে যাচ্ছে—চারিদিকে তো

হৈ হৈ পড়ে যাবে! অথচ ওদের এত পয়সা—এত সুখে ভোগে থাকে—প্রবৃত্তি খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সবই ভোগ হচ্ছে যেকালে—মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ভোগ সেটাই বা বাদ থাকে কেন? ওদেরই ঝোপ বুঝে কোপ মারত তুলসে। টাকার অভাব নেই তো। মোটা টাকাই দিত। গোপনে, কেউ জানতে পারবে না, কেচ্ছা কেলেঙ্কার হবে না—এমন ভাবে সবাই দিতে পারে না, তুলসে পারত।'

একটু থেমে—আমার তাড়নায় খেই-হারিয়ে-যাওয়া সূত্র আবার খুঁজে নিয়ে—কাহিনীটা পুরোপুরিই বললেন ঠাকুর্দা।

তুলসে নাকি এ লাইনে একেবারে চোস্ত ছিল। পুলিসের বড় সাহেব থেকে শুরু করে—যাকে যাকে পুজো দেওয়া দরকার সবাইকে টাকা দিয়ে জমিয়ে রাখত। কেউ কিছু দেখেও দেখত না তাই। নইলে চারদিকে পুলিস পাহারা—শিঙ্গারের দিন বিশেষ ক'রে—তার মধ্যে থেকে দুটো তিনটে মেয়ে পাচার করত তুলসে ফি বছর। এর মধ্যে কিছু কিছু বাইরেও চালান দিত। এ কারবার অনেকেই করে—বিহারে, পাঞ্জাবে, ভূপালে বহু এমন কারবারী আছে—তাদের অনেকের সঙ্গেই নাকি ওর যোগাযোগ ছিল।

রীতিমতো কারবার যাকে বলে। দেখতে দেখতে ডাক-বদলের মতো হাত-বদল হয়ে বহু দূরে চলে যেত। বাঙালীর মেয়ে কাবুল বাসরা আফ্রিকা আরব থেকে শুরু করে ওদিকে আরাকান বর্মা পর্যন্ত চলে যেত—কোথায় কোথায় না ছিল ওর লোক—মেয়েগুলো ইহজীবনে আর দেশভুঁই আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পেত না।...

হাজার হাজার টাকা নাকি রোজগার করত তুলসে ওই কাজ ক'রে। এমন ব্যাপার—অনেক ভালোমানুষ ভদ্র লোকও ওকে প্রশ্রয় দিত, বিপদ আপদ সামলাত। হীরু কাঁসারীও তার ভেতর একজন।

হীরু কাঁসারী! নামটা শুনে আমিও চমকে উঠেছিলুম। সে এর মধ্যে? তাকে তো ভাল লোক বলেই জানতুম। দান-ধ্যান ঢের, যথার্থ পরোপকারী—প্রতাপও খুব, কাশীর তাবড় তাবড় লোক হীরুর কথায় ওঠে-বসে, খোদ অন্নপূর্ণার মোহান্ত ওর বন্ধুর মতো—অথচ সে-ই নাকি চিরকাল তুলসেকে মদৎ দিয়ে এসেছে। সময়ে অসময়ে টাকা দিয়ে, বিপদে আপদে ওপরওলাদের ধরে তাল সামলেছে।

'আসলে টাকা'—ঠাকুর্দা বল্লেন, 'আমার যা মনে হয়। তুলসের কারবারে ওর ভাগ ছিল নিশ্চয়, এই দিকটা দেখত কারবারের—কিছু কিছু ভাগও পেত। টাকার জন্যে মানুষ কী না পারে!'

'যাকগে মরুকগে—কার ভেতর কি আছে কেউ বলতে পারে না। ঠিক না জেনে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। যা বলছিলুম, তুলসের কথা। রোজগার করত ঢের, তেমন তেমন মাল পেলে এক চালানেই পাঁচ-সাত-দশ হাজার পর্যন্ত লুটে নিত—কিন্তু এসব রোজগারের টাকা তো থাকে না। ঐ যে বলে না—চিৎপাতের ধন উৎপাতে যায়—কথাটা খাঁটি সত্যি। তাছাড়া ওর খরচও ছিল ঢের, নিজের নেশাভাঙ তো ছেড়েই দাও; বাঁধা মেয়েই ছিল দুটো,—এমনি মাইনে করা লোকও পুষতে হ'ত একগাদা। ঐ দে'ড়শিকে পুল—ওর কাছেই—একটা গোটা বাড়িই ভাড়া করা ছিল তুলসের, বাইরে থেকে তালা-চাবি দেওয়া, জানলা বন্ধ—যাতে দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি—তার ভেতর চাকর ঝি বাঁধা গুণ্ডা, এক গাদা লোক থাকত। রীতিমতো একটা—ঐ যে কী বলিস তোরা—এস্টাবলিশমেণ্ট।'

আমি চুপ ক'রেই শুনছিলুম—একটু বাধা দিতে হ'ল এবার। জিজ্ঞেস করলুম, 'দে'ড়শিকে পুল—মানে বিশ্বনাথের গলি? এক্কাওলারা তো ঐ অব্দি যায়। আজকাল রিক্সা হয়েছে তারাও বলে দে'ড়শিকে পুল, কিন্তু যায় তো দেখি ঐ বিশ্বনাথের গলির মোড় পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ রে—ঐখানে যে সত্যিই পুল ছিল একটা। আসলে এখন যেটাকে তোরা দশাশ্বমেধ রোড বলিস, ওখানে একটা নদী ছিল। কাশীধামে যেমন তেত্রিশকোটি দেবতা আছেন, তেমনি সমস্ত তীর্থও। সর্বতীর্থময়ো কাশীঃ। ঐখানে যে নদী ছিল তাকে বলত গোদাবরী, মাড়ুয়াড়ী—ঐ যে এক্কাওয়ালাগুলো চেঁচায় "মাড়ুয়াড়ি মাড়ুয়াড়ি" বলে—সেইখান থেকে সোজা এসে দশাশ্বমেধে পড়ত নদীটা। তখন ঐখানে মন্দিরে যাবার পথে একটা পুল ছিল, তাকেই বলত দেঁড়শিকে পুল। সে বহুকালের কথা অবিশ্যি—আমিও সে নদী দেখি নি—শুনেছি। সে নদীও নেই, পুলও নেই কিন্তু নামটা থেকেই গেছে—দেঁড়শিকে পুল।

'এমন বহু জায়গা আছে। মণিকর্ণিকা যেতে যে বরমনালা পড়ে—এখনকার যেটা চকথানা—তার সামনে দিয়ে সোজা যে গলিটা মণিকর্ণিকা পর্যন্ত চলে গেছে—ওখানেও একটা নদী ছিল, ব্রহ্মনালা বলে, কাশীখণ্ডে তার উল্লেখ আছে। এখন আর সে নদী নেই, নামটা আছে। মণিকর্ণিকা শ্মশানের ওপরদিকে যে জায়গাটা, তাকেই এখন ব্রহ্মনালা বা বরমনালা বলে। ওখানে পোড়ানোর ভারী কদর, তবে যাকে-তাকে পোড়াতে দেয় না। ওখানে পোড়াতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম লাগে।'...

বলতে বলতে যেন একটা ঘোর লাগে তাঁর চোখে, চুপ ক'রে যান একটু, তারপর নিজেই আবার একটু হেসে প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন, 'দ্যাখ্—কোথা থেকে কোথায় চলে এলুম। কী যেন বলছিলুম, তুলসের ঐ আপিস্ বাড়ির কথা! আপিস বাড়িই বলতে হয়, আর কি বলব বল? বিশ্বনাথের গলির উল্টো দিকে যে ভূতেশ্বরের গলিটা—কামরূপ মঠের দিকে চলে গেছে, ওর যে দিকে লালগোলার বাড়ি, তার পেছনেই ছিল ঐ আড্ডা। যা বলছিলুম, এই সব নানা ব্যাপারে তুলসের হাতে টাকা কখনই জমত না। যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়ে যেত। কাজেই কারবার চালু রাখতেই হ'ত। একবার ঐ শিঙ্গারের রাত্তিরেই এক উকীলের বৌকে সাফ করতে গিয়ে প্যাঁচে পড়ল। উকীলের বৌ কি কার বৌ তা তো আর জানে না। সুন্দর মেয়ে দেখেছে এই পর্যন্ত, ওর যা দরকার। সে উকীলটা খুব বুদ্ধিমান। সে প্রেথমটা একটু খোঁজাখুঁজি করার পর পাণ্ডাদের বাঁকা হাসি দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিল। আর একদম সোরগোল করে নি, ছুটোছুটি চেঁচামেচি পুলিসে খবর দেওয়া—কিছু না। সেও টাকা ছাড়তে লাগল। টাকায় কি না হয়। পাণ্ডাদের টাকা খাওয়াতেই খবর বেরোল। তার থেকে ওর চেলা-চামুণ্ডাদেরও হদিস পাওয়া গেল, তাদের কিছু খাওয়াতেই সব খোঁজ মিলল।'

তখন সে উকীলবাবু নাকি থানায় গেলেন। সেখানে গিয়ে পরিচয় দিলেন—এলাহাবাদের পুলিস সাহেবের ভাই, নিজেও বড় উকীল। পরিষ্কার বললেন, 'এ আমি সহজে ছাড়ব না, আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না করেন—আপনারাই বিপন্ন হবেন।' অগত্যা তাদের দলবল নিয়ে বেরোতে হ'ল—আর চোখ বুজে বসে থাকতে পারল না। উকীলবাবু পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ঐ বাড়িতে। ঠাকুর্দা বললেন, 'বাড়িটা থেকে বেরোবার পথ ছিল দুটো। ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পাশের বাড়ি থেকেও নামা যেত। সে সব খবর নিয়ে উকীলবাবু আগেই সেখানে লোক মোতায়েন রেখেছিল। একেবারে যাকে বেড়াজাল বলে। পুলিস গিয়ে দোর ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখল, চারতলার একটা ঘরে মেয়েটাকে মাজম্ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখেছে। অত্যোচারের চিহ্ন স্পষ্ট।

'এমনই কপাল তুলসের, সেদিন সেও ওখানে ছিল। খাপসুরৎ মাল পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারে নি—নইলে তার তখন দু নম্বর মেয়েমানুষের বাড়ি লঙ্কায় থাকবার কথা। হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে। সে বিরাট মকদ্দমা হয়েছিল। তুলসেকে বাঁচাবার জন্যে কম চেষ্টা করে নি ওর পেট্রনরা, হীরু কাঁসারী নাকি হাজার হাজার টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু উকীলবাবুও জবরদস্ত লোক, সাক্ষী প্রমাণ এমনভাবে সাজিয়ে

ছিলেন যে কোন হাকিমই তারপর খালাস দিতে পারে না। ঐ বাড়িতে যারা এতকাল তুলসের নিমক খেয়েছে—তাদের দিয়েই, কাউকে ঘুষ দিয়ে, কাউকে ভয় দেখিয়ে সাক্ষী দেওয়াল। সমস্ত কুকীর্তির কথা বেরিয়ে গেল তাদের মুখ থেকে—কাগজে কাগজে লেখালেখি। হয় একগুণ তো লোকে বলে দশগুণ তা তো জানিসই। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। নিহাৎ এদের তরফ থেকেও খুব তদ্বির হয়েছিল বলে অল্পে অব্যাহতি পেলে —চার বছরের জেল হয়ে গেল তুলসের।'...

এই পর্যন্ত বলে ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন ঠাকুর্দা।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর কেমন যেন অসহায় ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলুম যেন—?'

খেই ধরিয়ে দিতে আবার শুরু করলেন বলতে।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে আর এসব কাজে নামতে সাহস করে নি তুলসী। পুলিসের ভয় তো আছেই—তাছাড়া দলবল যারা ছিল, তারা এদিকে ওদিকে ছিটকে গেছে—নিজের মতো ক'রে খাচ্ছে। তাদের কেউ-ই আর ঘেঁষ দিল না তুলসেকে। যে সব পেট্রনরা টাকা যোগাত এত কাল—হীরু কাঁসারীর মতো লোক, তাদেরও শিক্ষা হয়ে গেছে। কাগজে ওদের নাম বেরিয়েছিল। যদিও ধরা-ছোঁয়ায় ফেলতে পারে নি বলে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল—'তবু ভাল ঘোড়ার এক চাবুক' ঠাকুর্দার ভাষায়, ওদের চৈতন্য হয়েছিল ঐ একবারেই। তারা আর কেউ ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজী হ'ল না। হীরু কাঁসারীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'লে নাকি চিনতে পারে নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এমন কি পুরনো মেয়েমানুষদের কাছে গিয়ে জানল—তারাও অন্য বাবু ধরেছে। কী করবে, তাদেরও তো চলা চাই।

তুলসেরও আর কোন পথ ছিল না রোজগারের—খারাপ পথ ছাড়া। লেখাপড়া শেখে নি যে চাকরি-বাকরি করবে, বামুনের ছেলে পুজোপাঠ ক'রে খাবে—কে দেবে ঐ নাম-জাদা খুনে গুণ্ডাকে ঠাকুরের পুজো করতে! আর যে এতকাল নবাবী ক'রে এসেছে সত্যিই সে কিছু মুটেগিরি ক'রে খেতে পারে না। ঠাকুর্দার ভাষায়, পাপে যে গলা পর্যন্ত নেমেছে—পাপের পথ ছাড়া তার কর্ম নয়। মানে সাধারণ মানুষের পক্ষে, বাল্মীকি একজনই হয়। সে হওয়া সহজ নয় বলেই তাঁর কথা সকলে মনে রেখেছে। তাঁর নাম প্রবাদ হয়ে গেছে। তাছাড়া তুলসের মাথাটাই ছিল অন্যরকম—দৃষ্টিটা ছিল বাঁকা, সোজা পথ দেখতে পেল না কোনদিনই।

'এবার সে আরও জঘন্য পথ ধরল।' হুঁকোটা সাবধানে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে বললেন ঠাকুর্দা, 'বিয়ে করব বলে গরিবের মেয়ে খুঁজে বার করতে লাগল। বাইরেকার মেয়ে সব—ধর, গোরখপুর ছাপরা কি বালিয়া জেলার ছোট শহর কি গ্রামে যে সব বাঙালী পরিবার আছে তারা মেয়েদের বে দিতে পারে না। এক জায়গায় হয়ত ঐ এক ঘরই, সরকারী চাকরি নিয়ে গেছে। এমনিও জমিজমা নিয়ে থাকে—এমন অনেক আছে অনেক জায়গায় ; ওসব দেশে মহকুমা শহরেই হয়ত মোট সাত-আট ঘর বাঙালী, তার মধ্যে দু-তিন ঘরের বেশি বামুন বেরোবে না, তাও আমাদের খিটকেল তো কম নয়—রাঢ়ী আছে, বারেন্দর আছে, শ্রোত্রীয়, বৈদিক, তার মধ্যে আবার দাক্ষিণাত্য বৈদিক—শুদ্ধ শ্রোত্রীয়—কত বলব? কাজেই পাত্তর পাবার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। দেশভুঁই —নিজেদের জাতঘর থেকে অত দূরে কে ওদের জন্যে পাত্তর খুঁজবে? ফলে একো একো মেয়ে দ্যাখো বুড়িয়ে যাবার যোগাড় হয়, তবু বে হয় না।'

তুলসে চারদিকে লোক লাগিয়ে ঐসব মেয়েদের খবর নিতে লাগল। কোথায় কোন্ গ্রাম, স্টেশন থেকে হয়ত সতেরো আঠারো মাইল দূরে—বয়েলগাড়ি ক'রে যেতে হয়। সেখানে ঐ একটিই বাঙালী পরিবার আছে—সেইখানে লোক লাগিয়ে, অপরের জবানীতে

চিঠি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে লাগল। তারা তো একে চায় আরও পায়। কাশীতে নিজের বাড়ি আছে, ছেলে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করে, চেহারা ভাল, সঘর—এর চেয়ে ভাল আর কি তারা আশা করবে—'খোট্টার দেশের' বাঙালী মেয়ে? বেশী খোঁজ-খবর নেওয়া তাদের সম্ভব নয়—আর সবচেয়ে বড় কথা, ঘাড় থেকে 'থুবড়ি' মেয়ে নামলেই তারা বাঁচে। খবর নিতে গেলে যদি বাগড়া পড়ে?

'চেহারাটা তুলসের সত্যিই ভাল—আর ভট্‌চায উপাধি তো—মেয়েদের ঘর বুঝে যেখানে যেমন, সেখানে তেমন হয়ে যেতে লাগল। কোথাও রাঢ়ী, কোথাও বারেন্দর, কোথাও বৈদিক। ব্যস, কেল্লা ফতে। পাঁচ-সাতশ' হাজার টাকা নগদ, একগা গয়না, অন্য দান-সামিগ্‌গির বিশেষ নিত না তুলসে, বলত—"আমাদের বামুনের ঘর। ওসব অঢেল, গোচ্ছার বাসন নিয়ে কি করব বলুন, আর খাট বিছানা? সেকেলে বাঙালীটোলার বাড়ি আমাদের, খুপরি খুপরি ঘর, মালে বোঝাই। ওসব রাখব কোথায়? তার বদলে বরং নগদ টাকাটা বাড়িয়ে দিন কিছু—"

'দিতও তারা, হাসিমুখেই দিত। ওসব দেশে যারা পড়ে আছে তাদের অবস্থা খুব খারাপও নয়। তুলসের যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যে লাভ হ'ত। দূর পথ বলে বেশী বরযাত্রীর কথা উঠত না, গুটি তিন-চার লোক নিয়ে বে করতে যেত, ভাড়া-করা লোক সব—তাদের গাড়ি-ভাড়া ছাড়া বিশ-পঁচিশ ক'রে দিলেই তারা কেতাত্ত হয়ে যেত—দুমাসের সংসার খরচ কাশীর। বে ক'রে এনে দু'চার দিন ঘর-সংসার করত। এক মা ছিল বাড়িতে—তাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিত এক একদিন—সে যমের মতো ভয় করত ছেলেকে—যা বলত, যেমন শাশুড়ীগিরি করতে বলত, তাই করত। আট দিন স্বোয়ামী সেজে থেকে শ্বশুরের খরচায় জোড়ে শ্বশুরবাড়ী ঘুরে আসার পথেই কোথাও বেচে দিয়ে আসত। খদ্দের সব রেডি—বিহারী, কাবুলী, পাঞ্জাবী, নেপালী—অনেক খদ্দের ছিল ওর। এ একটা আলাদা কারবার—এরও দালাল আছে, মহাজন আছে। কখনও "তার" ক'রে দিত—কলেরায় মরে গেছে, কখনও বা তাকে দিয়ে জোর ক'রে খানকতক চিঠি লিখিয়ে নিত, "অনেকদিন আপনাদের কুশল না পাইয়া চিন্তিত আছি" বাঁধা গৎ। যেন বাপের বাড়ির চিঠি একখানাও পায় নি—কি পাচ্ছে না। এই চিঠি মধ্যে মধ্যে ছাড়ত, তারাও নিশ্চিন্ত ছিল। অনেক সময় বৌকে নিজের বাড়িতেও তুলত না —বেশী বাড়াবাড়ি করলে জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয়ে। হয়ত সেই গৌরীগঞ্জে কি ময়দাগিনে কোন বাড়ি ভাড়া ক'রে সেখানে গিয়ে তুললে, তাদের হয় বললে কেউ কোথাও নেই, নয়ত বললে মার সঙ্গে বনে না তাই আলাদা—এইভাবে চালাত সকলের চোখে ধুলো দিয়ে।

'মহা ফন্দীবাজ আর ধূর্ত লোক ছিল তুলসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ভেবে সব দিকের আটঘাট বেঁধে কাজ করত। কিন্তু সবেরই একটা সীমা আছে, শেষ আছে। যত বড় ধড়িবাজ আর ধূর্তই হোক—পাপের পথের এমনই নিয়ম—এক সময় না এক সময় এক একটা ভুল ক'রে বসবেই।

'আসলে অহঙ্কার থেকেই এসব ভুল আসে বেশির ভাগ, ধর্ম কি আইনকে ফাঁকি দিতে দিতে বুক "বলে" যায়—ধরাকে সরা দেখে, ভাবে তাকে কেউ কোনদিন ছুঁতে পারবে না। এই-ই নিয়ম দুনিয়ার। ধর্ম কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখেন, মুখ বুজে সহ্য করেন, তারপর দুর্বুদ্ধি হয়ে তার ঘাড়ে চাপেন, তাকে দিয়েই তার সব্বনাশের পথ করেন। তুলসেরও হ'ল তাই। বাইরে বাইরে যদ্দিন ছিল এক রকম চলছিল। কারবার ফলাও হচ্ছিল দিন দিন। ছাপরার মেয়ে যে কলেরায় মরেছে একমাস আগেই—বালিয়ার মেয়ের বাপ—যে শহর-বাজার থেকে কুড়ি মাইল দূরে দেহাতী গাঁয়ে পড়ে আছে, তার জানবার কোন হেতু নেই। কাল হল তুলসের কাশীর মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে।'

॥ ১১ ॥

অনেকক্ষণ বকে ঠাকুর্দা শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে আমিই লম্পটা জেবলে একটা কলকে ধরিয়ে দিতে গেলুম, উনি তো হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন একেবারে।

'সর সর, ওসব তুই কি বুঝবি। তুই কলকে ধরালে সে তামুক আর আমাকে খেতে হচ্ছে না। এ রসের রসিক না হ'লে চলে? জিনিসটাই মাটি করে বসবি! তোর ঠানদি কলকে সাজিয়ে রেখে দেয়—কিন্তু টিকে ধরাতে দিই না ওকে। তুই রাখ, আমিই ধরিয়ে নিচ্ছি।'

কলকে ধরিয়ে, আমি যে সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলুম তার দুটো গালে ফেলে জল খেয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানলেন। তারপর হুঁকো নামিয়ে নিজেই শুরু করলেন আবার।

'এই সময়টাই আমি কাশীতে এসেছি সবে, অত-শত কাশীর মহিমা কিছু জানি না। বলে খাই দাই কাঁসি বাজাই, অত রগড়ের কি ধার ধারি—আমারও হয়েছে তাই। লক্ষ্ণৌ থেকে কাশী আসি যখন তখনও হাতে গোটা-দশেক টাকা আছে, তবে আমি খুব সেয়ানা হয়ে গিছলুম এতদিনে। এখানে এসে একটা দিন ধর্মশালায় থেকে হাতী-ফট্‌কার কাছে মাসে আট আনা ভাড়ায় একটা ঘর ভাড়া ক'রে নিলুম। রেঁধে খেতে পারি না—তখনকার দিনে হোটেলও তেমন হয়নি, দু' একদিন বাজারের খেয়ে পেট খারাপ হয়ে গেল, শেষে একজনকে ধরে পুঁটের ছত্তরে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। এক বেলা ওখানে খাই আর এক বেলা যোগে-যাগে চালাই। তখন কাশীতে গরমের দিনে এক পয়সা সের খরমুজ। এক পয়সায় ছ' ডেলা মুঠী গুড়। এক পয়সা খরচ করলে তোফা খাওয়া। এক পয়সায় বেল কিনলে একা খেতে পারতুম না। শীতের দিনে ওসব ছিল না, তেমনি ঐ বিশ্বনাথের গলির মোড়ে কচুরির দোকান—ওখানে এক পয়সা ক'রে এক-একখানা রেকাবির মতো কচুরি। দু' পয়সা খেলেই রাতটা চলে যেত। খেতুম আর গুধুড়ি বাজারে ঘুরে বেড়াতুম। পুরনো দু'একটা পুঁথি পেলে, দু'পয়সা চার পয়সায় যদি হত তো, কিনে নিতুম। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আসতুম।

'তবে এভাবে চলবে না সেটা বুঝেছিলুম। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে শেষ হতে বসেছে তখন। নতুন এসেই ক'টা বজ্জাত পাণ্ডা আর জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম। অবশ্য তাতে বেশী খসে নি—ওরাই আমার হিম্মৎ বুঝে ছেড়ে দিয়েছিল—তবু কিছু গেছে প্রেথমটায়।...কাজেই রোজগারের চেষ্টায় মন দিতে হ'ল। অনেক ঘোরা-ঘুরি ক'রে দু' একটা টিউশনিও পেলুম। দু'টাকা এক টাকার টিউশনি, তাও সে টাকা আদায় করতে রক্ত-পাইখানা শুরু হয়। আর উপায়ই বা কি? অবিশ্যি পুজো যজমানি না করলেও এসে অন্য একটা সামান্য রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল—একটা কোতোয়ালের কাজ পেয়ে গিয়েছিলুম।'—

আমি চমকে উঠলুম, 'কোতোয়াল? মানে পুলিসের কোতোয়াল? সে তো এস. পি-কে বলে?'

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ঠাকুর্দা।

'দূর বোকা! আমার কি সেই বিদ্যের জোর ছিল যে পুলিসের কোতোয়ালী করব! এ সে কোতোয়াল নয়।...আর বলবই বা কি? এখনকার ছেলেরা বোধ হয় কেউ-ই জানে না।...ওরে, এই যে কাশীতে এত অধিষ্ঠান দেখিস, অধ্যাপক-বিদেয় ব্রাহ্মণ-বিদেয়—এর একটা নেমন্তন্নর ব্যাপার তো আছে! সে এমনি যার যাকে খুশি করলে চলত না তখন। কাশীতে ব্রাহ্মণদের কতকগুলো সমাজ ছিল—এক এক পাড়ায় এক এক দল।

অনেক রকমের ব্রাহ্মণ আছে—এই একটু আগেই তো বলছিলুম—তাদের আলাদা আলাদা সমাজ। এ ছাড়াও পাড়া ধরে ধরে আলাদা আলাদা দলপতি ছিল, কারও অধিষ্ঠান দেবার ইচ্ছে হ'লে ঐ দলপতিকে আগে জানাতে হ'ত। শুধু ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান না অধ্যাপকের? শুধু বিদায় না বিচারসভা? ক'জন চাই, এ সব পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে, তারিখটি বলে দিয়ে আসতে হ'ত। তারপর দলপতি ঠিক করতেন কোনদিন কাকে কাকে বলবেন। তিনি এক অনুগত ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে এই নিমন্ত্রণ করতেন, ঐ ব্রাহ্মণকেই বলা হ'ত কোতোয়াল।'

'তা কোতোয়াল নাম কেন?' আমি শুধুই, 'এ রকম নেমন্তন্ন করার ব্রাহ্মণ তো আমাদের ওখানেও থাকে দু' একজন, ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে সব জাতের লোক নেমন্তন্ন করা যায়, নিজেদের যেতে হয় না বলে ওঁদের ধরে। এক একজন খুব একটু এক্সপার্ট হয়ে ওঠেন—তাই তাঁদেরই ওপর ভার দেয় সকলে। কিন্তু কৈ, তাদের তো কোতোয়াল বলে না?'

'না, তা বলে না।' ঠাকুর্দাও সায় দিলেন, 'ওটা কাশীরই একচেটে। শব্দটা এসেছে বাদশাহী আমল থেকে। শুনেছি শাজাহান বাদশার বেটা দারা শুকোহ্ কাশীতে এসে ব্রাহ্মণ বিদায়ের অনুষ্ঠান ক'রে সভা ডাকেন, তিনি আর কাকে জানেন? তাই নাকি শহরের কোতোয়ালকে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেই থেকেই ঐ শব্দটা চলে আসছে।...হ্যা——, যা বলছিলুম, দলপতি তো ফর্দ ক'রে দিলেন, সেই ফর্দ নিয়ে কোতোয়াল বেরোল জানান দিতে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে কোতোয়ালই চিনে রাখত—কোন ব্রাহ্মণ হয়ত নিজে যেতে পারবেন না, ছেলেকে পাঠাবেন—ছেলেকে ডেকে কোতোয়ালকে চিনিয়ে দিতেন।...অধিষ্ঠানের দিন কোতোয়াল সেই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত—চিনে দেখে গৃহস্বামীকে পরিচয় করিয়ে দিত। তিনি অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে যেতেন।...বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় কৈলেসদা—কৈলেস শিরোমণি মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমাদের সমাজের লোক, কথায় কথায় পরিচয় বেরিয়ে গেল—তখন ওঁরও পুরনো কোতোয়াল নেই। তিনি আমাকে কোতোয়াল ঠিক করলেন। ওঁর দলের লিস্টি দিয়ে ঠিকানা দিয়ে বলে দিলেন—ঘুরে ঘুরে সকলকে চিনে আসতে।'

'তা বেতন কত?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

'দূর পাগল. বেতন কি রে! দলপতির কি ঘরে মোটামুটি কিছু আসত যে মাইনে দেবেন? বরং কোতোয়ালেরই কিছু বাড়তি পাওনা ছিল, অধিষ্ঠান যা দেওয়া হ'ত কোতোয়াল তার ডবল পেত। আর পাওয়াই বা কি—অধিষ্ঠান—ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান বেশির ভাগ বাড়িতেই দেওয়া হ'ত একটা মাটির খুরিতে ছোট এক কুঁদো মিশ্রী, একটা পৈতে আর রুপোর দোয়ানি বা সিকি। কুঁদো মানে—এখানে যে ফেনি বাতাসার মতো মিশ্রীর কুঁদো হয়—সেই। আমাদের দেশের মতো বড় তাল মিশ্রী নয়।

'অধ্যাপক বিদেয় হ'লে আর একটু ভাল ব্যবস্থা হ'ত। পেতলের সরা বা রেকাবি—যার যেমন সামর্থ্য, মিশ্রীর বদলে হয়ত দুটো কি চারটে সন্দেশ, দক্ষিণেও চার আনার কম নয়। আধুলিও দিত কেউ কেউ। চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ি—ঐ যে যাদের সোনার দুগ্‌গোমূর্তি—ওখানে ব্রাহ্মণদের অধিষ্ঠানেও মিশ্রীর বদলে একটা ক'রে চূড়ো সন্দেশ দেওয়া হ'ত।...তবে এসব কি আর কেউ পাওয়ার জন্যে যেত? অধিষ্ঠানে নেমন্তন্ন হওয়া একটা সম্মান। যাবেন. গৃহস্বামী পা ধুইয়ে মুছিয়ে দেবে নতুন গামছায়, বসবেন—মানে ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান হবে তাঁর বাড়িতে। এই থেকেই অধিষ্ঠান কথাটা এসেছে, আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিয়ে চলে আসবেন, কাজ তো এই। কোতোয়ালের পাওনা ছিল খুরি হ'লে দুখানা খুরি, সরা হলে দুটো সরা—ভেতরের সাজপাট সমেত। তবে কি,

তেমন ঘটার কোন ক্রিয়াকলাপ কি শ্রাদ্ধশান্তি হ'লে, পুজো-টুজোয়—এইসব কোতো-য়ালদের ধুতি-চাদর পাওনা হ'ত।...ও কাজ কি আমার পাবার কথা? নেহাৎ কৈলেসদা স্নেহ করতেন বলেই—'

কথাটা বলতে বলতেই কেমন যেন আত্মস্থ হয়ে যান রমেশ ঠাকুর্দা। বোধ হয় অতীতের কথা মনে পড়ে সেই স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর অল্প দু'এক মিনিট পরেই আবার যেন চমক ভেঙ্গে বাস্তবে ফিরে আসেন।

'বেশ ছিলুম, বুঝলি, বে-পরোয়া, খাওয়ার জন্যে চিন্তা নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই—স্বাধীন। ক্রেমে ক্রেমে আরও দু' একটা ছেলে পড়ানো জুটল, ক্রমশ মাসে পাঁচ-ছ' টাকার মতো আয় দাঁড়িয়ে গেল। আরও হতে পারত—তখন তো এখানে বাংলা ইস্কুল ছিল না। অনেকেই মাষ্টার খুঁজত—কিন্তু আমার অত লোভ ছিল না। দরকারের বেশী রোজগার করব—তার জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভূতের মতো খাটব—ও আমার ধাতে সইত না। অত পয়সার টান থাকলে দেশের বাঁধা যজমানী ছাড়ব কেন?...আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজের আখের, ভবিষ্যৎ, কি নিজের দু' পয়সা আয় কিসে বাড়বে, এ কোন দিনই ভাবি নি, ঐ চিন্তামণি মুখুজ্জে যখন বাংলা ইস্কুল খুলতে এল—আমি ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পয়সা ভিক্ষে করেছি—একথা একবার মনেও হয় নি যে বাংলা ইস্কুল হ'লে সেখানেই সকলে ছেলেকে দেবে—আমার টিউশনির দফা গয়া হয়ে যাবে।

'যাকগে মরুকগে—আমার আহাম্মকীর কথা শুনলে তুইও বোকা হয়ে যাবি হয়ত। ...যা বলছিলুম, কাশীতে এসে পর্যন্তই তুলসের কথা শুনছি, কেচ্ছা-কেলেঙ্কার সব, যখন জেলে যায় তাও জানি, জেল থেকে বেরিয়ে এল, এই কারবার করছে—কিছুই শুনতে বাকী ছিল না। ঐ পাড়ায় থাকতুম, ঘুরতুম ফিরতুম, বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—সব কথাই কানে আসত। কিন্তু তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি। চোর ডাকাত ছ্যাঁচড়া বদমাইস তো সব দেশেই আছে, তীর্থে তো আরও বেশীই থাকবে—কথায় বলে, আলোর নিচেই অন্ধকার বেশি—আমি তার কি করতে পারি। আমি তো আর দণ্ডমুণ্ডের মালিক নই, ধম্ম বজায় রাখবার ভারও আমাকে কেউ দেয় নি। শুনতুম—দেখতুমও লোক-টাকে এই পর্যন্ত। সুন্দর দশাসই চেহারা ছিল। গঙ্গায় চান ক'রে বুকে কপালে চন্দন মেখে গরদের কাপড় পরে যখন উঠে আসত—তখন দেখলে ছেন্দাই হ'ত, কে বলবে এই লোকটা গুণ্ডা বদমাইস, জেলফেরৎ দাগী আসামী। এক এক সময় আমারও সন্দ হ'ত।

'কিন্তু কিছু দিন পরে আমাকেও মাথা ঘামাতে হ'ল। কুক্ষণে কি সুক্ষণে জানি না—তোর ঠান্‌দি এস্টেজে দেখা দিলেন। রঙ্গমঞ্চে অবতরণ যাকে বলে।'......

বলতে বলতে খানিকটা আপন মনেই হেসে নিলেন। তারপর আবার গল্পের খেই ধরলেন।

হঠাৎ শুনলেন ঠাকুর্দা চৌষট্টি যোগিনীর কাছে একটি নতুন ব্রাহ্মণ পরিবার এসে উঠেছেন, বাংলাদেশের বাস উঠিয়ে চলে এসেছেন তাঁরা—কাশীতেই থাকবেন। নতুন লোক পাড়ায় এলে ঠাকুর্দা যেচেই আলাপ করতেন। এখানেও নিজেই গেলেন। আলাপও হ'ল। শ্রীধর ভট্‌চায নাম, বর্ধমান জেলায় বাড়ি। সামান্য জমিজমা ছিল, কিছু যজমানীও করতেন—এক ছেলে ওঁর হঠাৎ যক্ষ্মায় পড়ল। সামান্য সঙ্গতি তো, আর রোগও তেমন নয়—যে বাড়িতে ঢুকবে ধনে প্রাণে মেরে যাবে। থাইসিস যে ভাল হবে না সবাই জানে —তবু চিকিৎসাও তো করতে হবে। ওঁকেও করতে হয়েছিল। ভাল ভাল খাওয়ানো, পুরীতে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাওয়া—যা করার সবই করেছেন। ফলে জমিজমা সমস্তই গেছে, ছেলেটিকেও রাখতে পারেন নি। তাতেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। কিছু ছিলও

না আর পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়া, তার আর মায়া করেন নি, বাসনকোসন বেচে কাশীতে চলে এসেছেন, মা অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে। স্বামী-স্ত্রী, আর তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে একটি। ভদ্রলোকের বয়স বেশী না, কিন্তু শোকে তাপে শরীর ভেঙে পড়েছিল। তিনটি ছেলে এক বছর দেড় বছরের ক'রে হয়ে মারা যাবার পর ঐ ছেলে, তাকেও রাখতে পারলেন না, এ আঘাত কি কম!

ঠাকুর্দা বললেন, 'একদিন গিয়েই অবস্থা বুঝে নিয়েছিলুম। একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী। আলাপ হওয়ার পর আমিই উয্যুগী হয়ে ভদ্রলোককে কিছু কিছু যজমানী যোগাড় ক'রে দিয়েছিলুম—অধিষ্ঠানে, ব্রতপার্বণেও যাতে কিছু আদায় হয় সেদিকেও চেষ্টা করতুম। তখন এখানে যাত্রী-তোলা বাড়ি ছিল অনেক, ক'জন বাড়িওলার সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলুম—সধবা, কুমারী-পুজো, ভুঁজিা—এগুলি যাতে ওঁরা পান। নগদ যা পাবে বাড়িওলার—মিষ্টি, থালাবাটি, কাপড়চোপড় এ'দের—এই বন্দোবস্ত হয়েছিল, তাতে এ'দেরই লাভ হ'ত, নইলে আধাআধি ব্যবস্থাই দস্তুর।

'এতেই একরকম ক'রে চালাচ্ছিলেন ভদ্রলোক—কিন্তু ভগবানের মার তখনও শেষ হয় নি, বোধহয় গেল জন্মে বসে বসে শুধুই পাপ ক'রে গেছেন ঐ তুলসের মতো, বঞ্চিত ক'রে গেছেন বিশ্বসুদ্ধ মানুষকে,—হঠাৎ একদিন পক্ষাঘাত হ'ল, ঘুম ভেঙে আর উঠতে পারলেন না, বাক্যিও হরে গেল। সে কি অবস্থা রে ভাই—খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি মেয়েটা আছাড়-পিছেড় খেয়ে কাঁদছে, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর চোখে জল নেই—বলে না যে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—তাঁরও বোধ হয় তাই হয়েছিল। পাথরের মতোই গুম খেয়ে বসে আছেন।

'লেগে গেলুম কাজে। পাড়ার দু'তিনটি ছেলেকেও লাগিয়ে দিলুম, তার মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ছেলেও ছিল শান্তাপ্রসাদ বলে, এমন প্রাণ দিয়ে পরোপকার করতে আমি আর কাকেও দেখি নি—তারা কিছু কিছু চাঁদা তুলল, আমি পাতালেশ্বর গলির আশু কবরেজকে ডাকালুম, মেয়েটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলুম, বললুম, "কান্নার ঢের সময় পাবে, খুকী—এখন বাপের সেবা করো আগে"। জানি কাজে না লেগে থাকলে মন খারাপ সারবে না। এমনিভাবে র-ব-ঠ ক'রে বছরখানেক চালিয়ে ছিলুম। ছেলেদের বলা ছিল, মাসে দু' আনা হিসেবে বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলবে, কাউকে জুলুম করবে না—কেউ না অসুবিধে ক'রে দেয়। মাসে দুগণ্ডা পয়সা দিতে অত কেউ আপত্তি করত না—অথচ চেনাশুনো মহল ঘুরে মাসে আট-দশ টাকা উঠে যেত তাতে।

'তাতে উপোসটা বাঁচল, আশু কবরেজের হাতে-পায়ে ধরে মনকে আঁখিঠারা গোছের একটা চিকিচ্ছেও হ'তে লাগল—একটা তেল আর বড়ি দিতেন মধ্যে মধ্যে, দাম নিতেন না—কিন্তু তাতে ফল কিছু হ'ল না, হঠাৎ একদিন নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ভদ্রলোক কাশী পেলেন। শোকটা এতদিনে এদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই স্ত্রী-মেয়ে দু'জনেই শান্ত ভাবে মৃত্যুটাকে মেনে নিল।

'কিন্তু আমাদের ওপর আরও দায় চাপল। টাকা তোলা বন্ধ হয় নি—সংসারটাও চলছিল, এবারে আমার যেটা প্রেধান চেষ্টা হলো মেয়েটাকে পার করা। এমন একটা ছেলে দেখে দিতে হবে—যে শাশুড়ীকে সুদ্ধ টানতে পারে, ওঁকে এমন ভিক্ষের ভাতে আর দিন কাটাতে না হয়। পাঁচজনকে বলেও রাখলুম, নিজেও ঘুরতে লাগলুম। তবে আমাদের তো জানিস, যতই সোন্দর মেয়ে হোক, শুধু-হাত কেউ মুখে তুলতে চায় না। ভাল পাত্তর যা দু'একটা পেলুম এত্তখানি খাঁই!'

এর মধ্যে একদিন গিয়ে শুনলেন ঠাকুর্দা—মধ্যে আট-দশ দিন যেতে পারেন নি, এক বুড়ীকে নিয়ে প্রেয়াগ করাতে গিছলেন এলাহাবাদে—যে, ও মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র কে—না ঐ তুলসে!

'বোঝ ব্যাপার! আমি তো অবাক, ওরা না হয় নতুন মানুষ—সব শোনে নি, কেউ কি বলেও দেয় নি তুলসে কেমন, কি মতলবে ঐ ফুলের মতো মেয়েটাকে কব্জা করতে চাচ্ছে!...বলতে গেলুম মাকে—শুনতে শুনতে মুখ সাদা হয়ে গেল মানুষটার কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাড় নাড়লেন। বে নাকি বন্ধ করা যাবে না, কোন উপায় নেই। উনিও নাকি শুনেছেন কিছু কিছু কিন্তু যাদের বলতে গেছেন সবাই বলেছে, 'তুলসে? ও বাবা, ও আমরা কিছু করতে পারব না। বে বন্ধ করতে গেলে, আটকাতে গেলে আমাদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে। আর ও যখন মন করেছে তখন তোমার মেয়ের আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই, মেয়েকে খরচের খাতায় ধরে রাখো।'

কথাটা যে কতখানি সত্যি তা তিনিও বুঝেছেন—যারা দেখাশুনো করত, সাহায্য করত তারা কেউ ছায়া মাড়ায় না আর—সবাইকে তুলসে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। পাড়ায় যে মুদী চাল-ডাল দিত সে আর মাল দেবে না। নগদ টাকা দিলেও নয়। এদিকে সব পথ বন্ধ ক'রে—পুরো একদিন প্রায় অনাহারে রাখবার পর—তুলসে নিজেই লোক দিয়ে ঝুড়ি ভর্তি সিধে, আনাজ-কোনাজ একরাশ পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন আর না নিয়ে উপায় কি? অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে জানালেন ভদ্রমহিলা।

'মাথায়-আগুন-জ্বলে-ওঠা কথাটা শোনাই ছিল এতকাল।' ঠাকুর্দা বললেন, 'ঐদিন বুঝতে পারলুম। কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হ'ল শুধু আমার মাথায় নয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেই বুঝি আগুন জ্বলছে। চারিদিক লাল দেখতে লাগলুম, কিন্তু ওঁকে কিছু বললুম না, শ্রীধর ভট্চাযের পরিবারকে। মেয়েটা দেখলুম ঘরের এক কোণে মেঝেতে পড়ে আছে, উঠলও না—আমার দিকে তাকালও না। বুঝলুম কেঁদেই চলেছে। সারা-জীবন যা করতে হবে, তারই রিয়েসাল দিয়ে নিচ্ছে।

'কিছু বললুম না, তার কারণ মেয়েমানুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। চাণক্য বলেছেন, কাজ যা করবে তা মনে মনে ভেবে নিও, কখনও প্রেকাশ করতে যেও না। এতকাল জগৎ-টাকে দেখে ঠেকে শিখেছি—কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি।...ওখান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্য করলুম তুলসের এক চেলা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে—মানে এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে! বুঝলুম এ মেয়ে বেচে অনেক দাম পাবার আশা রাখে, তাই এত আয়োজন। নেহাৎ আমাকে ভয় দেখাতে সাহস করল না তার কারণ—মোটামুটি কাশীর ব্রাহ্মণ সমাজে চেনা হয়ে গেছে, কৈলেসদা ভালবাসেন—আমাকে ঘাঁটাতে গেলে যদি সোরগোল বাধে? তাছাড়া আমাকে আধপাগলা ভিখিরী বলেই ভাবত, আমি যে ওর কোন অনিষ্ট করতে পারব তা মনে করে নি।'

ওখান থেকে বেরিয়ে ওঁরা যে ক'জন বামুনের ছেলে একটা সমিতি মতো করেছিলেন —সবাই ভাল ভাল ঘরের ছেলে, ওদিকে কেদারঘাট মানসরোবর আউদগর্বি থেকে শুরু ক'রে এদিকে গণেশমহল্লা পর্যন্ত—অনেকেই ছিল, শ্রীধর ভট্চাযকে সাহায্য করার জন্যেই এককালে এদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ঠাকুর্দা—এখন এরা বেশ একটা সমিতি করে নিয়েছে 'অন্নপূর্ণা বান্ধব ভাঁন্ডার' নাম দিয়ে—তাদের মধ্যে বেছে বেছে ক'জনের সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে বলতে গেলেন উনি, সবাই যেন ভূত দেখল একেবারে। প্রথমটা কেউ কানই দিতে চায় না, তুলসের ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সকলে। উনি তবু হাল ছাড়লেন না। অনেক ক'রে বোঝালেন। কত লোক আছে তুলসের তাঁবে? ওর তো পয়সা দিয়ে লোক পোষা—কত লোক পুষতে পারে? এ'রা যদি এতগুলো লোক এক হন—ওঁদের সামনে দাঁড়াতে পারবে? ভয়টাকে বড় ক'রে দেখলেই বড় হয়ে যায়, ওঁরাও মানুষ তো। না কি গরু ছাগল? কী করবে, খুন করবে? এত সাহস নেই। একবার জেল খেটে এসেছে—দাগী আসামী।

বলতে বলতে, ধিক্কার দিতে দিতে ওঁদের মন শক্ত হ'ল অনেকটা। তারপর সবাই

মিলে মতলব আঁটতে বসলেন। সময় ছিল, সেটা তখন চৈত্র মাস যাচ্ছে। বৈশাখের আগে বিয়ে হতে পারবে না। মানে তুলসের আর চৈত্র মাসই বা কি বৈশাখ মাসই বা কি—কিন্তু এদের কোন্ লজ্জায় বলবে চৈত্র মাসে মেয়ের বিয়ে দাও! চৈত্র মাস বলে তাঁদেরও একটু সুবিধে হয়ে গেল, বুঢ়ুয়া মঙ্গলের মেলা সামনে—সকলেরই মন পড়ে থাকবে গঙ্গার দিকে। গুন্ডা বদমাইশ লোকদের মহা-উৎসব—এ সময় সবাই ব্যস্ত থাকে। ভিড়ে দেখা-শুনো করা কি কোন লোককে ধরার ভারি সুবিধে।

'ধরলুমও। তুলসের যারা পুরুত নাপিত বরযাত্রী সাজত—অনেক খুঁজে তাদের নাম-গুলো পেলুম। তারপর পাঁচ-সাতজনে মিলে তাদের একে একে ধরলুম। কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে লোভ দেখিয়ে কায়দা করা হ'ল। ভয় দেখিয়েই বেশির ভাগ। এক বেটা শুঁড়ি ছিল, সে-ই নাপিত সাজত, খুব পয়সা পেত তুলসের কাছ থেকে—তাকে আর কোনমতে কায়দা করতে পারি না। হঠাৎ কি খেয়াল গেল, পিরানের মধ্যে থেকে পৈতে বার ক'রে ছিঁড়ে শাপ দিতে গেলুম। যে এতকাল এত কথায় ভয় পায় নি—সে ঐতেই ভয় পেয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গাললে সব কথা খুলে বলবে। বললেও সব, গলগল ক'রে বেরিয়ে এল সব কথা। কাকে কোথা থেকে এনেছে, কোন্ গ্রাম, মেয়ের বাপ কী করে—কোন্ মেয়েকে কলেরা ধরিয়েছে, কাকে থাইসিস, কার বেলা অমুকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—এই দুর্নাম দিয়েছে, সব খবরই পাওয়া গেল।

'বাকী ক'জনকে গিয়ে এই খবর একেবারে নামধাম-বিবরণ সমেত সব বলা হ'ল। কে বলেছে তা বললুম না। শুধু বললুম যে আমরা সব জেনেছি। সাক্ষী-সাবুদ সব মজুত। এবার আর কোনমতেই বাঁচোয়া নেই তোমাদের সর্দারের। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অনিবার্য। তোমাদেরও আট-দশ বৎসর জেল হবে—পাথর ভেঙ্গে ঘানি টেনে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। যদি অল্পে পার পেতে চাও—রাজার সাক্ষী হও, নিজে থেকে সব স্বীকার করো। তাদের আগেও কিছু কিছু ভয় দেখানো হয়েছে। একজনকে—যে বেটা পুরুত সাজে তাকে অনেক টাকা কবুলে লোভ দেখানো হয়েছিল। তবু ইতস্তত করছিল একটু আধটু—আমাদের মামলা সাজানো হয়ে গেছে দেখে এবার ঘাবড়ে গেল। আমি আর তাদের সময় দিলুম না—এক চেনা উকীলের বাড়ি নিয়ে গিয়ে এজাহার লিখিয়ে—সই করিয়ে—চার-পাঁচজন সাক্ষীকে দিয়ে দস্তখৎ ও সনাক্ত করিয়ে নিলুম।'

এর পর কি করবেন তাও ঠিক ছিল। তখন এক নতুন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে কাশীতে। খুব বুড়োও না, একেবারে ছোকরাও না। পুলিসের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না তা জানতেন এঁরা। যে এতখানি সাহস করে—তার ওসব পীরের দরগায় আগেই সিন্নি চড়ানো থাকে। মিছিমিছি ঘাঁটাতে গেলে—ওরাই হয়ত সাবধান ক'রে দেবে—সটান তাই চলে গেলেন এঁরা সাহেবের কাছে। এঁদের দলে ছিল কাশী-নরেশের দেওয়ানের ছেলে বিশ্বনাথ, সে বেশ বলিয়ে কইয়ে ছিল, সাহেবদের মতো ইংরিজী বলতে পারত। সে-ই এদের হয়ে কথা বলল হাকিমের সঙ্গে। সব কাগজপত্র দিয়ে, লোকটা আগেও কী ঘৃণ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল—সেজন্যে চার বছর জেল খেটেছে জানিয়ে—শেষ পর্যন্ত বলে দিলে, পুলিস ওর কাছ থেকে ঘুষ খায় তা সকলেই জানে, আর তা হাকিম বাহাদুরও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, নইলে এমন সব কাজ করার পরও এতকাল ধরে বুক ফুলিয়ে শহরের মধ্যে বাস করছে কি ক'রে! এখন হাকিম বাহাদুর যদি এর প্রতিকার না করেন তো বোঝা যাবে তিনিও এর মধ্যে আছেন, পুলিস মারফৎ তাঁর কাছেও ঘুষ এসে পৌঁছয় কিছু—সেক্ষেত্রে এঁদের খবরের কাগজের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। বসুমতীর সম্পাদক কাশীতে এসেছেন, তাঁর কাছেও এর এক-সেট কাগজপত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে—হাকিম বাহাদুর যদি এই অনাচারের কোন প্রতিকার

না করেন তো তিনি বলেছেন এসব খবর বিস্তৃত ক'রে তাঁর কাগজে ছাপবেন। পুলিস আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষ্ক্রিয়তার খবর সুদ্ধ।

'সব শুনে আর ওঁদের এজাহার দেখে সায়েবের লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "অত কিছু করতে হবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও।... তোমাদের ঐ ড্যাম্‌ড্‌ নেটিভ্‌ পেপার বসুমতীকে বলো তাকে ভাল খবরই ছাপতে হবে। আমাকে গালাগাল দেবার সুযোগ পাবে না।" সাহেব হয়ত ভাল, হয়ত ভাল না—ঘুষ-খোর—কিন্তু যাই হোক বসুমতীর নাম করায় কাজই হয়েছে, তখন বসুমতীর খুব নাম, সবাই ভয় করে।'

'তা সাহেব দেখালও বটে', বললেন ঠাকুরদা। অসম্ভবই নাকি সম্ভব করেছিলেন। কী ক'রে কি কলকাঠি নেড়েছিলেন তা তিনিই জানেন, মোদ্দা ওঁরা যাওয়ার পর থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে তুলসেকে হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে গেল পুলিস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর সাঙ্গোপাঙ্গদের সবাই গিয়ে হাজতে ঢুকল। যারা সাক্ষী দিয়েছিল—তাদের একেবারে আলাদা জায়গায় রাখা হ'ল, যাতে তুলসের লোকরা না ভয় দেখাতে পারে। সেইখানেই থামল না পুলিস,—বোধ হয় সাহেবের ধমকেই—সেই বালিয়া ছাপরা গোরখপুর বেতিয়া—সব জায়গায় খবর চলে গেল—তাদের মেয়েগুলোর কী পরিণাম হয়েছে! সাত-আট দিনের মধ্যে সেসব মেয়ের বাপ বা অভিভাবক কাশীতে এসে পৌঁছল। এবারও খুব জোর মকদ্দমা হ'ল—তবে এবার দেখা গেল, তুলসেকে বাঁচাতে একটি প্রাণীও এগিয়ে এল না। তুলসে যাদের কাছে খবর পাঠাল তারা সব পরিষ্কার বলে দিল, তুলসেকে তারা চেনে না, কস্মিনকালে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে মকদ্দমাও বেশী দিন টানবার দরকার হ'ল না, মাস ছয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তুলসের মেয়াদ হ'ল সাত বছর। সাঙ্গোপাঙ্গদের কারুর চার বছর কারুর পাঁচ। যারা সাক্ষী দিয়েছিল তাদের নামমাত্র সাজায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

॥ ১২ ॥

নাটকীয় ভাবে এই পর্যন্ত বলে ঠাকুর্দা আর এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিলেন। তার পর আমার অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে নিজেই শুরু করলেন আবার।

'তুলসের সেই শেষ। এবার জেল থেকে বেরিয়ে আর কাশী আসে নি। শেষ যে বে করেছিল, গাজীপুরের দিকের এক গাঁয়ের মেয়ে, ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী ক'রে খায়—অনেকগুলো ছেলেমেয়ে—তবু তার একটা পার হচ্ছে ভেবে কোন খবরই করে নি—সে বৌটাকে আর পাচার করবার সময় পায় নি, চারে জীইয়ে রেখেছিল। তার পরই তো এই বিত্তান্ত—মোকদ্দমার সময় বাপ এসে নিয়ে গিয়েছিল, সেইখানেই পড়ে ছিল—সেই সুবাদে তুলসেও গিয়ে সেখানে উঠল। তা সে শ্বশুর ভাল, বলেছিল, "যা হবার হয়েছে, এখন এইখানে জমিজমা দেখে দিচ্ছি, চাষবাস করো, খাও।" রাজীও হয়ে-ছিল—কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। গুণ্ডার স্বভাব কোথায় যাবে, চণ্ডালের রাগ—ঐ যারা ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল তাদের ওপর শোধ নেবার ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে পারল না।

'একটু সামলে নিয়েই চুপচুপ কাশীতে এল। সেই নাপ্‌তে বেটাকে আগে শেষ করবে এমনি মতলব ছিল, কিন্তু সে-ও মহা ধুরন্ধর। তুলসে জেল থেকে বেরিয়েছে খবর পেয়ে পজ্জন্তই তক্কে তক্কে ছিল—লোকও লাগিয়ে রেখেছিল পিছনে—রাত্তিরের গাড়িতে যেমন সিকরোল এসে নেমেছে, ওর দুজন লোক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে লাইনে। তখনই একটা মালগাড়ি আসছিল—থেঁৎলাতে থেঁৎলাতে সাত হাত দূরে টেনে নিয়ে

গেল—মানুষটাকে চেনবারই জো রইল না। নিহাৎ পকেটে কি সব কাগজপত্তর ছিল আর ডান উরুতে একটা সাদা জড়ুল—তাইতেই লাশ সনাক্ত হ'ল।...

'বাইবেলে নাকি একটা কথা আছে শুনেছি—পাটনার সেই নিতাইবাবু বলতেন—যে তলোয়ারের জোরে বড় হয় তলোয়ারেই তার সব্বনাশ ঘটে। তা তুলসেরও হ'ল তাই!'

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে ব'কে ঠাকুর্দা বেশ একটু থকেই গিয়েছিলেন—এবার খানিকটা চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর উঠে আর এক ঘটি জল খেয়ে এলেন আবার।

মায়া হবারই কথা ওঁর অবস্থা দেখে, কিন্তু আমার আর তখন মায়া দেখাতে গেলে চলে না। এখানে থাকার মেয়াদ বেশী দিনের নয়। থাকলেই খরচা, সুতরাং সীমাহীন ইচ্ছা সত্ত্বেও দু'একদিনের মধ্যে পাততাড়ি গুটোতে হবে। কাল যে আবার আসতে পারব ঠিক এই সময়ে—তা বলা কঠিন। যেটুকু জানবার এখনই জেনে নিতে হবে, সতীদি আসবার আগেই।

তাই একটু কেশে, বার দুই মাথা চুলকে বললুম, 'এ তো হ'ল—সতীদিকে উদ্ধার দানবের কবল থেকে, কিন্তু তিনি আপনার কুক্ষিগত হলেন কি ক'রে সেটা তো বললেন না এখনও—?'

'গেরো! কপালে গেরো থাকলে কে খণ্ডাতে পারে বল্! ওর কপালে আছে দুঃখের পেছনে দাঁড়ি দেওয়া—তার আমি কি করব। ঝিকে ঝি—রাঁধুনীকে রাঁধুনী, স্যাবাদাসীকে স্যাবাদাসী—আবার ইদিকে রোজগেরে বাবু। আমার পাল্লায় পড়ে সব করতে হবে—এ যে বিধেতা-পুরুষের লেখন ওঁর অদেষ্টে!'

ঠাকুর্দা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, যেন জ্বলে উঠলেন একেবারে। বললেন, 'তুলসে তো গেল—বেশ শান্তি হ'ল—আর কোন ভাবনা নাই, আমি উঠে পড়ে লাগলুম ওর জন্যে একটা পাত্তর খুঁজতে। বুঝলুম যে আর নয়, এ আগুন উনুনের মধ্যে পুরতে না পারলে নিস্তার নেই। নিজেও জ্বলবে. পরকেও জ্বালাবে। তুলসেকে তো একটাই পাঠান নি ভগবান সংসারে।

'পাঁচজনকে বলে রাখলুম। বামুনপাড়ায় জনে জনে গিয়ে জানালুম। আমাদের ভাণ্ডারের ছোঁড়াগুলোকেও বললুম; সোন্দর মেয়ে—খুব ভরসা ছিল বুকে—ভাল পাত্তর একটা পাওয়া যাবেই। তা সে দফা উনিই গয়া ক'রে দিলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলেন. বেশ ভেবেচিন্তে, হিসেব ক'রে।...একদিন ওদের খবর নিতে গেছি, ওর মা কেমন যেন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাবে, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ডেকে এককোণে নিয়ে গিয়ে কথাটা পাড়লেন. "বাবা, তুমি তো পাগলীর পাত্তর খুঁজতে সারা পৃথিবী তোলপাড় করছ—ও তো এক কাণ্ড ক'রে বসে আছে! এখন কী করবে করো। এসব বলাও যায় না, অথচ না বললেও নয়। আমার তো কিছু মাথাতে আসছে না"।

'আমি তো অবাক। ওঁর কথার ভাবে মনে হ'ল খুব একটা গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে মেয়েটা—জাত-কুল নষ্ট হবার মতো।...কিন্তু তেমন মেয়ে তো মনে হয় না। আর ঐটুকু মেয়ে!—আমার তখন এমন মনের অবস্থা, জিজ্ঞেসও করতে পারছি না—কী কাণ্ড ক'রে বসে আছে!

'বললেন ওর মা নিজেই। আরও একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন. "ও নাকি বাবা কেদারনাথকে ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছে যে তোমাকে ছাড়া নাকি কাউকে বিয়ে করবে না"!

'আমি তো অবাক। কথাটা মাথায় ঢুকতেই আমার বিলক্ষণ দেরি হ'ল। তারপর মনে হ'ল আমি ভুল শুনছি, না হয় ওঁর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আরও অনেক পরে বুঝলুম যে ভুল শুনি নি।

'মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল একেবারে. "সেকি!...কী বলছেন কি! মাথা খারাপ

নাকি? না না, ওসব পাগলামি করতে বারণ করুন ওকে। ছি ছি! কি বলছেন। তাছাড়া আমাকে বে—আমি তো ও কাজেই যাব না। সেই জন্যেই তো আরও এমন বাউণ্ডুলে হয়ে আছি। হ্যা——। না চাল না চুলো, একপয়সা রোজগার করি না, এই চেহারা, অন্ধকারে দেখলে লোক আঁৎকে ওঠে, খুব পাত্তর খুঁজে বার করেছে বটে"!

'হেসে উড়িয়ে দিতে যাই কথাটা। এদিকেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে একরকম। যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন ওর মা। ভেবেছিলুম না জানি কি একটা খুব খারাপ কাজ ক'রে বসে আছে!

'কিন্তু ভদ্রমহিলা হাসিঠাট্টার ধার দিয়ে যান না। বল্লেন, "মেয়ে যে বাবা কোন কথাই শুনছে না—তার কি করি। বলে, উনি আমাকে সব্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, মহাদুর্গতি থেকে রক্ষে করেছেন—ওরকম অবস্থা হ'লে তো মৃত্যু ছাড়া পথ থাকত না, কাজেই এ জীবনও ওঁর দেওয়া। আমি সেই দিন থেকেই মনে মনে ওঁকে স্বামী বলে ভেবে রেখেছি—হিঁদুর মেয়ের আবার বিয়ের কি বাকী আছে? তাছাড়া বাবাকে ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছি—আমার আর কোন পথ নেই—এখন উনি না নেন, ওঁর ধম্ম ওঁর কাছে, আমাকে তাহলে গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে, এর পর কনে সেজে আর কাউকে মালা দিতে পারব না।...ও মেয়ে বাবা সাংঘাতিক, কত বললুম কত বোঝালুম—আমি কি কম বুঝিয়েছি, কিন্তু সে সব ভস্মে ঘি ঢালা। বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছে, কোন কথাই শুনছে না। বলে না—মোষের শিং বাঁকা যোঝবার বেলা একা, তা ও মেয়েরও হয়েছে তাই"!

'বোঝ ব্যাপার! উনি তো খুব আহ্লাদ ক'রে বললেন। এক কথায় কথার তেইশ মেরে দিলেন। এখন আমি কি করি! আমিও অনেক ক'রে বোঝালুম, পায়ে-হাতে ধরতে গেলুম বলতে গেলে, পাঁচজনকে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম. অনেক গুরুজন প্রবীণ লোককে ডেকে আনলুম—মেয়ের সেই এক কথা, তুমি বে না করো—গঙ্গায় গিয়ে উলব। বলি কিছু নেই, পথের ভিখিরী—তা জবাব দেয় "শ্মশানে বাস করে জেনেই তো মা দুর্গা শিবকে বে করেছিলেন।"—এ'চোড়ে পাকা মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ভারী পাকা হয় নাতি—এ তুমি দেখে মিলিয়ে নিও—শহরের মেয়েদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। যারা মুখ্খু তারাই বলে সরলা পল্লীবালা! মরুক গে—আমার যা করবার তা চূড়োন্ত করেছি—কোন চেষ্টা বাকী রাখি নি, তাতেও যখন শুনল না আমার রাগ হয়ে গেল, সোজা বললুম, "মরগে যা! অদেষ্টে দুঃখ না থাকলে এমন বদ বুদ্ধি হবে কেন। কর্ আমাকে বে, কত সুখ, প্রাণে কত রস আছে টের পা একবার!"...মিটে গেল—বিত্তান্ত। সে-ই উনি আমার ঘাড়ে চাপলেন —কিম্বা আমিই ওঁর ঘাড়ে চাপলুম।'

কেন যে এ বদবুদ্ধি—তাও অবশ্য ঠাকুর্দাই বললেন—আর একটু পীড়াপীড়িতে।

সতীদি নাকি ঐ ঘটনার আগে থাকতেই ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন। বাবার অসুখের সময় এবং মৃত্যুর পর রমেশ ঠাকুর্দা যা করেছেন—যে অমানুষিক পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ—ওদের বাঁচিয়ে রাখতে, তা নাকি এই কলিযুগে কেউ কারও জন্যে করে না। আরও পাঁচজনে করেছে ঠিকই, তবে তারাও করেছে ওঁর জন্যে, ওঁর চেষ্টা আর দৃষ্টান্তেই।

সে-ই যেন নতুন দৃষ্টি খুলল সতীদির।

নতুন এক চোখে দেখলেন তিনি রমেশ ঠাকুর্দাকে। তাঁর মনে হ'ল সাক্ষাৎ শিব. স্বয়ং বিশ্বনাথ এমনি ভাঙ্গড় ভোলা ভিখারী সেজে এসেছেন ওদের ত্রাণ করতে।

সেই যে কিশোরী মেয়ের চোখে মায়া ও মোহের অঞ্জন লাগল, ঐ কুৎসিত প্রায়-প্রৌঢ় ঠাকুর্দা সেই যে পরম কাম্য রমণীমোহন রূপে তাঁর চোখে প্রতিভাত হলেন—সে মায়া. সে ভ্রান্তি আর জীবনে ঘুচল না। ঠাকুর্দার উদার কোমল অন্তরের অসীম ঐশ্বর্যই

তিনি দেখেছিলেন সেদিন—তাই বাইরের এই খোলসটা চোখে পড়ে নি। কোনদিনই পড়ে নি, জীবনভোর সেই মুগ্ধ দৃষ্টিটাই রয়ে গেছে তাঁর—সেদিনের সে ছবি কোনদিনই মোছে নি।

তার পর যখন সাক্ষাৎ কালান্তর যমের মতো—মূর্তিমান পাপের মতো তুলসে এল তাঁর জীবনে—দেখলেন যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে—সমস্ত পাড়া, সমস্ত পরিচিত লোক—এমন কি দোকানদাররা পর্যন্ত ওর ভয়ে আড়ষ্ট, জন্তু হয়ে গেছে—কেবল এই শীর্ণ কৃশতনু নিঃস্ব লোকটি ছাড়া।

এই আপাতদুর্বল মানুষটিই শুধু যথার্থ পুরুষের মতো, পুরুষ-সিংহের মতোই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং রক্ষাও করেছিলেন তাঁকে সেদিন—অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন।

আবারও নূতন রূপেরই ঘোর লেগেছিল সেদিন সতীদির চোখে।

মদনমোহন সেদিন লজ্জানিবারক শ্রীকৃষ্ণ রূপ, ভাঙগড় ভোলা বৃদ্ধ ভিখারী শিব সেদিন ত্রিপুরারি রূপ ধারণ করেছিলেন। তাই বয়স, রূপ, ভরণ-পোষণের সামর্থ্য—কোন কথাই আর ভাববার অবসর পান নি সতীদি!

'তবে একটা কথা বলব নাতি, সে শুনতে আসছে না, তার ধম্ম শুনছে—সেই যে জেদ ক'রে এসেছিল, গলায় মালা দিয়ে—তারপর থেকে টানা এই দুঃখুটা ভোগ ক'রে যাচ্ছে, একটা দিন, একটা মিনিটও তার জন্যে মুখে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে নি, কি আমাকে গঞ্জনা দেয় নি। এতটা বোধ হয় মা দুগ্‌গাও পারতেন না! অসুখ হয়েছে, একশ পাঁচ জ্বর—তার মধ্যে উঠেও আমায় ভাত রেঁধে দিয়েছে, আমার আর কারও রান্না মুখে রোচে না বলে।...ওরই কপাল, গেরোর ফের—নইলে ওর যা রূপ-গুণ, রাজার ঘরে পড়বার কথা!'

এই বলে একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, সামনে বাগানের ওপারে হিন্দুস্থানীদের বাড়ির কার্নিশে কবুতররা ফিরে এসেছে, করবীগাছের ডালে কতকগুলো ছোট পাখী আশ্রয় নিয়ে কিচির মিচির করছে—সেই দিকে চেয়ে তাদের দিকে কান পেতে বসে রইলেন যেন। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেলুম না, তবু আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—চোখ দুটো ওঁর ছলছল করছিল, প্রেমে, স্নেহে, সহানুভূতিতে—পত্নীগর্বে।

হয়ত জলও ঝরে পড়ছিল তোবড়ানো শীর্ণ দুই গাল বেয়ে।

আমিও আর কোন কথা তুললুম না। এখন কথা কওয়াতে যাওয়া মানে ওঁর ওপর অত্যাচার করা। 'আচ্ছা আসি এখন ঠাকুর্দা' বলে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠেই পড়লুম একেবারে।

সতীদির আসবার সময় হয়ে এল—তাঁর সামনে আর এ অবস্থায় পড়তে চাই না। তাঁর চোখে কিছুই এড়াবে না, আমাকে বকাবকি করবেন বুড়ো মানুষকে উত্ত্যক্ত করার জন্যে।

॥ গ্রন্থশেষ ॥

পুরাণের সতীর থেকেও ঢের বড় সতী আমাদের সতীদি কিন্তু এ জন্মে বিধাতার কাছ থেকে তাঁর এই তপস্যার কোন পুরস্কারই পান নি।

একমাত্র এই স্বামী-লাভ ছাড়া তাঁর কোন সাধই পূরণ করেন নি বিশ্বনাথ।

সবচেয়ে যেটা বড় প্রার্থনা ছিল—'তোরা বল, বাবাকে জানা, বুড়ো যাতে আমার কোলে যায়—তোদের পাঁচজনের বাড়ি মেগে আমার দিন একরকম ক'রে কেটেই যাবে—আমি গেলে বুড়োর বড় কষ্ট হবে, না খেয়ে উপোস ক'রে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে

মরবে!'—সেটাও শোনেন নি ভগবান।

এর অনেকদিন পরে, উনিশশো সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ সালে—আজ আর ঠিক মনে নেই—আর একবার দেখা হয়েছিল ঠাকুর্দার সঙ্গে।

ঠানদি যে নেই সে খবর আগেই পেয়েছিলুম, ওপাড়ার সতীশবাবুর মুখে, হঠাৎ একদিন শিয়ালদার বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু ঠাকুর্দার কি হ'ল সে খবর পাই নি। শুনলুম ঠানদি নাকি একদিন চাকরি সেরে রাত্রে ফিরে এসেছিলেন জ্বর নিয়ে। সামান্য জ্বর, পরের দিন বাইরে রাঁধতে যেতে পারেন নি, তবু উঠে বুড়োর রান্না ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, নিজের জন্যে একবাটি সাবুও। কিন্তু বিকেলে আর উঠতে পারলেন না। সাড়াও দিলেন না কথাও কইলেন না।

ঠাকুর্দা অনেক দিনের লোক, অনেক মৃত্যু দেখেছেন, হে'ট হয়ে নিঃশ্বাস নেবার ধরন দেখে আর গায়ে হাত দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে লক্ষ্মীবাবুকে জানালেন ব্যাপারটা। ওঁর চিৎকারে আরও পাঁচজন ছুটে এল। ডাক্তারও ডাকা হল—একজন নয়, খবর পেয়ে দুজন ডাক্তার এসে গেলেন, সতীদিকে সবাই ভক্তি করত, কিন্তু কিছুই করা গেল না। শেষরাত্রে ঊষার স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সাবিত্রী চতুর্দশীর দিন সেটা, খবর পেয়ে নাকি পাড়াসুদ্ধ ভেঙ্গে পড়েছিল মেয়ের দল, সিঁদুর দিতে আর প্রসাদী সিঁদুর নিয়ে যেতে।

এ সবই বলেছিলেন সতীশবাবু। কিন্তু বুড়োর কি হ'ল তা বলতে পারেন নি।

কাশীতে পৌঁছে আগে ঐ বাড়িতেই গেলুম। দেখলুম সে ঘরে একটি মোটাসোটা বিধবা মহিলা বাস করছেন—যে ঘরে ঠাকুর্দা থাকতেন। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। ওপরে প্রয়াগবাবুরাও নেই, প্রয়াগবাবু মারা গেছেন, তাঁরা এখন সব ওঁর বড় ছেলের কর্মস্থল কানপুরে চলে গেছেন। লক্ষ্মীবাবুর সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয় ছিল না—তবু অগত্যা তাঁর কাছেই গেলুম।

লক্ষ্মীবাবু অবশ্য নাম বলতেই চিনতে পারলেন। ঠিকানাও দিলেন। তাঁর মুখেই শুনলুম, এতকাল পরে ঠাকুর্দার কে এক সম্পর্কে ভাইঝি-জামাই কাশীবাস করতে এসেছে—তারা খুব ঘেঁষ দেয় নি—এ পাড়ার সকলে গিয়ে বলতে নিহাৎ চক্ষুলজ্জায় পড়েই নিয়ে গেছে বুড়োকে। পীতাম্বরপুরায় থাকেন ভদ্রলোক, হীরেন চক্রবর্তী নাম, কোন সরকারী হাসপাতালের ডেণ্টিস্ট ছিলেন, রিটায়ার ক'রে এখানে এসেছেন, দশাশ্বমেধের কাছে কোথায় বুঝি একটা চেম্বারও করেছেন—পেন্সনের টাকায় আর যা টুকটাক এখানে আয় হয় তাইতেই চলে।

খুঁজে খুঁজে পীতাম্বরপুরার সে বাড়িতে গেলাম পরের দিন।

আগেই ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হ'ল। বাড়িটার পথের ওপরে যে ঘর তাতে একটা নিরাবরণ তক্তাপোশ পাতা—অর্থাৎ বাইরের ঘর সেটা, তার পিছনে অন্ধকূপের মতো ঘর—দিনের বেলায় কিছুই ঠাওর হয় না ঘরে কি আছে বা কে আছে—সেইটেই নির্দিষ্ট হয়েছে রমেশ ঠাকুর্দার জন্যে। সেই ঘরের রকে থুম হয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ। চিনতে পারলুম আদল দেখে—নইলে চেনার উপায় নেই বিশেষ, আরও রোগা আরও বুড়ো হয়ে গেছেন।

আমায় দেখে, বা বলা উচিত আমার গলা শুনে, সেই প্রায়-দৃষ্টিহীন চোখও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'কে নাতি, আয় আয়। বোস।' বললেন, কিন্তু বসব কোথায়? সেই ভেবেই তাড়াতাড়ি মেঝেতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাইরের ঘরে এনে বসালেন। তারপর—কোন কিছু কথা কইবার কি কোন প্রশ্ন করার আগেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

কী সান্ত্বনা দেব বৃদ্ধকে—কিছুই ভেবে পেলুম না। তাই হাত ধরে পাশে বসিয়ে নীরবে হাতটাই ধরে রইলুম শুধু।

অবশ্য নিজেই শান্ত হলেন, প্রায় তখনই।

সব জানতেও পারলুম অবস্থা। এঁরা বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছেন বটে—লোকগঞ্জনা এড়াতে না পেরে—হাঁড়িতে দিতে পারেন নি। ভাইঝি নাকি স্পষ্টই বলে—'বাপ-মা ভাইদের ফেলে স্বার্থপরের মতো চলে এসেছিলেন, ওঁর সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক? তখন মনে ছিল না যে আত্মীয়দের কখনও দরকারে লাগতে পারে!'

সুতরাং ছত্তরে খেতে যেতে হয় প্রত্যহ।

তবু এই কাছেই নাটকোটার ছত্রে ব্যবস্থা হয়েছে তাই। খুবই কষ্ট হয়, যাবার সময় যতটা না হোক, আসবার সময় যেন দম বেরিয়ে যায়। যেদিন শরীর খারাপ হয় যেতে পারেন না, সেদিন খাওয়াই হয় না।

রাত্রে দয়া ক'রে এরা দুখানা রুটি দেয়, আর ডালের ওপরকার জলটা, তাতেই ভিজিয়ে চট্‌কে খান। ঐ ঘরে পড়ে থাকেন, বিছানার চাদর কি বালিশের ওয়াড় কি পরনের ধুতি—ঝিটা দয়া ক'রে এক একদিন কেচে দেয় তাই। নইলে তেল-চিটচিটে বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়।...ঘরে আলো নেই, সেটা বলেই অবশ্য তাড়াতাড়ি বলেন, 'আমারই বা আলোতে কি হবে বল, চোখে দেখতে পাই না—পড়াশুনো করার তো জো নেই—আমার কাছে আলো থাকাও যা না থাকাও তাই।'

কাউকে দোষ দিলেন না ভদ্রলোক, কোন অনুযোগ কি বিলাপ করলেন না, যেটুকু জানতে পারলুম নিজে খুঁচিয়ে প্রশ্ন ক'রে। কারও সম্বন্ধেই কোন নালিশ নেই, বিধাতার সম্বন্ধেও না। বললেন, 'যেমন করেছি—জীবনকে যেমন চালিয়েছি তেমনিই তো হবে—এর চেয়ে ভালো আর কি হ'তে পারে বল।...যে কাঠ খাবে তাকে আংরাই নাদতে হবে। এ সবই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এখন আর হায় হায় ক'রে কি হবে?...বরং ভগবানকে একটা ধন্যবাদ দিই—দয়াই করেছেন তিনি—বামনীকে আগে নিয়ে নিয়েছেন। কিছুই তো পেলে না জীবনে কোনদিন—তবু মরার পর রাজরাণীর মতো যে যেতে পারল—শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে, পাড়া ভেঙ্গে লোক এসে সতীসাধ্বী বলে পায়ের ধুলো নিয়ে গেল—এতেই আমি খুশী। আমার দুঃখকষ্ট সওয়া আছে ঢের—আমার সইবেও, কিন্তু তাকে রেখে গেলে বড় বাজত। ঐ হাত শুধু-ক'রে বিধবা হয়ে পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে বেড়াতে হ'ত—কথাটা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। বেশ গেছে সে, আমার খুব সন্তোষ এতে।'

আসবার সময় গোটা পাঁচেক টাকা দিতে গেলুম—ঠাকুর্দা নিলেন না। বললেন, 'কী করব বল টাকা নিয়ে? দোকানে গিয়ে কিছু কিনে খেয়ে আসব সে ক্ষ্যামতা তো নেই দেহে! উল্‌টে আমার হাতে টাকা দেখলে এরা ভাববে আরও ঢের লুকনো টাকা আছে কোথাও—আমি মানি না। যেটুকু দয়াধম্ম করে সেটুকুও আর করবে না। ও থাক্। আমার দিন চলেই যাবে। আর কতদিন রাখবে ভগবান, একদিন না একদিন তো যমের মনে পড়বেই। হ্যা——।'

হাসি আর আসে না—হাসির ভঙ্গী করেন শুধু।

এর অনেকদিন পরে ঠাকুর্দার খবর পেয়েছিলুম আবার। মৃত্যুসংবাদ।

শেষটা নাকি পক্ষাঘাতের মতো হয়েছিল, ওরা কোনমতে একটা হাসপাতালে ফেলে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কেউ যেতও না, খবরও নিত না। শেষে তারা ভৈরবী বলে কে এক সন্ন্যাসিনী এসে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখেছিল, সেবাও করেছিল খুব। তবে তার পর আর ঠাকুর্দা বেশীদিন বাঁচেন নি, অল্পেই রেহাই দিয়ে

গেছেন ভৈরবীকে।

ভৈরবী নাকি তাঁকে বলেছিল, আমার কাছ থেকেই খবর পেয়ে নিতে এসেছিল তাঁকে, তার সঙ্গে নাকি আমার দীর্ঘকালের পরিচয়।

এ কথা বলার রহস্যটা কি—আমার কোনদিনই আর জানা হয়ে ওঠে নি। যদি কোন দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়—জিজ্ঞাসা করব।

তারা ভৈরবী

উৎসর্গ

ডঃ কমলকৃষ্ণ দে ও শ্রীমতী সংঘমিত্রার

করকমলে

॥ ১ ॥

মোন্তির সঙ্গে আবার যে কোনদিন দেখা হবে, তা ভাবি নি।

মন থেকে না হলেও জীবন থেকে একরকম মুছেই গিয়েছিল সে।

শেষ যেদিন অহল্যাবাঈ ঘাটে দেখা হয়েছে—সেও তো অনেকদিনের কথা হয়ে গেল।

অবশ্য তখন আর মোন্তি নেই, তখন সে তারা ভৈরবী—ধীর মন্থর গতিতে আত্ম-সমাহিত ভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল—চারিদিকে যে অসংখ্য মুগ্ধ ভক্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ব্রাহ্মণ অতটা দীনতা স্বীকার না করলেও অনেকটা হেঁট হয়ে নমস্কার জানাচ্ছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই তার, প্রতিনমস্কার করা বা সাধুদের রীতি অনুযায়ী 'নারায়ণ নারায়ণ' কি 'শিব শিব' বলে সে নমস্কার ও প্রণাম ব্রহ্মের কাছে পেঁাছে দেবার কথাও মনে পড়ছে না, মনে হ'ল চারিদিকের এই ভক্তিমান জনতা সম্বন্ধে, এ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেই যেন সচেতন নয় সে।

এমন কি, আমার চোখে চোখ পড়তেও কোন পরিচয়ের দীপ্তি ফুটল না—মনে হ'ল আমাকে চিনতেও পারল না সে।

আমার সঙ্গে যে এককালে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, অথবা আমিই যে তার এই অবস্থার উপলক্ষ, কারণ—তাও তার মনে নেই।

অবশ্য সেটা আমার ভুল।

মনে যে ছিল, সে প্রমাণ পেয়েছি অনেকদিন পরে।

দেখা হয় নি, তবে শুনেছি তার কথা। আর একবার অন্তত।

আমার এক পাতানো ঠাকুর্দা ছিলেন—রমেশ ঠাকুর্দা—হতদরিদ্র সহায়-সম্বল-আশ্রয়হীন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—বোধ করি পৃথিবীতে কেউই তাঁকে চাইত না, দেখতে পারত না—তাঁর স্ত্রী এবং আমি ছাড়া।

সে স্ত্রীও বহুকাল পরলোকগত তখন—শেষ অবস্থায় তাঁর দুর্গতির কথা শুনে ঐ তারা ভৈরবীই তাঁকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিল, সেবাযত্ন করে ছিল।

কেন করেছিল তা কেউ জানে না, কোন যোগাযোগ কোন আত্মীয়তাই ছিল না ভৈরবীর সঙ্গে।

সামান্য পরিচয়ের সূত্রও খুঁজে পায় নি কেউ।

কিন্তু আমি জানি সে সূত্র কোথায়।

আমি জানি কেন করেছিল সে।

আমাকে ভোলে নি।

আমার জন্যেই একাজ করেছে।

অন্তত পরে, কথাটা নিয়ে যত ভেবেছি যত চিন্তা করেছি, ততই ঐ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে আমার।

হয়ত নিছক আত্ম-অহঙ্কারই এটা, নিজের মূল্য সম্বন্ধে অস্বাভাবিক উচ্চ ধারণা—তবু অন্য কোন অর্থ এর খুঁজে পাই নি, সংবাদটা নিয়ে মনে মনে বিস্তর তোলা-পাড়া ক'রেও।

রমেশ ঠাকুর্দা সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে—আমি তাঁকে হয়ত বা অকারণেই ভালবাসি—কথাটা মোন্তি জানত।

সেই জন্যেই, আমার মুখ চেয়েই—যাতে তাঁর অন্তিম দিনগুলিতে তিনি একটু স্বাচ্ছন্দ্য পান সেই ব্যবস্থা ক'রে ছিল।

নইলে রমেশ ঠাকুর্দার জন্যে এত মাথাব্যথা হবার কথা নয় ওর।...

কিন্তু সেও বহুদিনের কথা হলে গেল।

দুই যুগ প্রায়।

ক্রমে ক্রমে ভুলেই এসেছিলাম এসব কথা, মেন্তি বা তারা ভৈরবীর স্মৃতিও মনের দিগন্তে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল।

ইতিমধ্যে বয়সও হয়ে গেছে, সেদিনের সে রোম্যাণ্টিক মনও আর নেই।

দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেও প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়াচ লেগেছে, আর তেমন ঔৎসুক্যও নেই।

অথচ একদিন এই তারা ভৈরবীর জন্যেই কিভাবে দৌড়েছিলাম, পাগলের মতো—মনে হ'লে এখন হাসিও যেমন পায়, একটু অবাকও লাগে মাঝে মাঝে—সেদিনের সেই 'আমি'র জন্যে কোথায় যেন একটু ঈর্ষাও বোধ করি।

সত্যি, সে এক দিনই গিয়েছে!

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

কি ক'রে আবার এতকাল পরে তারা ভৈরবীর দেখা পেলুম সেই কথাই আগে বলে নিই।

বাল্যকালে কাশীতে যখন ছিলুম, মা'র অসুখের জন্যে দিনকতক—বছরখানেক প্রায়—হোটেলে খেতে হয়েছিল।

দশাশ্বমেধ রোডের ওপর পার্বতী ঠাকুরের হোটেল—এখনও অনেকের মনে আছে নিশ্চয়, অন্তত যারা আমার বয়সী।

১৯২৬ সালেও কাশী গিয়ে সে হোটেলে উঠেছি, তারপর ঠিক কবে উঠে গেল সে খবর আর রাখি নি।

তখন ঐটেই ছিল ভাল নাম-করা হোটেল, বড় বড় দিশী কোম্পানির ক্যানভাসাররা—এখন যাঁদের রিপ্রেজেনটেটিভ বা সেল্‌স্‌ম্যান্ বলা হয়, গিয়ে ঐ হোটেলেই উঠতেন।

ঐখানেই আমরা তিন ভাই খেতুম, মাসিক ছ'টাকা হিসেবে দিতে হ'ত মাথাপিছু—দুবেলা খাওয়ার জন্যে।

একটু নাকি বেশীই নিয়েছিলেন পার্বতী ঠাকুর (চক্রবর্তী কি ভট্টাচার্য—উপাধিটা মনে নেই, ঠাকুর বলেই সকলে উল্লেখ করত) আমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে। অন্তত তাই বলত সকলে।

তবে যত্ন করতেন খুব, খাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে অভিভাবকের মতোই উপদেশ দিতেন, আহার সম্বন্ধে জ্ঞান দিতেন।

তেতো খাওয়া উচিত রোজ, ভাত বেশী চিবিয়ে খাওয়া উচিত নইলে হজম হয় না—ইত্যাদি।

খাওয়াও—ভাত ডাল ও নিরামিষ তরকারি,—চচ্চড়ি, সুক্তো, কপির ডালনা, কুমড়োর ঘণ্ট—যেদিন যা হ'ত—ইচ্ছেমত চেয়ে খাওয়া চলত। কেবল মাছটাই বাঁধা বরাদ্দ, যা দেবার একবারেই দিতেন, কোনদিন একখানা বা দুখানা—কুঁচোমাছ হ'লে তাও কয়েকটা—ঐ একবার।

মাংসের বেলাও তাই, ছোট ছোট চারটি টুকরো—চাও তো ঝোল নিতে পারো, আলুও পাবে—মোদ্দা মাংস আর পড়বে না হাতা থেকে।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কাশীতে তখন 'রুহু' মাছ ছিল চার আনা সের, বাটা ইত্যাদি ঐ ধরনের মাছ তিন আনা, ইলিশ মাছ দু' আনা—কেবল আড় মাছ ছিল পাঁচ আনা করে—চুনো মাছ চার পয়সা ছ' পয়সা, ওজনও করত না অনেক সময়, একটা কি দুটো পয়সা ফেলে দিলে একরাশ তুলে খদ্দেরের খলুইয়ে পুরে দিত।

মাংসর সের ছিল চার আনা।...

তা হোক—টাকাও এমন কিছু বেশী নিতেন না ঠাকুর, ছ'টাকায় দুবেলা।

তবে কোন কোন খদ্দের সাড়ে-চার পাঁচ টাকাতেও খেত—সেটা আমরা পরে জেনেছি।

যাক গে। এসব প্রাসঙ্গিক কথা মাত্র। হোটেলের কথা তুলেছি অন্য কারণে।

এই হোটেলেই একটি আশ্চর্য মানুষকে দেখেছিলুম।

তাঁর নাম ভূতনাথ না বিশ্বেশ্বর ঐ রকম কী একটা ছিল, ভাল ক'রে শুনিও নি, মনেও নেই—আমরা জানতুম গুরুদেব বলে।

মানে সেও সবাইকে 'গুরু' বলে ডাকত, একা-একাও মাঝে মাঝে 'জয় গুরু' বলে হুঙ্কার ছাড়ত—তাকেও পাল্টা 'গুরু' বলত সবাই।

কেউ কেউ বা সমীহ ক'রে অথবা ঠাট্টা ক'রে গুরুদেব বলত।

কতকটা মেয়েছেলের গঙ্গাজল পাতানোর মতো, এ-পক্ষও গঙ্গাজল বলে—ও-পক্ষও তাই।

সে এক বিচিত্র জীব—এই গুরুদেব।

শুনেছি প্রচণ্ড বড়লোকের একমাত্র ছেলে, বিষয়ের লোভে জ্ঞাতিরা কি খাইয়ে মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল।

চিকিৎসা-পত্র করিয়ে কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'লেও পুরোপুরি সারে নি কোনদিনই।

লেখাপড়া তো হয়ই নি।

হয়েছিল যেটা—নানারকম নেশার অভ্যাস।

তবে মদ কি কোকেন এ ধরনের কোন নেশা নয়।

গাঁজা আর ভাঙ্, এই দুটোই প্রধান।

তবে নেশাখোর হোক—অসচ্চরিত্র যাকে বলে তা নয়।

স্ত্রীলোকের ছায়াও মাড়াত না।

জ্ঞাতিভাইরা কয়েকবারই নাকি চেষ্টা করেছিল ডাল্‌কামণ্ডীতে নিয়ে যাবার—গেছেও বিনা প্রতিবাদে কিন্তু সেখানে গিয়েই 'মা' বা 'মায়ী' বলে এমন এক হুঙ্কার ছেড়েছে যে, তার পর কোন মেয়ে ওকে ঘরে বসাতে সাহস করে নি।

না। ওসব বদখেয়াল ছিল না, শুনেছি বরং সাধুসঙ্গই ক'রে বেড়াত।

কোথাও কোন নতুন সাধু এসেছেন শুনলেই সেখানে গিয়ে পড়ে থাকত।

তখন দু'-তিন দিন পাত্তা পাওয়া যেত না আর—দেখেওছি আমরা মধ্যে মধ্যে, কপালে তো বটেই, সর্বাঙ্গেই বিভূতিমাখা অবস্থায়।

এমনিও, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করত, কপালে ঘাটিয়ালের লাগানো চন্দনের সঙ্গে বিশ্বনাথের বিভূতি ছাড়া কোনদিন দেখি নি ওকে।

কিন্তু এই সাধুসঙ্গের দিনগুলো ছাড়া বারোমাসই পড়ে থাকত পার্বতী ঠাকুরের হোটেলে আর ভূতের মতো খাটত।

বিনা মাইনেয়, বিনা পেটভাতায়।

বিনা খাওয়ায় কারণ মা বেঁচে ছিলেন আর কান্নাকাটি করতেন বলে বেলা দেড়টা দুটোয় একবার ক'রে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসত।

রাতে খাওয়ার প্রয়োজন হ'ত না, দুধ আর মিষ্টি ছাড়া কিছু খেত না—সেটাও মা পাঠিয়ে দিতেন বাড়ি থেকে চাকর দিয়ে।

কিসের লোভে এমন খাটত তা আজও জানি না। শুনেছি গাঁজার লোভ দেখিয়েই পার্বতী ঠাকুর বেঁধেছিল ওকে।

কিন্তু বড়লোকের ছেলে, বিধবা মা'র আদরের ছেলে—গাঁজার কটা পয়সা পাবে না,

এটা বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় আরও কিছু ছিল।

হয়ত খেয়াল, হয়ত এইটেই পাগলামি—এই অকারণ আসক্তি।

শুনেছি পার্বতী ঠাকুর নিজে হাতে প্রত্যেকবার গাঁজা সেজে দিতেন।

সন্ধ্যাবেলা নিজে হাতে ভাঙের শরবৎ তৈরি ক'রে দিতেন।

সে ভাঙ বাটা হ'ত বেলা তিনটে থেকে।

ভাঙ বাটা কাজটা খুব সহজ বা সাধারণ নয়।

তার বিশেষ তরিকা আছে।

পার্বতী ঠাকুরের একটি 'জলপাত্র' ছিল।

উনি বলতেন আমার 'ওয়াইফ্'—কিন্তু কাশীর বহু লোকই জানত যে স্ত্রী তিনি নন। ধনবতী বিধবাকে বার ক'রে এনেছিলেন পার্বতী ঠাকুর, ওদের বাপের বাড়ি রসুইয়ের কাজ করতেন—তারপর বহু জায়গা ঘুরে অনেক ফুর্তি করার পর তাঁরই গয়না বেচে এই হোটেল করেছেন।

এই ভদ্রমহিলার কাজই ছিল বিকেল থেকে বসে ভাঙ্ বাটা।

কারণ সাধারণ ঝি-চাকরকে দিয়ে এ কাজ হবার জো নেই।

বাটতে বাটতে এমন আটা হয়ে যাবে যে, নোড়া তুললে সঙ্গে সঙ্গে, তার সঙ্গে-লাগা-অবস্থায় শিল উঠে আসবে, তবেই নাকি ভাঙ্ ঠিক-মতো বাটা হয়েছে বুঝতে হবে।

এ ভাঙ্ নাকি নিজে খেতেন না ঠাকুর মশাই, 'গুরু'র জন্যেই করা।...

এটা কি শুধুই ওর হাড়ভাঙা নিঃস্বার্থ খাটুনির জন্যে—না বড়লোকের ছেলে টাকা দিয়েও সাহায্য করত, কে জানে!

কেউ আবার বলত, পার্বতী ঠাকুর নানা রকম মন্ত্র-তন্ত্র জানতেন—সোজা বাংলায় গুণ-তুক্ যাকে বলে—তাতেই অমন বশ ক'রে রেখেছিলেন।

তবে আমার মনে হয়—এখন মনে হয় আর কি—তখন শুনেই গিয়েছিলুম, অত বিচার ক'রে দেখি নি বা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি নি—একাধিক দিন শুনেছিলুম, গাঁজার কলকেয় দম দিয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে গুরুদেব বসে আছে, আর পার্বতী ঠাকুর নানারকম আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সঙ্গে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম পৌরাণিক গল্প শোনাচ্ছেন। বোধ হয় তাতেই ঐ নেশাখোর লোকটি ওঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিল।

আজ বুঝতে পারি, সে-সব গল্পের বেশির ভাগই বানানো বা লোকমুখে শোনা—পড়াশুনো পার্বতী ঠাকুরের কতটা থাকা সম্ভব তা বুঝতেই পারছেন—সে-সব গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচিত পুরাণের খুবই অল্প সম্পর্ক ছিল—এমন কি, তখন সেই বয়সেও কয়েকটা গল্প স্রেফ্ আজগুবী বা গাঁজাখুরী বলেই মনে হয়েছিল।

বয়স তখন খুব কম, তবু রামায়ণ মহাভারত বই দুটো মোটামুটি ভাল করেই পড়া ছিল।

রাবণ নাকি ঋষির ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গিয়েছিলেন, সেখানে ময়-দানবের তৈরি প্রাসাদ দেখে হাঁ হয়ে এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ছিলেন—যতদিকে মুখ ঘুরিয়েছেন, ততদিকেই একটা ক'রে মুখ গজিয়েছে, ছদ্মবেশে যাওয়ার জন্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শাপ দিয়েছিলেন তারই ফল এটা। এ গল্প যে কোনও রামায়ণ বা মহাভারতে লেখা সম্ভব নয়, আর গাঁজা কি সিদ্ধিতে ভোম্ হয়ে না থাকলে বিশ্বাসও করা যায় না, এটুকু তখনই বুঝতে পেরেছিলুম।

এই চিজটিই গুরু বা গুরুদেব।

এখনও চোখ বুজলেই চেহারাটা দেখতে পাই।

বেঁটে ধরনের দোহারা চেহারা, শুভ্র গৌর বর্ণ, নাকটা খাঁদা, কতকটা বুলডগের মতো ভাব (উপমাটা ভাল হ'ল না—কিন্তু নইলে বোঝানোও যায় না যে!), চোখদুটি সদাই আরক্ত—সন্ধ্যার দিকে অর্ধনিমীলিত, কপালে চন্দন ও বিভূতিমাখা, গরমের সময় কোন কোন দিন গলায় একটা ফুলের মালাও উঠত, সম্ভবত প্রসাদী—এই অবস্থায় আমাদের ডাল দিয়ে যাচ্ছেন বা হাতায় করে মাংসের ঝোল, কিংবা বড় বড় হাঁড়িতে ক'রে ভাত নামাচ্ছেন।

আমাদের 'বড়দা' বিভূতিবাবুর ভাষায় যাকে বলে ভূতগতো খাটুনি।...

অনেকদিন দেখা পাই নি, মনেও ছিল না অত।

ঊনিশশো ছাব্বিশ সালে যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কাশীতে উঠি তখনও দেখতে পাই নি।

শুনেছিলুম এখানে আর বিশেষ আসে না, নৈমিষারণ্যে কোন্ সাধুর আস্তানায় গিয়ে পড়ে থাকে প্রায়ই।

তার পরও আর দেখা হয় নি।

দেখা করার জন্যে উৎসুকও ছিলুম না—এমনি তো মনে পড়ার কথাও না!

॥ ২ ॥

হঠাৎ এতকাল পরে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কে জানত!

দেখা হ'লও বড় বিচিত্রভাবে।

আমি বলছি ঊনিশশো তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন সালের কথা, ঠিক কোন্ বছর তা আজ আর সঠিক মনে নেই।—মনে ক'রে রাখার চেষ্টাও তো করি নি—গঙ্গার ধারে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার মুখে দেখি চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে কে একটি বৃদ্ধ বসে খুব গল্প জমিয়েছেন।

কাশীতে এ দৃশ্য আদৌ বিরল নয়।

আগে দশাশ্বমেধ কি অহল্যাবাঈ ঘাটে রামায়ণ গান, কথকতা, কীর্তন এসব লেগেই থাকত।

মহিম ঠাকুরের রামায়ণ গান, শরতের কীর্তন—এখনও মনে আছে।

অপেক্ষাকৃত তরুণ শরতের কাছে ভিড় বেশী হ'তে লাগল, বৃদ্ধ মহিম ঠাকুরের মুখ ম্লান হ'তে লাগল দিন দিন।

ঐ মহিম ঠাকুরের একটা কথা আজও মনে আছে, সারাজীবন ধরেই তার যাথার্থ্য অনুভব করছি, 'দ্যাখেন মা কই, শোনেন, আপনার চেয়ে পর ভাল, ঘরের চেয়ে বন ভাল!'

ঐ ঘাটে রামকমলের কীর্তনও হয়েছে এক-আধদিন ; সদ্য বিলেত-ফেরত মণ্টুদা বা দিলীপ রায়ের গানও শুনেছি ঐখানে বসেই।

এ ছাড়াও পাথরের রানার ওপর কি ঘাট-পাণ্ডাদের পাতা কাঠের ওপর বসে বৃদ্ধদের জটলা, একটু কেদারের দিকে এগিয়ে গেলে, মানে নির্জন ঘাটগুলোয় তরুণদের আড্ডা—লেগেই থাকত।

এখনও বৃদ্ধদের জটলা আছে এক-আধ জায়গায়, তবে তখনকার মতো নয়।

অনেকদিন পরে এমনি একটি জটলা দেখে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, একটি ন্যাড়া-মাথা গোলগাল বৃদ্ধ খালি গায়ে বসে খুব উত্তেজিত ভাবে—উদ্দীপ্ত বলাই বোধ হয় উচিত, ইংরেজীতে যাকে animated বলে—কথা বলে যাচ্ছেন, গুটি আণ্টেক-নয় বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় মন দিয়ে বসে শুনছেন।

ফরসা রঙ, কপালে বিভূতি লেপা, তার মধ্যে চন্দনের ফোঁটা—কুলুঙ্গিকাটা নাক—

খুবই পরিচিত না?

বড়ই অস্বস্তি হ'তে লাগল, এত চেনা অথচ ঠিক চিনতে পারছি না বলে।

খানিকটা আকুলিবিকুলি ক'রে—স্মৃতির কপাটে মাথা খোঁড়ার পর—একসময় মনে পড়ে গেল।

কিছুই আর সে চেহারার অবশিষ্ট নেই, আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছেন, দাঁত পড়ে গাল তুব্‌ড়ে গেছে, চামড়া কুঁচকে গেছে মুখের—তবু ও থ্যাবড়া বুলডগের মতো মুখ ভুল হবার নয়—এ সেই 'গুরু'!

তখন আর বক্তৃতার মধ্যে বাধা দিলুম না।

কাছে গিয়ে আমিও এক পাশে বসে পড়লুম।

শুনলুম বলছেন, 'ঐ তো বলছি বাওয়া—আমার কাছে আসো কেন তোমরা? য়্যাঁ? আমি কি সাধু না মহাপুরুষ?...হ্যাঁ, কিছু কিছু সাধুসঙ্গ করেছি এটা ঠিক—তবে সেটা কি রকম জানো? ইস্টিশানের কুলী কি বাজারের খাচিয়াউলীদের মতো।...ওরা কত বড় বড় লোকের মাল বইছে—রাজা মহারাজা মিনিস্টার কত কে—তা তারা কি আর ওদের বিষয়ের ভাগ পাচ্ছে? জানতেও পারে না কে কত বড় লোক, কার কত ঐশ্বর্য বা কার কি পোজিশান!...তাদের পাওনা ঐ দু' গণ্ডা চার গণ্ডা পয়সা, বাঁধা বরাদ্দ। আমারও তো তাই, সাধুদের আস্তানায় গিয়ে পড়ে থেকেছি, মিনি পয়সায় গাঁজাটা দুধটা মিষ্টিটা জুটেছে। ভক্তরা দিয়ে গেলে লাড্ডু পুরীরও ভাগ পেয়েছি। তাই বলে কি তাঁদের সাধনায় ঢুকতে পেরেছি? রাম বলো! আমাকে দেবেই বা কেন? কী আছে আমার? ছোঃ! বলি দিতে গেলে পাত্র—ওঁরা যাকে বলেন আধার—চাই তো? তেল ঢাললেই তো হ'ল না, কিসে ঢালছি হুঁশ থাকা চাই। বাটিতে ঢাললে থাকবে, কলসীতে ঢাললে থাকবে, যত বড় কলসী হবে তত বেশী তেল ধরবে—হাতের আঁজলায় আর কতটা ধরবে বাপু, আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে না! আমার তো আঁজলাও নেই বাওয়া—এ হ'ল গে ফুটো নারকেলের মালা, যা আসে তার ঢের বেশী বেরিয়ে যায়! হে হে!'

আপন মনেই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসেন ভদ্রলোক।

এই হাসিও চেনা।

সে-ই এক ধরন।

কিছুই বদলায় নি।

পোশাকও সেই, কাছা-খোলা পাটকরা-ধুতি পরনে, খালি গা।

উন্নতির মধ্যে দেখলুম কাপড়ের রঙটা গেরুয়া, একটা বোধ হয় সিল্কের চাদর কোমরে বাঁধা—সেটাও ঐ রঙের।

আর গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা।

সমাগত জ্ঞানার্থীদের মধ্যে থেকে কেউ হয়ত কিছু প্রশ্ন করলেন, ভাল শুনতে পেলুম না—শুনলুম তার উত্তরটা।

আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ফোক্‌লা মুখে গাঁজাখোরের চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'তাই তো বলছি, তা আমার কাছে কেন? সাধুর কি অভাব আছে? যাও না, খুঁজে নাও না! কাশী কখনও সিদ্ধসাধকশূন্য থাকবে না, বাবা বিশ্বনাথের বর আছে শোন নি? কাশীতে সাধকের অভাব? ছোঃ!...খুঁজে নিতে হয়। গা নাড়ো একটু। চাড় থাকে, প্রাণে আর্তি গরজ থাকে—ঠিক দেখা পাবে।...সাধু মহাত্মা যাঁরা তাঁরা কি আর তোমাদের দোরে দোরে ঘুরবেন, ওগো দ্যাখোগো, ওগো দ্যাখোগো, আমি খুব বড় মহাৎমা, মস্ত-বড় যোগীপুরুষ এসেছি, আমার পায়ে পড়ো তোমরা—বলে? না, তোমাকে ওষুধের বড়ির মতো পরমার্থ গিলিয়ে রাতারাতি ভবপারের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন?...না, তেমন কেউ বললেই তোমাদের বিশ্বেস হবে?'

এই বলে একটু থেমে আবারও বলে উঠলেন, 'আজকাল ফ্যাশন হয়েছে—বড় বড় উকিল ব্যারেস্টার কি সহস্রমারী ডাক্তারদের মহাপুরুষ গুরু ধরা। পাপে আর মিথ্যে কথায় ডুবে আছেন, লোককে হরেহম্মে টাকা নিয়ে বড়লোক—সে পিরবিত্তি ছাড়তেও পারবেন না, অথচ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও ঢুকে যায় পরলোকের—এদিকেও সময় কম—একটা গুরু ধরে নিশ্চিন্ত হন।...ভাবেন এতেই ভগবানের মাথা কিনে নিলুম, মরবার পর বৈতরণীতে ছিরি-কুলো-বরণডালা নিয়ে বসে থাকবেন তিনি নৌকোয় চেপে—পার করবার জন্যে।...হে হে, অত সহজ নয় বাবা, অত সহজ নয়!'

কে একজন বললেন, 'তা কি লক্ষণ দেখে চিনব—কে যথার্থ সাধু?'

'তা কি ক'রে বলব। খোঁজ, দ্যাখো, যাচাই করো। গুরু নেবে চান্‌কে! মানে পহ্‌চানকে! শোন নি?...সাধু দেখতে চাও? আছে, তারও একটা সহজ উপায় আছে, রাত আড়াইটের সময় মণিকর্ণিকায় গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থেকো—বিস্তর সাধু দেখতে পাবে। যথার্থ সাধু সাধক যাঁরা, তাঁরা ভিড়ের মধ্যে চান করতে আসেন না, তাঁদের চানের সময়ও ঐটে—আড়াইটে, যখন গৃহী বিষয়ী লোকের অর্ধেক রাত। ঐ সময় চুপ্‌ চুপ্‌ এসে চান ক'রে গিয়ে যে যাঁর আসনে বসে পড়েন। বুঝলে? আমাদের কবীর মঠের মোহান্ত, এই কামরূপ মঠের মোহান্ত—এত দূর দূর থেকে উঠে চলে যান মণিকর্ণিকায়। বহু সাধু আসেন ঐ সময়, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেন না, আবার দু-একজন আলাপও করেন, অধিকাংশই মৌনী থাকেন, আপন মনে ইষ্টচিন্তা করেন।...এই যে আমার মাথার ওপরে মৌনীবাবা আছেন—মানে এই ঘাটের ওপরে—সবাই জানে উনি চৌষট্টিতে চান করেন—দুবেলা দেখে তো—কিন্তু উনিও সেই রাত দুটোয় উঠে ঘাট দিয়ে ঘাট দিয়ে চলে যান ঐখেনে। হে হে।'

অকারণেই হেসে ওঠেন 'গুরু'জী।...

আরও খানিকটা এটা ওটা 'সৎপ্রসঙ্গ' আলোচনার পর একে একে বৃদ্ধের দল উঠতে লাগলেন।

দু-একটা যা আরও কথা হ'ল তাতে বুঝলুম উনি কিছুমাত্র বিনয় করেন নি, সত্যকে আচ্ছাদিত করারও চেষ্টা করেন নি—উন্নতি ওঁর এই পোশাক ছাড়া আর কিছুতে হয় নি।

উদাহরণস্বরূপ পৌরাণিক আখ্যান উদ্ধার ক'রে যে সব উপদেশ দিতে লাগলেন তাতে তখনও পর্যন্ত পার্বতী ঠাকুরের প্রভাব স্পষ্ট।

অম্লান বদনে দ্বাপরের লোক টেনে এনে সত্যযুগের কাহিনী বিবৃতি করছেন, ব্যাসদেবের ছেলে পরাশরের গল্প শোনাচ্ছেন!

বুঝলুম সাধু দু-চার জন সত্যিকারের দেখেছেন ঠিকই—কিন্তু দেখার বেশী আর এগোতে পারেন নি।

তাও, তাঁদেরও যে সব অলৌকিক কীর্তিকলাপের রোমাঞ্চকর বিবরণ দিলেন, তা এই বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত।

•

একে একে সবাই চলে গেলে আমি কতকটা ওঁরই ঢঙে 'জয় গুরু!' বলে একটু কাছ ঘেঁষে সরে গেলুম।

সেই প্রায়-অন্ধকারেই ঢুলু ঢুলু অর্ধনিমীলিত চোখ দুটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে চাইবার চেষ্টা করতে করতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কে বাওয়া, অমন বেতর আওয়াজ ছাড়ছ! বুলিটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! পুরনো পাপী বুঝি? চিনিস আমাকে?'

আর একটু কাছ ঘেঁষে বসে উত্তর দিলুম, 'একটু একটু। অনেকদিন, প্রায় চল্লিশ বছর অগের দেখা। উনিশশো সতেরো আঠারো হবে। পার্বতী ঠাকুরের হোটেলে আমরা

খেতে যেতুম তিন ভাই, মনে আছে? আপনার অবিশ্যি মনে থাকার কথা নয়—'

'কেন, নেশায় ভোম্ হয়ে থাকতুম, তাই? হুঁ হুঁ, নেশাই করি আর যা-ই করি—ঠিকে ভুল হ'তে দেখেছিস কখনও? অন্তত এখনও এই তেষট্টি বছর বয়সেও তো হয় নি। অবিশ্যি অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তবু মনে পড়ছে বৈকি। মোটা মোটা তিনটে ভাই খেতে আসতিস, পার্বতী ঠাকুর ঠকিয়ে ছ'টাকা ক'রে নিত। চার টাকায় কত লোক খেয়ে যেত মাসে, তোদের বোকা পেয়ে—যাক গে! পরনিন্দায় কাজ নেই। তা তুই কোন্‌টা? ছোটটা—না মেজটা?'

'আমি ছোট।'

'হুঁ। তা এতকাল পরে কোথা থেকে? কী করিস এখন? আমাকে এই অন্ধকারে চিনলি কি ক'রে?'

'আপনার গলার আওয়াজে, আর—কিছু মনে করবেন না—আপনার মুখ দেখে, অমন মুখ তো চট্ ক'রে চোখে পড়ে না।'

'তা পড়ে না ঠিকই। বিধাতার এ ছাঁচে এই একটিই মুখ উঠেছিল। তা কি করিস এখন?'

বললুম। বলে প্রশ্ন করলুম, 'আপনি কোথায় থাকেন এখন?'

'কেন, এই যে—পাতালেশ্বরে। নিজের পৈতৃক বাড়িতে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'মা মাগী ফাঁসিয়ে গেল যে।...গেলুম উত্তরকাশীতে শাকাহারী বাবার কাছে সন্ন্যাস নিতে—শুনলুম পাপীতাপী সবাইকে বাবা নির্বিচারে সন্ন্যেস দেন, তা দিলেনও—কিন্তু দিয়ে হুকুম করলেন, যা বেটা আজই বাড়ি ফিরে যা, তোর মা'র খুব অসুখ—সেবা করগে যা। বলতে গেলুম, সে তো পূর্বাশ্রমের মা, এখন আর তাঁর সেবা করব কি ক'রে? তা বাবা খিস্তি ক'রে গাল দিতে দিতে চিমটে নিয়ে তেড়ে এলেন। বললেন, ও বেটা, এ দেহটা যতক্ষণ ধরে আছিস ততক্ষণ পূর্বাশ্রম কি রে! আগে এটাকে পুড়িয়ে মার—তবে তো নতুন জন্মের কথা উঠবে।...যা বেটা, মা'র তুল্য কেউ নেই, ভগবান বল ইষ্ট বল সব তোর ঐ!...ফিরে এলুম, মাগীর প্রাণটা ছিল বোধ হয় আমার জন্যেই—পরের দিনই পটল তুলল, কেবল যাবার আগে আমাকে বেঁধে গেল। বললে, বাবা, মরবার আগে আমাকে কথা দে, সাধন ভজন যা করার করিস, সন্ন্যিসী সাধু যা হোস—এই বাড়িটা ছাড়িস নি, এইখানে বসেই যা করার করিস। তাতেই তোর সিদ্ধি হবে।...বাস, সেই থেকে আটকে আছি। কোথায় সিদ্ধি আর কোথায় কি! খেয়ে ঘুমিয়ে আড্ডা দিয়ে দিন কাটছে!'

এর পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। আস্তে আস্তে গঙ্গার জলের ওপর সন্ধ্যার ছায়া নামছে, কালো জলে আর আকাশেতে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে দু' একটা নৌকো যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে ঘাট দেখাতে দেখাতে—ফিরতি নৌকো ফিরছে মাঝ-গঙ্গা দিয়ে। মানুষগুলো দেখা যাচ্ছে না, শুধু সাদা জামা কাপড় দেখা যাচ্ছে, আর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

টুকরো টুকরো কথাও ভেসে আসছে, মাঝিদের কথা, 'ইয়ে হ্যায় চৌষট যোগিনী, উয়ো রাণা মহল!' ইত্যাদি। ওদিকের কোন ঘাটে বাতি ভাসাচ্ছে কেউ কেউ, তার দু-একটা ভেসে যাচ্ছে জলের স্রোতে।

অন্ধকার ঘাটগুলোয় দু-একটা আলো।

পিছনে দশাশ্বমেধের জোর আলোটা যেন এর মধ্যে রসাভাস বলে মনে হয়। ভাগ্যে পিছন ফিরে আছি।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল, প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা গুরুজী, তারা ভৈরবীকে চেনেন?'

'তারা মা? চিনি বৈকি। মানে দু'চার দিন দর্শন লাভ হয়েছে। কেন বল্ দিকি?

তুই তাকে চিনলি কি ক'রে?'

'ছোটবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল, গল্প করার লোক।'

'সে কি রে! এ যে নতুন কথা শোনাচ্ছিস। ওর ভাইগুলো যে শুনেছি মহা গুণ্ডো আর ছোটলোক ছিল, সেই ভয়ে ওদের বাড়িতে কেউ যেত না। মানে কোন ভদ্দরলোক। তোর সংগে চেনাজানা হ'ল কি ক'রে তাহ'লে?'

বললুম চেনা-জানার ইতিহাসটা।

সবই খুলে বললুম ওঁকে।

সে ইতিহাসের একটা অংশ ওঁরও জানা ছিল বৈকি।

মা'র শরীর একেবারে ভেঙে পড়তেই আমাদের হোটেলে খাওয়া ধরতে হয়।

কিন্তু সমস্যাটা তাতেও পুরোপুরি মেটে না।

মা কি খাবেন? অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা সুরাহা হ'ল—অবশ্য যদি একে সুরাহা বলা যায়—এক ব্রাহ্মণবাড়িতে নারায়ণের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

আমরা যে বাসাবাড়ির একাংশে ভাড়া থাকতুম, সেই বাড়িরই নিচের দিকে একখানা ঘরের ভাড়াটে ছিলেন গোসাঁইগিন্নি, সেকালের কাশীর বিখ্যাত বৃদ্ধা বাঙালী অধিবাসিনীদের একজন—তবে ওরই মধ্যে একটু ওপরতলার হয়ত।

মানে তাঁর মাসিক আয় ছিল আট টাকা।

এই গোসাঁইগিন্নির কী একটু আত্মীয়তার সূত্র ছিল মটরার মায়েদের সংগে।

কার যেন প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজারী হিসাবে একখানা বাড়ি পেয়েছিলেন মটরার বাবা, শর্ত ছিল, ঠাকুরের নিত্যসেবা ও পূজা করতে হবে তাঁকে।

এমন বহু ব্রাহ্মণই কাশীতে দেবোত্তর ভোগ করতেন—এবং বলা বাহুল্য সেবাটা করতেন না।

মটরার বাপও এই দলেরই লোক ছিলেন।

নেশাখোর মদ্যপ ব্রাহ্মণ—ঠাকুরের সিংহাসনটা পর্যন্ত বেচে নেশা ক'রে গেছেন।

তবু বাড়িতে শিব আছেন, নারায়ণ আছেন, গোপাল বিগ্রহ আছেন।

শিবকে একটু ফুল বেলপাতা দিলে চলে, নারায়ণের ভোগ দিতেই হবে, বিশেষ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর।

যেমন ক'রেই হোক—নিত্য একটু ডালভাতও অন্তত নিবেদন করতে হয়।

সেই প্রসাদ পাওয়ারই ব্যবস্থা করে দিলেন গোসাঁই দিদিমা—আর প্রসাদ পাবেন বলেই মা আমাদের লক্ষ্মীকুণ্ডর বাড়ি থেকে মটরাদের পাঁড়ে হাউলির বাড়ি—প্রায় দেড় মাইল কি কিছু বেশীই হবে—হেঁটে যেতে রাজী হলেন।

সেই সূত্রেই আমার যাওয়া-আসা ও বাড়িতে।

প্রথম প্রথম প্রত্যহই মা'র সংগে যেতে হ'ত।

কিছুদিন পরে আর রোজ যাওয়ার দরকার ছিল না—তবু মাঝে-মধ্যে যেতুম, কতকটা নিজের গরজেই।

তার মানে এর ভেতর আমারও একটু আকর্ষণের কারণ ঘটেছিল।

দু'একদিন যাওয়ার পরই পরিবারটির পরিচয় পাওয়া গেল।

মটরার মা খুবই ভাল, নিপাট ভালমানুষ যাকে বলে, যত্ন করতেন বললে কম বলা হয়—মাকে কতকটা গুরুপত্নীর মতোই খাতির করতেন যেন—কিন্তু ছেলেগুলো সব কটাই ছিল অমানুষ, পশু।

বয়স বেশী নয় কারুরই, ছোটটা তো তখন বোধ হয় মোটে ষোল বছরের—তবু ঐ বয়সেই নেশায় পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল তিনটি ছেলেই। আনুষংগিক অনাচার—necessary evil যাকে বলে—তো ছিলই।

তার মধ্যে জুয়াটাই প্রধান।

ছেলের মতিগতি ফেরাবার আশায় মটরার মা—মাসিমা বলতুম আমি—মাত্র উনিশ বছর বয়সে বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হয় নি।

আর একটা বোঝা বেড়েছিল মাত্র, শুধু শুধু পরের মেয়েটার হাড়ির হাল।

গোটা সংসারটাই মাসিমাকে চালাতে হ'ত।

ভূতের মতো খাটুনি খেটে কোনমতে ডালভাতের সংস্থান করা, পুরস্কার ছিল ছেলেদের হাতে মধ্যে মধ্যেই চোরের মার খাওয়া।

অত দুঃখের পয়সাও—যে যেমন পেত মেরে-ধরে কেড়ে নিয়ে যেত।

খুবই দুঃখের পয়সা।

আমার মায়ের মতো আরও দুটি 'পেয়িং গেস্ট' ছিল ; একটি ভাড়াটে ছিল দোতলার ঘরে—এক মহিলা, তিন টাকা ভাড়া দিতেন—তাঁর যাবতীয় খেজমৎ খাটতে হ'ত মাসিমাকে।

ঝিয়ের মতো খাটিয়ে নিতেন, কয়লা ভাঙ্গা, উনুন ধরানো, ওপরে জল তুলে দিয়ে আসা—সব।

এছাড়া অবসর সময়ে ঠোঙা গড়তেন, সামান্যই আয় হ'ত তাতে—তবে সেটুকুও অবহেলা করার অবস্থা ছিল না।

ভদ্রমহিলার শান্তি ছিল দুটি মেয়েতে।

খেন্তি আর মেন্তি।

এরাই ছোট, তবু ওরাই ছিল তাঁর দুঃখের অংশীদার, ব্যথার ব্যথী।

মেন্তি ছিল বোধ হয় আমার এক বয়সী, ভারী শান্ত মিষ্টি মেয়েটি, ভীরু আর লাজুক ধরনের—খেন্তি ওর থেকে দু'তিন বছরের বড়।

তবু ঐ বয়সেই খেন্তি মা'র যাবতীয় খাটুনির দোসর ছিল।

কাজ কম নয়—রান্না-বান্নার যোগাড় দেওয়া, এত বড় বাড়ির ঘর ধোয়া মোছা, গরমের দিনে একটা আঁধি ওঠার পর গোটা বাড়িটাই ঝাড়া-মোছা করতে হ'ত, ঠাকুরঘরের কাজ, পুজোর আয়োজন—সবেতেই সাহায্য করত।

মায় ওপরের সেই ভাড়াটে মহিলার জল তুলে দিয়ে আসা পর্যন্ত।

দুপুরে মা'র সঙ্গে বসে ঠোঙাও গড়ত।

এক ব্যাপারী কাগজ গুনে দিয়ে যেত, হিসেব ক'রে গুনে ঠোঙা নিয়ে যেত আবার—এ'রা শতকরা হিসেবে মজুরী পেতেন।

সেইজন্যেই আরও—খেন্তির সঙ্গে ভাবটা খুব জমতে পারে নি।

জমেছিল মেন্তির সঙ্গে। ছোট মেয়ে বলেই মা আর দিদি ওকে বিশেষ কিছু করতে দিত না। গল্প করার বা খেলা করার অবসর মিলত ওর সঙ্গে। খেলার কোন উপকরণ ছিল না, গল্পই হ'ত বেশির ভাগ।

আমি গেলেই 'গল্প বলো' বলে ধরত, আমিও এটা ওটা বই থেকে, রামায়ণ মহাভারত থেকে যা পারতুম গল্প বলে যেতুম।

এই খাটুনি, খাওয়া তো নিরুপলক্ষ ডালভাত বলতে গেলে, পরনেও যা করে কুমারী-পুজোর পাওনা মোটা গুনচটের মতো সস্তা দামের মিলের শাড়ি—আদর-যত্ন কাকে বলে তা বোধ হয় জীবনেই জানে নি কোনদিন, দাদাদের ফরমাশ খাটতে খাটতে প্রাণান্ত হ'ত, তার বদলে 'চড়চাপড় গায়ের কাপড়' বকশিশ মিলত—তবু তাতেই ওদের রূপ যেন ধরত না।

বিশেষ ক'রে মেন্তি. অমন দুধে-আলতা রঙ কোন বাঙালী মেয়ের আজ অবধি দেখি নি।

মা বলতেন বসরাই গোলাপ।

তেমনি মুখশ্রী আর কমনীয় গঠনও।

খেটে খেটে খেন্তির ঐ বয়সেই হাত-পাগুলো একটু শির-বার-করা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মেন্তির—রোগা হ'লেও গোলালো নরম হাত-পা—দেখলে ফুলের কথাই মনে পড়ত।

ওখানে মাস-কতকের বেশী মা খান নি।

বোধ হয় মাস-আণ্টেক হবে বড় জোর।

প্রথমত নিত্য—দুটো একাদশী ও অমাবস্যা পূর্ণিমা ছাড়া—অত দূর হেঁটে যাওয়া পোষাত না, দ্বিতীয়ত মটরার মা যতই যত্ন করুন—দিনের পর দিন ডাল ভাত আলুভাতে, একটা সব চেয়ে সস্তা সবজীর তরকারি আর চিনিগুড়হীন টক—প্রসাদ মাথায় থাকুন—এ খেয়ে থাকা যায় না।

তার ওপর আমাদের কষ্ট হচ্ছে, ঝড়-জল-শীতে দু'বেলা অত পথ ঠেঙিয়ে হোটেলে খেতে যাওয়া—এই সব কারণেই ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে মা আবার হাঁড়িবেড়ি ধরলেন।

যেতে যাওয়া বন্ধ হলেও যাওয়া আসা বন্ধ হয় নি একেবারে।

যোগাযোগ একটা ছিলই।

ছেলেগুলো যতই বাঁদর হোক—আমার রাশভারী মায়ের সামনে কোনদিন অসভ্যতা বেচাল করতে সাহস করত না—মা'রও তাই যাওয়ার বাধা ছিল না, মাসিমাও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতেন মা গেলে।

এর মধ্যে খেন্তির বিয়ে হয়ে গেল, তখনও আমরা ওখানে আছি।

বিধাতার যোগাযোগ—নইলে বিয়ে দেওয়ার অবস্থা নয় ওঁদের। দোজবরে পাত্র, রেলে কাজ করে, এলাহাবাদে নিজের বাড়ি, প্রথম পক্ষের দু'তিনটি ছেলেমেয়ে আছে, নিজে মুখেই বলেছে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স—খেন্তির তখন পূর্ণ তেরো—তা হোক, তবু ভালই হ'ল বলতে হবে।

পাত্রপক্ষই পুরো খরচ করে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এতখানি সুবিধে ছাড়া উচিত নয়—এঁরাও ছাড়েন নি।

তবু প্রথমটা মাসিমা ইতস্তত করেছিলেন, পুরো একটা টাকারও যার সঙ্গতি নেই—সে বিয়েতে নামে কি ক'রে!

শেষে আত্মীয়স্বজনরা ভরসা দিতে একরকম ভিক্ষেদুঃখু করেই ঘর-খরচের টাকাটা যোগাড় হয়ে গেল।

ভাগ্যে দিয়েছিলেন বিয়ে, বয়সের অতটা ব্যবধান বলে আপত্তি করেন নি—তাই খেন্তি তবু একটু সুখের মুখ দেখেছিল।

ছেলেমেয়ে হয়েছে—আমি নিজে দেখে এসেছি ওদের শান্তির সংসার।

জামাই সতীশবাবু অতি সজ্জন, অমায়িক ব্যক্তি। বেঁচেও ছিলেন অনেকদিন, খেন্তি দীর্ঘদিন সিঁদুর পরতে পেরেছে।

বিয়ে মেন্তিরও হয়েছিল অবশ্য।

বৃন্দাবনের কোন্ বিখ্যাত গোসাঁই বংশের গৃহিণী গঙ্গার ঘাটে মেন্তিকে নাইতে দেখে কি জাত জেনে পরিচয় নিয়ে নিজে উপযাচক হয়ে গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি।

সমস্ত শাড়ি গহনা মায় এদের ঘর-খরচা পর্যন্ত দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে মেয়ে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি।

তখনকার দিনেও অন্তত চল্লিশ হাজার টাকার গহনা পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বৌকে, সমস্ত হীরার গহনা, টায়রা থেকে শুরু ক'রে কোমরের চন্দ্রহার পর্যন্ত।

নেহাত পায়ে সোনাজহরৎ পরতে নেই—তাই দেন নি।

মথুরা থেকে হাতীঘোড়ার রেশেলা গিয়েছিল বরকনের সঙ্গে।

তবু মেন্তি সুখী হ'তে পারে নি।

তার কারণ—এ'রা কোন খোঁজখবর নিতে পারেন নি, নেওয়া সম্ভবও ছিল না, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া—দুটি প্রবলা বিধবা ননদ।

তারাই বড়, পাত্রের থেকে বয়সে অনেক বড় দিদি তারা।

ছেলেটি ভালমানুষ, চিরদিন এই জাঁহাবাজ দিদিদের হুকুম তামিল ক'রে এসেছে, বোধ হয় একটু বোকাও—কে জানে কোন ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে অমন থুমথুমে ক'রে রেখেছিল কি না—সে এই অত্যাচারের কোন প্রতিকারই করতে পারে নি।

নামে সে-ই গোসাঁই বা সেবাইৎ মোহান্ত হলেও, ঐ দুটি স্ত্রীলোকই মাকে আর ভাইকে চালাত, সেই সঙ্গে এই বিপুল কারবারও।

ওরা থাকতে ভাইয়ের কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা নয়—নিতান্ত বিধাতার চক্রান্ত বলেই হ'তে পেরেছিল।

ওদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল—দুই বোন একসঙ্গে তীর্থ করতে বেরিয়েছিল, সেই অবস্থায় মা এই কান্ড ক'রে বসেছিলেন।

কথা দেওয়া হয়ে গেছে, সে কথা আর ফিরিয়ে নেওয়া গেল না।

ওরা তখন প্রতিকারের অন্য পথ ধরল।

এটা ওরা বুঝেছিল যে এই অসামান্য সুন্দরী বধূটি চিরদিনই বালিকা থাকবে না।

একদিন সে বড় হবে, নিজের পাওনা-গন্ডা বুঝতে চাইবে, দাবী করবে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার।

আর এই আশ্চর্য রূপের মোহে পড়ে ওদের ভাইটিও ঐ পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়ে বসবে—তখন আর বোনেদের ভয়ে এমন অমানুষ জন্তু হয়ে থাকবে না।

সুতরাং প্রথম থেকেই কড়া হাতে রাশ ধরল ওরা।

বর-বৌ সেই ফুলশয্যার রাত্রির পর আর কোনদিন একসঙ্গে শুতে পায় নি।

ননদরা রায় দিলেন, 'অতটুকু মেয়ে এখন পোয়াতী হ'লে ছেলে রুগ্ণ হবে।'

বড় ননদের সঙ্গে শুতে হ'ত—তাও কোনদিন ভাল একটা কাপড় কি গহনা পরতে দেয় নি, ঝিয়ের মতো রেখেছিল।

বড়লোকের বাড়িতে ঝিয়েরাও বোধ হয় ওর চাইতে ভাল কাপড় জামা পরে।

তারা কৈফিয়ৎ দিত, 'গরিবের ঘরের মেয়ে, হঠাৎ বড়লোকের চালচলনের মধ্যে এসে পড়লে মাথা ঘুরে যাবে।'

মেন্তির শাশুড়ী দজ্জাল মেয়েদের ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলেন, তাঁর ভয় ছিল মেয়েরা ভাইকে বিষ খাইয়ে আধপাগলা ক'রে দিয়েছে—তার ওপর কোপে পড়লে তাঁকে হয়ত মেরেই ফেলবে।

তিনি কোন কথা কইতে পারলেন না, ওর বরও চুপ ক'রে রইল।

তাও তবু একরকম চলছিল।

কাল হ'ল আমাদের বৃন্দাবন গিয়ে পড়া। হঠাৎ মেন্তির সঙ্গে মা'র দেখা হয়ে গেল।

মানে মেন্তিই ছুটে এল ওঁকে দেখতে পেয়ে।

তা নিয়ে ননদ একজন নভূতো নছুতো ক'রে মাকে তো লাঞ্ছনা করলই—মেয়েটাকে কি করল তা ভগবানই জানেন।

তবে এবার টনক নড়ল ওদের।

বুঝল, এইভাবে রেখেছে বৌকে—আমরা যদি পাঁচ জায়গায় বলে বেড়াই, বৌয়ের ভাইরা এসে যদি এ নিয়ে ঘোঁট পাকায় (ভাইদের কত গুণ তা জানবার কথা নয় ওদের) —তাহ'লে আর কিছু না হোক, বৃন্দাবনের সমাজে নানা লোকে নানা কথা বলবে।

সুতরাং এ কাঁটা এখনই দূর করা দরকার।

মেন্তিকে জেরা ক'রে মা ওর্র কী রকম মাসিমা জেনে নিল ননদরা ; কায়স্থ আমরা —নেহাৎই পাড়া-সম্পর্ক জেনে, আমি যে ওর খেলার সাথী ছিলুম সে কথাটাও বার করল।

আমি চিরদিনই বড়সড়—যাকে বলে বাড়নশা গড়ন।

যখন বৃন্দাবনে গেছি প্রথম, তখন আমার বড় জোর পনেরো বছর বয়স, কিন্তু তখনই আমাকে সতেরো বছরের ছেলে মনে হ'ত।

তবে তাতেই ওদের কাজ চলে গেল।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

আমার সঙ্গে চরিত্রের দুর্নাম দিয়ে, মেয়ে নষ্ট এই কথা বলে দারোয়ানের সঙ্গে এক কাপড়ে পাঠিয়ে দিলে কাশীতে।

দরজার বাইরে পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে, মর্মান্তিক সংবাদটি জানিয়ে দারোয়ান চলে গেল।

স্বামী শাশুড়ী কোন প্রতিবাদ করতে পারে নি—এ'রাও কোন প্রতিকার করতে পারলেন না।

মাসিমার সে সামর্থ্য ছিল না—না অর্থবল না লোকবল।

ভাইরা তো ঐ গুণধর, তারা বোনের এই দুর্ভাগ্যে খুব একটা দুঃখিতও হ'ল না বোধ হয়।

প্রতিবাদ করা বা থানা পুলিস কি আইন আদালত করার কথা তাদের মাথাতেও এল না।

মাথায় যেটা এল—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ—ছোট দাদা মোটা টাকা নিয়ে সুন্দরী বোনকে এক সাধুর কাছে বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল।

এসব ঘটনা যখন ঘটছে তখন আমি কলকাতায়—ইস্কুলে পড়ছি।

অনেক পরে কাশীতে এসে ওদের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম সব।

তারপর বিস্তর চেষ্টা ক'রে খুঁজে বারও করেছি—বিন্ধ্যাচলের কাছে অষ্টভুজার মন্দির আছে, তারই তলায় এক ঝোপ্ড়ায় বাস করছিল।

সেই সাধুর সঙ্গেই, বোধ হয় তার উত্তরসাধিকা হয়ে।*

সেই জন্যেই নাকি সাধু কিনেছিল তাকে।

আমি সেখানে গিয়ে দেখা ক'রে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলুম, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে, লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন উপার্জনের ব্যবস্থা ক'রে দেব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

কিন্তু সে আসে নি।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে হয় সেই সাধুটা ওকে রীতিমতো কব্জা করেছিল—আসবার শক্তি বা ইচ্ছে কোনটাই ছিল না।

সেই সাধুই ওর নাম দিয়েছে তারা।

* তারা ভৈরবীর পূর্বাশ্রমের পূর্ণ বিবরণ লেখকের 'তবু মনে রেখো' বইতে পাওয়া যাবে।

আমি নিজে 'তারা' বলে ডাকতে শুনেছি।...
সেই তারাই নাকি এখন তারা ভৈরবী হয়েছে।
দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত ক'রে চুপ করলুম এক সময়।
একটি কথাও বলেন নি 'গুরুদেব' এর মধ্যে, কোন বাধা সৃষ্টি করেন নি।
প্রশ্ন তো করেনই নি।
চোখদুটি সর্বদাই অর্ধনিমীলিত থাকে, ঘুমোচ্ছিলেন এতক্ষণ কি আমার কথা শুনছিলেন তা বুঝতেও পারলুম না—সেই অন্ধকারে।
তখন রীতিমতোই অন্ধকার হয়ে এসেছে ঘাট।
যা ওপরের বিজলীবাতির আভা একটুখানি—আর দূরে দশাশ্বমেধের ফ্লাডলাইটের আভাস।
তাতে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না।
গঙ্গা বেয়ে যেসব প্রমোদযাত্রীরা তখনও নৌকো ক'রে যাচ্ছেন তাঁদের আবছা আদলটা মাত্র বোঝা যাচ্ছে। মানুষগুলো কে কেমন কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।
তবে কথা শেষ হ'তে বুঝলুম—জেগেই ছিলেন ; শুনেছেনও সব মন দিয়ে।
কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, 'তা এতদিন পরে তাকে খুঁজছিস কেন আবার ?'
'আছে একটু দরকার। আমার নাম ক'রে সে একটা কাজ করেছে—সৎ কাজই অবশ্য—কিন্তু কেন করল সেটা জানতে ইচ্ছে করে। আমাকে সে এখনও মনে রেখেছে, আমার প্রিয় কাজ করতে চায়—অথচ সেদিন কেন এল না—এমনি হাজার কৌতূহল। সে আপনাকে বোঝাতে পারব না।'
গুরুজী বুঝতে চাইলেনও না।
তবে উত্তর দেবার আগে হাত তুলে নমস্কার করলেন একটা।
বোধ করি ভৈরবী মায়ের উদ্দেশেই।
বললেন, 'শুনেছি, বেশ ভাল ভাল লোকের মুখেই শুনেছি, তারা ভৈরবী খুব উচ্চ-কোটির সাধিকা। ওঁর যিনি গুরু—যাঁর কথা বলছিলি তুই, কব্জা করার কথা—তিনি সেরকম লোক ছিলেন না। খুবই বড় সাধক ছিলেন, ইচ্ছে করলে যাঁরা দিনকে রাত করতে পারেন—সেই ধরনের সাধক। তবে ওঁরা তো প্রকট হন না—নিজেকে গোপন ক'রে রাখেন। যাদের পূর্ব-জন্মের কিছু সুকৃতি আছে তারাই কৃপা পায়। তিনি ঐ তারা ভৈরবীকে সঙ্গে ক'রে নাকি সারা ভারত ঘুরেছেন, সমস্ত পীঠস্থান দর্শন করিয়েছেন—বাহান্নটা, তারপর স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ রেখেছেন, এইখানে—মণিকর্ণিকায়। অদ্ভুত মৃত্যু, সেদিন আমিও দেখতে গিয়েছিলুম, হেঁটে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে সমাধিস্থ হলেন—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। ঠিক কখন কবে কোন্ সময় দেহ রাখবেন—পাঁজিপুঁথি দেখে আগেই বলে দিয়েছিলেন।...তা তারপর থেকে ভৈরবী মা নাকি আর কাশী ছেড়ে যান নি কোথাও, এখানেই থাকেন।'
'কিন্তু সে জায়গাটা কোথায়—যেখানে তাঁর আস্তানা?' একটু অসহিষ্ণুভাবেই প্রশ্ন করলুম।
'উটি বাপু বলতে পারব না। কাউকে কখনও বলেন না। অবিশ্যি তেমন ভাবে কোন-দিন খোঁজও করি নি। তবে শুনেছি—সেই অঘা ভাইগুলোকে এখন নিয়মিত সাহায্য করেন মা। তারা বলতে পারে, খবর রাখে নিশ্চয়।...তাদের কাউকে ধরতে পারিস কি না দ্যাখ না! মটরাটা নাকি মদ চোলাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল—আর এদিকে আসে নি। তবে ভোঁদা আছে। সেটা দিনকতক বোনের পয়সায় নিশ্চিন্ত হয়ে গানবাজনা ধরেছিল—এখনও নাকি বাঈজী মহল্লাতেই ঘোরাঘুরি করে। দ্যাখ না যদি

খ‍ুঁজে বার করতে পারিস। সে দিতে পারবে সন্ধান।'

খুব সোজা কথা বলে দিলেন!

বাঈজী মহল্লা বলতে ঠিক কোন্‌খানটা বোঝায় তা-ই জানি না।

ডালকামন্ডীতেই কী?...

আর সেখানে গিয়ে ভোঁদা কোথায় থাকে খোঁজ করা—সে তো এক বিশ্রী ব্যাপার!

ভাল নামটাও জানি না। ভোঁদা বললে কি চিনবে কেউ?

তবে সে সব কথা ওঁকে বলে লাভ নেই।

বললুম, 'তা তারা ভৈরবী মণিকর্ণিকায় আসে না? সেখানে গেলে ধরা যাবে না রাত আড়াইটেয়?'

'উঁহুঁ। কৈ, কোনদিন তো দেখি নি। শুনেছি বরুণার ধারে আদিকেশবের কাছাকাছি কোথায় থাকেন। ঐখানেই স্নান করেন। তবে গঙ্গাতেও আসেন বৈকি। কিন্তু কবে কখন কোন্ ঘাটে নামবেন তা ঠিক নেই। না, সেসব কোন কাজের কথা নয়। তুই ঐ ভোঁদারই সন্ধান দ্যাখ।'

এই বলে উঠেই পড়লেন একেবারে।

আবারও একবার হাত তুলে নমস্কার করলেন কাকে—চৌষট্টি যোগিনীকে অথবা গঙ্গাকে অথবা আবারও সেই ভৈরবী মাকে—ঠিক বোঝা গেল না।

কিম্বা বারানসীপুরপতি বাবা বিশ্বনাথকেই।

তবে আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না আর।

সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেলেন।

॥ ৩ ॥

সত্যিই ভোঁদাকে খুঁজে বার করা খুব সহজ হ'ল না।

খবর নিয়ে নিয়ে দু-একজন বিখ্যাত বাঈজীর বাড়ি বার করলুম—তাদের মুন্সীদের মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে অনেক জিজ্ঞাসাবাদও করলুম—কিন্তু কেউই ভোঁদা বলে ঐ ধরনের কোন লোককে মনে করতে পারল না।

শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেব প্রায় এই অবস্থা—হঠাৎ চৌখাম্বার মোড়ে আসল লোকটির সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল।

অবশ্য আন্দাজেই ধরলুম, চেনবার উপায় নেই।

আমার স্মৃতিতেও একটা ক্ষীণ আদল মাত্র ছিল, তা থেকে এতকাল পরে—সে চেহারা থাকলেও চেনার কথা নয়।

সে চেহারাও ছিল না।

অমন ছ'ফুট লম্বা দেহ যেন বেঁটে হয়ে গেছে, আসলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলেই অমনি দেখায়—সে গৌর বর্ণও আর নেই, মাথার সামনে অর্ধেকটা পর্যন্ত টাক—চওড়া বুকের মাংস শুকিয়ে ঝলঝল করছে।

তবু কী যেন একটা সাদৃশ্য ছিল—সেই বহুদিন আগেকার-দেখা ভুলে-যাওয়া ভোঁদার সঙ্গে—কেমন আবছা-আবছা মনে হ'ল—এই-ই সেই ভদ্রলোক।

সন্ধ্যের দিক সেটা।

চোখ দুটি ঢুলঢুল করছে সিদ্ধির নেশায়, হাতে একটা চামেলি ফুলের মালা, খালি গায়ে একটা সিল্কের চাদর আধ-জড়ানো অবস্থায়—গুন্ গুন্ ক'রে আপন মনে কী একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে।

তখন আর দ্বিধা কি ইতস্তত করার সময় নেই, যাকে বলে সোজাসুজি আক্রমণ,

তাই করলুম।

'তুমি ভোঁদা না?'

'তুমি'ই বললুম, যদিচ আমার থেকে অন্তত বারো বছরের বড় হবে জানি।

অমানুষ নেশাখোরটাকে আপনি বলতে সঙ্কোচে বাধল।

থমকে দাঁড়াল লোকটি।

নেশায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা ক'রে বলল, 'কে রে! আঁতুড়ের নাম ধরে ডাকছিস? কে তুই? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ফচকে ছোঁড়া! আমাকে জন্মাতে দেখেছিস নাকি? য়্যাঁ—যে ঐ নামে ডাকছিস?'...

ঠিক লোককেই যে পেয়ে গেছি সে বিষয়ে যখন আর সন্দেহ রইল না—তখন মনে অনেকখানি জোর পেয়ে গেলুম। বললুম, 'ভাল নাম জানি না যে!'

'বটে! তা জানবে কেন? বাপের দেওয়া কুচ্ছিৎ নামটি ঠিক মুখস্থ ক'রে রেখেছ! বলি কে হে তুমি ঠাকুদ্দামশাই এলে আমার!...আমার নাম সুনীল, সুনীলকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শাণ্ডিল্য গোত্র—ঠাকুরের নাম—'

'থাক, থাক। ঠাকুরের নামের দরকার নেই। ওসব আমি জানি।'

'কিন্তু তুই কে? য়্যাঁ, পরিচয় দিচ্ছিস না যে!'

'আমি ভূতু—নাম বললে মনে পড়বে? চিনতে পারবে? দ্যাখো, আমারও ডাকনাম বলে দিলুম।'

অনেকক্ষণ সেই ঈষৎ আরক্ত চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভূতু? মানে সেই কায়েত মাসীর ছেলেটা?...অ। তা য়্যাদ্দিন পরে কোত্থেকে এলে বাবা, আমাকে খুঁজে বার করলেই বা কি ক'রে?'

'খুঁজেছি ঢের সত্যিই! তবে বার করতে পারি নি, এ তো হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।'

'হুঁ। বেশ হ'ল।...য়্যাদ্দিন পরে চিনতেও তো পারলি! বাহাদুরি আছে। কী করিস কি? পুলিসে কাজ করিস নাকি?'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলুম।

কোথাও একটা স্থির হয়ে না বসলে বা নিরিবিলি কোন জায়গায় না পৌঁছলে আমার কাজের কথা পাড়া যাবে না।

এখন কথা কইলেই কতকগুলো বাজে বকুনি শুরু করবে আবার—তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল।

চিরদিনের স্বভাব ভোঁদার—একটু বেশী বকা, সেই ছেলেবেলাই লক্ষ্য করেছি।

একটু চলার পরই চেনা রাস্তা পড়ল।

কাল-ভৈরোঁর রাস্তা। কিন্তু মন্দিরে নয়—ভৈরোঁজীর মন্দিরের কাছে যে পুরানো কাঠের হাবেলি, তারই গায়ে একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।

মনে হ'ল এটাই ওর বাসা বা আস্তানা।

কারণ কাউকে ডাকল না, কড়া নাড়ল না, ভেজানো কপাট ঠেলে নিঃসঙ্কোচে বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

তবে খুব ভেতরে যাওয়ার দরকার হ'ল না—সদর দরজার ঠিক পাশেই যে ঘরটা—রাস্তার দিকে, সেইটেতেই নিয়ে গেল আমাকে।

আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া উচিত কিনা—এ প্রশ্ন বোধ করি ভোঁদার মাথাতেই এল না।

আমি যে যেতে চাই, ওর সঙ্গে গল্প করতেই এসেছি—এটা ধরেই নিল সে।

যেখানে ঢুকল—সে ঘরখানা যেমন শ্রীহীন তেমনি নোংরা।

কত কি ছড়ানো চারিদিকেঃ চুনমাখা পানের দোনা, শুকনো ফুলের মালা, কাগজের

ছেঁড়া ঠোঙা ডেলা-পাকানো—কী নয়?

নেই যা—তা হ'ল কোন বই বা পত্রিকা, অর্থাৎ মা সরস্বতীর সংগে সম্পর্ক নেই কোথাও।

অবশ্য একেবারে নেই বলাটা একটু ভুল হ'ল।

দেওয়ালের ধারে একটা বড় বেঞ্চির ওপর ঘেরাটোপ দেওয়া একটা তানপুরা শোওয়ানো আছে।

তবে বাঁয়াতবলা কি সঙ্গীতের অন্য কোন আয়োজন নেই।

মেঝের এক কোণে একটা বিছানা গুটোনো ছিল, সেইটেই বিছিয়ে আমাকে বসতে বলল ভোঁদা।

তারপর নিজেও চটি দুটো একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'আঃ' বলে একটা আরামের শব্দ ক'রে নিজেও বসে পড়ল সেই বিছানারই এক দিকে।

ভাগ্যক্রমে বিছানাটা তত ময়লা নয়—ঘরের অবস্থা দেখে যা মনে হয়েছিল, অতটা নয় অন্তত। বসা চলে।

পিটপিট ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি দেখে নিয়ে বলল, 'তবে চা তামাক কিছু দিতে পারব না বাবা, সিধে কথা!...যার বাড়ি সে মাগী গেছে মুজঃফরনগরে মুজরো করতে, ঝি মহারাজ সব নিয়ে গেছে। আছে এক দারোয়ান, সে বেটা নেশাতে আমারও ঠাকুর্দা, কোথায় ভোম্ মেরে বসে আছে, তাকে এখন খুঁজে বার করতে পারব না। দেখছিস না অবস্থা—দরজা খোলা পড়ে, বেটা কোথায় ভেগেছে। ভাগ্যিস মাগীকে বলে-ছিলুম দোতলার ছড়ের দরজায় ভাল ক'রে দু'-তিনটে কুলুপ লাগিয়ে যেতে—নইলে যথাসব্বস্ব চোরে নিয়ে যেত হয়ত—ঘট্‌টে বাট্‌টেও থাকত না।'

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বললে, 'গেছে আর কোথায়—পাশের হাবেলিতে এক বেটা কোকেনখোর আছে, তার গর্তে গিয়ে সেঁধিয়েছে। সেই রাত দশটা বাজলে একগাদা সাজা পান হাতে ক'রে ঢুকবে—আমাকে কেদাত্ত করতে, বলবে—রোটি বানাউঁ মহারাজ—কেয়া পুরী লে আউঁ বাজারসে?...মহা ফাঁকিবাজ! জানে অত রাত্তিরে রুটি বানানোর জন্যে জেগে বসে থাকব না।...অন্য কোথাও হ'লে কবে দূর ক'রে দিত। নেহাৎ এককালে মালেকার পেয়ারের লোক ছেল, ওর সঙ্গে শুয়েছে কতদিন—তাই মায়ায় পড়ে তাড়ায় না।'

তারপর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আমাকে মুখ খোলবার অবকাশ মাত্র না দিয়েই আবার বকুনি শুরু করল, 'কদ্দিন কাশীতে ছিলি? এই কাঠের হাবেলি দেখেছিস? কাশীতে নামকরা সব সাড়ে তিন সাড়ে তিন আছে—তা জানিস তো! সাড়ে তিন হাবেলি, সাড়ে তিন মন্দির, সাড়ে তিন ঘাট, সাড়ে তিন মণ্ডি, সাড়ে তিন গঞ্জ! হাবেলির মধ্যে ধর্‌; দেওকী নন্দন, পাঁড়ে হাউলি, শিউহররাজ—আর এই কাঠের হাবেলিটা হ'ল আধা!'

কথাটা অন্তত অন্যদিকে মোড় ঘুরুক—এই ভরসাতেই বললুম, 'এটা কোনো বাঈজীর বাড়ি বুঝি? তুমি এখানে কি করো—মোসায়েবী, না ডুগিতবলা বাজাও?'

যেন দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল ভোঁদা।

'বাঈজী! বাঈজী বলতে আর আছে কে শুনি?...এরা আবার বাঈজী নাকি? কোন-মতে ক'রে খায় এই পর্যন্ত! গানবাজনার কি বোঝে এরা? ভেরেন্ডা আবার বৃক্ষ, আর্শোলা আবার পক্ষী—তেমনি এরাও বাঈজী!'

'কেন, সিদ্ধেশ্বরী বাঈ?'

'রাম কহো! রাম কহো!...তবে হ্যাঁ, অদ্ধেকটা বলতে পারো। ঐ যে বললুম, এখানে পুরোর সঙ্গে আদ্ধেকটা ক'রে থাকার রেওয়াজ আছে। এও তাই। হ্যাঁ—গায়, ভুলও হয় না—ওরই মধ্যে একটুখানি যা ও-ই আছে তবে কি সেই আগেকার মতো? নাপায্যিমানে নাতজামাই ভাতার—সেই কথায় বলে না! বাঈজী ছিল এককালে কাশীতে—তা মানছি

—সত্যিকারের বাঈজী ছিল তারা, বলো তাদের পায়ের ধুলো নিতে রাজী আছি। বাবার মুখে গণেশ কাকার মুখে—দেওয়ান জ্যাঠার কাছে শুনেছি তাদের গল্প—ত্যাখন কাশীতে এসে গেয়ে বাহবা পেলে তবে তাদের মানত সবাই। সরস্বতীবাঈ, হুসেনীবাঈ, বড়কী ময়না, তওকীবাঈ—এদের নাম করো, হাত তুলে নমস্কার করব। দেবেনদার মুখে শুনেছি —উনি আর দেওয়ান জ্যাঠার ছেলে যাচ্ছেলেন গান শুনতে—রাজা যুগলকিশোরের বাড়ি বড়কী ময়না গান গাইতে আসছে—যুগলকিশোরের বাড়ি বুঝেছিস?—ঐ যে সঙ্কট-মোচনের রাস্তায় উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ি—সেইটে। তা এ'রা যাচ্ছেলেন ঠিকই—কিন্তু গান না শুরু হ'লে যাওয়া যাবে না। দুজনেরই বাবা যাবেন গান শুনতে, তাঁদের নেমন্তন্ন হয়েছে, এদের মতো রবাহুত নয়—তাঁরা গিয়ে বসলে কোন্ দিকে মুখ ক'রে বসেছেন দেখে তাঁদের পিছনের দিকে বসবেন এ'রা—এই মতলব, যাতে চোখে না পড়ে। যে জলসায় বাপ যাবে সে জলসায় ছেলের যাওয়া ভারী নিন্দের কথা ছেল!'

এই বলে—অব্যর্থ লক্ষ্যে দরজার মধ্যে দিয়ে উঠোনের দিকে এক ধাবড়া থুথু ফেলে বললে,—'তা কোথায় বসে অপেক্ষা করেন—এতটা পথ হেঁটে গেছেন তো—দুর্গাকুন্ডুর পাড়ে গিয়ে বসলেন। দুর্গাকুন্ডু থেকে যুগলকিশোরের বাড়ি এক পোয়া রাস্তা হবে বেওজর, বেশী তো কম নয়। বসে জিরোচ্ছেন আর উড়ুনি নেড়ে হাওয়া খাচ্ছেন—খানিক পরে পরিষ্কার শোনা গেল বড়কী ময়না গান ধরেছে। সেই শুনে ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে রওনা দিলেন আসরের দিকে। বুঝে দ্যাখ, ত্যাখন তোদের এই মাইক ফাইকের বালাই ছেল না, যা করে ভগবানদত্ত গলা। লক্ষ্ণৌয়ের বুড়ী পার্বতীবাঈ এলাহাবাদের এক আসরে গলার জোরে দশ হাজার লোকের গোলমাল থামিয়ে গান শুনিয়েছিল। যে রইসের বাড়ি আসর তিনি তৎক্ষণাৎ এক লাখ টাকা লিখে দিয়েছিলেন ওকে। আমি দেখেছি ছেলেবেলায় বুড়ীকে, বেস্তর পয়সা—যখন তীর্থ করতে বেরোত অমন সত্তর-আশী জন বিধবাকে সঙ্গে নিয়ে যেত—সব খরচ ওর।'

এইবার একটু বেশীই থামতে হ'ল—এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ বকে দম নেবার জন্যে —সেই ফাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তা তুমি কি শিখেছ? গান না বাজনা? খেয়াল গাও—না ধ্রুপদ?'

'কে বললে তোকে, আমি শিখেছি?'

'যে-ই বলুক, কি শিখলে তাই বলো না।'

'কিছুই না। শিখব কি, যখন বুঝলুম, একটুখানি এর ভেতরে ঢোকার পর—যে, বারো বছর লাগবে শুধু গলাই তৈরী করতে, তারপর গাওয়া, তখনই ছেড়ে দিলুম। শিখতে কি আর পারতুম না, মাস্টার ঢের ছেল, এই পাশেই চৌখাম্বার বোসবাবু—অতবড় বীণ্‌কার ভারতে আর নেই। কোথা থেকে এক সায়েব ব্যায়লাবাজিয়ে এসেছেল, শুনেছি, রবিঠাকুরকে যখন শোনাতে গেছল তিনি বললেন—অ ব্যাটা, তুমি শুনিয়ে যাবে—শুনবে না কিছু! আমাদেরও জিনিস আছে। এই বলে উনি সন্তু বোসকে তার পাঠিয়ে নে গিয়ে শুনিয়ে ছেড়ে দিয়েছেলেন। সে ব্যাটা সায়েবের পো থ' হয়ে ফিরে গেল।...ঐ তো বললুম, এমন সব খাশা খাশা লোক ছেল, শিখলে ঢের শিখতে পারতুম কিন্তু শিখে কি করব বলো, এত কষ্ট ক'রে শিখব—শুনবে কে? তোদের এক এই গুষ্টির পিণ্ডি মাইক হয়েছে আর রেডিও—গানবাজনা বলতে কি আর আছে কিছু? শুনেছি বড় বড় সানাইঅলারা নাকি এখন বলে মাইক ছাড়া বাজাব না—আ মর! নিজেদের গোর নিজেরা কাটছে। ওসব যন্তরের গান হ'ল গে গোলা লোকদের জন্যে, কারুকার্য—কী গলার কী যন্তরের—ওতে ধরা পড়ে? এখন তাই শ্যালের হুক্কাহুয়াও গান হয়ে পড়েছে—ধরো, ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ পড়ে যাবে চারিদিকে!'

'দ্যাখ—' একটু থেমে, বোধ হয় অভ্যাসবশতই এক খিলি পানের জন্যে বৃথা খানিকটা

হাতড়ে শুরু করল আবার, 'তুই তো কাশীর ছেলে, বলি নেপাল রায় উপীন রায়ের তো নাম শুনেছিস? ঐ এয়োর বটতলার দিকে থাকত, এদান্তে এখানে থাকা হয়ে উঠত না, তবু ফাঁক পেলেই চলে আসত, এখানেই তো ওদের সব, শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু— কী নাম ছেল ওদের, ভারতজোড়া!...

'ওঃ, সে সব এক দিনই গিয়েছে। জগদীশকে জানতিস? ধ্যুস্! তুই এ সবের কোন খবর রাখিস না। সেও ছেল এক গাইয়ে—কণ্টছেণ্ট ক'রে একটা গান শিখেছেল—সব আসরেই ঐ গান গাইত। আসরে ওর মতো লোককে বেশী সময় দেবেই বা কে, তাই কেরামতি ধরাও পড়ত না বিশেষ।

'একবার হয়েছে কি, এসব শোনা কথা অবিশ্যি, বোম্বে থেকে কে এক বড় বাঈজী এসেছে—নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে খুবই বড় গাইয়ে, ঠাটঠমকও তেমনি—গান হচ্ছে কামেচ্ছায়, রাজা মতিচাঁদের বাগানবাড়িতে। উপীনবাবুরও নেমন্তন্ন, জগদীশেরও। হয়েছে কি, গাইতে গাইতে কোথায় কি একটা বেচাল হয়ে গিয়েছে—জগদীশ আপন মনেই 'উঁ' ক'রে উঠেছে, তন্ময় হয়ে চোখবুজে শুনছে তো, অত খেয়াল করে নি। শুনছে তো বহুদিন ধরে, বড় বড় গাইয়ের সঙ্গ করেছে—নিজে গাইতে পারুক বা না পারুক— কান ঠিক ঠোক্কর খেয়েছে, আওয়াজটাও বেরিয়ে গেছে আচমকা। সামান্য শব্দ, তবু সেইটুকুই বাঈজীর কানে গেছে,—গান থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, "ক্যা হুয়া?" জগদীশের তো মুখ শুকিয়ে গেছে—কানে খট করে লেগেছে ঠিকই—তাই বলে নিজে গেয়ে কোথায় ভুল বুঝিয়ে দেবে—এত বিদ্যে নেই।

'উপীনদা বসেছেলেন, দেখলেন সারা বাঙ্গালী জাতের অপমান হয়—তাছাড়া ভুল যে কি হয়েছে তা তো তাঁর জানতে বাকী ছেল না—তিনি নিজের দিকে নজর ফিরিয়ে নিলেন, হেসেই বলেন, "ক্যা হুয়া বাতাউঁ?" ওঁর দিকে তাকিয়েই বাঈজী জিভ কেটে ফেলেছে, সারেঙ্গীও চিনেছে—সে একেবারে যন্তর-টন্তর ফেলে হাতজোড়!...এমনি দিনকাল ছেল, গাইয়েদের এমনি সম্মান, এমনি ডিসিপিলিন!...

'তখন দামও ছেল অবশ্য, বড়লোকেরা হাজার হাজার টাকা খরচা ক'রে জলসা বসাত তবে লোক শুনতে পেত এদের গান। এখনকার মতো পঁচিশ টাকায় রেডিওতে গান গাইতে যেত না—কল ঘুরিয়ে যখন তখন শোনাও যেত না! ছ্যাঃ, এখন আবার গান শেখে মানুষ!'

বুঝলুম এ বকুনির শেষ হবে না কোন কালে।

সারা রাত বসে থাকলে সারা রাতই এই সব শুনতে হবে।

তাই মরীয়া হয়ে, ওর কথার মধ্যেই বলতে গেলে, আসল প্রশ্নটা ক'রে ফেললুম, 'আচ্ছা, মেন্তি এখন কোথায় থাকে জানো?'

হঠাৎ বকুনিতেও যেমন ছেদ পড়ল—মনে হ'ল নেশাটাও ছুটে গেল।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল এতক্ষণ—এবার সোজা হয়ে বসল।

নেশায়-বুজে-আসা চোখ যতটা সম্ভব প্রসারিত ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকটা, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'কে, মেন্তি? কার কথা বলছিস?'

'তোমার ছোট বোন। আর কোন্ মেন্তির কথা তোমাকে জিগ্যেস করব?'

'সে মেন্তি আর নেই। ঐ নামে আমার যে বোন ছিল তাকে আর পাবে না। সে গেছে। আছেন এখন তারা ভৈরবী—ভৈরবী মা।'

সত্যি সত্যিই হাত তুলে উদ্দেশে প্রণাম জানাল ভোঁদা।

তারপরই উদ্দীপিত হয়ে উঠল আবার।

'ভাবিস নি আমি নাকারা করছি। সত্যিই আমার বোন, আমাদের বাড়ির মেয়ে— মানে যাদের আমরা জানতুম, দেখে এসেছি চিরকাল—এ তেমন কেউ নয়। সাধারণ মেয়ে

বা মেয়েমানুষ নয়। শরীরটা তাই আছে বটে—কিন্তু কি বলব এ একেবারে আলাদা জিনিস। আমিই বুঝতে পারি না, তোকে বোঝাব কি!'

'তা না হয় হ'ল। তা সে ভৈরবী মা থাকেন কোথায়?'

কণ্ঠে বিদ্রূপ কি প্রচ্ছন্ন জ্বালা ফুটে উঠেছিল জানি না,—কিন্তু ভোঁদা চটে উঠল খুব।

বললে,—'কী ভাবছিস? ভীমরতি হয়েছে, নয়তো নেশাখোরের মাথাখারাপ! হুঃ! ...কাছ থেকে দেখিস নি অনেক কাল বোধ হয়—না? দেখা হ'লে পেন্নাম না ক'রে থাকতে পারবি না। আমি যে আমি—আমারই মাথা হেঁট হয়ে আসে আপনা-আপনি।'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠি বৈকি!

নেশাখোরের কাছ থেকে আসল কথাটা কি বার করতে পারব আদৌ?

খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলি, 'দেখি নি বলেই তো দেখতে চাই। আমি জানি সেই মেন্তিকেই।...এখন এত লোকের মুখে এত কথা শুনি বলেই তো দেখার ইচ্ছে।...তা তাঁর আশ্রমটা কোথায় বলে ফেল—দর্শন ক'রে আসি।'

সোজা দুদিকে ঘাড় ঘোরাল ভোঁদা।

'জানি না। সত্যিই জানি না। কোন আশ্রম আছে কিনা—কিংবা কোন ঝোপড়া, কি মন্দির, কি খোলা মাঠে রাত কাটায়—তাও জানি না। কাউকে বলেন না। পিছু নিয়ে দেখেছি, কখন ফাঁকি দিয়ে মিলিয়ে যান বুঝতেও পারি না।'

'সে কি! তবে যে শুনেছি তোমাদের—'

বলতে গিয়েও থেমে যাই।

টাকা বা সাহায্যের কথাটা বলা উচিত হবে কি?

কিন্তু ভোঁদাই যেন মুখের কথা কেড়ে নেয়।

বলে, 'আমাদের নিয়মিত সাহায্য করেন, এই তো? হ্যাঁ—তা করেন। গরমানি্য যাচ্ছি না। ভালই দেন—নেশাফেশা ক'রেও চলে যায়। এমন কি সেই মটরাটাকে সুদ্ধ—জেল থেকে বেরিয়ে গাজীপুর গিয়ে আছে—সেখানে পাঠিয়ে দেন। বলেন, ও আমার মহা উপকার করেছিল। নইলে জীবনটা বরবাদ হয়ে যেত।...কিন্তু এসব দেন নিজে থেকে —পাঠিয়ে দেন। কখনও হাতে হাতে দেন না। কখন কার হাত দিয়ে পাঠাবেন তা তিনিই জানেন। লোক জুটেও যায় ওঁর ঠিক—দরকার মতো।...অবিশ্যি তাই বলে দেখা কি আর হয় না—মাঝে মধ্যেই দেখা হয়। তবে তার সময় কি জায়গার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, মনে হয় তাঁর ইচ্ছে হ'লেই দেখা হয়।'

'তা হ'লে উপায়? আমার যে তার সঙ্গে দেখা হওয়া খুব দরকার!...সে আমাকে ভোলে নি এটা জানি। আমি দেখা করতে চাই শুনলে নিজেই ব্যবস্থা করবে। এ কথাটা শোনায় কে?'

ইচ্ছে ক'রেই 'সে' আর 'তার' বললুম, 'তিনি' বা 'তাঁর' নয়।

কিন্তু ভোঁদা অত লক্ষ্যও করল না। বলল, 'দ্যাখ, অত যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে—আমি একটা মতলব বলি—শোন। এক শুক্কুরবারে—ওঁর সেই গুরুই বল আর ভৈরব বল—দেহই রেখেছিলেন—সেই থেকে ফি শুক্কুরবারে উনি গঙ্গাস্নান করতে আসেন মণি-কর্ণিকায়। আগে সেই সময়টাতেই আসতেন—এদানীং খুব ভিড় জমে যায় বলে অন্য কোন একটা সময়ে, শেষ রাতটাতের দিকে একবার এসে নেয়ে যান। নইলে থাকেন—মনে হয় আদিকেশবের দিকে—ঐখানেই হয়ত অন্য দিন স্নান করেন কিংবা করেনই না। ওঁদের তো লীলা!'

এই বলে সেই 'গুরুজী'র মতো আর একবার হাত তুলে নমস্কার করল ভোঁদা।

সূত্র এইটুকু—তবু তার ওপরই ভরসা ক'রে বেয়ে-চেয়ে দেখব একবার—ঠিক করলুম।

খুব দৌড়ও করতে হবে না, কারণ ভোঁদার সঙ্গে যেদিন কথা হ'ল—সেটা বৃহস্পতিবার।

অর্থাৎ সেই রাত্রিশেষেই ভৈরবীর স্নান করতে আসার কথা।

...একটা সন্দেহ অবশ্য থেকেই গিয়েছিল—বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রিটা ইংরেজী মতে শুক্রবার, হিন্দু মতে নয়।

সেটা আর ভোঁদাকে শুধিয়ে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয় নি।

যাই হোক—কপাল ঠুকে সেই রাত্রেই দুটোর সময় বেরিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে মণিকর্ণিকার দিকে রওনা দিলুম।

তখনও এমন যাওয়া যেত, মানে অত রাত্রে।

কাশীতে গুন্ডা বদমাইশ চিরদিনই ছিল—কিন্তু স্নানার্থী দর্শনার্থীর কোন বিপদ ঘটত না বিশেষ।

তরুণী সুন্দরী মেয়েদের কথা অবশ্য আলাদা, তাদের বিপদ সর্বদেশে সর্বকালে—কোন কোন সময় স্বেচ্ছাবৃতও।

এখন কোথাওই আর নিরাপত্তা নেই, কাশীর আর কি দোষ দেব।

তবে শুনেছি, কাশীতে এখন মহিলারা সোনার খুব সরু হারও গলায় রাখতে সাহস করছেন না, তার বদলে রুদ্রাক্ষের বা গিল্‌টির মালা পরছেন।

যাকগে—সে অন্য কথা।

জোরে হেঁটে রাত আড়াইটের আগেই মণিকর্ণিকা পেঁছিলুম।

এলেনও দেখলাম দুচার জন স্নান করতে।

সাধুসন্তই বেশী, এমনিও যে এক-আধজন না এলেন তা নয়।

অন্তত সন্ন্যাসীর মতো বেশভূষা তাঁদের দেখা গেল না।

কিন্তু আসল মানুষটি কৈ?

আড়াইটে থেকে তিনটে, তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে—চারটেও বাজতে চলল একসময়ে—তারা ভৈরবী এমন কি গেরুয়া বা রক্তাম্বরধারিণী কোন মহিলারও সাক্ষাৎ পেলুম না।

আর অপেক্ষা করারও কোন মানে হয় না।

এবার সহজ নিয়মেই কাশী জেগে উঠছে, এখনই অসংখ্য স্নানার্থীর ভিড় হবে—তার মধ্যে সে আসবে না নিশ্চয়ই, আর বসে থাকা বৃথা।

আবার ঘাট দিয়েই ফিরতিমুখে রওনা দিলুম।

খুবই ক্লান্ত দেহ, আশাভঙ্গের ক্লান্তি যেন আরও বেশী।

ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় দুই চোখ জুড়ে আসছে ঘুমে, চলতে চলতেই তন্দ্রার ছোঁয়াচ লেগে যাচ্ছে, পা টলে চমকে সচেতন হয়ে উঠছি আবার।

ঘাটে ঘাটে শেষ-রাত্রের স্নানার্থী যারা ভগবানের নাম করতে করতে নামছে—তাদের স্তোত্র থেমে যাচ্ছে ক্ষণেকের জন্যে, ভ্রূকুটি ক'রে চেয়ে দেখছে।

আমার স্খলিত গতি দেখে মাতাল ভাবছে নিশ্চয়।

ওপারে ব্যাসকাশীর দিগন্তে আকাশ পান্ডুর হয়ে আসছে একটু একটু ক'রে ; গঙ্গার জল শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছে—নিঃশব্দে, তখনও একটি দুটি তারার ছায়া তার কালো জলে ; চারিদিকেই শান্তি ও পবিত্রতার আভাস।

তার মধ্যে আমার এই উপস্থিতিটা অনধিকার প্রবেশ বলে মনে হওয়ারই কথা।

এইভাবেই কখন মানমন্দিরের ঘাটের কাছে এসে পড়েছি তা বুঝতে পারি নি, কোন্

ঘাট দিয়ে যাচ্ছি তা অত লক্ষ্যও করছিলুম না—এটাও পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলুম এমনি আধাবেহুঁশ অবস্থাতেই, হঠাৎ চমকে উঠলুম।

মনে হ'ল ঘাটের ধারের আরও ঘন অন্ধকার থেকেই কে যেন পরিষ্কার ডাকল আমাকে, 'ভূতু!'

চমকে উঠলুম।

কোথাও কিছু দেখা যায় না—বিশেষ এ ঘাটে তখনও কেউ স্নান করতে নামে নি, কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই—তার মধ্যে এই ডাক—অশরীরী আহ্বানের মতো, মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবারই কথা।

মনে হ'ল ঘাটের ধারে পাথরের রানাগুলোর খাঁজে, ঐ বড় ছাতাগুলোর নিচে নিচে যে ছায়া যে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আছে—সেই ছায়াই হঠাৎ সরব হয়ে উঠেছে—এ স্বর তারই, সর্বনাশের, ভয়ঙ্কর পরিণতির আহ্বান এ।

ভয়টাই প্রাথমিক, বেশী।

চমকে ওঠাটা বিস্ময়ে তত নয়—যতটা অকারণ অজানা ত্রাসে। মানুষমাত্রেরই স্বভাব-ধর্ম এটা—ইনস্টিংক্ট্।

কিন্তু এই সর্বশরীর অনড় হিম-ক'রে-দেওয়া অনুভূতিটা কয়েক মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হ'ল না।

কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল—এ কণ্ঠস্বর একেবারে অপরিচিত নয়, কোথাও শুনেছি এর আগে, এই আহ্বানই শুনেছি কারও মুখে।

তবু তখনই পাথর-হয়ে-যাওয়া পায়ে সাড় ফিরত না, যদি না প্রায় তখনই আবার ঈষৎ কৌতুক, ঈষৎ স্নেহের সুরে প্রশ্ন আসত, 'কী হ'ল, ভয় পেলে নাকি? এই বুকের বল নিয়ে রাতদুপুরে শ্মশানে ভৈরবী খুঁজতে এসেছ?'

এবার আর সন্দেহ রইল না।

তারা ভৈরবী!

সত্যি সত্যিই যেন সেই কায়াহীন অন্ধকার থেকে রূপ পরিগ্রহ করে বেরিয়ে এল ভৈরবী।

কাব্য ক'রে বলতে গেলে আঁধারের পঙ্ক ভেদ ক'রে আলোর কমল ফুটে উঠল।...

পায়ে সাড় আসতে দেরি হ'ল না—সঙ্গে সঙ্গেই কিছু-পূর্বের নিদ্রাতুর জড়তাও কেটে গেল।

ইলেক্‌ট্রিক শক লাগবারই কাজ হ'ল কতকটা।

আমিও দ্রুত তিন চারটে ধাপ নেমে কাছে এসে দাঁড়ালুম।

'মৌন্তি!'

কতকটা যেন জোর ক'রেই এই নামে ডাকলুম।

ইচ্ছে ক'রে।

ওর ভৈরবী আখ্যা কিছুতেই মানব না আমি।

হয়ত এটা আত্ম-অহঙ্কার, সকলের যে পূজনীয় সে আমার কত অন্তরঙ্গ এইটে প্রমাণ করার চেষ্টা।

ভৈরবী কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না।

বলল, 'অনেকক্ষণ বসে আছি তোমার জন্যে। ভেবেছিলুম যাবার পথেই ধরব—একটু দেরি হয়ে গেল। আর তুমিও যে দুটোর সময়ই বেরিয়ে পড়বে, তা ভাবি নি।'

'তুমি—তুমি জানতে আমি আসব? এরই মধ্যে তোমাকে কে এ খবর দিলে? ভোঁদার সঙ্গে রাত্রেই দেখা হয়েছে বুঝি?'

হয়ত অনাবশ্যক বোধেই এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না ভৈরবী, হাসল শুধু।

ঝাপ্‌সা আলোয় খুব ভাল ক'রে দেখা না গেলেও হাসিটা বুঝতে পারলুম।

বলল, 'চলো। নৌকো প্রস্তুত। উঠে পড়ো। নাকি বাসায় খবর দিয়ে আসতে হবে?'

'বাসা আর কোথায়? মানে খবর দেবার মতো লোক?...একা, হোটেলে উঠেছি, সেখানে কেউ ভাববে না। কিন্তু নৌকো কেন?'

'তুমি তো আমার আশ্রম বা আস্তানা দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে। যাবে না সেখানে?...সেই জন্যেই নৌকো নিয়ে এসেছি। তুমি আমাকে দেখতে পাও নি, তার মানে আমি নৌকোতেই বসে ছিলুম।'

'কিন্তু তুমি ঐখান থেকে এই অন্ধকারে চিনলে কি ক'রে আমাকে?'

'পায়ের আওয়াজে। আর চলার ধরনেও। তুমি ছাড়া এত রাত্তিরে সাদা কাপড় পরেই বা কে আসবে এপথে, এমন টলতে টলতে! চান করতে যারা আসে তারা জলেই নামে—পাড় দিয়ে যায় না।'

হয়ত অন্য উত্তর আশা করেছিলুম।

অস্পষ্ট ধরনের ক্ষীণ আশা একটা।

উত্তরটাতে একটু যেন ক্ষুণ্ণই বোধ করলুম তাই।

কিন্তু সে-সব কোন কথা ভাবারও সময় রইল না আর।

বলতে বলতেই ভৈরবী নিচে নামতে শুরু করেছে—নৌকোর দিকে।

অগত্যা আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে নামতে হ'ল।

চলতে চলতেই প্রশ্ন করলুম, 'তা তুমি তো শুনলুম কাউকে আশ্রমের খোঁজ দিতে চাও না। তবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ যে?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি গিয়ে আমার পায়ে পড়বে না জানি, দীক্ষা দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে না, কিংবা মামলায় জেতার জন্যে কবচ ক'রে দিতে বলবে না।'

তারপর একটু থেমে, হেসে বলল, 'তাছাড়া তুমি অত কষ্ট ক'রে খুঁজে খুঁজে আমাকে উদ্ধার ক'রে আনতে গিয়েছিলে—সে কথাটা ভুলি নি। আর কেউই অত গরজ করে নি তুমি ছাড়া।...তুমি যে বইতে লেখো মেয়েছেলে মাত্রেই অকৃতজ্ঞ, সেটা ঠিক নয়।'

'কী সর্বনাশ। ঐসব বই তুমি পড়ো নাকি?'

'তোমার লেখা বই বলেই পড়েছি দু-একখানা।'

ততক্ষণে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে।

একটিই মাত্র মাল্লা, পাথরের মতো নিশ্চলভাবে বসে ছিল, নিঃশব্দে।

জীবিত কিনা, হঠাৎ দেখলে সন্দেহ হয়।

আমরা গিয়ে বসতেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দিল।

কোন প্রশ্নও করল না কোথায় যেতে হবে।

বোধ হয় বলাই ছিল, হয়ত ভৈরবীর নিজস্ব নৌকো এটা।...

কিন্তু মাদুলি কি দীক্ষা দেবার ভয়ে যে আশ্রম বা আস্তানার ঠিকানা দেয় না, সে এত টাকাই বা পায় কোথায়?

ভাইদের নিয়মিত সাহায্য করে—আরও কাউকে করে কি না তাই বা কে জানে।

ওর সেই গুরুর সম্পত্তি পেয়েছে নাকি?

হয়ত তার অনেক টাকা ছিল!

অকস্মাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠল ভৈরবী।

'তোমাদের বিষয়ী মন—কেবল টাকার চিন্তা। পরের টাকা কোথা থেকে আসে সে খবরে তোমার কী এত দরকার বাপু? সন্ধান পেলে তুমি কি কেড়ে নিয়ে বড়লোক হ'তে পারবে?'

আবারও কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ে শিউরে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

এ কি সত্যিই অন্তর্যামী নাকি! মনের কথা ছাপা বইয়ের লেখার মতো পড়তে পারে!

সত্যিই কি কিছু ঐশ্বরিক শক্তি পেয়েছে তাহ'লে?

আমার জিভও কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল—এ কথার কোন যোগ্য উত্তরও দিতে পারলুম না।

এই প্রথম ওর কাছে বড় দীন, বড় সামান্য মনে হ'ল।

ভৈরবীও আর কথা বাড়াল না।

নিঃশব্দে জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

নৌকো ততক্ষণে মাঝগঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।

অনুকূল স্রোতে তরতর ক'রে ভেসে যাচ্ছে বরুণা-সঙ্গমের দিকে।

দেখতে দেখতে মনিকর্ণিকা পঞ্চগঙ্গা পার হয়ে চলে গেল নৌকো।

ততক্ষণে পূর্বাকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

জলে পড়ে নি—কিন্তু তখনই একটা অরুণাভা এসে পড়েছে ঘাটের ওপরের বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায়, আর তারই এক ধরনের প্রতিফলিত আলো এসে পড়েছে জলে. নৌকোর ওপর। আমাদের মুখেও।

সেই আলোতেই ভাল ক'রে এবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখলুম।

তরুণী মেন্তির সে বিভ্রান্তিকর রূপ আর নেই, প্রথম যৌবনের সেই উগ্র দীপ্তি. বিদ্যুৎঝলকের মতো, অষ্টভুজায় প্রদীপের সামান্য আলোতেও যা দেখে চোখ ঝলসে গিয়েছিল—কিন্তু একেবারে বিদায়ও নেয় নি তা।

যৌবন যেন বিদায় নিতে গিয়েও যেতে পারে নি. এই অসামান্য বরতনুর মায়ায় আটকে আছে এখনও—অথবা মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না—দেখতে পাচ্ছে না জরার রন্ধ্রপথ।

'স্থির সৌদামিনী' কথাটা শোনাই ছিল—এই যেন প্রথম দেখলুম।

জানি না. দু-একগাছা চুলে পাক ধরেছে কিনা, সে বয়স এখনও হয় নি অবশ্য—কিন্তু এখনও কেশভার তেমনি বিপুল, বর্ষণোদ্যত মেঘের মতো।

মাথায় চূড়ো ক'রে বাঁধা—তবু সবটা বাঁধা যায় নি।

পরনে কমলা-লাল রঙের ধুতি, সেই রঙেরই একটা জামা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

কেবল হাতেও রুদ্রাক্ষের বালার পাশে শাঁখা আছে একগাছা ক'রে।

আর কোন আভরণ নেই, কিন্তু এই বৈরাগ্যের বেশে, সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদেই কী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে!

এখনও তেমনিই মোহের, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাকিয়ে থাকলে।...

প্রশ্নটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'শাঁখা কেন এখনও?'

'সংস্কার। উনি. মানে আমার স্বামী এখনও বেঁচে আছেন যে।'

'কিন্তু—তুমি তো সন্ন্যাসিনী। স্বামী তো পূর্বাশ্রমের।'

'ঐ জন্যেই তো বললুম—সংস্কার। তাছাড়া. এ আমার গুরুর আদেশও।'

আর কথা বাড়ালুম না।

কথা কইতে ভালও লাগছে না।

সামনে অপার্থিব দৃশ্য—সাধারণ গ্রাম্যকথা বললে এ স্বর্গীয় পরিস্থিতির অমর্যাদা করা হবে।

অবাক হয়ে দেখছি শুধু।

শুধু চেয়ে থাকতেই ইচ্ছে করছে।

এই প্রথম-ঊষার লাল আলো ওর কমলা-লাল কাপড়ে, গঙ্গার স্বচ্ছ জলে পড়ে নতুন এক বর্ণাভার সৃষ্টি করেছে।

সেই প্রতিফলিত লাল আলো ওর রক্তাভ-গৌর মুখে পড়ে কী অপরূপই না দেখাচ্ছে —মনে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কল্পনার ধন এ—এ রূপ ঈশ্বরের পক্ষেও বিস্ময়কর সৃষ্টি।

এতকাল আমিও বলেছি অন্যের সঙ্গে যে, নারী প্রথম যৌবনেই বেশী লোভনীয়— আজ যেন প্রবল একটা দ্বিধা দেখা দিল।

যে সত্যিকার সুন্দর—তাকে কোন বয়সের মাপে বিচার করা যায় না, সাধারণ মান তাদের জন্যে নয়।

মনে পড়ল বাদশা জাহাঙ্গীর যখন নুরজাঁহাকে বিয়ে করেন—ক'রে সর্বস্ব তার হাতে তুলে দেন—তখন নুরজাঁহাও আমাদের হিসেবে বিগতযৌবনা।

মনে হচ্ছিল এ যাত্রা অনন্ত হ'লেও ক্ষতি নেই।

মনে বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রার্থনা করছিলুম যেন পথ এখনই না ফুরোয়, দিগন্তদীর্ঘ প্রসারিত হোক আমাদের লক্ষ্যস্থানের দূরত্ব!

কিন্তু সৌভাগ্য কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

মনে হ'ল, ভাল ক'রে দেখার আগেই নৌকো এক জায়গায় পাড়ে এসে ভিড়ল।

ঘাট নয়, আঘাটা।

কাছেই, প্রায় মাথার ওপর রেলের পুল।

এদিকটা পরিত্যক্ত, ধোবীমহল্লা বলেই জানি।

এখানেই থাকে নাকি ভৈরবী?

এত জায়গা থাকতে এই—ঈশ্বরের-ভুলে-যাওয়া জায়গায়?

নৌকো তীরে ভেড়া মাত্র ভৈরবী নেমে পড়েছে।

নেমে নৌকোর গলুইটা চেপে ধরে বলল, 'এসো। ভয় নেই, জুতোয় কাদা লাগবে না, এখানে সবটাই বালি।'

নৌকো থেকে নেমে পড়ে ভৈরবীর পিছু পিছু পাড় বেয়ে ওপরে উঠলুম।

এ জায়গাটা সম্বন্ধে ট্রেনে যেতে যেতে যা ধারণা করেছি—ঠিক ততটাই নোংরা।

আসলে শহরের দিকে আমাদের যাত্রাও নয়। আগাছার জঙ্গল, শুয়োরের পাল— তার মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ।

এইভাবেই মিনিটকতক চলে কতকগুলো জীর্ণ দরিদ্র বস্তি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যেখানটায় পেঁছুলুম—একটা উঁচু পাড়ের মতো জায়গা—সেখানটা অবশ্য অত নোংরা নয়।

একটিই মাত্র কুটির—দেখলে মনে হয় পাতালতা দিয়েই তৈরী, সত্যিসত্যিই পর্ণ-কুটির—তার সামনে খানিকটা খোলা জায়গা গোবর-মাটি দিয়ে লেপা।

থাকার মধ্যে সামনে একটা নিমগাছ, দুটো হাঁড়িতে তুলসী আর মনসা গাছ।

এখানটা বেশ ফাঁকা, বহুদূর দেখাও যায়, একদিকে গঙ্গা আর একদিকে মজে যাওয়া শীর্ণা বরুণা।

কেবল গঙ্গার ওপর কাশীর যে দৃশ্য—তুলনাহীন প্যানোরমা সেটার বেশির ভাগই দৃষ্টির অগোচরে থাকে।

কুটিরে কোন আগড় কি দরজা নেই।

প্রবেশপথের সবটাই খোলা।

ভেতরে ঢুকে দেখলুম—সেই অষ্টভুজায় যা দেখেছিলুম—একটি বাঘছালের শয্যা, তার পাশে মাটিতে ত্রিশূল পোঁতা, দড়ির আলনায় আর এক প্রস্থ কাপড়-জামা ও একটা

গামছা, সবই এই লালচে গেরুয়ায় ছোপানো।

নিচে একটা মাটির বেদিতে সামান্য দু-একটা বাসন, আর ঘরের মাঝামাঝি খানিকটা গর্তমতো জায়গা, তাতে একটা বড় কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে—অর্থাৎ ধুনি।

শুধোলুম, 'মেয়েদের কি ধুনি জ্বালাতে আছে?'

'সান্ন্যসীর আবার মেয়েপুরুষ কি? তাছাড়া ও আমার গুরুর জ্বালা ধুনি, সেই থেকেই আছে। আগুনটা আমি জিইয়ে রাখি এই পর্যন্ত। ওর জন্যেই তো আর কোথাও নড়তে পারি না।'

এই বলে সেই অদ্বিতীয় শয্যাটাই দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসো ঐখানে। আমি একটু জল চাপাই। তোমাদের তো সব ভোরে চা খাওয়া অব্যেস, তায় আবার রাত জেগেছ!'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলতে গেলুম, 'আবার অত ঝঞ্ঝাট কেন করতে যাচ্ছ মৈন্তি—চা একদিন দুদণ্ড পরে খেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।...তুমি তো খাও না দেখছি, তাহলে ঘরে সরঞ্জাম থাকত—আমার জন্যে মিছিমিছি এত হ্যাঙ্গাম করতে হবে না।'

'খাই না ঠিকই—তেমনি একদিন তোমার জন্যে একটু ক'রে দিলেও কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তাছাড়া আমার জন্যে রাত জেগে হাপিত্যেশ ক'রে বসেছিলে, আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে এলুম—আমার মান্যবর অতিথি—একটু চা-ও খাওয়াব না!...বসো বসো, স্থির হয়ে বসো। অকারণে নৌকতা ক'রো না।'

জুতো বাইরেই খুলে রেখে এসেছি, তবু একটু সসঙ্কোচেই সেই বাঘছালে বসলুম।

কে জানে, এ হয়ত সেই বিচিত্র সন্ন্যাসীরই আসন।

আর মনে হতেই সেই দীর্ঘদেহ শুভ্রকান্তি, সেই গম্ভীর-প্রসন্ন মুখশ্রী, কাঁচাপাকা চুল ও দাড়ি, আর রুদ্রাক্ষের মালাসুদ্ধ, রক্ত-চন্দনচর্চিত মানুষটার ছবি এতদিন পরেও স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল।—

যদি সত্যিসত্যিই উঁচুদরের সাধক কেউ হন, আমি হয়ত এতে বসে তাঁর অমর্যাদাই করছি।

আবারও আমার মনের কথা বুঝেই বোধ হয় বলল ভৈরবী, তেমনি মুখ টিপে হেসে, 'ও আসন এতই পবিত্র, তুমি কেন—সত্যিকারের কোন বদলোক কি পাপী—এমন কি আমার দাদাদেরও সাধ্যি নেই ওকে অপবিত্র করে।'

চমকে ওঠারই কথা, কিন্তু এবার আর অত বিস্ময় বোধ করলুম না।

এর মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি ওর মনোভাব বোঝবার শক্তিতে।

তাই এখন বরং নিশ্চিন্ত হয়ে ভাল ক'রে উঠে বসলুম বিছানায়।

কথার ফাঁকে ফাঁকেই কাজ চলছিল।

আগুনটা উসকে ঘটি ক'রে জল চাপিয়ে দিল খানিকটা।

আমি অবাক হয়ে ভাবছি যে, চা চিনি দুধ তো কোনটারই যোগাড় দেখছি না, বস্তুটা তৈরী হবে কি দিয়ে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে কার ছায়া পড়ল।

সেই মাল্লাটিই নিঃশব্দে এসে একটা চায়ের প্যাকেট, দুটো ছোট ছোট কি কাগজের মোড়ক এবং একটা পুরুয়ায় খানিকটা দুধ এগিয়ে ধরল বাইরে থেকেই।

বোধহয় বলাই ছিল আগে থাকতে, এগুলো সংগ্রহ ক'রে আনার কথা।

আমি বললুম, 'তোমার এ মাল্লাটি তো বেশ নিঃশব্দে কাজ ক'রে যায়—একটাও কথা বলে না!'

'বলার উপায় নেই বলেই বলে না। ও বোবা। কালা বোবা দুই-ই।'

'সে কি! তাহলে ওকে কাজের কথা বোঝাও কি করে?'

'সে হয়ে যায়। আমার কথা ও ঠিক বুঝতে পারে।'

জল তখনও ফোটে নি। উঁকি মেরে দেখে আগুনের পাশেই মাটিতে বসল ভৈরবী।

বললুম, 'ঘরে হাঁড়িকুঁড়ি তো কিছু দেখছি না, তা তোমার রান্নাখাওয়া—?'

'রান্নার দরকার হয় না। তবে খাওয়াটা চাই বৈকি। ওটা এসেই যায়।'

'কে দেয়? এখানে তো কই তেমন—সবই তো বস্তি, হতদরিদ্র লোকের বাস দেখলে মনে হয়—তাও একেবারে কাছাকাছি কিছুই নেই। কোন মন্দিরটন্দিরও—?'

'দেয় কি একজন? না কোন বাঁধা বন্দোবস্ত আছে? কেউ না কেউ দিয়েই যায়, যার যেদিন দয়া হয়। মা অন্নপূর্ণার রাজত্বে কি আর উপোস ক'রে থাকি।...মন্দির-টন্দির দিয়ে কি করব, ব্রাহ্মণের হাতে খেতে হবে কি প্রসাদ নৈলে খাব না—সে সব কোন সংস্কার আমাদের নেই। ভিক্ষা যে দেবে তার কাছ থেকেই হাত পেতে নেব।'

'সেই ভরসায় তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো? কেউ যদি কোনদিন না দেয়?'

'কেন থাকব না। একদিনও তো উপোস করতে হয় নি এ পর্যন্ত। হতদরিদ্র বস্তি বলছ—ওদের মতো হৃদয়বান কেউ আছে নাকি? কত যত্ন ক'রে কত পরিচ্ছন্নভাবে ভক্তির সঙ্গে দিয়ে যায়—যার যা সামর্থ্য।...আমাদের দিন চলে গেলেই হ'ল। সঞ্চয় তো করতে নেই, প্রতিদিনই ভিক্ষা করার কথা, তাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। আমি ঘরে বসেই সে ভিক্ষা পাই এদের কল্যাণে।'

জল ফুটে গেছে। নামিয়ে একটা কাঁসার বাটিতে চা ভিজিয়ে মোড়কগুলো খুলল। দেখলুম শুধু চিনি নয়—দুখানা বিস্কুটও আছে। কাগজটাই খুলে টান ক'রে বিস্কুট-সুদ্ধ আমার সামনে রাখল, তারপর নিপুণ হাতে চা তৈরী করতে লাগল।

প্রশ্ন করলুম, 'তুমি?'

'এই যে, একগাদা দুধ নিয়ে এল ব্যাটা। তোমার চায়ে তো লাগবে দু চামচ, বাকীটা কি হবে?...এটাই খেয়ে নেব।'

একটা গ্লাসে ক'রে চা দিয়ে গরম গ্লাস ধরার জন্যে খানিকটা ছেঁড়া কাপড় পাট ক'রে পাশে রেখে নিজের দুধটা নিয়ে কাছে এসে বসল। বলল, 'তার পর, বলো এবার তোমার কথা—কি জানতে চাও?'

'আচ্ছা—সত্যিই কি তুমি সন্ন্যাসিনী—ওরা যা বলে—ভৈরবী? তুমি মনেপ্রাণে এ জীবন নিয়েছ—না তোমার সেই গুরু এটা চাপিয়ে দিয়েছেন তোমার ওপর?'

'তিনি কিছুই চাপান নি, তিনি সেরকম লোকই নন। "নন" কথাটা ইচ্ছে করেই বলছি—"ছিলেন না" বলি নি। তাঁর দেহান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আমি তাঁর সান্নিধ্য নিত্য অনুভব করি, প্রয়োজনে পথ দেখান, প্রশ্ন করলে মনের মধ্যে থেকেই উত্তর দেন।'

'তাহলে—লোকে যা বলে—সত্যিই তুমি পেয়েছ কিছু? সিদ্ধিলাভ ভগবৎলাভ হয়েছে তোমার?'

'সে কি এতই সোজা ভূত? তোমরা যাকে পাওয়া বলে জানো—কতকটা বিশেষ শক্তি—তা হয়ত পেয়েছি। কিন্তু মহাপুরুষরা বলেন, এসব যত পায় মানুষ ভগবান থেকে তত দূরে সরে যায়। সাধনার পথে বিঘ্ন এগুলো।...তবে এসব তোমাকে বোঝাতে পারব না। তত বিদ্যে আমার নেই। তুমি তো জানোই আমি লেখাপড়া কিছু শিখি নি, মা যেটুকু জানতেন বাংলা পড়তে লিখতে পারতুম একটুখানি—মুখ্যু মেয়েছেলে—যেটুকু শিখেছি ওঁর কৃপাতেই—উনিই দয়া ক'রে শিখিয়েছেন। তাছাড়া তোমারও বোঝা মুশকিল, সব বোঝারই আগে খানিকটা তৈরী হওয়া দরকার। যে ভাষাই শেখো তার বর্ণমালা আগে শিখতে হয়। এদিকে তোমার ক-খ'র জ্ঞানও নেই যে!'

খোলা দরজার মধ্য দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

রেলের লাইন, গঙ্গার পুল, ওপারের চড়ায় চাষীরা কি তুলছে, সামনে এই আশ্চর্য নারী—সবটা জড়িয়ে অপার্থিব অবাস্তব মনে হচ্ছে বার বার, মনে হচ্ছে, কোথাও ঘুমিয়ে

পড়ে স্বপ্ন দেখছি।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল কথাটা।

বললুম, 'ঘরে তো একটা আগড় পর্যন্ত নেই, একা থাকো—ভয় করে না? রূপ তো তোমার এখনও কম নেই, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। নাকি যোগবলে রক্ষা পাও? যাকে শক্তি বলছ—তাই? অশরীরী অপ্রত্যক্ষ কোন ব্যবস্থা আছে?'

'দূর পাগল! তুলসীদাসকে ভগবান পাহারা দিতেন—সে তুলসীদাস বলে। আমাকে কে দেবে, কি দুঃখেই বা দিতে যাবে। তা নয়, পাহারার ব্যবস্থা আছে। তোমার পিছনেই আছে একজন, চেয়ে দ্যাখো না—'

দেখলুম চেয়ে—এবং আঁতকে চমকে ল্যাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

যখন এসেছি তখন চোখে পড়ে নি—কে জানে তখন ছিল কিনা—এখন দেখলুম শয্যা আর পাতার বেড়ার মাঝখানে ঠিক আমার পিছনেই স্তূপাকার হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে—বিরাট এক অজগর ময়াল সাপ।

'কী হ'ল! ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, ও খুব নিরীহ সাপ। তোমাকে অন্তত কিছু বলবে না, কে আমন্ত্রিত আর কে নয় বেশ বোঝে। তবু—। ও থাকলে তোমার অস্বস্তি ঘুচবে না, বেশ বুঝছি।...এই যা রে—এখন যা। বাবু আছেন, এখন তোর দরকার নেই। তবে দেখিস হরিহরের শুয়োরছানা আর খাস নি—বেচারী কান্নাকাটি করছিল পর-পর দুটো উধাও হয়ে গেছে বলে।'

সত্যিই দেখলুম—ভৈরবীর কথা শেষ হবার আগেই নিঃশব্দে সেই বিরাট কুণ্ডলীর পাক খুলে পাতার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে গেল।

ভৈরবী হেসে বললে, 'কিছু বলে না, কোনদিন মানুষ ধরে নি—তবু ওর ভয়েই কেউ এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসে না—আমার ঐ বোবাকালা ছেলে ছাড়া।'

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। বাসনগুলো ভবিষ্যতে ধোওয়ার জন্যে একপাশে সরিয়ে রেখে বেশ গুছিয়ে বসল মেন্তি—আমার সামনাসামনি. একটু সকৌতুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

এবার আমার পালা।

আমি বললুম, 'তারপর?'

'অর্থাৎ ইতিহাসটা জানতেই হবে. নইলে ভাত হজম হচ্ছে না. এই তো? তা বলছি। বলব বলেই এনেছি।...কিন্তু এই নিয়ে আবার এক বই লিখে বসবে না তো? তোমাকে বিশ্বাস নেই।'

'লিখব না যে—এ কথা তোমাকে হলপ করে বলতে পারব না। এই গঙ্গাতীরে বসে—তায় সামনে তুমি ভৈরবী, দেশপূজ্যা।'

'থাক হয়েছে। দেশপূজ্যা না জগৎপূজ্যা! লেখগে যাও, ইচ্ছে হয় তো। আমি তো এখানে থাকছিও না। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম, এও তাঁরই নির্দেশ। তোমার কাছে একরকমের ঋণই আছে আমার—তুমিই আমার—লোকের মতে দুর্ভাগ্য—আমার হিসেবে সৌভাগ্যের মূল। এইটে শোধ হ'লেই চলে যাব।'

'কোথায় যাবে?'

'সে বলতে পারব না। আমিও জানি না। তিনি বলেছেন—সময় হ'লে—এখানের কাজ শেষ হ'লে তিনিই নির্দেশ দেবেন, মনের মধ্যেই সে নির্দেশ পাব। আর কাজ বলতে যা-কিছু—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই বাকী ছিল। কাজেই এবার ছুটি মিলবে মনে হচ্ছে। তবে শহর বাজারে কোথাও নয়। হয় কোন পাহাড়ে. নয় তো দূর কোন গ্রামে সমুদ্রের ধারে—।'

'তা কাশী ছেড়ে এখানে কেন? এই জঙ্গলের মধ্যে? নির্জনে থাকার জন্যে?'

'সেও কতকটা বটে। তবে কাশী ছেড়ে বলছ কেন, এই তো কাশী।'

'তার মানে?'

'এখন যেখানে শহর দেখছ, পুরাকালে ইতিহাসের কাশী সেখানে ছিল না। এই বরুণার তীরেই ছিল। শুনেছি কে এক বাঙ্গালী ঐতিহাসিকই তা প্রমাণ করেছেন। সারনাথ ছাড়িয়ে ছোট লাইনে প্রয়াগের দিকে যেতে রাজোয়াড়ী বলে যে স্টেশন পড়ে—ওটা আসলে রাজবাড়ী, কাশী-নরেশরা বাস করতেন ওখানে, ঐখানেই তাঁদের প্রাসাদ ছিল। পুরাণের দিবোদাস, যিনি বিশ্বনাথকে কাশীছাড়া করেছিলেন, যাঁর জন্যে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে কাশী আসতে হয়েছিল—তিনিও ঐখানেই বাস করতেন। একটা কথা ভাবো না কেন, বুদ্ধদেব বুদ্ধ হবার পর ধর্মপ্রচার করতে এলেন প্রথম সারনাথে—আমরা ছেলেবেলাতে যে জঙ্গল দেখেছি মনে আছে?—তেমনিই যদি হবে, তিনি কি গাছ-পালাকে ধর্ম বোঝাতে এসেছিলেন? আসলে রাজপ্রাসাদেরই পিছনের বাগান ছিল ওটা, হরিণবাগ। সন্ন্যাসীরা কোন গৃহস্থবাড়ি গেলে কখনও বাড়ির মধ্যে ঢোকেন না—বাগানে আশ্রয় নেন, বাইরে কোথাও। অন্তত আগে তাই রীতি ছিল, এখনও কেউ কেউ সে রীতি পালন করেন। সেই হিসেবেই রাজধানী এলেও রাজপ্রাসাদে বাস করেন নি বুদ্ধদেব, বাইরের বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদে থাকার আরও অসুবিধে—সাধারণ লোক তাহলে ওঁর উপদেশ শুনতে আসতে পারত না, আসতে সাহস করত না।...তাছাড়া, রবি ঠাকুরের সেই কবিতা পড়ো নি, "বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাসে স্বচ্ছ সলিলা বরুণা"—যদি ঐটেই শহর হবে, কাশীর মহিষী করুণা গঙ্গায় না গিয়ে বরুণায় স্নান করতে আসবেন কেন? আসলে এই দিকেই শহর ছিল তখন, এইখানেই স্নান করতে আসার রেওয়াজ ছিল।'

ভাল লাগছিল ঠিকই, নতুন কথা—কিন্তু সারাদিন এখানে থাকলে চলবে না, হোটেলের লোকরা ভয় পেয়ে পুলিসে খবর দেবে।

তাই বললুম, 'ওসব কথা থাক, তুমি তোমার কথা বলো।'

'বাবাঃ! এত কৌতূহল! তোমরা আবার মেয়েছেলের দোষ দাও! তুমি মেয়েছেলের অধম!'

'তা হোক। শুরু করো তুমি গোড়া থেকে কিন্তু। তোমার বিয়ে থেকে।'

॥ ৫ ॥

গোড়া থেকেই শুরু করল মেন্তি।

বড় মেয়ের বিয়ের পর ওর মায়ের মনে একটু সাহস এসেছিল।

এটা বুঝেছিলেন যে ভবিতব্যের যোগাযোগ হ'লে পয়সার জন্যে আটকায় না, এক-রকম করে বিয়েটা হয়েই যায়।

লোকে যথার্থ কন্যাদায় বুঝলে প্রাণপণেই সাহায্য করে।

চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বর আর চোদ্দ বছরের খেন্তি, তাও চোদ্দ বলাও চলে না ঠিক, পূর্ণ তেরো—অনেকেই নিষেধ করেছিল বৈকি, কিন্তু আর কিছু না হোক দুবেলা খেতে পাবে আর এই অমানুষ ভাইগুলোর হাত থেকে রেহাই পাবে—এই আশাতেই মাসিমা কোন দিকে তাকান নি।

বিয়ের পর বুঝেছিলেন—ভালই করেছেন, খেন্তি সুখে না হোক শান্তিতে আছে, সুখীই হয়েছে।

সেই অভিজ্ঞতাতেই, এত বড় ধনীগৃহ থেকে সম্বন্ধ আসাতেও ভয় পান নি, রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। পাত্র নিজেই গোসাঁই বা বর্তমান সেবাইৎ হ'লেও ছেলেমানুষ,

দেখতেও সুশ্রী। মেন্তির সঙ্গে মানাবে। বিশেষ পাত্রের মা যখন উপযাচক হয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে ঠিকানা যোগাড় ক'রে খুঁজে খুঁজে বাড়ি এসে প্রস্তাব করলেন, তখনকার দিনেও দশ টাকার মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ঢুকে মেন্তির মা'র দুটি হাত ধরে অনুনয় জানালেন —তখন তিনি যদি এটাকে ভগবানের যোগাযোগ বলেই ভেবে থাকেন তো তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

অন্য কোন খোঁজখবর তিনি করেন নি, কে-ই বা করবে, কোন্ সূত্রে?

গুণধর ছেলেরা তাঁর, বড়লোকের বাড়ি বোনের বিয়ে হচ্ছে—ভবিষ্যতে তাকে দোহন করে নিজেদের বেপরোয়া নেশা করার সুবিধে হবে—এই ভেবেই উল্লসিত, তারা কোন আপত্তি কানে তুলতেই রাজী নয়—কেউ কোন দ্বিধা বা সংশয়ের কথা তুলতে গেলে তাকেই মারতে উঠছিল।

তবু কেউ কেউ নিষেধ করেছিল—এই রকম অসমবিবাহ দিতে।

এত বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে যাওয়া ঠিক নয়—পদে পদে অপমানিত হতে হবে।

খেন্তির বেলা প্রশ্ন ছিল অসম বয়সের—কিন্তু অবস্থায় খুব একটা আকাশপাতাল তফাৎ নয়।

এদের মতো দরিদ্র হয়ত নয়, তবু সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থই।

তাছাড়া দোজবরে বর—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—সে তো মাথা নিচু ক'রে থাকবেই।

কিন্তু এটা একেবারে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়া—এ ঠিক নয়।

মেয়েকে সাতঝুড়ি কথা শুনতে হবে প্রতিদিন—দীর্ঘকাল ধরেই, যতদিন শাশুড়ী-ননদ বেঁচে থাকবে।

বারণ করেছিলেন অনেকেই, বিশেষ ওদের আত্মীয়, আমাদের পরিচিত গোসাঁই দিদিমা, যার সুবাদে আমাদের সঙ্গে পরিচয়, তিনি পই পই করে বারণ করেছিলেন।

বলেছিলেন, 'শুনেছি দুই বাঘা ননদ বাড়িতে থাকে, কড়ে রাঁড়ী—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে। অবিরত খোঁটা দেবে—হাঘরের মেয়ে ভিখিরীর মেয়ে বলে।'

মেন্তির মা তার জবাবে বলেছিলেন, 'সবই তো বুঝছি ঠাকুরঝি, কিন্তু আমার কি উপায় বলো। এ সুযোগ কি আর আসবে? দোজবরে তেজবরেই যে অমন বার বার জুটবে —তারও তো কিছু লেখাপড়া নেই। আমি তো একটা আধলারও আজীর। নিজে থেকে সব খরচ দিতে চাচ্ছে, আমাদের ঘরখরচা সুদ্ধ—এমন লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলা উচিত? আমার যা সব ছেলে বাড়িতে—কুলাঙ্গার বললেও বলা হয় না—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে মেয়েটা—খেন্তি চলে গিয়ে এস্তক ওর ওপরই তো সব—আদ্ধেকদিন খেতে পায় না, তার ওপর কারণে অকারণে তম্বি তো লেগেই আছে। পান থেকে চুন খসলেই—না খসলেও—যখন তখন নেশার ঝোঁকে ঢিবঢিবিয়ে দিচ্ছে—চোরের মার মারে এক একদিন। আর কিছুদিন পরে মদের পয়সায় টান পড়লে ডালকামন্ডীতে বেচে দিয়ে আসবে না —তাই বা কে বলতে পারে?

এর পর আর কিছু বলতে পারেন নি গোসাঁই দিদিমা।

কেউই কিছু বলতে পারে নি।

এরপর এক পথ—মেয়েটার পুরো ভার নিতে হয়, সেই বা অত ঝুঁকি কে নেবে?

ঐ আগুনের খাপরা মেয়ে?...

তারপর, বিয়ের সময় যখন ভারে ভারে জিনিস আসতে লাগল, সমারোহ ক'রেই বিয়ে হ'ল—সবাই বললে পাঁড়ে হাউলি কেন—কাশী শহরেই অনেককাল এমন জাঁকের বিয়ে হয় নি—তখন যারা নিষেধ করেছিল তারাই অনেকে ঈর্ষিত হয়ে উঠল।

মেন্তিরও মন্দ লাগে নি।

আর কিছু না হোক, এই নরক থেকে মুক্তি।

এক যা মা'র জন্যেই দুঃখ।

তবু, এমন দুরাশাও তার মনে হয়েছিল, হাজার হোক ছেলেমানুষ তো, ওরও তখন মোটে চোদ্দ বছর বয়স, অবাস্তব সুখস্বপ্ন দেখা ঐ বয়সেরই ধর্ম, ওখানে গিয়ে যদি সুবিধে হয়—মাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে।

খুব খারাপ দেখায় যদি—বা মা না রাজী হন—এরা তো বড়লোক, নিশ্চয় ওখানে অনেক বাড়ি আছে, কোথাও একখানা ঘর দিয়ে রাখতে পারবে না?

একবেলা দুটি ঠাকুরের প্রসাদ আর বছরে দু'খানা কাপড় হ'লেই মার চলে যাবে।

তারপর তো সেই হীরে-জহরতে মুড়ে নিয়ে যাওয়া ; বাজনা-বাদ্যি হাতিঘোড়া আলো—গল্পকথার মতো, রূপকথার মতোই বিয়ে।

সুখে আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল মেন্তির।

মনে হয়েছিল তাকে যে সকলে রূপসী বলে, এই এত বড় ঘরে পাঠাবেন বলেই ভগবান এত রূপ দিয়েছেন।

অবশ্য সে স্বপ্ন ভাঙ্গতে এক বেলাও লাগে নি।

অতি বড় রূপসী না পায় বর—এ কথাটার যাথার্থ্য বুঝতেও দেরি হয় নি।

শ্বশুরবাড়ি এসে দেখল যে এখানকার নগণ্য চাকরেরও যে মর্যাদা আছে ওর স্বামীর তা নেই, তাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না, কোন হুকুম করলে মুখের ওপরই ভেংচি ঠাট্টা ক'রে চলে যায়।

আসল কর্ত্রী দুই বিধবা ননদ—ওর শাশুড়ী নিজেই রাগ ক'রে বলতেন রহলাদহলা—স্বামী শাশুড়ী দু'জনেই ওদের ভয়ে কাঁটা।

মেন্তির যখন বিয়ে হয় তখন ওর স্বামীর বয়স তেইশ-চব্বিশ মাত্র, দুই ননদই তার থেকে অনেক বড় ; মধ্যে নাকি তিন-চারটি সন্তান নষ্ট হয়ে গিছল শাশুড়ীর। চল্লিশ না হলেও চল্লিশের কাছাকাছি বয়স তাদের।

রহলাদহলা—পোশাকী নাম বিশাখা আর চন্দ্রাবলী, ললিতাও একজন ছিল, মারা গেছে—দীর্ঘকাল এখানে কর্তৃত্ব করে এসেছে, তাদের অনুমতি ছাড়া এখানে কোন কাজ কোনদিন হয় না।

মেন্তির এই আকস্মিক আগমনে গোড়া থেকেই তাই বিরূপ হয়েছিল ওরা।

এ বাড়িতে মেন্তির বিয়েটাই তো তাদের কর্তৃত্ব বা অথারিটির বিপর্যয় রকমের ধ্বস নামা একটা।

একটু হিসেবের ভুলে দুই বোন একসঙ্গে চার ধাম করতে বেরিয়েছিল, মা যে ইতিমধ্যে এমন কাণ্ড করে বসবেন, এত সাহস হবে তাঁর—ভাবে নি।

তিনি এরই মধ্যে একেবারে আশীর্বাদ পর্যন্ত করে বসে আছেন, চিঠি ছাপা প্রস্তুত।

বোধ হয়—মেন্তির অন্তত তাই বিশ্বাস—ননদরা কোনদিনই ভাইয়ের বিয়ে দিতে চাইবে না, অন্তত সুন্দরী কোন মেয়ের সঙ্গে তো নয়ই—এই বুঝেই তিনিও এই সুযোগটা নিয়েছিলেন।

আশীর্বাদ পর্যন্ত করা হয়ে থাকলে তারা আর বিয়ে বন্ধ করতে সাহস করবে না এই কথাই ভেবেছিলেন।

তা করেও নি তারা।

সত্যিই সাহসে কুলোয় নি।

বিপুল একটা কেলেঙ্কারির ভয়েই কীল খেয়ে কীল চুরি হয়েছিল তাদের।

কিন্তু হিতে বিপরীতই হ'ল এতে।

ঈর্ষায় বিদ্বেষে এবং আশঙ্কায় হিংস্র হয়ে উঠল একেবারে।

এতদিনের কর্তৃত্ব হারাবার আশঙ্কা।

বিশেষ নতুন বৌয়ের রূপের দিকে চেয়ে—এখানে এসে মাজাঘষা ও প্রসাধনে সে রূপ চতুর্গুণ খুলেছিল—আরও আশঙ্কা তাদের।

মনে হ'ল এই বৌ পেয়ে ভাই ব্রজকিশোর উন্মত্ত হয়ে উঠবে—বৌয়ের কথায় উঠবে বসবে।

তাই বৌয়ের সঙ্গে যাতে কিছুতেই ভাইয়ের ভাবসাব না হ'তে পারে—সেই চেষ্টাতেই উঠে পড়ে লাগল।

বয়সের দোহাই দিয়ে বলল, 'ও মেয়ের কিছুতেই তেরোর ওপর বয়স হ'তে পারে না—পাছে বে ভেঙ্গে যায়, পাছে বয়েসের এতটা তফাৎ বলে আমরা আপত্য করি তাই মা মাগী বয়েস বাড়িয়ে বলেছে। যেমন বোকচন্দর আমাদের মা ঠাকরুণটি—তেমনি বোকা বানিয়ে কোনমতে গছিয়ে দিয়েছে বৈ তো নয়! (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স কমিয়ে বলারই দুর্নাম হয় বিয়ের ব্যাপারে—মেন্তি ম্লান হেসে বলল, ওর কপালে সবই উল্টো!) এ বয়েসে ছেলে হ'লে চিররুগ্ন হবে, আর বেজারও তো ঐ স্বাস্থ্য—অন্তত দুটো বছর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।...মা'র না হয় ভীমরতি ধরেছে, জ্ঞানগম্যি নেই, তাই বলে আমাদের তো আর মাথা খারাপ হয় নি। হাজার হোক—আমাদের বংশের ভবিষ্যতের কথা, এই ছেলে একদিন গদীতে বসবে। সেটা তো আমাদের বিচার করতে হবে!'

সেই হুকুমই বলবৎ রইল—মেন্তি ননদের কাছে শোবে।

শাশুড়ী বা স্বামী এত বড় অবিচারেরও—অত্যাচার বলাই উচিত—কোন প্রতিকার কি প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসে বোনদের ভয় করাটা স্বভাবের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল ব্রজকিশোরের।

এখন মেন্তি জেনেছে—ওর গুরুদেবের কথা কখনও মিথ্যা হয় না, কখনও হয় নি অন্তত—বহু ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পেয়েছে ও, যা বলতেন অভ্রান্ত—তিনিই বলে গেছেন, দিদিরা ভাইকে অল্প অল্প করে এক ধরনের কি ওষুধ বা বিষ দিয়ে অমন জড়বুদ্ধির মতো করে রাখত, ডাক্তারী ওষুধের নাম করে খাওয়াত—শরীর খারাপের অজুহাতে, ডাক্তারের সঙ্গে যড় করে।

এর কারণ কিন্তু শুধুই কর্তৃত্ব নয়।

আগে কথা হয়েছিল বড় ননদের সঙ্গে শোবে মেন্তি।

কার্যকালে দেখা গেল, পালা ক'রে এক একদিন এক একজন পাহারা দিচ্ছে ওকে।

কারণটাও জানতে বাকী রইল না বেশীদিন।

দু'জনেরই চরিত্রের দোষ ছিল—'বার-দোষ' যাকে বলে।

দীর্ঘকাল ধরেই নানা কীর্তি ঘটে আসছে।

বড়র নাকি এ বিষয়ে অসাধারণ নামডাক।

এদিকে মন্দিরের কামদার দু'জন পূজারী থেকে শুরু ক'রে দারোয়ান পর্যন্ত কাউকে বাদ দেয় নি—পুরনো ঝি রামপিয়ারী আরও খারাপ কথা বলেছে, সে মুখে উচ্চারণ করা যায় না,—এখন বাইরে যেতে শুরু করেছে।

গভীর রাত্রে ঝিকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে অন্য কোন্ কুঞ্জে পূজারীর কাছে যায়, তার সে কুঞ্জ ছেড়ে বেরোবার উপায় নেই, তাই ঐ ব্যবস্থা।

ছোট বোন অতটা নয়, তবে সে এখানেই অনেক নাগর বদল করেছে এর মধ্যে, এখন

এখানের বড় পূজারীর এক ভাইপো এসেছে দেশ থেকে, অল্প বয়স, কুড়ি-একুশের বেশী হবে না, স্বাস্থ্যবান—তাকে নিয়ে উন্মত্ত।

এদের ভয় দু'দিকে।

ভাই সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠে এ অনাচার হয়ত বরদাস্ত করবে না, শাসন করতে চাইবে, গোলমাল করবে।

বিশেষ স্ত্রীর বশ হলে সে-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে, প্রতিকার করতে বাধ্য করবে হয়ত।

দ্বিতীয় কারণটা আরও স্থূল ও প্রত্যক্ষ।

দুই বোনই বয়সকালে দেখতে ভাল ছিল. এখনও সে চেহারার চিহ্ন কিছু কিছু আছে।

তবু বয়স হয়েছে, আগেকার সে আকর্ষণ কমতে বাধ্য।

নিজেরাও তা বোঝে।

অথচ দু'জনেরই কামনা ক্রমশঃ উগ্রতর হচ্ছে. বিশেষ অল্পবয়সী প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে লোভ বাড়ছে।

এই অস্বাভাবিক প্রণয়লীলা বজায় রাখতে গেলে যৌবনের খামতিটা অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া দরকার।

এক কথায়—টাকা দিয়ে প্রেমাস্পদ কিনতে হয়।

এসব টাকাই এ'রা যথেচ্ছ এস্টেট থেকে ভেঙে আসছেন. আগেও কিছু কিছু ছিল. ইদানীং সেটা অনেক বেড়েছে।

ভয় হ'ল নতুন বৌ. কথাবার্তায় খুব বোকা বলেও মনে হয় না—দু'দিন পরেই বুঝবে. কিংবা এখনই বোঝে যে সে-ই আসল মালেকা. চিরদিন তাকে আলাদা রেখে দাবিয়ে রাখাও চলবে না।

সে যখন এই সব হিসেব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে. তখন স্বামীর নজর পড়তেও দেরি হবে না।

যে টাকা খরচ হয়ে গেছে তা আর আদায় হবে না এটা ঠিক—কিন্তু ভবিষ্যতে?

এ বাজে খরচা বন্ধ করতে চাইবে বৈকি।

তখন এ'দের গতি কি হবে? নখদন্তহীন বুড়ো বাঘিনীদের?

রূপের মোহ ঘুচলে শিকারকে রূপোর মোহ দিয়েই ভুলিয়ে আনতে হয়—পুরুষ-রূপী শিকারকে।...

সেইখানেই এদের বেশী দুশ্চিন্তা।

লালসা এখনও কিছুমাত্র কমে নি, আর সে সম্বন্ধে এরা লজ্জিতও নয়!

এসব কতক নিজেই দেখেছে. কতক শুনেছে মেন্তি ঝি-চাকরদের মুখে।

স্ত্রীলোক দুটোর আশ্রিত যে সব দাসী. যারা এই অনাচারে সহায়তা করে প্রচুর টাকা পায় ওদের কাছ থেকে—তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে বলে গেছে. প্রমাণ দিয়েছে।

বোধ হয় তারা ভেবেছে এ রাজত্ব চিরদিন চলবে না. ভাবী কর্ত্রীকে হাতে রাখাই ভালো।

চলবে না যে. তা ওর ননদরাও বুঝেছিল।

যত বড় হচ্ছে ততই আরও রূপসী হয়ে উঠছে মেন্তি. সামান্য বেশ. মলিন বস্ত্র. কঠিন পরিশ্রম কিছুতেই সে রূপ ঢাকা যাচ্ছে না।

যতই আড়ালে রাখুক—একদিন না একদিন ভাইয়ের চোখে পড়বে. এমনভাবে এমন সময় হয়ত পড়বে যখন নেশায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিও জ্বলে উঠবে, নিজের অধিকার দাবী

করবে সে, তখন আর তাকে বঞ্চিত রাখা চলবে না। কামার্ত মানুষ ক্ষুধার্ত পশুর থেকেও ভয়ঙ্কর, সেটা ওরা ভালই জানে।...

যত দিন কেটেছে, কোনমতে কিছুতেই এই কাঁটাটা দূর করা যায় নি—ততই অস্থির হয়ে উঠেছে স্ত্রীলোক দুটো।

শরীর খারাপও হয় না যে ওষুধের নাম ক'রে বিষ দেবে।

ওদের আনা চরণামৃত পর্যন্ত খেত না মেন্তি, রামপিয়ারী বারণ ক'রে দিয়েছিল।

আর কিছু না পেরে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়েছে—যাতে মেন্তিরও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে—আশা করেছে যে তাতেই মেয়েটা আত্মহত্যা করবে কিংবা পালিয়ে যাবে।

অন্য পুরুষ ভেতরে আনা মুশকিল তবু সেদিকেও চেষ্টা করেছে বৈকি—একটু-আধটু।

শয়ন আরতির সময় একা মন্দিরে পাঠিয়েছে, সেই তরুণ পূজারীটিকেও টিপে দিয়েছে চন্দ্রাবলী—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।...

যেটাকে সামান্য কাঁটা বলে মনে করছিল সেটাই ক্রমশঃ পরিণত ও দৃঢ়মূল কণ্টক-তরুতে পরিণত হয়েছে।

প্রায় যখন দিশেহারা অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে—ওদের বা মেন্তিরই সৌভাগ্যক্রমে—মেন্তির জীবন-রঙ্গমঞ্চে আমার প্রবেশ।

এসব কিছুই আমি জানতুম না, আমরা কেউই না।

বৃন্দাবনে গিয়ে অন্য ঠাকুরবাড়ি ঘুরতে ঘুরতে ভৃঙ্গারবটেও গিয়েছি মা'র সঙ্গে।...

ওখানেই মেন্তির বিয়ে হয়েছে—এইটুকু মাত্র শোনা ছিল, আমরা দেখা করার চেষ্টাও করি নি, সে অবসরও মেলে নি, মেন্তিই ওপর থেকে দেখতে পেয়ে আর নিজেকে সামলাতে পারে নি, ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছে।

আমার মা-ই তখন ওর কাছে সমস্ত বাপের বাড়ির প্রতীক—মনে হ'ল ওর মায়ের সস্নেহ হৃদয় নিয়ে এসেছেন, ওকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দিতে।

সে এক মুহূর্তেরও বেশী নয় বোধ হয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশাখা বেরিয়ে এসেছে।

তাকে দেখেই ভয়ে শিঁটিয়ে কাঠ হয়ে উঠে নিঃশব্দে যেন পিছু হটে হটে চলে গেল মেন্তি।

তাতেই অনেকখানি বলা হয়ে গেল অবশ্য, ওর এই দাসীরও অধম সর্বপ্রকার ভূষণ-হীন দীন মলিনবেশ, আর এই অবর্ণনীয় আতঙ্ক, তাতেই আমরা বুঝলুম কী অবস্থায় ও এ বাড়িতে থাকে।

তখন অপরাহ্ণকাল, গরমের দিন সেটা, নাটমন্দির ও মন্দির-প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ জনহীন ছিল, মন্দিরে পূজারী পর্যন্ত ছিল না কেউ।

তবু কুলবধূকে বাইরের হাটের মধ্যে টেনে আনা বা এখানে আসার জন্য তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ও উৎসাহিত করার অপরাধে, এখানে তার সঙ্গে কথা কওয়ার জন্য তো বটেই (যদিচ একটা কথাও বলার অবসর পান নি মা)—আমাদেরও লাঞ্ছনা ও অপমানের শেষ রইল না।

কে আমরা, তাদের বৌয়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক সব কঠিন মিষ্ট ভাষায় জেনে নিয়ে যৎপরোনাস্তি দুর্বাক্য প্রয়োগ করল।

শেষে মা'র অসহ্য হওয়াতে তিনিও কিছু কিছু মুখ খুললেন—তাতেই অল্পে শেষ হ'ল, রণে ভঙ্গ দিয়ে ভেতরে চলে গেল, নইলে হয়ত দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দেওয়াত।

ব্যাপারটা কিন্তু এতেই মিটল না।

ভগবান ওদের যেন অপ্রত্যাশিতভাবে এই সুযোগ এনে দিলেন।

ওরাও তার সদ্ব্যবহার করতে দেরি করল না।

বড়টির মাথাতে এত কথা যায় নি।

সে তার নিজের মতোই অপমান লাঞ্ছনার লাইনে যাচ্ছিল, ইদানীং গায়ে হাত তোলাও শুরু হয়েছিল, তাও বাদ যায় নি—ছোট এসব থামিয়ে দিয়ে ভারটা নিজের হাতে তুলে নিল।

মেন্তিকে পাশে বসিয়ে একে একে সহজভাবে প্রশ্ন করে করেই সব কথা জেনে নিল।

আমার মা যে ওর আপন মাসি নয়, আপন কেউ নয়, ওরা ব্রাহ্মণ আমরা কায়স্থ—দিনকতক ওদের ওখানে মা খরচ দিয়ে খেয়েছিলেন, সেই সূত্রেই আলাপ পরিচয়, আমরা সমবয়সী বলে আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল, খেলার সাথীর মতো—কোন কথাই গোপন করে নি মেন্তি, করার প্রয়োজন আছে, তাও বোঝে নি।

এইবার সর্পিণী তার ফণা বিস্তার করল।

চিরদিনই আমার—আমার কেন আমাদের তিন ভাইয়েরই—বাড়নশা গড়ন, আসল বয়েসের থেকে ঢের বেশী দেখাত।

ওরা বলল, আমার নাকি কমসে-কম উনিশ কুড়ি বছর বয়স।

বৌ বাপের বাড়ি থাকতেই আমার সঙ্গে নষ্ট—হয়ত পেট খসিয়েও এসেছে, তাই অমন কালিমাড়া চেহারা হচ্ছে দিন দিন—আমার বিরহেই অমন মনমরা হয়ে থাকে, ফোঁস ফোঁস করে যখন তখন নিঃশ্বাস ফেলে—(বাপের জন্মে যা খেতে পায় নি এখানে তা খাচ্ছে, এত কষ্টটা কিসের—মনঃকষ্ট ছাড়া?) বরের সঙ্গে শুতে চায় না।

হ্যাঁ, ওরা বারণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে তো কবেকার কথা, ও যেতে চাইলে কি আর যেতে দিত না?

তাছাড়া দিনরাত কিছু পাহারা দিচ্ছে না, ইচ্ছে হলেই ঠিকই বরের সঙ্গে ভাব ক'রে নিত এতদিনে, বলে গাইবাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে পিইয়ে থাকে।

আসলে ঐ রসালো নাগরের কাছে মন পড়ে আছে তাই। ইত্যাদি ইত্যাদি—

অতএব—।

নিজেরাই যেখানে বাদী, নিজেরাই বিচারকর্তা—সেখানে বিচারেও দেরি লাগে না, রায়ও যে কি দাঁড়াবে তা আগে থাকতেই অনুমান করা চলে।

ননদরা ভাইকে ডেকে—মত নেওয়া নয়, নিজেদের মতই তাকে শুনিয়ে দিল—তার স্ত্রী নষ্ট, একথা অকাট্যভাবে প্রমাণও হয়ে গেছে, শহরে জানাজানি হতেও বাকী নেই। এখনও বৌ ঘরে রাখলে সমাজে পতিত হতে হবে, শিষ্য-সেবক সব ছেড়ে যাবে, ঠাকুরেরও কোপে পড়তে হবে।

তাদের ধর্মের ঘরে এত বড় পাপ কিছুতে সহ্য হবে না—সুতরাং এ বৌ ত্যাগ করতেই হবে।

পরে আবার তারা দেখেশুনে ভাল ভদ্রঘর দেখে ভাইয়ের বিয়ে দেবে।

সদ্বংশের মেয়ের কি অভাব, মায়ের নেহাৎ মতিচ্ছন্ন তাই এমন ডাহা ময়লায় হাত দিয়েছিল।

ব্রজকিশোর পাথর হয়ে বসে শুনল, একটা কথাও বলতে পারল না।

পরে মেন্তি শুনেছে—ঝিয়েদের মুখে, আড়ালে গিয়ে নাকি চোখের জল মুছেছিল।

মাকে কেউ কোন কথা বলল না, তিনিও কোন মত দিতে সাহস করলেন না।

কন্যাদেরও নিরস্ত করতে পারলেন না।

অনায়াসে বিনা বাধায় তাদের কাঁটা এবার তারা তুলে ফেলল।

এক বস্ত্রে দারোয়ান ও ঝি সঙ্গে দিয়ে কাশীতে পাঠিয়ে দিল।

ঝিকে শেখানোই ছিল, সে চৌকাঠের বাইরে থেকে, বেশ পাঁচজনের শ্রুতিগম্যভাবে কথাগুলো শুনিয়ে—এ বাড়ির মেয়ের নষ্ট চরিত্রের ইতিহাস—সেইখান থেকেই ফিরে চলে গেল।

সেইখানে, দরজার কাছেই ম্লান, শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়ে রইল মেন্তি, যতক্ষণে না তার মা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মেয়ের এবং তাঁর মৃত্যুকামনা করতে করতে এসে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

মেন্তির চোখে এক ফোঁটাও জল ছিল না।

অতিরিক্ত দুঃখে ও উপর্যুপরি দুর্ভাগ্যের আঘাতে তার মধ্যকার অশ্রুর উৎসও শুকিয়ে গিয়েছিল যেন।

॥ ৬ ॥

যে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল মেন্তি, সে বাপের বাড়ি আর ফিরে আসতে পারল না।

আগেও খারাপ ছিল, অতি দুঃখেই কাটিয়ে গেছে জীবনের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স—তবু সে পরিস্থিতিও আর খুঁজে পেল না।

আরও খারাপ, আরও অসহ হয়ে গেছে।

বাড়ি বলতে ভাইরাই।

তার বৌদিরও তিনকুলে কেউ ছিল না, তবু দূরসম্পর্কের এক কাকা অবস্থা শুনে এসে নিয়ে গেছেন, সে নাকি সেখানে কোন সেলাইয়ের কলে কাজ শিখছে—তাতে একটা পেট চালিয়ে নিতে পারবে।

অর্থাৎ সে বেঁচে গেছে।

কিন্তু মেন্তি? তাকে কে বাঁচাবে?

ভাইদের ব্যবহার কোনকালেই সস্নেহ ছিল না।

এখন তারা রীতিমতোই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে।

তার কারণ আশাভঙ্গ।

তাদের টাকার প্রয়োজন বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশঃ—আয়ের পথ কমছে।

ওরা অনেকখানি আশা করেছিল এই বোনের ওপর—বড়লোকের ঘরে বিয়ে হচ্ছে, প্রচুর টাকা বাগাতে ও পাঠাতে পারবে।

আসা-যাওয়া থাকবে—নিজেই দিয়ে যাবে।

ওদের হাত ঝাড়লেই পর্বত। নগদ টাকা না দিতে পারুক, যার অত গয়না—এক-আধখানা করে দিয়ে গেলে শ্বশুরবাড়ির কেউ জানতেও পারবে না।

সে-সবের কিছুই হ'ল না।

বিয়ের পর আসা তো চুলোয় যাক, অথবা তাদের সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ—না রাম না গঙ্গা—সাড়াশব্দ কোন সম্পর্কই রইল না।

একটা চিঠিও কেউ দিল না।

অষ্টমঙ্গলার সময়েই দু'একখানা গহনা বাগিয়ে নেবে আশা করেছিল—তাও এল না।

উপরন্তু, ওদের পরিচিত এক ভদ্রলোক বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তিনি খোঁজ করে দেখা করতেও গিয়েছিলেন—মেন্তির মা'র কান্নাকাটিতে—তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে কি দেখা করতেও দেয় নি।

বলেছে, 'আমাদের বাড়ির বৌদের অমন হুট বলতে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা

করতে দেওয়ার রেওয়াজ নেই।'

তারপর তো এই।

একেবারে ঘাড়ে এসে চাপল—সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থায়, একবস্ত্রে, একটা বিশ্রী দুর্নাম সঙ্গে নিয়ে।

ফলে একেবারেই খড়্গহস্ত হয়ে উঠল ওরা।

একবেলাও বিনা দুর্গতি ও লাঞ্ছনায় কাটে নি মেন্তির—ঐ ক'টা মাস।

কিন্তু ক্রমশঃ বুদ্ধি খুলল।

খুলল ওর ছোড়দা মটরারই।

মন্দের মধ্যে থেকে যতটা ভাল আদায় করা যায়—টু মেক দ্য বেস্ট অফ ইট, ইংরেজিতে যাকে বলে—সেই চেষ্টাতেই উঠে পড়ে লাগল সে।

কোন আভরণ বা বেশ পারিপাট্য না থাকলেও—এখানে এসে অন্তত পরিষ্কার হয়ে স্নান করতে পেরে মেন্তির রূপের জেল্লা বা ঔজ্জ্বল্য আরও খুলেছে।

মটরারই প্রথম মাথায় গেল কথাটা—গহনা না থাক আস্ত হীরেটা তো আছে।

এ রূপ বিক্রি করলে ভাল একটা জড়োয়া গহনার থেকে বেশী দাম পাওয়া যাবে, বোনটাও সুখে থাকবে। তুলসে গুণ্ডা আগে এ কারবার করত—একচেটে ছিল তার—সে শেষ হয়ে যেতে অমন দাপটের সঙ্গে আর কেউ করতে পারে না, অত সুশৃঙ্খলে করার মতো বিপুল সংগঠন-ব্যবস্থাও নেই—তবু কারবার তো একেবারে বন্ধ হয় নি, গোপনে গোপনে চলেই।

ডালকামণ্ডীতে দিয়ে এলেও টাকা পাওয়া যাবে, সেখানে এরকম নতুন ঘোড়া বশ করে, 'ব্রেক করা' যাকে বলে—তাকে গাড়িতে জুততে পারে, এমন এক্স্‌পার্ট বুদ্ধা ঢের আছে—তবে তাদের কাছে বেশী দর মিলবে না।

যারা চালানী কারবার করে—তাদের কাছেই দর বেশী উঠবে।

সেই চেষ্টাই দেখতে লাগল মটরা।

প্রকাশ্যে নয়, কারণ অন্য ভাইরা জানতে পারলে ভাগ বসাবে কিংবা মুলেই-হাভাত করবে।

বড়টা তো রীতিমতো গুণ্ডা, সে যদি জোর ক'রে কিছু করে—মটরা বাধা দিতে পারবে না।

তাই সাবধানেই এগোতে লাগল।

হঠাৎ মেন্তির প্রতি খুব স্নেহার্দ্র হয়ে উঠল সে। কোথা থেকে—বন্ধুর দোকান থেকে ধারে এনেছে বলে—দুখানা রঙীন শাড়ি এনে দিল, সেই সঙ্গে ফিরোজাবাদী কাঁচের চুড়ি।

গঙ্গার ঘাটে কি এদিক-ওদিক বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠতে লাগল হঠাৎ—রাত্রে বিশ্বনাথের দুধ আরতি দেখাতে নিয়ে যাওয়ারও।

গত দু'বছর শ্বশুরবাড়িতে কেটেছে মেন্তির এক রকম ঝি চাকরদের মধ্যেই।

ঝিই বেশী, ঝি বা ঐ শ্রেণীর আশ্রিতা—যারা ভাঁড়ার দেয়, নাটমন্দির মোছে, কুটনো কোটে, তার মধ্যে বাঙ্গালীর মেয়েও আছে—হিন্দুস্থানী মেয়েও।

তাদের মুখে অনেক নোংরা কথা শুনেছে মেন্তি, জীবনের কুৎসিত দিকগুলোর অনেক ঘৃণ্য অন্তরঙ্গ কাহিনী।

তার ফলে সে আর আগের মতো ছেলেমানুষ বা সরল নেই, অভিজ্ঞতা না হলেও জ্ঞান হয়েছে অনেক। ছোড়দার এই আকস্মিক সহৃদয়তার কারণ বুঝতে তার কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না।

এই বেড়াতে নিয়ে যাওয়া মানে বাজারে দর যাচাই করা।

সম্ভাব্য খদ্দের বা দালালদেরই যে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারত।

এমন কি ভিড়ের মধ্যে কে যে তাকে দেখতে এসেছে, দেখছে ও মনে মনে হিসেব করছে কতটা পর্যন্ত দাম দেওয়া চলে—তাও জানতে বাকী থাকত না।

সেও কেমন যেন মরীয়া হয়ে গিয়েছিল।

এ জীবনের থেকে আর খারাপ কি হ'তে পারে, কত খারাপ হ'তে পারে!...

যে কিনছে সে অপর কারও কাছে বেচে দেবে দূর কোন দেশে?

দিক।

সে হয়ত সুখেই রাখবে—অন্তত কিছুদিন তো বটেই—যতদিন রূপযৌবন থাকবে।

শুনেছে এভাবে কিনে অনেকে বিয়েও করে—বিয়ের মতো একটা কিছু অনুষ্ঠান করে স্ত্রী বলেই পরিচয় দেয়।

মুসলমানরা তো করেই।

যদি বেশ্যাবৃত্তি করায় তাতেও দুঃখ নেই ওর।

এমনিতেই জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে গৃহস্থজীবনের সঙ্গে তার পরিচয়—অরুচি হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

তার ওপর—শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর থেকে জীবনের যে নমুনা দেখল সে, বড় বংশে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হওয়ার যে সুখ আস্বাদন করল, সেখান থেকে এসে ভদ্র জীবনযাপনের যে আনন্দ উপভোগ করছে, তারপর আর কোন জীবন সম্বন্ধেই কোন শঙ্কা থাকার কথা নয়—ছিলও না।...

এইভাবে খদ্দের বা দালালকে দেখাতে একদিন কেদারঘাটে নিয়ে গিয়েছিল মটরা।

সেটা একটা সোমবার—কেদারনাথ দর্শন করার নাম করেই নিয়ে গিয়েছিল।

বিকেলবেলা সেটা, সন্ধ্যার কিছু আগে।

খাওয়াদাওয়ার পর সোমবারের দর্শন করার কোন মূল্য আছে কিনা—সে প্রশ্ন নিরর্থক এখানে, মেন্তিও তা তোলে নি।

গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে ধীরে ধীরে ওরা মন্দিরে উঠছে, মানে উক্ত দালালকে ভাল ক'রে দেখার অবকাশ দিয়ে—সেও ওদের পাশে পাশেই উঠছিল, তাকে চিনতে অসুবিধা হয় নি সেদিনও—ওদিকে হরিশচন্দ্র ঘাট থেকে শ্মশানভস্ম সংগ্রহ ক'রে আসছিলেন এক সন্ন্যাসী বা অবধূত।

ওকে দেখে, চোখে চোখ পড়ার পর কেমন যেন এক মিনিটকাল থমকে থেমে গেলেন তিনি, সেই সঙ্গে মেন্তিও। তারও চোখে পলক পড়ল না, কিছুকালের মতো যেন পাথর হয়ে গেল সে, নিশ্চল, নিস্পন্দ।

কি দেখেছিল তা আজও জানে না মেন্তি, কোন্ ভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছিল তা আজও বুঝতে পারে নি ; ভক্তি, সম্ভ্রম, ভয়, বিস্ময়—না দেহজ আকর্ষণ, চেহারাও তার চোখে অন্তত আকর্ষণ করার মতোই—ভাল ক'রে তলিয়ে ভেবে দেখেও কোনদিন সঠিক উত্তর পায় নি সে।

শুধু এটা জানে যে সেদিন সেই মুহূর্তে ওর জীবনে যেন মস্ত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, প্রচণ্ড একটা ওলটপালট।

যেন দেহের সমস্ত রক্ত উত্তাল হয়ে বুকের কাছে চলকে উঠতে লাগল, ভেতরে ভেতরে সমস্ত স্নায়ুগুলো কেমন ঝিমঝিম ক'রে উঠল, হাতপাগুলো কেমন যেন অবশ হয়ে গেল কিছুকালের জন্য।

মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি কাঁপছে পায়ের তলায়।

মনে হ'ল এই প্রথম বুঝি তার জীবন আরম্ভ হবে এবার, নতুন ক'রে বাঁচবে সে।

বুঝি এই লোকটিরই আসার অপেক্ষা ছিল এতদিন।...

'ঠিক যে কী মনে হ'ল আর মনে হ'ল না—তা বলা শক্ত।' মেন্তি বলল, 'সেদিনও বুঝি নি, আজও বুঝতে পারি না। তাঁকেও জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি মিষ্টি ক'রে হেসেছেন, যেমন ছোটদের বোকামি প্রশ্নে অভিভাবকরা হাসেন, বলেছেন, "তোমার মনে কি হ'ল আমি বলব! বা রে। সে তো তুমিই জানো।" তা নয়—তিনি বলতে পারতেন, সকলকার মনের কথাই বলতে পারতেন তিনি, একবার মাত্র চোখের দিকে চেয়ে। আসলে হয়ত বলার কিছু ছিল না, মনের মধ্যে সবটাই তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল—চিন্তা ভাবনা অনুভূতি সব! একটা ঝড় উঠেছিল মাথায়, কালবৈশাখীরই মতো, সেই বাতাসে পরিচিত দিকচিহ্ন, যা দেখে মনের গতি নির্ণয় করা যায়, কোথায় উড়ে চলে গিয়েছিল। সে ঝড়ে কোন্ ঘর ভাঙ্গল, কোন্ ভিত নড়ে উঠল, কোন্ নৌকোর নোঙর ছিঁড়ল—তা সেই সময়টুকুর মধ্যে হিসেব পাওয়া, জানা সম্ভব নয়। কী হয়েছিল তা পরে প্রকৃতি শান্ত হলে পরিণতি দেখে অনুমান করা চলে মাত্র।'

মটরা এসব কিছু বোঝে নি।

এ ধরনের হৃদয়াবেগের ধার ধারে না সে।

একটা লালকাপড়পরা ভণ্ড লোক একটা সুন্দরী মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে—এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু বোনটা হাঁ ক'রে কেন তাকিয়ে আছে ঐ বিভূতি আর রক্তচন্দনমাখা রুদ্রাক্ষপরা আধবুড়ো লোকটার দিকে—সেই কথাটাই ভাল বুঝতে পারল না।

হয়ত এ ধরনের সন্ন্যাসী দেখে নি সে।...

তবে তাতে ও বিরক্তও হ'ল না।

স্থির অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে তার মক্কেলের ভাল ক'রে দেখার সুবিধে হ'ল—এইটেই একরকম লাভ।

এই সন্ন্যাসীই মেন্তির ভাবী গুরু। ওর জীবনের পরম আশ্রয়।

'তিনি এক নজরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন।' মেন্তি বলল, 'আমার বিশ্বাস—এ বিশ্বাস কারও ওপর চাপাতে চাই না অবশ্য—তিনি ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, সেটাই গোপন ক'রে রাখতেন সর্বদা। কে কী উদ্দেশ্যে আমাকে দেখতে এসেছে আর কে দেখাতে এসেছে—কিছুই জানতে বাকী রইল না তাঁর।...তাঁর লোকও ছিল হাতে—নানা কাজের জন্যে নানান লোক। আশ্চর্য, সত্যি বলছি ভূতু, এতদিন কাছে ছিলুম, তবু তাঁর যেন শক্তির অন্ত পাই নি আমি। সম্পূর্ণ একা থাকতেন—নিভৃতে, নির্জন জায়গায়, মহাপুরুষদের বা সন্ন্যাসীদের চারপাশে যেমন ভক্তশিষ্যরা এসে ভিড় করে তেমন কোনদিন দেখি নি—কিন্তু কোনদিন তাঁর কোন জিনিসেরও অভাব হ'ত না, মানুষেরও না। দরকারের সময় যেন মন্ত্রবলে লোক এসে যেত। যেখানে যেমন লোক চাই, যে যে কাজের উপযুক্ত ঠিক সেই লোক যেন তাঁর হাতে থাকত সর্বদা—ইচ্ছে হ'লেই হাজির হ'ত। তেমনি একজনকে দিয়েই, মানে ঐ লাইনেরই—ছোড়দাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেই দিন—সন্ধ্যাবেলাতেই।...তারপর ও যেতে সোজা—কোন বৃথা দরদস্তুর নয়—পুরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইলেন আমার দাম। চেক নয়, হুণ্ডী নয়—নগদ দশ টাকার নোটে দেবেন, তবে দু'জন সাক্ষী রেখে রসিদ লিখে দিতে হবে—এই শর্ত।

'বোধ হয় এর আগে এত টাকা আর কেউ দিতে চায় নি। ছোড়দা এক কথায় রাজী হয়ে গিছল। তারপর কিভাবে কি ছুতোয় এনে ওঁর আস্তানায় তুলে দিয়েছিল সে তো তুমি শুনেছই। পছন্দমতো কাপড় কিনে দেবার নাম ক'রে এনেছিল। আমি অবিশ্যি জানতামই যে, এবার আমার বাপের বাড়ির অন্নও উঠল, তবে তাতে কোন আপসোস

ছিল না। এক দুঃখ মায়ের জন্যে, তবে এও আমি জানতুম আমি বাড়ি থাকলেও তাঁর দুঃখ ঘোচাতে পারব না, উলটে দিনরাত শত দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্যে আবার আমার চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসে থাকবে—তার চেয়ে মরার বাড়া গাল নেই, এ পর্ব শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।...

'তবে তখন অবিশ্যি জানতুম না, মনেও করি নি অতটা—যে তাঁর লজ্জাঘেন্না আরও বাড়াতে ছোড়দা দুর্নামটা আমার মাথাতেই চাপিয়ে দেবে, রটিয়ে দেবে যে আমি ওর জানাশুনো এক বকাটে ছোকরার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছি। যাক, মা মরবার আগে সত্যি কথাটা জেনে গেছে, এইতেই আমি খুশী।'

'যখন বাড়ি ছাড়ছ—ভয় হয় নি একটুও? কার কাছে যাচ্ছ, সে কেমন লোক—?' শুধোলুম আমি।

'না। ঐ তো বললুম, আমি তখন মরীয়া। যা হবার হয়ে যাক—এ বাড়ি থেকে তো মুক্তি পাব, সেইটেই যথেষ্ট।...তবে, এখন তোমাকে বলছি, আমার তখনই কেমন যেন মনে হয়েছিল—আগের দিন যে সন্ন্যাসীকে দেখেছি—ছোড়দার আজকের এই নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ আছে। কেন এ ধারণা হ'ল তা জানি না, কোন কারণ নেই—কিন্তু সত্যিই হয়েছিল। আর তাতে আমি খুব দুঃখিত হই নি। বরং যেন আশাই করছিলুম চাইছিলুম যে তাই হোক, একটু উৎসুকই ছিলুম—অনুমানের সঙ্গে মেলে কিনা! বড়লোকের হাতে পড়লে সোনাদানা পরতে পাব, সিল্কের শাড়ি—সন্ন্যাসীর হাতে পড়লে তার কিছুই হবে না, পয়সা থাকলেও পরাতে পারবে না, লোকলজ্জার ভয়ে—হয়ত শ্মশানে রাত কাটাতে হবে—হয়ত, কী সব কুৎসিত তান্ত্রিক ক্রিয়া করে ওরা শুনেছি সেই সব করাবে আমাকে দিয়ে—এসব কোন চিন্তাই আমার ছিল না, কী যেন এক প্রবল আকর্ষণে টানছিলেন উনি—ঘর সংসার ইহজীবনের সমস্ত পরিচিত পরিবেশ, কোন কিছুর মায়াই আর মনের মধ্যে ছিল না।'

॥ ৭ ॥

'তার পর?' প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসেই প্রশ্নটা করি।

'এইবারই আসল কথা—কী বলো?' খুব খানিকটা হাসল ভৈরবী, বলল, 'এইটে জানবার জন্যেই মরে যাচ্ছ—সেই অতদিন থেকে।...কিন্তু তার আগে—আর একটা কাজ সেরে নাও, বোধ হয় তোমার খাবার এনেছে এবার।'

'খাবার? আবার কি খাবার?'

'ওমা, সেই দুটো বিস্কুট খেয়ে বসে আছ, খিদে পায় নি? তখন কোন দোকান খোলে নি, কারও উনুনেও আঁচ পড়ে নি—তাই। দোকান খুলিয়ে চা চিনি বিস্কুট এনেছে, দুধও দুধও'লার কড়ায় যা ছিল, কালকের দুধ। তুমি কি ভাবছ আমি ঐ খাইয়ে ছেড়ে দেব, এই এত বেলায়?'

বলতে বলতেই সেই নির্বাক লোকটির ছায়া পড়ল আবার।

ভৈরবী গিয়ে তার হাত থেকে ঠোঙাটা নিয়ে এসে আমার সামনে ঠোঙা খুলে সেই পাতাতেই খাবারটা সাজিয়ে দিল, গরম কচুরি ও জিলাপী।

অনাবশ্যক সৌজন্য নেই ওর—ঘরে রেকাবি আছে—কিন্তু তা ধুতে হবে, পরে মাজতে হবে।

এত হাঙ্গামা করার দরকারও তো নেই।

বললুম, 'তা তুমি?'

'আমি দিনে কিছু খাই না—ঐ একটু দুধ ছাড়া। ওটাও অন্যদিন ঢের বেলায় খাই..

আজ জুটে গেল তোমার কল্যাণে তাই।'

'তা খাও কখন তাহলে?'

'সন্ধ্যের পর। সে-সময় অন্য কোথাও গিয়ে পড়লে তাও হয় না।'

'উপোস ক'রে থাকো? ওতে শরীর টেঁকে?'

'কৈ, উপোস বলে তো মনে হয় না। বেশ তো আছি দেখতেই পাচ্ছ।...নাও, তুমি তো শুরু করো। একে এ পাড়ার খাবার—ওর যে কি ছিরি তা চেহারাতেই মালুম, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর খাওয়া যাবে না।'

অগত্যা খাওয়া শুরু করলুম।

অভুক্ত মানুষটা সামনে বসে রইল, খুব খারাপ লাগছিল ঐভাবে একা একা খেতে—কিন্তু কিছু বলতেও পারলুম না।

বাল্যসঙ্গিনী, এখনও আমার সম্বন্ধে ওর মনে স্নেহ যথেষ্ট—দুর্বলতা বলাও হয়ত অন্যায় হবে না, তবু মনে হ'ল কেমন ক'রে সে যেন আমাকে ছাড়িয়ে আমাদের স্তর ছাড়িয়ে দূরে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

সাধারণ অন্তরঙ্গদের দলে আর ওকে ফেলা যাবে না।

তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও—খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারলুম না, সাহস হ'ল না।

মনে হ'ল ওর যা নিয়ম তা অলঙ্ঘ্য—কোন মতেই তা ভাঙ্গা যাবে না, মাঝখান থেকে আমিই ছোট হয়ে যাবো।

খাওয়া শেষ হলে পাতাগুলো গুটিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, জলের গেলাসটা সরিয়ে রেখে জায়গাটায় জলহাত বুলিয়ে নিয়ে—আবার কাছে এসে স্থির হয়ে বসল।

প্রশ্ন করাই ছিল, তাই আর নতুন ক'রে করলুম না।

শুধু জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলুম।

মেন্তিও বিনাভূমিকাতেই শুরু করল, 'তুমি যা ভেবেছিলে, তুমি কেন—আরও পাঁচ-জন যা ভেবেছে, ভেবে এসেছে এতকাল—তা ঠিক নয়। সেটাই স্বাভাবিক, তোমাদের মনে করাটা কিছু অন্যায় হয় নি, কিন্তু—সে মানুষটার কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কোনটাই তাঁর সাধারণ মানুষের মতো ছিল না, অপরের পক্ষে যা স্বাভাবিক—যে স্বভাবকে সে কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারে না—সে নিয়মও তাঁর বেলা খাটে না। আমাদের জানাশোনা কোন মাপকাঠিতেই তাঁকে মাপা যায় নি কোনদিন।

'তোমরা কেন, যখন দেখলুম সেই সন্ন্যাসীটিই আমাকে অত টাকা দিয়ে কিনছেন—তখন আমারও ঐ কথাটাই মনে হয়েছিল, তান্ত্রিক সাধনার কাজে লাগাবেন আমাকে। আগে হ'লে ঘেন্নায় শিউরে উঠতুম—ওসব ব্যাপার ভাল ক'রে না জানলেও আমাদের সেই দোতলার ভাড়াটে দিদিমার কাছে কিছু কিছু আবছা শুনেছিলুম; বামুনের মেয়ে সধবা অথচ স্বামীসঙ্গ হয় নি, অক্ষতযোনি—এ মেয়ে ওদের কাছে দুর্লভ, সেই জন্যেই এত দাম দিয়েছে—ধরে নিয়েছিলুম, সুতরাং ভয় ঘেন্না দুই-ই হবার কথা—কিন্তু কে জানে কেন ওঁকে দেখার পর আর অতটা ভয়ঙ্কর কি অপমানকর দুঃসহ বলে মনে হ'ল না। মনে হ'ল উনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন, যে ভাবেই হোক, আমার খারাপ লাগবে না, ভালই লাগবে হয়ত। ওঁকে দেখেই কেমন যেন একটা নির্ভর, আশ্বাসের ভাব জেগে-ছিল মনে, মনে হয়েছিল এতদিনে আমি একটা ভাল আশ্রয় পেলুম।

'কিন্তু আমি প্রস্তুত—এমন কি হয়ত, মিছে কথা বলব না, উৎসুক থাকলেও—উনি সে দিক দিয়েই গেলেন না। ওসব সাধনা হয় উনি কখনও করেন নি, নয় তো বহু আগেই ওসব পালা চুকেবুকে গেছে। আমি যখন থেকে দেখলুম—এসবের অনেক ঊর্ধ্বে উনি। সত্যিই যত দেখেছি ওঁকে, ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে কোন মালিন্য, কোন ক্ষুদ্রতা-লুব্ধতার কথা ভাবতেই পারি নি।...

'তা ছাড়া উনি একেবারেই উলটো কথা বললেন। বললেন, "তোমাকে দেখেই বুঝলুম তুমি উত্তম আধার—এমন তৈরী আধার প্রায়ই পাওয়া যায় না। এ তোমার পূর্বজন্মের সুকৃতি—আগেই যথেষ্ট সাধনা ছিল—কোন কারণে ঠিক সিদ্ধির আগে ব্যাঘাত ঘটে, তাই আবার আসতে হয়েছে। কিন্তু কঠিন সাধনা ছিল ব'লে সেই সুকৃতি নিয়েই জন্মেছ। সেই জন্যেই ভগবান তোমার সঙ্গে এই খেলা খেললেন, ঘর বাঁধতে দিলেন না কিছুতেই।"

'উনি আমাকে দেখেও যেমন চিনেছিলেন তেমনি ছোড়দাকেও। কেন আমাকে নিয়ে এসেছে ঘাটে, পাশের সেই বেঁটে লোকটা কেন আমাকে আপাদমস্তক ঠাউরে ঠাউরে দেখছে —তাও তাঁর বুঝতে বাকী থাকে নি। এও বুঝেছিলেন যে, ঐ লোকটার মাল পছন্দ হয়েছে, ছোড়দারও টাকার খুব দরকার, অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে, এ যা দাম দিতে চাইবে তাতেই রাজী হয়ে যাবে। সুতরাং আর সময় নেই—যা করতে হবে এখনই। ঐ লোকটা নিয়ে বাইরে চালান দেবে, নাচগান শিখিয়ে ঘৃণ্য জীবনে বাধ্য করবে এটা উনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন, তাই আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই ওঁর এত আগ্রহ, একেবারে এত টাকা কবলে বসে রইলেন. যাতে ছোড়দা না বলতে না পারে।

'কেনা অবিশ্যি বাজে কথা. উনিই বলেছিলেন পরে, "এদেশে কি মানুষ কেনা বেচার আইন আছে? না ঐ বিক্রি কোবালা আদালতে গ্রাহ্য হবে? তা নয়—ওটাকে তো বিশ্বাস নেই। এরপর আমাকে ভয় দেখিয়ে আরও টাকা আদায়ের জন্যে বলতে পারে আমি তোমাকে ফুসলে এনেছি, সেই জন্যেই রসিদ লিখিয়ে নেওয়া।"'

এর পরও বেশ কিছুদিন কাশীতে ছিল ওরা—মৈন্তিরা।

এইখানেই আস্তানা ছিল একটা, কাছাকাছি—যেমন দেখছি এখন।

কোথাও পাকা কোন আশ্রম করতেন না ওর গুরুদেব। (তাঁর কী নাম বলল না মৈন্তি, গুরুর নাম নাকি ধরতে নেই, লিখে দেওয়া চলে, তা কী লাভই বা অত হাঙ্গামা ক'রে?) এমনি পাতালতা দিয়েই ঘর তৈরি হ'ত—যেখানে যখন যেতেন।

এসব ঘর তৈরি করার লোকেরও কখনও অভাব হয় নি, মালপত্রেরও না।

কখনও কোন আসবাব, মায় পুজোর আসবাবও ঘরে রাখতেন না, কাপড় প্রয়োজনের বেশী একখানাও না।

যখন অন্যত্র যেতেন সব পড়ে থাকত, কেবল এই বাঘছালের শয্যা আর ত্রিশূল- এই সঙ্গে যেত, আর ধুনির আগুন একটুখানি।

এখানেই ছিল ওরা—কিন্তু কেউ আর সন্ধান পায় নি, মানে মৈন্তির পরিচিত কেউ।

ওর বড় দুই দাদা এই ব্যাপার জানাজানি হবার পর বিস্তর খুঁজেছে, মটরা নিজেও—বোনের কল্যাণের জন্যে বা তাকে উদ্ধারের জন্যে অবশ্যই নয়—সাধুটাকে ধমক দিয়ে আর কিছু টাকা আদায় করা যায় কিনা এই মহৎ উদ্দেশ্যেই তাদের এত খবর নেওয়া—সুতরাং চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি, বহু লোক লাগিয়েছে ওরা—কোন খবর পায় নি।

এমন কি, যেখানে এসে মটরা বোনকে বেচে গেছে সে জায়গাটাও খুঁজে পায় নি বা মনে করতে পারে নি আর।

তারপর—আরও বোধহয় এদের উৎপাতেই, এখান ছেড়ে ঐ বিন্ধ্যাচলে চলে যায় ওরা, যেখানে আমি গিয়েছিলুম।

মাঝে দিনকতক শহরেও ছিল, গৈবির কাছাকাছি একটা বাড়িতে, ওর গুরুদেবের এক গুরুভাইয়ের কাছে।

তিনিও নাকি খুব উঁচুদরের সাধক, যোগী, তাঁর কাছ থেকে কিছু উপদেশ শোনাবার জন্যেই মৈন্তিকে সেখানে রেখেছিলেন গুরুদেব।

অর্থাৎ আমি যে দুটো জায়গার কথা শুনেছিলুম, কোনটাই একেবারে অমূলক নয়।

তবে সঠিক ঠিকানা পেলেও নাকি আমি খুঁজে বার করতে পারতুম না, মেন্তি বলল।

কারণ জানতে চাইলুম—তার উত্তরে একটু হাসল শুধু. রহস্যময় হাসি, কোন খোলসা উত্তর দিল না।

ও আসার পর প্রথমে ওকে একটু লেখাপড়া শেখানো শুরু করলেন ওর গুরুদেব।

এদিকেও তাঁর অসামান্য শক্তি—যে কিছুই জানত না—তাকেও অতি অল্প আয়াসে খানিকটা চলনসই করে নিলেন।

তারপর রীতিমতো অনুষ্ঠান ক'রে দীক্ষা দিয়ে শুরু করলেন সাধনার প্রথম পাঠ।

নতুন সঙ্গী, নতুন জীবন—রহস্যময় নতুন পরিবেশ—একা সম্পূর্ণ এক অপরিচিত মানুষের সঙ্গে থাকা, ওর থেকে বয়সে অনেক বড়, গম্ভীর স্বল্পভাষী লোক—চোখের চাহনি এত গভীর ও স্থির যে দেখলে বুক কেঁপে ওঠে—সব জাড়িয়ে ভয় পাবারই কথা —কিন্তু কে জানে কেন ভয় পেল না মেন্তি, বরং খুব ভাল লাগল।

এই প্রথম যেন জীবনে শান্তির মুখ দেখল সে।

এত মধুর ব্যবহার, এমন সস্নেহ কথাবার্তা—জ্ঞান হবার পর থেকে তখনও পর্যন্ত তো আর কারও কাছ থেকে পায় নি।

অসুবিধা ছিল বৈকি।

জীবনযাত্রা বড় বেশী অনাড়ম্বর, প্রয়োজনের বেশী একটিও কাপড় নেই, ঘরে কোন আসবাব নেই. পাতালতার ঘর. সাপ বিছে জীবজন্তু তো অনায়াসেই আসতে পারে—বেশির ভাগ জঙ্গলেই যখন বাস—বিছানা বলতে খানিকটা শুকনো ঘাসের ওপর একটা মাদুর পাতা—মাথার বালিশ পর্যন্ত নেই—যত দুঃখেই থাক, এত কষ্ট করে নি কখনও —তবুও মেন্তির খারাপ লাগল না, এটাকে বিশেষ কষ্ট বলেও বোধ হল না।

কেন হ'ল না—তাও সে জানে না।

এ তাঁরই কোন প্রচ্ছন্ন প্রভাব, না নূতনত্বের অভিনবত্বের আকর্ষণ. তা আজও বলতে পারবে না মেন্তি।

কিছুদিন যেতে মেন্তি সাধনার এই প্রথম স্তরেই যথেষ্ট আনন্দের স্বাদ পেল—কিন্তু কে জানে কেন গুরুদেব ওর এই উন্নতিতে খুশি হতে পারলেন না।

কয়েকদিন ওকে নিয়ে বসার পরই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে লাগলেন ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে।

যেন কি একটা সত্য নির্ণয় করতে চাইছেন ওর মুখ দেখে—কিন্তু অনুমানের সঙ্গে তা মিলছে না।

মেন্তি একটু ভয় পেল বৈকি!

কোথায় তার কি অপরাধ ঘটছে বুঝতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও—কোথায় বিচ্যুতি ঘটছে তার—তবে হচ্ছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাঁকে খুশি করার জন্য সে প্রাণপণ কষ্ট স্বীকার করতে রাজী—তিনি কি চান, কি করলে কতটা পরিশ্রম করলে তাঁর এই অপ্রসন্নতা বা বিরক্তি দূর হবে সেটাই কিছুতে ভেবে পেল না সে।

ভয়ে জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কে জানে কী শুনতে হবে!

শেষে তিনিই একদিন বললেন, 'তারা—' তারা নাম তিনিই রেখেছিলেন ওর, মেন্তির ভাল নাম বুঝি ছিল অপর্ণা, আমি আবার তাও জানতুম না—'তোমার কি একটা বন্ধন আছে পেছনে, প্রবল কোন বন্ধন, সেই জন্যে তুমি এগোতে পারছ না। কী সেটা বলো

তো, লজ্জা করো না।'

'বন্ধন!'

তারা চমকে উঠল। বলল, 'কৈ, আমার তো কোন বন্ধনের কথা মনে আসছে না। এক মা'র জন্যেই মাঝে মাঝে—তা তাঁর দুঃখ তো আমি থেকেও ঘোচাতে পারতুম না, বরং বাড়তই—দুঃখের ওপর দুর্ভাবনা—সেই জেনেই তো আমি ছেড়ে এসেছি। আর কোন বন্ধন বা পিছুটান তো মনে পড়ছে না।'

ভ্রূকুটিটা যেন আরও ঘন হয়ে এল।

তিনি বললেন, 'অত চট ক'রে উত্তর দিও না, ভাল ক'রে ভেবে দেখো। বোধহয় আমার ভুল হয় নি। মা নয়—অন্য কোন বন্ধনের কথা চিন্তা করো।'

সেদিনটা দিনরাতই ভাবল তারা।

অনেক ভেবেও তেমন কোন বন্ধনের কথা মনে পড়ল না।

শেষে শেষ রাত্রের দিকে—গুরুদেব প্রত্যহ রাত আড়াইটেয় উঠতেন—ওরও ঘুম ভাঙত বাধ্য হয়ে—তিনি কথাটা সংশোধন করলেন।

বললেন, 'বন্ধন বলতে তুমি হয়ত কথাটা ভাল বুঝতে পারো নি তারা,—আমি কামনার কথাই বলছি। কোন বিশেষ কামনা অপূর্ণ আছে তোমার, সেই কামনাই তোমাকে পিছনে টেনে রেখেছে, মনকে সংসার থেকে মানুষের মধ্যে থেকে তুলে নিতে পারছ না। এইবার ভেবে দ্যাখো দিকি ভাল ক'রে।'

ভেবে দেখল।

অন্তরের অন্তস্তলে ডুব দিয়ে দেখল, মনের সমস্ত আঁতে-কোণে ঘুরে এল।

মনেও পড়ল এক সময়।

প্রত্যূষে ধ্যান থেকে উঠে গুরু যখন ওর দিকে তাকালেন, সে আর তাঁর চোখে চোখ রাখতে পারল না। মাথা নামাল, লজ্জিত অপরাধীর মতো।

গুরুদেব বুঝলেন, হাসলেন একটু।

ক্ষমার হাসি।

বললেন, 'কী সে? পুরুষ?'

মাথাটা আরও নত হল তারার।

'সব বলো আমাকে। লজ্জা করো না। গুরু, ডাক্তার আর নিজের পক্ষের উকিল—এ'দের কাছে সত্য গোপন করতে নেই। বিশেষ গুরুর কাছে পুণ্যের ফর্দ মেলে ধরার তো প্রয়োজন নেই, পাপ বাসনা, কলুষিত কামনা যদি কিছু থাকে—যদি অতীতের কোন গর্হিত অপরাধ বিবেকের ওপর চেপে বসে থাকে—সেইগুলোই গুরুর কাছে খুলে বলা দরকার।'

এবার মাথা তুলল তারা।

বলল, 'না, তেমন কোন অপরাধ বা পাপ আমার বিবেকে নেই। কামনা যা আছে তাও লজ্জা পাবার মতো কিছু নয়। আমি বিবাহিত, স্বামীকে দেখেছি, স্পর্শ করেছি—কিন্তু অন্য কোন সাধ মেটে নি। আপনাকে সত্যি কথাই বলছি সে সাধ যে আমার মনে এতটা ছিল তা আমিও বুঝি নি—কিন্তু আজ আপনি বলার পর মনের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি যে—সেই কামনাই এখনও আমার মনের মধ্যে আছে।'

'তোমার স্বামী! কিন্তু সে তো শুনেছি, জরদগব, জড়বুদ্ধি, ইংরিজিতে যাকে "হাফ উইট" বলে। তার ওপর তোমার—! তোমাদের পরিচয়ও তো হয় নি কোনদিন—?'

না, জরদগব বা জড়বুদ্ধি নয়।

তারা প্রতিবাদ করেছিল।

ক্রমাগত কি বিলিতি ঘুমের বড়ি দিয়ে তাকে নেশা ধরানো হয়েছে, ওর ননদরা কোন

ডাক্তারকে প্রচুর টাকা দিয়ে আনায় ভাইয়ের জন্যে।

সেই বড়ি খেয়েই দিনরাত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

নেশা কাটলেই অস্বস্তিবোধ করে বলে আবার খায়, তাতেই স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে, কোন বিষয়েই ইচ্ছের জোর নেই, নিজের অধিকার খাটাতে পারে না।...

নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতার সুবিধের জন্য একটা তরুণ জীবন এইভাবে নষ্ট করছে ঐ নষ্ট মেয়েছেলে দুটো—একথা যখনই ভাবে তারা, মাথা গরম হয়ে ওঠে তার।

আজও, এত কাণ্ডর পরও, ওর নিজের দুঃখের চেয়ে এই দুঃখই বেশী মনে লাগে ভাবতে গেলে...এই প্রতিকারহীন অন্যায় অত্যাচার।

একজনকে অকারণে বঞ্চিত করার এই ষড়যন্ত্রের কথা।

না, এটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করে না তারা, এই আকর্ষণ বা মায়া বা মন-কেমন-করা—যা-ই বলুক না কেন লোকে।

সে হিন্দুর মেয়ে, ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, সেকেলে পরিবেশে স্বল্পশিক্ষিতা মায়ের কাছে মানুষ—তাঁদের কাছে আদর্শ বলতে সীতা সাবিত্রী সতীর কাহিনী, তাঁরা জীবন-পাত করেও সতীত্ব বজায় রাখেন, শত দুঃখে কষ্টেও কুপথে পা দেবার কথা ভাবতে পারেন না।

আজকালকার মেয়েরা ঐ বয়সে অনেক বেশী শেখে—অনেক বেশী নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত তারা, বিচার ক'রে হৃদয়াবেগকে সংযত রাখে—বিনা তর্কে বা বিনা যুক্তিতে, যাচাই না ক'রে, জীবনের বাস্তব দিকগুলোর সঙ্গে না মিলিয়ে—কোন কথা শুধু গুরুজনরা বলছেন বা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে বলে মেনে নেয় না।

সহজে বিশ্বাস করাটা তাদের বুদ্ধি ও শিক্ষার অপমান বলে মনে করে তারা।

ক্ষমা করাটা তাদের কাছে দুর্বলতা, বিশেষ নিজে থেকে ক্ষমা করার কথা তো ভাবতেই পারে না।

ভালবাসাকেও তৌল করে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

তারার আমলে সেরকম ছিল না।

শৈশব থেকে, একটু একটু ক'রে জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছে যে স্বামীই মেয়েদের সব—ইহকাল পরকাল তাঁর সঙ্গে জড়িত, জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক দু'জনের।

তাই বিয়ের কথা ওঠার পর থেকেই অপরিচিত না-দেখা বরকে ঘিরেই বহু স্বপ্ন দেখেছে সে, কল্পনায় কামনা তৈরী হয়েছে মনের মধ্যে।

তারপর শুভদৃষ্টির সময় যখন চোখে চোখ পড়েছে—ভাল লেগেছে তার ব্রজকিশোরকে।

হাতে হাত রাখার সময় শিউরে উঠেছে তার স্পর্শে।

কুশণ্ডিকার সময় তার বুকে হাত দিয়েছে, দুই হাত দিয়ে বেড়ে ধরেছে, চার হাত এক করে যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়েছে—সেই স্পর্শ, সেই ক্ষণিকের সাহচর্য কল্পনাকে আরও উদ্বেল করেছে, কামনাকে করেছে আরও উত্তেজিত, আরও লোভাতুরা।

ফুলশয্যার রাত্রেও, কথা কইতে পারে নি ঠিকই—ননদদের আদেশে দরজার কাছে ঝি শুয়ে ছিল একজন—কিন্তু দু'জনেরই দু'জনের দিকে চেয়ে দেখার বাধা ছিল না।

শেজের ক্ষীণ আলো জ্বলছিল ঘরে, তাতেই সে দেখেছে, দুই চোখ ভরে দেখেছে—ভাল লেগেছে তার।

হয়ত ভাল লাগার জন্যে প্রস্তুত ছিল বলেই লেগেছে—মনে মনে স্বপ্ন দেখেছে সেই সঙ্গেই—কবে কখন নিভৃতে পাবে, ঐ বুকে মাথা রেখে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করবে।...

মনে হয়, ওর বিশ্বাস—ব্রজকিশোরেরও ওকে দেখে ভাল লেগেছিল, সুযোগ পেলে

সেও ওকে ভালবাসত, ওদের জীবন সুখের হ'ত।

তারপর—সেই দুঃস্বপ্নের দিন, দীর্ঘ দু'বছর ধরে সেই একটানা নির্যাতন—তার মধ্যে যদি ঐ আশাটুকু না থাকত যে একদিন হয়ত এ দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটবে, স্বামীকে আপন ক'রে পাবেই সে—তা'হলে সে অবর্ণনীয় অপমান লাঞ্ছনা ও দুঃখ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না, কবেই হয়ত আত্মহত্যা ক'রে অব্যাহতি খুঁজত।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আঘাতে আঘাতে পাথর হয়ে গেছে বুক, চিন্তাশক্তি অনুভূতি কামনা কল্পনা সব অবশ অনড় হয়ে গেছে—কিছুই আর বোধ হ'ত না শেষের দিকে, স্বামীকে ঘিরে যে স্বপ্ন তাও যেন ভুলে গিয়েছিল।

সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতাও আর ছিল না, মনে হয়েছিল সে কামনারও বুঝি মৃত্যু ঘটেছে।

দেহ-ধর্মের যে ক্ষুধা তাও দীর্ঘ উপবাসে মরে গেছে।

কিন্তু আজ, ওঁর কথায় নিজের মনের অতলে হাত্ড়ে খুঁজে দেখছে—মহাপ্রলয়ের দিনের বটপত্রে শায়িত বিশ্ববীজশিশুর মতো সে কামনার ক্ষুদ্রতম বীজ একটু কোথায় থেকেই গিয়েছিল, অতি ক্ষুদ্র, প্রায় দৃষ্টির অগোচর, তবু তাই তাকে পিছনের দিকে টেনে রেখেছে।

এ কামনার বুঝি মৃত্যু হয় না কোনদিনই, অণুর মতো বীজ থেকেই যায় মানুষের মনে।

কায়াহীন মহাশক্তির অংশকণা।

স্থির হয়ে বসে শুনলেন তারার গুরুদেব।

শোনার পরও অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন।

এই সমস্ত সময়টা একদৃষ্টে ধুনির ধূমায়িত কাঠটার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন—এখনও তেমনিই বসে রইলেন। মুখ তুললেন না বা ওর দিকে তাকালেন না।

তারা একটি কথাও গোপন করে নি বা সঙ্কোচ ক'রে কিছু রেখে ঢেকে বলার চেষ্টা করে নি।

তার মনোভাবের জন্যে লজ্জিত নয় সে—কোন অপরাধবোধ নেই তার।

তবু বলা শেষ হ'লে অকারণেই যেন কাঠগড়ার আসামীর মতো রায়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল দুরুদুরু বুকে।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুললেন সন্ন্যাসী।

বললেন, 'তোমাকে স্বামীসঙ্গই করতে হবে তারা। এই আকর্ষণ পেছনে নিয়ে তুমি এগোতে পারবে না।'

তারা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'তাহলে আপনি কি আমাকে ত্যাগ করলেন?'

'তোমাকে ত্যাগ করা আর আমার সম্ভব নয়। আমাদের এও জন্মান্তরের সম্পর্ক। তোমাকে দেখার পর বুঝেছি—তোমার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করেছি, আমি যা জেনেছি তা তোমাকে জানিয়ে ছুটি নিতে পারব—হয়ত যা জানি না তাও তুমি জানতে পারবে একদিন, আমার আরব্ধ কাজ শেষ করে যাবে।......না, আমি শুধু চাইছি তোমাকে সর্ববন্ধন মুক্ত ক'রে, তাঁর দিকে ঠেলে দিতে।...কোন অতৃপ্ত ইচ্ছা না সেই পথে তোমার পায়ে বেড়ি হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু—' তারা একটু ইতস্ততঃ করে সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'শুনেছি এসব সাধনায় ব্রহ্মচর্যের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।'

'ব্রহ্মচর্য শুধু দেহের নয় তারা, মনেরও ব্রহ্মচর্য দরকার। মনের মধ্যে দৈহিক সম্ভোগের বাসনা রেখে শুধু দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখলে কোন সুবিধে হয় না। তার চেয়ে

ও পিছুটান কাটিয়ে নেওয়াই ভাল। সেকালের বহু মুনিঋষি বিবাহিত ছিলেন, অনেক সন্তানও ছিল তাঁদের। তাছাড়াও, বিশ্বামিত্র পরাশর—এ'দেরও দেহসম্ভোগের ইচ্ছা জেগেছে, হঠাৎ কামার্ত হয়ে পড়েছেন—সে গল্প তো জান নিশ্চয়ই। নইলে শকুন্তলা কি ব্যাসদেবের জন্ম হ'ত না। তাতেই বা কি আর তাঁদের ঋষিত্ব বাতিল হয়ে গেছে? দেহ ধারণ করলেই এসব দুর্বলতার অধীন হ'তে হবে। যদি মনে মনে সম্পূর্ণ ইচ্ছাটাকে বিনষ্ট করতে পারো—তবেই সত্যকার ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা সম্ভব।'

॥ ৮ ॥

এই স্বামীসঙ্গ আবার কেমন ক'রে ঘটবে, কী ভাবে, কবে—তা গুরুদেব বলেন নি কিছু।

স্বমীসঙ্গ ঘটলে বন্ধন দৃঢ় হবে, সংসারে জড়িয়ে পড়বে—তাহলেই বা আবার কেমন করে তাঁর কাছে আসবে—এসব কথাও না।

তারাও প্রশ্ন করে নি।

এই ক'মাসেই ওঁর সম্বন্ধে তার একটা অগাধ আস্থা এসে গিয়েছিল।

ওঁর পক্ষে সবই সম্ভব—এই কথাই মনে হ'ত।

সম্ভব হ'লও তাই।

ক'দিন পরে উনিই সংবাদটা দিলেন।

ব্রজকিশোর নাকি স্ত্রীকে ঐভাবে বাপের বাড়িতে পাঠানোতে খুবই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়েছিল।

এতটা যে হবে, এতটা অনুভবের শক্তি ওর আছে তা ওর দিদিরা ধারণা করতে পারে নি।

সে যে এরপর আস্তে আস্তে অসাধারণ চেষ্টায় নেশাটা কমিয়ে আনছিল—তাও দিদিদের জানতে দেয় নি।

প্রচণ্ড শ্যকেই এটা সম্ভব হয়েছে, বোধ করি এই পৈশাচিক বন্ধন কাটিয়ে উঠতে এই শ্যাকেরই প্রয়োজন ছিল।

তার মাসকতক পরে সে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। কোথায় যাচ্ছে কাউকে বলে নি।

তাতে খুবই বিচলিত হয়েছিল দিদিরা, কারণ ব্রজ থাকলে সেই মালিক, তার সম্পর্কেই এখানে এত প্রতাপ, ব্রজর অবর্তমানে জ্ঞাতিভাইদের হাতে চলে যাবার কথা সব—ব্রজর সন্তান না থাকলে।

এটা ওরা আগে ভেবে দেখে নি, তাহ'লে মেন্তির একটা সন্তান সম্ভব হ'ত এতদিনে।

ওরা তাই প্রাণপণে খোঁজখবর যা কিছু, বিজ্ঞাপন দেওয়া, লোক লাগানো, সব করেছে।

ব্রজ অবশ্য নিজেই খবর দিয়েছে কিছুদিন পরে জয়পুর থেকে।

সেখানে ওর এক মামা থাকতেন, বিষয়ী পাকা লোক, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কতকগুলো হুকুমনামা পাঠিয়ে কামদারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে—কতটা টাকা পর্যন্ত সংসার খরচ দেওয়া যাবে—এবং এক অডিটার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে গত ক'বছরের হিসেব দেখার জন্য।

খবর পেয়ে বোনেরা ছুটে এসেছিল, সে মামা দেখা করতে দেয় নি।

তারপর কোথায় গেছে, তারা আর খবর পায় নি।

কিন্তু গুরুদেব জানেন, সে সম্প্রতি কাশীতেই এসেছে।

লজ্জায় শ্বশুরবাড়ি যেতে পারে নি। তবে তারই খোঁজ করতে এসেছে সে।

উনি খবর দিয়েছেন—সে এখানেই আসবে।...

'তারপর?' কেমন যেন অবসন্নভাবে প্রশ্ন করে তারা।

সে কি ঠিক এ-ই চেয়েছিল?

আবার এই গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যেতে?

সেই বাড়িতে আবার, সেই সব লোকের মধ্যে?

যেখান থেকে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছে?

কে জানে, এখন যেন নিজের মনটা নিয়েই বিপদে পড়েছে সে—কী করবে, কী করতে চায় তাই বুঝতে পারছে না।

হাসেন গুরুদেব।

বলেন, 'আসুক না ব্রজ। দ্যাখো। তারপর তো তোমার হাতে।'

তখন বোঝে নি তারা, সে হাসি বা কথাগুলোর অর্থ।

বিকেলবেলাই ব্রজকিশোর এল।

কতকগুলো রঙীন শাড়ি ও কিছু গহনা নিয়ে।

বলল, 'খুলে ফেল, খুলে ফেল। ছিঃ! আমি থাকতে গেরুয়া! ছি ছি!'

তারপর ওর গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বলল, 'আমি ওকে আজই নিয়ে যাব। এ বেলাই।'

'কোথায়?' প্রশ্ন করলেন গুরুদেব।

'কেন, হোটেলে! যেখানে আমি আছি!' সে একটু অবাক হয়েই যায়।

'কী পরিচয় দেবে?'

'আমার বৌ।'

'এতদিন ছিল না, হঠাৎ আজই বৌ কোথা থেকে এল তারা কিছু মনে করবে না? কাশীতে অনেক রকম বৌ চলে তো, সেই রকমই যদি তারাকে তোমার অবিদ্যা বলে মনে করে?'

'তা তবে?' বোকার মতো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় তারার মুখের দিকে।

যেন তারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে।

দীর্ঘকাল পরের বুদ্ধি ও মতামতের ওপর নির্ভর করে থাকারই ফল এটা—কোন সমস্যা উপস্থিত হ'লে নিজে কিছু ভেবে পায় না।

পরামর্শ গুরুদেবই দিলেন, 'ও হোটেল ছেড়ে দাও, মালপত্র নিয়ে এখানে এসো, কাল তারাকে নিয়ে নতুন কোন হোটেলে উঠো। কিংবা, বাড়িতেই চলে যাও না একেবারে?'

'না—মানে বাড়িতে—ইয়ে এভাবে হঠাৎ যাওয়া ঠিক হবে না। এখন আর ওখানে ফিরতেও ইচ্ছে নেই। দিনকতক ভাবছি ঘুরেই বেড়াব, দিল্লী আগ্রা হরিদ্বার, ওদিকে রাজপুতানা—দ্বারকা পর্যন্ত।'

যদিচ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক—সব জড়িয়ে প্রায় চার বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, তবু পরিচয় এবং আলাপ, স্বামী-সম্ভাষণ যাকে বলে তাও এই প্রথম।

তাই রাজ্যের সংকোচ এসে কণ্ঠে ভর করে, তবু অনেক চেষ্টায় তারা কথা কইল এবার। বলল, 'তুমি কি কোনদিন আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে পারবে? তোমার দিদিরা বেঁচে থাকতে?'

দুর্বল মানুষের স্বভাবই এই যে যার যেখানে দুর্বলতা সেখানকার কথা উল্লেখ করলেই সে অতিরিক্ত সবল হবার চেষ্টা করে।

তার ফলে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় বেশির ভাগই।

ব্রজকিশোরও হঠাৎ দিদিদের উদ্দেশে অত্যন্ত কটু ভাষায় গালিগালাজ ক'রে উঠল।

বার বার বলতে লাগল, 'আমি কি ওদের পরোয়া করি নাকি? আমি ওদের খাই না পরি? ও গদি আমার, আমি মালিক। কি ভেবেছে ওরা? উকিলের চিঠি দিয়েছি কামদারকে। ক'বছরের হিসেব চেয়েছি। অডিটার বসে গেছে হিসেব চেক করতে। আমার হুকুম ছাড়া যা খরচ হয়েছে, অনেয্য যা—সব আদায় করব আমি ঐ কামদারটার কাছ

থেকে। ওর সঙ্গে ঐ মাগী দু'টোর ষড় আছে—আমি জানি না! তিনজনে মিলে আমার সর্বনাশ ক'রে এসেছে এতদিনে ধরে। ওদের জেলে দিয়ে ছাড়ব আমি!'

গুরুদেব অর্ধনিমীলিত নেত্রে ধুনিটার দিকে চেয়ে বসে আছেন।

প্রশান্ত মুখ—কেবল তারার মনে হ'ল ওষ্ঠের প্রান্তে ঈষৎ একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস।

'তাহলে তোমার বৃন্দাবন ফিরতেই বা আপত্তি কি?'

তারাই প্রশ্ন ক'রে আবার।

'আপত্তি! কিসের আপত্তি! আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? সেখানে আমিই মালিক, একলা।...তা নয়, এই একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে, লোক-জানাজানি—আবার দুম্‌ ক'রে নিয়ে গিয়ে তুলব?...যাক না দু'দিন। তারপর ওদেরও একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। অন্য বাড়ি দেখে চলে যেতে বলেছি। তা সহজে তো যাবে না। ওরা থাকলেই অশান্তি আবার।'...

তারপর একটু যেন বিরক্তভাবেই বলে, 'তা তুমিই বা এখনই সেখানে যাবার জন্যে ব্যস্ত কেন? কি সুখ পেয়েছিলে সেখানে এত? হেঁ হেঁ—বলে উঠতে লাথি, বসতে ঝ্যাঁটা—এই তো? আমার এখন আর ঐ গর্তয় গিয়ে ঢোকার ইচ্ছে নেই। মোটা টাকার কটা ড্রাফ্‌ট্‌ ক'রে নিয়েছি, এখন তো দিনকতক ফুর্তি ক'রে বেড়াই!'

তারপর আরও অনেকক্ষণ ধরে বকে যায়।

স্থূল কথা, স্থূল রসিকতা।

লেখাপড়া বিশেষ কিছুই শেখে নি, ওর জগৎ যেটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই অতি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই মন এবং মুখের ভাষা ঘুরে বেড়ায়।

শুনতে শুনতে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারে আর অকারণেই শিউরে ওঠে তারা।

অনেকক্ষণ বসে থাকে ব্রজকিশোর।

বোধ হয় এরা প্রশ্রয় দিলে সারা রাতটাই থেকে যেত।

গুরুদেবই ওকে চা-জলখাবার খাইয়ে বিদায় দেন।

বলেন, 'তাহলে কাল এসো। আজ এখন ফিরে যাও। হোটেলওলারা ভাববে নয়ত। কাশী জায়গা—গুণ্ডা বদমাইশ ফেরেববাজের হাতে পড়া তো আশ্চর্য কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, তা বটে।' ব্রজও সায় দেয়, 'তা ছাড়া আমি শাঁসালো মক্কেল, আমার জন্যে আরও ব্যস্ত হবে। জানে বিস্তর টাকা আমার হাতে আছে।...রাজরাজড়ার মতো থাকি তো, টাকার পরোয়া আমার নেই।'

সে বিদায় নিল অনেক রাত্রে।

বলে গেল, 'তুমি তৈরী থেকো অপর্ণা। আমি বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ এসেই নিয়ে যাবো। গাড়ি নিয়ে আসব একেবারে—মালপত্র থাকবে তো, দেরি করা চলবে না। ব্যাটারা জো পেলেই বেশী ভাড়ার জন্যে ছ্যাঁচড়াবিত্তি লাগাবে! আচ্ছা আসি।'

গুরুদেবের দিকে নমস্কারের ভঙ্গীতে একবার হাতটা তুলে বিদায় নেয় সে।

•

সারা রাত ঘুমোতে পারল না তারা।

সেও সমস্ত রাত ধূমায়িত ধুনিটার দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিল।

গুরুদেব প্রতিদিনই রাত আড়াইটেয় উঠে প্রাতঃকৃত্য স্নান সেরে এসে ধ্যানে বসেন, সূর্যোদয় পর্যন্ত স্থিরভাবে বসে থাকেন একমনে।

সেদিনও তার অন্যথা হয় নি।

পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের লক্ষণ দেখা দিতে তিনি যেমন আসন ছেড়ে উঠতে যাবেন, তারা তাঁর পায়ের ওপর পড়ল উপুড় হয়ে, 'আমাকে বাঁচান, ওর সঙ্গে পাঠাবেন না।'

'সে কি! কেন এমন হঠাৎ—মতি বদল হ'ল?'

প্রশান্ত মুখে তখনও সেই কৌতুকের আভাস।

'না, এ আমি চাই নি। এ রকম আমি ভাবি নি। ওর সঙ্গে বাস করতে পারব না আমি। শুধু দৈহিক একটু আনন্দের জন্যে—আনন্দ পাব কিনা তাও জানি না—তিলে তিলে মরতে আমি পারব না। সংসার আমার জন্যে নয়, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমাকে সংসার থেকে বাঁচান।'

'কিন্তু তুমি আবারও ভুল করছ না তো তারা? আত্মপ্রবঞ্চনা করছ না?...মনের দিকটা ভাল ক'রে তাকিয়ে দ্যাখো।'

'যতটা সম্ভব দেখেছি, সারারাত ধরেই দেখেছি। না, পিছনের বন্ধন আর থাকবে না, আপনি আমাকে পায়ে স্থান দিন, তাড়িয়ে দেবেন না।'

'এত তাড়াতাড়ি করো না। মন এত সহজে বোঝা যায় না। ভেবে দ্যাখো। আমি তোমাকে তাড়াতে চাইছি না। তুমি থাকবে কিনা ভেবে দ্যাখো। পিছটান থাকলে এখানে তোমার শরীরটা ধরে রেখে কোন লাভ হবে না।...বেশ তো, ব্রজর তো এখনও আসতে চার-পাঁচ ঘন্টা দেরি আছে, যাও, স্নান ক'রে এসে একটু আসনে বসো, মনটা শান্ত করার চেষ্টা করো। ভেবে দেখে স্থির করো—যাবে, না তাকেই বিদায় দেবে!'

মন স্থির করল তারা।

এগারোটা নাগাদ ব্রজকিশোর যখন এল, তখন তারা অনেকটাই শান্ত হয়েছে।

আগের দিনের রেখে যাওয়া শাড়ি-গহনাগুলো বিস্মিত হতভম্ব ব্রজর প্রায়-শিথিল হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে মাপ করো। আমার যাওয়া হবে না। তুমি এবার তোমার মনের মতো একটি মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রে সুখী হও।'

'তা—তার মানে? এর মানেটা কি আমি জানতে চাই।..ঐ ব্যাটা ভণ্ড সান্ন্যাসীটা তোমাকে ভুজুং দিয়েছে বুঝি রাত্তিরে। ঐ ব্যাটার গেলবার মতলব তোমাকে! য়্যাঁ? গেলাচ্ছি আমি!'

'ছিঃ! অনেক নীচে নেমেছ, আর পাপ বাড়িও না। ওঁর সে মতলব থাকলে আমি কৃতার্থ হয়ে যেতুম। আর তা'হলে উনিই খোঁজ ক'রে তোমাকে ডাকিয়ে আনাবেন কেন? তা নয়—বিনা অপরাধে যথেষ্ট লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এসেছি শ্বশুরবাড়ি থেকে, আসলে সেখানে আবার সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবারই লোভ আমার, তোমার রক্ষিতা হয়ে বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর প্রবৃত্তি আমার নেই। যদি সেইভাবেই জীবন কাটাতে হয়—অনেক ভাল পুরুষ আমার জুটবে, সত্যিকারের রাজারাজড়াও জুটতে পারে।'

'বা রে!' আমি কি তাই বলেছি—বলছিলুম এখন এই কিছুদিন আর কি—একটু জানাজানি হোক, আমি বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে আমার কাছে রেখেছি, খবরটা একটু থিতিয়ে যাক—তারপর একদিন গিয়ে পড়লেই হবে—'

'তোমার দিদিরা ওখানে থাকতে কোনদিন তুমি তা পারবে না। তাদের সামনে গেলেই আবার জুজু হয়ে যাবে। তারা ও বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বৃন্দাবনে অন্য কোথাও বসে থাকলেও তোমার অশান্তি।, তখন আমাকে ফেলতেও পারবে না, গিলতেও পারবে না।... না, তুমি ফিরেই যাও, তোমার জীবন থেকে গোবিন্দ যখন আলাদা করে দিয়েছেন, তখন আর জড়াতে চেয়ো না।'

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলল ব্রজকিশোর।

অনেক চেঁচামিচি অনেক রাগারাগি।

গুরুদেবকে বিস্তর গালাগাল দিল।

তিনি একটি কথাও বললেন না, ইঙ্গিতে তারাকেও নিরস্ত করলেন প্রতিবাদ করতে।

তারপর কতকটা শ্রান্ত হয়েই—টাঙ্গাওয়ালাও ঝামেলা শুরু করল এত দেরি হচ্ছে বলে,

একসময় ব্রজকিশোর বিদায় নিল।

শাসিয়ে গেল বিকেলে লোকজন নিয়ে আসবে, জোর ক'রে নিয়ে যাবে তার বিয়ে-করা বৌকে।

সে চলে যেতে উৎকণ্ঠিত পাংশু মুখে তারা প্রশ্ন করল, 'সত্যিই ওবেলা এলে হাঙ্গামা করবে না তো?'

'পাগল! খুঁজে বার করতেই পারবে না। সে ভয় নেই, কিন্তু তুমি একটা মস্ত ভুল করলে না তো? আবার আমাকেই ওর সন্ধানে বেরোতে হবে না তো?'

'না, সত্যিই বলছি। আমার শখ মিটে গেছে। সাধও।'

হাসলেন গুরুদেব।

বললেন, 'এত সহজে যদি ওটা মিটত তারা!'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করল তারা ভৈরবী।

কিন্তু আমার এখনও শোনা শেষ হয় নি। প্রশ্ন করলুম, 'তার পর?'

'তারপর আর কি। এই।'

'উঁহু, আরও কিছু আছে। গুরুদেবের শেষ কথাটা মিলিয়ে নিতে বাকী, ওটা খোলসা করো। কথাটা তিনি শুধুমুধু বলেন নি, তুমিও আমাকে এমনি শোনাও নি।'

হাসতে লাগল তারা, 'তুমি বড় চালাক, না!...এত কথা শুনেই বা তোমার লাভ কি?'

'সেটা এত কথা শোনাবার আগে ভেবে দেখলেই পারতে! এখন এই শেষটুকু বাকী রেখেই বা তোমার লাভ কি?'

'সত্যি, কেন যে এত ছিষ্টি তোমাকেই ডেকে এনে বলতে গেলুম!'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'সাধুই হই আর তপস্বিনীই হই—লজ্জাটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না।...সেই জন্যেই বলতে ইতস্ততঃ করছিলুম।'

গুরুদেবের ও মন্তব্যের অর্থ তারা বুঝেছিল আরও কিছুদিন পরে।

তিনি হয়ত জানতেন—কিন্তু তারা নিজের মনে বুঝতে পারে নি আগে।

যেদিন ঠিক বুঝল, সেদিন আর দেরি করে নি, বৃথা সংকোচে ইতস্ততঃ করে নি।

মনের পাপ অকপটেই তাঁর কাছে খুলে বলেছিল।

বলেছিল, 'এ আমার কি হ'ল, এর পর যে নিজের কাছেই নিজে মুখ দেখাতে পারছি না! আত্মহত্যা করলেও যে এ পাপের শেষ হবে না!'

গুরুদেব ওর মুখের ওপর শান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন করেন নি, হয়ত উত্তরটা কি আসবে তিনি জানতেনই।

কিছুই বোধ হয় অজানা ছিল না তাঁর।

তারাকেই বলতে হয়েছিল।

তারা তাঁকেই কামনা করে।

সেই পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই বোধ হয় করছে।

এটা অস্বাভাবিক বলে, অন্যায় বলে নিজের মনের চেহারাটা দেখেও দেখে নি, অসম্ভব বলে মনকেই ধমক দিয়েছে বার বার।...

আজ মনে হয়, ওঁকে ছেড়ে যেতে হবে বলেই আরও বোধ হয় ব্রজর সঙ্গে যেতে পারে নি।

অনেক চেষ্টা করেছে সে চিত্ত দমন করবার, বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায় নি নিজেই, নিজের মনের চেহারাটা দেখেও দেখতে চায় নি—কিন্তু এখন আর কোন সংশয় নেই।

এত বড় পাপ গোপন ক'রে রাখাও পাপ।

অনেক লড়াই করেছে সে এ অনাচার এ ক্লেদ দূর করার জন্যে—কিন্তু কিছুতেই পারে নি।

মনকে একান্তভাবে পরমার্থের দিকে নিয়ে যেতে পারছে না, এই পাপ বাধা দিচ্ছে।

এই পর্যন্ত বলে মাথা হেঁট করল ভৈরবী।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলুম, 'সে কি! তারপর? উনি কি বললেন?'

উত্তেজনায় প্রায় উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিলুম আমি।

তারা অপ্রতিভভাবে বলল, 'তিনি যা বলবেন তা তো জানাই। এ সম্ভব নয় কোন-মতেই। তিনি আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, গুরু; জননী বলে সম্বোধন করেছেন, জগজ্জননী বলে পূজা করেছেন আমাকে—তারপর আর এ হয় না।...তাঁর দিক থেকে মন মুক্ত না থাকলে এক ঘরে কিছুতেই বাস করতেন না এতদিন।'

কিন্তু তিরস্কারও তিনি করেন নি।

আসল কথাটা কিছু পরে বলল তারা।

এ বাসনা যে কত দৃঢ়মূল তা তাঁর মতো সর্বদর্শী সন্ন্যাসীর জানতে বাকী ছিল না।

তিনি হেসেই আশ্বাস দিয়েছিলেন তারাকে, এ অতৃপ্তি, এ কামনা থাকবে না, চলে যাবে।

'চলে গিছল?'

আবারও সেই সর্বেন্দ্রিয়রোধকরা অবস্থা আমার।

'গিছল।'

'কি ভাবে? আপনিই?'

'সেটা শুনতে চেয়ো না। বুঝতে পারবে না। বিশ্বাসও করবে না। তবে এইটুকু জেনে রাখো—তোমরা যাকে দৈহিক মিলন বলো তা হয় নি কোনদিনই, কিন্তু তাঁর কৃপায় সে কামনা নিবৃত্ত হয়েছে আমার, অতৃপ্তি দূর হয়েছে।'

আর কিছু বলার নেই তার, আমারও শোনার না।

এবার ওঠবার কথা।

ওঠাই উচিত।

কিন্তু ঠিক যেন তখনই উঠতে ইচ্ছে করছে না।

এই-ই হয়ত শেষ দেখা।

চিরকালের মতো।

অন্তত তারা তাই বলেছে।

'আর কি, ওঠো এবার? হোটেলে ফিরবে না? থেকে যেতে চাও তো থাকতে পারো। চাট্টি নিরিমিষ ভাতের ব্যবস্থাও হ'তে পারবে।'

'না না, তার দরকার নেই। উঠছি।...কিন্তু আর কি, মানে আর কখনও—দেখা পাবো না?'

'না। গুরুদেব বলেছিলেন, সে তোমার খোঁজ করতে আসবে ঠিক একদিন। তুমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে কথাগুলো জানিয়ে দিও। এটা তার পাওনা।...তাই এত আয়োজন। এবার আমি সত্যিই অজ্ঞাতবাসে চলে যাবো—এ জগৎ থেকে পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে ছুটি হয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু তোমার ঐ সব কুপুষ্যি? ভইরা—যাদের টাকা গুনছ এখনও? তাদের কি হবে?'

'ওরা কোন বন্ধন নয়। এখানে আছি তাই—। ওদের জন্যে আমার এক মুহূর্তের

চিন্তাও নষ্ট হবে না। মা নেই, আর ওদের সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

'তবু পিছটান একটু থেকে যাবে তোমার।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলি।

'সে আবার কি? তুমি? না—তোমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্যেই তো এত নেমন্তন্ন ক'রে আনা!'

'সম্পর্ক কি এক তরফা চোকে? তোমার কামনাই কি শুধু পিছটান—অপরের যদি কোন কামনা থাকে তোমাকে ঘিরে, তার কি কোন টান নেই? তুমি যখন সব কথাই খুলে বললে, আমিও বলছি, আমার তৃষ্ণা কিন্তু থেকেই গেছে।'

তারা হাসল, বেশ শব্দ করেই।

বলল, 'মেয়েছেলে যেমনই হোক তাকেও পছন্দ করার লোক থাকে, তার ওপর যদি সুন্দরী হয় তো কথাই নেই, তার সম্বন্ধে বহু লোকের অতৃপ্ত কামনা থাকবেই; সব কি মেটানো সম্ভব সে মেয়ের? আর তার অত দায়ই বা কি? আমার বন্ধন আমার মধ্যেই. আমার বোঝা আমিই।'

অগত্যা উঠতে হ'ল। আর বসার কোন কারণও নেই।

তারাও উঠে ঘাটের ধার পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল।

নৌকোয় উঠে একবার শেষ আর্তি জানালুম, 'আর কখনও—একবারও দেখা হবে না? একবারও?'

কী ভাবল একটুখানি।

তারপর খুব সহজভাবেই বলল, 'আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় ঘোড়াঘাটে এই নৌকোই অপেক্ষা করবে। ও কালা-বোবা, তুমি খুঁজে নিয়ে নৌকোয় বসো।...তোমাকে নিয়ে আসবে।'

কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না, অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম ওর দিকে।

'কী হ'ল? বিশ্বাস হচ্ছে না? আর সময় হবে না। যদি সত্যিই আর একবার দেখা করার ইচ্ছে থাকে—আজই এসো।'

দিনটা কাটল অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। আশা-আকাঙ্ক্ষা আত্মগ্লানি—অসম্ভব আশা করার জন্যে. তার সঙ্গে কৌতূহল। কৌতূহলই বেশী।

কেন, কেন ডাকল তারা?

সে কি শুধুই আর একবার দেখা হওয়ার জন্যে. অত মিনতি প্রকাশ করছিলুম বলে?

আজই মিটিয়ে ফেলতে চায় ঝামেলাটা?

বাইরের সংসার এই লৌকিক জগতের এখন আমিই প্রতীক ওর কাছে—আজই সে সম্পর্ক চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলতে চায় বলে?

নাকি আর কিছু?

আর কীই বা হ'তে পারে?

কি আর নতুন ক'রে বলবার আছে তার?

আর কোন্ রহস্য উন্মোচিত করতে চায় সে আমার কাছে?

নাকি আমাকেও টানতে চায় ওর সাধনার মধ্যে?...

এমনি সহস্র প্রশ্ন আর অনুমানে ক্ষতবিক্ষত হ'তে লাগলুম সারাটা অবশিষ্ট দিন।

ঘড়ির কাঁটা যে এত আস্তে চলে আমার ধারণা ছিল না এতদিন। মনে হচ্ছে সময়টা এক জায়গায় থেমে থাকছে অনেকক্ষণ।

শেষে ছ'টা বাজলেই বেরিয়ে পড়লুম।

ফলে ঘাটের কাছে পোঁছে এক দোকানে পর পর দু' কাপ চা খেতে হ'ল।

কারণ আমি আগে পোঁছলেই যে নৌকোও আগে আসবে, এমন কোন লেখাপড়া নেই।

অবশেষে সাতটাও বাজল একসময়।

ঘাটে নামতে নামতেই নজরে পড়ল পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছে মাল্লাটা। আমি নৌকোয় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দিল সে...।

ঘাটের ধারেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল তারা।

'এসো' বলে হাত বাড়িয়ে দিল—অন্ধকারে মাটি দেখতে পাব না মনে করেই হয়ত।

বহুকাল পরে ওকে স্পর্শ করলুম।

কিন্তু না করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এত কোমল এত সুখদস্পর্শ কোন হাত যে হয়, মানুষের হাত এমন হতে পারে তা জানতুম না।

একটি মাত্র স্পর্শেই সারা দেহে এমন আগুন জ্বলে ওঠে, এমন অস্থিরতা জাগে সমস্ত দেহে—রক্ত এমন উন্মত্ত উত্তাল ভাবে বইতে থাকে ধমনীতে—তাও জানতুম না। ...বুকের মধ্যে যে ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ হতে লাগল, মনে হ'ল বাইরে বহু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু এ কোন্ তারা?

অন্ধকার—তবে একেবারে নিরন্ধ্র অন্ধকার বলেই নক্ষত্রের সামান্য আলোতেও দৃষ্টিটা চলছে এইমাত্র, আবছা আবছা ঘরবাড়ি, গাছপালা, ঘাট থেকে ওঠবার পথ দেখা যাচ্ছে।

তবু তাতেই তফাতটা নজরে পড়ল।

সে রুদ্রাক্ষের মালা এবং বালার চিহ্নমাত্র নেই, লাল গেরুয়া কাপড়ও না।

সে জায়গায় নীলাভ সিল্কের শাড়ী আর ফুলের গহনা, তার দিয়ে গাঁথা কঠিন কষ্টদায়ক গহনা নয়—গড়ে মালারই বালা, তাগা আর কবরীভূষা।

এ যে ফুলশয্যার সাজ!

প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না। ক্ষমতাও ছিল না।

জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, সমস্ত দেহটা কাঁপছে ভেতরে ভেতরে থরথর ক'রে। বুকের এমন অবস্থা, মনে হচ্ছে যে কোন্ সময় থেমে যাবে হৃৎপিণ্ডের কাজ।

কী চায় এ মেয়েটা? আমাকে নিয়ে এ ওর কি খেলা?

হাত ধরেই নিয়ে চলল আমাকে পথ দেখিয়ে।

নইলে অসুবিধে হ'ত ঠিকই। অনভ্যস্ত রাস্তা—আর রাস্তাও তো সেটা নয়—পায়েচলা পথ একটুখানি, অজানা পাড়া। চারিদিকে কাঁটা গাছ। আগাছার জঙ্গল।

কিন্তু শুধুই কি সেই জন্যে?

অসুবিধা আমার পা দুটোতেও কম নয়।

কোন শক্তিই যেন ছিল না ও দুটোর।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল একটা, মোটা সলতের প্রদীপ, তবু তার কতটুকুই বা আলো! অবশ্য বাইরের ঘন অন্ধকার থেকে এসে সেই আলোই যথেষ্ট উজ্জ্বল বোধ হ'ল।

এবার কোনমতে, যেন প্রাণপণেই, সাহস সঞ্চয় ক'রে ওর দিকে তাকালুম।

এ কি, এ যে মূর্তিমতী বিদ্যুৎ। এ যে সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা!

যে তারাকে কয়েক ঘণ্টা আগেও দেখে গেছি, এ তো সে তারা নয়।

যে তারাকে দেখেছিলুম সেই অষ্টভুজায়—এমনি প্রদীপের আলোতে, সত্যি কথা বলতে কি যে তারাকে দেখে প্রথম আমি একটা কামনার আলোড়ন অনুভব করেছিলুম এ সেই নবযৌবনা তারা; যার দেহসৌষ্ঠব সুরাঙ্গনাদেরও ঈর্ষার বস্তু, যার দেহসুষমায় আর কিছু যোগ করতে বাকী ছিল না যৌবন-বিধাতার—অথচ যাতে অতিরিক্ত একটি কণাও যুক্ত হয় নি তখনও পর্যন্ত; যে রূপ চিরকালীন পুরুষের দেহে রক্ত চঞ্চল ক'রে তোলে, উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ক'রে দেয়—অতি ঘৃণ্য অপরাধে প্রবৃত্ত করায়—এ সেই রূপ।

এতগুলো বছর—এত দীর্ঘকালের ব্যবধান এমন ক'রে পেরিয়ে গেল কি ক'রে?

আমি কি এ স্বপ্ন দেখছি, না মাথাই খারাপ হয়ে গেল?

সকালেও তাকে সুন্দরী দেখেছি, এও লক্ষ্য করেছি যে তার দেহ থেকে যৌবন যেতে গিয়েও যেন যায় নি—কিন্তু তবু যেতে চলেছে, এ সত্যটা সে দেহের রেখায় গোপন ছিল না।

যে তারা এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে, কোটি মানবের সাধনার ধন—তার মধ্যে সে অবস্থার আভাস মাত্র নেই, এ সে নববিকশিত-যৌবনা তারা—যাকে ঘিরে এতগুলো বছর মনের নিভৃতে অবাস্তব স্বপ্ন রচিত হয়েছে দিনের পর দিন—আশাহীন আশার দুর্গ রচনা করেছি কল্পনায়।

বোধ হয় আমার এ বিহ্বলতা চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, মনোভাব গোপন করার অবস্থাও ছিল না।

সে হাসল একটু। সে-হাসি উগ্রতর সুরার কাজ করল সেই মুহূর্তে—তাতে এমনই মাদকতা।

হাত ধরে বিছানার কাছেই এনেছিল, কিন্তু সে বাঘছালের বিছানাও অন্তর্হিত হয়েছে ইতিমধ্যে।

সাধারণ শুভ্র একটি শয্যা পাতা।

সেইখানে, আলো আড়াল ক'রে আরও রহস্যময় আলো-আঁধারির সৃষ্টি ক'রে একেবারে আমার বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে, রক্তে আগুন লাগানো গলায় চুপি চুপি বলল, 'পছন্দ হয়েছে? এই তো চেয়েছিলে?'

আর সম্ভব হ'ল না নিজেকে সামলানো।

যেন প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবী দুলে কেঁপে উঠে চোখ এবং মনের সামনে সব একাকার হয়ে গেল।

কিছুকালের জন্যে কোন হিতাহিত অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান রইল না—দু'হাতে সবলে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলুম। কঠিন আলিঙ্গনে চেপে ধরলুম—

তারা বাধা দিল না।

মনে হ'ল সে প্রস্তুতই ছিল। তারও কাম্য ছিল এই বর্বরতা।

সেই পুষ্পাভরণ-শোভিত পুষ্পকোমল দেহলতা সম্পূর্ণ নিঃশেষে এলিয়ে পড়ল আমার আলিঙ্গনের মধ্যে, উন্মত্ত চুম্বনে পুষ্পকলির মতো ওষ্ঠদুটি অধিকতর প্রশ্রয়ে অর্ধ-উন্মীলিত হয়ে গেল। কমলদলের মতো চোখদুটি বুজে এল আবেশে।...

তারপর আর কিছু জানি না, আর কিছু মনে নেই।

*　　　*　　　*

যখন আবার জ্ঞান হ'ল, পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারলুম আবার—তখনও মনে হ'ল আমি স্বপ্ন দেখছি, অথবা মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শুধু রাত্রিটা রাত্রিই আছে।

প্রদীপে এখনও আলো জ্বলছে এই মাত্র।

নইলে কিছু পূর্বের সে উন্মত্ত আনন্দলীলার আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

দেখলুম আমি সেই সকালের মতো বাঘছালের উপরে বসে আছি, তেমনি দূরে মাটির ওপর তারা ভৈরবী বসে মৃদু মৃদু হাসছে, সকালের মতোই রহস্যময় কৌতুকের হাসি।

তার পরনে সেই অভ্যস্ত লাল গেরুয়া, ক'ঘণ্টা আগে যা দেখে গেছি, আভরণ বলতে সেই রুদ্রাক্ষের মালা ও বালা।

আজ সকালে যাকে দেখেছি, বয়সের হিসেবে যা হওয়া উচিত, এ সেই যৌবনপ্রান্ত-

বর্তিনী মধ্যবয়সী তারা ভৈরবী!

চেঁচিয়ে উঠতে গেলুম, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

এ কি অবস্থা হ'ল আমার!

রহস্যময়ী ব্যস্ত হ'ল না। শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কী হ'ল, অমন করছ কেন?'

এবার—ওর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরেই বোধহয় আমার কণ্ঠেও স্বর খুঁজে পেলুম। প্রায় চিৎকার করেই বললুম, 'এ—এ কি তারা? এ কি স্বপ্ন দেখলুম এতক্ষণ, না মায়া-মতি-ভ্রম! এই কি সম্মোহন বিদ্যা? না যোগবল? এ সবটাই কি মিথ্যা—এত—এতক্ষণ যা হ'ল?'

তারা দাঁড়িয়ে উঠল একেবারে।

একটু তিরস্কারের ভাবেই বলল, 'সত্যটা জেনে লাভ কি তোমার? অত ছট্‌ফট করছ কেন? যদি মায়াই হয়, যোগবল, স্বপ্ন—যাই হোক, যা পেয়েছ—সাধ মিটিয়েই যদি পেয়ে থাকো তাতে সুখী হওয়া উচিত, যা পেলে তা ঠিক পেলে কিনা, এর চেয়েও ঠিক কিছু আছে কিনা—এ জানতে চেয়ে অশান্তি বাড়াও কেন? সাধকদের মতে তো এ জীবন, এ জগৎ-সংসার সবই মায়া—তা জেনে কি সব হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, না এতটুকু স্বার্থ নিয়ে ঝগড়াবিবাদ কিছু কম করছে?...যাও, এবার ফিরে যাও, তোমাকে পৌঁছে দিলে ছেলেটার ছুটি হবে।...আর কিন্তু আমার খোঁজ করো না।'

সে কথা রাখতে পারি নি।

খোঁজ করেছি আবারও।

এক দিন নয়, তিন-চার দিন ধরে, পাতি পাতি ক'রে খুঁজেছি, বোধ হয় এখানকার প্রতি ইঞ্চি জমি মেপে মেপে ঘুরেছি, কোথাও সে ঝোপড়া খুঁজে পাই নি।

গঙ্গার ধারেও ঘুরেছি, কিন্তু সেই বোবা কালা মাল্লাটার সঙ্গেও দেখা হয় নি কোনদিন।

কেউ বলতেও পারে নি কোথায় গেছে—কিংবা কাশীতেই আছে কিনা!

—সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত—

সপ্তম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৮

-আশি টাকা—

সম্পাদক

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ : সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র